শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ

গিরিশচন্দ্র

বঙ্গ-নাট্যশালার ইতিহাস-সম্বলিত

অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

স্বপন মজুমদার
সম্পাদিত

দে'জ পাবলিশিং ॥ কলকাতা ৭০০ ০০৯

নিবেদন

বহু মনীষী ও লেখক বলিয়া গিয়াছেন যে, 'চরিত্র ও কীর্ত্তি, এই দুইটী আখ্যানযোগ্য বিষয়; অর্থাৎ, যাঁহার চরিত্রে বিশিষ্টতা আছে, যাঁহার কীর্ত্তি সমাজের নিম্নস্তরকে পর্য্যন্ত আলোড়িত করিতে পারে, যাঁহার প্রভাব বহুজনের উপর ব্যাপ্ত, তাঁহার জীবন-কথা লিখিয়া রাখিবার যোগ্য।' এ বিবৃতি গ্রাহ্য করিলে বলিতে হয়, গিরিশচন্দ্রের জীবন সম্পূর্ণ আখ্যানযোগ্য। ১৭ বৎসর হইল তাঁহার মৃত্যু ঘটিয়াছে, তাঁহার মৃত্যুর এতদিন পরেও তাঁহার প্রভাব ক্ষুণ্ণ হওয়া দূরে যাউক, বরং তাহা সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে বলিয়াই মনে করি। বঙ্গ-নাট্যসাহিত্যের ও রঙ্গালয়ের সিংহাসন তাঁহার অভাবে আজিও শূন্য পড়িয়া আছে। একাধারে গ্যারিক ও সেক্সপীয়ারের শক্তি যদি কোনও ভাগ্যধর পুরুষে পুনঃসংঘটনের সম্ভাবনা হয়, তবে গিরিশের শূন্য আসন পূর্ণ হইতে পারে। তাই তাঁহার দেশবাসী তাঁহার অভাব প্রতিনিয়তই অনুভব করিয়া থাকেন। এই তীব্র অভাব-অনুভূতি হইতেই স্পষ্ট বুঝা যায় যে, গিরিশচন্দ্রের প্রভাব-প্রতিপত্তির প্রসার ও ব্যাপ্তি কত বেশী।

১৩১০ সালে মৎ-সম্পাদিত 'গিরিশ-গীতাবলী' যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন তাহার শেষভাগে গিরিশচন্দ্রের এক সংক্ষিপ্ত জীবনী অসম্পূর্ণভাবে সন্নিবিষ্ট করিয়াছিলাম; কেননা, গিরিশচন্দ্র সে সময়ে জীবিত। বলা বাহুল্য, তাঁহার সেই জীবন-কথা তাঁহাকে শুনাইয়া ভ্রমশূন্য করিয়া প্রকাশের প্রয়াস পাইয়াছিলাম। সেইসময় হইতেই, গিরিশচন্দ্রের একটী সুবিস্তৃত জীবনচরিত প্রণয়নের বাসনা বলবতী হয়, এবং সুযোগমত জীবনী-উপাদান সংগ্রহে প্রবৃত্ত হই। গিরিশচন্দ্র আমার মনোভাব অবগত হইয়া, তাঁহার জীবন কিভাবে গঠিত, তৎ-সম্বন্ধে মধ্যে-মধ্যে নানারূপ গল্প করিতেন। তাঁহার জীবনের শেষ চতুর্দ্দশ বৎসর (১৮৯৯ হইতে ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দ) তাঁহার নিত্য সহচররূপে থাকিয়া তাঁহার মুখে যে সকল কথা শুনিতাম এবং তাঁহার চতুর্থা ভগিনী স্নেহময়ী দক্ষিণাকালী, চতুর্থ ভ্রাতা সত্যনিষ্ঠ অতুলকৃষ্ণ, তাঁহার সুযোগ্য পুত্র বঙ্গ-নাট্যশালার শ্রেষ্ঠ নট শ্রদ্ধেয় সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু) এবং গিরিশচন্দ্রের বন্ধুবান্ধবগণের মুখে তদতিরিক্ত যাহা কিছু অবগত হইতাম, তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতাম।

গিরিশচন্দ্রের পরলোকগমনের (১৩১৮ সাল) পর ১৩২০ সালে যে সময়ে 'গিরিশ-গীতাবলী' দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশ করি, সে সময়ে গিরিশচন্দ্রের জীবনীর শেষাংশ সংক্ষেপে রচিত হইলেও তাঁহার সম্বন্ধে এত অধিক কথা তাহাতে প্রকাশিত হয় যে, গ্রন্থখানি 'গিরিশচন্দ্র বা গিরিশ গীতাবলী' দ্বিতীয় ভাগ নামে অভিহিত করা সমীচীন বোধ করি।

যাহাই হউক, তৎ-পরে গিরিশচন্দ্রের একখানি সুবৃহৎ জীবনচরিত লিখিবার নিমিত্ত অনেকেই আমাকে অনুরোধ করেন। তাঁহাদের বাক্যরক্ষা এবং আমারও বহুদিনের

সঙ্কল্পসিদ্ধির নিমিত্ত বহু বৎসর ধরিয়া উদ্যোগ আয়োজন ও যথাসাধ্য পরিশ্রম করিয়া এতদিন পরে গিরিশচন্দ্রের জীবনচরিত সাধারণ্যে প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছি। বলিয়া রাখা ভাল, ঐকান্তিক যত্ন সত্ত্বেও গ্রন্থখানি মনোমত করিয়া প্রকাশ করিতে পারিলাম না ; কারণ গিরিশচন্দ্র সম্বন্ধে এখনও অনেক কথা বলিবার আছে। গ্রন্থের অত্যধিক কলেবরবৃদ্ধির ভয়ে বিরত হইতে হইল। ভগবৎকৃপা থাকিলে দ্বিতীয় সংস্করণে গ্রন্থখানি ত্রুটীহীন করিবার চেষ্টা করিব।

পরমশ্রদ্ধাস্পদ নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয়ের অনুগ্রহে এই গ্রন্থের বহু উপাদানলাভে কৃতার্থ হইয়াছি। আদি 'ন্যাসান্যাল থিয়েটারে'র প্রবীণ নট শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, 'গ্রেট ন্যাসান্যাল থিয়েটারে'র স্বত্বাধিকারী স্বর্গীয় ভুবনমোহন নিয়োগী, সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা শ্রীযুক্ত চুণীলাল দেব, প্রথিতযশা নট ও নাট্যকার শ্রীযুক্ত অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রদ্ধেয় সুহৃদ শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মতিলাল ও শ্রীযুক্ত কুমুদবন্ধু সেন, প্রতিভাসম্পন্না প্রবীণা অভিনেত্রী শ্রীমতী বিনোদিনী দাসী প্রভৃতির নিকট এই গ্রন্থপ্রণয়নে অল্পাধিক সাহায্যলাভ করিয়াছি, এ নিমিত্ত তাঁহাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম।

সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ও সমালোচক শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ রায় মহাশয় তৎ-সম্পাদিত 'সারথী' (১৩২৭ সাল) এবং 'বাসন্তী' (১৩২৭।২৮ সাল) পত্রিকায় মৎ-প্রণীত 'গিরিশচন্দ্রে'র আংশিক জীবনী* এবং বঙ্গ-নাট্যশালার ইতিহাস ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত করেন। সেইসময় হইতেই তিনি গিরিশচন্দ্রের সুবিস্তৃত একখানি জীবনচরিত লিখিবার জন্য আমায় সমভাবে উৎসাহিত করিয়া আসিতেছিলেন। রচনার সৌষ্ঠবসাধনে —গ্রন্থের গৌরববর্দ্ধনে প্রভৃত সহায়তা করিয়া তিনি আমায় কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার এই গভীর সহৃদয়তা হৃদয়ে চিরজাগরূক থাকিবে।

পরিশেষে যাঁহার সর্ব্বতোভাবে সাহায্যলাভে এই গ্রন্থ সুসম্পন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছি, যিনি গিরিশচন্দ্রের পরম আত্মীয় এবং বাল্যাবধি গিরিশচন্দ্রের পরম স্নেহপাত্র ও সহচর ছিলেন, যাঁহার দ্বারা আমি গিরিশচন্দ্রের সহিত প্রথম পরিচিত হই, সেই উদারহৃদয় পরমশ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের নামোল্লেখ করিতেছি। এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপির অধিকাংশই তিনি দেখিয়া দিয়াছেন এবং আবশ্যকমত সংযোজন সংশোধন ও পরিবর্ত্তন করিয়া আমাকে দুশ্ছেদ্য কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন।

'ভারতবর্ষ' প্রিন্টিং বিভাগের অধ্যক্ষ শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই গ্রন্থের সৌষ্ঠবসাধন এবং মুদ্রণ-পারিপাট্যে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া আমাকে পরম বাধিত করিয়াছেন।

নাট্যাচার্য্য অমৃতলাল লিখিয়াছেন, "দেহ-পট সঙ্গে নট সকলি হারায়।" এ কথা বাঙ্গালাদেশ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সত্য। এ দেশের অনেক প্রতিভাশালী অভিনেতা ও অভিনেত্রীর অভিনয়-প্রতিভার পরিচয় আধুনিক পাঠক ও দর্শক-সমাজে অবিদিতই

* তৎ-পর 'মজলিস' পত্রে (১৩৩০ সাল) গিরিশচন্দ্র সম্বন্ধে একটী ধারাবাহিক ইতিহাস বহুদূর পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছিল।

আছে। সেইজন্য গিরিশচন্দ্রের এই জীবনকাহিনীর মধ্যে তাঁহার সমসাময়িক বহু অভিনেতা ও অভিনেত্রীর অভিনয়-কথা অন্তর্নিবিষ্ট করিয়াছি। গুরুর পরিচয় শিষ্যে। অতএব গিরিশচন্দ্রের সৃষ্টিশক্তি বুঝাইবার জন্য তাঁহার সহকর্ম্মী ও শিষ্যবর্গের কথাও বলা কর্ত্তব্যবোধ করিয়াছি।

আর-এক কথা, গিরিশচন্দ্রের নাম করিতে গেলে বঙ্গীয় নাট্যশালার কথা এবং বঙ্গীয় নাট্যশালার কথা কহিতে গেলে গিরিশচন্দ্রের নাম ও কীর্ত্তি স্বতঃই মনে উদয় হয়। একের জীবনের সহিত অন্যের জীবন অঙ্গাঙ্গীভাবে সংশ্লিষ্ট। কাজেই বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাসও যে ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে, তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

ফলতঃ গ্রন্থখানি সুধীবৃন্দের সুখপাঠ্য ও হৃদয়গ্রাহী করিতে যত্ন ও পরিশ্রমের ত্রুটী করি নাই, কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি শ্রীভগবানই জানেন।

১৩ নং বসুপাড়া লেন,
বাগবাজার, কলিকাতা।
৬ই কার্ত্তিক ১৩৩৪ সাল।

বিনীত
শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।

উৎসর্গ

কাশিমবাজারাধিপতি মহারাজা স্যার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী
কে. সি. আই. ই. মহোদয় সমীপেষু—

মহারাজ,

গিরিশচন্দ্রের রচনার আপনি চিরদিন পক্ষপাতী। গিরিশচন্দ্রও চিরজীবন মহারাজের প্রতি শ্রদ্ধাবান ছিলেন। এই ভরসায় 'গিরিশচন্দ্র' রাজ-করে সমর্পণ করিতে সাহসী হইলাম। গ্রন্থপাঠে মহারাজ কিঞ্চিন্মাত্র আনন্দলাভ করিলে আমার সমস্ত শ্রম সার্থক হইবে। নিবেদন ইতি।

অনুগত
শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।

বীরভক্ত, সিদ্ধকবি,
বঙ্গ-রঙ্গভূমি-রবি,
নটগুরু, নাট্যছবি
সম্পদ ভাষার!
ধর্ম্ম-আত্মা, কর্ম্মবীর,
কৃতিপুত্র ভারতীর,
রামকৃষ্ণ-গত প্রাণ,
সর্ব্ব রসাধার!
অমর লেখনী ধ'রে
স্বজাতির স্মৃতি পরে
লিখেছ যে নাম—
চিরদিন উজলিয়ে রবে বঙ্গধাম।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু

সূচিপত্র

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

ত্রয়োত্রিংশ পরিচ্ছেদ

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ

ষড়ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ

অষ্টত্রিংশ পরিচ্ছেদ

উনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

দ্বিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

ত্রিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

চতুশ্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

পঞ্চচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

ষড়চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

সপ্তচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

অষ্টচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

ঊনপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ

পঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ

পরিশিষ্ট

গিরিশচন্দ্র

প্রথম পরিচ্ছেদ

বংশ-পরিচয়

উচ্চ বংশেই গিরিশচন্দ্রের জন্ম। কলিকাতার বাগবাজারে বসুপাড়া নামে যে পল্লী আছে, সেই পল্লীর সম্ভ্রান্ত কায়স্থ কুলোদ্ভব নীলকমল ঘোষের মধ্যম পুত্র— গিরিশচন্দ্র। ইঁহারা বালির ঘোষ (সমাজ), সৌকালীন গোত্র, মধ্যাংশ। গিরিশচন্দ্রের ২৬ পর্য্যায়। ইঁহার পূর্ব্বপুরুষের আদি বাস গোয়াড়ি কৃষ্ণনগর। তথা হইতে তাঁহারা হরিপালে আসিয়া বাস করেন। গিরিশচন্দ্রের বৃদ্ধ প্রপিতামহ কলিকাতায় বাগবাজার অন্তর্গত, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তীর ষ্ট্রীটে সুপ্রসিদ্ধ নিয়োগীদের বাটীর সন্নিকটে আসিয়া প্রথমে বাস করেন। তাঁহার দুই পুত্র, রামলোচন ও কার্ত্তিক। কার্ত্তিক ২৪ পরগণার অন্তর্গত (উপস্থিত খুলনা জেলার অন্তর্ভুক্ত) নলতা গ্রামের জমীদার জগন্নাথ ভঞ্জ-চৌধুরীর ভগ্নীকে বিবাহ করিয়া নিকটবর্ত্তী ন'পাড়া গ্রামে যাইয়া বাস করেন। কার্ত্তিকের প্রপৌত্র শ্রীকৃষ্ণবাবু কলিকাতায়, বেঙ্গল সেক্রেটেরিয়েটের অন্তর্ভুক্ত ইন্সপেক্টর জেনারল অফ্ রেজিষ্ট্রেশন অফিসে কার্য্য করেন। তাঁহার মুখে কার্ত্তিকের সাধ্বী পত্নী সম্বন্ধে এক চমৎকার গল্প শুনিয়াছি। যাহাকে সহধর্ম্মিণী বলে—তিনি তাহার আদর্শ ছিলেন। তিনি স্বয়ং বিদুষী ছিলেন এবং পতির প্রত্যেক কার্য্যে সহকারিণীরূপে থাকিতেন। স্বামীর সহিত বিদ্যালোচনা করিতেন ও বিষয়কার্য্যে তাঁহাকে সুমন্ত্রণা দিতেন। এমনকি, স্বামী দাবাবড়ে খেলিতে ভালবাসিতেন বলিয়া তাঁহার সহিত তিনি দাবাবড়ে খেলিতেন। স্বামীর ন্যায় খড়ম পায়ে দিয়া বেড়াইতেন,—আবার স্বামীর মৃত্যু হইলে এই নিত্যসঙ্গিনী সতীলক্ষ্মী স্বামীর সহিত সহমৃতা হইয়া একত্রে স্বর্গধামে গমন করেন। কার্ত্তিকের বংশধরগণ এক্ষণে ন'পাড়াতেই বাস করিতেছেন। কর্ম্মোপলক্ষে কেহ-কেহ কালীঘাটের সন্নিকটস্থ মনোহরপুকুরে অবস্থান করেন।

রামলোচন গিরিশচন্দ্রের বর্ত্তমান আবাসবাটী (১৩নং বসুপাড়া লেন) ক্রয় করিয়া তাহাতে বাস করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার দুই পুত্র—রামরতন ও হরিশচন্দ্র। কনিষ্ঠ হরিশচন্দ্রের পুত্রসন্তান ছিল না। তাঁহার একমাত্র কন্যা বিন্দুবাসিনীর

বাগবাজারের সুপ্রসিদ্ধ বসু বংশীয় স্বর্গীয় গোপীনাথ বসুর সহিত বিবাহ হয়। ইনি সাব-জজ ছিলেন। তাঁহার চরিত্র উন্নত ছিল। সুপণ্ডিত ও সুলেখক শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু তাঁহারই পুত্র।

জ্যেষ্ঠ রামরতনের পাঁচ পুত্র—রামনারায়ণ, গঙ্গানারায়ণ, হরিনারায়ণ, নীলকমল এবং মাধব। রামরতন ব্যবসা দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিতেন এবং পুত্রগণকে যত্নের সহিত লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন। কনিষ্ঠ মাধবের অবিবাহিত অবস্থায় মৃত্যু ঘটে। অবশিষ্ট চারি ভ্রাতার মধ্যে নীলকমল ব্যতীত সকলেই নিঃসন্তান ছিলেন। নীলকমলবাবু কলিকাতায় সওদাগরী অফিসে এবং তাঁহার অগ্রজ গঙ্গানারায়ণবাবু যশোহরে একটী নীলকর অফিসে কার্য্য করিতেন। অন্য দুই ভ্রাতা পিতৃ-প্রদর্শিত দৃষ্টান্তানুসারে ব্যবসাকার্য্য লইয়া থাকিতেন।

পাঠকগণের বুঝিবার সুবিধার নিমিত্ত একটী বংশ-তালিকা প্রদত্ত হইল।—

গিরিশচন্দ্রের জন্মলাভের পূর্ব্বে গঙ্গানারায়ণ ও হরিনারায়ণ ইহলোক ত্যাগ করেন। ইঁহাদের অবস্থা বেশ ভালই ছিল। নীলকমলবাবু সওদাগর অফিসের বুককিপার ছিলেন। অস্‌টেও ব্যাও হিলজার সাহেবের অফিস তাঁহার শেষ কর্ম্মস্থল। বর্ত্তমান অফিসের নাম—হিলজার কোম্পানী। হিসাব রাখিবার Double Entry পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত করিয়া তৎকালে ইনি একজন সুপ্রসিদ্ধ বুককিপার বলিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করেন। তীক্ষ্ণ বুদ্ধিপ্রভাবে তিনি অফিসের সাহেবগণের বিশেষ প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন।

নীলকমলবাবুর সাতটী কন্যা এবং পাঁচটী পুত্রসন্তান হইয়াছিল। প্রথম একটী কন্যা জন্মগ্রহণ করে—নাম কৃষ্ণকিশোরী; পরে একটী পুত্র নিত্যগোপাল, তৎপরে পর-পর পাঁচটী কন্যা—কৃষ্ণকামিনী, কৃষ্ণভামিনী, দক্ষিণাকালী, কৃষ্ণরঙ্গিণী ও প্রসন্নকালী; তাহার পরে চারিটী পুত্র—গিরিশচন্দ্র, কানাইলাল, অতুলকৃষ্ণ ও ক্ষীরোদচন্দ্র, সর্ব্বশেষে একটী কন্যা।

ভগ্নীদিগের কথা

নীলকমলবাবু বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত বংশেই কন্যাগণের বিবাহ দিয়াছিলেন। প্রথমা কন্যা কৃষ্ণকিশোরীর বিবাহ—কলিকাতা, পটলডাঙ্গার সুপ্রসিদ্ধ রমানাথ মজুমদারের ভ্রাতুষ্পুত্র গোবিন্দচন্দ্র মজুমদারের সহিত সম্পন্ন হয়। হ্যারিসন রোডের মোড়ে রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট এখনও উক্ত বংশের স্মৃতিরক্ষা করিতেছে। উপস্থিত যথায় সুবিখ্যাত পণ্ডিত জীবানন্দ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বংশধরগণ বাস করিতেছেন, এই ভিটাই গোবিন্দচন্দ্রের বাস্তভিটা ছিল।

গিরিশচন্দ্রের বৃদ্ধ প্রপিতামহ
(ইনিই কলিকাতায় আসিয়া প্রথমে বাস করেন)
রামলোচন
কার্ত্তিক
রামরতন
হরিশচন্দ্র
কালীপ্রসাদ
বিন্দুবাসিনী (কন্যা)
দেবেন্দ্রনাথ বসু
দ্বারিকানাথ
নবকৃষ্ণ
কেশব
হরি
রাজকৃষ্ণ
উপেন্দ্র
শ্রীকৃষ্ণ
রামনারায়ণ
(নিঃসন্তান)
গঙ্গানারায়ণ
(নিঃসন্তান)
হরিনারায়ণ
(নিঃসন্তান)
নীলকমল
মাধব
(অবিবাহিত অবস্থায় মৃত্যু)
১
কৃষ্ণকিশোরী
(১মা কন্যা)
২
নিত্যগোপাল
(১ম পুত্র)
৩
কৃষ্ণকামিনী
(২য়া কন্যা)
৪
কৃষ্ণভামিনী
(৩য়া কন্যা)
৫
দক্ষিণাকালী
(৪র্থা কন্যা)
৬
কৃষ্ণরঙ্গিণী
(৫মা কন্যা)
৭
প্রসন্নকালী
(৬ষ্ঠা কন্যা)
৮
গিরিশচন্দ্র
(২য় পুত্র)
৯
কানাই
(৩য় পুত্র)
১০
অতুলকৃষ্ণ
(৪র্থ পুত্র)
১১
ক্ষীরোদচন্দ্র
(৫ম পুত্র)
১২
কন্যা
সুরেন্দ্রনাথ
সরোজিনী
(কন্যা)
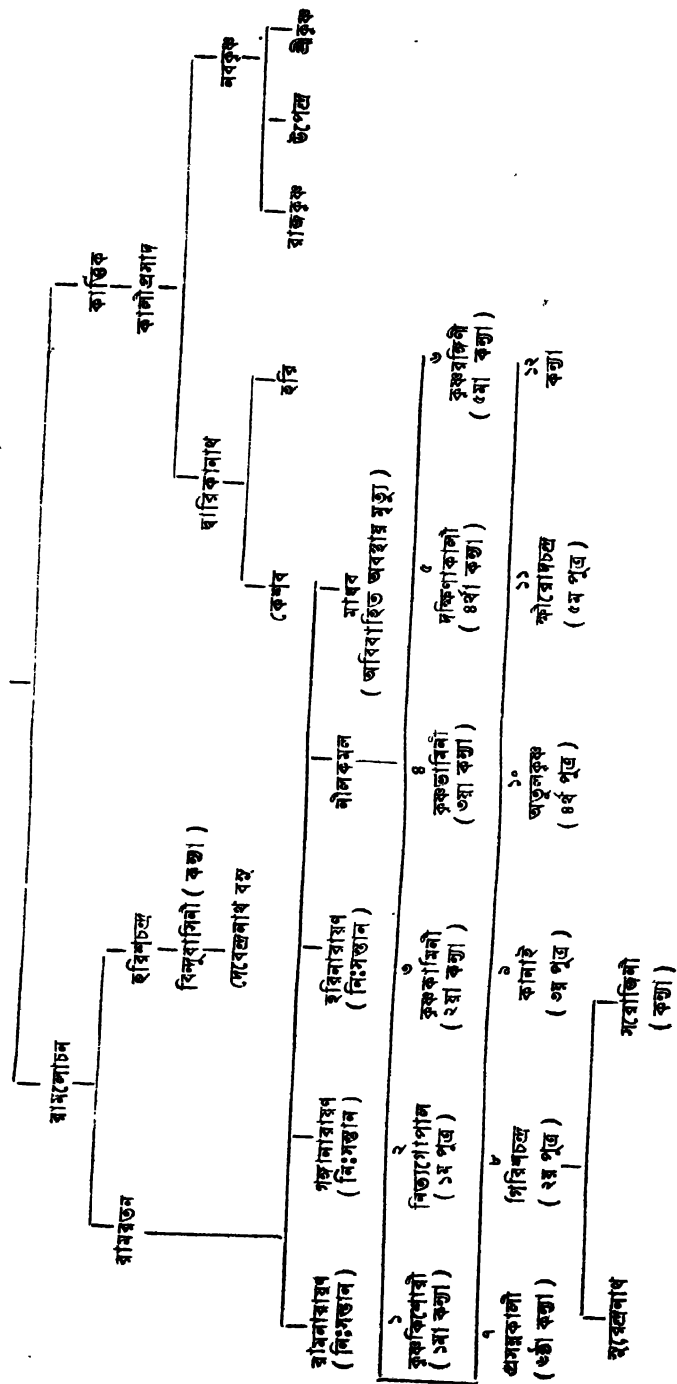
দ্বিতীয়া কন্যা কৃষ্ণকামিনীর বিবাহ—চুঁচুড়ার সুপ্রসিদ্ধ সোম বংশীয় হরলাল সোমের সহিত নিষ্পন্ন হয়।*

তৃতীয়া কন্যা কৃষ্ণভামিনীর বিবাহ—কলিকাতা, শ্যামপুকুরের সুপ্রসিদ্ধ মল্লিক বংশীয় নিমকির দাওয়ান কালীশঙ্কর মল্লিক মহাশয়ের পুত্র প্রসন্নকুমার মল্লিকের সহিত সম্পন্ন হয়।

চতুর্থা কন্যা দক্ষিণাকালীর বিবাহ—কলিকাতা, সিমলার সুবিখ্যাত রামদুলাল সরকারের ভ্রাতুষ্পুত্র ভুবনেশ্বর দেবের (সরকার) সহিত নিষ্পন্ন হয়। বিধবা হইবার কয়েক বৎসর পরে তিনি পিত্রালয়ে আসিয়া অবস্থান করেন এবং জ্যেষ্ঠা ভগ্নী কৃষ্ণকিশোরীর মৃত্যুর পর গিরিশচন্দ্রের সংসারের তিনি কর্ত্রী হইয়াছিলেন।

পঞ্চমা কন্যা কৃষ্ণরঙ্গিণীর বিবাহ—কলিকাতা, ঠনঠনিয়ার প্রসিদ্ধ গোবিন্দ সরকারের পুত্র ব্রজেন্দ্রনাথ সরকার (দে) মহাশয়ের সহিত সম্পন্ন হইয়াছিল।

ষষ্ঠা কন্যা কালীপ্রসন্নের (প্রসন্নকালী) শৈশবাবস্থায় মৃত্যু ঘটে।

সপ্তমা কন্যার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। গিরিশচন্দ্রের জননী এই মৃতা কন্যাটী প্রসব করিয়া ইহলোক ত্যাগ করেন।

পিতার প্রকৃতি

নীলকমলবাবু গম্ভীর প্রকৃতির লোক ছিলেন, বিষয়-বুদ্ধি তাঁহার অসাধারণ ছিল। কপটতা করিয়া কেহ তাঁহাকে ঠকাইতে পারিত না। তাঁহার অসাধারণ স্মৃতিশক্তি

* চুঁচুড়া যে সময়ে ওলন্দাজের অধিকারে ছিল, সে সময়ে ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ শ্যামরায় সোম ও তোতারাম সোম ভ্রাতৃদ্বয় ওলন্দাজদের অধীনে কার্য্য করিতেন। শ্যামরায় ফৌজদারী বিভাগে এবং তোতারাম দেওয়ানী বিভাগে নিযুক্ত ছিলেন। ইঁহারা কেবলমাত্র কর্ম্মচারী ছিলেন না, চুঁচুড়ার বাণিজ্যে ওলন্দাজদের যাহা লাভ হইত, ইঁহারা তাহার কতক অংশ পাইতেন। এক সময়ে কোনও কারণে নবাব সিরাজদ্দৌলা শ্যামরায়কে মুর্শিদাবাদে ধরিয়া লইয়া যান;—এক লক্ষ টাকা দিয়া তবে ইনি নিষ্কৃতিলাভ করেন। ইনি সুগায়ক ছিলেন, নবাব ইঁহার সুমধুর সঙ্গীত শ্রবণে ইঁহাকে 'রাজা' উপাধি এবং নহবৎ রাখিবার ক্ষমতা প্রদান করেন। সে সময়ে নবাব ব্যতীত কেহই নহবৎ রাখিতে পারিতেন না। ইতিপূর্ব্বে ইঁহাদের বংশীয় রাজবল্লভ 'রাজা' উপাধিলাভ করায় শ্যামরায় 'রাজা' উপাধিগ্রহণে অসম্মত হন, এ নিমিত্ত তিনি নবাবের নিকট 'বাবু' উপাধিপ্রাপ্ত হন। অদ্যাবধি চুঁচুড়ার বিখ্যাত 'শ্যামবাবুর ঘাট' ইঁহার নাম রক্ষা করিতেছে। গঙ্গায় মাছ ধরিবার জন্য জেলেদের যে গভর্ণমেণ্টকে কর দিতে হইত,—অনেকের ধারণা যে, রাণী রাসমণি সেই জলকর প্রথম তুলিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু এ কথা ঠিক নহে। এই শ্যামরায়ই সর্ব্বপ্রথমে লর্ড ক্লাইবকে অনুরোধ করিয়া জলকর বন্ধ করেন।

ইংরাজ-অধিকারে ইঁহাদের বংশের অনেকেই কেহ জজিয়তি, কেহ-বা সাব-জজিয়তি কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। এ নিমিত্ত চুঁচুড়ার সোমেদের বাটী এখনও 'সদরওয়ালার বাড়ী' বলিয়া কথিত হয়। এই বংশেই সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক দয়ালচন্দ্র সোম এবং 'মধু-স্মৃতি'-প্রণেতা কবিশেখর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন।

ছিল। বিষয়-সংক্রান্ত কোনও চিঠিপত্র বা দলিলাদি লিখিবার সময়ে কোনও ব্যক্তি তাঁহার সহিত কোনও প্রয়োজনে দেখা করিতে আসিলে, তিনি তাঁহার সহিত যথারীতি কথাবার্ত্তা কহিতেন, এবং সে ব্যক্তি চলিয়া যাইবামাত্র তাঁহার লেখনী অমনি আবার চলিতে আরম্ভ করিত। কতদূর পর্য্যন্ত লিখিয়াছেন, তাহার পূর্ব্ব অসমাপ্ত ছত্র আর পড়িতেন না বা পড়িয়া লইবার আবশ্যকও হইত না, তাহা তাঁহার স্মৃতিপটে ঠিক অঙ্কিত থাকিত।

পল্লীবাসিগণ বিষয়কর্ম্মে বা কোনও সামাজিক ব্যাপারে তাঁহার অভিমত না লইয়া কোনও কার্য্য করিতেন না। তিনি মিতব্যয়ী, বুদ্ধিমান এবং দূরদর্শী ছিলেন। দয়ালু এবং পরোপকারী হইলেও তাঁহার বাহ্য আড়ম্বর ছিল না। পরোপকারকার্য্যে তাঁহার বেশ-একটু বিশিষ্টতা ছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা কয়েকটী ঘটনার উল্লেখ করিতেছি :—

১। বসুপাড়া পল্লীর জনৈক গৃহস্থ যুবক হঠাৎ পিতৃহীন হওয়ায় বড়ই সাংসারিক কষ্টে পতিত হয়। নীলকমলবাবু দয়া-পরবশ হইয়া তাহার একটী চাকুরী করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু সেই যুবার মাছ ধরিবার বড়ই বাতিক ছিল,—কোনও পুকুরে মাছ ধরিবার সুযোগ পাইলে অফিস কামাই করিতে ইতস্ততঃ করিত না। এইরূপে প্রায়ই অফিস কামাই হওয়ায়, একদিন সাহেব বিরক্ত হইয়া তাহাকে কার্য্যে জবাব দেন। যুবকটী আবার সাংসারিক কষ্টে পড়িয়া, নীলকমলবাবুকে আর-একটী চাকুরীর জন্য ধরিয়া বসেন। যুবকের স্বভাব-চরিত্র ভালই ছিল—দোষের মধ্যে ঐ এক মাছ ধরিবার ঝোঁক! নীলকমলবাবু প্রকৃত অবস্থা অবগত হইয়া একটী সুকৌশল আবিষ্কার করিলেন। তিনি নিজে মূলধন দিয়া যুবককে কয়েকটী পুকুর জমা করিয়া দিলেন। মনোমত কার্য্য পাইয়া যুবকের উৎসাহ বাড়িয়া গেল। বলা বাহুল্য, এই কার্য্যে যুবকের আর্থিক অবস্থারও উন্নতি ঘটিয়াছিল।

২। পল্লীস্থ আর-একটী কায়স্থ যুবার অনেকগুলি প্রতিপাল্য ছিল; কিন্তু সে কোনও কাজকর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণে মনোযোগী ছিল না—বড়লোকের মোসাহেবী করিয়া বেড়াইত—প্রায়ই বাড়ীতে থাকিত না। যুবকটীর পিতামহী, নীলকমলবাবুর নিকট আসিয়া সাংসারিক দুরবস্থা জানাইয়া কাঁদাকাটি করেন এবং পৌত্রকে একটী কাজ করিয়া দিবার জন্য ধরিয়া বসেন। নীলকমলবাবু অনুসন্ধানে জানিতে পারিলেন, যুবকটী বড়লোকের ছেলেদের সহিত মিশিয়া তাহাদের সখের কোচয়ানি করে। গাড়ী হাঁকাইবার শুধু সখ নহে—একটু শক্তিও আছে। ঘোড়ার শুশ্রূষা করিতে পারে—ঘোড়া চড়িতে ভালবাসে—আবার বাছিয়া-বাছিয়া নীরোগ ও নিখুঁত ঘোড়া কিনিবারও কতকটা অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে। এজন্য বড়-লোকের ছেলেরা তাহাকে পছন্দ করে এবং মাঝে-মাঝে কিছু-কিছু অর্থসাহায্যও করিয়া থাকে—কিন্তু তাহা আর বাড়ী আসিয়া পৌঁছায় না।

মনুষ্য-চরিত্র বুঝিতে নীলকমলবাবুর যথেষ্ট ক্ষমতা ছিল। কাহাকে কোন পথে চালাইলে সে সুশৃঙ্খলায় চলিতে পারে—তাহা তিনি বিশেষরূপে বুঝিতেন। তিনি

স্বয়ং চাকুরীজীবী হইলেও বোধহয় নিজে বংশগত ব্যবসানুরক্তির প্রভাববশতঃ ব্যবসায়-কার্য্যের প্রতি তাঁহার আগ্রহ ও সহানুভূতি ছিল। যুবককে ডাকাইয়া নীলকমলবাবু বলিলেন,—"শুনিতে পাই, সংসারে তুমি একটী পয়সা সাহায্য কর না। কায়স্থের ছেলে হইয়া বড়লোকের বাড়ী সখের কোচয়ানি করিয়া বেড়াও। গাড়ী-ঘোড়ায় যখন তোমার এত সখ, তখন আমি তোমাকে নিজে মূলধন দিয়া চারিখানি ঘোড়ার গাড়ী করিয়া দিতেছি,—তুমি তাহা লইয়া ভাড়া খাটাও। ঘোড়ার ঘাস-দানা ও গাড়োয়ানের মাহিনা বাদ যাহা থাকিবে, তাহা হইতে তোমার সাংসারিক খরচের ন্যায্য টাকা বাদ দিয়া অবশিষ্ট যাহা রহিবে—তাহা আমার নিকট জমা দিবে। যতদিনে পার—এইরূপে আমার মূলধন শোধ করিয়া দিয়া, তুমি স্বয়ং গাড়ী-ঘোড়ার মালিক হও। প্রত্যহ আমি কিন্তু হিসাব দেখিব।" যুবকটী নীলকমলবাবুর এই বদান্যতায় বিশেষ উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। এবং দ্বিগুণ উৎসাহে এই ব্যবসায়ে বিশেষ লাভবান হইয়া নীলকমলবাবুর প্রদত্ত মূলধনের টাকা ক্রমে পরিশোধ করিয়া দিল।

৩। পল্লীস্থ আর-এক গৃহস্থ ব্যক্তি কন্যাদায়গ্রস্ত হইয়া নীলকমলবাবুর নিকট পাঁচশত টাকা ঋণগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার হাঁপানীর পীড়া—তাহার উপর পান-দোষ ছিল। বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনগণের বিশেষ অনুরোধ ও উপদেশেও তিনি পানদোষ পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। নীলকমলবাবুর সহিত তাঁহার সর্ত্ত ছিল,—প্রতি মাসে বেতন পাইলেই তাঁহাকে পনের টাকা করিয়া দিতে হইবে। তিনি অফিসে যাহা বেতন পাইতেন, তাহাতে সংসার খরচ চালাইয়া সামান্যই উদ্বৃত্ত থাকিত,—নীলকমলবাবুকে পনের টাকা করিয়া দিয়া এবং পানদোষের খরচ চালাইয়া মাসে তাহাকে চারি-পাঁচ টাকা দেনা করিতে হইত।

নীলকমলবাবুর দেনা যখন ৪৫০ টাকা শোধ হইয়া আসিল, তখন তিনি তাঁহার নিকট আসিয়া প্রার্থনা করিলেন,—"বাকী পঞ্চাশটী টাকা হইতে আমাকে নিষ্কৃতি দিন।" নীলকমলবাবু বলিলেন,—"আমি তোমার নিকট সুদ লইব না বলিয়াছি, কিন্তু আসল একটী টাকাও ছাড়িব না। তুমি মদ খাইয়া থাক—নেশার পয়সা জোটে, আর আমাকে ন্যায্য পাওনা ছাড়িয়া দিবার জন্য বলিতে তোমার লজ্জা হয় না?" নীলকমলবাবু রাশভারি লোক ছিলেন। লোকটী আর তাঁহার সম্মুখে বেশী কথা না কহিয়া বাড়ী ফিরিয়া যান এবং স্ত্রীকে নীলকমলবাবুর বাড়ীতে পাঠাইয়া দেন। বাটীর মেয়েরা তাঁহার স্ত্রীর কাতরতায় নীলকমলবাবুকে বাকী পঞ্চাশটী টাকা ছাড়িয়া দিবার নিমিত্ত বিশেষ অনুরোধ করেন। কিন্তু তিনি কাহারও অনুরোধ রক্ষা না করিয়া পূর্ণ পাঁচশত টাকা লইয়া তবে ক্ষান্ত হন।

ঋণ পরিশোধের প্রায় এক বৎসর পরে কঠিন পীড়ায় লোকটীর অকালে মৃত্যু হয়। বলা বাহুল্য তিনি কতকগুলি লোকের নিকট খুচরা দেনা ব্যতীত আর কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। অপোগণ্ড পুত্র-কন্যা লইয়া তাঁহার অনাথিনী স্ত্রী বড়ই বিব্রত হইয়া পড়েন। নীলকমলবাবু তাঁহাকে বাটীতে ডাকাইয়া আনিয়া বলিলেন,—"দেখ, তোমার স্বামীকে মদ ছাড়িবার জন্য আমি অনেকবার বুঝাইয়াছিলাম। একে

ইাপানীর ব্যামো—তাহার উপর এসব অত্যাচার সহ্য হবে কেন? সে যে আর বেশী-দিন বাঁচিবে না, তাহা আমি অনেকদিন বুঝিয়াছিলাম, এবং তাহার মৃত্যুতে তোমাদেরই বা কি অবস্থা হইবে, তাহাও ভাবিয়াছিলাম। এইজন্যই তোমাদের সকলের এত অনুরোধে একটী পয়সাও ছাড়িয়া দিই নাই। আজ সেই পাঁচশত টাকা দিতেছি—লইয়া যাও। খুচরা দেনাগুলি শোধ করিয়া বাকী টাকায় নাবালকদের মানুষ কর।" নীলকমলবাবুর এই অপূর্ব্ব বদান্যতা ও দূরদর্শিতার পরিচয় পাইয়া পল্লীবাসিগণ চমৎকৃত হইয়া উঠেন। ইতিপূর্ব্বে তাঁহাকে কৃপণ বলিয়া যাঁহারা প্রচার করিতেন, তাঁহারাও তাঁহাদের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া লজ্জিত হইলেন।

মাতামহ বংশ-পরিচয়

নীলকমলবাবু—কলিকাতা, সিমলা, মদন মিত্রের লেন-নিবাসী প্রসিদ্ধ চুণীরাম বসুর পুত্র রাধাগোবিন্দ বসুর মধ্যমা কন্যা রাইমণিকে বিবাহ করেন। ইঁহারা বৈষ্ণব ছিলেন। রাধাগোবিন্দের পুত্র নবীনকৃষ্ণবাবু অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। গিরিশচন্দ্রের উপর তাঁহার এই মাতুলের বিশেষ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। তাঁহারই শিক্ষা-কৌশলে গিরিশচন্দ্র বাণী-মন্দিরের প্রবেশদ্বারের সন্ধান পাইয়াছিলেন। যথাসময়ে সে কথার উল্লেখ করিব।

মানবের চরিত্রগত দোষগুণ অনেক পরিমাণে বংশ ধারার সহিত প্রবাহিত হয়। পিতৃ-মাতৃ উভয় বংশের দোষগুণ বীজরূপে সকল মানবে বিদ্যমান থাকে, সময় ও সুযোগ মত তাহা অঙ্কুরিত হয়। অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা, কর্ম্মকুশলতা, লোক-চরিত্র-জ্ঞান ও আত্ম-নির্ভরতা—এ সমস্তই গিরিশচন্দ্রের পিতৃ-সম্পত্তি। ভাবপ্রবণতা, বিদ্যানুরাগ, অধ্যয়নশীলতা, তর্কশক্তি—গিরিশচন্দ্র তাঁহার মাতুল নবীনকৃষ্ণের নিকট প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। গিরিশচন্দ্রের হৃদয়-নিহিত ভক্তি-বীজ তাঁহার মাতামহ বংশের যৌতুক। দৃষ্টান্তস্বরূপ গিরিশচন্দ্রের প্রমাতামহ পরম বৈষ্ণব চুণীরাম বসুর অদ্ভুত মৃত্যু-ঘটনা উল্লেখ করিতেছি:—

চুণীরামবাবু প্রত্যহ গৃহদেবতা 'গিরিধারী'কে (নারায়ণ-শিলা) অন্ন নিবেদন করিয়া পরে সেই প্রসাদ খাইতেন। একদিন আহারের বহুক্ষণ পরে—একটী উদ্গার উঠে, সেই সঙ্গে গিরিধারীর প্রসাদের এক কণা অন্ন মুখ হইতে বাহির হয়। তিনি চমকিত হইয়া সেই প্রসাদ-কণা মস্তকে ধারণ করিয়া বলিলেন,—"যখন গিরিধারীর প্রসাদান্ন জীর্ণ হয় নাই, তখন আর প্রাণ বাহির হইবার বিলম্বও নাই। আমায় শীঘ্র গঙ্গায় লইয়া চল।" বৃদ্ধের আজ্ঞা ও আগ্রহাতিশয্যে সকলে সংকীর্ত্তন সহ তাঁহাকে গঙ্গাতীরে লইয়া চলিলেন। তিনি খাট ধরিয়া পদব্রজে হরিনাম করিতে-করিতে যাইতে লাগিলেন। পথিমধ্যে ছাতুবাবুর বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া অবসন্ন হইয়া পড়িলে তাঁহাকে খাটে শোয়াইয়া দেওয়া হয়। তীরস্থ হইয়া হরিনাম করিতে-করিতে তিনি গঙ্গাজলে দেহত্যাগ করেন।

তাঁহার পৌত্রী অর্থাৎ গিরিশচন্দ্রের জননীও পরম ভক্তিমতী ছিলেন। নীল-কমলবাবুর গৃহদেবতা শ্রীধরজীর সেবা তিনি অতি নিষ্ঠা ও ভক্তির সহিত সম্পন্ন করিতেন। বাটীতে একদিন বৃহৎ একটী কাঁটাল আসিয়াছিল। তিনি ঐ কাঁটালটী শ্রীধরজীকে দিবেন বলিয়া সযত্নে তুলিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু বাড়ীর ছেলেপুলেরা বালক-বুদ্ধিবশতঃ তাহার অগ্রভাগ খাইয়া ফেলে। জননী অত্যন্ত কুপিতা হইয়া তাহাদিগকে ভর্ৎসনা ও প্রহার করেন। আশ্চর্য্যের বিষয়—সেইদিন রাত্রে তিনি স্বপ্নে দেখিলেন, যেন শ্রীধরজী হাসিতে-হাসিতে বলিতেছেন—"আমিও বাড়ীর ছেলে-পুলের মধ্যে, অগ্রভাগ-ভুক্ত কাঁটাল আমায় খেতে দিলে কোন দোষ হবে না।"

গিরিশচন্দ্র বলিতেন,—"আমার পিতা একজন প্রসিদ্ধ accountant ছিলেন, তাঁহার বিষয়-বুদ্ধি অতি প্রখর ছিল; আর আমার মাতা কোমলপ্রাণা ছিলেন,—শৈশবকাল হইতেই দেব-দ্বিজে তাঁহার অতিশয় ভক্তি ছিল, ঠাকুর-দেবতার কথা শুনিতে এবং দেবদেবীর স্তব পাঠ করিতে তিনি বড়ই ভালবাসিতেন। বৈষ্ণব-ভিখারী বাটীতে আসিলে পয়সা দিয়া গান শুনিতেন। আমি পিতার নিকট বিষয়-বুদ্ধি ও মাতার নিকট কাব্যানুরাগ ও ভক্তি পাইয়াছি।"

এইবার গিরিশচন্দ্রের জ্যেষ্ঠতাত রামনারায়ণবাবুর কথা উল্লেখ করিয়া বংশ-পরিচয় শেষ করিব। ইনি বড় দয়ার্দ্র এবং অমায়িক ছিলেন,—অধিক বেলায় আহার করিতেন। আহারের পূর্ব্বে একবার পাড়ায় ঘুরিয়া, কেহ অভুক্ত আছে কিনা, অনুসন্ধান করিয়া আসিতেন। রামনারায়ণবাবু যেমন উদার ছিলেন, তেমনই আবার আমোদী ও মাদকপ্রিয় ছিলেন,—গিরিশচন্দ্র জ্যেঠা মহাশয়ের এই তিন গুণেরই উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন।

কিন্তু কেবল বংশানুগত দোষগুণ লইয়াই মানুষের চরিত্র সম্পূর্ণ গঠিত হয় না। দেশ, কাল, শিক্ষা, সংস্কার ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা প্রভৃতি মানব-প্রকৃতিকে বিশিষ্ট-ভাবে গড়িয়া তুলে। ইহার উপর আবার প্রতিভার প্রভাব আছে। প্রতিভা বংশানুগত গুণ নয়—চেষ্টায় উহা অর্জ্জিতও হয় না,—"নব নব উন্মেষশালিনী বুদ্ধি প্রতিভা ইতি উচ্যতে।" সৌরভ যেমন কুসুমের গৌরব বাড়ায়—পরশমণি যেমন লৌহকে কাঞ্চনে পরিণত করে,—সারদার এই অযাচিত দানে তেমনই সাধারণ অসাধারণ হয়—লৌকিক অলৌকিক হয় এবং যাহা নশ্বর তাহা অবিনশ্বর হয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বাল্য-কথা

সন ১২৫০ সাল, ১৫ই ফাল্গুন, সোমবার, শুক্লপক্ষ, অষ্টমী তিথিতে গিরিশচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। নীলকমলের প্রথমে এক কন্যা, পরে এক পুত্র (নিত্যগোপাল) তৎপরে ক্রমান্বয়ে পাঁচটী কন্যার পর এই অষ্টমগর্ভজাত শিশু ভূমিষ্ঠ হইলে বাটীতে এক মহা আনন্দের সাড়া পড়িয়া যায়। গিরিশচন্দ্রের জ্যেষ্ঠতাত রামনারায়ণবাবুর পরিচয় পূর্ব্ব-পরিচ্ছেদের শেষভাগে প্রদত্ত হইয়াছে। তিনি আনন্দোচ্ছ্বাসে বলিয়াছিলেন, "এই তিথি-নক্ষত্রে ও অষ্টমগর্ভে শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, – প্রভেদ কেবল শুক্ল ও কৃষ্ণ পক্ষে – তা হোক, সেই কৃষ্ণচন্দ্রই এসেছেন – এ ছেলে নিশ্চয় আমার বংশ উজ্জ্বল করবে।" শিশুর জন্মোৎসবে তিনি মুক্তহস্তে দান করিতে লাগিলেন। বাড়ীতে ঢাক-ঢোল বাদ্যের খুব ধুম পড়িয়া গেল। গিরিশচন্দ্রের খুল্লপিতামহ হরিশচন্দ্র, বাদ্যকারগণকে গায়ের শাল হইতে আরম্ভ করিয়া পরিধেয় বস্ত্র পর্য্যন্ত বিতরণ করিয়াছিলেন। এই বিতরণের সংবাদ প্রচারিত হওয়ায় নানা স্থান হইতে বাদ্যকারগণ আসিয়া মাসাবধি বসুপাড়া তোলপাড় করিয়াছিল। এই স্নেহ-প্রবণ খুল্লপিতামহ ও জ্যেষ্ঠতাত উভয়েই গিরিশচন্দ্রের জন্মের প্রায় ছয় মাস কাল পরে পরলোকগমন করেন।

গিরিশচন্দ্র ভূমিষ্ঠ হইবার পর তাঁহার জননীর কঠিন পীড়া হয়। সেই কারণে নবশিশুর পালনভার উমা নাম্নী এক বাগ্দিনীর উপর প্রদত্ত হয়। কোকিল-শাবকের পালনভার কাকের উপর অর্পিত হইল। সে এই বাড়ীতে বাসন মাজিত। গিরিশচন্দ্র বাগ্দিনীর স্তন্যপান করিয়া মানুষ হন। তিনি তাঁহার "গোবরা" নামক একটি ক্ষুদ্র গল্পে, তাঁহার এই শৈশব-ইতিহাসের একটু আভাস দিয়াছেন। যথা :– "গৃহিণীর প্রসব করিয়া অবধি বড় অসুখ, ক্রমে রোগ দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। এদিকে জাতশিশুর নিমিত্ত মাইদিউনী পাওয়া যায় না। এক মাগী বাগ্দিনী, মণি তাহার নাম – হসপিটালে প্রসব করিয়া সেইদিনই আসিয়াছে, ছেলেটা দুই ঘণ্টা বাঁচিয়াছিল মাত্র। বাগ্দিনী নবশিশুর মাইদিউনী হইল।" ('উদ্বোধন', ১ম বর্ষ, ১লা আষাঢ়, ১৩০৬ সাল।)

গিরিশচন্দ্রের জন্ম-পত্রিকা

শকাব্দা ১৭৬৫।১০।১৪।৪।৩৫

সন ১২৫০, ১৫ই ফাল্গুন, ২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৮3৪ খ্রীঃ, সোমবার, শুক্লাষ্টমী

চ ৪
কে ৫
ম ১
লং
শু ২৭
র ২৪
বৃ ২৫
শ ২১
বু ২২
রা ১৮

জাতাহঃ

২	৪	২৭
৮	৫৬	১৩
৪৯	৫৯	৩৭
৪৭	০	১৫

কোষ্ঠীতে বিশেষ দ্রষ্টব্য বিষয়

১। লগ্নে শুক্র তুঙ্গী। ২। দ্বিতীয়াধিপ মঙ্গল ২য়ে (স্বক্ষেত্রী)।
৩। তৃতীয়ে চন্দ্র তুঙ্গী। ৪। একাদশাধিপ শনি ১১দশে (স্বক্ষেত্রী)।
৫। শনি বুধযুক্ত। ইত্যাদি ইত্যাদি।

দীর্ঘকাল রোগভোগ করিয়া গিরিশচন্দ্রের মাতাঠাকুরাণী আরোগ্যলাভ করেন। নীলকমলবাবুর উপর্য্যুপরি কতকগুলি কন্যার পর গিরিশচন্দ্র জন্মিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার আদর কিছু অতিরিক্ত মাত্রায় হইত। অত্যধিক আদরেই বোধহয় শিশু-কাল হইতে কোন কিছুর সামান্য ত্রুটী হইলে বালকের অভিমান উথলিয়া উঠিত। অনেক সময় এই অভিমান তাঁহাকে ক্রোধান্ধ করিত। বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াও তিনি কোনও কার্য্যের সামান্য ত্রুটী বা কিছু অন্যায় দেখিলে প্রথমেই কুপিত হইয়া উঠিতেন, পরে আত্ম-সংবরণ করিয়া লইতেন। ভৃত্যগণকে তিনি ভালবাসিতেন, তাহাদের সাংসারিক সচ্ছলতার দিকে তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল,—দেশে তাহাদের ঋণ পরিশোধ বা জমি কিনিবার জন্য সময়ে-সময়ে টাকাও দিতেন। কিন্তু কোনও কার্য্যে তাহাদের ত্রুটী ঘটিলে তিনি অত্যন্ত কুপিত হইয়া উঠিতেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটী ঘটনার উল্লেখ করিতেছি :—

একদিন একখানি গ্রন্থ পাঠ করিতে-করিতে তিনি সম্মুখেই সেখানি রাখিয়া দিয়াছিলেন, ঘর পরিষ্কার করিবার সময় ভৃত্য তাহা অন্যান্য পুস্তকগুলির সহিত মিশাইয়া রাখিয়া দিয়াছিল। পুনঃ পাঠ করিবার সময় সম্মুখে সেই গ্রন্থখানি দেখিতে

না পাইয়া ক্রোধে অধীর হইয়া তিনি তাহাকে অত্যন্ত ভর্ৎসনা করিলেন। ভৃত্যটী আসিয়া যখন সন্নিকটস্থ অন্যান্য পুস্তকগুলির মধ্য হইতে সেই পুস্তকখানি বাহির করিয়া দিল, তখন তিনি শান্ত হইলেন এবং ঈষৎ হাসিয়া উপস্থিত জনৈক ব্যক্তিকে বলিলেন, —"ছেলেবেলায় বাঘিনীর মাই খেয়ে মানুষ হয়েছিলুম, তাই এমনি স্বভাব হয়েছে না কি?" রোম নগরের প্রতিষ্ঠাতা রোমাস ও রমুলাস ভ্রাতৃদ্বয় খুল্লতাত কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া বিজন বনে নেকড়ে বাঘিনীর স্তন্যপান করিয়া জীবনধারণ করিয়াছিলেন। ভবিষ্যৎ জীবনে এই দুই শিশুই বর্ত্তমান সভ্যতার লীলাভূমি রোম নগর প্রতিষ্ঠা করেন।

গিরিশচন্দ্র বাল্যকালে বড় দুরন্ত ছিলেন। যে কার্য্য লোকে বারণ করিত, সে কার্য্যটী আগে না করিতে পারিলে তিনি স্থির হইতে পারিতেন না। তাঁহার মুখে গল্প শুনিয়াছিলাম :—

বাল্যকালে তাঁহাদের খিড়কীর বাগানে শশা গাছে প্রথম যে শশাটী ফলে, তৎসম্বন্ধে তাঁহার জ্যা-মা (জ্যাঠাইমা, রামনারায়ণের স্ত্রী) বাটীর সকলকে বিশেষ শাসনবাক্যে বলিলেন—"এই প্রথম ফলটী গৃহদেবতা শ্রীধরকে দিব; দেখিও কেহ যেন এই শশায় হাত দিও না।" বালক গিরিশচন্দ্র সেই নিষেধবাক্য শুনিয়া শশাটী খাইবার জন্য অস্থির হইয়া উঠিলেন, অথচ ভয়ে কিছু বলিতেও পারেন না। বৈকাল হইতে কান্না সুরু করিলেন। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলেন—"তেষ্টা পেয়েছে।" অথচ জল দিলে খান না।

সন্ধ্যার সময় পিতা নীলকমলবাবু অফিস হইতে বাড়ী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন —"গিরিশ কাঁদচে কেন?" জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃবধূ বলিলেন,—"কি জানি ঠাকুরপো, তেষ্টা পেয়েছে বলছে কিন্তু জল দিলে খাবে না।" পুত্রবৎসল পিতা আদর করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"গিরি, তেষ্টা পেয়েছে, জল খাচ্ছিস নি কেন?" গিরিশচন্দ্র বলিলেন—"জল খাবার তেষ্টা নয়।" পিতাঠাকুর হাসিয়া বলিলেন, "তবে কি খাবার তেষ্টা?" পুত্র বলিলেন, "শশা খাবার তেষ্টা।" স্নেহময় পিতা ভৃত্যকে বলিলেন, "শীঘ্র বাজার থেকে একটা শশা কিনে আন।"

পুত্র। বাজারের শশা খাবার তেষ্টা নয়।

পিতা। তবে আবার কি শশা?

পুত্র। খিড়কীর বাগানে যে শশা হয়েছে।

পুত্রবৎসল পিতা ভৃত্যকে আলো লইয়া খিড়কীর বাগান হইতে সেই শশা তুলিয়া আনিতে বলিলেন। তখন জ্যাঠাইমা রাগ করিয়া বলিলেন, "ও শশা ঠাকুরকে দেব বলে রেখেছি। ওমা, সেই শশা খাবার জন্যে কান্না! ঠাকুরপো, ও শশা তুমি দিও না —যা ধরবে তাই?" নীলকমলবাবু উত্তরে ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—"বড় বউ, বালক যার জন্য এত করে কাঁদচে, ঠাকুর কি তা তৃপ্তি করে খাবেন।" যাহাই হউক, শশাটী খাইয়া বালক নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইয়া পড়িলেন।

গিরিশচন্দ্র বলিতেন, "আমি আজীবন এই প্রকৃতি-চালিত হইয়া আসিতেছি।

অন্যায় বা কঠিন বলিয়া যে কার্য্যে আমাকে নিষেধ করা হইয়াছে, তাহাই সাধন করিতে আমি আগে ছুটিয়াছি।"

তাঁহার হেয়ার স্কুলের সহপাঠী হাইকোর্টের সুপ্রসিদ্ধ বিচারপতি পণ্ডিতবর ৺গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিতেন, সেক্সপীয়র-প্রণীত 'ম্যাকৃবেথ' নাটকের ডাকিনী (witch) দিগের কথা কিছুতেই বাঙ্গালা করা যায় না। অন্যান্য পণ্ডিতগণও তাঁহার মতের পোষকতা করিতেন। গিরিশচন্দ্রের ঝোঁক হইল—'ম্যাকৃবেথ' অনুবাদ করিব—বিশেষ এই ডাকিনীদের কথা।

হাতেখড়ি হইবার পর গিরিশচন্দ্র বাটীর সন্নিকট ভগবতী গাঙ্গুলীর বাড়ীর পাঠশালায় প্রবিষ্ট হন। তথায় পাঠ সমাপ্ত হইলে, নীলকমলবাবু তাঁহাকে গৌরমোহন আঢ্যের স্কুলে (পাঠশালা ডিপার্টমেণ্ট) ভর্ত্তি করিয়া দেন। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম প্রায় আট বৎসর।

গিরিশচন্দ্রের খুল্লপিতামহী রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি পুরাণের কথা অতি চমৎকার করিয়া বলিতে পারিতেন। বালক গিরিশচন্দ্র সন্ধ্যার পর তাঁহার কাছে বসিয়া সেই সকল গল্প শুনিতেন, এবং উহা তাঁহাকে এরূপ অভিভূত করিত যে, তিনি সকল সময়েই সেই কল্পনায় বিভোর হইয়া থাকিতেন। বয়সের সঙ্গে-সঙ্গে তাঁহার মনে পৌরাণিক চিত্র সকল মুদ্রিত হইয়া গিয়াছিল। তিনি যে পরিণত বয়সে উৎকৃষ্ট পৌরাণিক নাটকাদি লিখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাহার ভিত্তি এইখানে।

একদিন শ্রীকৃষ্ণের মথুরা-যাত্রার কথা হইতেছিল। নির্দ্দয় অক্রূর রথ লইয়া আসিয়াছে, শ্রীকৃষ্ণ রথে উঠিয়াছেন। ব্রজাঙ্গনাগণ কেহ রথচক্র ধরিয়াছে, কেহ অশ্বের বল্গা ধরিয়াছে, কেহ-বা রথের সম্মুখে লম্বমানা হইয়া পড়িয়া আছে। রাখাল বালকগণ নয়নজলে ভাসিতেছে, কেহ "কানাই, কানাই" বলিয়া মর্ম্মভেদী চীৎকার করিতেছে, গাভীগণ উর্দ্ধনেত্রে শ্রীকৃষ্ণের মুখপানে চাহিয়া আছে। পাখী নীরব, শাখী স্থির—"গোপাল আয়রে, গোপাল আয়রে" বলিতে-বলিতে মা যশোদা ছুটিয়া আসিতেছেন। গোপ-গোপীদের নয়নজলে পথ পিচ্ছিল, সেই পিচ্ছিল পথে মাঝে-মাঝে তাঁহার পদ স্খলিত হইয়া পড়িতেছে, আবার উঠিয়া—"নীলমণি, নীলমণি" বলিতে-বলিতে ছুটিতেছেন। নির্দ্দয় অক্রূর কোন কথা শুনিল না, কিছুই দেখিল না, কাহারও মুখ চাহিল না, গোকুলের সুখের হাট ভাঙ্গিয়া দিয়া গোকুলানন্দকে লইয়া মথুরায় চলিয়া গেল।

বালক গিরিশচন্দ্র অশ্রুপূর্ণ নয়নে বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "আবার আসিলেন?" পিতামহী কহিলেন, "না।" বালক গিরিশচন্দ্র পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "আর আসিলেন না?" আবার উত্তর, "না।" তিনবার এইরূপ নির্দ্দয় উত্তর শুনিয়া, গিরিশচন্দ্রের কোমল প্রাণে বড় আঘাত লাগিল, বালক কাঁদিতে-কাঁদিতে পলাইয়া গেল,—তিনদিন আর গল্প শুনিতে আসিল না। এই শিশুকাল হইতেই গিরিশচন্দ্রের হৃদয়ে আমরা তীব্র অনুভূতির উন্মেষ দেখিতে পাই। বস্তুতঃ বালক-হৃদয়ে বৃন্দাবনের বিরহভাব এতটা গভীরভাবে অঙ্কিত হইয়াছিল যে, তৎপরে বহু শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করিলেও প্রবীণ বয়স পর্য্যন্ত তিনি মথুরা-লীলা কখনও পড়িতে পারেন নাই।

পল্লীর নিকটস্থ কোন স্থানে কথকতা বা রামায়ণ ইত্যাদি গান হইলে, গিরিশচন্দ্র সে স্থানে উপস্থিত না হইয়া থাকিতে পারিতেন না। বাল্যকাল হইতে বৈষ্ণব ভিখারী-গণের মুখে ধর্ম্ম-সঙ্গীত শুনিতে জননীর ন্যায় তিনিও ভালবাসিতেন। বিদ্যালয়ের পাঠ অভ্যাসে তাদৃশ মনোযোগ না থাকিলেও কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরাম দাসের মহাভারত আদ্যোপান্ত কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন। শেষ বয়স পর্য্যন্ত তিনি রামায়ণ, মহাভারতের বহু স্থান অবিকল আবৃত্তি করিতে পারিতেন। এইরূপে বালক-হৃদয়ে কাব্যরস-সঞ্চারের সূত্রপাত হয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মাতৃবিয়োগ

গিরিশচন্দ্র পিতার কাছে যেরূপ আদর পাইতেন, মাতার কাছে তাহা পাইতেন না। বরং অনাদরটাই সেদিক হইতে বেশী আসিয়া তাঁহাকে ব্যথিত করিত। তিনি বলিতেন, "আদর প্রত্যাশায় যদি কখনও মার কাছে যাইতাম, মা দূর-দূর করিয়া তাড়াইয়া দিতেন। যদি কখনও মিথ্যা কথা বলিতাম বা কাহাকেও গালি দিতাম, মা মুখের ভিতর গোবর টিপিয়া দিতেন। মার মুখে কখনও মিষ্ট কথা শুনিতে পাইতাম না, এজন্য মনে বড় কষ্ট হইত। একদিন আমার গাল-গলা ফুলে ভারি জ্বর, অঘোরে পড়িয়া আছি। শুনিলাম, মা বাবাকে বলিতেছেন– অতি ব্যাকুল হইয়াই বলিতেছেন, 'তুমি যেমন করে পার বাঁচাও।' বাবা জানিতেন, মা আমায় আদর করেন না, বোধহয় তেমন ভালওবাসেন না। তিনি বিস্মিত হইয়া বলিলেন, 'তুমি যে এত ব্যাকুল হচ্ছ?' মা অতি কাতরকণ্ঠে উত্তর করিলেন, 'আমি রাক্ষসী, এক সন্তান খেয়েছি,* এটী অষ্টমগর্ভের ছেলে, পাছে আমার দৃষ্টিতে কোন অমঙ্গল হয়, তাই আমি একে কাছে আসতে দিতুম না, এলে দূর-দূর করে তাড়িয়ে দিতুম। কোলে করিনি, কখনও একটী মিষ্টি কথা বলিনি, আমার হেনস্তায় কত কষ্ট পেয়েছে, আমার বুক ফেটে যাচ্ছে!' জননীর এই অন্তর্নিহিত গভীর স্নেহ এতদিন পরে সম্যক্ উপলব্ধি করিয়া আমি রোগের যন্ত্রণা পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছিলাম।"

গিরিশচন্দ্র-প্রণীত 'অশোক' নাটকে তাঁহার এই বাল্য-জীবনস্মৃতির আভাস আছে। অশোক-জননী সুভদ্রাঙ্গী অশোককে বলিতেছেন:–

> "বুঝি বা জানিতে মোরে মমতা-বর্জ্জিত,
> বুঝি বা ভাবিতে মম আদরের ক্রটী,
> কিন্তু শোন, বৎস,
> আজি করি মনোভাব প্রকাশ তোমারে,–
> রাজরাজেশ্বর পুত্র জন্মিবে আমার
> দৈবজ্ঞের গণনা এরূপ;

* ইহার পূর্ব্বে গিরিশচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নিত্যগোপালের মৃত্যু ঘটিয়াছিল। পুত্রশোকাতুরা জননী সেই অবধি গিরিশচন্দ্রের মুখপানে চাহিতেন না।

স্নেহ-দৃষ্টে চাহিলে তোমার পানে
পাছে তব হয় অকল্যাণ,
স্নেহের প্রকাশ নাহি করি সেই হেতু।"

'অশোক'। ১ম অঙ্ক, ২য় গর্ভাঙ্ক।

গিরিশচন্দ্র তাঁহার "গোবরা" গল্পেও স্বীয় শৈশব-জীবনের কতক কথা গাঁথিয়া দিয়া গিয়াছেন। মৃত্যুশয্যায় গোবরার মাতা তাঁহার স্বামীকে বলিতেছেন:—

"উমো বড় অভাগা, একদিনও স্তন্য দিতে পারি নাই। বৃদ্ধ বয়সের সন্তান, পাছে অকল্যাণ হয়, এই ভয়ে ওর প্রতি আমি চাই নাই, কখনও আদর করি নাই। পাছে তুমি তাড়না কর, এই ভয়ে আমি আগেই তাড়না করিতাম।"

গোবরার প্রকৃত নাম ছিল উমাচরণ। গিরিশচন্দ্রেরও রাশি নাম—উমাচরণ। এই গল্পটী পড়িলে দেখা যায় যে, উহার মধ্যে গিরিশচন্দ্রের বাল্য-জীবনের অনেক স্মৃতি জড়িত আছে।

শোক গিরিশচন্দ্রের চির সহচর ছিল। যখন তাঁহার দশ বৎসর মাত্র বয়স, সে সময় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নিত্যগোপালের মৃত্যু ঘটে। উপযুক্ত সন্তান, লেখাপড়া শিখাইয়া সংসারের উপযুক্ত করিয়া তুলিয়াছেন। পুত্রের জন্য দ্বিতলে বৈঠকখানা নির্ম্মিত হইতেছে, এমন সময়ে হঠাৎ তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় নীলকমলের বুকে শেল বিঁধিল! গিরিশচন্দ্রের পর নীলকমলবাবুর আরও কয়েকটী পুত্র জন্মে। ইঁহারা তখন শিশু, নিত্যগোপালই উপযুক্ত হইয়াছিল। নীলকমলবাবু কোন্নগর মিত্র-বাটীতে ইঁহার কিশোর বয়সে বিবাহ দিয়াছিলেন। উনিশ বছর বয়সে নিত্যগোপালবাবুর নববধূর মৃত্যু হয়। ইহার অল্পদিন পরেই ইনি বায়ুরোগাক্রান্ত হন। সুচিকিৎসায় রোগের উপশম হইলে নীলকমলবাবু পুনরায় জোড়াসাঁকো, বলরাম দে ষ্ট্রীটে পুত্রের বিবাহ দিয়াছিলেন। বিবাহের দেড় বৎসর পরে বাতশ্লেষ্ম বিকারে মাত্র ২২ বৎসর বয়সে নিত্যগোপালের মৃত্যু হয়। সুতরাং জ্যেষ্ঠ সন্তানের অকালমৃত্যুতে তিনি কিরূপ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিলেন, তাহা সহজেই অনুমেয়। পুত্রের নিমিত্ত যে নূতন বৈঠকখানা নির্ম্মাণ করিতেছিলেন, তখন তাহা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল, নবনির্ম্মিত বৈঠক-খানায় জীবিতকাল পর্য্যন্ত একদিনের জন্যও তিনি প্রবেশ করেন নাই।

গিরিশচন্দ্র দশ বৎসর বয়সে অগ্রজকে হারাইলেন। এগার বৎসর বয়সে তাঁহার মাতৃবিয়োগ ঘটিল। তাঁহার মাতা কলিকাতা, সিমলা, মদন মিত্রের লেনে সুপ্রসিদ্ধ চুণীরাম বসুর পুত্র রাধাগোবিন্দ বসুর মধ্যমা কন্যা—বংশ-পরিচয়ে তাহা বর্ণিত হইয়াছে। পিত্রালয়ে ইঁহার খুব আদর ছিল। মাতার আগ্রহাতিশয্যে প্রত্যেক-বারেই সাধভক্ষণের নিমিত্ত তাঁহাকে সেখানে যাইতে হইত।

গিরিশ-জননীর শেষ গর্ভাবস্থার সময় তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র নিত্যগোপালের মৃত্যু হয়। নিদারুণ শোকে বহুদিন পর্য্যন্ত বাটীর সকলে মুহ্যমান হইয়া থাকে। এরূপ অবস্থায় তিনি হয়ত সাধ খাইতে পিত্রালয়ে যাইবেন না, এইরূপ ইতস্ততঃ করিয়া তাঁহার মাতাঠাকুরাণী সাধের তত্ত্ব বসুপাড়া বাটীতে পাঠাইয়া দেন। ভৃত্যগণকে

সাধের তত্ত্ব আনিতে দেখিয়া গিরিশচন্দ্রের মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে সাধ পাঠাইয়া দিলে?" ভৃত্য তাঁহার মাতার নাম করিলে তিনি বলিলেন, "যাকে বলিস্, আমি তথায় যাইয়া সাধ খাইয়া আসিব।"

যথাসময়ে তিনি পিত্রালয়ে উপস্থিত হইলেন। নিত্যগোপালের শোকে বাটীর সকলেই উচ্চৈস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন। গিরিশচন্দ্রের মাতাও ধূলায় লুটাইয়া কাঁদিলেন। পরে কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থা হইলে করুণ কণ্ঠে জননীকে বলিলেন, "মা, আমি সাধ খেতে আসি নাই, তোমাকে দেখতে এসেছি। আবার দেখা হবে কিনা তা জানি না।"

পিত্রালয় হইতে শ্বশুরবাটীতে আসিয়া দুই-তিনদিন পরেই তাঁহার গর্ভবেদনা উপস্থিত হয়, পরে একটী মৃতা কন্যা প্রসব করিয়া তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। মাতৃদেবী যখন কন্যার এই আকস্মিক মৃত্যুর সংবাদ পাইলেন, তিনি মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। আসন্ন মৃত্যু জানিয়া, কন্যা যে জোর করিয়া আসিয়া তাঁহাকে শেষ দেখা দেখিয়া গিয়াছেন, এ কথা মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি ভুলিতে পারেন নাই।

গিরিশচন্দ্র তাঁহার মাতৃবিয়োগ সম্বন্ধে বলিতেন, "একদিন আমরা ক'ভাই পাড়ার বালকগণের সঙ্গে মিলিয়া খেলা করিতেছিলাম, বাটীর নিকটে নিত্যই আমরা খেলা করিতাম, সন্ধ্যার পূর্ব্বে বাড়ী হইতে ভৃত্য আসিয়া ডাকিয়া লইয়া যাইত। কিন্তু সে-দিন তাহার আসিতে বিলম্ব হইতে লাগিল। মনে-মনে ভাবিতে লাগিলাম—ভৃত্য আসিতে কেন বিলম্ব করিতেছে? কিন্তু অধিকক্ষণ খেলিতে পাইয়া আবার আহ্লাদও হইতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে ভৃত্য আসিয়া আমাদের (গিরিশচন্দ্রের কনিষ্ঠ কানাইলাল, অতুলকৃষ্ণ ও ক্ষীরোদ; সর্ব্বকনিষ্ঠ ক্ষীরোদচন্দ্র তখন শিশু ছিল) বাড়ী লইয়া গেল। বাড়ী ঢুকিয়া দেখি, সকলেরই কেমন বিমর্ষ ও ব্যস্ত-সমস্ত ভাব। ক্ষণকাল পরেই ভিতর-বাটী হইতে শাঁখ বাজিয়া উঠিল, শুনিলাম আমার একটী ভগ্নী হইয়াছে; কিন্তু সে শঙ্খরোল থামিতে-না-থামিতে সহসা বাটীতে ক্রন্দনরোল উঠিল। জননী মৃতা কন্যা প্রসব করিয়া স্বর্গারোহণ করিলেন।"

সেদিনের সেই নিদারুণ স্মৃতি গিরিশচন্দ্রের হৃদয়ে গভীরভাবে অঙ্কিত হইয়াছিল। তৎপ্রণীত 'বুদ্ধদেব চরিত' নাটকে ইহার ছবি আছে। বুদ্ধদেবকে প্রসব করিয়া বুদ্ধ-জননীর মৃত্যু বর্ণনায় তাঁহার মাতৃ-মৃত্যু-ঘটনার চিত্রই প্রতিফলিত দেখিতে পাই। বুদ্ধদেবের জন্মক্ষণে অন্তঃপুর হইতে শঙ্খধ্বনি শুনিয়া রাজসভায় আসীন রাজা শুদ্ধোদন সাগ্রহে বলিতেছেন :—

"রাজা। জন্মেছে নন্দন!
শ্রীকাল দেবল। নাহি হও উচাটন,
শুন—নীরব আনন্দ-ধ্বনি;
নৃপমণি, ধৈর্য্য-পাশে বাঁধ বুক।
(মন্ত্রীর প্রবেশ)

মন্ত্রী। মহারাজ, জন্মেছে নন্দন।
কিন্তু হে রাজন্,
জড়িত রসনা মম দিতে এ সংবাদ।
মূর্চ্ছাগত রাজরাণী,
রাজবৈদ্যগণে—
সযতনে চেতন করিতে নারে।"

'বুদ্ধদেব চরিত' ১ম অঙ্ক, ১ম গর্ভাঙ্ক।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পিতৃবিয়োগ

গিরিশচন্দ্র পল্লীস্থ পাঠশালার পাঠ শেষ করিয়া যখন গৌরমোহন আঢ্যের স্কুলে পাঠশালা ডিপার্টমেণ্টে ভর্ত্তি হন, সে সময়ে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নিত্যগোপাল জীবিত ছিলেন। নিত্যগোপালবাবু ভাল করিয়া লেখাপড়া শিখিতে পারেন নাই, এজন্যে গিরিশচন্দ্রের লেখাপড়ার উন্নতির দিকে তাঁহার বিশেষরূপ লক্ষ্য ছিল এবং প্রত্যহ গিরিশচন্দ্রকে বাটীতে পড়াইতেন। তীক্ষ্ণ বুদ্ধির প্রভাবে গিরিশচন্দ্র শিক্ষকগণের স্নেহাকর্ষণ করিয়াছিলেন। পাঠশালা ডিপার্টমেণ্টের শেষ পরীক্ষায় যোগ্যতার সহিত উত্তীর্ণ হইয়া, তিনি 'মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ' প্রাইজ প্রাপ্ত হন। প্রথিতনামা খ্রীষ্টান অধ্যাপক ৺কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার তখন সহপাঠী ছিলেন। 'ব্যানার্জ্জি সাহেব' আজীবন তাঁহার গুণের পক্ষপাতী ছিলেন, উত্তরকালে তিনি গিরিশচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হাইকোর্টের উকীল অতুলকৃষ্ণবাবুকে প্রায়ই বলিতেন, "দেখ, গিরিশবাবু যে একটা Genius, আমার ছেলেবেলা থেকেই কেমন একটা ধারণা ছিল।"

ওরিয়্যাণ্টাল্ সেমিনারী (গৌরমোহন আঢ্য এই সুবিখ্যাত বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া ইহা "গৌরমোহন আঢ্যের স্কুল" বলিয়া বিখ্যাত) বিদ্যালয়ে গিরিশচন্দ্র বৎসর দুই পড়িয়াছিলেন। তারপর পিতাকে বলিয়া নিত্যগোপালবাবু ভ্রাতাকে হেয়ার স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেন। হেয়ার স্কুলে অধ্যয়নকালেই গিরিশচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও মাতৃদেবীর মৃত্যু হয়।

মাতৃহারা ছেলেদের যাহাতে যত্নের কোনও ত্রুটী না ঘটে, নীলকমলবাবু সেদিকে সবিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন। বাল্যে মাতার হতাদরের জন্য গিরিশচন্দ্র যে অনুক্ষণ ক্ষুণ্ণ থাকিতেন, বিচক্ষণ নীলকমলবাবু তাহা বিলক্ষণ বুঝিতেন, সেইজন্য বালকের ক্ষত হৃদয়ে অজস্র স্নেহধারা ঢালিয়াও তাঁহার তৃপ্তি হইত না। পুত্রের কল্যাণের জন্য বাহ্যিক কঠোরভাব ধারণ করিয়া স্নেহময়ী জননী যে আপনা-আপনি মনে-মনে শত লাঞ্ছিত হইতেন, নীলকমলবাবু অতি সূক্ষ্মদর্শী হইলেও তাহা ধারণায় আনিতে পারিতেন না। ব্যথিত বালক-পুত্র তো নয়ই। নীলকমলবাবু পুত্রকে স্নেহের পক্ষপুটে ঢাকিয়া রাখিয়া শত অপরাধ, সহস্র লাঞ্ছনা হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিতেন। এই আদর্শ পুত্র-বাৎসল্য, গিরিশচন্দ্রের আদর্শ হইয়াছিল।

এক সময় তাঁহার কোন নিকট-আত্মীয় তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "আমার একটী

শিশু কন্যা ছিল, একদিন তাহাকে একটী চড় মারিয়াছিলাম, অনেকদিন সে আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে, তাহার মুখ পর্য্যন্ত ভাল মনে নাই; কিন্তু সেদিনকার সে প্রহার তীক্ষ্ণশির কণ্টকের মত এখনও আমার বুকে বিঁধিয়া রহিয়াছে। বিশ বৎসরেও তাহা ভুলিতে পারিতেছি না।'' গিরিশচন্দ্র শুনিয়া বলিলেন, "আমার কথা শোন, তুমি কখনও সন্তানকে মারিও না, তুমি মারিলে সে কার কাছে 'বাবা' বলে কেঁদে এসে দাঁড়াবে ?"

যাহাই হউক, দুঃসহ পুত্রশোকের পর নিদারুণ পত্নীশোকে ক্রমশঃ নীলকমলবাবুর স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। পুরাতন রক্তামাশয় পীড়া দেখা দিল, চিকিৎসকগণ গঙ্গাবক্ষে ভ্রমণের ব্যবস্থা দিলেন। অপোগণ্ড ছেলেদের লইয়া নীলকমলবাবু নৌকারোহণে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কিছুদিন এইরূপ ভ্রমণ করিতে-করিতে একদিন নবদ্বীপ সন্নিকটে, যে স্থানে খড়ে নদী গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে, তথায় নৌকা উপস্থিত হইলে সহসা তুফান উঠিল, নৌকা ভীষণ দুলিতে লাগিল—যেন এখনই ডুবিবে! জলমগ্ন হইবার আশঙ্কায় গিরিশ পিতার হস্ত দৃঢ় করিয়া ধরিলেন। মাঝি অতি কষ্টে খড়ে নদীর ভিতর গিয়া নৌকা রক্ষা করিল। এই নিরাপদ স্থানে উপস্থিত হইলে নীলকমলবাবু গিরিশচন্দ্রকে বলিলেন, "তুই আমার হাত ধরেছিলি যে ? আমার নিজের প্রাণ বড় না তোর ? যদি নৌকা ডুবত—আমি হাত ছিনিয়ে নিতুম—তুই কোথায় পড়ে থাকতিস জানিস ? যেমন করে পারি আপনাকেই বাঁচাতুম।'' বোধহয় বিচক্ষণ নীলকমলবাবু বুঝিয়াছিলেন, যাহাকে দুইদিন পরে অকূল সমুদ্রে ভাসিতে হইবে, তাহার পক্ষে এ শিক্ষা বিশেষ প্রয়োজন। সেদিনকার সে তুফান, সে বিপন্ন তরণী নীলকমলের মনে আসন্ন মৃত্যুর দৃষ্টি অঙ্কিত করিয়াছিল কিনা, কে বলিবে ? কিন্তু এ ঘটনা উপলক্ষ্যে তিনি যে শিক্ষা দিয়াছিলেন, গিরিশচন্দ্র তাহা জীবনে বিস্মৃত হন নাই, "বিপদে হাত ধরিবার কেহ নাই!''—অতি তিক্ত ঔষধ, কিন্তু বোধ করি, বিচক্ষণ নীলকমলবাবু বুঝিয়াছিলেন, তিক্ত হউক, ঔষধ অমোঘ; বুঝিয়াছিলেন, পিতার স্নেহময় অঙ্ক ছাড়িয়া যে বালককে অদূর ভবিষ্যতে আপনার পায়ের বলে দাঁড়াইতে হইবে, তাহাকে সে শিক্ষা দিবার এই উপযুক্ত সময়। গিরিশচন্দ্র বলিতেন, "বাবার কথায় হৃদয়ে গুরুতর আঘাত লাগিয়াছিল, কিন্তু শিখিয়াছিলাম যে বিপদে এক ভগবান ভিন্ন হাত ধরিবার আর কেহ নাই।''

ক্রমশঃ পীড়া বৃদ্ধি হওয়ায় নীলকমলবাবু কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। গিরিশবাবু গল্প করিতেন, "বাবা খুব সাবধানী ছিলেন, একে আমাশয়ের পীড়া, আহারাদি সম্বন্ধে খুব সতর্ক হওয়া উচিত। বাবা তাহাই করিতেন, বাটীর মেয়েরা কোনওরূপ গুরুপাক খাদ্য খাইতে দিলে ভৎর্সনা করিয়া বলিতেন, 'আমার যে পীড়া, তাহাতে দুষ্পাচ্য খাদ্য ভোজনেরই প্রলোভন অধিক, তোমরা কোথায় সাবধান হইয়া আমার আহার সম্বন্ধে লক্ষ্য রাখিবে, না, আমাকেই তোমাদিগকে সাবধান করিয়া দিতে হইবে।' অন্তিমকাল উপস্থিত হইলে উর্ব্বর মস্তিষ্কও নিস্তেজ হইয়া যায়; বাবা এত সাবধানী ছিলেন, তিনিও মনের বল হারাইয়াছিলেন। তাঁহার কঠিন পীড়ায়

সংবাদে তাঁহার পঞ্চমা কন্যা কৃষ্ণরঙ্গিণী* শ্বশুরালয় হইতে তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছেন। উপস্থিত কৃষ্ণরঙ্গিণীই বাড়ীর ছোট মেয়ে; বাটীতে সেদিন নানারূপ আহারের উদ্যোগ হইয়াছে। মেয়েরা বাটীতে উৎকৃষ্ট কড়াইশুটির কচুরী তৈয়ারী করিয়াছে। কৃষ্ণরঙ্গিণী আসিয়া বলিল, 'বাবা কি চমৎকার কচুরী তৈরী হয়েছে, দু'খানা খাবে?' স্নেহময়ী কন্যার অনুরোধে নীলকমলবাবু একখানিমাত্র আনিতে বলিলেন, কিন্তু কচুরীখানি খাইতে অত্যন্ত ভাল লাগায় তিনি আর-একখানি আনিতে বলেন। কৃষ্ণরঙ্গিণী পাছে বাড়ীতে বকে, সেইজন্য লুকাইয়া চারি-পাঁচখানি কচুরী আনিয়া বাবাকে খাইতে দিল। বাবা আবার খাইতে চাহিয়াছে, এই আনন্দে পিতৃভক্তি-অন্ধা জ্ঞানহীনা কন্যা চাহিয়া দেখিল না – বাবাকে কি হলাহল খাইতে দিল।" তাহার পরই উত্তরোত্তর পীড়া বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ৫২ বৎসর বয়ঃক্রমে তাঁহার লোকান্তরপ্রাপ্তি হয়।

তাহার পরলোকগমনকালে গিরিশচন্দ্রের বয়স চতুর্দ্দশ বৎসর মাত্র। সেই নাবালক পুত্র সংসারের কর্ত্তা এবং জ্যেষ্ঠা বিধবা কন্যা কৃষ্ণকিশোরী তাহার অভিভাবিকা।†

এই দুইজনের উপর সংসার ও সম্পত্তির ভার দিতে অন্য লোক হইলে ভীত হইত, কিন্তু সংসার-অভিজ্ঞ নীলকমলবাবু বুঝিয়াছিলেন যে, অপর কাহাকেও ভার দিলে অর্থলোভে প্রবঞ্চনা করিতে পারে। বুদ্ধিমতী দুহিতা হইতে সে আশঙ্কা নাই। তিনি তাহাকে লেখাপড়াও শিখাইয়াছিলেন। তিনি পিতার সাংসারিক বুদ্ধিশক্তি পাইয়াছিলেন এবং বিশেষ সাবধানে ও বিচক্ষণতার সহিত সংসার চালাইয়াছিলেন।

নীলকমলবাবু যেমন সাবধানী তেমনই সতর্ক ছিলেন, বিষয়-সম্পত্তি সম্বন্ধে যে কিছু গোলযোগ হইতে পারে এবং যাহা কিছু করা কর্ত্তব্য, সমস্তই তিনি একখানি খাতায় স্বহস্তে লিপিবদ্ধ করিয়া যান। আজ পর্য্যন্ত সেই খাতাখানি তাঁহার বংশধরেরা সযত্নে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। আমরা প্রথমেই উল্লেখ করিয়াছি, সওদাগরী অফিসে হিসাব রাখিবার 'ডবল এন্ট্রি' প্রণালী ইনিই প্রথম প্রবর্ত্তিত করেন। বস্তুতঃ সংসারে যাহাকে হিসাবী বুদ্ধি বলে, নীলকমলবাবুর তাহা যথেষ্ট ছিল এবং পুত্রও এই গুণের অধিকারী হইয়াছিলেন। দুর্দ্দমনীয় উচ্ছৃঙ্খলতায় পিতৃ-প্রদত্ত এই বিমৃশ্যকারিতা গিরিশচন্দ্রকে পদে-পদে আজীবন রক্ষা করিয়াছে। নীলকমলবাবুর যে সকল গুণ গিরিশচন্দ্রে পূর্ণভাবে বিকশিত হইয়াছিল, বাৎসল্য তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। গিরিশচন্দ্র পিতার ন্যায় পুত্র-বৎসল ছিলেন। পিতৃস্নেহ স্মরণ করিয়া তিনি বলিতেন, "আমার ছোট ভাইদের বাবা হাত ধরিয়া লইয়া যাইতেন, কিন্তু তাঁহার কোলে চড়িয়া যাইতাম আমি, আমি তাঁহার কোলের অধিকারী ছিলাম।"

গিরিশচন্দ্র চিরজীবন পিতৃস্মৃতির পূজা করিতেন। যখন ঘোর নাস্তিকতায় তাঁহার বুদ্ধি আচ্ছন্ন, তখনও তিনি গঙ্গাস্নানে গিয়া পিতৃ-উদ্দেশে অঞ্জলিপূর্ণ গঙ্গাজল প্রদান

* বংশ-পরিচয়ে পাঠকগণ ইঁহার পরিচয় পাইয়াছেন।

† কৃষ্ণকিশোরী অল্পবয়সে বিধবা হইয়া পিত্রালয়ে আসিয়া বাস করেন।

করিতেন। প্রথম রচিত তাঁহার পৌরাণিক নাটকগুলিতে অনেক স্থলে কৌশলে তাঁহার পিতৃ-নাম সংযোজিত করিতেন। যথা :—

"সংসারে মোরে সকলে, নীলকমল-আঁখি-বলে।"

'অকাল বোধন'। ২য় দৃশ্য।

"গুহক প্রেমের তরে নাম গেয়েছে,
পেয়েছে নীলকমল-আঁখি।"

'সীতার বনবাস'। ৩য় অঙ্ক, ১ম গর্ভাঙ্ক।

"রাখি' নীলকমলে হৃদ্‌কমলে,
হওরে ভোলা ভাবে ভোল!"

'লক্ষ্মণ বর্জ্জন'। ৯ম দৃশ্য।

"চল্‌গো সখি, চল্‌গো তোরা চল,
কাল রাজা হবে নীলকমল।"

'রামের বনবাস'। ১ম অঙ্ক, ৩য় গর্ভাঙ্ক।

ইত্যাদি ইত্যাদি।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বিবাহ—বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ

তিনটি অপোগণ্ড ভাই লইয়া চতুর্দ্দশ বৎসর বয়স্ক পিতৃ-মাতৃহীন বালক গিরিশচন্দ্র সংসারের কর্ত্তা হইলেন। অভিভাবিকা জ্যেষ্ঠা বিধবা ভগ্নী। সুবৃহৎ সুখপূর্ণ সংসারের কি শোচনীয় পরিবর্ত্তন। তবে শোকে সান্ত্বনা এই নীলকমলবাবু পুত্রগণের গ্রাসাচ্ছাদনের অভাব রাখিয়া যান নাই; এবং দিগম্বর মিত্র নামক একজন বিশ্বাসী এবং সুহিসাবী কর্ম্মচারী রাখিয়া গিয়াছিলেন।

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে গিরিশচন্দ্রের যেরূপ দুর্ব্বৎসর, দেশের অবস্থাও সেইরূপ ভয়ঙ্কর! এক বৎসর পূর্ব্বে সিপাহী বিদ্রোহের সূচনা হইয়াছে, ভারতে ইংরাজ রাজত্ব টলমল করিতেছে,—বিদ্রোহীর দল আজ এখানে, কাল সেখানে! চারিদিকে নৃশংস নির্য্যাতন-কাহিনী, হত্যা, অত্যাচার, দেশময় হাহাকার! জনরব চারিদিকে শতমুখে কত কথা বলিতেছে। শঙ্কাচ্ছন্ন কল্পনা সহস্রগুণে তাহা বর্দ্ধিত করিয়া লোকের মনে অমানুষী ভীতি উৎপাদন করিতেছে। দেশ যেন দুঃস্বপ্নে আচ্ছন্ন। কলিকাতায় অবশ্য অপেক্ষাকৃত শান্তি বিরাজিত ছিল। কিন্তু একদিনকার একটী ঘটনা সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্র বলিতেন, "বক্‌রীদের দিন জনরব উঠিল, বদমায়েস মুসলমানগণ কলিকাতা লুট করিবে। আমরা তখন বালক, কিন্তু সেদিনকার কথা স্মৃতি-পটে অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। সহরময় হুলুস্থূল, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা শঙ্কাকুল! 'কি হবে' 'কি হবে' ব্যতীত লোকের মুখে অন্য কথা নাই। সহরের এই ভয়-বিহ্বল অবস্থায় ইংরাজরাজ প্রজার ঘরে-ঘরে অভয় বিলাইতে লাগিলেন, ঘরে-ঘরে ছাপার কাগজ আসিতে লাগিল। 'ভয় নাই, ভয় নাই; অস্ত্রধারী ইংরাজ-রাজকর্ম্মচারিগণ বক্‌রীদের রাত্রে পথে-পথে পাহারা দিয়া বেড়াইবেন। প্রজার রক্ষণে প্রাণপণ করিবেন, নিঃশঙ্কচিত্তে সকলে নিদ্রা যাও।' সে ঘোর দুর্দ্দিনে ইংরাজরাজের ধৈর্য্য, শৌর্য্য, বীর্য্য ও ঔদার্য্যগুণে ভারত রক্ষা পাইয়াছিল, শান্তি পুনঃস্থাপিত হইয়াছিল।" বৃহৎ সংসারের সেই করাল ছবি দেখিতে-দেখিতে গিরিশচন্দ্র তাঁহার ক্ষুদ্র সংসারে প্রবেশ করিলেন।

পিতার মৃত্যুর এক বৎসর পর (১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে) জ্যেষ্ঠা ভগিনী অভিভাবিকা কৃষ্ণকিশোরী গিরিশচন্দ্রের বিবাহ দিলেন। গিরিশচন্দ্রের বয়স তখন পনর বৎসর। বাল্যবিবাহ সে সময় দূষণীয় বলিয়া কেহ মনে করিতেন না। বিশেষ গিরিশচন্দ্রের পুরুষ অভিভাবক কেহ ছিল না। একজন গণ্যমান্য বিজ্ঞ ব্যক্তির কন্যার সহিত সম্বন্ধ

স্থাপন করিলে সকল দিকেই ভাল। অ্যাট্‌কিন্সন টিলটন কোম্পানীর বুককিপার শ্যামপুকুর-নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ নবীনচন্দ্র (দেব) সরকারের কন্যা প্রমোদিনীর সহিত ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে গিরিশচন্দ্রের শুভ পরিণয় সম্পন্ন হইল। বিবাহের দিন কলিকাতায় ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হইয়াছিল। নিমতলায় একটি কাঠগোলায় আগুন লাগে। সেই অগ্নি ভীষণাকারে জ্বলিতে-জ্বলিতে বাগবাজার-অভিমুখে ধাবিত হইয়া গিরিশচন্দ্রের বাটীর সন্নিকট আসিয়া উপস্থিত হয়। কোথায় বিবাহের আমোদ আর এই আসন্ন সর্ব্বনাশ! চতুর্দ্দিকে হাহাকার শব্দ "সর্ব্বনাশ হল—সব গেল" শব্দে সহস্র-সহস্র নরনারীর কণ্ঠে রাজপথ মুখরিত। "জল আন" "জল আন"—গগনভেদী শব্দ, বাটীর লোক ভয়ে কম্পমান! প্রাণপণে ভগবানকে ডাকিতেছেন। গৃহদেবতা শ্রীধরজীর দ্বারে লুটাইয়া পড়িয়া বলিতেছেন, "ঠাকুর, রক্ষা কর; ঠাকুর, রক্ষা কর।" শ্রীধরজী প্রসন্ন হইলেন। আশ্চর্য্য, গিরিশচন্দ্রের বাটীর ঠিক দক্ষিণ-পশ্চিমে একটি বৃহৎ তেঁতুলের গাছ ছিল; সেই বৃক্ষে ধাবিত অগ্নিরাশি আসিয়া প্রতিহত এবং ক্রমশঃ অগ্নিদেবের শক্তি নিঃশেষিত হইয়া যায়।

হেয়ার স্কুলে যে সময় গিরিশচন্দ্র প্রথম শ্রেণীতে অধ্যয়ন করেন, সে সময় (১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে) তাঁহার পিতার মৃত্যু হওয়ায় তিনিও বিদ্যালয় পরিত্যাগ করেন। হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি স্বর্গীয় গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সুপ্রসিদ্ধ স্কুল ইন্সপেক্টর স্বর্গীয় বেণীমাধব দে হেয়ার স্কুলে তাঁহার সহাধ্যায়ী ছিলেন। গুরুদাসবাবু আজীবন বন্ধুর ন্যায় তাঁহার সহিত ব্যবহার করিয়া আসিয়াছিলেন। স্বীয় ভবনে বা সভা-সমিতিতে যেখানেই গিরিশবাবুর কথা উঠিয়াছে, সেখানেই, গিরিশবাবুতে-আমাতে একসঙ্গে হেয়ার স্কুলে পড়িতাম—তাঁহার সরস কথাবার্ত্তায় পরম আনন্দ উপভোগ করিতাম—এইরূপ নানা কথাই বলিতেন।

বিবাহের পর ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে গিরিশচন্দ্র পুনরায় ওরিয়েন্টাল সেমিনারীতে প্রথম শ্রেণীতে ভর্ত্তি হন। সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক চন্দ্রনাথ বসু ও মিলিটারী সিভিল সার্জ্জন ডাক্তার ফকিরচন্দ্র বসু এখানে ইঁহার সহাধ্যায়ী ছিলেন। পারিবারিক দুর্ঘটনাবশতঃ সে বৎসর তিনি পরীক্ষায় উপস্থিত হন নাই। পুনরায় ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে পাইকপাড়া গভর্ণমেণ্ট সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয় হইতে পরীক্ষা প্রদান করেন।

কিন্তু পিতৃবিয়োগে অভিভাবক না থাকায় এবং স্বেচ্ছামত আজ এখানে কাল সেখানে ক্রমান্বয়ে স্কুল পরিবর্ত্তন ইত্যাদি নানা প্রতিবন্ধকতায় তিনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সম্বন্ধ তাঁহার এইখানেই শেষ।

গিরিশচন্দ্র চিরদিন অধ্যয়নপ্রিয় ছিলেন এবং বাল্যকাল হইতেই রামায়ণ, মহাভারত, কবিকঙ্কণ চণ্ডী, অন্নদামঙ্গল প্রভৃতি বিশেষ আগ্রহের সহিত পাঠ করিতেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত শিক্ষা কখনও তাঁহাকে আকর্ষণ করিতে পারে নাই। বাল্যকাল হইতেই গিরিশচন্দ্রের স্বভাব ছিল, তিনি "ভাসা-ভাসা" কিছুই বুঝিতে চাহিতেন না এবং পারিতেনও না। সকল বিষয়েরই মূল তাৎপর্য্য বুঝিতে চেষ্টা করিতেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ তাঁহার এই প্রকৃতির ঠিক সন্ধান না পাইয়া তাঁহাকে

সময়ে-সময়ে তাড়না করিতেন। আবার বুদ্ধিমান বলিয়া মধ্যে-মধ্যে প্রশংসাও করিতেন। দুই-একবার বাৎসরিক পরীক্ষায় তিনি পারিতোষিকও পাইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার ন্যায় প্রতিভাশালী বালকের নিকট যেরূপ উন্নতির আশা করা যায়, তিনি সেরূপ কৃতিত্ব কখনও দেখাইতে পারেন নাই। গিরিশচন্দ্র বলিতেন, "যদি শিক্ষকেরা আমায় তাড়না না করিয়া মিষ্ট কথায়, আমি যেরূপে বুঝিতে পারি, সেইরূপ বুঝাইয়া দিতেন, তাহাহইলে কিছু শিখিতে পারিতাম। তৎপ্রণীত 'নল-দময়ন্তী' নাটকে বিদূষদের মুখে তিনি ইহার একটু আভাসও দিয়াছেন। "গুরুমশায় শালা যে কান মলে দিলে, নইলে, 'ক' 'খ' শিখতুম।" 'নলদময়ন্তী', ৩য় অঙ্ক, ৫ম গর্ভাঙ্ক।

তিনি বলিতেন, তাড়না বা ভয় প্রদর্শনে কেহ কখনও আমায় কর্ম্মে প্রবৃত্ত বা তাহা হইতে নিবৃত্ত করিতে পারেন নাই। পশু চাবুকে বশ হয়—মানুষ নয়। আমার স্বভাব ছিল, জুজুর ভয় দেখাইলে জুজু দেখিতে আগে ছুটিতাম। ভয়ে আমি কোন কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হই নাই বা যে কার্য্যে আমোদ পাই নাই, সে কার্য্যে কখনই প্রবৃত্ত হই নাই।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

গৃহে অধ্যয়ন

১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় হিন্দু কলেজ স্থাপিত হইবার পর বাঙ্গালী জীবনে ইংরাজী চালচলন বিশেষরূপে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। কৃতবিদ্যগণ ইংরাজী সাহিত্যেরই আদর করিতেন। মুসলমান আমলে পার্শীবিদ্যার আদর হইয়াছিল, ইংরাজ অভ্যুদয়ে ইংরাজীরই আদর হইতে লাগিল। সূক্ষ্মদর্শী স্বদেশভক্ত কবি রামনিধি গুপ্ত (নিধুবাবু) দিব্যচক্ষে তাহা দেখিতে পাইয়া বলিয়াছিলেন :—

"নানান দেশে নানান ভাষা,
বিনা স্বদেশীয় ভাষা, পূরে কি আশা,
কত নদী সরোবর, কিবা ফল চাতকীর,
ধারা জল বিনে কভু ঘুচে কি তৃষা ?"

কবির এ প্রাণের উক্তি প্রথম নিষ্ফল হইলেও পরে অনেকে উহার মর্ম্ম উপলব্ধি করিয়াছিলেন। কবিবর মধুসূদন বাণী-চরণে বিজাতীয় ফুলে প্রথমাঞ্জলি দিলেও আপনার ভ্রান্তি বুঝিয়া সময় থাকিতে সতর্ক হইয়াছিলেন। গিরিশচন্দ্রের জন্মের কিছুকাল পূর্ব্ব হইতেই মাতৃভাষার প্রতি বঙ্গবাসীর অনুরাগ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতেছিল। যে সকল মহাত্মা আধুনিক বঙ্গভাষার সৃষ্টিকর্ত্তা, গিরিশচন্দ্রের জন্মের পূর্ব্বেই তাঁহারা প্রতিষ্ঠাভাজন হইয়াছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের প্রতিভা-সূর্য্য তখন পূর্ণ গরিমায় দীপ্তি পাইতেছে। অক্ষয়কুমার দত্তের সম্পাদকতায় 'তত্ত্ববোধিনী' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, স্বনাম-ধন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' প্রভৃতি রচনায় মাতৃভাষার উন্নতিসাধন করিয়া বঙ্গবাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

গিরিশচন্দ্র বহু পূর্ব্বেই প্রাচীন কবিদিগের কাব্যপাঠে বঙ্গভাষার প্রতি বিশেষ অনুরাগী হইয়াছিলেন। এক্ষণে সাময়িক সাহিত্যও যত্ন সহকারে পাঠ করিতে লাগিলেন। কবিতা লিখিবার তাঁহার শৈশব হইতেই সখ ছিল, তিনি ঈশ্বর গুপ্তের অনুকরণ করিয়া মাঝে-মাঝে কবিতা লিখিতেন।*

কিন্তু ইংরাজী শিক্ষারই সে সময়ে সর্ব্বাপেক্ষা আদর। যিনি ভাল ইংরাজী বলিতে ও লিখিতে পারিতেন, সমাজে তিনি মহা সম্মানিত হইতেন। কেমন করিয়া ইংরাজী

* নমুনাস্বরূপ দুইটী কবিতা উদ্ধৃত করিলাম :—

সাহিত্যে পাণ্ডিত্যলাভ করিবেন, সেই তাঁহার ধ্যান-জ্ঞান হইল। গিরিশচন্দ্র যখন যে কার্য্যে ঝুঁকিতেন, একটু অতিরিক্ত মাত্রাতেই সে কার্য্য সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইতেন। বিবাহের যৌতুকে যে অর্থ তিনি পাইয়াছিলেন, অন্য যুবকের মত তাহা বিলাস-ব্যসনে অপব্যয় না করিয়া ইংরাজী সাহিত্যের কতকগুলি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ সেই অর্থে ক্রয় করিলেন এবং গভীর মনোনিবেশ সহকারে একনিষ্ঠভাবে পাঠ করিতে লাগিলেন। দিবারাত্র কাহারও সহিত মেশেন না, কোথাও বেড়াইতে যান না, সর্ব্বদা পুস্তক লইয়াই থাকেন। নিতান্ত অবসাদ উপস্থিত হইলে তাঁহাদের দুই-মহল-বাড়ীর অন্দরের সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া আবার ঘরে গিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া পড়িতে বসেন। বন্ধু-বান্ধব কেহই তাঁহার সাক্ষাৎ পায় না ; বাড়ীর লোকেরা তাঁহার এতাদৃশ আচরণে চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। এইরূপে বৎসরাধিক অতিবাহিত হইলে গিরিশচন্দ্র হঠাৎ পড়াশুনা পরিত্যাগ করিলেন। তখন তাঁহার গঙ্গাতীর এবং 'নিৰ্ক্ষা'ভাবে পাড়া বেড়ানই একমাত্র কার্য্য হইল। এমন সময় হঠাৎ একদিন পল্লীস্থ ব্রজবিহারী সোম (উত্তরকালে ইনি সাব-জজ হইয়াছিলেন) নামে তাঁহার জনৈক বন্ধু বলেন, "কি হে, আজকাল যে খুব বেড়াচ্ছ, পড়াশুনা আর কর না নাকি ?" গিরিশচন্দ্র বলিলেন, "দেখ, সব বই ভাল বুঝতে পারি না, মাঝে-মাঝে বড় আটকায়, স্পষ্ট মানে বোঝা যায় না, তাই বিরক্ত হয়ে পড়া ছেড়ে দিয়েছি।" ব্রজবাবু তখন বি. এ. পাস করিয়াছেন ; তিনি বলিলেন, "আমরাই কি সব বইয়ের সব জায়গায় বুঝতে পারি, আমাদেরও অনেক জায়গায় আটকায়, ভাবে বুঝে নিতে হয়, তবে এটা ঠিক, পড়তে-পড়তে আপনিই বোঝা যায়। আর প্রথম থেকে সমস্ত বুঝে ক'জনেই-বা পড়ে, পড়তে থাক, দেখবে ক্রমে-ক্রমে সব ঠিক হয়ে যাবে।" বন্ধুর কথায় গিরিশচন্দ্র আবার উৎসাহ সহকারে অধ্যয়ন আরম্ভ করিলেন। উত্তরকালে তিনি বন্ধুর কথার মূল্য বিশেষরূপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। শেষ বয়সে প্রায়ই বলিতেন, "আমার যা কিছু শেখা, ব্রজবাবুর জন্য ; ব্রজবাবুর ঋণ শোধা যায় না।" বসুপাড়া পল্লীস্থ স্বর্গীয় দীননাথ বসু মহাশয়ও গিরিশচন্দ্রকে পড়াশুনা করিবার জন্য বিশেষরূপ উৎসাহিত করিতেন।

গৃহে অধ্যয়নে গিরিশচন্দ্রের এই উপকার হয় যে, পরীক্ষার জন্য ব্যস্ত না হইয়া পঠিত বিষয় আলোচনা ও চিন্তা করিবার তাঁহার অনেক সময় থাকিত এবং সহজ প্রতিভা

প্রথম কবিতা।

ধরিয়া মানব-কায়, সমভাবে নাহি যায়,
সুখ-দুখ-মাঝে হেলে দুলে।
কেমন লোকের মন, দুঃখ নামে অচেতন
সুখলাভে সকলেই চলে॥

দ্বিতীয় কবিতা।

নীরব মানব সব নিশি ঘোরতর,
তমোময় সমুদয় মহা ভয়ঙ্কর।

দ্বারা অনেক বিষয়ের প্রকৃত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিতেন। এই সময় তিনি বিশ্রামকালে প্রায়ই বাঙ্গালা ও ইংরাজী উভয় ভাষায় কৃতিত্ব লাভ করিবার জন্য ইংরাজী কাব্যের পদ্যানুবাদ করিতেন। আমরা নিম্নে কয়েকটীর অনুবাদ প্রদান করিলাম। প্রথমতঃ তিনি অবিকল অনুবাদের চেষ্টা করেন।

যথা :—Pope-এর "Eloisa to Abelard"-এর কিয়দংশ :—

In these deep solitudes and awful cells,
Where heavenly pensive contemplation dwells,
And ever-musing melancholy reigns ;
What means this tumult in a vestal's veins ?

গভীর নিভৃত হেন ভীষণ মন্দিরে,
চিন্তাসতী মূর্তিমতী বিরাজিত ধীরে,
বিহরে বিষাদ যথা ভাবনা মগন ;
কেন হেন বিচঞ্চল তপস্বিনী মন ?

দ্বিতীয়তঃ তিনি স্বাধীন অনুবাদের চেষ্টা পান।

যথা :—John Gay-এর "A Ballad"-এর কিয়দংশ :—

'T was when the seas were roaring
With hollow blasts of wind ;
A damsel lay deploring,
All on a rock reclined.
Wide o'er the foaming billows
She cast a wistful look ;
Her head was crown'd with willows,
That trembled o'er the brook.
Twelve months are gone and over,
And nine long tedious days.
Why didst thou, venturous lover,
Why didst thou trust the seas ;

দেখাইতে আশুগতি, বেগে চলে আশুগতি,
জলনিধি গরজে ভীষণ ;

রণবেশে ঘন এসে ঘেরিল গগন,
ঘন ঘন ঘোর নাদে গভীর গর্জ্জন।
চমকে চপলা, করে আঁধার হরণ,
কড় কড় কুলিশের কঠোর নিঃস্বন।

সন্তাপিতা একাকিনী শিলাতলে বিরহিণী,
হেরিলাম শয়নে তখন।
নয়ন-কমলে বারি, ঝরিছে মুকুতা সারি,
বিস্তার জলধি পানে চায় ;
বিবশা বর্জ্জিতা বেশ, আকুল কুঞ্চিত কেশ,
মনোহর উড়িতেছে বায়।
বৎসর হয়েছে পাত, নয় দিন তার সাথ,
প্রাণনাথ এলো না আমার ;
কেন হে হৃদয়ধন, করিয়ে দারুণ পণ,
জলনিধি হ'তে গেল পার।

অবশেষে অবিকল বা স্বাধীন অনুবাদ পরিত্যাগ করিয়া, মূল অবিকৃত রাখিয়া, অনুবাদের ভাষার মাধুর্য্য সংরক্ষণে যত্নবান হন।

যথা :- Parker-এর "Indian Lover's Song"-এর কিয়দংশ—

Hasten, love, the sun hath set ?
And the moon, through twilight gleaming,
On the mosque's white minaret,
Now in silver light is streaming.
All is hush'd in deep repose ,
Silence rests on field and dwelling,
Save where the bulbul to the rose
Is a love-tale sweetly telling.
Save the ripple, faint and far,
Of the river softly gliding ;
Soft as thine own murmurs are,
When my kisses gently chiding.

এস প্রিয়ে ত্বরাত্বরি, ডুবিল তিমির-অরি,
চন্দ্রোদয় গোধূলি ভেদিয়ে,
শুভ্র মস্‌জিদের শির, শোভিত রজত নীর,
ধায় শুভ্র কিরণ বহিয়ে।
নীরব সকল রব, নিদ্রিত মানব সব,
বুলবুল পাখী শুধু জাগে,
প্রেমে পুলকিত হিয়া, গোলাপের কাছে গিয়া,
প্রেম-কথা কয় অনুরাগে।
দূরস্থিত স্রোতস্বতী, মরমরি করে গতি,
আসে ধনী জিনিয়া সুতান ;

যেইরূপ মৃদু রবে, চুম্বন করিছে যবে,
ছি ছি বলি ফিরাও বয়ান।

প্রথম পরিচ্ছেদে উল্লেখ করিয়াছি, গিরিশচন্দ্রের উপর তাঁহার মাতুল নবীনকৃষ্ণ বসুর প্রভাব বিশেষরূপে পরিলক্ষিত হয় এবং যথাসময়ে আমরা সে কথা বলিব। এক্ষণে সেই কথা বলিবার সময় আসিয়াছে। কিন্তু তৎপূর্ব্বে নবীনবাবুর একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয়-প্রদান আবশ্যক।—

নবীনকৃষ্ণবাবু 'কলিকাতা একাডেমি' বিদ্যালয়ে সগৌরবে পাঠ শেষ করিয়া মেডিক্যাল কলেজে প্রবিষ্ট হন। তথায় সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া দশখানি সুবর্ণ পদক লাভ করেন। তৎকালীন গভর্ণর জেনারল লর্ড ডালহৌসি তাঁহার অসামান্য প্রতিভা দর্শনে পরম প্রীত হইয়া তাঁহাকে স্বয়ং একখানি সুবর্ণপদক প্রদান করেন। ডাক্তারীতে তাঁহার বেশ প্রতিপত্তি হইয়াছিল। এক সময় দুইটী কঠিন রোগীর চিকিৎসাকালে তিনি বলিয়াছিলেন,—"প্রথম রোগীটীর বাঁচিবার সম্ভাবনা নাই, দ্বিতীয় রোগীটী নিশ্চয় বাঁচিবে।" কিন্তু প্রথম রোগীটী আরোগ্যলাভ করে এবং দ্বিতীয়টীর মৃত্যু হয়। ইহাতে তাঁহার চিকিৎসাশাস্ত্র অসম্পূর্ণ (imperfect) বলিয়া ধারণা জন্মে। এমনকি বিবেকের বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে তিনি অসম্মত হইয়া চিকিৎসা-ব্যবসায় একেবারে পরিত্যাগ করেন। বাটীতে আসিয়া নানা বিষয়ক গ্রন্থপাঠে অগাধ বিদ্যার অধিকারী হন। কয়েক বৎসর পরে গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে অতিরিক্ত সহকারী কমিশনারের (Extra Assistant Commissioner) পদ প্রদান করিয়া বাঁকীপুরে প্রেরণ করেন। এই উচ্চপদ প্রাপ্ত হইয়াও আজীবন তিনি অধ্যয়নশীল ছিলেন। তাঁহার ন্যায় সুতার্কিক সে সময়ে বিরল ছিল। মিশনরি প্রধান ডফ্ সাহেব তর্কযুদ্ধে তাঁহাকে হটাইতে না পারিয়া পরিশেষে তাহার সহিত সৌহার্দ্দ্য স্থাপন করেন।

গিরিশচন্দ্র মধ্যে-মধ্যে মাতুলালয়ে গিয়া তাঁহার সহিত তর্ক করিতেন। তর্কে গিরিশচন্দ্রের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও প্রতিভার পরিচয় পাইয়া যাহাতে তাঁহার পাঠ-লিপ্সা বর্দ্ধিত হয় এবং নানা গ্রন্থপাঠে অভিজ্ঞতা জন্মে, সেই অভিপ্রায়ে নবীনকৃষ্ণবাবু একটী কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনি বহু পুস্তক লইয়া এক সঙ্গে তর্ক না করিয়া একখানিমাত্র গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া তর্কের সৃষ্টি করিতেন। গিরিশচন্দ্র মনে করিতেন, সেই গ্রন্থখানি আয়ত্ত করিতে পারিলেই মাতুলের সহিত তর্কে জয় লাভ করিতে পারিবেন। গিরিশচন্দ্র সেই গ্রন্থ মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিয়া মাতুলের সহিত তর্ক করিতে যাইতেন। নবীনকৃষ্ণবাবু পুনরায় অন্য দুইখানি গ্রন্থ হইতে নূতন কথা উত্থাপন করিতেন। গিরিশচন্দ্র আগ্রহ সহকারে আবার সেই দুইখানি গ্রন্থ পাঠ করিয়া আসিতেন; মনে করিতেন—এইবার জয়লাভ করিব। মাতুল মহাশয় আবার অন্য গ্রন্থ হইতে নূতন যুক্তি প্রদর্শন করিতেন। নবীনকৃষ্ণবাবুর এই সুকৌশলে গিরিশচন্দ্র বহু গ্রন্থের গবেষণা করিয়া গভীর জ্ঞানলাভ করিতে লাগিলেন। সুবিখ্যাত পণ্ডিত ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার, বিশ্ববিজয়ী স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি মনীষিগণের সহিত উত্তরকালে তিনি অসাধারণ তর্কশক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন,—মাতুলের

শিক্ষাদান-কৌশলই তাঁহার সে শক্তির ভিত্তি দৃঢ় করে।

এইরূপ অনবরত পরিশ্রমের সহিত তিনি ইংরেজী সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, প্রাণী-তত্ত্ব প্রভৃতি নানা বিষয়ক প্রধান-প্রধান পুস্তকসমূহ পাঠ করিয়া সেই সকল গ্রন্থের ভাবরাশি আয়ত্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার অধ্যয়নশীল জীবন এইভাবেই আজীবন চলিয়াছিল। কলিকাতার প্রসিদ্ধ-প্রসিদ্ধ লাইব্রেরীর গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইয়াও তাঁহার অধ্যয়ন-তৃষ্ণার পরিতৃপ্তি না হওয়ায়, তিনি 'এসিয়াটিক সোসাইটীর' সদস্য শ্রেণীভুক্ত হন। এই লাইব্রেরীই তাঁহার ঐতিহাসিক নাটকগুলির উপকরণ সংগ্রহে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

কবিত্ব-বিকাশ

নৃশংস ব্যাধ যখন প্রমোদরত চক্রবাক মিথুনের প্রতি শর প্রয়োগ করিয়াছিল, মহামুনি বাল্মীকি যদি সে সময় উপস্থিত না থাকিতেন, তাঁহার হৃদয়ে কবিতার উৎস স্ফুরিত হইত না, জগতও রামায়ণ-সুধাপানে বঞ্চিত হইত। কার্লাইল বলিয়াছিলেন, মৃগচুরি অপবাদে সেক্সপীয়রকে যদি দারুণ নির্য্যাতন সহ্য করিতে না হইত, সেই নির্য্যাতন-ফলে যদি তিনি জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া লণ্ডন সহরে না আসিতেন, সম্ভবতঃ নাট্যজগতে তাঁহার নাম অমর অক্ষরে লেখা হইত না। বাগবাজারে ভগবতীবাবুর বাড়ীতে যেদিন হাফ্-আকড়াই আসর হইয়াছিল, গিরিশচন্দ্র যদি সেদিন সেখানে উপস্থিত না হইতেন, তাহাহইলে বোধকরি সওদাগর অফিসের খাতাপত্র লইয়াই তাঁহার জীবন অতিবাহিত হইত।

একদিন বাগবাজার বসুপাড়ায় ৺ভগবতীচরণ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে হাফ্-আকড়াই উপলক্ষে বিশেষ সমারোহ হয়। সে সময়ে কলিকাতার ধনাঢ্য ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে হাফ্-আকড়াই সঙ্গীতের বড়ই আদর ছিল। বহুসংখ্যক ভদ্র দর্শক সমাগমে এরূপ জনতা হয় যে নিমন্ত্রিত গণ্যমান্য ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ অতি কষ্টে সেই ভীড় ঠেলিয়া বাটীতে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। এমন সময় সামান্য পরিচ্ছদধারী জনৈক ভদ্রলোক দ্বারে আসিয়া উপস্থিত। তাঁহার আগমনে জনতামণ্ডলীর মধ্যেই মহা উল্লাস ও মহা অভ্যর্থনার ধুম পড়িয়া গেল, জনতা আপনা-আপনি অপসারিত হইয়া তাঁহার প্রবেশের পথ করিয়া দিল,—শত-শত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁহার অভ্যর্থনার নিমিত্ত ছুটিয়া আসিলেন। ইনিই কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত;—হাফ্-আকড়াইয়ের গান বাঁধিবার জন্য আহুত হইয়াছিলেন। কবিবরের এইরূপ সম্মান দেখিয়া কিশোরবয়স্ক গিরিশচন্দ্রের মনে কবি হইবার সাধ জাগিয়া উঠে।

ইহার পরই তিনি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সম্পাদিত 'প্রভাকরে'র গ্রাহক হন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' এবং তৎকালপ্রকাশিত অন্যান্য প্রসিদ্ধ বাঙ্গালা গ্রন্থগুলি পাঠ করিয়া বাঙ্গালা ভাষার প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুরাগও জন্মিয়াছিল। এক্ষণে তিনি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তকে অন্তরে গুরুরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহার পদানুসরণে কবিতা রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। স্বভাবের প্ররোচনায় গিরিশচন্দ্র পূর্ব্বে কবিতা লিখিতেন, কিন্তু এই ঘটনার পর হইতে তাহার

উৎসাহ শতগুণে বর্দ্ধিত হইল। বাঙ্গালার প্রাচীন কাব্য পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিতে লাগিলেন এবং ভাষায় আধিপত্য লাভ করিবার জন্য ইংরাজী কবিতার অনুবাদও করিতে লাগিলেন। ইংরাজী সাহিত্যে অভিজ্ঞতালাভের নিমিত্ত এ সময়ে তাঁহার ঐকান্তিক যত্ন এবং দৃঢ় অধ্যবসায়ের কথা পূর্ব্ব-পরিচ্ছেদে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। নানা বিষয়ক গ্রন্থপাঠে সতত নিবিষ্ট থাকিলেও তাঁহাকে যে কবি হইতে হইবে—এ কথা তিনি ভুলেন নাই। সময় বা সুযোগ পাইলেই কবিতা বা গীত রচনা করিতেন। যে সকল কবিতা বা গীত তাঁহার ভাল লাগিত, তাহা বন্ধুবান্ধবদিগকে শুনাইতেন; আর যাহা তাঁহার নিজেরই ভাল লাগিত না তাহা তৎক্ষণাৎ ছিঁড়িয়া ফেলিতেন। বস্তুতঃ তৎকাল-রচিত কবিতা বা একখানি গীতও তিনি যত্নে রক্ষা করেন নাই। এ সম্বন্ধে ১৩০৭ সালের পৌষ মাসে মিনার্ভা থিয়েটারে বঙ্গ নাট্যশালার সাম্বৎসরিক উৎসব-সভায় নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় বক্তৃতাকালে বলিয়াছিলেন, “গিরিশবাবু যে সকল কবিতা ও গান বাঁধিয়া নষ্ট করিয়াছিলেন, সেইগুলি যদি আমরা যত্নে রক্ষা করিতাম, তাহা হইলে বহুদিন পূর্ব্বে কবি হইয়া যাইতাম।” গিরিশচন্দ্রের যে দুই-তিনখানি গীত মনে ছিল, তাঁহার মুখে শুনিয়া মৎ-সম্পাদিত ‘গিরিশ-গীতাবলি’তে বহুদিন পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছিলাম। পাঠকগণের জ্ঞাতার্থে নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম:—

(১) গিরিশচন্দ্রের সর্ব্বপ্রথম রচিত গীত:—

সুখ কি সতত হয় প্রণয় হ’লে।
সুখ-অনুগামী দুখ, গোলাপে কণ্টক মিলে॥
শশী প্রেমে কুমুদিনী, প্রমোদিনী উন্মাদিনী,
তথাপি যে একাকিনী, কত নিশি ভাসে জলে॥

(২) সেক্সপীয়রের “Go rose” নামক সনেট (চতুর্দ্দশপদাবলী কবিতা) হইতে নিম্নলিখিত গীতটি রচিত হয়। গিরিশচন্দ্রের স্মরণ না থাকায়, সম্পূর্ণ গীতটী প্রকাশ করিতে পারি নাই।—যারে গোলাপ জেনে আয়, সে কেন আলাপ করে না।

সুন্দরী বিনা সে নারী, অন্য কারে আদরে না॥
যদ্যপি যৌবন ভরে, আমারে সে অনাদরে,
শুকা’য়ে দেখা’য়ো তারে, যৌবন চিরদিন রবে না॥

(৩) স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের ‘দিবা অবসান হেরি’ শীর্ষক গীতের অনুকরণে রচিত।—

ভ্রমর বিষণ্ণ মন, নলিনী মলিনী হেরে।
কুমুদিনী প্রমোদিনী হাসি-হাসি ভাসে নীরে॥
নিশারূপা নিশাচরী, তিমির-বসন পরি,
স্বভাবে ঘেরিল হেরি, আলোক লুকায় ডরে॥
জোনাকী জ্বালিয়ে আলো, আঁধারে পরায় মাল’,
তারকা হীরক সম, ঝকিল গগন ’পরে॥

(৪) নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল বসু মহাশয়ের নিকট গিরিশচন্দ্রের যৌবনকালের রচিত নিম্নলিখিত গীতটী প্রাপ্ত হইয়াছিলাম।—

কথায় যদিও কিছু বলনি কখন।
কখনো কি কোন কথা বলেনি তব নয়ন॥
যে কথা বলেছে আঁখি, ভুলিয়ে গিয়েছ না কি,
ইত্যাদি আছে হৃদয়, শুধালে হবে স্মরণ॥

গিরিশচন্দ্রের মাতৃভাষায় কিরূপ অনুরাগ ছিল, এবং বাঙ্গালা ভাষা যে হৃদয়ের সকল ভাব, সকল উচ্চ চিন্তা প্রকাশ করিতে সক্ষম, তাহা তিনি এই সময় একটী কবিতায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। কবিতাটী বহুকাল পূর্ব্বে রচিত হওয়ায় গিরিশচন্দ্রের স্মরণ ছিল না। তাঁহার মুখে যতটুকু শুনিয়াছিলাম, তাহাই নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :—

দেবভাষা পৃষ্ঠে যার, কিসের অভাব তার,
কোন্ ভাষে বাক্য-ভাবে হেন সংযোজন?
মধুর গুঞ্জরে অলি, বিকাশে কমল-কলি,
কোন্ ভাষে কুঞ্জবনে কোকিল কুহরে?
কালের করাল হাসি, দলকে দামিনী রাশি,
নিবিড় জলদজাল ঢাকে বা অম্বরে?

এই কয়েক ছত্র কবিতা এবং উদ্ধৃত গীতগুলি পাঠেই গিরিশচন্দ্রের কবিত্ব-বিকাশের পরিচয় পাওয়া যায়।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

যৌবনে গিরিশচন্দ্র

গিরিশচন্দ্র নিবিষ্ট মনে ও পরম উৎসাহে কাব্যশাস্ত্র আলোচনা করিতেন সত্য, কিন্তু যৌবনের প্রাক্কালে মাথার উপর অভিভাবক না থাকিলে চরিত্রে যে সকল দোষ ঘটে, গিরিশচন্দ্রে তাহা অনেক পরিমাণে দেখা দিয়াছিল। পানদোষ ঘটিল, সঙ্গে-সঙ্গে স্বেচ্ছাচারিতা, উচ্ছৃঙ্খলতা, হঠকারিতা;—পাড়ায় একটী বওয়াটে দলের সৃষ্টি হইল—গিরিশচন্দ্র তাহার নেতা। ডুবড়িওয়ালা, সাপুড়ের সঙ্গে কখনও বাণ খেলিতেছেন, কখনও অত্যাচারী ভণ্ড সন্ন্যাসীদিগকে দণ্ড দিতেছেন;* আবার কাহারও বাটীতে, লোকাভাবে মৃতের সৎকার হইতেছে না, গিরিশচন্দ্র অগ্রগামী হইয়া আপনার দল লইয়া দাহকার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন। পাড়ায় কোথায় পীড়িত ব্যক্তির লোকাভাবে শুশ্রূষা হইতেছে না, অর্থাভাবে ঔষধ-পথ্য জুটিতেছে না, গিরিশচন্দ্র আপনার দলের ভিতর চাঁদা সংগ্রহ করিয়া ঔষধ-পথ্য দিয়া তাহার সেবা করিতেছেন।† গিরিশচন্দ্রের ভ্রাতা হাইকোর্টের উকীল স্বর্গীয় অতুলকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয় এতদ্প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন—"কিন্তু এ সকল সৎকার্য্য সত্ত্বেও অভিভাবকশূন্য উচ্ছৃঙ্খল যুবককে প্রতিবাসীগণ 'বয়াটে' বলিত অথবা তাঁহাকে appreciate করিতে পারিত না। তাঁহারা মেজদাদার নিকট উপকার পাইলেও তাঁহাকে পছন্দ করিতেন না।"

গিরিশচন্দ্র বরাবরই একগুঁয়ে প্রকৃতির ছিলেন;—যাহা তিনি উচিত বিবেচনা করিতেন, কাহারও কথায় তিনি সঙ্কল্পচ্যুত হইতেন না। সামাজিক ভয় বা দণ্ডে তিনি

* এই সময়ে ভণ্ড সন্ন্যাসীগণ মধ্যাহ্নে যে সময়ে পুরুষেরা অফিসে যাইত, সেই সময়ে গৃহস্থের বাটীতে প্রবেশ করিয়া স্ত্রীলোকদের প্রতি নানারূপ অত্যাচার ও ভয় প্রদর্শন করিয়া অর্থ ও বস্ত্রাদি আদায় করিত। গিরিশচন্দ্র, যাহাতে এই অত্যাচারী ও ভণ্ড সন্ন্যাসীগণের পাড়ায় আসা বন্ধ হয়, তদ্বিষয়ে চেষ্টা করিতেন।

† এই শ্রেণীর বওয়াটে দলের প্রতি তাঁহার আজীবন একটা টান ছিল। তাঁহার 'বলিদান' নাটকে সদ্যবিধবা অসহায়া হিরণ্ময়ীর মুখে ইহার একটু আভাস দিয়াছেন। যথা—হিরণ্ময়ী বলিতেছে:—"আহা, এই গরীব অনাথা (প্রতিবেশিনী)—এ খবর নিতে এসেছে, কিন্তু পাড়ার কেউ উঁকি মারলে না! পাড়ার যাদের বয়াটে বলে, তারা কাঁধে করে সৎকার ক'রতে নিয়ে গেল, কিন্তু পাড়ার ভদ্রলোক কেউ উঁকি মারলে না। কি করবো—কি হবে।" ইত্যাদি। 'বলিদান', ৩য় অঙ্ক, ৫ম গর্ভাঙ্ক।

কদাচ বিচলিত হইতেন না ; যাহা ভাল বুঝিতেন, তাহাই করিতেন। একদিন পল্লীস্থ হীরালাল বসুর পুষ্করিণীতে কোনও একটি ভদ্রলোক ডুবিয়া মারা যায়। তাহার আত্মীয়-স্বজনেরা কেহই ভয়ে পুকুরে নামিয়া লাশ তুলিতে সম্মত হয় না। গিরিশচন্দ্র যখন দেখিলেন, পুলিশ আসিয়া মুদ্দফরাস দ্বারা সেই ভদ্রলোকের লাশ তুলিবার ব্যবস্থা করিতেছে, তখন তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। নিজেই পুকুরে লাফাইয়া পড়িয়া সেই স্ফীত বিকৃত লাশ অতি কষ্টে উপরে তুলিয়া আনিলেন এবং নিজেই উদ্যোগী হইয়া তাঁহার দলবল ডাকিয়া মৃতদেহ হাসপাতালে লইয়া গেলেন এবং পরীক্ষা শেষ হইলে দাহকার্য্য সম্পন্ন করিয়া বাটী ফিরিয়া আসিলেন।

আর-একটী ঘটনা তাঁহার মুখে শুনিয়াছিলাম,—তিনি একদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে গঙ্গা-তীরে ভ্রমণকালীন রসিক নিয়োগীর ঘাটে গঙ্গাযাত্রীদের ঘরে একটি মুমূর্ষুর আর্তনাদ শুনিতে পাইলেন। ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, একটি মুমূর্ষু একা খাটে শুইয়া আছে, আত্মীয়-স্বজন কেহই নিকটে নাই। অনুসন্ধানে জ্ঞাত হইলেন, বৃদ্ধের নিকট আত্মীয় কেহই নাই, যাহারা লইয়া আসিয়াছিল, মৃত্যুর বিলম্ব দেখিয়া তাহারা বাটী চলিয়া গিয়াছে ; এখনও পর্য্যন্ত কেহই ফিরিয়া আসে নাই। গিরিশচন্দ্র দেখিলেন, রোগীর কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া আসিয়াছে, একটু জলের জন্য আর্তনাদ করিতেছে। তাড়াতাড়ি একটু গঙ্গাজল মুমূর্ষুর মুখে দিয়া তিনি দুগ্ধের জন্য অনতিদূরস্থ বাড়ীর দিকে ছুটিলেন। সে সময় আকাশে একখানা ঘনকৃষ্ণ মেঘ উঠিতেছিল—বাড়ীতে আসিতে-আসিতেই ভয়ঙ্কর ঝড়-বৃষ্টি আরম্ভ হইল। বৃষ্টি একটু মন্দীভূত হইবামাত্র গিরিশচন্দ্র দুগ্ধ লইয়া বাটী হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। তখন রাত্রি হইয়াছে, গভীর অন্ধকার, ঘন-ঘন মেঘ গর্জ্জন করিতেছে, থাকিয়া-থাকিয়া বিদ্যুৎ ঝলসিতেছে, পথ জনমানবহীন—গিরিশচন্দ্র গঙ্গাযাত্রীর জন্য দুগ্ধ হস্তে ছুটিলেন। বলা বাহুল্য—সে সময়ে পথে আলোরও বিশেষ ব্যবস্থা ছিল না এবং রাস্তাঘাটে পুলিশ প্রহরীরও তেমন সুব্যবস্থা ছিল না।

দ্বারের নিকট আসিয়া বিদ্যুতালোকে দেখিলেন—দ্বার বন্ধ, একটু ঠেলিলেন, খুলিল না ; ভাবিলেন হয়ত মুমূর্ষুর লোকেরা আসিয়াছে। ডাকিলেন—কেহ উত্তর দিল না। এবার জোর করিয়া দোর ঠেলিতে দ্বার খুলিয়া গেল, সঙ্গে-সঙ্গে একখানি কঠিন শীতল শীর্ণ হস্ত সেই অন্ধকার গৃহ হইতে আসিয়া তাঁহার স্কন্ধের উপর পড়িল। গিরিশচন্দ্র হতবুদ্ধি হইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন, এমন সময়ে বিদ্যুৎ-আলোকে দেখিতে পাইলেন, সেই মুমূর্ষু বিকৃত মুখভঙ্গী করিয়া ঈষৎ বঙ্কিমভাবে দরজায় পিঠ দিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। গিরিশচন্দ্র মুমূর্ষুর হস্ত ধরিয়া তুলিবামাত্র বুঝিলেন, বহুক্ষণ রোগীর মৃত্যু হইয়াছে। বোধহয় বিকারের খেয়ালে খাট হইতে উঠিয়া দরজার কাছে আসিয়াই দণ্ডায়মান অবস্থায় প্রাণত্যাগ করিয়াছে। তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। ছুটিয়া চলিয়া আসিলেন। এরূপ ঘটনা তাঁহার বাস্তব-জীবনে ঘটিলেও তৎপরে বহু মুমূর্ষুর সেবা একাকী করিতে তিনি ভীত হন নাই।

অফিসে প্রবেশ

জামাতার ভাবগতিক দেখিয়া নবীনবাবু গিরিশচন্দ্রকে কর্ম্ম শিখাইবার জন্ত অ্যাট্‌কিন্সন টিলটন কোম্পানীর অফিসে শিক্ষানবীশরূপে বাহির করিলেন। তিনি উক্ত অফিসে বুককিপার ছিলেন, বুককিপারি কাজের তখন বড় আদর। নবীনবাবু গিরিশচন্দ্রের পিতা নীলকমলবাবুর নিকট বুককিপারের কার্য্য শিখিয়াছিলেন।— এক্ষণে শ্বশুর-জামাতা সম্বন্ধ ব্যতীত গুরু-পুত্রের আবার গুরু হইলেন। প্রথম পরিচ্ছেদে লিখিত হইয়াছে, নীলকমলবাবু সে সময়ে একজন সুপ্রসিদ্ধ বুককিপার বলিয়া প্রতিষ্ঠা-লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রবর্ত্তিত 'ডবল এণ্ট্রি অ্যাকাউন্ট সিস্‌টেম' কলিকাতার সকল সওদাগরী অফিসেই প্রচলিত হয়। পিতৃ-কীর্ত্তির অধিকারী হইবার নিমিত্ত গিরিশচন্দ্র বিশেষ উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার প্রতিবেশী দিগম্বর দে একজন খ্যাতনামা বুককিপার ছিলেন। গিরিশচন্দ্র যেরূপ অফিসে কাজকর্ম্ম শিখিতে লাগিলেন, সেইরূপ দিগম্বরবাবুর বাটীতে গিয়া তাঁহার নিকটও যত্নসহকারে বুককিপারের কার্য্য শিক্ষা করিতে লাগিলেন। পিতার গুণ পুত্র লাভ করিয়াছিলেন, উত্তরকালে গিরিশচন্দ্র একজন সুনিপুণ বুককিপার বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ

নাট্য-জীবনের সূত্রপাত

সাধারণ বঙ্গ-নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার ভিত্তি খনন হইতে আরম্ভ করিয়া গিরিশচন্দ্র তাঁহার জীবনের শেষ পর্য্যন্ত—প্রায় অর্দ্ধশতাব্দীকাল—ঐকান্তিক সাধনায় বঙ্গ-রঙ্গভূমিকে নব-নব রূপ ও রসে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যশালিনী করিয়া গিয়াছেন। নাট্যশালার সহিত তাঁহার কর্ম্মজীবন বিশিষ্টরূপ গ্রথিত। এ নিমিত্ত কিরূপে তাঁহার নাট্য-জীবনের সূত্রপাত হইল, তাহা লিখিতে হইলে পূর্ব্ববর্ত্তী নাট্যশালার কতকটা পরিচয় দিতে হয়। পাঠকগণের অবগতির নিমিত্ত বঙ্গ-রঙ্গালয়ের জন্মবৃত্তান্তের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিলাম।—

প্রাচীন ইতিহাস

১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে হেরাসিম লেবেডেফ নামক জনৈক রুসিয়া-নিবাসী পর্য্যটক কলিকাতায় আসিয়া বহুদিন বাস করিয়াছিলেন। গোলকনাথ দাস নামক একজন ভাষাবিদের নিকট তিনি বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করিয়া *The Disguise* এবং *Love is the Best Doctor* নামক দুইখানি ইংরাজী নাটকের বাঙ্গালা অনুবাদ করেন। গোলক বাবুর সাহায্যে তিনি বাঙ্গালী অভিনেতা ও অভিনেত্রী সংগ্রহপূর্ব্বক ১৭৯৫ ও ৯৬ খ্রীষ্টাব্দে, ২৫ নং ডোমতলায় পুরাতন চিনাবাজার মধ্যস্থ একটী গলিতে 'বেঙ্গলী থিয়েটার' নামে একটী রঙ্গালয় নির্ম্মাণ করেন এবং টিকিট বিক্রয় করিয়া দুইরাত্রি *Disguise* নাটকের অভিনয় পর্য্যন্ত করাইয়াছিলেন। ইহাই হইল বঙ্গীয় নাট্যশালার প্রাচীন ইতিহাস।

সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ রায় মহাশয় লেবেডেফের এই বাঙ্গালা থিয়েটারের সংবাদ বাক্‌ল্যাণ্ডের *Dictionary of Indian Biography* হইতে অনুবাদ করিয়া বাঙ্গালা কাগজে প্রথম প্রকাশ করেন। ১৩২৮ সাল, ২২শে জ্যৈষ্ঠ, রবিবার তারিখে 'বাসন্তী' নাম্নী সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রিকায় "পুরাতন প্রসঙ্গ" শীর্ষক প্রবন্ধে "বাঙ্গলার আদি নাট্যকার" বলিয়া এই প্রবন্ধ মুদ্রিত হয়। তৎপরে *Calcutta Review* মাসিকপত্রে পণ্ডিত G. A. Grierson, প্রফেসর শ্রীযুক্ত

শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র ও শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়গণ কর্ত্তৃক লিখিত প্রবন্ধে এতদ্‌সম্বন্ধে আরও অধিক আলোচিত হয়। সম্প্রতি সুসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়দ্বয় যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়া লেবেডেফের থিয়েটারের বহু তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন।

যাহা হউক বঙ্গ-রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার মূল ইংরাজ। ইংরাজী থিয়েটার দেখিয়াই বাঙ্গালীরা রঙ্গমঞ্চ নির্ম্মাণ করিয়া দৃশ্যপটাদি সংযোগে থিয়েটার করিতে শিখেন। 'মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন-চরিত'-লেখক সুপ্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বলেন, ইংরাজেরা প্রথমে 'চৌরাঙ্গী থিয়েটার' নামক একটী থিয়েটার স্থাপন করেন। ৺দ্বারকানাথ ঠাকুরের ন্যায় দুই-একজন সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালীর কদাচ-কখন গমন ব্যতীত সাধারণ বাঙ্গালী দর্শক তথায় যাইতেন না। ক্রমশঃ ইংরাজের রাজ্যবৃদ্ধি এবং তৎসঙ্গে বহুসংখ্যক ইংরাজের এদেশে আগমনে তাঁহাদের নাট্যশালারও সংখ্যা এবং শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়। ইংরাজদের 'সাঁ-সুঁছি' (Sans Soucci) নামক থিয়েটারটী সে সময় সর্ব্বাপেক্ষা প্রতিপত্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। সাধারণ বাঙ্গালীরা এ সকল থিয়েটারে না যাইলেও অনেক গণ্যমান্য বাঙ্গালী যাইতেন। এতাবৎ তাঁহারা যাত্রা, পাঁচালি, কবির লড়াই প্রভৃতি লইয়াই আমোদ উপভোগ করিয়া আসিয়াছেন, অভিনয়ের সঙ্গে-সঙ্গে দৃশ্যপট পরিবর্ত্তন কখনও দেখেন নাই। ইংরাজী থিয়েটারের এই নূতনত্ব দর্শন করিয়া দেশীয় নাটকের শ্রীবৃদ্ধিসাধনে অনেকে উৎসাহিত হইয়া উঠেন।

১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা, শ্যামবাজার-নিবাসী নবীনচন্দ্র বসু নামক জনৈক ধনাঢ্য ব্যক্তি বিস্তর অর্থব্যয়ে তাঁহার বাটীতে কবিবর ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের 'বিদ্যাসুন্দর কাব্য' নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত করাইয়া অভিনয় আয়োজন করেন। তৎকালীন ইংরাজী থিয়েটার বা আধুনিক নাট্যশালার ন্যায় অঙ্কিত দৃশ্যপটাদি ব্যবহৃত না হইলেও এই অভিনয়ে বিশেষ নূতনত্ব ছিল। নাট্যোল্লিখিত দৃশ্যগুলি সেই বৃহৎ ভবনে নানা স্থানে সজ্জিত হইয়াছিল। একস্থানে—বীরসিংহ রায়ের রাজসভা; একস্থানে—সুন্দরের বসিবার জন্য বকুলতলা; একস্থানে—মালিনীর গৃহ; বাটীর শেষ ভাগে মশান,—এইরূপ সজ্জিত হইত এবং প্রত্যেক দৃশ্যের সম্মুখে আসনের ব্যবস্থা থাকিত। দৃশ্য পরিবর্ত্তনের সঙ্গে-সঙ্গে দর্শকগণকেও অন্য দৃশ্যের সম্মুখস্থ আসনে গিয়া উপবেশন করিতে হইত। এই অভিনয়ে স্ত্রী-চরিত্রের ভূমিকাগুলি বারাঙ্গনা কর্ত্তৃক অভিনীত হইয়াছিল। এই অপূর্ব্ব অভিনয় দর্শনে সাধারণে মুগ্ধ হইলেও ইংরাজী-শিক্ষিত নব্য সম্প্রদায় বিদ্যাসুন্দরের অশ্লীলতা এবং বেশ্যা লইয়া অভিনয় সম্বন্ধে সংবাদপত্রে আন্দোলন করেন।

পর বৎসর ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে ৺প্রসন্নকুমার ঠাকুর তৎকালীন সংস্কৃত কলেজের প্রফেসর উইলসন সাহেব কর্ত্তৃক 'উত্তররামচরিত' নাটকের ইংরাজী অনুবাদ—তাঁহার শুঁড়োর বাগানে অভিনয় করান। স্বয়ং উইলসন সাহেবের শিক্ষকতায় সংস্কৃত ও হিন্দু কলেজের ছাত্রগণ ইহাতে অভিনয় করিয়াছিলেন।

ক্রমে বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের মধ্যে ইংরাজী অভিনয় সংক্রামিত হইয়া উঠিয়াছিল। কলিকাতায় সেই সময় হিন্দু কলেজ ও ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী—এই দুইটী বিদ্যালয়ই

বিখ্যাত ছিল। কাপ্তেন রিচার্ডসন সাহেব হিন্দু কলেজে এবং হারমান্ জেফ্রয় নামক জনৈক ফরাসী ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীতে সে সময়ে প্রধান শিক্ষক ছিলেন, ইঁহারা উভয়েই নাট্যকলাবিদ্ ছিলেন। ইঁহাদেরই উৎসাহ ও যত্নে ছাত্রগণের হৃদয়ে অভিনয়ানুরাগ সঞ্চারিত হইতে থাকে।

ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীতে ছাত্রগণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'ওরিয়েণ্টাল থিয়েটারে'র আদর্শে কয়েক বৎসর ধরিয়া নানাস্থানে ইংরাজীতে সেক্সপীয়রের নাটকগুলি অভিনীত হইতে লাগিল। কিন্তু ইংরাজী ভাষায় অভিনয় হওয়ায় জনসাধারণ নাটকীয় রসাস্বাদনে বঞ্চিত হইত। অভিনয়োপযোগী যে সময় বাঙ্গালা নাটকও ছিল না। 'বিল্বমঙ্গল' ও 'ভদ্রার্জ্জুন' নামক দুই-একখানি নাটক ছিল, তাহাতে আবার দৃশ্য-বিভাগ বা প্রবেশ-প্রস্থানও লিখিত ছিল না, ভাষাও মার্জ্জিত নহে। পাশ্চাত্য নাটকসমূহের রসাস্বাদ করিয়া শিক্ষিতগণের তাহাতে তৃপ্তি না হওয়ায় কলিকাতায় অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি নিজ-নিজ গৃহে ইংরাজী নাটকের অভিনয় করাইতে লাগিলেন।

শুভক্ষণে সুবিখ্যাত নাট্যকার পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ন মহাশয় 'কুলীনকুলসর্ব্বস্ব' নামক একখানি নাটক রচনা করিয়াছিলেন, সাধারণের নিকট এই নাটকখানি অতিশয় সমাদৃত হইয়াছিল। যে মহান উদ্দেশ্যে এই নাটকখানি বিরচিত হয়, তাহার ইতিহাস এইরূপ :—

রঙ্গপুর জেলায় কুণ্ডীগ্রামের জমীদার দেশহিতৈষী, সহৃদয় কালীচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয় তৎকালীন কৌলীন্য ও বহুবিবাহ-প্রথায় বঙ্গ-সমাজের দিন-দিন অধঃপতন দর্শনে বিশেষরূপ ব্যথিত ও চিন্তাকুল হন। তিনি দেশের এই অনিষ্টকারিতা সাধারণের মর্ম্মে-মর্ম্মে উপলব্ধির নিমিত্ত একটী কৌশল অবলম্বন করেন। কালীবাবু 'রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ' সংবাদপত্রে নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেন :—

"বিজ্ঞাপন।

৫০, পঞ্চাশ টাকা পারিতোষিক।

এই বিজ্ঞাপন দ্বারা সর্ব্বসাধারণ কৃতবিদ্য মহোদয়গণকে বিজ্ঞাত করা যাইতেছে, যিনি সুললিত গৌড়ীয় ভাষায় ছয় মাস মধ্যে 'কুলীনকুলসর্ব্বস্ব' নামক একখানি মনোহর নাটক রচনা করিয়া রচকগণ মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্টতা দর্শাইতে পারিবেন, তাঁহাকে সঙ্কল্পিত ৫০, পঞ্চাশ টাকা পারিতোষিক প্রদান করা যাইবেক।

রঙ্গপুর পং কুণ্ডী শ্রীকালীচন্দ্র রায়চৌধুরী—কুণ্ডী পং জমীদার।

বঙ্গাব্দ ১২৬০ সাল তারিখ ৬ কার্ত্তিক।"

পণ্ডিতবর রামনারায়ণ তর্করত্ন মহাশয়ই সগৌরবে এই পারিতোষিক লাভ করিয়াছিলেন।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা পাথুরিয়াঘাটা, চড়কডাঙ্গায় জয়রাম বসাকের বাটীতে উক্ত নাটকের প্রথমাভিনয় হয়। অভিনয় সর্ব্বসাধারণের এরূপ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল যে, ধনাঢ্য ও গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ তাঁহাদের ভবনে ইংরাজী নাটকাভিনয়ের পরিবর্ত্তে বাঙ্গালা নাটকাভিনয়ে উৎসাহিত হইয়া উঠেন।

উক্ত বৎসর হইতে আরম্ভ করিয়া ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কলিকাতায় বহু ধনাঢ্য-ভবনে বাঙ্গালা নাটকের অভিনয় হইয়াছিল। তন্মধ্যে বিশেষরূপ উল্লেখযোগ্য— (১) সিমলায় ছাতুবাবুর বাটীতে 'শকুন্তলা' অভিনয়, (২) মহাভারত-অনুবাদক কালীপ্রসন্ন সিংহের বাটীতে 'বেণীসংহার' অভিনয়, (৩) পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপ-নারায়ণ সিংহ ও ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের বেলগেছিয়া উদ্যান-ভবনে 'রত্নাবলী' ও 'শর্ম্মিষ্ঠা'র অভিনয়, (৪) সিন্দুরিয়াপটীর ৺গোপাললাল মল্লিকের বাটীতে আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেনের উদ্যোগে 'বিধবাবিবাহ' অভিনয়, (৫) মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের পাথুরিয়াঘাটা রাজবাড়ীতে 'মালবিকাগ্নিমিত্র', 'বিদ্যাসুন্দর', 'মালতীমাধব', 'রুক্মিণী-হরণ', 'বুঝলে কিনা?' প্রভৃতি, (৬) জোড়াসাঁকো ৺দ্বারকানাথ ঠাকুরের বাটীতে 'নব-নাটক', (৭) শোভাবাজার রাজবাড়ীতে 'কৃষ্ণকুমারী', (৮) বটতলার জয় মিত্রের পুত্র পাঁচকড়ি মিত্রের উদ্যোগে তাঁহাদের অপার চীৎপুর রোডস্থ পুরাতন বাড়ীতে 'পদ্মাবতী', (৯) কয়লাহাটায় (রতন সরকার গার্ডেন ষ্ট্রীট) শ্যামলাল ঠাকুরের দৌহিত্র হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে 'কিছু কিছু বুঝি'।

সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত স্বর্গীয় মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয়, নাট্যাচার্য্য কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ও বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি প্রবীণ নাট্যকলাবিদ্‌গণের সাহায্যে তৎসম্পাদিত 'অনুশীলন' নামক মাসিকপত্রে, শ্যামবাজারের নবীন বসুর বাটীতে 'বিদ্যাসুন্দরে'র অভিনয় হইতে আরম্ভ করিয়া কলিকাতার ধনাঢ্য-ভবনে অভিনয়ের ইতিবৃত্ত বিস্তৃতভাবে প্রকাশ করেন।

উল্লিখিত ধনাঢ্য ব্যক্তিগণের ভবনে নাটকাভিনয়ে দৃশ্যপট এবং পোষাক-পরিচ্ছদ বহু ব্যয়েই প্রস্তুত হইত এবং শিক্ষিত অভিনেতারও অভাব হইত না। সুতরাং তাঁহাদের অভিনয় দেখিবার জন্য সাধারণের যে বিশেষ আগ্রহ জন্মিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? কিন্তু বড়লোকের বাটীতে সখের থিয়েটার—অধিক জনতায় পাছে অভিনয়ের ব্যাঘাত ঘটে, এ নিমিত্ত স্থানোপযোগী নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক ফ্রি টিকিট বিতরিত হইত—তাহার অধিকাংশই তাঁহাদের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব—এবং উচ্চপদস্থ মান্য-গণ্য ব্যক্তিদের দিতেই ব্যয়িত হইত; সুতরাং নাট্যামোদী গৃহস্থ ভদ্রলোকের অভিনয় দর্শনের নিমিত্ত টিকিট সংগ্রহের চেষ্টা প্রায়ই ব্যর্থ হইত। আত্মসম্ভ্রম-জ্ঞানহীন কোনও ব্যক্তি বিনা টিকিটে রঙ্গভবনে প্রবেশের চেষ্টা করিলে, দ্বারবান কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত হইয়া বহিষ্কৃত হইত।

গিরিশচন্দ্র গল্প করিতেন, পাথুরিয়াঘাটায় ঠাকুরবাড়ীতে থিয়েটার দেখিবার এক-

খানি টিকিট সংগ্রহ করিয়া আমাদের বস্তুপাড়ার একটী ভদ্রলোক, সগৌরবে সেই টিকিটখানি প্রত্যেক লোককে দেখাইয়া বেড়াইতেন এবং কিরূপ বুদ্ধি-কৌশলে — কিরূপ যোগাড়-যন্ত্র করিয়া তিনি টিকিটখানি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহার গল্প করিয়া পল্লীবাসিগণকে অবাক করিয়া দিতেন।

যুবক গিরিশচন্দ্রের মনে ঐ প্রকারে অভিনয় দর্শন করিবার পরিবর্ত্তে, এইরূপ যদি একটী থিয়েটার করিতে পারেন, সেই বাসনাই প্রবল হইয়াছিল। কিন্তু মধ্যবিত্ত গৃহস্থের সন্তান — এত অর্থ কোথায় পাইবেন ? মনের আশা মনেই থাকিত। কিছুদিন পরে তাঁহার সেই ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিবার সুযোগ উপস্থিত হইল। তাঁহার প্রতিবাসী স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নিজ বাটীতে একটী কনসার্টের দল বসাইয়াছিলেন। গিরিশবাবু মধ্যে-মধ্যে তথায় যাইতেন। সেই সময় কলিকাতায় যেমন স্থানে-স্থানে থিয়েটার হইতেছিল, সেইরূপ আবার স্থানে-স্থানে সখের যাত্রাও হইতেছিল। থিয়েটার অপেক্ষা যাত্রার খরচ অনেক কম পড়িত। গিরিশবাবু, নগেন্দ্রবাবু, ধর্ম্মদাস সুর, রাধামাধব কর প্রভৃতি বন্ধুগণ মিলিত হইয়া ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে বাগবাজারে একটী সখের যাত্রাসম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত করেন। মাইকেলের 'শর্ম্মিষ্ঠা' নাটক অভিনয়ার্থে মনোনীত হয়। যাত্রার উপযোগী কতকগুলি গীত রচনার আবশ্যক হওয়ায়, সকলে তৎসাময়িক প্রসিদ্ধ গীত-রচয়িতা বাবু প্রিয়মাধব বসু মল্লিকের নিকট গমন করেন, কিন্তু বহুবার যাতায়াতের পর তাঁহার নিকট একখানিও গীত না পাওয়ায় গিরিশবাবু বিরক্ত হইয়া তাঁহার সমবয়স্ক উমেশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়কে বলেন, "এত কষ্ট কেন ? আয়, আমরা দু'জনে যেমন পারি, গান বাঁধি।" উভয়ে উৎসাহের সহিত উক্ত যাত্রার গান রচনা করিলেন। গিরিশবাবু — যিনি আজ শ্রেষ্ঠ গীত-রচয়িতা বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাঁহার রচিত গীত এইসময় সাধারণের নিকট প্রথম পরিচিত হইল। আমরা গিরিশবাবুর ঐ সময়ের রচিত দুইখানি গীত সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি, নিম্নে তাহা প্রকাশিত হইল।

১। দেবযানীকে কূপ হইতে উদ্ধার করিয়া যযাতি —

(সখি 'ধর ধর' সুরে গেয়)

আহা ! মরি ! মরি !
অনুপমা ছবি, মায়া কি মানবী,
ছলনা বুঝি করে বনদেবী !
রঞ্জিত রোদনে বদন অমল,
নয়ন-কমলে নীর ঢল-ঢল,
নিতম্ব-চুম্বিত, বেণী আলোড়িত,
বিমোহিত চিত হেরি মাধুরী ॥
জনহীন হেন গহন কাননে,
এ কূপ ভীষণে, পড়িল কেমনে,

কি ভাবে ভামিনী, ত্যজিয়া ভবনে,
আসিয়াছে এই স্থানে, —
দারুণ কঠিন এর পরিজন,
তাই একাকিনী রমণী রতন
কেবা এ কামিনী, কেন অনাথিনী,
পাগলিনী বুঝি প্রিয় পরিহরি ॥

২। সখীর প্রতি শর্ম্মিষ্ঠার উক্তি —

অতুল রূপ হেরিয়ে।
বিমুগ্ধ মন, নিয়ত সে ধন, সাধন করি সই —
সে বিনা দহে হিয়ে ॥
চিত্ত-মোহন, বিনোদ-বদন, আর কি কভু পাব দরশন,
মধুর বচন, করিব শ্রবণ,
পরশে পূরাব সাধ —
সরস হাসি বিমল-অধরে, অনুপম আঁখি মানস হরে,
কেন রতনে না রাখিনু ধ'রে, লুকাল মন হরিয়ে ॥

দশম পরিচ্ছেদ

'সধবার একাদশী'র অভিনয়

প্রায় বৎসরাবধিকাল বাগবাজারে মাঝে-মাঝে 'শর্ম্মিষ্ঠা'র অভিনয় হইত। গিরিশচন্দ্র যে আশা এতকাল ধরিয়া হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিতেছিলেন, তাহা এক্ষণে ফলবতী হইবার উপায় হইল। তিনি নগেন্দ্রবাবুর সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন, এই ত যাত্রায় বেশ সুখ্যাতি লাভ করা গেল, এস না একটা থিয়েটারের দল বসান যাক্। নগেন্দ্রবাবু বলিলেন, "দৃশ্যপট ও পোষাক-পরিচ্ছদে বিস্তর খরচ পড়িবে, সে টাকা কি আমরা সঙ্কুলান করিতে পারিব?" নানা নাটকাভিনয়ের কথা উত্থাপিত হইল, কিন্তু পোষাক-পরিচ্ছদের বাহুল্য বুঝিয়া তাহা পরিত্যক্ত হইতে লাগিল। বহু চিন্তার পর গিরিশবাবু দীনবন্ধুবাবুর 'সধবার একাদশী' অভিনয়ের প্রস্তাব করিলেন। সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের সেই সময়ে নূতন নাটক 'সধবার একাদশী' বাহির হইয়াছে। সাহিত্যক্ষেত্রে এই নূতন নাটক লইয়া মহা আন্দোলন চলিতেছে, নব্য সম্প্রদায় মহা আগ্রহে নিমে দত্তের ইংরাজী আওড়াইতেছেন। পোষাক-পরিচ্ছদের হাঙ্গামা নাই। ভদ্রলোকের ন্যায় কাপড়, জামা, চাদর পরিয়া অভিনয় চলিতে পারে। বাকি দৃশ্যপট—সকলে মিলিয়া সেটা কি আর খাড়া করিতে পারিবে না!

নগেন্দ্রবাবু প্রভৃতি সকলেই গিরিশচন্দ্রের এই প্রস্তাব সমীচীনবোধে আনন্দ-সহকারে গ্রহণ করিলেন এবং পরমোৎসাহে 'সধবার একাদশী'র মহলা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। আজ আমোদের জন্য বাগবাজারের এই যুবকগণ মিলিয়া যে নাট্যবীজ বপন করিতে অগ্রসর হইলেন, তাঁহারা স্বপ্নেও ভাবেন নাই, এই বীজ অঙ্কুরিত হইয়া ক্ষুদ্র তরু হইতে ক্রমে বিরাট মহীরুহরূপে পরিণত হইয়া ইহার শাখাপল্লব বঙ্গ-দেশ ছাড়াইয়া সমস্ত ভারতবর্ষে একদিন বিস্তৃত হইয়া পড়িবে। বস্তুতঃ দীনবন্ধুবাবুর নাটকই সাধারণ নাট্যশালা সংস্থাপনের ভিত্তি সূচিত করিল। গিরিশবাবু তাঁহার 'শাস্তি কি শান্তি' নামক নাটক দীনবন্ধুবাবুর নামে উৎসর্গ করেন। উৎসর্গপত্রের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি:—

"যে সময়ে 'সধবার একাদশী'র অভিনয় হয়, সে সময় ধনাঢ্য ব্যক্তির সাহায্য ব্যতীত নাটকাভিনয় করা একপ্রকার অসম্ভব হইত; কারণ পরিচ্ছদ প্রভৃতিতে যেরূপ বিপুল ব্যয় হইত, তাহা নির্ব্বাহ করা সাধারণের সাধ্যাতীত ছিল। কিন্তু আপনার

সমাজচিত্র 'সধবার একাদশী'তে অর্থব্যয়ের প্রয়োজন হয় নাই। সেইজন্য সম্পত্তিহীন যুবকবৃন্দ মিলিয়া 'সধবার একাদশী' অভিনয় করিতে সক্ষম হয়। মহাশয়ের নাটক যদি না থাকিত, এই সকল যুবক মিলিয়া 'ন্যাশান্যাল থিয়েটার' স্থাপন করিতে সাহস করিত না। সেই নিমিত্ত আপনাকে রঙ্গালয়-স্রষ্টা বলিয়া নমস্কার করি।"

বাগবাজারের সখের 'শর্ম্মিষ্ঠা' যাত্রাসম্প্রদায় হইতেই অভিনেতৃগণ নির্ব্বাচিত হইল। বাগবাজার মুখুজ্যেপাড়ায় হরলাল মিত্রের লেনে, নাট্যামোদী অরুণচন্দ্র হালদারের বাটীতে মহলা (রিহারস্যাল) বসিল। গিরিশবাবু সে সময়ে জন অ্যাট্‌কিন্সন কোম্পানী অফিসে সহকারী বুককিপারের কার্য্য করিতেন এবং গৃহে নানা গ্রন্থ অধ্যয়ন ও ইংরাজী কবিতার অনুবাদ ইত্যাদিতে ব্যাপৃত থাকিতেন। সম্প্রতি 'শর্ম্মিষ্ঠা' যাত্রার গান বাঁধিয়া কবি বলিয়াও কিঞ্চিৎ সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। সম্প্রদায়স্থ যুবকগণের মধ্যে ইনি বয়োজ্যেষ্ঠ এবং বিদ্বান বলিয়া পরিচিত ছিলেন, এই নিমিত্ত 'সধবার একাদশী' সম্প্রদায়ের শিক্ষক ও নেতার পদ গিরিশচন্দ্রের উপর অর্পিত হইল। নাট্যকলার চরমোৎকর্ষসাধনের নিমিত্ত রাজটীকা কপালে দিয়া যে নাট্য-সম্রাটকে বিধাতা বঙ্গে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, এই তাঁহার প্রথম আচার্য্যের আসন-গ্রহণ। গিরিশচন্দ্র বোধহয় তখন জানিতেন না, এই আসনের মর্য্যাদা তাঁহাকে আজীবন রক্ষা করিতে হইবে।

সে সময়ে প্রত্যেক নাটকেই প্রায় নট-নটী লইয়া একটী প্রস্তাবনা থাকিত, কিন্তু 'সধবার একাদশী'তে তাহা না থাকায় তখনকার প্রথামত গিরিশবাবু নট-নটী লইয়া একটী প্রস্তাবনা এবং আবশ্যকবোধে কয়েকটী গানও রচনা করিয়া দেন। এই গীতগুলি তৎকাল-প্রচলিত প্রসিদ্ধ-প্রসিদ্ধ হিন্দি গানের অবিকল ছন্দ বজায় রাখিয়া রচিত হইয়াছিল। কারণ, সে সময়ে নূতন গানে সুরসংযোগের সুবিধা ছিল না। ঐ সকল আদর্শ হিন্দী গানের সহিত গিরিশচন্দ্র-রচিত গীতগুলির তুলনা করিলে, তাঁহার ছন্দ-বোধ ও রচনাদক্ষতার প্রভূত পরিচয় পাওয়া যায়। যে কয়েকখানি গীত সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলাম, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

১ম গীত। *

কাল কোকিল তানে প্রাণে হানে শর,
প্রেমে আকুল ধাইল কত মধুকর।
ঢলে টলে রসে, ভ্রমে চুমে কুসুম-অধর॥
অনিল চঞ্চল ধীরে বহিল,
লুটিল পরিমল দিক মোহিল,
বিপিন নবীন মুঞ্জরিল,
চিত মোহিত হেরি শোভা—বিরহিণী জর-জর॥

* এই গীতটী উত্তরকালে রচয়িতা তাঁহার 'ভ্রান্তি' নাটকে সংযোজিত করেন।

২য় গীত।

নকুলেশ্বরের উক্তি :—

(মদিরা) তোমায় সঁপেছি প্রাণমন।
মাতাল-মোহিনী, অশেষ রঙ্গিনী,
তরঙ্গিণী বিবিধ বরণ ॥
হ'লে প্রবীণা, হও নবীনা,
তোমার ততই বাড়েলো যৌবন ॥
মরি কি মাধুরী, জান না চাতুরী,
সম সবে কর বিনোদন ॥

৩য় গীত।

কুমুদিনীর উক্তি :—

এই কিরে কপালে ছিল।
কেঁদে-কেঁদে দিন বহিল ॥
করি যার উপাসনা, সেই করে প্রতারণা,
নারী হ'য়ে কি লাঞ্ছনা, বিধি বাদ সাধিল ॥
বসন-ভূষণ-ধন, সব হ'ল অকারণ,
দিয়ে সুখ বিসর্জ্জন, পোড়া প্রাণ রহিল ॥

৪র্থ গীত।

বল ওলো বিনোদিনি, ভুলিয়েছিলে কেমনে ?
এস এস প্রাণধন, ব'স লো হৃদি-আসনে।
বলিলে মিলন যবে, পুন ত্বরা দেখা হবে,
অদর্শনে কেন তবে, বেদনা দিলে হে মনে ॥

৫ম গীত।

ভ্রমে মধুপগণে—
লোটে ফুল-মধু প্রমোদ-বনে।
পুলকিত চিত গীত গায় পিকবরে,
শ্রবণরঞ্জন স্বরে রে—
মন হরে তরু মুঞ্জুরে রে—
চমকে প্রাণ মলয় পবনে ॥

৬ষ্ঠ গীত।

(সরিমিঞার টপ্পার সুর, অবিকল বজায় রাখিয়া রচিত)

শুন হে মদন, করি হে বারণ।
অবলা বধিতে শর করো না সংযোজন ॥
কোমলপ্রাণা ললনা,—
তারে দেহ বেদনা হে এ কেমন ॥

এই 'সধবার একাদশী' সম্প্রদায়ের নাম হইয়াছিল—"The Baghbazar Amateur Theatre". সম্প্রদায় নবোৎসাহে যে সময়ে অভিনয় খুলিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন, সেই সময়ে নটকুলশেখর অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী মহাশয় আসিয়া যোগদান করেন। "বঙ্গীয় নাট্যশালার নটচূড়ামণি স্বর্গীয় অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী" প্রবন্ধে গিরিশচন্দ্র লিখিয়াছিলেন,—"যখন বাগবাজারে 'সধবার একাদশী' থিয়েটার সম্প্রদায়ের আকড়া বসে, তখন উক্ত সম্প্রদায়ের উৎসাহী প্রসিদ্ধ অভিনেতা স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন যে তিনি কয়লাহাটায় 'কিছু কিছু বুঝি' প্রহসনের অভিনয় দেখিতে গিয়া একজন অত্যুৎকৃষ্ট অভিনেতা দেখিয়াছেন, অভিনেতা বাগবাজারেই থাকে। আমার বিশেষ আগ্রহে নগেন্দ্রনাথ অভিনেতাটীকে আনেন। দেখিলাম—আমার পূর্ব্ব-পরিচিত অর্দ্ধেন্দুশেখর।" পাথুরিয়াঘাটা রাজবাটীতে মহারাজ যতীন্দ্র-মোহন ঠাকুর-প্রণীত 'বুঝলে কিনা ?' নামক একখানি প্রহসন অভিনীত হইয়াছিল, তাহার উত্তরস্বরূপ 'কিছু কিছু বুঝি' নামক একখানি প্রহসন কয়লাহাটায় অভিনীত হয়। এই প্রহসনের একটী ভূমিকায় রাজবাটীর কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির উপর বিশেষরূপ কটাক্ষ ছিল। অর্দ্ধেন্দুবাবু সেই ভূমিকাটীই রাজবাটীর প্রতিপক্ষ সম্প্রদায়ে যোগ দিয়া জীবন্তভাবে অভিনয় করিয়া সাধারণের নিকট যেরূপ প্রশংসালাভ করেন, রাজবাটীতে সেইরূপ বিরক্তিভাজন হন। অর্দ্ধেন্দুবাবু মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের মাতুলপুত্র ছিলেন এবং রাজবাটীতে পিতৃষসার নিকট থাকিয়া তিনি লেখাপড়া করিতেন। এই অভিনয় করিয়া তিনি রাজবাটী পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। যাহা হউক তথা হইতে বাগবাজারের পিতৃভবনে আসিয়া 'সধবার একাদশী' সম্প্রদায়ে যোগদান করেন।

গিরিশচন্দ্র অফিসে চাকরি করিতেন, এজন্য অন্য সময়ে অবসর হইত না, তিনি সন্ধ্যার পর আখড়ায় যাইয়া শিক্ষা দিতেন। অর্দ্ধেন্দুবাবুর কোনও কাজকর্ম্ম ছিল না, এজন্য তিনি সকল সময়েই আখড়া-বাটীতে থাকিতে পারিতেন এবং দিবসে যাহাকে পাইতেন, তাহাকেই শিক্ষা দিয়া গিরিশবাবুর সাহায্য করিতেন। ছোট-ছোট পার্টগুলি তিনি বেশ উজ্জ্বল করিয়া দিয়াছিলেন। গিরিশবাবু ও নগেন্দ্রবাবুর অনুরোধে অর্দ্ধেন্দুবাবু কেনারামের ভূমিকা গ্রহণ করেন। অরুণচন্দ্র হালদার মহাশয় এই ভূমিকার রিহারস্যাল দিয়াছিলেন, তিনি ইচ্ছা করিয়াই এই ভূমিকা অর্দ্ধেন্দুবাবুকে ছাড়িয়া দেন।

১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে ৺শারদীয়া পূজার রাত্রিতে বাগবাজার মুখুজ্যেপাড়ায় ৺প্রাণকৃষ্ণ হালদারের বাড়ীতে 'সধবার একাদশী'র প্রথম অভিনয় হয়। গিরিশবাবু

নিমচাঁদের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া রঙ্গমঞ্চে এই প্রথম অবতীর্ণ হইলেন। নিমচাঁদের ভূমিকা অভিনয় করিতে হইলে, নানাবিধ ইংরাজী কাব্য আবৃত্তি করার অভ্যাস থাকা আবশ্যক, এই নিমিত্ত উক্ত ভূমিকার অভিনয়, সাধারণ অভিনেতার দ্বারা অসম্ভব, এইরূপ সকলের ধারণা ছিল। কিন্তু রঙ্গমঞ্চে গিরিশচন্দ্রের মুখে উক্ত উদ্ধৃত ইংরাজী কাব্যের আবৃত্তি শুনিয়া দর্শকবৃন্দ যেরূপ আনন্দলাভ করিয়াছিলেন, তদধিক বিস্মিত হইয়াছিলেন। 'সধবার একাদশী' নাটকের প্রথমাভিনয় রজনীর অভিনেতৃগণের নাম :—

নিমচাঁদ	গিরিশচন্দ্র ঘোষ।
অটল	নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
কেনারাম	অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী।
রামমাণিক্য	রাধামাধব কর।
কুমুদিনী	অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেলবাবু)।
জীবনচন্দ্র	ঈশানচন্দ্র নিয়োগী।
সৌদামিনী	মহেন্দ্রনাথ দাস।
কাঞ্চন	নন্দলাল ঘোষ।
নকুড়	মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
নটী	নগেন্দ্রনাথ পাল।

প্রায় সপ্তাহ পরে কোজাগর লক্ষ্মীপূজায় শ্যামপুকুরস্থ ৺নবীনচন্দ্র দেবের বাটীতে (গিরিশচন্দ্রের শ্বশুরালয়ে) 'সধবার একাদশী'র দ্বিতীয়াভিনয় হয়। তৃতীয় অভিনয় গড়পারে জগন্নাথ দত্তের ভবনে এবং চতুর্থাভিনয় দেওয়ান ৺রায় রামপ্রসাদ মিত্র বাহাদুরের শ্যামবাজার-বাটীতে হয়। এই অভিনয় সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই দিনে বিশেষ কোনও কারণে, অর্দ্ধেন্দুবাবু জীবনচন্দ্রের এবং অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কেনারামের ভূমিকাভিনয় করেন। রঙ্গমঞ্চের মুখপটের উপর লিখিত হইয়াছিল, "He holds the mirror up to nature." স্বয়ং গ্রন্থকর্ত্তা দীনবন্ধুবাবু ও তাঁহার বন্ধুবর্গ, শোভাবাজারের বিজু বাহাদুর, কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল অফিসের ভাইস-চেয়ারম্যান গোপাললাল মিত্র, সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার দুর্গাদাস কর প্রভৃতি গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন। অভিনয়ান্তে দীনবন্ধুবাবু, গিরিশচন্দ্রের অভিনয়-প্রতিভা দর্শনে এরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, গিরিশবাবুকে বলেন, "তুমি না থাকিলে এ নাটক অভিনয় হইত না। নিমচাঁদ যেন তোমার জন্যই লেখা হইয়াছিল।" অর্দ্ধেন্দুবাবুকে বলেন—"জীবনের অটলকে লাথি মারিয়া যাওয়া (১ম অঙ্ক, ২য় দৃশ্য) improvement on the author." বিজু বাহাদুর, গোপালবাবু ও দুর্গাদাসবাবু একবাক্যে নিমচাঁদের প্রশংসা করেন। গিরিশচন্দ্রের নিমচাঁদ অননুকরণীয় ও অতুলনীয়। গিরিশবাবুর স্বর্গারোহণের পরদিন 'বেঙ্গলী' সংবাদপত্রে লিখিত হইয়াছিল—"About forty-five years ago Girishchandra appeared in the inimitable role of Nimchand in Dinobandhu's "Sadhabar Ekadasi" and when he awoke the next morning he found himself an actor."

চতুর্থাভিনয় রজনীতে আর-একটী প্রতিভাশালী যুবা এই নাট্যামোদ উপভোগ করিয়াছিলেন,—তিনি পরে অসামান্য পাণ্ডিত্য-গুণে হাইকোর্টের বিচারকের আসনে উপবিষ্ট হইয়া অসাধারণ প্রতিভা দেখাইয়া দেশবিখ্যাত হইয়াছিলেন।—এই স্বনামধন্য স্বর্গীয় সারদাচরণ মিত্র মহাশয় উক্ত দিবস অভিনয় দর্শনে কিরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলেন, তাহা ১৩২১ সাল, অগ্রহায়ণ মাসের 'বঙ্গদর্শনে' তল্লিখিত "দীনবন্ধু মিত্র" শীর্ষক প্রবন্ধে যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, তাহা পাঠকগণের বিদিতার্থে উদ্ধৃত করিলাম :—

"১৮৭০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে সরস্বতী পূজার রাত্রে কলিকাতার শ্যামবাজারের রায় রামপ্রসাদ মিত্র বাহাদুরের বাটীতে আমি 'সধবার একাদশী'র অভিনয় প্রথম দেখি। সেই দিন আমাদের এম, এ, পরীক্ষা শেষ হইয়াছিল। নিদ্রাদেবীর আরাধনা ত্যাগ করিয়া আমি রামবাবুর বাটীতে অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলাম। বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষ বাঙ্গলার নব্য ধরণের নাটকের সৃষ্টিকর্ত্তা;—সেদিন কবিবর গিরিশ স্বয়ং নিমচাঁদ। 'সধবার একাদশী' পূর্ব্বে পড়িয়াছিলাম, কিন্তু সেদিনের অভিনয় দেখিয়া, বিশেষতঃ নিমচাঁদের অভিনয় দেখিয়া আমি আনন্দে আপ্লুত হইলাম। বয়োবৃদ্ধি-বশতঃ ক্রমশঃ অনেক জিনিস ভুলিয়াছি, আরও কত ভুলিব, ইংরাজী, বাঙ্গলা, সংস্কৃত অনেক নাটক পড়িয়াছি, অধিকাংশের নামমাত্র স্মরণ আছে। কিন্তু সে রাত্রের নিমচাঁদের অভিনয় বোধহয় কখন ভুলিব না। সেই রাত্রি হইতে কবি দীনবন্ধুর উপর আমার শ্রদ্ধা-ভক্তি পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বেশী হইল, অভিনয়ের নৈপুণ্যের জন্য গিরিশের উপর বিশেষ শ্রদ্ধা হইল। গিরিশবাবুর ভ্রাতা অতুলকৃষ্ণ আমার সহাধ্যায়ী ও চিরবন্ধু, সুতরাং অনতিপরেই আমি গিরিশবাবুর সুপরিচিত হইলাম। গিরিশবাবু এখন আমার শ্রদ্ধেয় পরম বন্ধু।"

উক্ত নাটকের পঞ্চমাভিনয় বাগবাজার, বসুপাড়ার সুবিখ্যাত সদরালা লোকনাথ বসু মহাশয়ের ভবনে এবং ষষ্ঠাভিনয় (১২৭৭ সাল) ৺দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে খিদিরপুরে নন্দলাল ঘোষের বাটীতে হয়। সপ্তমাভিনয় চোরবাগানের ৺লক্ষ্মীনারায়ণ দত্ত (পণ্ডিত-প্রবর শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এবং সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা ৺অমরেন্দ্রনাথ দত্তের পিতামহ) মহাশয়ের বাটীতে হইয়াছিল। 'সধবার একাদশী' অভিনয়ের শেষে দীনবন্ধুবাবুর 'বিয়েপাগলা বুড়ো' প্রহসন অভিনীত হয়। 'বিয়েপাগলা বুড়ো'র ইহাই প্রথম অভিনয়। গিরিশবাবু নিমচাঁদ-বেশেই প্রহসনের প্রস্তাবনাস্বরূপ মুখে-মুখে নিম্নলিখিত কবিতাটী আবৃত্তি করেন :—

মাতলামীটে ফুরিয়ে গেল, দেখুন বুড়োর সং।
বাসর-ঘরে টোপর প'রে কিবা বিয়ের ঢং॥
আয়না নসে রত্না কোথা যা পারিস তা বল।
ক্ষমা করিবেন দোষ রসিকমণ্ডল॥
আসছে এবার ছোঁড়াল দল, ভুবনো নসে রত্না।
সভ্যগণ নমস্কার, ফুরাল আমার কথা॥

এইরূপে কলিকাতার বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বাটীতে 'সধবার একাদশী'র অভিনয় হওয়ায় বাগবাজার নাট্যসম্প্রদায়ের যথেষ্ট প্রতিপত্তি বাড়িতে লাগিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে গিরিশবাবু, নগেন্দ্রবাবু, ধর্ম্মদাসবাবু, রাধামাধববাবু প্রভৃতি কয়েকটী বন্ধু মিলিয়া প্রথমে, বাগবাজারে মাইকেলের 'শর্ম্মিষ্ঠা' নাটক লইয়া একটী সখের যাত্রাসম্প্রদায় সৃষ্টি করেন। কিন্তু গিরিশবাবু ও তাঁহার কতকগুলি বন্ধু উক্ত যাত্রাসম্প্রদায় হইতে পৃথক হইয়া থিয়েটারে লিপ্ত হইলেও যাত্রাসম্প্রদায়ের অস্তিত্ব লোপ হয় নাই, তাঁহারা বসুপাড়ায় গতি দত্তের বাড়ীতে আখড়া বসাইয়া মধ্যে-মধ্যে 'শর্ম্মিষ্ঠা'র অভিনয় করিতেন।

'সধবার একাদশী' অভিনয়ের কৃতকার্য্যতা দর্শনে উক্ত যাত্রাসম্প্রদায়ের কেহ-কেহ গিরিশবাবুকে বলেন, "পর্দ্দার আড়াল থেকে শুনে-শুনে থিয়েটার ক'রে সুখ্যাতি পাওয়া সহজ, কিন্তু খোলা যায়গায় সুর-তান-লয়-শুদ্ধ গান-বাজনায় যাত্রা করা বড় শক্ত।" যৌবনসুলভ উত্তেজনায় গিরিশবাবু বলেন, "আট দিনের মধ্যে তোমাদিগকে যাত্রা শুনাইয়া দিব।" নগেন্দ্রবাবু, অর্দ্ধেন্দুবাবু, রাধামাধববাবু প্রভৃতি বন্ধুগণের সহিত মিলিত হইয়া মণিলাল সরকারের 'উষাহরণ' নাটক অভিনয়ার্থে মনোনীত করিয়া সেই রাত্রেই গিরিশবাবু যাত্রা-উপযোগী ছাব্বিশখানি গান বাঁধিয়াছিলেন। মহা উৎসাহে দিবারাত্রি মহলা চলিতে লাগিল। বর্দ্ধমান, মেমারী স্টেশনের সন্নিকট আমাদপুরের সুপ্রসিদ্ধ গায়ক উমাচরণ চক্রবর্ত্তী ও তাঁহার ভাগিনেয় কথক দুর্লভচন্দ্র গোস্বামী প্রধান জুড়ির গায়ক হইলেন। ঠনঠনিয়ার বিখ্যাত নিতাইচাঁদ চক্রবর্ত্তীকে বাজাইবার জন্য আনা হইল। সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা মতিলাল সুর এই যাত্রার দলে যোগদান করিয়া ইঁহাদের সহিত এই প্রথম মিলিত হন। ১২৭৬ সালে জগদ্ধাত্রী পূজার দিন নগেন্দ্রবাবুর বাড়ীতে ঠিক আট দিনের মধ্যে মহা উৎসাহে এই 'উষাহরণ' অভিনীত হইয়া সাধারণের বিস্ময়োৎপাদন করিয়াছিলেন।

'বিশ্বকোষে' লিখিত হইয়াছে, "শর্ম্মিষ্ঠা যাত্রাসম্প্রদায়ের জনৈক ব্যক্তিকে অর্দ্ধেন্দুবাবু পনের দিনের মধ্যে যাত্রা শুনাইয়া দিবেন বলিয়াছিলেন।" আমরা গিরিশবাবু ও ধর্ম্মদাসবাবুর মুখে যাহা শুনিয়াছি, তাহাই লিপিবদ্ধ করিলাম। 'উষাহরণ' যাত্রার জন্য গিরিশচন্দ্র-রচিত নিম্নলিখিত তিনখানি গীত সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি। প্রথম দুইখানি গীত সুকবি ও সুসাহিত্যিক সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্তের চেষ্টায় পাইয়াছি।

(১) স্বপ্নদর্শনের পর নিদ্রোত্থিতা উষা :—

যামিনীতে একাকিনী ঘুমঘোরে অচেতন।
হেরিনু স্বপনে সখি, কামিনী মনোরঞ্জন॥
ধীরে ধীরে গুণমণি, রমণী হৃদয়মণি।
আসিয়ে প্রাণ সজনি, চুরি ক'রে গেছে মন॥
অলসে ঘুমের ঘোরে, ধরিতে নারিনু চোরে,
পাগলিনী ক'রে মোরে, পলায়েছে প্রাণধন॥

(২) অনিরুদ্ধের কারাবরোধের সংবাদ পাইয়া শিবপূজারতা ঊষা :—

পূজিতে মহেশে হেরি প্রাণধনে।
শিব-শিরে দিতে বারি, বারি বহে দু'নয়নে ॥
ত্রিপুরারি করি ধ্যান, হৃদে জাগে সে বয়ান।
ব্যাকুল পাগল প্রাণ, রাখিতে নারি যতনে ॥
কাতরে করুণা কর, হে শঙ্কর পূজা ধর,
আশুতোষ দুঃখ হর, কৃপাকণা বিতরণে ॥

(৩) ললিত বিভাস—আড়াঠেকা।

পোহাল' যামিনী, বহে ধীর সমীরণ।
ধূসর-বরণ শশী তারকাহীন গগন ॥
গাহিছে বিহগকুল, ফোটে নানাবিধ ফুল,
কাননে শোভা অতুল, আকুল মধুপগণ ॥
বিনোদে বিদায়-দিয়ে, কাতরা কুমুদী-হিয়ে,
জলে মুখ লুকাইয়ে করিছে রোদন ॥
কমল বিমল নীরে, ভাসিছে হাসিছে ধীরে,
পুনঃ পাইবে মিহিরে, হবে শুভ-সম্মিলন ॥

একাদশ পরিচ্ছেদ

'লীলাবতী' নাটকাভিনয়

'সধবার একাদশীর' অভিনয় দর্শনে প্রীত হইয়া দীনবন্ধুবাবু উক্ত সম্প্রদায়কে অতঃপর 'লীলাবতী' অভিনয় কবিতে বলেন। গিরিশবাবুর প্রস্তাবানুসাবে সম্প্রদায় 'লীলাবতী'র বিহারস্থাল দিতে আরম্ভ করিলেন। এই 'লীলাবতী' সম্প্রদায় কাহারও বাটীতে অভিনয় কবেন নাই। শ্যামবাজারে ৺রাজেন্দ্রলাল পালের বাটীতে স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ নির্ম্মাণ করিয়া 'লীলাবতী'র অভিনয় হয়। সুবিখ্যাত ষ্টেজ-ম্যানেজার ধর্ম্মদাস সুর এই রঙ্গমঞ্চ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। 'সধবার একাদশী' অভিনয়ে বঙ্গীয় সাধারণ নাট্যশালার বীজরোপণ এবং তাহাব পর 'লীলাবতী'র অভিনয়ে তাহার অঙ্কুর দেখা দেয়। 'লীলাবতী' নাটক লইয়াই 'ন্যাসান্যাল থিয়েটারে'র সূচনা হয়। সুতরাং 'লীলাবতী'র কিছু বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া আবশ্যক।

পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে, 'সধবার একাদশী'র রিহারস্থাল বাগবাজার হরলাল মিত্রের লেনে, অরুণচন্দ্র হালদার মহাশয়ের বাটীতে হয়। উক্ত গলিতেই গোবিন্দচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় নামক জনৈক পূর্ব্ববঙ্গীয় ভদ্রলোকেব শ্বশুরবাটী ছিল। তিনি উদার-হৃদয় এবং নাট্যমোদী ছিলেন। তাঁহারই আগ্রহ ও সাহায্যে তাঁহার শ্বশুরালয়ের বৈঠকখানায় 'লীলাবতী'ব রিহারস্থাল আরম্ভ হয়। 'সধবাব একাদশী' সম্প্রদায়ের অভিনেতাগণ ব্যতীত সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা মহেন্দ্রলাল বসু, ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, যদুনাথ ভট্টাচার্য্য, সুরেন্দ্রনাথ মিত্র, কার্ত্তিকচন্দ্র পাল প্রভৃতি নাট্যামোদী যুবকগণ নূতন-নূতন অভিনেতারূপে এই দলে আসিয়া যোগদান করেন। বেলগেছিয়া ও পাথুরিয়া-ঘাটার বাজাদের ন্যায় একটী স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ নির্ম্মাণ করিয়া স্বেচ্ছামত অভিনয়-মানসে বাগবাজার সম্প্রদায় অর্থসংগ্রহের জন্য চাঁদা তুলিতে চেষ্টা করেন, — কিন্তু চাঁদার খাতা হস্তে নানা স্থানে যাতায়াত করিয়া সেরূপ সুবিধা করিতে পারেন নাই; দুই একটী ধনাঢ্য ব্যক্তির বাটীতে গিয়া বরং লজ্জিত হন। অবশেষে পাড়া-প্রতিবাসী ও বন্ধুবান্ধবগণের মধ্যে চাঁদা তুলিয়া সামান্য যাহা জমিয়াছিল, গোবর্দ্ধন পোটো রাজ-পথের একখানি সিন আঁকিয়া দিয়া তাহা নিঃশেষ করিয়া দেয়। সম্প্রদায় হতাশ হইয়া পড়িলেন। কিছুদিন পরে রঙ্গমঞ্চ নির্ম্মাণের একটী বিশেষ সুবিধা হইল।

'সধবার একাদশী'র দ্বিতীয়াভিনয় গিরিশবাবুর জ্যেষ্ঠ শ্যালক সুপ্রসিদ্ধ নরেন্দ্রকৃষ্ণ (নস্তিবাবু) চুণীলাল ও নিখিলেন্দ্রকৃষ্ণ দেব ভ্রাতৃত্রয়ের পিতা ব্রজনাথ দেব মহাশয়ের

বাটীতে হয়—এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই অভিনয়ের সময় হইতে ব্রজনাথবাবু পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুরবাড়ীর স্থায় একটী স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ নির্ম্মাণ করাইয়া—নিয়মিতভাবে অভিনয় চালাইবার সঙ্কল্প করেন। কিন্তু এই ব্যয়সাধ্য কার্য্যসাধনের জন্ত কিরূপে অর্থ সংগ্রহ করিবেন, এ কথা লইয়া গিরিশবাবুর সহিত তাঁহার প্রায়ই পরামর্শ চলিত।

ব্রজনাথবাবু গিরিশবাবুর শুধু নিকট আত্মীয় নয়, সখা, সহচর ও সোদর-প্রতিম বন্ধু বলিতে যাহা বুঝায়, গিরিশবাবুর তিনি তাহাই ছিলেন। ইঁহারা শৈশবে এক বিদ্যালয়ে পাঠ করিতেন, যৌবনে আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। ব্রজবাবু গিরিশবাবু অপেক্ষা দুই বৎসরের বড় ছিলেন,—গিরিশবাবুকে তিনি কনিষ্ঠ সহোদরের স্নেহ করিতেন; গিরিশবাবুও জ্যেষ্ঠের স্থায় তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতেন। ব্রজবাবু হোমিওপ্যাথি চিকিৎসানুরাগী ছিলেন, এই বিদ্যায় তিনি বিশেষরূপ জ্ঞানলাভ করিয়া বিনামূল্যে প্রতিবাসী ও দরিদ্রগণকে ঔষধ প্রদান করিতেন। তাঁহার উৎসাহেই গিরিশবাবু প্রথম উক্ত বিদ্যায় অনুরাগী হন। উভয়ে সে সময়ে জন্ অ্যাট্কিন্সন কোম্পানীর অফিসে কার্য্য করিতেন। ব্রজবাবু উক্ত অফিসের বুককিপার এবং গিরিশবাবু সহকারী বুককিপার ছিলেন।

প্রত্যেক অফিসেই দালালেরা বড়বাবুদের নানা বাবদে টাকা দিয়া থাকেন; কিন্তু ব্রজবাবু তাহা লইতেন না। উপস্থিত উভয়ের পরামর্শে এইরূপ স্থির হইল যে, স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ নির্ম্মাণের জন্য দালালদের নিকট চাঁদা তুলিয়া, ব্রজবাবু কতকটা টাকা যোগাড় করিবেন। ব্রজবাবু কৃতিপুরুষ ছিলেন, তাঁহার সঙ্কল্প অনেকটা সফলও হইয়াছিল, শ্যামপুকুরে গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাতামহ ৺গোপীনাথ তর্কালঙ্কার মহাশয়ের বাড়ীর উঠানে রঙ্গমঞ্চ নির্ম্মিত হইয়াছিল। গিরিশবাবুর অনুরোধে ধর্ম্মদাসবাবুও গিয়া উক্ত রঙ্গমঞ্চ নির্ম্মাণকার্য্যে সাহায্য করিতেন। কিন্তু পাটাতন পর্য্যন্ত প্রস্তুত হইতে না হইতে ব্রজবাবু সাংঘাতিক পীড়ায় আক্রান্ত হন, নির্ম্মাণকার্য্যও সেই সময় বন্ধ হইয়া যায়। দীর্ঘকাল রোগভোগ করিয়া ব্রজনাথবাবু অকালে ইহলোক ত্যাগ করেন।

তর্কালঙ্কার মহাশয়ের বাটীর উঠানে কাঠকাঠরাগুলি নষ্ট হইয়া যাইতেছে দেখিয়া, গিরিশবাবু ব্রজবাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা দ্বারকানাথ দেবের অনুমতি লইয়া সেগুলি বাগবাজার সম্প্রদায়কে লইয়া যাইতে বলেন। ধর্ম্মদাসবাবু কাষ্ঠগুলি লইয়া গিয়া কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তীর ষ্ট্রীটে তাঁহার বাটীর সন্নিকটস্থ খানিকটা মাঠ ঘিরিয়া লইয়া রঙ্গমঞ্চ নির্ম্মাণ এবং দৃশ্যপট অঙ্কন আরম্ভ করিয়া দেন। এই সময়ে ম্যাকলিন নামে একজন দরিদ্র ইংরাজ নাবিক বাগবাজারে মাঝে-মাঝে ভিক্ষা করিতে আসিত। জাহাজে সে রং প্রস্তুত করিতে শিখিয়াছিল। ধর্ম্মদাসবাবু সাহেবের গুণের পরিচয় পাইয়া তাহার সহিত এইরূপ বন্দোবস্ত করেন যে, সাহেব রং বাঁটিবে ও কাষ্ঠগুলির রক্ষণাবেক্ষণ করিবে, এবং তাহার বিনিময়ে ধর্ম্মদাসবাবু তাহাকে খাইতে দিবেন। ম্যাকলিন কিছুদিন এই ব্যবস্থামতই কার্য্য করে। ইহার পর ধর্ম্মদাসবাবুর প্রতিবাসী সুপ্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী ৺কৃষ্ণকিশোর নিয়োগী মহাশয় ঐ সাহেবকে তাঁহার কোচ-

ম্যান নিযুক্ত করেন এবং এক স্যুট নূতন পোষাক করিয়া দিয়াছিলেন। নূতন পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া, ছিন্ন-বস্ত্র-পরিহিত সাহেবের প্রাণে জাত্যাভিমান জাগিয়া উঠিয়াছিল কিনা জানা যায় নাই, কিন্তু তাহার পর সে যে কোথায় চলিয়া গেল, আর তাহার সন্ধান মিলিল না।

ফলতঃ ব্রজবাবুর চেষ্টার্জ্জিত উক্ত কাঠকাঠরাগুলি 'ন্যাসান্যাল থিয়েটারে'র ভিত্তি-স্থাপনে প্রথম স্বর্ণ-ইষ্টক-স্বরূপ প্রোথিত হইয়াছিল তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে। ব্রজবাবু কেবল নাট্যামোদী ছিলেন না, তিনি একজন সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীতশাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন। গানবাজনায় ইঁহার বিশেষ সখ ছিল। সুপ্রসিদ্ধ গায়ক ও বাদক জোয়ালা-প্রসাদ, নিমাই অধিকারী (সঙ্গীতাচার্য্য বেণীবাবুর পিতা) প্রভৃতি ওস্তাদেরা বেতন লইয়া তাঁহাকে শিক্ষা দিতেন। যখন যে গুণী গায়ক ও বাদক কলিকাতায় আসিতেন, ব্রজবাবুর যত্ন ও সঙ্গীতানুরাগে বাধ্য হইয়া তাঁহারা ব্রজবাবুর বাটীতে আসিয়া সঙ্গীতালোচনা করিয়া আনন্দ করিতেন। এই সূত্রে গিরিশবাবু রাগ-রাগিণীও তান-লয় সম্বন্ধে ব্রজনাথবাবুর নিকট মোটামুটি একটা জ্ঞান লাভ করেন। উত্তরকালে এই শিক্ষার ফলে তিনি রঙ্গালয়ে সঙ্গীত ও নৃত্য শিক্ষকগণকে বরাবর উপদেশ ও শিক্ষা-প্রদানে পরিচালিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

ব্রজবাবুই প্রথমে ইংরাজী নোটেশন ও ইংরাজী বাদ্যযন্ত্র রঙ্গালয়ে প্রচলন করেন। বেতন দিয়া সাহেব শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া ইনি ইংরাজী সঙ্গীতশাস্ত্র আলোচনা ও শিক্ষা করিতেন। স্বয়ং তিনি একটী কনসার্টের দল গঠন করিয়াছিলেন। 'বিশ্বকোষে' লিখিত হইয়াছে :—ইঁহারই কনসার্টের দলে প্রথম ক্ল্যারিওনেট বাঁশী বাজান আরম্ভ হয়। তখনও কর্ণেট বাজান হইত না। তাঁত ও তারের যন্ত্র সমস্ত, পিকলো, ক্ল্যানেট বাঁশী, জলতরঙ্গের বাটীও এই দলে একত্রে বাজান হইত। এতদ্ভিন্ন শঙ্খ বাজাইয়া সুর দেওয়া হইত। ডি-সুরে কনসার্ট বাজান হইত। বাছিয়া-বাছিয়া ডি-সুরের শাঁখ আনা হইয়াছিল। যতক্ষণ বাজনা হইত, শানাইয়ের পোঁ ধরা হিসাবে এই শাঁখে সেইরূপ সুর দেওয়া হইত। ব্রজবাবুর বাজনার দল নবগোপালবাবুর উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত চৈত্রমেলায় প্রথম বাজাইয়া ছিলেন।

এক্ষণে আমরা 'লীলাবতী'র রিহারস্যালের কথা বলিব। বহুদিন ধরিয়া 'লীলাবতী'র রিহারস্যাল হয়। কারণ গিরিশবাবু রিহারস্যালে নিয়মিত আসিতে পারিতেন না। তিনি অফিস হইতে বাটী আসিয়া সন্ধ্যার পর প্রত্যহই শয্যাশায়ী ব্রজবাবুর তত্ত্বা-বধানে শ্যামপুকুর শ্বশুরালয়ে যাইতেন। ব্রজবাবু স্বয়ং হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা শিখিয়াছিলেন এবং নিজের চিকিৎসাও হোমিওপ্যাথি মতে করাইতেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি, ব্রজবাবুর উৎসাহেই গিরিশবাবু উক্ত চিকিৎসার অনুরাগী হইয়াছিলেন। ব্রজবাবু বহুসংখ্যক মূল্যবান হোমিওপ্যাথিক গ্রন্থ ক্রয় করিয়াছিলেন। গিরিশবাবু শ্যামপুকুরে গিয়া মনোযোগের সহিত তাহা পাঠ করিতেন এবং উক্ত চিকিৎসা সম্বন্ধে নানারূপ আলোচনা ও গবেষণায় প্রায়ই অধিক রাত্রি কাটাইয়া বাড়ী ফিরিতেন। যেদিন সকাল-সকাল ফিরিতেন, সেইদিন আখড়া হইয়া আসিতেন। সুবিখ্যাত

ডাক্তার সাল্‌জার সাহেব ব্রজবাবুর চিকিৎসক এক বন্ধু ছিলেন, তিনি তাঁহাকে প্রায়ই দেখিতে আসিতেন। এই সূত্রে গিরিশবাবুর সহিতও তাঁহার ঘনিষ্ঠতা হয়। ব্রজবাবুর এই কঠিন পীড়া সম্বন্ধে সাহেবের সহিত চিকিৎসাশাস্ত্রের আলোচনাকল্পে তাঁহাকে উক্ত চিকিৎসাশাস্ত্র গভীরভাবে অধ্যয়ন করিতে হইত।

ব্রজবাবুর মৃত্যুর পরেও চিত্ত-চাঞ্চল্যবশতঃ গিরিশবাবু 'লীলাবতী'র রিহারস্যাল বিশেষরূপে মনঃসংযোগ করিতে পারেন নাই। ধীরে-ধীরেই 'লীলাবতী'র রিহারস্যাল-কার্য্য চলিতেছিল। কিন্তু এই সময়ে এমন একটী ঘটনা ঘটিল, যাহাতে এই মন্থরগামী 'লীলাবতী' সম্প্রদায় প্রবল উৎসাহে মাতিয়া উঠিল।

'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় প্রকাশিত হয়, সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র ও সাহিত্যরথী অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়দ্বয়ের শিক্ষাবিধানে এবং অন্যান্য কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণের তত্ত্বাবধানে চুঁচুড়ায় 'লীলাবতী' নাটক অভিনীত হইতেছে। বঙ্কিমবাবু 'লীলাবতী' নাটকের কিছু-কিছু বাদ দিয়া ও কিছু-কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া অভিনয়োপযোগী করিয়া দিয়াছেন। 'অমৃতবাজারে' ইহার সুখ্যাতিও বাহির হয়। এই সংবাদপাঠে নগেনবাবু, অর্দ্ধেন্দুবাবু, ধর্ম্মদাসবাবু ও গোবিন্দচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি গিরিশবাবুর বাটী আসিয়া তাঁহাকে বলেন,—"চুঁচুড়ার দলের নিকট হারিয়া যাইব, তুমি কি বসিয়া দেখিবে ?" গিরিশবাবু বন্ধুগণের অনুযোগে উত্তেজিত হইয়া বলেন,—নাটককারের একটী কথাও বাদ না দিয়া আমাদের অভিনয় করিতে হইবে এবং শুধু অভিনয় নয়, চুঁচুড়ার দলকে অভিনয়ে হারাইতে হইবে।" অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ বসু মহাশয়ের পিতৃদেব স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বসু মহাশয় এই চুঁচুড়ার দলভুক্ত ছিলেন।

দ্বিগুণ উৎসাহে গিরিশচন্দ্র 'লীলাবতী'র রিহারস্যাল দিতে আরম্ভ করিলেন। ধর্ম্মদাসবাবু দিবারাত্রি খাটিয়া দৃশ্যপট ও রঙ্গমঞ্চ প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। তিনি এই সময়ে শ্যামবাজার বঙ্গ-বিদ্যালয়-সংলগ্ন 'Preparatory School'-এ শিক্ষকতা করিতেন।* ধর্ম্মদাসবাবুকে কেবল এই কার্য্যে নিযুক্ত রাখিবার জন্য অর্দ্ধেন্দুবাবু এবং সুবিখ্যাত নট ও নাট্যকার শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল বসু মহাশয় তাঁহার হইয়া বিদ্যালয়ে গিয়া পড়াইয়া আসিতেন। অমৃতবাবু কাশীধামে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করিতেন, এই সময়ে কিছুদিনের জন্য কলিকাতায় আসিয়াছিলেন এবং নাট্যানুরাগবশতঃ ধর্ম্মদাস-বাবুর 'সিন' আঁকা দেখিতে আসিতেন।

* রায় বাহাদুর ডাক্তার শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু মহাশয় তাঁহার একজন ছাত্র ছিলেন। চুণীবাবুর একখানি পাঠ্যপুস্তকে ধর্ম্মদাসবাবু এরূপ সুন্দর অক্ষরে তাঁহার নাম লিখিয়া দিয়াছিলেন যে, চুণীবাবু অদ্যাবধি সেই পুস্তকখানি সযত্নে রাখিয়া দিয়াছেন।

'ন্যাশান্যাল থিয়েটার' নামকরণ

বিহারস্থাল সমাপ্ত হইলে, শ্যামবাজারে রাজেন্দ্রলাল পালের বাটীতে স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ নির্ম্মাণ করিয়া ১২৭৮ সালের আষাঢ় মাসে (ইং ১৮৭১ জুলাই) মহা সমারোহে 'লীলাবতী' নাটকের প্রথম অভিনয় হয়। 'সধবার একাদশী' অভিনয়কালে এই সম্প্রদায়ের নাম "The Baghbazar Amateur Theatre" ('বাগবাজার অ্যামেচার থিয়েটার') ছিল। 'লীলাবতী' অভিনয়কালে ঐ নাম বদলাইয়া প্রথমে "The Calcutta National Theatre" পরে 'Calcutta' বাদ দিয়া "The National Theatre" ('ন্যাশান্যাল থিয়েটার') নামকরণ হয়। "হিন্দুমেলা"-প্রতিষ্ঠাতা নবগোপাল মিত্র মহাশয় এই সময়ে 'লীলাবতী' সম্প্রদায়ে যাতায়াত করিতেন। ইনি *National Paper*-এর সম্পাদক ছিলেন। *National Magazine* নামে একখানি মাসিকপত্রও বাহির করিয়াছিলেন। "National" শব্দ প্রয়োগের ইনি বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন বলিয়া, ইঁহাকে সকলে "ন্যাশান্যাল নবগোপাল" বলিয়া ডাকিত।* ইঁহারই প্রস্তাবে "The Baghbazar Amateur Theatre"-এর নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া "The Calcutta National Theatre" নাম হয়; কিন্তু সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা মতিলাল সুর মহাশয় বলিলেন, "আবার 'Calcutta' কেন? শুধু 'The National Theatre' নাম রাখা হউক।" সম্প্রদায় তাহাই সাব্যস্ত করিলেন।

'সধবার একাদশী'র ন্যায় 'লীলাবতী' অভিনয়েও গিরিশবাবু কতকগুলি গান বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। আমরা নিম্নলিখিত দুইখানি গানের সন্ধান পাইয়াছি।

প্রথম গীত

হরশঙ্কর, শশিশেখর, পিনাকী ত্রিপুরারে।
বিভূতি-ভূষণ, দিক-বসন, জাহ্নবী-জটাভারে॥
অনল ভালে মদন দমন, তরুণ অরুণ-কিরণ-নয়ন।
নীলকণ্ঠ রজত-বরণ, মণ্ডিত ফণী-হারে॥
উক্ষারূঢ় গরল ভক্ষ্য, অক্ষমালা শোভিত বক্ষ,
ভিক্ষা-লক্ষ্য, পিশাচ-পক্ষ, রক্ষক ভবপারে॥

* সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় নবগোপালবাবুর সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন,—"নবগোপাল একটা ন্যাশনাল ধুয়া তুলিল। সে খুব কাজ করিতে পারিত; কুস্তি, জিমন্যাষ্টিক প্রভৃতির প্রচলন করার চেষ্টা তার খুব ছিল; একটা মেলা বসাইয়া ছিল—তাঁতি, কামার, কুমার ইত্যাদি লইয়া। একখানা ন্যাশনাল কাগজ বাহির করিল, নবগোপালের সময় থেকে এই ন্যাশনাল শব্দটা দাঁড়াইয়া রহিয়া গেল। ন্যাশনাল সঙ্গীত রচিত হইতে আরম্ভ হইল।" 'ভারতবর্ষ' (আষাঢ়, ১৩২৮)

১২৭২ সাল, চৈত্র মাসে (ইং ১৮৬৬ মার্চ) নবগোপালবাবু প্রথম হিন্দুমেলা প্রতিষ্ঠিত করেন। ৭৮ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে, ব্রজবাবুর বাজনার দল এই প্রথম চৈত্রমেলায় বাজাইয়াছিলেন।

দ্বিতীয় গীত

ব'সেছিল বঁধু হেঁসেলের কোণে।
বল্লে না ফুটে, থামকা উঠে—
হামা দিয়ে গিয়ে সেঁদুলো বনে॥
সাঁজে সকালে, ফেরে চালে চালে
(আহা) পগার পরে বঁধু যেত এগোনে॥

উত্তরকালে প্রথম গীতটী গিরিশচন্দ্রের 'লক্ষ্মণ-বর্জ্জন' নাটকে এবং দ্বিতীয় গীতটী 'বিল্বমঙ্গল' নাটকে সংযোজিত হইয়াছিল।

'লীলাবতী' নাটকের প্রথমাভিনয় রজনী বঙ্গ-রঙ্গালয়ের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় থাকিবে। কারণ ভবিষ্যতে এই 'ন্যাসান্যাল থিয়েটারে'র নাম গ্রহণ করিয়া এবং এই থিয়েটারেরই অধিকাংশ অভিনেতা লইয়া সাধারণ বঙ্গ-নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হয়। অভিনয়-রাত্রে ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার, স্বয়ং গ্রন্থকার দীনবন্ধু মিত্র এবং বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। 'লীলাবতী' নাটকের ভূমিকা লইয়া নিম্নলিখিত অভিনেতাগণ প্রথম ন্যাসান্যাল রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন :—

ললিত	গিরিশচন্দ্র ঘোষ।
হেমচাঁদ	নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
হরবিলাস ও ঝি	অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী।
ক্ষীরোদবাসিনী	রাধামাধব কর।
নদেরচাঁদ	যোগেন্দ্রনাথ মিত্র।
সারদাসুন্দরী	অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেলবাবু)।
ভোলানাথ	মহেন্দ্রলাল বসু।
মেজোখুড়ো	মতিলাল সুর।
রাজলক্ষ্মী	ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়।
যোগজীবন	যদুনাথ ভট্টাচার্য্য।
শ্রীনাথ	শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
লীলাবতী	সুরেশচন্দ্র মিত্র।
রঘু উড়ে	হিঙ্গুল খাঁ।

সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা মহেন্দ্রলাল বসু, অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেলবাবু) এবং মতিলাল সুর 'লীলাবতী' নাটকে এই প্রথম রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হন।

অভিনয় দর্শনে দীনবন্ধুবাবু এতদূর মুগ্ধ হইয়াছিলেন, যে অভিনয়ান্তে অতি-ব্যস্ততার সহিত ষ্টেজের মধ্যে আসিয়াই বলেন, "এবার চিঠি লিখ্‌বো, হুয়ো বঙ্কিম।" গিরিশবাবুকে বলেন, "আমার কবিতা যে এমন করিয়া পড়া যায় তাহা আমি জানিতাম না। Take this compliment at least." বস্তুতঃ দীনবন্ধুবাবুর দীর্ঘ কবিতাসমূহ গিরিশবাবু যেভাবে আবৃত্তি করিয়াছিলেন, তাহা সাধারণের আয়াসসাধ্য নহে। অর্দ্ধেন্দুবাবু মেদিনীপুরের ভাষায় ঝিয়ের ভূমিকাভিনয় করায়

দর্শকগণ বিলক্ষণ আমোদ উপভোগ করিয়াছিলেন; দীনবন্ধুবাবুর নাটকে এদেশীয় ভাষায় ঝিয়েদের কথা ছিল। মহেন্দ্রলাল বসু ভোলানাথ চৌধুরীর ভূমিকাভিনয়ে পাড়াগেঁয়ে ছ্যাবলা জমীদারের এমন একটী ছবি দেখাইয়াছিলেন, যে, সেইদিন হইতে দীনবন্ধুবাবু আজীবন তাঁহাকে ভোলানাথ চৌধুরী বলিয়া ডাকিতেন। যোগেন্দ্রনাথ মিত্র নদের চাঁদ ভূমিকাভিনয় করিয়াছিলেন। দীনবন্ধুবাবু বলিয়াছিলেন, "যখনই দেখলুম, নদের চাঁদ কাপড় গলায় দিয়া প্রথম রঙ্গমঞ্চে বাহির হইল, তখনই জেনেছি মেরে দিয়েছি।" চুঁচুড়ার অভিনয়ের সহিত তুলনা করিয়াই তিনি এ কথা বলিয়াছিলেন। চরিত্রোপযোগী বেশভূষার প্রতি এই ন্যাসান্যাল সম্প্রদায়ের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। গিরিশচন্দ্রের শিক্ষাদানের ইহাই বিশেষত্ব। 'লীলাবতী' অভিনয় সম্বন্ধে গিরিশবাবু তাঁহার "বঙ্গীয় নাট্যশালায় নটচূড়ামণি স্বর্গীয় অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী" পুস্তিকায় (১৯ পৃষ্ঠায়) লিখিয়াছেন,—"'লীলাবতী' অভিনয়ের অতিশয় প্রশংসা হইল। অভিনয় দর্শনে মুগ্ধ হইয়া দীনবন্ধুবাবু আমায় বলিয়াছিলেন, 'তোমাদের অভিনয়ের সহিত চুঁচুড়া দলের তুলনাই হয় না,—আমি পত্র লিখিব—'দুয়ো বঙ্কিম!' সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার ৺কানাইলাল দে, ঠাকুরবাড়ীর অভিনয়ের সহিত তুলনা করিয়া আমাদের নিকট প্রকাশ করেন যে, তিনি তথায় বলিয়া আসিয়াছেন,—'আপনাদের অভিনয় সোনার খাঁচায় দাঁড়কাক পোরা।'"

প্রত্যেক শনিবারে শ্যামবাজারে রাজেন্দ্রবাবুর বাটীতে বাঁধা রঙ্গমঞ্চে 'লীলাবতী' অভিনয় দর্শনের নিমিত্ত ফ্রি-টিকিটের ব্যবস্থা হইয়াছিল। কিন্তু অভিনয়ের সুযশ বিস্তৃত হইয়া পড়ায়, টিকিটের নিমিত্ত এরূপ জনতা ও এত অধিক চিঠি আসিতে আরম্ভ হইল যে সম্প্রদায় নিয়ম করিলেন, যে সে লোককে টিকিট দেওয়া হইবে না, যাঁহারা অভিনয় বুঝিতে সক্ষম, তাঁহাদিগকেই টিকিট দেওয়া হইবে। তাহাতে অনেক দর্শক আপনাপন যোগ্যতার সার্টিফিকেট লইয়া অভিনয়-রাত্রের তিন-চারি দিন পূর্ব্ব হইতে দলে-দলে আসিতে আরম্ভ করিতেন।

প্রায় পাঁচ রাত্রি অভিনয়ের পর প্রবল বর্ষার জন্য থিয়েটার বন্ধ হইয়া যায়। আশ্বিন মাসে পূজার সময় উক্ত শ্যামবাজার-নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ বন্দুকওয়ালা মথুরামোহন বিশ্বাসের বাড়ীতে (উপস্থিত যথায় D. N. Biswas-এর বাটী) ইহার শেষ অভিনয় হয়।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

'নীলদর্পণে'র মহলা—গিরিশচন্দ্রের সহিত সম্প্রদায়ের বিচ্ছেদ

'লীলাবতী' অভিনয়ের পর 'ন্যাসান্যাল থিয়েটার' দ্বিগুণ উৎসাহে দীনবন্ধুবাবুর 'নীলদর্পণ' নাটকাভিনয়ের জন্য প্রবৃত্ত হইলেন। রিহারস্যাল আরম্ভ হইল। দৃশ্যপট, রিহারস্যাল ইত্যাদির ব্যয় নির্ব্বাহার্থে সম্প্রদায় পাড়াপ্রতিবেশী এবং বন্ধুবান্ধবগণের মধ্যে চাঁদা সংগ্রহ করতে আরম্ভ করিলেন। এমন সময়ে বাগবাজার নিবাসী বিখ্যাত জমীদার ৺রসিকমোহন নিয়োগীর মধ্যম পৌত্র শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন নিয়োগী মহাশয়ের সহিত ইঁহাদের পরিচয় হয়। ধর্ম্মদাসবাবু ভুবনমোহনবাবুর প্রতিবেশী, তিনিই এই মিলন সংঘটন করিয়াছিলেন। ভুবনমোহনবাবু এই সম্প্রদায়ের প্রতি বিশেষরূপ সহানুভূতি প্রকাশ করেন। চাঁদা প্রদান ব্যতীত, 'নীলদর্পণ' নাটকের উত্তমরূপ রিহারস্যাল দিবার নিমিত্ত তাঁহার পিতামহ প্রতিষ্ঠিত বাগবাজার অন্নপূর্ণা ঘাটের চাঁদনীর উপর বারদ্বারী বৈঠকখানা ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। সম্প্রদায় ভাড়াটিয়া আখড়াঘর ছাড়িয়া দিয়া গঙ্গার উপর এই মনোরম স্থানে দ্বিগুণ উৎসাহে 'নীলদর্পণে'র রিহারস্যাল দিতে লাগিলেন। উপস্থিত সে বাটীর নিম্নতলার কিছু চিহ্ন আছে। অবশিষ্ট অংশ পোর্ট ট্রাষ্ট লুপ্ত করিয়া দিয়াছে। যাহাই হউক, নাটকের রিহারস্যাল সমাপ্ত হইলে, সম্প্রদায়স্থ কতকগুলি অভিনেতা পূর্ব্ব হইতেই দর্শকগণের আগ্রহাতিশয় দর্শনে এবং প্রত্যেক নূতন নাটক খুলিবার সময় দৃশ্যপটাদির জন্য চাঁদা সংগ্রহ বিশেষ কষ্টকর ইত্যাদি নানা কথা তুলিয়া টিকিট বিক্রয়পূর্ব্বক 'নীলদর্পণ' অভিনয়ের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। গিরিশবাবু এ প্রস্তাবে অসম্মত হন। তিনি বলেন, "আমাদের রঙ্গমঞ্চ, দৃশ্যপট ও অন্যান্য সাজ-সরঞ্জাম এখনও এরূপ উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে নাই, যাহাতে 'ন্যাসান্যাল থিয়েটার' নামকরণপূর্ব্বক টিকিট বিক্রয় করিয়া সাধারণের সম্মুখে বাহির হওয়া যায়। 'ন্যাসান্যাল থিয়েটার' নাম শুনিয়া অনেকেই মনে করিবেন এই থিয়েটার দেশের সমস্ত ধনাঢ্য ব্যক্তিদের সমবেত চেষ্টার ফল—ইহা জাতীয় রঙ্গমঞ্চ। কিন্তু কতকগুলি মধ্যবিত্ত গৃহস্থ যুবা একত্র হইয়া ক্ষুদ্র সাজ-সরঞ্জামে 'ন্যাসাগ্যাল থিয়েটার' করিতেছে ইহা বড়ই বিসদৃশ হইবে।" টিকিট বিক্রয় করিয়া থিয়েটারের তিনি বিরোধী ছিলেন না। তবে সামান্য সরঞ্জাম লইয়া টিকিট বিক্রয়ে তিনি অসম্মত ছিলেন। কিন্তু সম্প্রদায়ের অধিকাংশই এরূপ উত্তেজিত হন যে তাঁহারা তাঁহাদের প্রধান পরিচালকের কথা রক্ষা করিতে অসম্মত

হইলেন। চিরস্বাধীন গিরিশবাবু তৎক্ষণাৎ সম্প্রদায়ের সংস্রব ত্যাগ করিলেন।

টিকিট বিক্রয় করিয়া থিয়েটার করিতে সম্মত নহেন, এরূপ আরও কয়েকজন অভিনেতা সুরেশচন্দ্র মিত্র ('লীলাবতী' অভিনয়ের লীলাবতী), রাধামাধব কর ('সধবার একাদশী'র রামমাণিক্য ও 'লীলাবতী'র ক্ষীরোদবাসিনী), যোগেন্দ্রনাথ মিত্র ('লীলাবতী'র নদের চাঁদ), নন্দলাল ঘোষ ('সধবার একাদশী'র কাঞ্চন), মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ('সধবার একাদশী'র নকুড়) প্রভৃতি ইঁহারা গিরিশবাবুর ন্যায় 'ন্যাসান্যাল থিয়েটার' পরিত্যাগ করেন। এই সময়ে বঙ্গগৌরব নট-নাট্যকার ও নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় কাশী হইতে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। রাধামাধববাবু 'নীলদর্পণ' নাটকে সৈরিন্ধ্রীর ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি চলিয়া যাওয়ায় অর্দ্ধেন্দুবাবু, নগেন্দ্রবাবু প্রভৃতি অমৃতবাবুকে সৈরিন্ধ্রীর ভূমিকা গ্রহণে বিশেষ অনুরোধ করেন। প্রথমে তিনি অসম্মত হন কিন্তু বন্ধুবান্ধবগণের অনুরোধ ও 'চাপাচাপি'তে শেষে স্বীকৃত হন। নাট্যশালার সহিত ইহাই তাঁহার প্রথম ও প্রকাশ্য যোগদান।

ইহার পর 'ন্যাসান্যাল থিয়েটার' সম্প্রদায় সন্ধান করিয়া কলিকাতা, জোড়াসাঁকো, অপার চিৎপুর রোডের উপর মধুসূদন সান্যাল মহাশয়ের বাটীর (উপস্থিত যথায় ঘড়ীওয়ালা মল্লিকদের বাড়ী) উঠান, মাসিক চল্লিশ টাকায় ভাড়া লইয়া, তথায় ষ্টেজ প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সুপ্রসিদ্ধ ষ্টেজ-ম্যানেজার ধর্ম্মদাস সুর এবং 'কলিকাতা আর্ট স্কুলে'র ছাত্র ও 'ন্যাসান্যাল থিয়েটারে'র অভিনেতা শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয়ের অক্লান্ত পরিশ্রমে ষ্টেজ নির্ম্মাণ হইতে লাগিল। এদিকে রাত্রে ভুবনমোহনবাবুর গঙ্গাতীরস্থ বৈঠকখানায় 'নীলদর্পণে'র রিহারস্যাল চলিতে লাগিল। গিরিশবাবুর স্থলে বেণীমাধব মিত্র নামক জনৈক ব্যক্তিকে সম্প্রদায়ের প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত করা হইল।

এই সময়ে বাগবাজারে একটী সখের যাত্রার দলের সৃষ্টি হয়। গিরিশবাবু তাহাদের একটী সংএর পালা বাঁধিয়া দেন। সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা ও সুগায়ক রাধামাধব কর প্রহসনের একটী ভূমিকা লইয়া সুকণ্ঠে নিম্নলিখিত গীতটী গাহিতেন। গানটী প্রয়াগের লুপ্ত বেণী ত্রিধারা ভাগীরথীর বর্ণনাত্মক। গানটীতে 'নীলদর্পণ' সম্প্রদায়স্থ তৎকালীন প্রেসিডেণ্ট হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যেক অভিনেতা ও উৎসাহদাতাগণের নাম অতি সুকৌশলে গ্রথিত আছে। গীতটী শ্লেষাত্মক হইলেও ইহা লইয়া উভয় পক্ষই বিলক্ষণ আমোদ উপভোগ করিয়াছিলেন।

গীত

(কবির সুরে গেয়)

লুপ্ত বেণী[১] বইছে তেরোধার।[২]
তাতে পূর্ণ[৩] অর্দ্ধইন্দু[৪] কিরণ[৫]
সিঁদুর মাখা মতির[৬] হার॥

নগ[৭] হ'তে ধারা ধায়, সরস্বতী ক্ষীণাকায়,[৮]
বিবিধ বিগ্রহ[৯] খাটের উপর শোভা পায় ;
শিব[১০] শম্ভুসুত[১১] মহেন্দ্রাদি[১২] যদুপতি[১৩] অবতার ॥
কিম্বা ধর্ম্ম[১৪] ক্ষেত্র[১৫] স্থান,
অলক্ষ্যেতে বিষ্ণু[১৬] করে গান,
অবিনাশী[১৭] মুনি-ঋষি করছে ব'সে ধ্যান,
সবাই মিলে ডেকে বলে, 'দীনবন্ধু'[১৮] কর পার ॥
কিবা বালুময় বেলা[১৯]
পালে পাল[২০] রেতের বেলা[২১]
ভুবনমোহন[২২] চরে[২৩] করে গোপালে[২৪] খেলা,
মিছে ক'রে আশা, যত চাষা[২৫]
নীলের গোড়ায়[২৬] দিচ্ছে সার ॥[২৭]
কলঙ্কিত শশী[২৮] হরষে, অমৃত[২৯] বরষে,
জ্ঞান হয় বা দিনের গৌরব এতদিনে খসে,
স্থান মাহাত্ম্যে হাড়ীশুঁড়ী পয়সা দে দেখে বাহার ॥[৩০]

চিহ্নিত মাত্রার অর্থ :–

(১) দলের প্রেসিডেণ্ট–৺বেণীমাধব মিত্র। ইনি অভিনয় করিতেন না, গিরিশবাবু সম্প্রদায় পরিত্যাগ করিবাব পর তাঁহার স্থলে বেণীমাধববাবুর উপর কর্ত্তৃত্ব-ভার অর্পিত হয়। ইহার নাম অপ্রকাশ থাকায় "লুপ্ত" বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে। অপর পক্ষে গঙ্গা যমুনা সরস্বতী-সঙ্গ।

(২) তেরোধার–ত্রিধারায়।
(৩) পূর্ণচন্দ্র মিত্র–অভিনেতা।
(৪) অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী–নাট্যাচার্য্য ও অভিনেতা।
(৫) কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়–অভিনেতা।
(৬) মতিলাল সুর–অভিনেতা।
(৭) নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়–অভিনেতা ও প্রধান পরিচালক।
(৮) সরস্বতী ক্ষীণাকায়–অল্প বিদ্যা অর্থাৎ মূর্খ।
(৯) বিগ্রহ–সজমে দেবমূর্ত্তি অপরপক্ষে কুৎসিত গালি।
(১০) শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়–অভিনেতা।
(১১) কার্ত্তিকচন্দ্র পাল–সম্প্রদায়ের উৎসাহদাতা।
(১২) মহেন্দ্রলাল বসু–অভিনেতা।
(১৩) যদুনাথ ভট্টাচার্য্য–অভিনেতা।
(১৪) ধর্ম্মদাস সুর–ষ্টেজ-ম্যানেজার।
(১৫) শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়–অভিনেতা ও সহকারী ষ্টেজ-ম্যানেজার।
(১৬) ব্রাহ্মসমাজের গায়ক বিষ্ণুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ইনি নেপথ্য হইতে গান করিতেন।

(১৭) অবিনাশচন্দ্র কর—অভিনেতা।

(১৮) 'নীলদর্পণ'-প্রণেতা সুবিখ্যাত নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র।

(১৯) অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেলবাবু)—অভিনেতা।

(২০) রাজেন্দ্রলাল পাল প্রভৃতি পাল বংশীয় কয়েকজন।

(২১) রেতের বেলা—অর্থাৎ রাত্রিকালে রিহারস্তাল হইত।

(২২) শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন নিয়োগী।

(২৩) চরে অর্থাৎ বেড়ায়; ভুবনমোহনবাবুর কোন নির্দ্দিষ্ট কার্য্য ছিল না। অপরপক্ষে ভুবনমোহন চরে অর্থাৎ গঙ্গাতীরস্থ ভুবনমোহনবাবুব বৈঠকখানায়।

(২৪) গোপালচন্দ্র দাস—অভিনেতা।

(২৫) সদগোপ জাতীয় অনেকেই এই সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন।

(২৬) 'নীলদর্পণ' নাটক।

(২৭) সার—বিষ্ঠা। এস্থলে কার্য্য-নিপুণতার অভাব বুঝাইতেছে।

(২৮) শশীভূষণ দাস—অভিনেতা।

(২৯) নাট্যাচার্য্য ও অভিনেতা শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু।

(৩০) সম্প্রদায় বৈতনিক হওয়ায় কাহারও আর প্রবেশ-নিষেধ রহিল না,—অর্থাৎ টিকিট কিনিলেই প্রবেশাধিকার।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

'বিশ্বকোষ' ও গিরিশচন্দ্র

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় সম্পাদিত 'বিশ্বকোষ' অভিধানে "রঙ্গালয়" শীর্ষক শব্দের মধ্যে বঙ্গীয় নাট্যশালার একটী সংক্ষিপ্ত ইতিহাস প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে অনেক স্থানেই ভ্রমপ্রমাদ দৃষ্ট হয়, বিশেষতঃ গিরিশবাবু সম্বন্ধে উহাতে এমন অনেক মিথ্যা কলঙ্ক-কুৎসার কথা আছে, যাহা অমার্জ্জনীয়। কর্ত্তব্যের অনুরোধে 'বিশ্বকোষে' প্রকাশিত সেইসব অন্যায় ও মিথ্যা উক্তির প্রতিবাদ করিয়া প্রকৃত রহস্য প্রকাশে বাধ্য হইলাম।

১৩০৭ সালে বঙ্গ-নাট্যশালার ইতিহাস সংগ্রহের নিমিত্ত সুকবি ও সুসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, নাট্যামোদী ৺বিপিনচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় এবং আমি—এই তিনজন একত্রে সাধারণ বঙ্গ-নাট্যশালার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ধর্ম্মদাস সুর মহাশয়ের নিকট গমন করি। ধর্ম্মদাসবাবু প্রথম হইতেই অক্লান্ত পরিশ্রমে ষ্টেজ নির্ম্মাণ ও স্বয়ং তুলি ধরিয়া দৃশ্যপট আঁকিতে আরম্ভ না করিলে গৃহস্থ যুবক-সম্প্রদায় থিয়েটাব করিতে পারিতেন কিনা সন্দেহ। ধর্ম্মদাসবাবু তাঁহাদের গৌরবজনক নাট্যশালার একটী ধারাবাহিক ইতিহাস আমাদেব নিকট বর্ণনা করেন। পরে কিরণবাবুর অনুরোধে তিনি তাঁহাকে বঙ্গ-নাট্যশালার একটী সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। ধর্ম্মদাসবাবুর লিখিত বিবরণ ও নাট্যসম্রাট গিরিশচন্দ্রের প্রমুখাৎ এবং অন্যান্য নানা স্থান হইতে তত্ত্ব সংগ্রহ করিষা কিরণবাবু স্বর্গীয় নাট্যরথী অমরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রতিষ্ঠিত এবং সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'রঙ্গালয়' সংবাদপত্রে ১৩০৭ সাল, ২রা চৈত্র (১৫ই মার্চ্চ ১৯০১ খ্রী) তারিখে "বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস" লিখিতে আরম্ভ করেন। ১৩১০ সালে মৎ-সম্পাদিত 'গিরিশ গীতাবলী' পুস্তক বাহির হয়। গ্রন্থের শেষভাগে বঙ্গ-নাট্যশালার ইতিহাস-সহ গিরিশবাবুর সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশ করি। কিরণবাবু কর্ত্তৃক প্রকাশিত ধর্ম্মদাসবাবু লিখিত উক্ত বিবরণ হইতে আমি বিশেষ সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলাম। পর বৎসর ১৩১১ সালে 'বিশ্বকোষে' "রঙ্গালয়" শব্দের ব্যাখ্যা উপলক্ষ্যে বঙ্গীয় রঙ্গালয়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বাহির হয়। ইহাতে লিখিত আছে, অর্দ্ধেন্দুবাবু 'লীলাবতী' নাটকের রিহারস্তাল দেন এবং ব্রজবাবুর কাছে ষ্টেজের কাঠকাঠরা চাওয়াতে তিনি আনন্দিত হইয়া অর্দ্ধেন্দুবাবুকে তাহা দান করেন। 'বিশ্বকোষে' প্রকাশিত সংবাদের যাথার্থ্য সম্বন্ধে ধর্ম্মদাসবাবুকে জিজ্ঞাসা করি। কারণ,

'গিরিশ-গীতাবলী'তে মুদ্রিত ধর্ম্মদাসবাবুর লিখিত বিবরণ অবলম্বনে যাহা প্রকাশিত হয়—তাহার সহিত 'বিশ্বকোষে'র লেখার সামঞ্জস্য নাই। ধর্ম্মদাসবাবু 'গিরিশ-গীতাবলী'র সেই অংশ পাঠ করিয়া স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া উক্ত মুদ্রিতাংশ পৃষ্ঠার পার্শ্বে "Yes my statement is correct." লিখিয়া নাম সহি করিয়া দেন। আমি সে পুস্তকখানি সযত্নে রক্ষা করিয়া আসিতেছি। পাঠকগণের অবগতির জন্য সেই অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :—

"সধবার একাদশী'র প্রথমাভিনয় রজনীর পর হইতে আমি, গিরিশবাবু কর্ত্তৃক ষ্টেজ-ম্যানেজার নিযুক্ত হই। পরে 'সধবার একাদশী'র অভিনয় চলিতে থাকে। ইতিমধ্যে আমরা কয়েকজনে চাঁদা তুলিয়া স্থায়ী বঙ্গমঞ্চের স্থাপন-মানসে একখানি Prospectus ছাপাইয়া চাঁদা সংগ্রহ করিতে থাকি। দুই মাস চেষ্টা করিয়া আমরা অকৃতকার্য্য হই। এই সময় গিরিশবাবুর শ্যালক শ্যামপুকুরের সরকার বাটীর ৺নবীনচন্দ্র দেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র ৺ব্রজনাথ দেব [নাট্যামোদিগণের বিশেষ পরিচিত সুপ্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকৃষ্ণ, চুণীলাল ও নিখিলেন্দ্রকৃষ্ণ দেব (সরকার উপাধি) ভ্রাতৃত্রয়ের পিতা] একটী নাট্যশালা স্থাপন জন্য কিছু টাকা সংগ্রহ করিয়া একটী ষ্টেজ নির্ম্মাণ করিতে থাকেন। গিরিশ-বাবুর আদেশক্রমে আমি শ্যামপুকুরে যাইয়া ঐ ষ্টেজ নির্ম্মাণ-কার্য্যে বিশেষ সাহায্য করি। উক্ত ষ্টেজ নির্ম্মাণ হইতে না হইতেই, ব্রজবাবু ইহলোক পরিত্যাগ করেন। নির্ম্মাণ-কার্য্য স্থগিত থাকে। তিন মাস পরে গিরিশবাবু, আমাকে উক্ত ষ্টেজের কাষ্ঠাদি লইয়া নূতন ষ্টেজ প্রস্তুত করিতে বলেন ও আমাকে সমস্ত সাজ-সরঞ্জাম প্রদান করেন। আমি স্বীয় বাটীতে ঐ সকল কাষ্ঠাদি লইয়া আসিয়া ও আপনা-আপনির মধ্যে ৬০৲ ষাট টাকা চাঁদা তুলিয়া ষ্টেজ নির্ম্মাণ ও একজন পেণ্টারকে দিয়া scene painting আরম্ভ করি। একখানি সিন আঁকা হইতে না হইতেই টাকা ফুরাইয়া গেল। টাকার জমা-খরচ আমি করিতাম। তখন আমাদের 'লীলাবতী'র রিহারস্যাল চলিতেছে। আমাদের মধ্যে এমনকি অধিকাংশ লোকই Blank verse (অমিত্রাক্ষর ছন্দ) পড়িতে জানিত না! গিরিশবাবু, তাহা কিরূপে পড়িতে হয়, সকলকে শিখাইয়া দেন। প্রকৃতপক্ষে থিয়েটারের বা অভিনয়ের ক, খ, শিক্ষা হইতেই গিরিশবাবু মাষ্টার। রিহারস্যাল খুব চলিতেছে, অথচ ষ্টেজ নাই। ক্রমে-ক্রমে এক-একখানি করিয়া 'লীলাবতী'র সমস্ত সিনগুলি আমার দ্বারা আঁকা হইল এবং আমিও সকলের নিকট অত্যন্ত আদর পাইলাম। তাহার পর ষ্টেজ complete (সম্পূর্ণ) হইলে, আমরা বৃন্দাবন পালের গলির রাজেন্দ্রলাল পালের বাটীতে ষ্টেজ বাঁধিয়া 'লীলাবতী'র অভিনয় সুচারুরূপে সম্পন্ন করি।" "My statement is correct." (Sd.) D. D. Sur.

ধর্ম্মদাসবাবুর statement পাঠে ভরসা করি, বিচক্ষণ পাঠকগণ 'বিশ্বকোষে'র "রঙ্গালয়"-লেখকের সত্যতার পরিমাণ বুঝিতে পারিবেন। যিনি শ্যামপুকুর যাইয়া ব্রজবাবুর ষ্টেজ নির্ম্মাণে সাহায্য করিতেন, সেই ধর্ম্মদাসবাবু লিখিতেছেন, ব্রজবাবুর মৃত্যুর তিন মাস পরে আমি গিরিশবাবুর কথামত শ্যামপুকুর যাইয়া কাষ্ঠাদি লইয়া আসি। আর 'বিশ্বকোষে' লিখিত হইয়াছে,—"ব্রজবাবু তখনও শয্যাগত। অর্দ্ধেন্দুবাবু

ব্রজবাবুর নিকট এই কাঠকাঠরা প্রার্থনা করায় তিনি আনন্দিত হইয়া তাহা দান করিলেন।" যে ব্যক্তি বড় সাধ করিয়া রঙ্গমঞ্চ নির্ম্মাণ করিতেছিলেন, রোগমুক্ত হইলে তাহা সম্পূর্ণ করিবার আশা রাখেন, তাঁহার শয্যাশায়ী অবস্থায় গিয়া তাঁহার নিকট কাঠগুলি প্রার্থনা করা সম্ভবপর নহে। আবার সেই সংবাদ শুনিয়া রোগী আনন্দিত হইয়া উঠিলেন, ইহাও নূতনত্ব বটে !

ব্রজবাবুর পীড়াকালীন গিরিশবাবু প্রায়ই রিহারশ্যালে যাইতে পারিতেন না বলিয়াই বোধহয় "অর্দ্ধেন্দুবাবু শিক্ষাদাতা হইলেন" 'বিশ্বকোষে' লিখিত হইয়াছে। কিন্তু নগেন্দ্রবাবু, রাধামাধববাবু তাঁহারাও যে গিরিশবাবুর অনুপস্থিতকালে ছোট-ছোট ভূমিকাগুলি শিখাইতেন, এ কথা 'বিশ্বকোষে' লিখিত হইল না কেন ?

'ন্যাসান্যাল থিয়েটার' সম্প্রদায় 'লীলাবতী'র পর 'নীলদর্পণে'র রিহারশ্যাল দিতে আরম্ভ করেন। 'বিশ্বকোষে' 'নীলদর্পণে'র রিহারশ্যাল ব্যাপার হইতে গিরিশবাবুকে একেবারে ছাঁটিয়া বাদ দেওয়া হইয়াছে। 'বিশ্বকোষ' বলিতেছেন,—"গিরিশবাবু ব্যতীত 'লীলাবতী'র দলের সকলেই আসিয়া জুটিলেন। পূর্ব্বোক্ত বন্ধুবান্ধবগণের যত্নে এবার কার্য্যের একটা শৃঙ্খলা স্থাপিত হইল। নগেন্দ্রবাবু সম্পাদক (সেক্রেটারী), ধর্ম্মদাস-বাবু কর্ম্মাধ্যক্ষ (ম্যানেজার), কার্ত্তিকবাবু বেশকারী (ড্রেসার) আর অর্দ্ধেন্দুবাবু পরিচালক ও শিক্ষক (Director ও Teacher) হইলেন।…অর্দ্ধেন্দুবাবুর প্রস্তাবে 'নীলদর্পণ' অভিনয় করা স্থির হয়।" কিন্তু এ কথা একেবারেই সত্য নহে। তৎকালীন ম্যানেজার ধর্ম্মদাসবাবু এবং পৃষ্ঠপোষক শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন নিয়োগী মহাশয়ের স্বাক্ষরিত অংশ 'গিরিশ-গীতাবলী' হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—

"যাহাই হউক সম্প্রদায় তৎপরে দ্বিগুণ উৎসাহে শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন নিয়োগীর গঙ্গা তটস্থ বৈঠকখানায় গিরিশবাবুর প্রস্তাবমত 'নীলদর্পণে'র রিহারশ্যাল দিতে লাগিলেন। রিহারশ্যাল সমাপ্ত হইলে, দর্শকবৃন্দের আগ্রহাতিশয় দর্শনে সম্প্রদায়, টিকিট বিক্রয় করিবার প্রস্তাব করেন। এ প্রস্তাবে তাঁহাদের অভিনয়-শিক্ষক শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ অসম্মত হন। তিনি বলেন,—"আমাদের রঙ্গমঞ্চ, দৃশ্যপট ও অন্যান্য সাজ-সরঞ্জাম এখনও এরূপ উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে নাই, যাহাতে 'ন্যাসান্যাল থিয়েটার' নামকরণ পূর্ব্বক টিকিট বিক্রয় করিয়া, সাধারণে প্রকাশিত হওয়া যায়।" কিন্তু সম্প্রদায়স্থ অধিকাংশই এরূপ উত্তেজিত হন যে, তাঁহাদের শিক্ষাগুরু,—যাঁহার অসাধারণ শিক্ষা-নৈপুণ্যে তাঁহাদের সম্প্রদায় এত প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল এবং যাঁহার বিপুল অধ্যবসায়-গুণে সুশিক্ষিত হইয়া, তাঁহারা 'নীলদর্পণ' অভিনয়ে এরূপ নবোৎসাহে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, সেই গিরিশবাবুর কথা রক্ষা করিতে অসম্মত হইলেন। চিরস্বাধীন গিরিশবাবু, তাঁহার বহুযত্নের শিক্ষাদানের 'নীলদর্পণ' অভিনয় দর্শনে, সাধারণে কিরূপ মন্তব্য প্রকাশ করে, সে কৌতূহল নিবৃত্তির আগ্রহ পরিত্যাগপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ সম্প্রদায়ের সংস্রব ত্যাগ করিলেন।"

(Sd.) Dhurma Dass Sur.

(Sd.) Bhooban Mohan Neogy. (সাঃ) শ্রীভুবনমোহন নিয়োগী।

১৩১৭ সাল, ভাদ্র মাসের 'নাট্যমন্দিরে' ধর্মদাসবাবুর স্বরচিত আত্মজীবনী প্রকাশিত হয়। তাহা হইতেও 'নীলদর্পণে'র রিহারস্তাল-বৃত্তান্ত উদ্ধৃত করিতেছি :—

"পরে 'নীলদর্পণে'র রিহারস্তাল আরম্ভ হইল। আমার স্বজাতি ও প্রতিবাসী শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন নিয়োগী মহাশয় তাঁহার গঙ্গার উপরিস্থিত বৈঠকখানা আমাদের রিহারস্তাল ও আপিস করিতে দিলেন এবং আমাদের সময়ে-সময়ে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। আমরাও দ্বিগুণ উৎসাহে কার্য্য করিতে লাগিলাম। ক্রমে আমাদের "নীলদর্পণ' অভিনয়-উপযোগী সিনগুলি সব প্রস্তুত হইয়া আসিল। টিকিট বিক্রয় করিয়া থিয়েটার করিবার জন্ত জোড়াসাঁকোর ৺মধুসূদন সান্ন্যাল মহাশয়ের বাটী (যে বাটী এখন ঘড়িওয়ালা বাটী বলিয়া খ্যাত) ঐ বাটী যোগাড় করা হইল। আমি স্টেজ প্রস্তুত করিলাম। আমরা সকলেই উৎসাহিত; কেবল গিরিশবাবুর অমত। কিন্তু আমাদের সকলে একেবারে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে—কেহই গিরিশবাবুর আপত্তি ও অমত গ্রাহ্য করিল না, বরং সকলেই একমত হইয়া স্থির করিল,—ওঁর অমত হয়, আমরা উঁহাকে চাহি না। উঁহাকে বাদ দিতে গেলে আমাদের সকলকে দমনে রাখে—এমন একজন আবশুক। কাজেই শ্রীযুক্ত বেণীমাধব মিত্র মহাশয়কে আমরা প্রেসিডেন্ট করিলাম। তাহাতে গিরিশবাবু আমাদের সকলের উপর রাগ করিলেন ও সেই কারণেই গিরিশবাবুর "লুপ্তবেণী" গানের সৃষ্টি হইল। কারণ আমরা বেণীবাবুর নাম বিজ্ঞাপনে ছাপাই নাই।"

এ সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্র তৎ-প্রণীত অর্দ্ধেন্দু জীবনীতে ('বঙ্গীয় নাট্যশালায় নট-চূড়ামণি স্বর্গীয় অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী' নামক পুস্তকে) যাহা লিখিয়াছেন, তাহাও আমরা (২০ পৃষ্ঠা হইতে) উদ্ধৃত করিতেছি :—

" 'নীলদর্পণে'র শিক্ষা সম্বন্ধে নানাবিধ তর্কবিতর্ক শুনিতে পাই ও মুদ্রাঙ্কিত কাগজ দেখিতে পাই। সেই সব কাগজ ও কথার বিশেষ যত্ন, যাহাতে প্রতীয়মান হয় যে 'নীলদর্পণে'র রিহারস্তালে আমার কোন হস্তক্ষেপ ছিল না, কেবল অর্দ্ধেন্দুর শিক্ষাতেই সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছিল। আমার সংস্রব ছিল বা না ছিল, তাহা জানাইবার প্রয়োজন নাই; কিন্তু 'নীলদর্পণ' সম্প্রদায় গঠিত করিয়াছিলেন, এ কথায় অর্দ্ধেন্দুর বিশেষ প্রশংসা হয় না। কারণ উক্ত সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণ দুইবার অতি উচ্চ প্রশংসার সহিত 'সধবার একাদশী' ও 'লীলাবতী' অভিনয় করিয়াছে। 'নীলদর্পণে' নাটককারের কৃতিত্ব 'লীলাবতী'র অপেক্ষা অধিক হইলেও 'লীলাবতী'তে 'নীলদর্পণ' অপেক্ষা অধিক শিক্ষার প্রয়োজন ছিল। যাঁহারা 'লীলাবতী' অভিনয় করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজনকে চাষার শিক্ষা দিলেই যথেষ্ট হইত; কারণ কঠিন-কঠিন ভূমিকা—সাবিত্রী, উড, গোলক বসু প্রভৃতি অর্দ্ধেন্দুশেখর স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছিলেন। 'লীলাবতী'তে সম্প্রদায় যেরূপ শিক্ষিত হইয়াছিল, তাহাতে নবীনমাধব, বিন্দুমাধব, সৈরিন্ধ্রী, সরলা প্রভৃতি ভূমিকার অধিক শিক্ষার প্রয়োজন ছিল না। যথা—'লীলাবতী'র শ্রীনাথের পক্ষে 'নীলদর্পণে'র দেওয়ান বিশেষ কঠিন নয়। 'নীলদর্পণে' আমার কোন সংস্রব ছিল না, ইহা প্রমাণ করিয়া যিনি অর্দ্ধেন্দুশেখরের বিশেষ প্রশংসার চেষ্টা করিবেন,

তাহাতে তিনি কৃতকার্য্য হইবেন না। অর্দ্ধেন্দুশেখরের সহিত 'নীলদর্পণে'র শিক্ষার অংশ না হোক, 'সধবার একাদশী' ও 'লীলাবতী'র শিক্ষার দাবী শ্রীযুক্ত রাধামাধব করও রাখেন। 'নীলদর্পণ' শিখাইবার অংশ অদ্যাবধি জীবিত ধর্ম্মদাসবাবু আমাকে কাগজে-কলমে দেন। 'নীলদর্পণ' সম্প্রদায়ের অনেকেই মহেন্দ্রলাল, মতিলাল, কাপ্তেন বেল, শিবচন্দ্র প্রভৃতি আজীবন আমাকে গুরু বলিয়া গৌরব করিতেন। যাঁহার অপর প্রশংসা নাই, তাঁহার পক্ষপাতী ব্যক্তি যদি সত্যের অপলাপ করিয়া তাঁহার প্রশংসাবৃদ্ধির প্রয়াস পান, তাহাতে ফল না হোক, কতক পরিমাণে মার্জ্জনীয় হইতে পারে। 'নীলদর্পণ' লইয়া আমার সহিত অর্দ্ধেন্দুর বিবাদ কেহ-কেহ প্রকাশ করিয়া থাকেন, কিন্তু ইহা অমূলক। 'ন্যাসান্যাল থিয়েটার' স্থাপনের কর্ত্তৃত্বভার শ্রীযুক্ত ধর্ম্মদাস সুর ও ৺নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অল্প ছিল না। নগেন্দ্রনাথ ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র অংশের শিক্ষাও দিতেন। কতকটা 'ষ্টার থিয়েটারে'র ম্যানেজার শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসুও এ কর্ত্তৃত্বের দাবী রাখেন। তিনি এই 'নীলদর্পণে' 'লীলাবতী'র ক্ষীরোদবাসিনী চলিয়া যাওয়ায় সৈরিন্ধ্রীর ভূমিকা পান ও এই তাঁহার প্রথম নাটক শিক্ষা। যে সময়ে অমৃতবাবু 'নীলদর্পণে' যোগ দেন, সে সময়ে আমি না থাকিবার কারণ কোনও বিবাদ নয়, মতের অনৈক্য মাত্র। আমার রচিত গান "লুপ্তবেণী বইছে তিরোধার" তাহার প্রমাণ। গানের শ্লেষ এই—"স্থান-মাহাত্ম্যে হাড়িশুঁড়ি পয়সা দে দেখে বাহার।" 'ন্যাসান্যাল থিয়েটার' নাম দিয়া, 'ন্যাসান্যাল থিয়েটারে'র উপযুক্ত সাজ-সরঞ্জাম ব্যতীত, সাধারণের সম্মুখে টিকিট বিক্রয় করিয়া অভিনয় করা আমার অমত ছিল। কারণ একেই তো তখন বাঙ্গালীর নাম শুনিয়া ভিন্নজাতি মুখ বাঁকাইয়া যায়, এরূপ দৈন্য অবস্থা 'ন্যাসান্যাল থিয়েটারে' দেখিলে কি না বলিবে—এই আমার আপত্তি। 'ন্যাসান্যাল থিয়েটার' নামে অনেকেই বুঝিবে যে ইহা জাতীয় রঙ্গমঞ্চ, বঙ্গের শিক্ষিত ও ধনাঢ্য ব্যক্তিগণের সমবেত চেষ্টায় ইহা স্থাপিত। কিন্তু কয়েকজন গৃহস্থ যুবা একত্র হইয়া ক্ষুদ্র সরঞ্জামে 'ন্যাসান্যাল থিয়েটার' করিতেছে, ইহা বিসদৃশ জ্ঞান হইল। এই মতভেদ। কিন্তু সে সময় টিকিট বেচিয়া টিকিটের অর্থ আত্মসাৎ করিবেন, এমন দুই-এক ব্যক্তি পৃষ্ঠপোষক হইয়াছেন। তাঁহারাই এই মতভেদকে শত্রুতা বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন।"

টিকিট বিক্রয় করিয়া অভিনয় করিবার যাঁহাদের অধিক আগ্রহ ছিল, অর্দ্ধেন্দুবাবুও তাঁহাদের মধ্যে একজন প্রধান। তাহার কারণ, তিনি তখন অন্য কোন কাজকর্ম্ম করিতেন না, নাট্যানুরাগবশতঃ আখড়া-গৃহেই সদাসর্ব্বদা থাকিতেন। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, আত্মীয়তাসূত্রে পাথুরিয়াঘাটায় মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ও সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর ভ্রাতৃদ্বয়ের বাটীতে থাকিয়া অর্দ্ধেন্দুবাবু লেখাপড়া করিতেন। কিন্তু কয়লাহাটায় (জোড়াসাঁকো, রতন সরকার গার্ডেন ষ্ট্রীটে) অভিনীত 'কিছু কিছু বুঝি' প্রহসনে দন্তবক্রের ভূমিকা (দন্ত-রোগাক্রান্ত সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের প্রতি শ্লেষব্যঞ্জক) অভিনয় করিয়া তিনি পাথুরিয়াঘাটা রাজবাটীতে বসবাস পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। এই মনোমালিন্য এত অধিক বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে ঠাকুরবাটী হইতে অর্দ্ধেন্দুবাবুর পিতা

৺শ্যামাচরণ মুস্তফী মহাশয় যে মাসোহারা পাইতেন, তাহাও বন্ধ হইয়া যায়। এই নিমিত্ত শ্যামাচরণবাবু অর্দ্ধেন্দুবাবুর উপর বিশেষ বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয়-বর্ণিত 'মানসী ও মর্ম্মবাণী' মাসিক পত্রিকায় (শ্রাবণ ১৩২৩ সাল) যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি:—

"অর্দ্ধেন্দুর কিছু টানাটানি ছিল, তাঁহাকে প্রায়ই টাকা দিতে হইত। 'নীলদর্পণে'র তৃতীয় অভিনয় রজনীতে অর্দ্ধেন্দুর অদর্শনে আমরা অস্থির হইয়া পড়িলাম; কোনও-রকম করিয়া যোগেন্দ্রনাথ মিত্রকে দিয়া তাঁহার কাজ চালাইয়া লইলাম। পরদিন প্রাতে অর্দ্ধেন্দুর বাড়ীতে গিয়া তাঁহার পিতা ৺শ্যামাচরণ মুস্তফী মহাশয়ের হস্তে নগেন বন্দ্যো চল্লিশটী টাকা দিয়া আসিলেন। তখনকার মত গোল মিটিয়া গেল। ইহার জন্য অর্দ্ধেন্দুকে দোষ দিতে পারি না। থিয়েটারের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি করিতে গিয়া তিনি নিজের সংসারের দিকে দৃক্‌পাত করিবার অবসর পান নাই। তাঁহারা পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুরবাড়ী হইতে বরাবর মাসে-মাসে যে বৃত্তি পাইয়া আসিতেছিলেন, 'কিছু কিছু বুঝি' প্রহসন অভিনয়ের পর হইতেই তাহা বন্ধ হইয়া যায়। সুতরাং থিয়েটারের জন্য তাঁহাদিগকে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্থ হইতে হইল। যদি আমরা তাঁহার অর্থাভাব মোচনের চেষ্টা না করিতাম, তাহা হইলে আমাদের আচরণ অত্যন্ত গর্হিত হইত।" ৬৭০ পৃষ্ঠা।

'লীলাবতী' নাটকের ক্ষীরোদবাসিনীর ভূমিকার অভিনেতা রাধামাধববাবু চলিয়া যাওয়ায়, 'নীলদর্পণ' নাটকের সৈরিন্ধ্রীব ভূমিকা অমৃতবাবুকে প্রদান করা হয়। 'বিশ্বকোষে' লিখিত হইয়াছে, অর্দ্ধেন্দুবাবুই তাঁহাকে সম্পূর্ণ শিক্ষাপ্রদান করেন। কিন্তু অমৃতবাবু তাহা স্বীকার করেন না। পূর্ব্বোক্ত তারিখের 'মানসী ও মর্ম্মবাণী' পত্রিকায় এতদ্‌সম্বন্ধে তাঁহার যে প্রতিবাদ বাহির হইয়াছিল, তাহাও নিম্নে উদ্ধৃত হইল:—

" 'বিশ্বকোষ' অভিধানে "রঙ্গালয়" শীর্ষক প্রবন্ধে একটু আধটু ভুল রহিয়া গিয়াছে। প্রথম দেখুন—রেবতীর ভূমিকা লইয়াছিলেন তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়, তিনকড়ি মান্না নহে।·· গিরিশবাবুর গানে আছে—"কলঙ্কিত শশী হরষে, অমৃত বরষে", এ স্থলে 'বিশ্বকোষে'র লেখক টীকা করিয়াছেন—"অমৃত বরষে—অমৃতলাল পাল—একজন অভিভাবক।" অথচ সকলেই জানিতেন যে ঐ 'অমৃত' সৈরিন্ধ্রীবেশী অমৃতলাল বসু। সৈরিন্ধ্রীর অশ্রুবর্ষণের উল্লেখ করিয়া "অমৃত বরষে" লেখা হইয়াছে। আর অমৃতলাল পাল কোনওকালে 'অভিভাবক' অথবা থিয়েটারের ভাবুকও ছিলেন না। এইরকম ছোটখাট অনেক ভুল উক্ত প্রবন্ধে আছে। পুনশ্চ দেখুন, লেখক একস্থলে বলিতেছেন, —নবীনমাধবের মৃত্যুশয্যার দৃশ্যে সৈরিন্ধ্রীকে যে 'মড়াকান্না' কাঁদিতে হইত, অমৃতবাবু সহজে তাহা আয়ত্ত করিয়া উঠিতে পারেন নাই। শেষে অমৃতবাবু নিজ বাড়ীর পার্শ্বস্থ একটা খালি ভাঙ্গা বাড়ীতে প্রত্যহ দু-প্রহর বেলায় গিয়া এই ক্রন্দন শিখিবার জন্য সাধনা করিতেন। অর্দ্ধেন্দুবাবু সেখানে গিয়া কাঁদিতে শিখাইতেন, উভয়ে গলা মিলাইয়া কান্না অভ্যাস করিতেন। আট-দশ দিন এইরূপ কঠোর সাধনায় অমৃতবাবু

মড়াকান্না আয়ত্ত করিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রত্যহ এই সাধনার বিষয় পল্লীস্থ স্ত্রীলোকেরা জানিত না, কাজেই রটিয়া গেল যে "ভাঙ্গা বাড়ীতে ভূতে রোজ কাঁদে।"—এই বর্ণনায় কিছু গলদ আছে। ব্যাপারটা এই:—আমি ত সৈরিন্ধ্রীর ভূমিকা গ্রহণ করিলাম। প্রথমে নিজে-নিজেই আমার পার্টটা আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করিতে ক্রটি করি নাই। একদিন অর্দ্ধেন্দুবাবু বলিলেন, 'তোমার পার্টটা কেমন হ'ল দেখি?' তিনি আমার পরীক্ষা লইয়া বলিলেন—'না, হয়নি।' এই বলিয়া সৈরিন্ধ্রীর প্রথম দৃশ্যে চুলের দড়ি বিনানর সময় কথার ভঙ্গী কেমন হওয়া উচিৎ, তাহা তিনি আমাকে বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা করিলেন। আমার মেয়েলিপনা ঠিক হইল না। গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আমি ভাবিলাম; বক্তৃতার ধরণটা ঠিক করিয়া লইতে বেশি দেরি হইবে না; আসল ব্যাপারটা হইতেছে—ঐ কান্না। ঐটাকে আয়ত্ত করিতে হইবে। এই মনে করিয়া আমি আমাদের ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী কালিদাস সান্ন্যাল মহাশয়ের নিকটে কান্না শিখিতে গেলাম। তাঁর সেকেলে ধরনের কান্না; সুরটাই মেয়েলি, কিন্তু আমার মনে হইল যেন emotionএর অভাব। আমার ঠিক উহা ভাল লাগিল না। আমি একাই চেষ্টা করিয়া দেখিব, এই প্রতিজ্ঞা করিয়া প্রত্যহ ঐ পড়ো-বাড়ীতে দ্বিপ্রহরে আমি মড়াকান্না অভ্যাস করিতাম। একাকী করিতাম; অর্দ্ধেন্দু বা অন্য কেহ আমার দোসর ছিলেন না। কয়েকদিন পরে আমি অর্দ্ধেন্দুকে বলিলাম,—'একবার আমার কান্নার জায়গাটা শোনো দেখি।' মড়াকান্নার অভিনয় দেখিয়া তিনি সানন্দে আমার হাত ধরিয়া বলিলেন—'বহুৎ আচ্ছা! বেশ হয়েছে।' "

অমৃতবাবু সম্বন্ধে 'বিশ্বকোষে' 'একটু আধটু ভুল' আছে, কিন্তু গিরিশবাবু সম্পর্কে সেই ভুলের মাত্রা অত্যধিক বাড়িয়া গিয়াছে। ১৩১৫ সালে, আশ্বিন মাসে মিনার্ভা থিয়েটারে অর্দ্ধেন্দুবাবুর শোক-সভায় গিরিশবাবু অর্দ্ধেন্দুবাবু সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ পাঠ করেন, তাহাতে 'বিশ্বকোষে'র এই সকল ক্রটী সম্বন্ধে উল্লেখ করেন। 'বিশ্বকোষ'-সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়ও সেই সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। তিনি সভাস্থলে বলেন,—" 'বিশ্বকোষে' প্রকাশিত "রঙ্গালয়" প্রবন্ধটী অর্দ্ধেন্দু-বাবুর পুত্র ব্যোমকেশবাবু আমাকে লিখিয়া দেন। নানা কারণে আমি এই প্রবন্ধটী গিরিশবাবু বা অমৃতবাবুকে দেখাইয়া লইতে পারি নাই। এক্ষণে বুঝিতেছি, এই প্রবন্ধটীতে অনেক গলদ রহিয়া গিয়াছে। যাহাই হউক পুনর্মুদ্রণকালে আমি ইহা সংশোধিত করিয়া বাহির করিব। আমি এ বিষয়ে অনভিজ্ঞ, ভরসা করি, আপনারা এতদ্‌বিষয়ে আমাকে সাহায্য করিবেন।"

'বিশ্বকোষ' কবে পুনর্মুদ্রিত হইবে এবং পুনর্মুদ্রণকালে ঐ সব ভুল-ভ্রান্তির সংশোধন হইবার সুবিধা হইবে কিনা বলিতে পারি না। তাই 'বিশ্বকোষে'র লেখা সম্বন্ধে আরও দুই-একটী অমূলক কথা এখানে বলা প্রয়োজন বোধ করি। যথা:—

"এই অভিনয়ের ('সধবার একাদশী') পর রঙ্গমঞ্চ মেরামতি হিসাবে ৪০৲ টাকার গোলমাল হয়। সেই গোলমাল লইয়া গিরিশবাবু রঙ্গমঞ্চ আটকাইয়া রাখেন। এই সূত্রে গিরিশবাবুর সহিত সমগ্র দলের বিবাদ হয়, এবং গিরিশবাবু দল ছাড়িয়া দেন।

এই অভিনয়ের পর গড়পারে জগন্নাথ দত্তের বাড়ী ইঁহাদের তৃতীয় অভিনয় হয়। এই অভিনয়ের জন্য রঙ্গমঞ্চের অভাব হয়। শিবপুরে তখন 'কৃষ্ণকুমারী'র অভিনয় হইত। সেই দলের রঙ্গমঞ্চ ক্রয় করিয়া আনিয়া অভিনয় করা স্থির হয়। গিরিশবাবু এই সংবাদ পাইয়া নিজে আসিয়া নিমচাঁদ অভিনয়ের জন্য প্রস্তুত হইলেন।" 'বিশ্বকোষ' — "রঙ্গালয় (বঙ্গীয়)", ১৮৭ পৃষ্ঠা।

"এদিকে দৃশ্যপট আঁকা ও প্ল্যাটফর্ম্ম তৈয়ারী যখন অর্দ্ধেক হইয়াছে, তখন ইঁহাদের মধ্যে এক ব্যক্তি শক্রতা করিয়া উহা পুড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই ব্যক্তি ইঁহাদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন, মধ্যে-মধ্যে দলে আসিয়া অভিনয়াদি করিতেন। অভিনয়ে তিনি সুখ্যাতি পাইয়াছিলেন, কিন্তু টিকিট বেচিয়া থিয়েটার করিতে তাঁহার আপত্তি ছিল বলিয়া তিনি দল ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার অভাবেও যখন দেখিলেন, এই সম্প্রদায় স্বচ্ছন্দে রঙ্গমঞ্চ প্রস্তুত করিয়া তুলিতে লাগিল, তখন তিনি ঈর্ষাপরবশ হইয়া এই কুৎসিত উপায় অবলম্বন করিবেন স্থির করিলেন। অর্দ্ধেন্দুবাবু, নগেন্দ্রবাবু ও ধর্ম্মদাসবাবু এত পরিশ্রমে সংগৃহীত কাষ্ঠগুলি অনায়াসে ভস্মীভূত হইবে এই ভয়ে, সংবাদ পাইবামাত্র সেইদিনই সমস্ত খুলিয়া শ্যামবাজারে ৺বৃন্দাবন পালের বাড়ীতে লইয়া আসিলেন। বৃন্দাবনবাবুর পোষ্যপুত্র রাজেন্দ্রবাবু ইঁহাদের বাল্যবন্ধু। তিনি সাহায্য করিতে স্বীকার করায় তাঁহার বৃহৎ উঠানে মঞ্চ বাঁধা হইতে লাগিল। এই সময় ধর্ম্মদাসবাবু ও কার্ত্তিকচন্দ্র পাল একপ্রকার ২৪ ঘণ্টা পরিশ্রম করিয়া কার্য্য করিতে লাগিলেন। রাজেন্দ্রবাবুর বাড়ীতে আশ্রয় লওয়ায় আবার ইঁহাদিগকে টিকিট বেচিবার আশা ত্যাগ করিতে হইল। নগেন্দ্রবাবুর বাড়ীতে আখড়াই চলিতে লাগিল। টিকিট বেচা হইবে না শুনিয়া গিরিশবাবু আবার দলে মিশিলেন। সম্প্রদায় তাঁহা হইতে ইতিপূর্ব্বে নানারূপে উৎপীড়িত হইলেও চক্ষুলজ্জায় পড়িয়া তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন।" 'বিশ্বকোষ' — "রঙ্গালয় (বঙ্গীয়)", ১৯০ পৃষ্ঠা।

ইহা হইতেই পাঠকগণ আমাদের বাক্যের সত্যতা উপলব্ধি করিবেন এবং স্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন, গিরিশবাবুকে সাধারণের নিকট হীন প্রতিপন্ন করাই যেন "রঙ্গালয়"-প্রবন্ধকারের উদ্দেশ্য।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

সান্ন্যাল-ভবনে 'ন্যাসান্যাল থিয়েটার'
(সাধারণ নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা)

১২৭৯ সাল, ২৩শে অগ্রহায়ণ (৭ই ডিসেম্বর ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দ) শনিবার, বঙ্গীয় সাধারণ নাট্যশালার চিরস্মরণীয় দিন। এই দিনেই সাধারণ বঙ্গ-নাট্যশালা প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। বাগবাজারে স্থাপিত যে 'ন্যাসান্যাল থিয়েটার' এ পর্য্যন্ত বিনামূল্যে টিকিট বিতরণে অভিনয় করিয়া 'প্রাইভেট থিয়েটার' নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছিল, টিকিট বিক্রয়ে সর্ব্বসাধারণকে অভিনয় দর্শনার্থে আহ্বান করিয়া এই দিনে তাহা সাধারণ রঙ্গালয় (Public Theatre) নাম ধারণ করিল। জোড়াসাঁকো, ৩৬৫ নং অপার চিৎপুর রোডস্থ ৺মধুসূদন সান্যাল মহাশয়ের বাটীও বঙ্গ-নাট্যশালার ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিল, কারণ এই সান্যাল-ভবনেই বঙ্গ-নাট্যশালা সর্ব্বসাধারণের নিমিত্ত প্রথম উন্মুক্ত হইল। সুবিখ্যাত নাট্যকার রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের 'সধবার একাদশী' নাটক লইয়াই—'ন্যাসান্যাল থিয়েটারে'র বীজ রোপিত, 'লীলাবতী'তে তাহা অঙ্কুরিত এবং 'নীলদর্পণে' তাহা বিকশিত হইয়া সর্ব্বসাধারণের গোচরীভূত হইল,—এ নিমিত্ত বঙ্গ-নাট্যশালার অস্তিত্বের সহিত তাঁহার নামও চিরজাগরূক থাকিবে।

মহাসমারোহে সান্যাল-ভবনে ১২৭৯ সাল, ২৩শে অগ্রহায়ণ তারিখে বহু সম্ভ্রান্ত দর্শক-সমাগমে 'নীলদর্পণ' নাটকের প্রথমাভিনয় হয়। প্রথমাভিনয় রজনীর* অভিনেতাগণ :—

গোলক বসু, উড সাহেব, জনৈক রাইয়ত এবং সাবিত্রী	অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী।
নবীনমাধব	নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
বিন্দুমাধব	কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
তোরাপ, রাইচরণ, গোপ এবং নীলকরদিগের মোক্তার	মতিলাল সুর।

* 'নীলদর্পণে'র ইহা প্রথমাভিনয় নহে। 'নীলদর্পণ' নাটক ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকায় প্রথম মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। গ্রন্থকার দীনবন্ধুবাবুর উৎসাহেই তথায় ইহার অভিনয় হইয়াছিল।

সাধুচরণ, ম্যাজিষ্ট্রেট ও পদী ময়রাণী	মহেন্দ্রলাল বসু।
সৈরিন্ধ্রী	শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু।
রোগ সাহেব ও খুড়ী	অবিনাশচন্দ্র কর।
গোপীনাথ দেওয়ান	শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
নবীনমাধবের মোক্তার ও আদুরী	গোপালচন্দ্র দাস।
কবিরাজ	শশীলাল দাস।
সরলতা	শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়।
রেবতী	তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়।
লাঠিয়াল	পূর্ণচন্দ্র মিত্র।
রাখাল	যদুনাথ ভট্টাচার্য্য।
খালাসী	গোলকনাথ চট্টোপাধ্যায়।

অভিনয় দর্শনে সকলেই একবাক্যে সুখ্যাতি করিয়াছিলেন, কেবল দীনবন্ধুবাবু আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন,—"ইহাতে একজন যোগ্য গম্ভীর অংশের (serious part) actor যোগদান করেন নাই।" বলা বাহুল্য, গিরিশবাবুকে লক্ষ্য করিয়াই এ কথা বলা হইয়াছিল।

১৪ই ডিসেম্বর (১লা পৌষ) 'নীলদর্পণে'র দ্বিতীয়াভিনয় করিয়া 'ন্যাসান্যাল' সম্প্রদায় পর সপ্তাহে ২১শে ডিসেম্বর (৮ই পৌষ) দীনবন্ধুবাবুর 'জামাই বারিকে'র অভিনয় করেন। তৃতীয় ও চতুর্থ রজনী 'জামাই বারিক' অভিনয়ের পর ৫ঠা জানুয়ারী (২২শে অগ্রহায়ণ) পঞ্চম রজনীতে দীনবন্ধুবাবুর 'নবীন তপস্বিনী' নাটকের অভিনয় হয়। তৎপরে 'ন্যাসান্যালে' দীনবন্ধুবাবুর 'বিয়েপাগলা বুড়ো' ১৫ই জানুয়ারী (৩রা মাঘ) বুধবারে অভিনীত হয়। পাঠকগণের বোধহয় স্মরণ আছে, 'বাগবাজার অ্যামেচার থিয়েটারে' 'সধবার একাদশী'র সঙ্গে 'বিয়েপাগলা বুড়ো' চোরবাগানে স্বর্গীয় লক্ষ্মীনারায়ণ দত্ত মহাশয়ের বাটীতে পূর্ব্বে অভিনীত হইয়াছিল। 'ন্যাসান্যাল থিয়েটারে' বুধবারে অভিনয় এই প্রথম আরম্ভ হইল। 'বিয়েপাগলা বুড়ো'র সঙ্গে আর কয়েকখানি রঙ্গনাট্যও অভিনীত হইয়াছিল। তন্মধ্যে 'মুস্তফী সাহেব কা পাক্কা তামাসা' বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

দীনবন্ধুবাবুর একমাত্র 'কমলে কামিনী' ব্যতীত আর সমস্ত নাটকগুলি এইরূপে একে-একে 'ন্যাসান্যাল থিয়েটারে' অভিনীত হইয়া যাইলে সম্প্রদায় নূতন নাটকের সন্ধান করিতে লাগিলেন। সুপ্রসিদ্ধ 'অমৃতবাজার পত্রিকা'-সম্পাদক স্বর্গীয় শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয় পূর্ব্ব হইতেই 'ন্যাসান্যাল থিয়েটারে'র হিতৈষী ও উৎসাহদাতা ছিলেন। 'নয়শো রূপেয়া' নামক একখানি সামাজিক নাটক তিনি প্রণয়ন করিয়াছিলেন। এই নাটকখানি অতঃপর 'ন্যাসান্যাল থিয়েটারে' অভিনীত হয়।

দুই মাস পরে 'ন্যাসান্যালে' গিরিশচন্দ্রের যোগদান ও 'কৃষ্ণকুমারী'র অভিনয়

'নয়শো রূপেয়া' অভিনয় করিয়া সম্প্রদায় আর-একখানি ভাল নাটকের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু সেরূপ কোনও নাটক না পাওয়ায়, পুরাতন হইলেও উৎকৃষ্ট বোধে তাঁহারা মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত-বিরচিত 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক পুনরভিনয় করা স্থির করিলেন।

. 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকে কে কোন ভূমিকা গ্রহণ করিবেন, সম্প্রদায় তাহার একটী খসড়া প্রস্তুত করিলেন। কিন্তু ভীমসিংহের ভূমিকা কে গ্রহণ করিবে? যাঁহাদের নাম নির্ব্বাচিত হইল, তাহা সর্ব্ববাদীসম্মত হইল না। কেহ-কেহ বলিলেন, "গিরিশবাবু যদি ভীমসিংহের ভূমিকা-অভিনয় করেন, তাহা হইলে 'ন্যাসান্যাল থিয়েটারে' আবার একটা sensation উপস্থিত হয়।" এইরূপ নানা তর্কবিতর্কের পর সম্প্রদায় ইতস্ততঃ করিয়া অবশেষে গিরিশবাবুর বাটী আসিয়া তাঁহাকে ধরিয়া বসিলেন। পেশাদারী থিয়েটার করিতে গিরিশচন্দ্রের যে কারণে আপত্তি, তাহা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। যাহাই হউক, শৈশব-বান্ধবগণের অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া সর্ব্বশেষে এই স্থির হইল, তিনি অবৈতনিক(amateur)ভাবে থিয়েটারে যোগদান করিবেন, এবং থিয়েটারের বিজ্ঞাপনে তাঁহার নাম অপ্রকাশিত থাকিবে। সেইরূপ ব্যবস্থাই হইল। ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে তিনি 'ন্যাসান্যাল থিয়েটারে' যোগদান করিলেন। সাধারণ নাট্যশালার প্রতিষ্ঠার দিন হইতে দুই মাস কাল পর্য্যন্ত গিরিশচন্দ্র থিয়েটারের সহিত কোনও সম্পর্ক রাখেন নাই।

'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের শিক্ষা গিরিশচন্দ্র অতি যত্নের সহিত প্রদান করিয়াছিলেন। কারণ, শোভাবাজার রাজবাড়ীতে পূর্ব্বে ইহার একবার অভিনয় হইয়া গিয়াছিল। 'বেঙ্গল থিয়েটারে'র প্রথিতনামা ম্যানেজার ও নট-নাট্যকার বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ইহাতে ভীমসিংহের ভূমিকাভিনয় করিয়াছিলেন। যথাসময়ে 'কৃষ্ণকুমারী'র অভিনয় ঘোষণা করা হইল। গিরিশচন্দ্র আপনার নাম প্রকাশে অসম্মত হওয়ায়, 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের হ্যাণ্ডবিলে এইরূপ লিখিত হইল, "ভীমসিংহ—A distinguished amateur."* ২২শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে (বঙ্গাব্দ ১২৭৯, ১২ই ফাল্গুন)

* গিরিশচন্দ্র অর্দ্ধেন্দু-জীবনীতে লিখিয়াছেন,—"যখন 'কৃষ্ণকুমারী'র অভিনয় হইয়াছিল, তখন আমায় ('ন্যাসান্যাল থিয়েটারে') যোগ দিতে হয়। ভীমসিংহের ভূমিকা আমার উপর অর্পিত হয়। বর্ণিত মতভেদ এই সময় কিছু বিস্তৃত হইয়া বিচ্ছেদের আকার ধারণ করে। আমি আমার নাম amateur বলিয়া বিজ্ঞাপিত না হইলে, অভিনয় করিতে অসম্মত হই। অর্থলোভী ব্যক্তিরা আমার যোগদানে তাহাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে না, এই আশঙ্কায় ওরূপ বিজ্ঞাপন দিতে আপত্তি করিলেন। অর্দ্ধেন্দু'কেও সে আপত্তি বুঝাইতে তাঁহারা সক্ষম হইয়াছিলেন। কিন্তু উক্তরূপ বিজ্ঞাপিত না হইয়া আমি রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইতে একান্ত আপত্তি করায়, "ভীমসিংহ—By a distinguished amateur" প্ল্যাকার্ডে প্রকাশিত হয়।"

শনিবারে 'ন্যাসান্যাল থিয়েটারে' 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের প্রথমাভিনয় হয়। প্রথমাভিনয় রজনীর অভিনেতাগণের নাম :-

ভীমসিংহ	গিরিশচন্দ্র ঘোষ।
বলেন্দ্রসিংহ	নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
ধনদাস	অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী।
সত্যদাস	মতিলাল সুর।
জগৎসিংহ	কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
নারায়ণ মিশ্র	গোপালচন্দ্র দাস।
দূত	শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
অহল্যাদেবী	মহেন্দ্রলাল বসু।
কৃষ্ণকুমারী	শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়।
বিলাসবতী	অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেলবাবু)।
মদনিকা	শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু।

প্রথমাভিনয় রজনীতে গ্রন্থকার স্বয়ং মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। ক্ষেত্রমোহনবাবু বলেন,-"অভিনয়ান্তে ভিতরে আসিয়া, তিনি গিরিশবাবুর নাট্যপ্রতিভার ভূয়সী প্রশংসা করেন। নগেন, অর্দ্ধেন্দু এবং ভুনিবাবুর (শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসুর)ও খুব সুখ্যাতি করিলেন। পরে আমাকে দেখিতে পাইয়া, 'Krishnakumary you have done to perfection' বলিয়া আমাকে কোলে করিয়া নাচিয়াছিলেন।" বস্তুতঃ 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অভিনীত হইয়াছিল। গিরিশচন্দ্র ভীমসিংহের ভূমিকাভিনয়ে অসাধারণ কলানৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন। নবম পরিচ্ছেদে লিখিত হইয়াছে, শোভাবাজার রাজবাটীতে 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। নাট্যাচার্য্য স্বর্গীয় বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ইহাতে ভীমসিংহের ভূমিকাভিনয় করিয়া গৌরবলাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু উৎকৃষ্টরূপে অভিনীত ভূমিকা যে চিন্তার দ্বারা উৎকৃষ্টতর অভিনীত হইতে পারে, ভীমসিংহের অভিনয়ে গিরিশচন্দ্র তাহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছিলেন। 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকে (৫ম অঙ্ক, ৩য় গর্ভাঙ্কে) একমাত্র কন্যা কৃষ্ণকুমারীর শোকে উন্মাদগ্রস্ত ভীমসিংহ বলিতেছেন, "মানসিংহ-মানসিংহ-মানসিংহ! হুঁঃ-তাকে তো এখনই নষ্ট করবো। আমি এই চল্লেম।" বিহারীবাবু মানসিংহ নামটী একই সুরে তিনবার উচ্চারণ করিতেন। কিন্তু গিরিশবাবু প্রথম মানসিংহ নামটী এরূপভাবে উচ্চারণ করিতেন যেন নামটী ক্ষিপ্ত ভীমসিংহের মস্তিষ্কে দুঃস্বপ্নের ছায়ার ন্যায় পতিত হইত, দ্বিতীয় মানসিংহের উচ্চারণে বোধ হইত, যেন সেই ছায়া কিঞ্চিৎ দীপ্তি পাইয়াছে-যেন কি দুর্ঘটনা স্মরণ হইতেছে; তৃতীয়বারে ক্ষিপ্ত রাজার স্মৃতিপটে শত্রু মানসিংহ সুস্পষ্ট দাঁড়াইল; এই শেষের মানসিংহ দেখিবামাত্র অসিমোচনপূর্ব্বক ভীমসিংহ তাহাকে বধ করিতে ছুটিল। শুনিয়াছি, গিরিশচন্দ্রের এই তৃতীয়বারে উচ্চারিত মানসিংহের গম্ভীর গর্জ্জনে সম্মুখস্থ কয়েকজন দর্শক বিহ্বল হইয়া চেয়ার হইতে পড়িয়া গিয়াছিলেন। তন্মধ্যে

একজন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন।

উক্ত গর্ভাঙ্কেই কন্যা-শোকাতুরা রাণীকে ভীমসিংহ বলিতেছেন, "মহিষী যে? দেখ, তুমি আমার কৃষ্ণাকে দেখেছ? কৈ?" বিহারীবাবু এই অংশ কাঁদিতে-কাঁদিতে অভিনয় করিতেন। গিরিশবাবুর অভিনয়ে ক্রন্দন ছিল না; কৃষ্ণকুমারী যেন কোথায় গিয়াছে—ভীমসিংহ প্রিয় দুহিতাকে খুঁজিতেছেন। গিরিশবাবুর এই পরিবর্ত্তিত অভিনয় বিহারীবাবুর রোদন অপেক্ষা দর্শকগণের হৃদয়ভেদী হইয়াছিল।

প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী ভবানীর বংশধর নাটোরের রাজা চন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর এই সময়ে 'ন্যাসান্যাল থিয়েটারে' আসিতেন। তিনি যেরূপ উদারহৃদয় ও মহানুভব—সেইরূপ নাট্যামোদীও ছিলেন। গিরিশ-গুণমুগ্ধ চন্দ্রনাথ স্বহস্তে আপনার রাজ-পরিচ্ছদে গিরিশচন্দ্রকে ভীমসিংহ সাজাইয়া তাঁহার তরবারি গিরিশচন্দ্রকে প্রদান করিয়াছিলেন।

'বিশ্বকোষে' রাজা চন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক গিরিশবাবুকে সাজাইয়া দিবার উল্লেখ তো নাই-ই, পক্ষান্তরে লিখিত হইয়াছে,—"গিরিশবাবু প্রথম দিন ভীমসিংহ অভিনয় করিয়াই বিনা কারণে দলত্যাগ করেন। দ্বিতীয় দিনের অভিনয়ে অর্দ্ধেন্দুবাবু একাই ভীমসিংহ এবং তাঁহার নিজের অংশ ধনদাস অভিনয় করেন। এই অভিনয়ে এক ব্যক্তি দ্বারা যুগপৎ দুই বিরোধী রস—করুণ ও হাস্যরসের অভিনয় দেখিয়া রাজা চন্দ্রনাথ মুগ্ধ এবং বিস্মিত হইয়া অর্দ্ধেন্দুবাবুকে উপহার দিয়াছিলেন।" নাট্যাচার্য্য অমৃতলালবাবু 'বিশ্বকোষে' উহা পাঠ করিয়া আমাকে বিশেষ করিয়া ইহাই লিখিতে বলেন যে,—"রাজা চন্দ্রনাথ যদি অর্দ্ধেন্দুবাবুকে উপহার দিয়া থাকেন, তাহা লুকাইয়া দিয়াছিলেন। কারণ সে সময়ে সম্প্রদায় তাহা জানিতে পারিলে সকলেই দল ছাড়িয়া দিতেন, সে সময়ে তাঁহাদের এতটা মনের তেজ ছিল। গিরিশবাবুকে নিজের গাত্র হইতে পোষাক খুলিয়া পরাইয়া দেওয়ায় সকলেই সম্মান বোধ করিয়াছিল মাত্র; এবং সে পরিচ্ছদ থিয়েটারেরই হইয়াছিল। গিরিশবাবু তাহা নিজের বাটীতে লইয়া যান নাই। প্রথম রাত্রি মাত্র ভীমসিংহের ভূমিকা অভিনয় করিয়া গিরিশবাবুর চলিয়া যাওয়ার সংবাদও অমূলক। মার্চ্চ মাসে থিয়েটার উঠিয়া যায়, তিনি শেষ পর্য্যন্ত ছিলেন।"

সান্যাল-ভবনে ২২শে ফেব্রুয়ারী, 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের প্রথমাভিনয় হয়, ৮ই মার্চ্চ উক্ত ভবনে 'ন্যাসান্যালে'র শেষ অভিনয় হইয়া থিয়েটার বন্ধ হইয়া যায়। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে, 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকাভিনয়ের পর 'ন্যাসান্যাল থিয়েটার' সান্যাল-ভবনে আর পনের দিন মাত্র ছিল। 'বিশ্বকোষে' তৎপর লিখিত হইয়াছে,—"বন্ধ হইবার কিছু পূর্ব্বে গিরিশবাবু বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা' নাটকাকারে পরিবর্ত্তন করিয়া দেন। উপন্যাস হইতে নাট্যগঠন এই প্রথম। ইহার অভিনয় হইয়াছিল।" 'বিশ্বকোষে'র কথাই যদি সত্য হয়, প্রথম দিন ভীমসিংহ অভিনয় করিয়াই যদি গিরিশবাবু দলত্যাগ করিয়া যান, তাহা হইলে পুনরায় 'বিশ্বকোষে'র উক্তি অনুসারেই আমরা জিজ্ঞাসা করি, অবশিষ্ট ঐ পনের দিনের মধ্যে গিরিশবাবু আবার কবে আসিয়া থিয়েটারে যোগদান করিলেন, কবে 'কপালকুণ্ডলা' নাটকাকারে গঠিত করিলেন, কবেই বা তাহার অভিনয় হইল?

'বিশ্বকোষ' হইতে আর-একটী মজার সংবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। 'বিশ্বকোষে' প্রকাশিত হইয়াছে,—"এক মঙ্গলবারে তখনকার বড়লাট সাহেব নিজে থিয়েটার দেখিতে আসেন। তিনি পূর্ব্বে কোন সংবাদ না দিয়াই অভিনয়ের প্রাক্কালে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। একেবারে দরজায় গাড়ী আসিয়া লাগিলে সকলে জানিতে পারিলেন, বড়লাট সাহেব আসিয়াছেন।" 'বিশ্বকোষ'—"রঙ্গালয় (বঙ্গীয়)", ১৯৪ পৃষ্ঠা।

প্রকৃত ঘটনা এই,—২৫শে ফেব্রুয়ারী (১৮৭৩ খ্রী) মঙ্গলবারে মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, তৎকালীন বড়লাট লর্ড নর্থব্রুককে তাঁহাদের পাথুরিয়াঘাটা রাজবাটীর অভিনয় দেখাইবার জন্য বহুদিন পরে মহাসমারোহে রাজবাটীর পুরাতন রঙ্গমঞ্চ পুনঃসংস্কৃত করিয়া অভিনয় আয়োজন করেন। বড়লাট বাহাদুর মঙ্গলবারে পাথুরিয়াঘাটার রাজবাটীর অভিনয় দেখিতে আসিবেন, এ সংবাদ সহরে রাষ্ট্র হইয়া পড়ে। লাটদর্শনে সেদিন চিৎপুর রোডে বহু লোক-সমাগম হইবে,—নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ রাজবাটীতে গিয়া অভিনয় দর্শন করিবে, কিন্তু অভিনয় দর্শনে একান্ত ইচ্ছা থাকিলেও প্রবেশাধিকার না পাইয়া অনিমন্ত্রিতগণকে নিরাশ হইয়া ফিরিতে হইবে। সেদিন যদি 'ন্যাসান্যাল থিয়েটারে' একটী বিশেষ অভিনয় (special performance) ঘোষণা করা যায়, তাহা হইলে এই হুজুগে একটা বিক্রয়েব সম্ভাবনা বুঝিয়া সম্প্রদায় উক্ত মঙ্গলবার তারিখে 'নীলদর্পণে'র অভিনয় বিজ্ঞাপিত করেন। জোড়াসাঁকোস্থ 'ন্যাসান্যাল থিয়েটার' হইতে অতি অল্প দূরেই পাথুরিয়াঘাটা রাজবাটীব গলির মোড়। আলোকমালায় সজ্জিত 'ন্যাসান্যাল থিয়েটার' দর্শনে ভ্রমবশতঃ বড়লাটের গাড়ী আসিয়া থিয়েটারের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিল। ইঁহারা সম্ভ্রমসহকারে পাথুরিয়াঘাটার গলি দেখাইয়া দিয়াছিলেন। এই ঘটনাটুকু অবলম্বনে, 'বিশ্বকোষে'র "রঙ্গালয়"-প্রবন্ধলেখক তাঁহার অপূর্ব্ব কল্পনায় এই আজগুবি সংবাদ বাহির করিয়াছিলেন।

'কৃষ্ণকুমারী' নাটক অভিনয় হইবার পূর্ব্বে 'ভারতমাতা' বলিয়া একখানি নাটিকা 'ন্যাসান্যাল থিয়েটারে' অভিনীত হইয়া দর্শকগণের নিকট অতিশয় সমাদৃত হইয়াছিল। 'ভারতমাতা' সম্বন্ধে নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় বলেন,—"এই সময়ে সহরে আর-একটা বিষয়ের অল্পে-অল্পে আদর হচ্ছিল, সেটা স্বদেশ-হিতৈষিতা, স্বাধীনতা ইত্যাদি। ন্যাসান্যাল নবগোপালের হিন্দুমেলা-টেলা উপলক্ষ্যে নবগোপাল ও মনোমোহন বসুর বক্তৃতাদিতে ঐ সকল কথার আলোচনা হ'ত, তখন হেমবাবুর "ভারত-সঙ্গীত" নূতন হয়েছে, তখন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের "মলিন মুখচন্দ্রমা ভারত তোমারি" গানটী নূতন রচিত হয়েছে। এই সময়ে আমরা 'ন্যাসান্যাল থিয়েটারে' 'ভারতমাতা' ব'লে একটা ছোটখাট দৃশ্যকাব্য দিলেম। এই 'ভারতমাতা'র অভিনয় বড়ই শুভক্ষণে আরম্ভ হইয়াছিল। সাধারণে বিষয়টী বড় appreciate করলে। 'ভারতমাতা'র ক'খানা প্রচলিত গান ছিল, সেগুলার আদর এমন বেড়ে গেল যে, শেষে আমাদের যেদিন 'ভারতমাতা'র অভিনয় না হ'ত, সেদিন দর্শকের তুষ্টির জন্য প্ল্যাকার্ডের পরিশেষে 'ভারত-সঙ্গীত' ব'লে বিজ্ঞাপন দিতে হ'ত। মহেন্দ্রবাবু ভারতমাতা সাজতেন। এত সুন্দর অভিনয় করেছিলেন যে, আমরা তাঁকে মা ব'লে ডাকতেম।"

দীনবন্ধুবাবুর 'নীলদর্পণা'দি অভিনয়ের পর ইয়ুরোপীয় নাটকের আদর্শে গঠিত মাইকেলের 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকাভিনয়ে 'ন্যাসান্যালে'র বিশেষরূপ গৌরববৃদ্ধি হইয়াছিল। বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি 'ন্যাসান্যাল থিয়েটারে' আসিতেন ও সম্প্রদায়ের সহিত আলাপ-পরিচয় করিতেন। নাটোরাধিপতি রাজা চন্দ্রনাথ ও সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক Sir W. W. Hunter প্রভৃতি 'ন্যাসান্যাল' সম্প্রদায়ের বিশেষ শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। হাণ্টার সাহেব প্রায়ই ইংরাজ দর্শকগণ সঙ্গে লইয়া থিয়েটার দেখিতে আসিতেন।

'ন্যাসান্যাল থিয়েটারে' প্রায় প্রত্যেক সপ্তাহেই নূতন নাটক অভিনীত হইত। নাটকাভিনয়ের পর ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র রঙ্গাভিনয় হইত। যথা—'The Hunchback' ('কুব্জ ও দর্জ্জি'), 'Model school and its examination', 'The Goosequill fight', 'বিলাতীবাবু', 'Charitable dispensary', 'Public subscription book', 'Greenroom of a private theatre', 'Distribution of title of honor' etc., 'পরীস্থান', 'মুস্তফী সাহেবকা পাক্কা তামাসা' ইত্যাদি। 'বিশ্বকোষে' লিখিত হইয়াছে, "তখন সহরে যে সকল প্রাত্যহিক ঘটনা ঘটিত, তাহা হইতেই অভিনয়ের বিষয় নির্ব্বাচিত হইত। ইহার জন্য পূর্ব্ব হইতে বিশেষ আয়োজন করা হইত না। অনেক বিষয় লিখিয়া লিপিবদ্ধও করা হইত না। অর্দ্ধেন্দুবাবু, অমৃতবাবু, গিরিশবাবু, মহেন্দ্রবাবু প্রভৃতি প্রধান-প্রধান অভিনেতারা কোন-একটা বিষয়ে আপন-আপন বক্তব্য স্থির করিয়া লইয়া স্টেজে বাহির হইয়া পড়িতেন।" অভিনেতারা রঙ্গমঞ্চে দাঁড়াইয়া উত্তর-প্রত্যুত্তর নিজ ইচ্ছামত করিতেন। বাহাদুরি এই, পরস্পরের এই উক্তি-প্রত্যুক্তিতে গল্পটী ঠিক বজায় থাকিত।

পাঠকগণ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, প্রতি সপ্তাহে নূতন-নূতন নাটক এবং নূতন-নূতন রঙ্গ-নাট্যাভিনয় কিরূপে হইত? পূর্ব্বে 'সধবার একাদশী', 'লীলাবতী' ও 'নীলদর্পণ' দীর্ঘকাল ধরিয়া রিহারস্যাল দেওয়ায় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অভিনীত হইয়াছিল। কিন্তু সান্যাল-ভবনস্থ 'ন্যাসান্যাল থিয়েটারে' এত অল্প সময়ের মধ্যে কেমন করিয়া সম্প্রদায় এরূপ ঘন-ঘন নূতন নাটক অভিনয় করিতেন?" ইহার উত্তর আমরা গিরিশবাবুর কথাতেই দিব। তিনি অর্দ্ধেন্দু-জীবনীতে লিখিয়াছেন, "এরূপ বিস্ময় জন্মিতে পারে, কারণ পাঠক জানেন না যে 'ন্যাসান্যাল থিয়েটার' হইতে প্রম্‌টার নামে একজন নেপথ্যে অভিনয়কারী সৃষ্টি হইয়াছে। প্রম্‌টারের বলেই 'ন্যাসান্যাল থিয়েটারে' নূতন-নূতন নাটক বুধবারে ও শনিবারে অভিনীত হইত। ইহাতে রঙ্গালয়ের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা আজও চলিতেছে।"

নগেনবাবু, অমৃতবাবু, মহেন্দ্রবাবু, মতিলালবাবু প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতাগণ তাঁহাদের সুযোগমত প্রম্‌টারের কার্য্য করিতেন। তন্মধ্যে কিরণবাবুই সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রম্‌টার ছিলেন।

প্রত্যেক সপ্তাহে নূতন নাটকের অভিনয়ে 'ন্যাসান্যাল থিয়েটারে'র আয় বেশ হইত। প্রথম-প্রথম যেরূপ অধিক বিক্রয় হইয়াছিল, ক্রমে তাহা কিছু-কিছু করিয়া কমিতে থাকে বটে, কিন্তু 'কৃষ্ণকুমারী' অভিনয়ে আবার বিক্রয় বাড়িয়া যায়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রতি সপ্তাহে শনি ও বুধবারে অভিনয় হইত। রাত্রি ৯টা হইতে আরম্ভ করিয়া ১২টা পর্য্যন্ত অভিনয় চলিত। এত অল্প সময়ের মধ্যে অভিনয় শেষ হইয়া যাওয়ায় প্রথমে দূরাগত দর্শকগণ বিরক্ত হইয়া উঠিতেন। ক্রমে তাঁহাদের অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল এবং তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন, থিয়েটারের অভিনয় তিন ঘণ্টার বেশি হয় না।

সান্যাল-ভবনে টিকিট বিক্রয় করিয়া অভিনয়ের পূর্ব্বে থিয়েটারের খরচ চালাইবার জন্য অভিনেতাগণকে চাঁদা তুলিতে হইত। চাঁদা সবসময়ে আদায় হইত না, এ নিমিত্ত অনেক সময়ে তাঁহাদিগকে বিশেষ ব্যস্ত হইয়া পড়িতে হইত। এক্ষণে টিকিট বিক্রয় করিয়া অভিনয় করায় এবং তাহাতে বেশ অর্থসমাগম হওয়ায়, থিয়েটারের খরচ চালাইবার জন্য আর কোন চিন্তা ছিল না। নির্ভাবনায় থিয়েটার চলিয়া যাইতেছে, ইহাতেই তাঁহাদের আনন্দ ছিল। অধিক বিক্রয় দেখিয়া অর্থগ্রহণের নিমিত্ত কেহ ব্যস্ত ছিলেন না। কর্ত্তৃপক্ষীয়েরাও নানা খরচ দেখাইয়া "কিছু আয় হইতেছে না" বলিতেন। অভিনেতাগণ তাহাই বিশ্বাস করিতেন, কেহ কোনরূপ আপত্তি করিতেন না। নাট্যামোদেই তাঁহারা বিভোর হইয়া থাকিতেন, তবে উপস্থিত আমোদ-আহ্লাদ, পান-ভোজনাদির জন্য হঠাৎ কিছু প্রয়োজন হইলে, দুই চারি টাকা গ্রহণ করিতেন মাত্র। নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু প্রভৃতি দুই-একজন থিয়েটার হইতে এক কপর্দ্দকও গ্রহণ করিতেন না। বর্ত্তমান রঙ্গালয়ে অভিনেতারা কোনরূপ দোষ করিলে কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা জরিমানা (fine) করিয়া তাহার দণ্ড দিয়া থাকেন। তখনকার দণ্ড ছিল পার্ট না দেওয়া ; ইহার অধিক গুরুতর দণ্ড তাঁহাদের আর কিছু ছিল না। নূতন নাটকে দুই তিনটীর অধিক প্রধান ভূমিকা থাকিত না, কিন্তু সে সময় শক্তিমান অভিনেতা অনেক ছিল, কর্ত্তৃপক্ষীয়দের পক্ষপাতিতায় সবসময়ে যোগ্য লোকে part পাইতেন না। ফলতঃ কর্ত্তৃপক্ষীয়গণের সমদৃষ্টির অভাবে প্রথমে অভিনেতাগণের হৃদয়ে অভিমান, অভিমান হইতে মনোমালিন্য, মনোমালিন্য হইতে ঘরোয়া বিবাদের উৎপত্তি হইল। ক্রমে তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন, দুই চারিজন অভিনেতা রীতিমতই টাকা লইয়া থাকেন, এবং কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ যে সমস্ত টাকা থিয়েটার পরিচালনে খরচ হইয়া যাইতেছে বলিয়া কৈফিয়ৎ দিতেন, তাহাও সত্য নহে। দল ভাঙ্গিবার এইখানেই সূত্রপাত হইল। ধর্ম্মদাসবাবুর কথা বোধহয় পাঠকগণের স্মরণ আছে—"সম্প্রদায়কে দমনে রাখিতে একমাত্র গিরিশ-বাবুই পারিতেন।" গিরিশচন্দ্রকে থিয়েটারে লইয়া আসিবার ইহাও অন্যতম কারণ। ইনি 'ন্যাসান্যালে' যোগদান করিলে ইহাকে থিয়েটারের পরিচালন-দণ্ড গ্রহণ করিতে অনুরোধ করা হয়। কিন্তু তিনি সম্প্রদায়ের আভ্যন্তরিক অবস্থা জ্ঞাত হইয়া তাহাতে অস্বীকৃত হন। পরে তাঁহাকে, 'অমৃতবাজার পত্রিকা'-সম্পাদক শিশিরবাবু এবং নগেন্দ্র-

বাবুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দেবেন্দ্রবাবুকে থিয়েটার পরিচালনের নিমিত্ত ডাইরেক্টার নির্বাচিত করা হইল; ইহাদের তিনজনের নামাঙ্কিত মোহরযুক্ত হইয়া টিকিট বিক্রয় হইতে আরম্ভ হইল। কিন্তু তথাপি ভিতরের গোল মিটিল না। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় 'নাট্যমন্দির' মাসিক পত্রিকায় তাঁহার সংগৃহীত "বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস" প্রবন্ধে এই সময়ের ইতিহাস বিস্তৃতভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। ধর্ম্মদাসবাবুর লিখিত 'নোট' হইতে তিনি উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এই নিমিত্ত তাহা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম :—

"কিন্তু এরূপ সুপ্রণালীমত সম্প্রদায়ের কার্য্যাদি চলিলেও নানা গোলযোগ উঠিতে লাগিল। এক দিবস দেবেন্দ্রবাবু ধর্ম্মদাসবাবুকে বলিলেন,—'তুমি, নগেন্দ্র, অর্দ্ধেন্দু ও অমৃত যথেষ্ট পরিশ্রম কর, তোমরা চারিজনে থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী* হও, ও অন্যান্য সকলে তোমাদের বেতনভোগী হউক।' এ প্রস্তাবে ধর্ম্মদাসবাবু অসম্মতি প্রকাশ করিয়া বলিলেন, 'কেবল আমরাই কেন, অনেকেই এই সম্প্রদায়ের উন্নতির জন্য পরিশ্রম করেন।† আমরা চারিজনে স্বত্বাধিকারী হইলে, তাঁহাদিগের প্রতি অবিচার করা হয়। আরও বোধহয় ইহাতে যথেষ্ট মনোবিবাদের কারণ হইয়া উঠিবে।' ধর্ম্মদাস-বাবুর অনুমান সত্যে পরিণত হইল। ডাইরেক্টার দেবেন্দ্রবাবুর প্রস্তাব ভিতরে-ভিতরে কার্য্য করিয়া মনোমালিন্য ফুটাইয়া তুলিয়া দল মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাইল। 'অর্থমনর্থম্' এই ঋষিবাক্যের সার্থকতা সম্পাদিত হইল। হায় রজতখণ্ড! তোমার মাহাত্ম্য চিরদিনই সমান! এদিকে ১২৭৯ সালের চৈত্রের প্রারম্ভেই 'কালবৈশাখী'র জল-ঝড়ের উৎপাত দেখা দিতে লাগিল। সেই 'চটাতপতল'স্থ মঞ্চে সম্প্রদায়ের অভিনয়াদি চালান অসম্ভব বোধ হইল। সম্প্রদায় তখন গৃহে-বাহিরে নানারূপে বিপর্য্যস্ত হইয়া তখনকার মত 'কাজের খতম' করিতে বাধ্য হইলেন।" 'নাট্যমন্দির', ৩য় বর্ষ, পৌষ ১৩১৯, ৩২০ পৃষ্ঠা।

সে বৎসর ফাল্গুন মাসের শেষ হইতেই অপরাহ্নে ঝড়বৃষ্টি হইতে আরম্ভ হয়। সান্যাল-ভবনের উঠানের উপর সামিয়ানা খাটান ছিল, তাহাতে ঝড়বৃষ্টির বেগ রক্ষিত হইল না। দর্শকগণ উঠিয়া পড়ে, ষ্টেজ ভিজিয়া যায়। এদিকে সম্প্রদায়ের ভিতরে আত্মকলহ আর বাহিরে প্রকৃতির এই অত্যাচার। সম্প্রদায় থিয়েটার বন্ধ করিতে বাধ্য হইলেন। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই মার্চ্চ (সন ১২৭৯, ২৬শে ফাল্গুন) শনিবার 'ন্যাসান্যাল থিয়েটারে' 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ', 'যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল' এবং 'বিলাতিবাবু' প্রভৃতি কয়েকটী ক্ষুদ্র রঙ্গনাট্য শেষ অভিনয় হয়।

অভিনয় সমাপ্ত হইলে, যবনিকা পতনের পূর্ব্বে 'ন্যাসান্যাল থিয়েটারে'র বিদায়গ্রহণ উপলক্ষ্যে অর্দ্ধেন্দুবাবু একটী বক্তৃতা করিলেন। সর্ব্বশেষে গিরিশবাবু-বিরচিত একটী

* নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু বলেন, সে সময় স্বত্বাধিকারী বলিয়া কোন কথাই ছিল না, প্রধান পরিচালক মাত্র বলা যাইতে পারিত।

† সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা মহেন্দ্রলাল বসু, অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেলবাবু), মতিলাল সুর, অবিনাশচন্দ্র কর প্রভৃতি।

বিদায়-সঙ্গীত গীত হয়। 'ন্যাসান্যাল থিয়েটারে'র উক্তিতে গিরিশচন্দ্র গানটী বাঁধিয়া দিয়াছিলেন।

গীত

"কাতর অন্তরে আমি চাহি বিদায়।
সাধি ওহে সুধীব্রজ, ভুলো না আমায়॥
এ সভা রসিক মিলিত, হেরিয়ে অধীনি-চিত,
আধ পুলকিত, আধ হুতাশে শুকায়॥
অস্তগামী দিনমণি, যেমতি হেরি নলিনী
আধ ধনী বিমলিনী, আধ হাসি চায়॥
মম প্রতি ঋতুপতি, হয়েছে নিদয় অতি,
হাসাইছে বসুমতী, আমারে কাঁদায়॥
নির্ম্মাইয়া নাট্যালয়, আবস্তিব অভিনয়,
পুনঃ যেন দেখা হয়, এ মিনতি পায়॥"

এই অল্প সময়ের মধ্যে নাট্যকলা-নৈপুণ্য প্রদর্শনে 'ন্যাসান্যাল থিয়েটার' নাট্যামোদিগণের একপ হৃদয় আকর্ষণ করিয়াছিল যে উক্ত সকরুণ গীতখানি সমাপ্তির সহিত ধীবে-ধীরে যখন যবনিকা পতিত হইল অনেক দর্শকই অশ্রু সংবরণ করিতে পাবেন নাই। সহৃদয় নাট্যানুরাগিগণ পরম ব্যথিত হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন কবিয়াছিলেন।

'ন্যাসান্যাল থিয়েটার' স্থাপিত হইবাব পূর্ব্বে কলিকাতাব নানা স্থানে বহু সখের (amateur) থিয়েটারে বহু নাটকাদিব অভিনয় হয়। যে সকল থিয়েটারের অভিনেতাবা সাধারণতঃ ভালরূপ আবৃত্তি করিতে পাবিতেন, তাঁহারাই উৎকৃষ্ট অভিনেতা বলিয়া সকলের নিকট সমাদৃত হইতেন। কিন্তু 'ন্যাসান্যাল থিয়েটারে'র অভিনেতাগণ যে রসেব ভূমিকা গ্রহণ করিতেন, তাঁহাবা কেবলমাত্র আবৃত্তির দিকে লক্ষ্য না করিয়া, স্বভাবসঙ্গত সেই রস ফুটাইবার চেষ্টা করিতেন, প্রত্যেক চবিত্রাভিনয়ে একটী ছবি দেখাইবার তাঁহাদের যত্ন ছিল। প্রবীন নাট্যাচার্য্য অমৃতলালবাবু বলেন,—"পূর্ব্ববর্ত্তী থিয়েটাবের প্রধান অভিনেতারা ভাব ও ভঙ্গীসহ রসাভিনয় করিতেন বটে, কিন্তু অনেক সময়েই তাহা অনুকরণ বোধ হইত, ভিতর হইতে যেন বলিতেন না। কিন্তু গিরিশবাবু ও অর্দ্ধেন্দুবাবু যাহা বলিতেন, তাহা যেন ভিতর হইতে বাহির হইত। তাঁহারা feel করিয়া acting করিতেন এবং সেইরূপ শিখাইতেন।"

বঙ্গ-নাট্যশালার সৌভাগ্যবশতঃই যেন সে সময়ে কতকগুলি শক্তিশালী যুবা একত্র হইয়াছিলেন। গিরিশচন্দ্র ও অর্দ্ধেন্দুশেখরের ন্যায় শিক্ষক এবং মহেন্দ্রলাল, নগেন্দ্রনাথ, অমৃতলাল, বেলবাবু, মতিলাল সুরের ন্যায় অভিনেতাই বা আর কয়জন জন্মিয়াছেন?

নাট্যাচার্য্য অমৃতলালবাবু বলেন, "১২৭৯ সাল বঙ্গসাহিত্যসেবীর বিশেষ স্মরণীয় বৎসর। সেই বৎসরেই ধর্ম্মাচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন-সম্পাদিত 'সুলভ সমাচার', সাহিত্যাচার্য্য বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' এবং 'ন্যাসান্যাল থিয়েটারে'র অভ্যুদয় হইয়াছিল।"

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

'ন্যাসান্যাল থিয়েটার' নানা স্থানে

সান্ন্যাল-ভবনে শেষ অভিনয় করিয়া 'ন্যাসান্যাল' সম্প্রদায় আত্মকলহের ফলে দুই দলে বিভক্ত হইল। প্রথম দলে নগেন্দ্রবাবু, অর্দ্ধেন্দুবাবু, অমৃতবাবু, কিরণবাবু, বেলবাবু, ক্ষেত্রবাবু, ভোলানাথ বসু, বিহারীলাল বসু (জ্যাঠা) প্রভৃতি এবং দ্বিতীয় দলে ধর্ম্মদাস-বাবু, মহেন্দ্রলাল [বসু], মতিলাল সুর, অবিনাশচন্দ্র কর, গোপালচন্দ্র দাস, শিবচন্দ্র ভট্টাচার্য, তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রলাল পাল (ইঁহার বাটীতে প্রথম 'লীলাবতী' অভিনয় হয়) প্রভৃতি যোগ দিলেন। নগেন্দ্রবাবু সান্ন্যাল বাটী হইতে পোষাক-পরিচ্ছদ ও হারমোনিয়াম নিজ বাটীতে আনিয়া রাখিলেন। ধর্ম্মদাসবাবুর তত্ত্বাবধানে ষ্টেজ ছিল, তিনি তাহা খুলিয়া শোভাবাজারে স্যার রাধাকান্তদেব বাহাদুরের নাটমন্দিরে আনয়ন-পূর্ব্বক তথায় ষ্টেজ বাঁধিয়া অভিনয় করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। নগেন্দ্রবাবুর দল কালীপ্রসন্ন সিংহের ১৪৭ নং বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীটস্থ বাটীর হলঘরে ষ্টেজ বাঁধিয়া অভিনয় করিবার জন্য সচেষ্ট হইলেন। এই সময়ে ধর্ম্মদাসবাবুদের দলের এমন একটী সুযোগ ঘটিল, যাহাতে সাধারণের দৃষ্টি তাঁহাদের উপরই প্রথম আকৃষ্ট হইল।

পাথুরিয়াঘাটায় গঙ্গার ধারে দেশীয়গণের চিকিৎসার নিমিত্ত যে মেয়ো-হস্‌পিটল আছে, এই চিকিৎসালয় নির্ম্মাণের নিমিত্ত তৎকালীন বড়লাট লর্ড নর্থব্রুক ৩রা ফেব্রুয়ারী, ইহার প্রথম ভিত্তি-প্রস্তর প্রোথিত করেন। বড় রকমের বাড়ী নির্ম্মাণের নিমিত্ত রাজা, মহারাজা, জমীদার ও সম্ভ্রান্ত ধনাঢ্যগণের নিকট হইতে চাঁদা সংগ্রহ হইতে থাকে। ডাক্তার ম্যাক্‌নামাবা নামক জনৈক লব্ধপ্রতিষ্ঠ চক্ষু-চিকিৎসকও সে সময়ে উক্ত শুভানুষ্ঠানে বিশেষ উদ্যোগী হইয়া চাঁদা সংগ্রহ করিতেছিলেন। তোষাখানার দেওয়ান সুপ্রসিদ্ধ গিরিশচন্দ্র দাস মহাশয় ম্যাক্‌নামারা সাহেবকে বিশেষ সাহায্য করেন। রাজেন্দ্রলাল পাল ও ধর্ম্মদাস সুর উভয়ে তাঁহাদের ডাইরেক্টর গিরিশচন্দ্রের সহিত পরামর্শ করিয়া উক্ত দেওয়ান মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তিনি আনন্দের সহিত ম্যাক্‌নামারা সাহেবের সহিত ইঁহাদের পরিচয় করিয়া দেন। পরস্পরের কথাবার্ত্তায় এইরূপ স্থির হইল, ম্যাক্‌নামারা সাহেব টাউন হল ভাড়া লইয়া তথায় তাঁহাদের অভিনয়ের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিবেন, এবং ইঁহারাও সে রাত্রির বিক্রয়লব্ধ সমস্ত অর্থ উক্ত হস্‌পিটাল নির্ম্মাণের সাহায্যার্থে সাহেবকে প্রদান করিবেন। অবিলম্বে 'নীলদর্পণ'-অভিনয়োপযোগী কয়েকজন লোক বাহির হইতে সংগ্রহ করিয়া ভাড়া

অল স্থগঠিত করা হইল। গিরিশচন্দ্রের শিক্ষাদানে এক সপ্তাহের মধ্যে সম্প্রদায় অভিনয়ের নিমিত্ত প্রস্তুত হইলেন। বলা বাহুল্য, সম্প্রদায়স্থ অনেকেই যথা—মতিলাল স্থর, অবিনাশচন্দ্র কর, মহেন্দ্রলাল বসু প্রভৃতি 'নীলদর্পণে'র প্রথমাভিনয় রজনী হইতে তাঁহাদের মৌলিক (original) ভূমিকাভিনয় করিয়া [illegible] বাগবাজারে প্রথম যে সময়ে 'নীলদর্পণে'র রিহারস্তাল বসে, সেই সময়েই [illegible] উড সাহেবের ভূমিকা ছিল, সুতরাং ইহাও তাঁহার পক্ষে নূতন ছিল না। কেবল সৈরিন্ধ্রীর ভূমিকা (যাহা নাট্যাচার্য্য অমৃতলাল বসু মহাশয় অভিনয় করিতেন) রাধামাধববাবুর ভ্রাতা রাধাগোবিন্দ কর (পরে সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার আর. জি. কর) গ্রহণ করিয়াছিলেন। ২৯শে মার্চ্চ, শনিবার তারিখে মহাসমারোহে নানাবিধ আলোক ও পুষ্পমালায় সজ্জিত টাউন হলে 'নীলদর্পণে'র অভিনয় হয়।

থিয়েটারে সাহায্য রজনীর (Benefit night) এই প্রথম সূত্রপাত। টাউন হলের স্থায় বৃহৎ হলে দেশীয়গণ কর্ত্তৃক নাট্যাভিনয় এই প্রথম। দর্শক সমাগমে টাউন হলের স্থায় সুবৃহৎ হলে তিলার্দ্ধ স্থান ছিল না। গিরিশচন্দ্র অন্য প্রথম উড সাহেবের ভূমিকা লইয়া রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইবেন, হ্যাণ্ডবিল এবং সম্প্রদায়ের মুখে-মুখে এই সংবাদ বহুবিস্তৃত হইয়া পড়ায় নাট্যামোদিগণেরও যথেষ্ট সমাগম হইয়াছিল। সেদিনকার অভিনয় বড়ই মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছিল। দর্শকগণের কখনও ক্রোধব্যঞ্জক চীৎকার, কখনও-বা উল্লাসজনক করতালি-ধ্বনিতে টাউন হল ক্ষণে-ক্ষণে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। গিরিশচন্দ্রের উড সাহেবের ভূমিকাভিনয়ে চরিত্রোপযোগী হাব-ভাব, আদব-কায়দা এবং প্রবেশ-প্রস্থানে—এরূপ একটী জীবন্ত ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল যে কাহারও-কাহারও সন্দেহ হইয়াছিল, বুঝি-বা ম্যাক্‌নামারা সাহেবের চেষ্টায় কোনও বাঙ্গালা-জানা সাহেব আসিয়া তাঁহার অভিনয়ে যোগদান করিয়াছে। অবিনাশচন্দ্র কর রোগ সাহেবের এবং মতিলাল সুর তোরাপের ভূমিকাভিনয়ে পূর্ব্ব হইতেই অদ্ভুত কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া আসিয়াছেন,—অদ্যকার অভিনয়ে আরও একটু নূতনত্ব হইয়াছিল। যে দৃশ্যে অত্যাচার-পীড়িত তোরাপ আত্মহারা হইয়া রোগ সাহেবকে আক্রমণ করে, সে দৃশ্যে অবিনাশবাবু ও মতিলালবাবু উভয়েই এরূপ অভাবনীয় অভিনয় করিয়াছিলেন যে দর্শকগণ অভিনয়ের কথা ভুলিয়া গিয়া যেন সত্য ঘটনা প্রত্যক্ষ করিতেছেন বোধে—ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। এমনকি একজন দর্শক* আত্মহারা হইয়া লম্ফপ্রদানে রঙ্গমঞ্চে উঠিয়া তোরাপের সহিত যোগদান করিয়া রোগ সাহেবকে প্রহার করিতে-করিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। রাধাগোবিন্দবাবু সৈরিন্ধ্রীর ভূমিকাভিনয়ে বিশেষরূপ কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন। ৩১শে মার্চ্চ তারিখের 'ইংলিসম্যানে' অভিনয়ের সমালোচনা বাহির হয়: "The Native performance at the Town Hall.—On Saturday night the members of the Calcutta National Theatre performed in the Town Hall the play of "Nil Darpan", for the benefit of the Native Hospital. It is

* স্বর্গীয় [illegible] ইনি সুবিখ্যাত ব্যারিষ্টার উড্রোফ সাহেবের বাবু ছিলেন।

a great pity that so short a notice was given, as, on that account, very few Europeans were present. However, the Natives mustered very strongly on the occasion and testified by their repeated plaudits how much they enjoyed the performance. "The acting was exceedingly good throughout. We hope the Management will give another performance shortly." *Englishman*, Monday, 31st March 1873.

সেদিন এগারশত টাকার টিকিট বিক্রয় হইয়াছিল। চারিশত টাকা খরচ বাদে ম্যাক্‌নামারা সাহেব সাতশত টাকা প্রাপ্ত হন।

"Native Hospital"-এর সাহায্য-রজনীতে অসম্ভব বিক্রয় দেখিয়া "Indian Reform Association"-এর সভ্যগণ তাঁহাদের 'Charitable Section'-এর সাহায্যার্থে সম্প্রদায়কে বিশেষ অনুরোধ করেন। নবোৎসাহে সম্প্রদায় পর সপ্তাহেই পুনরায় টাউন হল ভাড়া লইয়া 'সধবার একাদশী' এবং 'ভারতমাতা' অভিনয় করেন।

নগেন্দ্রবাবু, অর্দ্ধেন্দুবাবু প্রভৃতি ভিন্ন সম্প্রদায়স্থ টাউন হলে ঐ বিক্রয়াধিক্য দেখিয়া, তাঁহারাও লিণ্ডসে ষ্ট্রীটে 'অপেরা হাউস' ভাড়া লইয়া নিজ সম্প্রদায়ের 'হিন্দু ন্যাসান্যাল থিয়েটার' নামকরণপূর্ব্বক মাইকেলের 'শর্ম্মিষ্ঠা' নাটক ও অন্যান্য রঙ্গাভিনয় এবং অখিলবাবুর ব্যায়াম-ক্রীড়া প্রদর্শনের বিজ্ঞাপন ঘোষণা করেন।

'ন্যাসান্যাল' ও 'হিন্দু ন্যাসান্যাল থিয়েটার' একই দিনে অভিনয় ঘোষণা করায় পূর্ব্ব সপ্তাহের ন্যায় 'ন্যাসান্যাল থিয়েটারে' বিক্রয় হয় নাই, তথাপি গিরিশচন্দ্রের নিমচাঁদ ভূমিকা অভিনয় দর্শনের নিমিত্ত বহুদর্শকের সমাগম হওয়ায় মোট আটশত টাকা বিক্রয় হইয়াছিল। প্রত্যেক অভিনেতাই সুখ্যাতির সহিত অভিনয় করিয়াছিলেন। নাট্যাচার্য্য অমৃতলালবাবু বলেন, "রাজা চন্দ্রনাথ বাহাদুরের ইচ্ছায় আমরা 'শর্ম্মিষ্ঠা' নাটক অভিনয় করিয়াছিলাম। তাড়াতাড়ি অভিনয়ের নিমিত্ত প্রস্তুত হওয়ায় 'হিন্দু ন্যাসান্যালে' আমাদের অভিনয়ও মনোনীত হয় নাই বং বিক্রয়ও সুবিধাজনক হয় নাই।"

যাহাই হউক 'ন্যাসান্যাল' সম্প্রদায় টাউন হলে দুই রাত্রি অভিনয় করিয়া পুনরায় রাধাকান্ত দেবের নাটমন্দিরে রঙ্গমঞ্চ বাঁধিতে আরম্ভ করিল। 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক সর্ব্বপ্রথমে শোভাবাজার রাজবাটীতে অভিনয় হয়, পরে সান্যাল-ভবনে ইহার পুনরভিনয়-বৃত্তান্ত পাঠকগণ জ্ঞাত আছেন। শোভাবাজার রাজবাটীর কুমারগণের বিশেষ আগ্রহে আবার 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক লইয়া 'ন্যাসান্যাল থিয়েটার' এখানকার প্রথম অভিনয় ঘোষণা করিলেন। অভিনয় সর্ব্বজন-সমাদৃত হইয়াছিল। গিরিশবাবুর দ্বিতীয়বার ভীমসিংহের ভূমিকাভিনয় দর্শনে এবং তাঁহার নাট্য-প্রতিভার সম্যক পরিচয় পাইয়া সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন। রাণী অহল্যাবাঈয়ের ভূমিকাভিনয়ে মহেন্দ্রলাল বসু যথেষ্ট গুণপনা দেখাইয়াছিলেন। গিরিশবাবু "মহেন্দ্রলাল বসু" প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, "শোভাবাজার রাজবাটীতে প্রথমে কুমার অমরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর, 'কৃষ্ণকুমারী'র ভূমিকাভিনয় করিয়াছিলেন, তিনি মহেন্দ্রবাবুর অতি সুন্দর অভিনয় দর্শনে ঈর্ষা ভুলিয়া

তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করেন।"

'ন্যাসান্যাল থিয়েটার' নাটমন্দিরে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে দেখিয়া 'হিন্দু ন্যাসান্যাল' সম্প্রদায় ঢাকায় অভিনয়ার্থে গমন করিলেন। ঢাকায় গিয়া ইঁহাদের বেশ সুবিধা হইয়াছিল। 'পূর্ব্ববঙ্গ রঙ্গভূমি' নামে ঢাকায় একটী থিয়েটার ছিল; নাট্যকার দীনবন্ধুবাবুর উদ্যোগে তথায় একটী রঙ্গমঞ্চ নির্ম্মিত হইয়া প্রথম 'নীলদর্পণ' নাটক অভিনীত হয়। 'নীলদর্পণ' নাটক যখন তিনি প্রণয়ন করেন, গভর্ণমেণ্টের চাকুরীতে সে সময় তিনি ঢাকাতেই থাকিতেন। ঢাকাবাসী যুবকগণ মাঝে-মাঝে সেই রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করিতেন। 'হিন্দু ন্যাসান্যাল থিয়েটাব' সম্প্রদায় ঢাকায় গিয়া তথাকার সুপ্রসিদ্ধ মোহিনীমোহন দাস মহাশয়ের সহায়তায় সেই রঙ্গমঞ্চ সংগ্রহ কবেন, এবং আবশ্যকমত stageটী সুসংস্কৃত করিয়া অভিনয় আরম্ভ করেন।

কলিকাতায় 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকাভিনয়ের পর 'ন্যাসান্যাল থিয়েটারে' 'কপালকুণ্ডলা' অভিনীত হয। অভিনয়রাত্রে কোন কারণে 'কপালকুণ্ডলা'র খাতাখানি হাবাইয়া যায়। এদিকে অভিনয় দর্শনার্থ শত-শত দর্শক আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। সম্প্রদাযের মধ্যে হুলস্থুল পডিয়া গেল, না জানি আজ কি একটা কেলেঙ্কারী হইবে। শত্রু হাসিবে, 'ন্যাসান্যালে'র সুনাম আজই ডুবিয়া যাইবে। দর্শকগণ এখনই হৈ-হৈ করিযা টিটকারী দিতে থাকিবে।

মহেন্দ্রলাল বসু, ধর্ম্মদাসবাবু এবং মতিলাল সুর প্রভৃতি প্রধান-প্রধান অভিনেতারা আসিয়া তাঁহাদের সম্প্রদায়ের ডাইরেক্টর গিরিশবাবুকে বলিলেন, "মহাশয়, যাহা হউক একটা উপায করুন।" গিরিশবাবু ইতিমধ্যেই রাজবাটীর লাইব্রেরী হইতে বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা' পুস্তক সংগ্রহেব জন্য লোক পাঠাইয়াছিলেন। এমন সময় পুস্তক আসিয়া পৌঁছিল। পুস্তক পাইবামাত্র গিরিশবাবু হর্ষোৎফুল্ল হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "কোনও ভয় নাই, আমি prompt করিয়া যাইতেছি, তোমবা রঙ্গমঞ্চে বাহির হও।" তাহাই হইল, নির্ব্বিঘ্নে 'কপালকুণ্ডলা' অভিনীত হইল, দর্শকগণ ভিতরেব বিভ্রাট কিছুই উপলব্ধি করিতে পারিল না। একমাত্র উপন্যাস ও প্রোগ্র্যাম অবলম্বনে সদ্য-সদ্য নাটকের দৃশ্য ও চবিত্রাবলীর সর্ব্বদিকে সামঞ্জস্য রক্ষা করিযা prompt করিয়া যাওয়া সাধারণ শক্তির কার্য্য নহে, তাহা একমাত্র গিরিশবাবুতেই সম্ভব ছিল।

ঢাকায় 'হিন্দু ন্যাসান্যাল থিয়েটারে'র অভিনয় খুব জমিয়াছিল। তথায় সম্প্রদায়ের বিশেষ সুযশ এবং অর্থ লাভেব সংবাদ কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিলে, 'ন্যাসান্যাল থিয়েটার' সম্প্রদায় চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। রাজেন্দ্রলালবাবু, ধর্ম্মদাসবাবু প্রভৃতি সম্প্রদায়স্থ সকলেই ঢাকা যাইতে মনস্থ করিলেন। শোভাবাজার রাজবাটীর নাট্যমন্দিরে ১০ই মে, শনিবার, 'কপালকুণ্ডলা' ও 'ভারত-সঙ্গীত' শেষ অভিনয় করিয়া গিরিশবাবু ব্যতীত থিয়েটারের আর সকলেই ঢাকা যাত্রা করিলেন। গিরিশবাবু সে সময়ে জন অ্যাট্-কিন্সন অফিসের বুককিপার ছিলেন। অর্দ্ধেন্দু-জীবনীতে তিনি লিখিয়াছেন,—"একদলে অর্দ্ধেন্দু আর একদলে আমার থাকা না থাকা সমান, কারণ নানা স্থানে বেড়াইবার আমার শক্তি, সুযোগ ও ইচ্ছা ছিল না। ৺রাজেন্দ্রলাল নিয়োগী দ্বিতীয়

দলের প্রকৃত পরিচালক, শ্রীযুক্ত ধর্ম্মদাস সুর সেই দলে ছিলেন।"

যাহাই হউক কলিকাতা হইতে প্ল্যাকার্ড ও হ্যাণ্ডবিল ছাপাইয়া লইয়া মহাসমারোহে ও বিপুল উদ্যমে 'ন্যাসান্যাল থিয়েটার' ঢাকায় গিয়া প্রথমেই সহরময় বিজ্ঞাপন প্রচারিত করিলেন,—"The genuine National Theatre arrived" অর্থাৎ কলিকাতা হইতে প্রথমে যে থিয়েটার ঢাকায় আসিয়া অভিনয় করিতেছে, সে থিয়েটার সুবিখ্যাত 'ন্যাসান্যাল থিয়েটার' নহে,—প্রকৃত 'ন্যাসান্যাল থিয়েটার' এইবার আসিল। যত শীঘ্র সম্ভব, ষ্টেজ বাঁধিয়া ও থিয়েটার সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ের ব্যবস্থা করিয়া 'ন্যাসান্যাল' সম্প্রদায় অভিনয় ঘোষণা করিলেন।

প্রথম দুই-এক রাত্রি যথেষ্ট বিক্রয় হইলেও ক্রমশঃ 'ন্যাসান্যালে'র বিক্রয় হ্রাস পাইতে লাগিল। 'হিন্দু ন্যাসান্যাল' সম্প্রদায় পূর্ব্ব হইতে আসিয়াই 'নীলদর্পণ', 'সধবার একাদশী', 'কৃষ্ণকুমারী', 'নবীন তপস্বিনী' প্রভৃতি উৎকৃষ্ট নাটক ও প্রহসনাদি অভিনয়ে বিশেষরূপ প্রতিপত্তিলাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু 'ন্যাসান্যাল থিয়েটার' আসিয়া ইহার উপর আর কিছু একটা নূতনত্ব দেখাইতে পারিলেন না। গিরিশবাবু আসিলে হয়তো তিনি অভিনয় চাতুর্য্যে পুরাতন নাটকেও নব সৌন্দর্য্য ফুটাইয়া দর্শক আকর্ষণ করিতে পারিতেন কিম্বা এই সঙ্কটাবস্থায় নূতন কোনও একটা উপায় উদ্ভাবন করিতেন। ফলতঃ প্রতিভাশালী পরিচালক অভাবে দিন-দিন ইঁহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইতে লাগিলেন। অবশেষে 'হিন্দু ন্যাসান্যাল' সম্প্রদায়ের নিকট ষ্টেজ বাঁধা রাখিয়া তথাকার ঋণ পরিশোধপূর্ব্বক কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। 'হিন্দু ন্যাসান্যাল থিয়েটার' সম্প্রদায়ও ক্রমশঃ আয় কম হইতে থাকায় অল্পদিন পরেই ঢাকা হইতে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন।

কলিকাতায় আসিয়া উভয় সম্প্রদায়ই কিছুদিন নীরব থাকেন। এই সময়ে দিঘাপতিয়ার রাজা প্রমদানাথ রায় বাহাদুরের অন্নপ্রাশন উপলক্ষ্যে তদীয় পিতৃদেব প্রমথনাথ রায় বাহাদুর কলিকাতা হইতে 'ন্যাসান্যাল থিয়েটার'কে অভিনয়ার্থে নিযুক্ত করিবার জন্য তিনি তাঁহার কলিকাতাস্থ আমমোক্তার ঈশ্বরচন্দ্র বসু মহাশয়কে অনুজ্ঞা পাঠান। ঈশ্বরবাবু অনুসন্ধানে জ্ঞাত হইলেন, সান্ন্যাল-ভবনস্থ 'ন্যাসাণ্যাল থিয়েটার' এক্ষণে দুইটী দলে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। উপস্থিত তিনি বায়না সম্বন্ধে কোন্ দলের সহিত কথাবার্ত্তা কহিবেন—বড়ই সঙ্কটে পড়িলেন! তাঁহারই অনুরোধে উভয় সম্প্রদায়ের সমবেত অভিনয়ের ব্যবস্থা হয়; এই সূত্রে কার্য্যতঃ দুই দল এক হইয়া যায়। পারিশ্রমিক লইয়া অর্থাৎ বায়না গ্রহণ করিয়া কাহারও বাটীতে অভিনয় এই প্রথম। গিরিশবাবু, অমৃতবাবু এবং নগেন্দ্রনাথ ও কিরণচন্দ্র ভ্রাতৃদ্বয় ব্যতীত সকলেই দিঘাপতিয়ায় গিয়াছিলেন। রাজবাটীতে চারি রাত্রি অভিনয় হয়। দিঘাপতিয়া হইতে ফিরিবার সময় 'ন্যাসান্যাল' সম্প্রদায় রামপুর বোয়ালিয়া ও বহরমপুরে অভিনয় করিয়া কলিকাতায় আসেন। কিছুদিন পরে আর-একবার তাঁহারা বর্দ্ধমান ও চুঁচুড়ায় গিয়া কয়েক রাত্রি অভিনয় করিয়া আসিয়াছিলেন। ইহাই শেষ অভিনয়।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

অ্যাট্‌কিন্সন কোম্পানীর অফিস এবং মিসেস লুইসের সহিত ঘনিষ্ঠতা

'ন্যাসান্যাল থিয়েটার' প্রতিষ্ঠিত হইবার বহু পূর্ব্ব হইতে কলিকাতায় ইংরাজদের দুইটীমাত্র সাধারণ থিয়েটার ছিল। প্রথমটী চৌরঙ্গীতে অবস্থিত 'থিয়েটার রয়েল'; দ্বিতীয়টী লিণ্ডসে ষ্ট্রীটে অবস্থিত—'অপেরা হাউস'। মিসেস লুইস নামে জনৈক আমেরিকা-নিবাসী মহিলা বহু পূর্ব্ব হইতে 'থিয়েটার রয়েল' ভাড়া লইয়া অভিনয় করিতেছিলেন; তাঁহার নামানুসারে 'লুইস থিয়েটার রয়েল' ("Lewis's Theatre Royal") নামে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইত। সাধারণে 'লুইস থিয়েটার' বলিত। নাট্যাচায্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় বলেন,—স্থলতানা নামক জনৈক আমেরিকাবাসী বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীটের মোড়ে থাকিতেন, তিনি 'ময়দান প্যাভেলিয়ান' নাম দিয়া এই থিয়েটার প্রস্তুত করিয়াছিলেন। মিসেস লুইস (Mrs. G. B. W. Lewis) তাঁহার নিকট ভাড়া লইয়াছিলেন। রাজপুরুষগণের রঙ্গালয়ে আগমনের জন্য এই থিয়েটাবের নাম 'থিয়েটার রয়েল' হইয়াছিল।

গিরিশচন্দ্র মিসেস লুইসের সহিত বহু পূর্ব্ব হইতেই সুপরিচিত ছিলেন এবং তাঁহার থিয়েটারে প্রায়ই যাতায়াত করিতেন। কিরূপে এই পরিচয় হইল, এবং এই পরিচয় ক্রমে কিরূপে ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হইয়াছিল, তাহার কথা এইবার বলা প্রয়োজন। কারণ এই ঘনিষ্ঠতাই গিরিশচন্দ্রের নাট্য-প্রতিভা-স্ফূরণে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল।

পাঠকগণ অবগত আছেন, গিরিশচন্দ্র প্রথমে অ্যাট্‌কিন্সন টিলটন কোম্পানী অফিসে শিক্ষানবীশরূপে বাহির হন। তখন তাঁহার বয়স কুড়ি বৎসর মাত্র। তথায় বেতনভোগী হইয়া পরে ইনি আরজেণ্টি সিলিজি কোম্পানী অফিসের সহকারী বুককিপার হইয়া যান। কিছুকাল পরে অ্যাট্‌কিন্সন সাহেব অ্যাট্‌কিন্সন টিলটন এণ্ড কোম্পানী অফিস হইতে বাহির হইয়া নিজে জন্ অ্যাট্‌কিন্সন এণ্ড কোম্পানী নামে একটী নূতন অফিস খোলেন এবং নবীনবাবুকে তাঁহার অফিসে যাইবার জন্য অনুরোধ করেন; কিন্তু তিনি না যাইয়া পুত্র ব্রজবাবু ও জামাতা গিরিশবাবুকে নূতন অফিসে পাঠাইয়া দেন। তথায় ব্রজবাবু বুককিপার এবং গিরিশবাবু তাঁহার সহকারী নিযুক্ত হন (১৮৬৭ খ্রী)। ব্রজবাবু গিরিশবাবু অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন, এবং তাঁহার পূর্ব্ব হইতেই অফিসে বাহির হইতেছিলেন। ব্রজবাবুর পর গিরিশবাবু প্রধান বুককিপার হন। এই অফিসে তিনি প্রায় আট বৎসর কার্য্য করিয়াছিলেন।

অ্যাট্‌কিন্সন সাহেব আমেরিকা-নিবাসী ছিলেন, মিসেস লুইসও তদ্দেশবাসিনী ছিলেন। এবং ইঁহাদের পরস্পরের মধ্যে বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। মিসেস লুইস প্রত্যহই একবার করিয়া অফিসে অ্যাট্‌কিন্সন সাহেবের সহিত দেখা করিতে আসিতেন। উক্ত অফিসে টাকাকড়ির 'লেন দেন' সম্বন্ধ থাকায় এবং গিরিশবাবু অফিসের হিসাবরক্ষকের কার্য্যে ব্রতী থাকায় তাঁহার সহিত লুইসের পরিচয় হয়। ক্রমে উভয়ের মধ্যে এতটা ঘনিষ্ঠতা জন্মে যে, লুইসের নিজস্ব হিসাবপত্র সমস্তই গিরিশচন্দ্রের নিকট থাকিত।

মিসেস লুইস সুবিখ্যাতা অভিনেত্রী ছিলেন। বহুসংখ্যক বিলাতী সাহেব ও এতদ্দেশীয় সুশিক্ষিত ও ধনাঢ্য বহুদর্শক সমাগমে তাঁহার থিয়েটারের আয়ও যথেষ্ট ছিল। অভিনয়-নৈপুণ্য এবং সৌজন্যে তাঁহার সে সময়ে এরূপ সম্মান ও প্রতিপত্তি হইয়াছিল যে তৎকালীন সম্ভ্রান্ত ইউরোপীয়ানগণের সভাসমিতি হইতে Viceregal party-তে পর্য্যন্ত তিনি সাদরে নিমন্ত্রিতা হইতেন।

'লুইস থিয়েটারে' কোন নাটক অভিনীত হইলে সে নাটকের এবং অভিনেতৃগণের অভিনয়ের দোষগুণ সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্র তাঁহার স্বাধীন মত প্রকাশ করিতেন। মিসেস লুইস সওদাগরি অফিসের জনৈক হিসাবরক্ষক যুবকের মুখে একজন প্রতিভাবান কলা-কৌশলীর ন্যায় সমালোচনা শুনিয়া বিস্মিত ও মুগ্ধ হইতেন। দিন-দিন তিনি তাঁহাকে এত স্নেহ করিতে লাগিলেন যে, অফিসের ছুটি হইলে, গিরিশচন্দ্রকে তাঁহার পার্শ্বে বসাইয়া ফিটনে চড়িয়া হাওয়া খাইতে যাইতেন। প্রতিভাশালিনী প্রৌঢ়া অভিনেত্রী মিসেস লুইসের সহিত নানারূপ বিদেশীয় নাটক ও অভিনয় সমালোচনায় এবং সেই সঙ্গে প্রায়ই অভিনিবেশসহ লুইস থিয়েটারের অভিনয় দর্শনে গিরিশচন্দ্রের নাট্য-প্রতিভা ক্রমশ স্ফুরিত হইতে থাকে। সেই প্রতিভার প্রথম বিকাশ—স্বীয় পল্লীতে 'সধবার একাদশী' নাটকে নিমচাঁদের ভূমিকাভিনয়ে (১৮৬৯ খ্রী)।

গিরিশচন্দ্র যে-যে স্থানে কর্ম্ম করিয়াছিলেন, সেই-সেই স্থানেই সাহেবের প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। কর্ম্মস্থলে প্রভুর হিতের প্রতি তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল। এইজন্য অ্যাট্‌কিন্সন সাহেব তাঁহাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন। অফিস প্রসঙ্গে গিরিশচন্দ্র একদিন একটী ঘটনার কথা বলিয়াছিলেন—"আমি তখন অ্যাট্‌কিন্সন সাহেবের অফিসে কাজ করি। ইঁহাদের নীলের কাজ ছিল। একদিন অফিসের ছাদে নীল শুকাইতে দেওয়া হয়। বৃষ্টিব কোনও সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া নীল গুদামে তোলা হয় নাই। রাত্রে দেখি, ভয়ানক মেঘ দেখা দিয়াছে। আমার তখনই মনে হইল, অফিসের ছাদে নীল পড়িয়া আছে, বৃষ্টি হইলে বিস্তর টাকা ক্ষতি হইবে। তাড়াতাড়ি একখানি গাড়ী ভাড়া করিয়া অফিসে গেলাম। দারোয়ানদের জাগাইয়া দ্বিগুণ মজুরী দিয়া কুলী সংগ্রহ করিলাম, পরে নীল গুদামে তুলাইয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম। পরদিন অফিসে গিয়া শুনিলাম, আমি চলিয়া আসিবার পর অ্যাট্‌কিন্সন সাহেব নীল রক্ষার জন্য ব্যস্ত হইয়া অফিসে গিয়াছিলেন। দারোয়ানের মুখে আমার নীল তোলার কথা শুনিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া বাটী যান। বড় সাহেবের আদেশমত আমি কুলীদের মজুরীর বিল দাখিল করিলাম। অফিসের ছোট সাহেব এবং অংশীদার—নাম ব্যান্‌ক্রফ্‌ট,

বড় সজ্জন ছিলেন না—তিনি বলিলেন, 'মজুরী অত্যন্ত অধিক চার্জ্জ করা হইয়াছে।' অ্যাট্‌কিন্সন সাহেব বলিলেন—'বল কি? একে রাত্রিকাল, অফিস অঞ্চল একরূপ জনশূন্য, অকালে মেঘের আড়ম্বর, এ অবস্থায় লোকসংগ্রহ কঠিন,—দর কসাকসি করিবার তখন অবস্থাই নয়। আমার অনেক কর্ম্মচারী আছে, আমি সে সময়ে আসিয়া কাহারও মুখ দেখিতে পাই নাই। এই ব্যক্তি আমাদের বহুৎ লোকসান বাঁচাইয়াছে। ইহাকে পুরস্কৃত করা কর্ত্তব্য।' অ্যাট্‌কিন্সন সাহেবের মনোগত ভাব ছিল, আমার বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিবেন। কিন্তু বিচক্ষণ সাহেব, ছোট সাহেবের মনোভাব দর্শনে স্পষ্ট বুঝিলেন, ইহাতে অনেকেই ঈর্ষান্বিত হইবে। তিনি আর কিছু না বলিয়া লোহার সিন্দুক খুলিয়া দিয়া আমায় বলিলেন, 'বাবু, তোমার পুরস্কারস্বরূপ হাতে যত ধরে, তিন আঁচলা টাকা তুলিয়া লও।' আমি রুমাল পাতিয়া সিন্দুক হইতে তিন আঁচল টাকা তুলিয়া লইলাম। আমার হাতের চেটো দুইখানি দেখিতে নেহাত ছোটখাটো নয়। ব্যান্‌ক্রপ্ট সাহেব নীরবে একবার আমার হাতের আঁচলের বহর দেখিতে লাগিলেন, আর একবার সিন্দুকের টাকার দিকে চাহিতে লাগিলেন।"

ব্যান্‌ক্রপ্ট সাহেব, অ্যাট্‌কিন্সন সাহেবের অফিসের অংশীদার ছিলেন বটে, কিন্তু অ্যাট্‌কিন্সন সাহেব যেরূপ তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন, কর্ম্মী এবং সহৃদয় ছিলেন, তিনি একেবারেই তাহার বিপরীত ছিলেন। কয়েক বৎসর কার্য্য করিবার পর উভয়ের মধ্যে মত-বিরোধ ঘটিল, মনোমালিন্য ক্রমশঃ এতটা বাড়িয়া উঠিল যে, অ্যাট্‌কিন্সন সাহেব ছোট সাহেবকে তাহার অফিসের বখরা বিক্রয় করিয়া স্বদেশে চলিয়া যান।

এই অ্যাট্‌কিন্সন সাহেবের অফিসের সহিত গিরিশচন্দ্রের সাহিত্য-জীবনের একটী ক্ষুদ্র স্মৃতি বিজড়িত আছে। এই অফিসে কার্য্যকালীন তিনি 'ম্যাক্‌বেথ' নাটকের তর্জ্জমা করিতেছিলেন। সময় পাইলেই কখনও বাড়ীতে, কখনও-বা অফিসে একটু-একটু করিয়া অনুবাদ করিতেন। অনুবাদ প্রায় শেষ হইলে তিনি খাতাখানি আনিয়া অফিসের ডেস্কের ভিতর রাখিয়া দিয়াছিলেন, কার্য্যের ফুরসৎ পাইলে আবশ্যকমত খাতাখানি সংশোধন করিতেন।

নিজ ঔদ্ধত্যবশতঃ ব্যান্‌ক্রপ্ট সাহেবও অধিকদিন অফিস চালাইতে পারেন নাই। শীঘ্রই তিনি সমব্যবসায়িগণের সহানুভূতি হারাইলেন। যথাকালে অফিস ফেল হইয়া যখন আসবাবপত্র—চেয়ার-টেবিল নিলাম হইয়া যায়, সেই সঙ্গে গিরিশচন্দ্রের ডেস্কের মধ্যে রক্ষিত 'ম্যাক্‌বেথে'র পাণ্ডুলিপিখানিও খোয়া যায়। এই সময়ে পত্নী-বিয়োগে মানসিক অশান্তিবশতঃ খাতাখানি যে অফিসে আছে, তাহাও তাঁহার স্মরণ ছিল না। উত্তরকালে তিনি মিনার্ভা থিয়েটারের নিমিত্ত 'ম্যাক্‌বেথ' নাটকের পুনরায় অনুবাদ আরম্ভ করেন। পূর্ব্বস্মৃতি হইতে অনেক স্থানে তিনি সাহায্য পাইয়াছিলেন। যথাসময়ে ইহার উল্লেখ করিব।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা

একাদশ পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে, গিরিশচন্দ্র তাঁহার জ্যেষ্ঠ শ্যালক ব্রজনাথবাবুর নিকট প্রথমে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা শিক্ষা করেন। ব্রজবাবুর মৃত্যুর পর গিরিশচন্দ্র তাঁহার অ্যানাটমি ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার পুস্তকগুলি এবং ঔষধের বাক্সটি নিজ বাটীতে আনেন এবং বিশেষ যত্নের সহিত গ্রন্থগুলি অধ্যয়ন করিয়া বিনামূল্যে প্রতিবাসী ও দীনদরিদ্রগণকে ঔষধ বিতরণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহার সুচিকিৎসার বার্ত্তা বসুপাড়া পল্লীতে বিস্তৃত হইয়া পড়িলে—ভদ্র ও ইতর শ্রেণীর বহু ব্যক্তি প্রাতঃকালে তাহার বাটীতে ঔষধের নিমিত্ত সমবেত হইতেন। গিবিশচন্দ্রের রোগ নির্ণয় ও ঔষধ নির্ব্বাচনের উপর তাঁহার বন্ধু-বান্ধবের যথেষ্ট বিশ্বাস ছিল। একদা বসুপাড়া পল্লীর জনৈক ভদ্রলোক তাঁহার মাতাঠাকুরাণীর অন্তিমাবস্থায় তাঁহাকে গঙ্গাতীরস্থ করেন। গিরিশচন্দ্র জনৈক বন্ধুর সহিত গঙ্গাতীরে তাঁহাকে দেখিতে যান। বৃদ্ধার শরীরের অবস্থা ও নাড়ী পরীক্ষা করিয়া তিনি বলেন, "ইঁহার মৃত্যুব এখনও বহু বিলম্ব আছে। আমার বিশ্বাস, ঔষধ সেবনে এ যাত্রা রক্ষা পাইতে পারেন, বলেন তো আমি ঔষধ পাঠাইয়া দিই।" রোগীকে ঔষধ খাওয়ান সকলের মত হইলে গিরিশচন্দ্র অগ্রেই বাটী চলিয়া আসেন এবং চিকিৎসা-পুস্তক খুলিয়া বিশেষ যত্নের সহিত রোগীর সমস্ত লক্ষণ মিলাইয়া একটী ঔষধ নির্ব্বাচিত করেন। কিন্তু ঔষধ লইতে কেহ আর আসিল না। পবে তিনি শুনিলেন, তাঁহারা মত পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। গিরিশবাবুর প্রদত্ত ঔষধের উপর তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল,—যদ্যপি ঔষধ সেবনে রোগী পুনর্জ্জীবন লাভ করে,—তাহাহইলে গঙ্গাতীর হইতে পুনরায় বাটী লইয়া যাওয়া লৌকিক আচারে বড়ই বিপজ্জনক হইবে।

ভদ্রলোকটীর মাতা বহুদিন গঙ্গাতীরস্থ "মুমূর্ষু-নিকেতনে" থাকায়, তাহাকে প্রত্যহ বহুবার বাড়ী ও গঙ্গাতীর যাওয়া-আসা করিতে হইত। গিরিশবাবুর বাটীর সম্মুখস্থ গলি দিয়াই যাতায়াতের সুবিধা ছিল। গিরিশচন্দ্রের মুখে শুনিয়াছি, পাছে তিনি ঔষধ দেন, এই ভয়ে ভদ্রলোকটী উক্ত গলি-পথ দিয়া যাওয়া-আসা বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন।

তিনি যাঁহাদিগকে ঔষধ দিতেন, তাঁহাদিগকে ঔষধ সেবনের পর রোগী কিরূপ থাকে, সে সংবাদ দিবার নিমিত্ত বিশেষ করিয়া বলিয়া দিতেন, এমনকি অনেক

সময়ে ঔষধের ফলাফল জানিবার জন্য অফিসের কার্য্যে তিনি অন্যমনস্ক হইয়া পড়িতেন এবং রাত্রে ঔৎসুক্যবশতঃ তাঁহার নিদ্রার বিশেষ ব্যাঘাত হইত। কিন্তু অনেকেই যথাসময়ে তাঁহাকে রোগীর অবস্থা জ্ঞাপন করিতেন না, কেহ-বা সুস্থ হইয়া তাঁহার সহিত আর সাক্ষাতই করিতেন না। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটী ঘটনার উল্লেখ করিতেছি।— নিকটবর্ত্তী কাঁটাপুকুরে এক ব্যক্তির কলেরা হইয়াছিল। গিরিশচন্দ্র তাহার চিকিৎসা করেন। রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত ঔষধদানে রোগের উপসর্গগুলি প্রায়ই দূর করিয়া আনেন। বিশেষ করিয়া রোগীর আত্মীয়কে বলিয়া দেন—"অন্য কোনও উপসর্গ দেখা দিলে রাত্রেই আসিয়া আমাকে জানাইবে, নচেৎ কল্য প্রাতে আসিয়া সংবাদ দিবে।"

প্রভাত হইতে না হইতে গিরিশচন্দ্র উৎকণ্ঠায় উঠিয়া পড়েন এবং বৈঠকখানায় আসিয়া রোগীর আত্মীয়ের আগমন প্রতীক্ষা করিতে থাকেন, কিন্তু বেলা ৮টা বাজিতে যায়, তখন পর্য্যন্ত কাহারও দেখা নাই। তাঁহার একবার সন্দেহ হইল, রোগীর কি মৃত্যু হইল?—আবার ভাবিলেন, ঔষধে যেরূপ সুফল দেখা দিতেছিল—তাহাতে তো মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা নাই। যাহাই হউক তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না— স্বয়ং রোগীর বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখেন—রোগী পিড়েয় ঠেস দিয়া দাওয়ায় বসিয়া আছে। তিনি তাঁহার আত্মীয়কে অনুযোগ করিয়া বলিলেন,—"তোমার সকালেই খবর দিবার কথা—কেন দিলে না?" আত্মীয়টী বিনীতভাবে বলিল,—"আজ্ঞে, রোগী বেশ ভাল আছে, আর কোন ভয় নাই। সেইজন্যই আর খবর দিই নাই।"

এইরূপ নানা কারণে বিরক্ত হইয়া, তিনি উক্ত চিকিৎসা একপ্রকার পরিত্যাগ করেন, 'ক্লাসিক থিয়েটারে' কার্য্যকালীন (১৩০৯ সালে) পুনরায় তিনি দ্বিগুণ উৎসাহে এই চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হন। যথাসময়ে তাহার বিস্তৃত বিবরণ পাঠকগণ জ্ঞাত হইবেন।

এই সময়ে অফিসের কার্য্যও খুব জোরে চলিতেছিল। সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর গিরিশচন্দ্র বাটী আসিয়া আর-কোথাও বড়-একটা বাহির হইতেন না। রাত্রে সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান ও রাজনীতি-সংক্রান্ত নানা বিষয়ক গ্রন্থপাঠে নিবিষ্ট থাকিতেন। বিশেষ আবশ্যক না থাকিলে তিনি পাঠের ব্যাঘাত করিতে চাহিতেন না। অধ্যয়নই তাঁহার জীবনের প্রধান আনন্দ ছিল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

ধর্ম্ম-জীবনের প্রথমাবস্থা

অষ্টম পরিচ্ছেদে বলিয়াছি,—যৌবনেব প্রারম্ভে গিরিশচন্দ্র অভিভাবকবিহীন হইয়া স্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠিয়াছিলেন। সে সময়ে শিক্ষিত সমাজে একটা ধর্ম্ম-বিপ্লবের দিন আসিয়াছিল। সনাতন ধর্ম্মে অনাস্থা, চতুর্দ্দিকে নব-নব মত উত্থিত। কি সত্য কি মিথ্যা স্থির করিতে না পারিয়া গিরিশচন্দ্রেরও হিন্দু ধর্ম্মে তাদৃশ শ্রদ্ধা ছিল না, ক্রমে তিনি নাস্তিক হইয়া উঠিয়াছিলেন। এই সময়ের একটী ঘটনার উল্লেখ করিতেছি :—

৺শারদীয়া পূজার পূর্ব্বদিন প্রভাতে বাটীব লোক উঠিয়া দেখিল, বহির্ব্বাটীর প্রাঙ্গণে কাহারা প্রতিমা ফেলিয়া দিয়া গিয়াছে। বাড়ীতে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। পল্লীবাসীবা জানিত, নীলকমলবাবু যথেষ্ট অর্থ রাখিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ কন্যারও ঠাকুর-দেবতার উপর বিশেষ ভক্তি-শ্রদ্ধা আছে। বোধহয় সেই কারণেই—পাড়ার কয়েকজন হুজুগপ্রিয় লোক মজা দেখিবাব জন্য গোপনে এই কার্য্য করিয়াছিল। যাহাই হউক গিরিশচন্দ্রের জ্যেষ্ঠা ভগিনী কৃষ্ণকিশোরী এই অপ্রত্যাশিত ঘটনায় চঞ্চলা হইয়া উঠিলেন,—মহামায়ির পূজা না কবিলে পাছে বাড়ীর অকল্যাণ হয়—এখন কি করা কর্ত্তব্য—এই সকল চিন্তা করিতেছেন—এমন সময়ে বাটীতে বহু লোকের সমাগমে একটা কোলাহল উত্থিত হওয়ায়, গিবিশচন্দ্র ঘুম হইতে উঠিয়া পড়িলেন। বহির্ব্বাটীতে আসিয়া প্রতিমা দর্শনে বুঝিলেন, পাড়ার জনকতক দুষ্ট লোকের এই কীর্ত্তি। তিনিও তাহাদের এই কীর্ত্তি লোপ করিবার জন্য 'কালাপাহাড়' মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। মদ্যপান করিয়া কোথা হইতে একখানি কুঠাব সংগ্রহ করিয়া আনিয়া প্রতিমা খণ্ড-বিখণ্ড করিতে আরম্ভ করিলেন। "করিস কি, করিস কি" বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতে-করিতে কৃষ্ণকিশোরী ছুটিয়া আসিলেন—বাটীতে কান্না পড়িয়া গেল। দিগম্বরবাবু থাকিলে হয়তো তাঁহাকে নিরস্ত করিতে পাবিতেন, কিন্তু তিনি ৺পূজায় দেশে গিয়াছিলেন।* তাঁহার সেই সংহার-মূর্ত্তি দর্শনে অন্য কেহ নিকটে যাইতে সাহস করিল না, একে-একে সকলেই সরিয়া পড়িল।

* ইনি যেরূপ বুদ্ধিমান সেইরূপ বিশ্বাসী এবং সাহসী ছিলেন। সাংসারিক প্রত্যেক কার্য্যেই কৃষ্ণকিশোরী ইঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। পারিবারিক আপদ-বিপদে দিগম্বরবাবু প্রাণদানেও পরাঙ্মুখ হইতেন না। ইঁহার সদ্গুণের ছায়া লইয়া উত্তরকালে গিরিশচন্দ্র তাঁহার 'প্রফুল্ল' নাটকে পীতাম্বর চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন।

ধ্বংস-কার্য্য শেষ করিয়া গিরিশচন্দ্র প্রতিমার এক-এক টুকরা তাঁহাদের খিড়কির বাগানের এক আমগাছ-তলায় লইয়া গিয়া স্তূপীকৃত করিলেন। পরে সমস্তদিন ধরিয়া সেইগুলি মাটীতে পুঁতিয়া তবে নিশ্চিন্ত হইলেন।*

গিরিশচন্দ্রের তৎকালীন উচ্ছৃঙ্খল জীবনেও, তাঁহার হৃদয়ের অন্তস্তলে ফল্গুর ন্যায় যে এক মহাপ্রাণতার ক্ষীণ ধারা প্রবাহিত হইতেছিল, তাহা তাঁহার বাল্যসুহৃদ স্বর্গীয় কালীনাথ বসু মহাশয়ের ডায়েরীপাঠে অবগত হওয়া যায়।

কালীনাথবাবু তাঁহার সমবয়সী, প্রতিবাসী এবং বন্ধু ছিলেন। পুলিশ বিভাগে ইনি কার্য্য করিতেন। বাঙ্গালার নানাস্থানে ঘুরিয়া ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে ২৭শে জুলাই তারিখে কলিকাতায় ইনি কোর্ট ইন্সপেক্টর হইয়া আসেন। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে, ইনি প্রথম শ্রেণীর ইন্সপেক্টর, পরে স্বীয় যোগ্যতা এবং বুদ্ধিমত্তায় ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গালীর মধ্যে প্রথম পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট পদ প্রাপ্ত হন। তিনি তাঁহার ডায়েরীতে জীবনের ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেন। তাঁহার সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বসু (Asst. Commissioner of Police) মহাশয়ের সৌজন্যে কালীনাথবাবুর স্বহস্তে লিখিত ডায়েরী পাঠ করিবার সুযোগ পাইয়াছি।

১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে কালীনাথবাবু যে সময়ে রানীগঞ্জ রেলওয়ে পুলিসের কার্য্য করিতেছিলেন, গিরিশচন্দ্র সে সময়ে রানীগঞ্জে বেড়াইতে যান এবং তাঁহার বাসাতেই অবস্থান করেন। গিরিশচন্দ্রের বয়ঃক্রম তখন তেইশ বৎসর মাত্র। কালীনাথবাবুর ডায়েরী-পাঠে বুঝা যায়, গিরিশচন্দ্র এই সময়ে চরিত্রহীন হইলেও তাহা সংশোধনের চেষ্টা করিতেছিলেন এবং ঈশ্বরের অস্তিত্বে প্রত্যয় না করিলেও ঈশ্বর বিশ্বাসে যে নির্ম্মল আনন্দ আছে, স্বীকার করেন। গিরিশচন্দ্রের এই মহাবাক্যে আশ্বস্ত হইয়া কালীনাথ-বাবু অতঃপর প্রত্যহ ঈশ্বর উপাসনায় উৎসাহিত হন। আমরা কালীনাথবাবুর ১৪ই ফেব্রুয়ারী (১৮৬৭ খ্রী) তারিখের ডায়েরী হইতে সবটুকুই উদ্ধৃত করিলাম।

"At noon Girish and I, sitting on my couch, had a talk upon moral conduct of life. Girish admitted that he was passing a bad life and was degenerating himself and wished to correct himself. I am very sorry for him and wish his recovery. What a dreadful word he says, he has no belief in the existence of the Almighty! I shall pray for him. I note this to mark at what time change takes place in him. Girish admits there is a happiness in reliance to God. Oh, I must try to have that as much as possible. Prayer

* শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু) মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি, সেই রাত্রে গিরিশচন্দ্রের প্রবল জ্বর হয়, মুখ ভীষণ ফুলিয়া উঠে। মহাত্রাসে কৃষ্ণকিশোরী গিরিশচন্দ্রের এই গুরুতর পাপস্খালনের নিমিত্ত দেব-দেবীর নিকট মানসিক করেন। কয়েকদিন জ্বর ভোগ করিয়া গিরিশচন্দ্র নিরাময় হন। পরবর্ত্তী চারি বৎসর কৃষ্ণকিশোরী সমারোহ করিয়া বাটীতে দুর্গাপূজা করিয়াছিলেন।

I am after, now every day."*

গিরিশচন্দ্র স্বয়ং মদ্যপান করিতেন, কিন্তু বন্ধুবান্ধবদের মদ্যপ দেখিতে ইচ্ছা করিতেন না। কালীনাথবাবু কলিকাতায় "মদ্যপান নিবারণী সভা"র অঙ্গীকার-পত্রে নাম লিখিয়াও অনিয়মিত মদ্যপান করিতেন। এ নিমিত্ত গিরিশবাবু তাঁহাকে পূর্ব্ব-প্রতিজ্ঞা স্মরণ করাইয়া অনুযোগ করেন। কালীনাথবাবু গিরিশচন্দ্রকে ধন্যবাদ দিয়া তাঁহার ২৪শে ফেব্রুয়ারী তারিখের ডায়েরীতে নিম্নলিখিতরূপ লিখিয়া রাখিয়াছেন।

"Girish reminded me that I signed my name in covenant of Temperance Society. I so forgot that I never thought of it. I am very sorry. I shall never drink but as prescribed by Temperance Society. Thanks to Girish for his doing good."

কালীনাথবাবুর ডায়েরীর পর তারিখে লিখিত হইয়াছে, "তাঁহার ভৃত্য পূর্ব্বরাত্রে বাড়ীতে চুরি করায় তিনি তাহাকে পুলিস সোপরদ্দ করিয়া উপযুক্ত দণ্ডপ্রদানে সমুদ্যত হন। কিন্তু গিরিশচন্দ্র তাঁহাকে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করেন—'প্রথমেই গুরুদণ্ডের ব্যবস্থা না করিয়া এবারটা তাহাকে ক্ষমা করা হোক।'" কালীনাথবাবু কর্ত্তব্যকর্ম্মে বড়ই কঠোর ছিলেন, গিরিশচন্দ্র বহুকষ্টে ভৃত্যটীকে মুক্তিদান করিয়াছিলেন।†

কালীনাথবাবু কলিকাতায় আসিলে, গিরিশচন্দ্র তাঁহার সহিত কিছুদিন আদি ব্রাহ্মসমাজে উপাসনাদিতে যোগদান করিয়াছিলেন। একদা উক্ত সমাজে উৎসবের দিন প্রথমে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পরে স্বর্গীয় বেচারামবাবু, তৎপরে পূর্ব্ববঙ্গদেশীয় জনৈক প্রচারক বক্তৃতা করেন। পরদিবস সুবিখ্যাত ধর্ম্মাচার্য্য কেশবচন্দ্র সেনের বাটীতে আদি ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতাদির সম্বন্ধে আন্দোলন হইতেছিল। গিরিশবাবু সেদিন তথায় উপস্থিত ছিলেন। এই আন্দোলনে উক্ত পূর্ব্ববঙ্গদেশীয় প্রচারক সম্বন্ধে কেশববাবু যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা তরুণবয়স্ক গিরিশচন্দ্রের মনে যেন ভ্রাতৃভাবের উপেক্ষা বলিয়া বোধ হইল। সেইরূপ উপেক্ষা অনুভব হওয়ায় তিনি ব্যথিত হইলেন এবং ভ্রাতৃভাব একটা কথার কথা, তাঁহার ধারণা জন্মিল। সেইদিন হইতে তিনি ব্রাহ্মদিগের দল পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্ববৎ আবার নাস্তিক হইয়া উঠিলেন। কালীনাথবাবু কেশব সেনের নিকট ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হন। মুঙ্গেরে কার্য্যকালীন তথায় তিনি কেশববাবুর সহিত পরিচিত হইয়া তদবধি তাঁহার অনুরক্ত হইয়াছিলেন।

* মাত্র ৩৮ বৎসর বয়ঃক্রমে কালীনাথবাবু অকালে ইহলোক ত্যাগ করেন; নচেৎ তিনি দেখিয়া যাইতেন, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের কৃপালাভ করিয়া গিরিশচন্দ্রের ধর্ম্ম-জীবনের কিরূপ পরিবর্তন হইয়াছিল।

† এই প্রসঙ্গে উপনিষদের সেই শ্লোকটী স্মরণ হয়:

অপরাদ্ধেষু সস্নেহা মৃদবো মৃদুবৎসলা।
আরাধন সুখাশ্চাপি পুরুষাঃ স্বর্গগামিনঃ॥

অর্থাৎ যাঁহারা অপরাধীর প্রতি সদয়, কোমল ও মৃদুবৎসল এবং যাঁহারা ব্রহ্মের আরাধনায় সুখী হয়েন, তাঁহারা স্বর্গগামী হন।

গিরিশচন্দ্র মনে-মনে এই সিদ্ধান্ত করিলেন, যদি ঈশ্বর থাকেন এবং ধর্ম্ম, মানব-জীবনের অতি প্রয়োজনীয় বস্তু হয়, তাহাহইলে জীবনধারণের অতি আবশ্যক জল, বায়ু ও আলোক যেমন যথেষ্ট রহিয়াছে, ধর্ম্ম তদপেক্ষা সুলভ লভ্য হইত। "ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং" হইয়া থাকিত না। কিন্তু এই নাস্তিক অবস্থাতেও পিতৃদেবের উপর অচলা ভক্তিবশতঃ যেদিন তিনি গঙ্গাস্নান করিতেন, পিতৃমাতৃ-লোকের উদ্দেশে রামতর্পণের মন্ত্র* পাঠে, তিনি অঞ্জলি করিয়া জল প্রদান করিতেন। ভাবিতেন, "জল দিই, কি জানি সত্যই যদি পিতার কোন কার্য্য হয়।" এই পিতৃভক্তির প্রভাবেই গিরিশচন্দ্র সাংসারিক বহু শোক, তাপ ও বিপদ সহ্য করিয়া পরম শান্তিলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন।

গিরিশচন্দ্র তাঁহার ধর্ম্ম-জীবনের প্রথম ইতিহাস এইরূপ বর্ণনা করিয়াছিলেন :— "আমাদের পঠদ্দশায় ইংরাজী-শিক্ষার প্রভাবে কেহ জড়বাদী, কেহ খ্রীষ্টান, কেহ-বা ব্রাহ্ম হইয়াছিলেন। হিন্দু ধর্ম্মের উপর বিশ্বাস কেহ বড় একটা করিতেন না। যাঁহারা হিন্দু ছিলেন, তাঁহাদের ভিতর আবার নানান্ দলাদলি। কেহ শাক্ত, কেহ বৈষ্ণব; আবার বৈষ্ণবের ভিতরও নানান্ সম্প্রদায়। প্রত্যেক মতাবলম্বী অপর মতাবলম্বীকে নরকে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতেন। এই তো অবস্থা, তার উপর আবার অনেক যাজক ব্রাহ্মণ ভ্রষ্টাচারী, কেহ সত্যনারায়ণের পুঁথি লইয়া শ্রাদ্ধ করিতে বসেন, কেহ-বা, স্বচক্ষে দেখিয়াছি, শৌচ হইতে আসিয়া পাইখানাব গাড়ুর জলে অঙ্গুলি সিক্ত করিয়া মাটির দেওয়ালে ঘসে, কপালে ফোঁটা কেটে পূজা করিতে যান। এরূপ অবস্থায় স্বধর্ম্মে আর কোন আস্থা রহিল না। আবার দু'পাত ইংরাজী পড়িয়া দেখিলাম, যাহারা জড়বাদী—বিদ্যাবুদ্ধিতে তাঁহারা সকলের শ্রেষ্ঠ। ঈশ্বর না মানা একটা পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক বলিয়া মনে হইত। কিন্তু হিন্দুর দেশে চারিযুগ ধরিয়া যাহার নাম চলিয়া আসিতেছে, হিন্দুর প্রাণ সে ঈশ্বরকে একেবারে হট্ করিয়া উড়াইয়া দিতে পারে না। বন্ধুবান্ধবদিগের মধ্যে যাহারা কৃতবিদ্য ছিলেন, ঈশ্বর লইয়া মাঝে-মাঝে তাঁহাদের সহিত তর্ক করিতাম। ব্রাহ্মসমাজেও মাঝে-মাঝে যাওয়া-আসা করিতে লাগিলাম। কিন্তু যে অন্ধকার—সেই অন্ধকার, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। ঈশ্বর আছেন কিনা,—থাকেন যদি, কোন ধর্ম্ম অবলম্বন করা উচিত? মনে-মনে ঈশ্বরকে ডাকিতাম,—'ঈশ্বর যদি থাক, আমায় পথ দেখাইয়া দাও।' ক্রমে মনে হইল, সব ঝুট, —জল, বায়ু, আলোক—যাহা ক্ষণিক ইহজীবনের প্রয়োজন, তাহা ছড়ান রহিয়াছে—না চাহিলেও পাওয়া যায়; তবে ধর্ম্ম—যাহা অনন্ত জীবনের প্রয়োজন, তাহা খুঁজিয়া লইতে হইবে কেন? সব ঝুট কথা! জড়বাদীরা বিদ্বান, বিজ্ঞ,—তাঁহারা যাহা বলেন, তাহাই ঠিক।"

গিরিশচন্দ্রের ধর্ম্ম-জীবন বড়ই বিচিত্র। যথাসময়ে পাঠকগণ তাহা জ্ঞাত হইবেন।

* ওঁ আব্রহ্ম ভুবনাল্লোকা দেবর্ষিপিতৃমানবাঃ।
তৃপ্যন্তু পিতরঃ সর্ব্বে মাতৃমাতামহাদয়ঃ॥
অতীতকুলকোটীনাং সপ্তদ্বীপনিবাসিনাম্।
ময়া দত্তেন তোয়েন তৃপ্যন্তু ভুবনত্রয়ম্॥

উনবিংশ পরিচ্ছেদ

পারিবারিক সুখ-দুঃখ

গিরিশচন্দ্র বলিতেন, "বাল্যে মাতৃবিয়োগ, কৈশোরে পিতৃবিয়োগ এবং যৌবনে পত্নীবিয়োগ যে কিরূপ নিদারুণ, তাহা আমি ভুক্তভোগী হইয়া মর্ম্মে-মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়াছি।" বাস্তবিক গিরিশচন্দ্রের জীবনী আলোচনা করিলে সুস্পষ্ট বুঝা যায়, পারিবারিক সুখ-শান্তি-প্রদানে ভাগ্যবিধাতা তাঁহার প্রতি বড়ই কৃপণতা দেখাইয়াছিলেন। একটী ধারাবাহিক শোক-স্রোত তাঁহার সমস্ত জীবনের উপর দিয়া বহিয়া চলিয়াছিল।

যে নবশিশুর শুভাগমনে তাঁহার খুল্লপিতামহ হরিশচন্দ্র এবং জ্যেষ্ঠতাত রামনারায়ণ আনন্দে আত্মহারা হইয়া মুক্তহস্তে দান করিয়াছিলেন, তাঁহারা উভয়েই গিরিশচন্দ্রের জন্মের ছয়মাস পরে ইহলোক ত্যাগ করেন।

প্রসূতিব কঠিন পীড়ায় গিরিশচন্দ্র, জননীর স্তন্যপানে বঞ্চিত হইযা এক বাগ্দিনীর স্তন্যপানে প্রাণধারণ করেন। মাতৃবক্ষেব পবিত্র অমৃতপান শিশুর ভাগ্যে ঘটে নাই।

শৈশবে গিরিশচন্দ্রের ষষ্ঠা ভগিনী কালীপ্রসন্নের (প্রসন্নকালীর) মৃত্যু ঘটে। এই কন্যার জন্মের দুই বৎসর পরেই গিরিশচন্দ্রের জন্ম। এই বালিকা গিরিশচন্দ্রকে অত্যন্ত ভালবাসিত। গিরিশচন্দ্রকে আদর করিয়া সে 'গিরিভাই' বলিয়া ডাকিত। গিরিভাইকে একবার কোলে করিতে পারিলে তাহার আনন্দের আর সীমা থাকিত না। ছাদে গিরিশচন্দ্রের শুইবার কাঁথা শুকাইতেছে, হঠাৎ বৃষ্টি আসিয়াছে, পাছে গিরিভাই-এর কাঁথা ভিজিয়া যায়, বালিকা কাঁদিয়া আকুল। গিরিশকে কোলে লইবার জন্য বালিকা সতত সুযোগ খুঁজিত; কিন্তু পাছে কোলে তুলিয়া ফেলিয়া দেয়—এ নিমিত্ত বাটীর সকলকে সতত সাবধানে থাকিতে হইত।

গিরিশচন্দ্র, অতুলকৃষ্ণ ও তাঁহার ভগিনী দক্ষিণাকালীর মুখে বহুবার এই বালিকার সম্বন্ধে গল্প শুনিয়াছি। বালিকার মৃত্যুর করুণ কাহিনী বড়ই মর্ম্মস্পর্শী। নীলকমলবাবুর বাটীতে একজন ভিখারী প্রায়ই ভিক্ষা করিতে আসিত, সে "জয় রাধাগোবিন্দ নাচে" বলিয়া গান গাহিত। প্রসন্নকালী তখনও তেমন স্পষ্ট করিয়া কথা বলিতে পারিত না, সে সেই গানের অনুকরণ করিয়া বলিত "ধেও নাধার গোবিন্দ"। বালিকা মায়ের নিকট পয়সা লইয়া সেই ভিখারীকে দিত। কিছুদিন পরে বালিকা কঠিন পীড়ায় সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়ে, মৃত্যু হইয়াছে জ্ঞানে তাহাকে শ্মশানঘাটে লইয়া যাওয়া হয়।

গঙ্গাতীরে আনিবার পর বালিকার পুনরায় চৈতন্য হয়। বাটীতে এ সংবাদ পৌঁছিলে নীলকমলবাবু প্রভৃতি ছুটিয়া আসেন। কিন্তু চৈতন্যলাভ করিয়াও বালিকার আবার ভাবান্তর ঘটে। সেই অবস্থায় বালিকা বলিল, "খেও নাধার গোবিন্দ এয়েছে, রথ এয়েছে, পয়সা দাও।" এমন সময় দেখা গেল, জনৈক মুমূর্ষু বৃদ্ধকে তাঁহার আত্মীয়-স্বজন সংকীর্ত্তন করিতে-করিতে গঙ্গাতীরে আনয়ন করিল। সংকীর্ত্তন শ্রবণে বালিকার মৃত্যু-ছায়াঙ্কিত মুখ সহসা হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিল, সে পুনরায় বলিতে লাগিল, "খেও নাধার গোবিন্দ—খেও নাধার গোবিন্দ।" ক্ষুদ্র বালিকার এই অদ্ভুত ভাব দর্শনে সমাগত লোকগণ আসিয়া তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। আশ্চর্য্যের বিষয়, এই সংকীর্ত্তনকারীর দল সেই বৃদ্ধ মুমূর্ষুকে পরিত্যাগ করিয়া বালিকার সম্মুখে আসিয়া "জয় রাধাগোবিন্দ" বলিয়া নাম সংকীর্ত্তন করিতে লাগিল। মধুর নাম শুনিতে-শুনিতে শাপভ্রষ্টার ন্যায় বালিকা দিব্যধামে চলিয়া গেল!

এই সরলা মমতাময়ী ভগিনীর অদর্শনে শিশু-হৃদয়ে কি ব্যথা জাগিয়াছিল, তাহা যিনি সকল হৃদয়েরই সংবাদ রাখেন, সেই অন্তর্য্যামীই জানিতেন। তবে গিবিশচন্দ্রের জ্ঞান হইলে, তাঁহার ভগিনীদের মুখে কালীপ্রসন্নের (প্রসন্নকালীর) এই অদ্ভুত মৃত্যু-কাহিনী এবং তাঁহার প্রতি বালিকার এই অকৃত্রিম স্নেহের গল্প শুনিয়া গিরিশের হৃদয় দ্রবীভূত হইয়া পড়িত এবং বয়োবৃদ্ধির সহিত এই দেবীপ্রতিমাকে মানসপটে অঙ্কিত করিয়া, ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলিদানে পরম তৃপ্তিলাভ করিতেন। মনে পড়ে, একদিন নিশীথ-কালে অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় কালীপ্রসন্ন প্রসঙ্গে তিনি অত্যন্ত অভিভূত হইয়া পড়েন, এবং সেই অবস্থায় তাঁহার উদ্দেশে একটী কবিতা রচনা করেন। কবিতাটী তিনি মুখে বলিযা যান, আমি লিখিতে থাকি। এইস্থলে বলা আবশ্যক, গিরিশচন্দ্রের শেষজীবনের পঞ্চদশ বৎসরকাল আমি তাঁহার লেখকের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলাম এবং প্রায় নিত্য-সঙ্গীরূপে থাকিতাম। কবিতাটী সযত্নে রাখিয়া দিয়াছিলাম। নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম:—

"প্রসন্ন তোমারে কালী প্রসন্ন তোমার,
'গিরিভাই'—দেখ কি গো আর?
তোমার নাহিক মনে, অলৌকিক জগজ্জনে
শুনি তব মূর্ত্তি ছিল স্নেহেব আধার—
অলৌকিক লাবণ্য রূপের জ্যোতিহার!

মনে পড়ে করে ধ'রে বলিতে আমায়,—
'তুমি মার কাছে যাও, আমারে বিদায় দাও!'
—সংসার-সাগরে ভাসি ভুলেছি তোমায়,
দেখ কি এখন আমি আছি কি দশায়?
সরল সংসারে দেখা তোমায় আমায়,
জান না আমার বিবরণ—

শুন শুন এ সংসার কুটীলতাময়
নহে—তুমি দেখেছ যেমন।

সংসার মাঝারে রণ করি দিবানিশি,
হাসি শুধু বিলাসের হাসি!
তুমি যদি ফিরে চাও, ভুলাইয়ে নিয়ে যাও,
'গিরিবাবু' তোমার, দেখ না দুখে ভাসি!

ভঙ্গুর এ দেহ আমি জানি চিরদিন;
জানি সৃষ্টি কালের অধীন;
তথাপি তোমারে চাই, মনে সাধ দেখা পাই,
স্বপ্নে যদি তুমি দেখা দাও একদিন,—
বলি, দিদি, তোমায়—সংসার কি কঠিন!"

গিরিশচন্দ্রের যে সময় দশ বৎসর বয়ঃক্রম, সেই সময়ে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নিত্যগোপালবাবুর মৃত্যু হয়। নিত্যগোপালবাবু গিরিশচন্দ্রকে বড়ই ভালবাসিতেন, মুহূর্তের নিমিত্ত চক্ষুর অন্তরাল করিতেন না, নির্ম্মল স্নেহের আবরণে পৃথিবীর সকল আবিলতা হইতে ভাইটীকে রক্ষা করিতেন। ভ্রাতার লেখাপড়ায় যাহাতে সমধিক উন্নতি হয়, সেই উচ্চাশায় নিত্যগোপালবাবু পিতাকে অনুরোধ করিয়া গিরিশচন্দ্রকে হেয়ার স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেন। নীলকমলবাবুর ঘরের গাড়ী ছিল, অফিস যাইবার সময় পুত্রকে স্কুলে নামাইয়া দিয়া যাইতেন। বাল্যকাল হইতেই নিত্যগোপালবাবুর ঘোড়ায় চড়িবার সখ ছিল, এ নিমিত্ত স্নেহময় পিতা তাঁহাকে একটী ঘোড়া কিনিয়া দিয়াছিলেন, ক্রমে তিনি একজন ভাল অশ্বারোহী হইয়া উঠিয়াছিলেন।

লেখাপড়া ছাড়িয়া নিত্যগোপালবাবু পিতার নিকট বিষয়কর্ম্ম শিক্ষা করিতেন। গিরিশচন্দ্র স্কুলে যাইলে তিনি বড়ই বিমনা হইয়া থাকিতেন, ভাইকে স্কুল হইতে আসিতে দেখিলেই আবার প্রফুল্ল হইয়া উঠিতেন। যেদিন গিরিশচন্দ্রকে দেখিবার নিমিত্ত মন বড়ই ব্যাকুল হইয়া পড়িত,—তখনই অশ্বারোহণে বাগবাজার হইতে পটলডাঙ্গায় ছুটিতেন এবং ভাইকে একবার দেখিয়া ও স্কুলে তাহার কিরূপ লেখাপড়া হইতেছে, সে সংবাদ লইয়া প্রসন্নমনে বাড়ী ফিরিয়া আসিতেন।

বাইশ বৎসর বয়সে বাতশ্লেষ্মা বিকারে হঠাৎ ইঁহার মৃত্যু হয়। গিরিশচন্দ্রের বয়ঃক্রম তখন দশ বৎসর মাত্র। উপযুক্ত পুত্রের অকালমৃত্যুতে নীলকমলবাবু এরূপ ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়েন যে সেই হইতে গিরিশচন্দ্রের শিক্ষার দিকে তাঁহার আর তেমন দৃষ্টি রহিল না।

এক বৎসর যাইতে-না-যাইতে একাদশ বর্ষ বয়সে গিরিশচন্দ্র মাতৃহীন হইলেন। দুঃসহ পুত্রশোকের পর পত্নীবিয়োগে নীলকমলবাবুর স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়া পড়ে। পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে, স্ত্রীর মৃত্যুর তিন বৎসর পরে তাঁহার মৃত্যু হয়। গিরিশচন্দ্রের

বয়:ক্রম তখন চৌদ্দ বৎসর মাত্র। এই বয়সে তিনটী কনিষ্ঠ ভ্রাতার—কানাইলাল, অতুলকৃষ্ণ ও ক্ষীরোদচন্দ্রের হস্ত ধরিয়া জ্যেষ্ঠা ভগিনী কৃষ্ণকিশোরীর অভিভাবকতায় গিরিশচন্দ্র সংসারে প্রবেশ করিলেন। এই অল্প বয়সে সমাজমান্য, সুশিক্ষিত, উপার্জ্জনশীল, পরম স্নেহময় জনকের অকালমৃত্যু—গিরিশচন্দ্রের দুর্ভাগ্য তাহাতে আর সন্দেহ কি!

জ্যেষ্ঠা ভগিনী কৃষ্ণকিশোরী এই বৃহৎ সংসারে একজন পুরুষ অভিভাবকের প্রয়োজন-বোধে ষোল বৎসর বয়সে গিরিশচন্দ্রের বিবাহ দিলেন। বিবাহেব দিন ভীষণ অগ্নি-কাণ্ডের কথা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে।

পিতৃ-বিয়োগে স্বেচ্ছাচারী হইয়া হেয়ার স্কুল হইতে ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী, তথা হইতে আবার পাইকপাড়া গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়—এইরূপ ক্রমান্বয় স্কুল পরিবর্ত্তনে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় তিনি কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে পারিলেন না।* ইহার কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহার পঞ্চমা ভগিনী কৃষ্ণরঙ্গিণী কালগ্রাসে পতিতা হন।

যে প্রতিভা লইয়া তিনি জন্মগ্রহণ করিযাছিলেন, এই সময়ে সংযত হইয়া লেখাপড়া শিখিলে হয়তো তিনি ভবিষ্যতে একজন বিখ্যাত অধ্যাপক, উকীল বা চিকিৎসক হইতে পারিতেন,—কিন্তু বিধাতা তাঁহার জন্য অন্য পথ নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছিলেন।

তেইশ বৎসর বয়সে গিরিশচন্দ্রেব একটী পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, পুত্রটী দুই-এক মাসের অধিক জীবিত ছিল না।

১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে গিরিশচন্দ্রের দ্বিতীয়া ভগিনী কৃষ্ণকামিনী পরলোকগমন করেন। প্রথম পরিচ্ছেদে লিখিত হইয়াছে,—চুঁচুড়ার সুপ্রসিদ্ধ সোমেদের বাটীতে ইঁহার বিবাহ হয়। ইনি দুইটী পুত্র রাখিয়া যান। প্রথম পুত্র ত্রৈলোক্যনাথ সোম মহাশয় সাব-জজ হইয়া, কয়েক বৎসব গত হইল, ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী সোম মহাশয় উপস্থিত চুঁচুড়াতেই বাস কবিতেছেন। ইনি আজীবন অধ্যয়নশীল। শৈশবাবস্থায় মাতৃহীন হওয়ায় গিরিশচন্দ্রের চতুর্থা ভগিনী দক্ষিণাকালী বিনোদবাবুকে আপনাব নিকট রাখিয়া আজীবন গর্ভধারিণী জননীর ন্যায় প্রতিপালন

* পাইকপাড়া স্কুলের কথা লিখিতে গিয়া, গিরিশচন্দ্র-কথিত একটী উপদেশ স্মরণ হইল। তিনি একদিন কথা প্রসঙ্গে বলেন,—"তখন আমি পাইকপাড়া স্কুলে পড়িতাম। একদিন স্কুল যাইতেছি, দেখিলাম—একটী আট বছরের সাহেবের ছেলে চিৎপুবের মাঠে একটা শিয়ালকে তাড়া করিয়া ছুটিয়াছে। তখন চিৎপুরে অনেক পাটকল ও পাটের গুদাম হওয়ায়, অনেক সাহেব তথায় সপরিবারে বাস করিতেন। আমি ব্যস্ত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ছেলেটীকে বলিলাম, 'অহে দাঁড়াও, দাঁড়াও—কি কচ্চ? এখনই যে শিয়ালে কামড়ে দেবে।' সাহেবের ছেলেটী আমার চীৎকারে থমকিয়া দাঁড়াইল। আমি নিকটবর্ত্তী হইয়া ইংরাজীতে বলিলাম, 'তুমি কি শিয়ালকে ভয় করো না?' ছেলেটী সদর্পে বুক ফুলাইয়া বলিল—'Oh no no, the Jackal will be frightened at my sight!' আমি সেই আট বছরের ছেলেটার সাহস ও নির্ভীকতা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম। আমরা মায়ের কোল হইতে ছেলেদের জুজু ও ভূতের ভয় দেখাইতে শুরু করি। তাহার পর পাছে কোন বিপদ ঘটে, এই আশঙ্কায়—প্রত্যেক কার্য্যে বাধা দিয়া ছেলেগুলিকে অত্যন্ত নিরীহ গোবেচারা করিয়া তুলি। ছেলেদের শিক্ষাদান সম্বন্ধে আমাদের সহিত ইংরাজের কতটা পার্থক্য দেখ।"

করিয়াছিলেন। বিধবা হইয়া ইনি পিত্রালয়ে আসিয়া অবস্থান করিলে, খুদুমণিবাবুও (বিনোদবাবুর শৈশবের আদরের নাম) তাঁহার সঙ্গে আসিয়া মাতুলালয়ে অবস্থান করেন। *

কৃষ্ণকামিনীর মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই গিরিশচন্দ্রের তৃতীয় ভ্রাতা কানাইলাল অকালে কালগ্রাসে পতিত হন। বাটীতে হাহাকার পড়িয়া যায়। কয়েকমাস পূর্ব্বে হাটখোলার সুপ্রসিদ্ধ দত্তদের বাটীতে রাধিকানাথ দত্তের কন্যার সহিত ইঁহার বিবাহ হইয়াছিল। ভাই তিনটী যাহাতে সুশিক্ষিত হয়, গিরিশচন্দ্র সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন। এফ. এ. পরীক্ষা দিবার অল্পদিন পূর্ব্বেই তাঁহার জ্বর হয়, সেই জ্বরেই মৃত্যু ঘটে; গিরিশচন্দ্র কানাইলাল অপেক্ষা তিন বৎসরের বড় ছিলেন; তাঁহার মৃত্যুতে তিনি সহোদর এবং সুহৃদ উভয়েই হারাইলেন।

এই বৎসর গিরিশচন্দ্র যেইরূপ উপর্য্যুপরি দুইটী গভীর শোক পাইয়াছিলেন, সেইরূপ একটী পুত্ররত্নও লাভ করেন। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে, ১১ই ডিসেম্বর (১২৭৫ সাল, ২৮শে অগ্রহায়ণ) গিরিশচন্দ্রের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু) শ্যামপুকুরস্থ তাঁহার মাতুলালয়ে ভূমিষ্ঠ হন। গিরিশচন্দ্রের বয়স তখন পঁচিশ বৎসর। বর্ত্তমান বঙ্গ-নাট্যশালার অপ্রতিদ্বন্দ্বী অভিনেতা সুরেন্দ্রবাবুর সহিত পাঠকমাত্রেই পরিচিত। প্রথম পুত্র বিয়োগের পর এই নবশিশুর অভ্যুদয়ে বাটীতে আনন্দ কোলাহল উত্থিত হয়।

সুরেন্দ্রনাথের জন্মগ্রহণের প্রায় চারি বৎসর পরে গিরিশচন্দ্রের প্রথমা কন্যা

* এই প্রসঙ্গে গিরিশচন্দ্র-কথিত একটী গল্প মনে পড়িল। তিনি একদিন বলিয়াছিলেন,— "ন'দিদি (দক্ষিণাকালী) খুদুমণিকে তাহার মায়ের মৃত্যুর পর নিজের কাছে রাখিয়া দিয়াছিলেন। এত ভালবাসিতেন যে, একদণ্ড চক্ষুর আড় করিতেন না। একদিন খুদুমণির বাবা হরলালবাবু আসিয়া 'বাড়ীতে ছেলেকে একবার দেখিতে চাহিতেছে' বলিয়া দুই দিনের কড়ারে খুদুমণিকে চুঁচুড়ায় লইয়া যান, চুঁচুড়ায় লইয়া গিয়া কিন্তু আর পাঠাইয়া দিতে চাহেন না। বলেন—'নিজের বাড়ী থাকিতে ছেলে পরের বাড়ীতে থাকিবে কেন? আমি আর পাঠাইব না।' এদিকে ন'দিদি ছেলের জন্য কাঁদিয়া আকুল। লোকের উপর লোক পাঠান—কিন্তু তাহারা হরলালবাবুর ধমক খাইয়া ফিরিয়া আসে। অবশেষে ন'দিদি আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিলেন। একদিন কাঁদিতে-কাঁদিতে আমাকে জিদ করিয়া বলিলেন,—'তুমি না যাইলে কেহই আমার খুদুমণিকে আনিতে পারিবে না। তাহার মা নাই, সেখানে ছেলের অযত্ন হইতেছে।' বাধ্য হইয়া আমাকে চুঁচুড়া যাইতে হইল। সঙ্গে একজন সুচতুর ভৃত্য লইয়াছিলাম। আমি চুঁচুড়া যাইয়া খুদুমণিকে পাঠাইবার জন্য হরলাল-বাবুকে বিশেষ অনুরোধ করিলাম; কিন্তু তিনি কোনওমতে রাজী হইলেন না। বাটীর অন্যান্য লোকের পাঠাইবার ততটা অমত ছিল না, তবে হরলালবাবুর ভয়ে কিছু বলিতেও পারিতেন না। আমি তাঁহাদের সহিত পরামর্শ করিয়া আহারাদির পর বৈঠকখানায় হরলালবাবুর সহিত নানারূপ গল্পগুজব করিতে লাগিলাম, ইতিমধ্যে উপদেশমত আমার ভৃত্য খুদুমণিকে লইয়া নৌকাযোগে কলিকাতায় রওনা হইল। আমি তারপর একা কলিকাতা আসিয়াছিলাম। হরলালবাবু সঙ্গে আসিয়া আমাকে শ্যামবাবুর ঘাটে নৌকায় তুলিয়া দিয়া গেলেন। পরে বাটী গিয়া যখন শুনিলেন, ছেলেকে ভৃত্য বহুপূর্ব্বে লইয়া গিয়াছে, তিনি ক্রোধে জ্বলিয়া উঠেন। অনেক বুঝাইয়া অবশেষে বাটীর লোক তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ করেন।

সরোজিনী জন্মগ্রহণ করে।* সুরেন্দ্রবাবুর জন্মের পর ন্যূনাধিক ছয় বৎসরকাল গিরিশচন্দ্র পারিবারিক শান্তিলাভ করিয়াছিলেন। এই সময় বাগবাজারের সখের থিয়েটারে ইনি 'সধবার একাদশী', 'লীলাবতী' এবং সান্ন্যাল-ভবনে অভিনীত 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকে যথাক্রমে নিমচাঁদ, ললিত ও ভীমসিংহের ভূমিকাভিনয় করিয়া প্রতিভাবান অভিনেতা বলিয়া যশঃলাভ করিয়াছিলেন। কার্য্যদক্ষতায় অফিসের বড় সাহেবের প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন এবং প্রত্যেক বৎসর বেতনবৃদ্ধি হইতেছিল। এই সময়েই চতুর্থ ভ্রাতা অতুলকৃষ্ণ বি. এল. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া হাইকোর্টে ওকালতি করিতে আরম্ভ করেন।

ত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে গিরিশচন্দ্রের বাটীতে আবার অশান্তি দেখা দেয়। এই সময় তাঁহার পত্নী একটী সন্তান প্রসব করিয়া সূতিকা-পীড়ায় আক্রান্তা হন। শিশুটীও জীবিত ছিল না। ইহার অল্পদিন পরেই গিরিশচন্দ্রের সর্ব্বকনিষ্ঠ (পঞ্চম) ভ্রাতা ক্ষীরোদচন্দ্র একুশ বৎসর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করেন। সন্ধ্যাকালে বসুপাড়া পল্লীর জনৈক প্রতিবেশীর বাটীতে ইনি নিমন্ত্রণ রাখিতে গিয়াছিলেন, তথায় হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়ায় ভোজন না করিয়াই বাটীতে ফিরিয়া আসেন, সেই রাত্রেই তাঁহার মৃত্যু হয়। বিবাহ তখনও হয় নাই, নানা স্থান হইতে সম্বন্ধ আসিতেছিল মাত্র। সর্ব্বকনিষ্ঠ ভ্রাতার এই আকস্মিক মৃত্যুতে গিরিশচন্দ্র বড়ই মর্ম্মাহত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

এই সময়ে 'গ্রেট ন্যাসান্যাল থিয়েটার' খোলা হয়। মানসিক অশান্তি ও নানা কারণে গিরিশচন্দ্র প্রথম হইতে এ সম্প্রদায়ে ছিলেন না। বিশেষরূপ অনুরুদ্ধ হইয়া এক মাস পরে অবৈতনিকভাবে তথায় যোগদান করেন।

* ইনিই উদীয়মান অভিনেতা শ্রীমান্ দুর্গাপ্রসন্ন বসুর জননী।

বিংশ পরিচ্ছেদ

'গ্রেট ন্যাসান্যালে' গিরিশচন্দ্র

'গ্রেট ন্যাসান্যাল থিয়েটারে' গিরিশচন্দ্রের যোগদান করিবার পূর্ব্বে কিরূপে 'গ্রেট ন্যাসান্যাল থিয়েটারে'র সৃষ্টি হইল এবং কিরূপ অবস্থায় গিরিশচন্দ্র তথায় যোগদান করিলেন, তৎসম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। 'বেঙ্গল থিয়েটার' ইহার পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত না হইলে 'গ্রেট ন্যাসান্যাল থিয়েটার' হইত কিনা সন্দেহ, সুতরাং সর্ব্বপ্রথমে 'বেঙ্গল থিয়েটার' সম্বন্ধে দুই-চারি কথা বলিব।

'বেঙ্গল থিয়েটার' প্রতিষ্ঠা

সান্ন্যাল-ভবনে 'ন্যাসান্যাল থিয়েটারে'র অভিনয় দেখিয়া, সিমলার সুপ্রসিদ্ধ জমীদার স্বর্গীয় আশুতোষ দেব ওরফে ছাতুবাবুর দৌহিত্র স্বর্গীয় শরচ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয় একটী সাধারণ নাট্যশালা সংস্থাপনে উদ্যোগী হন। দেশের গণ্যমান্য লোক লইয়া তিনি এই নব-নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত একটী কমিটি সংগঠিত করেন। প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রামবাগানের দত্ত বংশীয় সুপ্রসিদ্ধ উমেশচন্দ্র দত্ত (O. C. Dutt), পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমী প্রভৃতি মনীষিগণ এই কমিটির মেম্বার ছিলেন। সিঁদুরিয়াপটীর ৺গোপাললাল মল্লিকের বাড়ীতে আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেনের উদ্যোগে 'বিধবাবিবাহ' নাটক এবং স্বর্গীয় দ্বারকানাথ ঠাকুরের মধ্যম পুত্র গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্রগণের উদ্যোগে তাঁহাদের জোড়াসাঁকো-ভবনে 'নব-নাটক' অভিনয় দেখিয়া, বিদ্যাসাগর মহাশয় বেশ বুঝিয়াছিলেন যে, নাট্যশালা সমাজের কুসংস্কার দূর করিবার একটী প্রকৃষ্ট উপায়।

শরচ্চন্দ্রবাবু তাঁহার মাতামহের নিকট হইতে তাঁহার বৃহৎ ভবনের সম্মুখস্থ মাঠের কিয়দংশ ভাড়া লইলেন এবং বাল্যবন্ধু সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়, অখিলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি বন্ধুগণের সহিত মিলিত হইয়া, খোলার ঘর বাঁধিয়া থিয়েটার-বাটী নির্ম্মাণ আরম্ভ করিলেন। (এই স্থানে উপস্থিত বিডন স্কোয়ার পোষ্টাফিসের নূতন বাটী নির্ম্মিত হইয়াছে।) থিয়েটারের নিমিত্ত মাইকেল মধুসূদন দত্ত স্বয়ং 'মায়াকানন' নামক একখানি নাটক প্রণয়নে প্রবৃত্ত হইলেন। স্ত্রী-চরিত্র

অভিনয়ের নিমিত্ত বালক-সংগ্রহের চেষ্টা হইতে লাগিল। কিন্তু মাইকেল মধুসূদন, চিরদিনই নূতনত্বের পক্ষপাতী, তিনি বলিয়া বসিলেন,—"বালক লইয়া অভিনয় করিলে অভিনয় কখনই স্বাভাবিক হইতে পারে না, স্ত্রী-চরিত্রের অভিনয় স্ত্রীলোক লইয়াই করা কর্ত্তব্য।" বহু তর্ক-বিতর্ক করিয়া অবশেষে অভিনেতাগণ বারাঙ্গনা লইয়া অভিনয় করিতে সম্মত হইলেন। কমিটিও পরিশেষে ইহার অনুমোদন করিলেন;—কেবল বিদ্যাসাগর মহাশয় এ প্রস্তাবে সম্মত না হইয়া থিয়েটারের সংস্রব ত্যাগ করিলেন।

ইতিপূর্ব্বে মধুসূদন পঞ্চকোটের রাজার ম্যানেজার ছিলেন, কিন্তু নানা কারণে রাজার প্রতি বিরক্ত হইয়া কার্য্যে জবাব দিয়া কলিকাতায় চলিয়া আসেন। এই সময়ে তিনি উমেশচন্দ্র দত্তের উৎসাহে এই নব-নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার আয়োজনে যোগদান করেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন, স্বয়ং নাটক লিখিয়া ও শিক্ষাদান করিয়া বঙ্গ-নাট্যশালার উৎকর্ষতা সাধন করিবেন এবং সেই সঙ্গে নিজেরও অর্থোপার্জ্জনের একটা উপায় হইবে। কিন্তু অল্পদিন পরেই ইনি কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হন। শয্যাশায়িত অবস্থাতেই তিনি 'মায়াকানন' নাটক সমাপ্ত করিয়া, নাটকখানির স্বত্ব - দারুণ অর্থাভাববশতঃ—পাঁচশত টাকায় শরৎবাবুকে বিক্রয় করেন।

উত্তরোত্তর মাইকেলের পীড়া বৃদ্ধি হইতে থাকায়, সম্প্রদায় নূতন নাটকের রিহারস্তাল না দিয়া তাঁহার পুরাতন 'শর্ম্মিষ্ঠা' নাটক অভিনয়েই থিয়েটার খুলিবার সঙ্কল্প করিলেন। গোলাপসুন্দরী (সুকুমারী দত্ত), এলোকেশী, জগত্তারিণী এবং শ্যামা নাম্নী চারিজন স্ত্রী-অভিনেত্রী লইয়া ইহারা 'শর্ম্মিষ্ঠা'র মহলা দিতে আরম্ভ করিলেন। রঙ্গালয়ও প্রায় প্রস্তুত হইয়া আসিল, এমন সময়ে শুনা গেল, মাইকেলের মৃত্যু হইয়াছে (১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দ, ২৯শে জুন, রবিবার, বেলা প্রায় ২টার সময়)। যাহাই হউক সম্প্রদায় নূতন নাট্যশালার 'বেঙ্গল থিয়েটার' নামকরণপূর্ব্বক ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দ, ১৬ই আগষ্ট (১২৮০ সাল, ১লা ভাদ্র) 'শর্ম্মিষ্ঠা' নাটকের প্রথম অভিনয় ঘোষণা করেন। কিন্তু 'শর্ম্মিষ্ঠা' নাটক অভিনয়ে সাফল্যলাভ করিতে না পারিয়া সম্প্রদায় বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িলেন।

এই সময়ে তারকেশ্বরের মোহান্ত ও এলোকেশী লইয়া বাঙ্গালাদেশে একটা তুমুল আন্দোলন চলিতে থাকে। 'বেঙ্গল থিয়েটার' এই হুজুগে 'মোহান্তর এই কি কাজ?' নামক একখানি নাটকের অভিনয় ঘোষণা করেন। নাটকখানি বড়ই সময়োপযোগী হইয়াছিল। প্রত্যেক অভিনয়-রজনীতে এত ভীড় হইত, যে স্থানাভাবে দর্শকগণ দলে-দলে হতাশ হইয়া ফিরিয়া যাইত।

'গ্রেট ন্যাসান্যাল থিয়েটারে'র উৎপত্তি

এই সময়ে এক রাত্রি নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ধর্ম্মদাস সুর, শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন নিয়োগী মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া 'বেঙ্গল থিয়েটার' দেখিতে আসেন, কিন্তু এত ভীড় যে তাঁহারা চারি টাকার টিকিট আট টাকা দিয়া কিনিতে চাহিয়াও পাইলেন না। ভুবনমোহনবাবু ধনাঢ্য জমীদারের পুত্র; তখন পিতৃ-বিয়োগ হওয়ায় বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছেন। টিকিট না পাইয়া তিনি উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন, এবং ফিরিবার পথে বিডন উদ্যানের কোণে আসিয়া তিনজনে পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন —একটী নূতন থিয়েটার করিতেই হইবে। ভুবনমোহনবাবুর অর্থে নগেন্দ্রবাবু এবং ধর্ম্মদাসবাবু, বিপুল উদ্যমে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। সিমলা-নিবাসী মহেন্দ্র দাসের, বর্ত্তমান 'মিনার্ভা থিয়েটার' যথায় প্রতিষ্ঠিত, খালি জমী মাসিক চল্লিশ টাকা ভাড়ায় পাঁচ বৎসরের জন্য লিজ লওয়া হইল। ধর্ম্মদাসবাবু অক্লান্ত পরিশ্রমে 'লুইস থিয়েটারে'র আদর্শে কাষ্ঠ-নির্ম্মিত রঙ্গালয় নির্ম্মাণ করিলেন। ১৫৭৬-৭৭ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনে জেমস্ বার্ব্বেজ নামক জনৈক সূত্রধার-ব্যবসায়ী নট কাষ্ঠ-নির্ম্মিত রঙ্গালয় প্রথম নির্ম্মাণ করেন। প্রায় তিনশত বৎসর পরে আমাদের ধর্ম্মদাসবাবুও কলিকাতায় বাঙ্গালীর জন্য প্রথম কাষ্ঠ-নির্ম্মিত রঙ্গালয় নির্ম্মাণ করিলেন।

১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দ, ৩১শে ডিসেম্বর, শনিবার মহাসমারোহে 'গ্রেট ন্যাসান্যাল থিয়েটার' খোলা হয়। ইহার পাঁচ মাস পূর্ব্বে 'বেঙ্গল থিয়েটার' প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং সাধারণ বঙ্গ-নাট্যশালাগুলির মধ্যে খোলার ঘর হইলেও বাটী নির্ম্মাণ হিসাবে 'বেঙ্গল থিয়েটারে'র নাম প্রথম উল্লেখযোগ্য।

'কাম্যকানন' নাটক লইয়া 'গ্রেট ন্যাসান্যাল থিয়েটার' খোলা হয়। হঠাৎ সেদিন থিয়েটারে অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত হওয়ায় 'কাম্যকানন' কিয়দংশমাত্র অভিনীত হইয়াই বন্ধ হইয়া যায়। থিয়েটারের সম্মুখে star light হইতে হঠাৎ আগুন জ্বলিয়া উঠে। দেওয়ালের গায়ে গ্যাসবাক্সে চিমনি বসান হয় নাই, সে জন্য উত্তাপের আধিক্যবশতঃ এই অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়াছিল। 'গ্রেট ন্যাসান্যাল থিয়েটারে'র স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন নিয়োগী মহাশয় বলেন,—"থিয়েটারের বাহিরের মাথায় ঘড়ি দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। তখন ঘড়ি তৈয়ারী না হওয়ায় সেই স্থানে ধর্ম্মদাসবাবু একটী পিচবোর্ডে ঘড়ি সুচিত্রিত করিয়া তাহার চারিপাশে লাল সালু দিয়া বাহার করেন এবং তাহার পার্শ্বে গ্যাসলাইট জ্বালাইয়া দিয়াছিলেন। শত্রুপক্ষের লোক আসিয়া লাঠি দিয়া খোঁচাইয়া সেই সালু গ্যাসের মুখে লাগাইয়া দেয়। আগুন জ্বলিয়া উঠিলে হৈ-চৈ পড়িয়া যায়। দর্শকগণ প্রাণভয়ে বাহির হইয়া পড়ে।" যাহাই হউক বহুলোকের সমবেত চেষ্টায় শীঘ্র অগ্নি নির্ব্বাপিত হয়। 'কাম্যকানন' আর অভিনীত হয় নাই। পরদিন (১৮৭৪ খ্রী. ১লা জানুয়ারী) বেলভেডিয়ারে Fancy Fair উপলক্ষ্যে 'গ্রেট ন্যাসান্যালে'র 'নীলদর্পণ' নাটক অভিনীত হয়। অতঃপর সান্যাল-ভবনে 'ন্যাসান্যাল থিয়েটার' কর্ত্তৃক অভিনীত দীনবন্ধুবাবুর নাটকগুলির পুনরভিনয় করিয়া ইহারা

কবিবর মনোমোহন বসু মহাশয়ের 'প্রণয়পরীক্ষা' নাটক প্রথম অভিনয় করেন। অভিনয় দর্শনে দর্শকগণ প্রীতিলাভ করিলেও সেরূপ অর্থসমাগম হয় নাই।

১১ই ফেব্রুয়ারী তারিখে 'অমৃতবাজার পত্রিকা'-সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়ের বিরচিত 'বাজারের লড়াই' নামক একখানি সাময়িক নাটক 'গ্রেট ন্যাসান্যালে' প্রথম অভিনীত নয়। কলিকাতা বিখ্যাত শীলেদের সহিত বাজার লইয়া হগ সাহেবের যে দাঙ্গা হয়, সেই ঘটনা লইয়া নাটকখানি রচিত হইয়াছিল।

ইহার প্রায় দেড় মাস পূর্ব্বে (২০শে ডিসেম্বর ১৮৭৩ খ্রী) 'বেঙ্গল থিয়েটারে' বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশ-নন্দিনী' প্রথম অভিনীত হয়। থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী শরচ্চন্দ্র ঘোষ্ মহাশয় জগৎ-সিংহের ভূমিকা গ্রহণে ঘোড়ায় চড়িয়া রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া দর্শকগণকে চমৎকৃত করিয়া দিতেন।* 'দুর্গেশনন্দিনী'র অভিনয়ও খুব জমিয়াছিল এবং দর্শক-সমাগমও যথেষ্ট হইত।

'গ্রেট ন্যাসান্যাল থিয়েটারে' ধর্ম্মদাসবাবু প্রথমে ম্যানেজার এবং নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যো-পাধ্যায় ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ভ্রাতৃদ্বয় প্রধান পরিচালক ছিলেন।

যে সময়ে 'গ্রেট ন্যাসান্যাল থিয়েটার' খোলা হয়, প্রায় সেই সময়েই গিরিশচন্দ্রের সর্ব্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা ক্ষীরোদচন্দ্রের হঠাৎ মৃত্যু হয়। মানসিক অশান্তিবশতঃ তিনি যে থিয়েটার খুলিবার প্রথম হইতে ছিলেন না, ইহাই প্রধান কারণ নহে। বস্তুতঃ ধর্ম্মদাস-বাবু এবং নগেন্দ্রবাবুই ভুবনমোহনবাবুকে থিয়েটার করিবার নিমিত্ত প্রথমে উত্তেজিত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের বিশেষরূপ উৎসাহেই পিতৃহীন ধনাঢ্য কিশোরবয়স্ক ভুবন-মোহনবাবু বহু অর্থব্যয়ে নূতন নাট্যশালা নির্ম্মাণ করেন এবং তাঁহাদের মতানুযায়ী চলিতে থাকেন। গিরিশবাবুর সহিত তাঁহাদের কোনওরূপ অকৌশল ছিল না। তবে নগেন্দ্রবাবু প্রভৃতির কতকটা ভরসা ছিল, গিরিশচন্দ্রের সাহায্য না লইয়াও তাঁহারা থিয়েটার চালাইতে পারিবেন। কিন্তু প্রথমেই 'কাম্যকানন' অভিনয়ে অকৃতকার্য্য হইয়া ইঁহারা অনেকটা ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়েন। মাসাবধি পুরাতন নাটকাভিনয়ে থিয়েটার চালাইয়া যখন তাঁহারা দেখিলেন — থিয়েটারের বিক্রয় ক্রমশঃ কমিয়া যাইতেছে এবং 'বেঙ্গল থিয়েটার' 'দুর্গেশনন্দিনী' অভিনয় করিয়া সুযশে এবং প্রচুর অর্থাগমে দিন-দিন সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া উঠিতেছে, তখন তাঁহারা আর নিজ শক্তির উপর নির্ভর না করিয়া গিরিশচন্দ্রের শরণাপন্ন হইলেন।

* রঙ্গমঞ্চের উপর ঘোড়া বাহির করা — শরৎবাবুই প্রথম প্রবর্ত্তিত করেন। এ নিমিত্ত 'বেঙ্গল থিয়েটারে'র প্লাটফরম আগাগোড়া মাটির ছিল, মাঝে খানিকটা তক্তা বসান থাকিত মাত্র। শরৎবাবু একজন বিখ্যাত ঘোড়সওয়ার ছিলেন। প্রতিভাশালিনী প্রবীণা অভিনেত্রী শ্রীমতী বিনোদিনী দাসী বলেন, — "আমরাও দেখেছি, ষ্টেজে ঘোড়া বেরিয়ে দুষ্টুমি কচ্চে, কিন্তু যেই শরৎবাবু ঘোড়ার গায়ে হাত দিলেন, অমনি সে শান্ত শিষ্ট, যেন কিছুই জানে না। শরৎবাবুর একটা সখের টাট্টু ঘোড়া ছিল; তিনি সেই ঘোড়ায় চ'ড়ে তাঁদের বাড়ীতে একতলা থেকে সিঁড়ি ভেঙ্গে তেতালায় ঠাকুর ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়াতেন। আর তাঁর দিদিমা ঠাকুরের প্রসাদী ফলমূল ঘোড়াকে খেতে দিতেন।"

'মৃণালিনী' অভিনয়

'গ্রেট ন্যাসান্যাল' সম্প্রদায় কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া গিরিশচন্দ্র অবৈতনিকভাবে বঙ্কিমচন্দ্রের 'মৃণালিনী' নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত করিয়া দেন, এবং স্বয়ং পশুপতির ভূমিকাভিনয়ে স্বীকৃত হন। ১৮৭৪ খ্রী, ১৪ই ফেব্রুয়ারী, 'গ্রেট ন্যাসান্যালে' 'মৃণালিনী'র প্রথমাভিনয় হয়। প্রথমাভিনয় রজনীর অভিনেতাগণের নাম :—

পশুপতি	গিরিশচন্দ্র ঘোষ।
হৃষীকেশ	অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী।
হেমচন্দ্র	নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
দিগ্বিজয়	শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু।
ব্যোমকেশ	অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেলবাবু)।
মাধবাচার্য্য	মতিলাল সুর।
বখতিয়ার খিলজি	মহেন্দ্রলাল বসু।
জনার্দ্দন	রাধাপ্রসাদ বসাক।
মৃণালিনী	বসন্তকুমার ঘোষ।
গিরিজায়া	আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়।
মনোরমা	শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়।
মণিমালিনী	মহেন্দ্রনাথ সিংহ।

প্রত্যেক ভূমিকাই সুযোগ্য অভিনেতাগণ কর্তৃক অভিনীত হওয়ায় নাট্যামোদিগণ 'মৃণালিনী' অভিনয় দর্শনে অতীব আনন্দলাভ করিয়াছিলেন। পশুপতির ভূমিকাভিনয়ে গিরিশচন্দ্র অদ্ভুত অভিনয়-প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন। ক্ষেত্রমোহনবাবু বলেন,—"যে দৃশ্যে পশুপতি মনোরমার মুখে পরিচয় পাইলেন, ইনিই কেশবের কন্যা ও তাঁহার পরিণীতা ভার্য্যা, সে দৃশ্যে পশুপতি-বেশী গিরিশচন্দ্রের তৎকালীন বদনমণ্ডলের অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন—এখনও যেন চক্ষের সম্মুখে দেখিতেছি ;—তাঁহার কণ্ঠস্বরের সেই বিচিত্রতা—এখনও যেন কর্ণ-পটাহে প্রতিধ্বনিত হইতেছে, মুখে বলিয়া তাহা ঠিক বুঝান যায় না। যে সময়ে মুসলমান পরিচ্ছদ-পরিহিত পশুপতি বিধর্ম্মী সৈন্যবেষ্টিত হইয়া রাজপথে চলিয়াছেন, সে সময়ে পশুপতির সেই উন্মাদ অবস্থা—মধ্যে-মধ্যে জ্ঞানসঞ্চার—গিরিশবাবু অতি আশ্চর্য্যভাবে দেখাইতেন—মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় দর্শকগণ সেই অলৌকিক অভিনয় দেখিতেন।"

নাট্যাচার্য্য অমৃতলালবাবু বলেন—"নাটকের শেষ দৃশ্যে সেই অগ্নিরাশির মধ্যে অষ্টভূজা মূর্ত্তি আলিঙ্গনে গিরিশচন্দ্রের অদ্ভুত অভিনয়-নৈপুণ্য দর্শনে আমরা পর্য্যন্ত অভিভূত হইয়া পড়িতাম—দর্শক তো দূরের কথা।"

সান্ন্যাল-ভবন হইতে 'ন্যাসান্যাল থিয়েটার' উঠিয়া যাইবার পর নাট্যাচার্য্য অর্দ্ধেন্দুশেখর প্রায়ই মফঃস্বলে ঘুরিয়া বেড়াইতেন, মধ্যে-মধ্যে কলিকাতায় আসিয়া আবার চলিয়া যাইতেন। 'গ্রেট ন্যাসান্যাল থিয়েটার' যেদিন খোলা হয়, সেদিন তিনি

নিমন্ত্রিত দর্শকরূপে থিয়েটার দেখিতে আসিয়াছিলেন। 'মৃণালিনী' নাটক খুলিবার পূর্ব্বে তিনি কলিকাতায় আসিয়া বন্ধু-বান্ধবদের অনুরোধে অল্পদিনের জন্ত থিয়েটারে যোগদান করেন এবং হৃষীকেশের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া আবার রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হন। মনোরমার ভূমিকা শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় এত সুন্দর অভিনয় করিয়াছিলেন যে গিরিশচন্দ্র 'মৃণালিনী'র বিজ্ঞাপনে লিখিয়া দিয়াছিলেন,—"Look—look to your Monoroma, she jumps at the fire." যাহাই হউক 'বেঙ্গল থিয়েটারে' অভিনীত 'দুর্গেশনন্দিনী'র ন্যায় 'গ্রেট ন্যাসান্যাল থিয়েটার'ও 'মৃণালিনী' অভিনয়ে যথেষ্ট গৌরবলাভ করিয়াছিল।

নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা লব্ধপ্রতিষ্ঠ অভিনেতা কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ইতিপূর্ব্বে 'বেঙ্গল থিয়েটারে' যোগদান করিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট হইতে গিরিশচন্দ্র কর্ত্তৃক নাটকাকারে গঠিত 'মৃণালিনীর' পাণ্ডুলিপি পাইয়া 'বেঙ্গল থিয়েটার' সম্প্রদায়ও ইহার পর বহুকাল ধরিয়া এই নাটকের অভিনয় করেন। কিরণবাবু পশুপতির ভূমিকা অভিনয় করিতেন। গোলাপসুন্দরীর গিরিজায়ার গান শুনিবার নিমিত্ত বহু দর্শকের সমাগম হইত।

গিরিশচন্দ্র যে সময়ে (১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে) 'মৃণালিনী' নাট্যাকারে পরিবর্ত্তিত করেন, তখন পর্য্যন্ত তিনি স্বয়ং কোন নাটক রচনা করেন নাই। আমরা 'মৃণালিনী' হইতে গিরিশচন্দ্র-লিখিত দুইটী দৃশ্যের কিয়দংশ পাঠকগণকে উপহার প্রদান করিলাম। এতৎ পাঠে পাঠকগণ পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে গিরিশচন্দ্রের রচনাশক্তির পরিচয় পাইবেন।

[বঙ্কিমচন্দ্রের 'মৃণালিনী' যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদের স্মরণ থাকিতে পারে যে, নবদ্বীপাধিপতি বৃদ্ধ লক্ষ্মণ সেনের ধর্ম্মাধিকার পশুপতির সহিত মুসলমান সেনাপতি বখতিয়ার খিলজির এইরূপ ষড়যন্ত্র হয় যে, পশুপতি যুদ্ধে নিরস্ত্র থাকিলে বখতিয়ার নবদ্বীপ অধিকার করিয়া তাঁহাকে বঙ্গ-সিংহাসনে বসাইবেন। পশুপতির এই বিশ্বাস-ঘাতকতা ও স্বদেশদ্রোহিতার ফলে বখতিয়ার নির্ব্বিবাদে বঙ্গ-সিংহাসন লাভ করিলেন বটে, কিন্তু নিজ প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিলেন না। পরন্তু পশুপতিকে বলিলেন, "যে অবিশ্বাসী—সে নরাধম কখনও সিংহাসনের উপযুক্ত নয়। এক্ষণে তুমি বন্দী।"

এই সময় কারারুদ্ধ পশুপতির মনে যে আক্ষেপের ঝড় উঠে, তাহারই চিত্র গিরিশবাবু এইভাবে ফুটাইছেন :—

প্রথম দৃশ্য

(৪র্থ অঙ্ক, ৩য় গর্ভাঙ্ক)

কারাগারে—পশুপতি

পশুপতি। রাজ্যনাশ—কারাবাস—কর্ম্মদোষে আমার সকলই উপস্থিত। কিন্তু আমি কেমন করে মনোরমাকে বিস্মৃত হব! মনোরমা, তোমার জন্য সব, তোমার কথা না শুনে আমি সব হারালুম। কিন্তু তোমা হারা হয়ে কি পশুপতি জীবনধারণ করতে পারে? কে বলে—পৃথিবী দুঃখময়। পৃথিবীতে এমন কি দুঃখ আছে যে

পশুপতিকে পীড়িত করতে পারে? নরক-যন্ত্রণা, উদয় হও! পশুপতির পাপের শাস্তি বিধান কর। নরকে কি এরূপ শাস্তি আছে—পশুপতির উপযুক্ত শাস্তি কি নরকে আছে? আমার অন্তঃকরণ অপেক্ষা কি নরক ভীষণ? শত-শত নরক একত্রিত কর—আমার অন্তঃকরণের নিকট তারা পরাস্ত হবে। আত্মীয়-স্বজন-শোণিতে চরণ প্রক্ষালন করেছি—তথাপি কি পশুপতির হৃদয়ে স্নেহের উদয় হয়? স্নেহ, তুমি বৃক্ষ-শাখা অবলম্বন কর—পাষাণে বাস কর—পশুপতির হৃদয়ে তোমার স্থান নাই।

(মহম্মদ আলীর প্রবেশ)

মুসলমান, আবার তুমি কি প্রিয় সম্ভাষণ করতে এসেছ? একবার তোমার প্রিয় সম্ভাষণে বিশ্বাস করে এই অবস্থাপন্ন হয়েছি, বিধর্মীকে বিশ্বাস করবার প্রতিফল পেয়েছি, এখন আমার মৃত্যু সংকল্প—আর তোমাদের কোন প্রিয় সম্ভাষণ শুনব না।

দ্বিতীয় দৃশ্য

তাহার পর পশুপতিকে মুসলমান-পরিচ্ছদ পরাইয়া যে সময়ে মহম্মদ আলী ও মুসলমান সৈন্যগণ রাজপথ দিয়া চলিয়াছে সে সময় বিকৃত-মস্তিষ্ক পশুপতি বলিতেছেন :]

পশুপতি। আকাশ আমার চন্দ্রাতপ! হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—রাজা জন্মেজয়ের মত আমার চন্দ্রাতপ কৃষ্ণবর্ণ হওয়া উচিত। মহাভারত শ্রবণে তাঁর চন্দ্রাতপ শ্বেতবর্ণ হইয়াছিল, আমার চন্দ্রাতপ কৃষ্ণবর্ণই থাকবে। শত-শত মহাভারত শ্রবণে শ্বেতবর্ণ হবে না।

মহম্মদ আলি। আপনি পাগলের মত কি বলছেন? যা হবার হয়ে গিয়েছে, দুঃখ করলে আর ফিরবে না।

পশুপতি। মন্ত্রীবর, বল দেখি পা রাখি কোথায়? এই দেখ, ভ্রাতৃবর্গের শোণিতাক্ত চরণের ভার মেদিনী আর বহন করতে পাচ্ছে না। মেদিনীরই বা অপরাধ কি? চারি যুগ হতে মনুষ্যের বাস,—এখন বৃদ্ধ হয়েছেন, আর বহন করতে অসমর্থ।

১ম সৈন্য। একি পাগল হল নাকি?

পশুপতি। লক্ষ্মণ সেন, তুমি বৃদ্ধ ও অকর্মণ্য। তোমাকে পদচ্যুত করায় আমার পাপ নাই। তিরস্কার করবে?—কর—সহ্য করব। পশুপতির হৃদয়ে সব সয়—পশুপতির হৃদয়ে অসহ্যও সহ্য হয়।

২য় সৈন্য। হা হতভাগ্য!

পশুপতি। মহারাজ! মহারাজ কে?—মহারাজ তো আমি। লক্ষ্মণ সেন, তোমার মুখ-কান্তি মলিন কেন? এতে কি আমার দয়ার উদ্রেক হয়? তোমার ন্যায় শত-শত ব্যক্তির ছিন্ন মস্তক পদতলে দলিত করে সিংহাসনে আরোহণ করতে পশুপতির হৃদয় কুণ্ঠিত হয় না। এই দেখ, চরণ দেখ—জানু পর্য্যন্ত শোণিত দেখ,—রাজপথে দেখে এস—শোণিত-স্রোত ভাগীরথীতে গিয়ে পড়ছে।

মহম্মদ। এই দুর্ভাগ্যকে কি করে নিয়ে যাই।

পশুপতি। মন্ত্রীবর ওকে ডাক। লক্ষ্মণ সেন, ফের—ফের—উপায় নাই, উপায় থাকলে ফিরতেম। আমার মস্তক দিলে যদি উপায় হয়, এই দণ্ডেই দিতে প্রস্তুত আছি।

মহম্মদ। (স্বগত) কি করি! 'রাজা' বলে সম্বোধন করে দেখি, যদি আমার সঙ্গে আসে। (প্রকাশ্যে) মহারাজ, চলুন নৌকা প্রস্তুত।

পশুপতি। কে ডাকে—কাকে ডাকে?

মহম্মদ। আসুন, নৌকা প্রস্তুত।

পশুপতি। মন্ত্রীবর, বিশ্বকর্ম্মা আমার সিংহাসন আনছে। দেখ—দেখ—যম কেমন পুরোহিত, সেই আমার অভিষেক করবে। দেখ—মস্তকশূন্য প্রজাগণ কেমন আহ্লাদে নৃত্য কচ্চে! ছত্রধারী, ছত্র ধর। মনোরমা—মনোরমা—আহা সিংহাসনের বাম-পার্শ্বে মনোরমা কি অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করেছে!

১ম সৈন্য। বোধহয় আমাদের কথা বিশ্বাস কচ্ছে না।

মহম্মদ। (স্বগত) না, আমার কথায় বিশ্বাস করেই এর এই দশা হয়েছে। (প্রকাশ্যে) আমার কথা বিশ্বাস করুন, আপনার প্রাণরক্ষার জন্য নৌকা প্রস্তুত, চলুন!

পশুপতি। বিশ্বাস—কাকে বিশ্বাস? জগতে কে বিশ্বাসের যোগ্য? লক্ষ্মণ সেন আমাকে বিশ্বাস করেছিল,—পশুপতি কাকেও বিশ্বাস করে না।

মহম্মদ। মহাশয়, আপনি আপন অবস্থা ভুলে যাচ্ছেন।

পশুপতি। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—তুই কে?—মুসলমান। রক্ষক একে বধ কর। হাঃ হাঃ হাঃ—ঐ যে আমার সিংহাসন আসছে,—দেখ দেখ—সিংহাসন আমাকে ডাকছে!

মহম্মদ। (নেপথ্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া) একি! পশুপতির গৃহে কে অগ্নি দিলে? বোধহয়—সৈন্যেরা লুট করতে-করতে অগ্নি দিয়েছে।

পশুপতি। মন্ত্রীবর, প্রজারা এদিকে আসছে কেন? তাদের বল—আজ অভিষেক নয়—অধিবাস। মনোরমা কোথায়? মনোরমা যে আমার সঙ্গে অধিবাস করবে। মনোরমা কোথায় গেল? এ্যাঁ, কোথায় গেল? আমার গৃহে আছে। (গমনোদ্যোগ)

মহম্মদ। (পশুপতিকে ধরিয়া) তোমার গৃহ কোথায়? ঐ দেখ, সৈন্যেরা তোমার গৃহে আগুন দিয়েছে।

পশুপতি। (সচকিতে) মনোরমা যে গৃহে আছে! ছাড়—ছাড়—(মহম্মদ আলীর ইঙ্গিতে সৈন্যদ্বয়ের পশুপতির উভয় হস্ত ধারণ)।

মহম্মদ। তুমি বন্দী। তোমাকে কারাগারে নিয়ে যাব।

পশুপতি। এ্যাঁ বন্দী! স্থির হও, ছাড়—আমি যাচ্ছি। জীবন স্বপ্নের ন্যায় স্মরণ হচ্ছে। ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও—

মহম্মদ। বোধহয় জ্ঞান হয়েছে।

পশুপতি। (অদূরে স্বীয় ভবন দর্শন করিয়া) ঐ কি আমার গৃহ ?

মহম্মদ। হ্যাঁ—তোমার গৃহ।

পশুপতি। হ্যাঁ, আমারই গৃহ বটে। আগুন দিয়েছে (সহসা উন্মত্তাবস্থায়) মনোরমা যে গৃহে আছে, ছাড়—ছাড়—(সবলে হাত ছাড়াইয়া ধাবিত হইলেন)।

'মৃণালিনী' অভিনয়ের পরে গিরিশচন্দ্র কর্ত্তৃক পুনরায় নাটকাকারে গঠিত হইয়া বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা' ৪ঠা এপ্রিল (১৮৭৪ খ্রী) 'গ্রেট ন্যাসান্যাল থিয়েটারে' অভিনীত হয়। পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে, ১৮৭৩ খ্রী, ১০ই মে তারিখে রাজা রাধাকান্ত দেবের নাটমন্দিরে 'ন্যাসান্যাল থিয়েটার' কর্ত্তৃক 'কপালকুণ্ডলা' প্রথমাভিনীত হইয়াছিল।

নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় বলেন,—"নগেনবাবু দেখিতে যেরূপ সুপুরুষ ছিলেন, সেইরূপ একজন উৎকৃষ্ট নট ছিলেন। নবকুমারের ভূমিকা তিনি অতি যোগ্যতার সহিত অভিনয় করিয়াছিলেন। মতিলাল সুরের কাপালিকের ভূমিকাভিনয় অতুলনীয় হইয়াছিল। 'নীলদর্পণে' তোরাপ এবং 'কপালকুণ্ডলা'য় কাপালিকের অভিনয়ে এ পর্য্যন্ত কেহই তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারেন নাই। কপালকুণ্ডলার অভিনয়ে শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় এবং মতিবিবির অভিনয়ে বেলবাবু বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন। সে সময়ে প্রত্যেক নাটকের প্রধান স্ত্রী-চরিত্রের ভূমিকাগুলি ক্ষেত্রবাবু ও বেলবাবুর একচেটিয়া ছিল। মিষ্ট পার্টের অভিনয়ে ক্ষেত্রবাবু এবং একটু ঝাঁজাল পার্টের অভিনয়ে বেলবাবু অদ্বিতীয় ছিলেন।"

একবিংশ পরিচ্ছেদ

আবার দুঃসময়—পত্নী-বিয়োগ ইত্যাদি

ত্রিশ বৎসর বয়সে গিরিশচন্দ্রের পুনরায় দুঃসময় উপস্থিত হয়—আবার নিদারুণ অশান্তি দেখা দেয়। কনিষ্ঠ ভ্রাতা ক্ষীরোদচন্দ্রের মৃত্যুর কয়েক মাস পরে গিরিশচন্দ্রের তৃতীয়া ভগিনী কৃষ্ণভাবিনী ওষ্ঠব্রণ পীড়ায়, মাঘ মাসে ভীমাষ্টমীর দিবস চল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রমে পরলোকগমন করেন।*

গিরিশচন্দ্রের পত্নী দীর্ঘকাল সূতিকা রোগে কষ্ট পাইতেছিলেন। পীড়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতেই থাকে। এই সময় তাঁহার অফিসেও গোলযোগ উপস্থিত হয়। ষোড়শ পরিচ্ছেদে বলিয়াছি,—মিঃ অ্যাট্‌কিন্সনের সহিত ব্যান্‌ক্রুপ্ট সাহেবের বনিবনাও হইত না। শেষে বড় সাহেব বিরক্ত হইয়া স্বদেশে চলিয়া যান। নিজ ঔদ্ধত্যবশতঃ ব্যান্‌ক্রুপ্ট সাহেবও অধিকদিন অফিস চালাইতে পারেন নাই।—এই সময়ে অফিস 'ফেল' হইবার উপক্রম হয়।

দুঃসময় ক্রমে ঘনীভূত হইয়া আসিল। গিরিশচন্দ্রের বিবাহের দিন যে অগ্নি তাঁহার বাটীর সন্নিকট পর্য্যন্ত আসিয়া নিরস্ত হইয়াছিল, সেই অগ্নি যেন আবার জাগিয়া উঠিয়া গিরিশচন্দ্রের সংসার বিপর্য্যস্ত করিল।

গিরিশচন্দ্র পত্নীর সুচিকিৎসার নিমিত্ত অধিকতর মনোযোগী হইলেন। দিবসে অফিস যাইতেন মাত্র, রাত্রে থিয়েটার যাওয়া বন্ধ করিলেন। রোগীর তত্ত্বাবধান করিয়া অবশিষ্ট সময় গ্রন্থপাঠে নিবিষ্ট থাকিতেন। পড়িতে-পড়িতে কোন-কোন দিন সমস্ত রাত্রি কাটিয়া যাইত, কখন প্রভাত হইত—তাঁহার হুঁশ থাকিত না। এই সময়ে তিনি মহাকবি সেক্সপীয়রের 'ম্যাক্‌বেথ' নাটকের বঙ্গানুবাদ করিতেছিলেন। †

* বংশ-পরিচয়ে পাঠকগণ জ্ঞাত আছেন,—কলিকাতা, শ্যামপুকুরে সুপ্রসিদ্ধ মল্লিকদের বাটীতে ইঁহার বিবাহ হইয়াছিল। মৃত্যুকালে ইনি দুইটী পুত্র ও তিনটী কন্যা রাখিয়া যান। পুত্রদ্বয়ের নাম ব্রজেন্দ্রকৃষ্ণ ও নগেন্দ্রকৃষ্ণ। কয়েক বৎসর গত হইল, উভয় ভ্রাতারই মৃত্যু হইয়াছে। ব্রজেন্দ্রবাবুর চারি পুত্র—মণীন্দ্রকৃষ্ণ, সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ, নলিনেন্দ্রকৃষ্ণ ও নবগোপাল। নগেন্দ্রবাবুর পাঁচ পুত্র—লালগোপাল, জয়গোপাল, শ্রীগোপাল, যদুগোপাল ও নৃত্যগোপাল। কন্যা তিনটীর নাম—কৃষ্ণবিনোদিনী, কৃষ্ণপ্রকাশিনী, এবং কৃষ্ণপ্রমোদিনী।

† ইতিপূর্ব্বে (১৩ই অক্টোবর ১৮৭৪ খ্রী) হেয়ার স্কুলের হেডমাষ্টার হরলাল রায়-প্রণীত 'রুদ্রপাল' নামক একখানি নাটক 'গ্রেট ন্যাশান্যালে' অভিনীত হয়। এই নাটকখানি মহাকবি সেক্সপীয়রের 'ম্যাক্‌বেথ' নাটক অবলম্বনে লিখিত হইয়াছিল।

এইরূপে প্রায় এক বৎসর গত হইতে চলিল, কিন্তু গিরিশচন্দ্রের সহধর্ম্মিণীর আরোগ্যের লক্ষণ কিছু দেখা গেল না। বহু অর্থব্যয়ে সুচিকিৎসার ত্রুটী হইল না, কিন্তু পীড়া ক্রমশঃই কঠিন হইয়া উঠিল। চিকিৎসকগণ আশা ত্যাগ করিলেন। ১২৮১ সাল, ১০ই পৌষ (১৮৭৪ খ্রী, ২৪শে ডিসেম্বর) পুত্র ও কন্যার পালনভার পতির হস্তে সমর্পণ করিয়া সাধ্বী সতী সংসার হইতে শেষ বিদায়গ্রহণ করিলেন।

ত্রিশ বৎসর, নয় মাস বয়ঃক্রমে গিরিশচন্দ্রের পত্নী-বিয়োগ হয়। প্রথমে তাঁহাকে তাদৃশ বিচলিত হইতে দেখা যায় নাই। কিন্তু ক্রমে সেই শোক গাঢ় হইয়া তাঁহাকে দিন-দিন অধিকতর আচ্ছন্ন করিতে লাগিল। পরম শান্তিদাতা পরমেশ্বরের পদে আত্মসমর্পণ করিয়া, হতভাগ্য মানবের শোকসন্তপ্ত হৃদয় যে কথঞ্চিৎ শান্তিলাভ করে,—নিরীশ্বরতা-প্রভাবে গিরিশচন্দ্রের সে সান্ত্বনা ছিল না। আবার এই সময় অ্যাট্‌কিন্সন কোম্পানীর অফিস ফেল হওয়ায়, কাজকর্ম্মে মন দিয়া যে ক্ষণিক শোক ভুলিয়া থাকিবেন, সে সুযোগ পর্য্যন্ত রহিল না। কবিবর টেনিসন বলিয়াছেন :—

"But, for the unquiet heart and brain,
A use in measured language lies ,
The sad mechanic exercise
Like dull narcotics, numbing pain "

মাদকে যেমন তীব্র দৈনিক যন্ত্রণার ক্ষণিক নিবৃত্তি হয়, ছন্দোময়ী ভাষা রচনার প্রয়াস তেমনি তীব্র মর্ম্ম-বেদনায় ও মানসিক অশান্তিতে মানবকে ক্ষণিক আত্মবিস্মৃতি প্রদান করে। ক্ষণিক আত্মবিস্মৃতিলাভের আকাঙ্ক্ষায় গিরিশচন্দ্র কবিতা লিখিতে আরম্ভ করিলেন। এইসকল কবিতাপাঠে তাঁহার তৎকালীন শোকপূর্ণ হৃদয়ের করুণ পরিচয় পাওয়া যায়। "আজি" নামক কবিতায় তিনি লিখিয়াছেন :—

"তিন-দশ পূর্ণকায় অতীত যৌবন,
তিন-দশ পূর্ণ কায়, জীবন-প্রবাহ ধায়,
মহাকাল মহার্ণব সহ সম্মিলন।

... .

শৈশব সুখের স্বপ্ন নাহিক এখন,
যৌবনে ঢালিয়ে কায়, পেয়েছিনু প্রমদায়,
মনে কি ভুলিব হায় প্রথম চুম্বন !"

'রুদ্রপাল' নাটক অভিনয়ের পর একদিন গিরিশচন্দ্রের সহিত তাঁহার হেয়ার স্কুলের সহপাঠী, ভূতপূর্ব্ব হাইকোর্টের জজ পণ্ডিতবর স্বর্গীয় গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত সাক্ষাৎ হয়। তখন তিনি হাইকোর্টে ওকালতি করিতেছিলেন। কথায়-কথায় 'গ্রেট ন্যাসান্যাল থিয়েটারে' 'রুদ্রপাল' নাটক অভিনয় প্রসঙ্গে 'ম্যাকবেথে'র কথা উঠে। গুরুদাসবাবু বলেন, সেক্সপীয়রের নাটকগুলির বঙ্গানুবাদ হইলে বঙ্গভাষায় পুষ্টি সাধিত হয়, কিন্তু তাহা বড়ই কঠিন, বিশেষতঃ এই 'ম্যাক্‌বেথ' নাটকের ডাকিনী(witch)দের ভাষায় অনুবাদ। পাঠকগণ জ্ঞাত আছেন, ইহার বহুপূর্ব্ব হইতেই গিরিশচন্দ্র ইংরাজী কবিতার বঙ্গানুবাদ করিয়া থাকিতেন। গুরুদাসবাবুর সহিত এই কথাবার্ত্তার পর ঔৎসুক্য-বশতঃ তিনি 'ম্যাক্‌বেথ' নাটকের অনুবাদ করিতে আরম্ভ করেন।

এই সময়ে যে কয়েকটী কবিতা রচিত হইয়াছিল, তাহার সকলগুলিতেই হতাশের দীর্ঘশ্বাস বহিতেছে, হৃদয়ের রুদ্ধ রোদন-ধারা উথলিয়া উঠিতেছে। সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়াছে, সংসারের আলোক নিভিয়াছে, সঙ্গে-সঙ্গে জীবনের আলোকও অন্তর্হিত হইয়াছে; —এখন একমাত্র আশ্রয় অন্ধকার! কবি অন্ধকারকে সম্ভাষণ করিয়া বলিতেছেন:—

"তোমায় জানে না নরে, তাইত তোমারে ডরে,
অসময় তুমি সখা কেহ নাহি আর,—
একক বান্ধবহীন, আশার উচ্ছ্বাস লীন,
হৃদয়ে শুকায়ে যায় রোদনের ধার,
জ্বলে শুধু স্মৃতি—চিতে চিতানল প্রায়,
তখন অভাগা তব মুখপানে চায়।"

এই "আঁধার" কবিতা সম্বন্ধে বঙ্গভাষার বিখ্যাত লেখক স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বলিয়াছিলেন,—"আঁধারের ন্যায় কবিতা পৃথিবীর যে কোনও ভাষায় রচিত হইত, তাহার গৌরববর্দ্ধন করিত।"

কিছুদিন পরে কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া তিনি ফ্রাইবার্জ্জার এণ্ড কোম্পানীর অফিসে প্রবেশ করেন। উক্ত অফিসের মাল খরিদের কার্য্যভার লইয়া তাঁহাকে ভাগলপুরে যাইতে হয়। ভাগলপুর হইতে বহু গ্রামে গিযা তাঁহাকে মাল খরিদ করিতে হইত। সেই আত্মীয়-স্বজনহীন সুদূর প্রবাসে তিনি অবসরমত "ধুতুরা", "গিরি", "চাতক", "শৈশব-বান্ধব", "হলদিঘাটের যুদ্ধ" প্রভৃতি আরও কতকগুলি কবিতা লিখিয়াছিলেন। সেই কবিতাগুলি পাঠ করিলে বুঝা যায় যে এখনও তাঁহার হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ হইতে সেই দীর্ঘশ্বাস উঠিতেছে, এখনও সেই শোকাশ্রু ঝরিতেছে! কিন্তু হৃদয়ের অতি নিভৃত স্থানে একটী নূতন আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিতেছে। জড় জগৎ যতই সুন্দর হউক, সে জড় মানব-হৃদয়ের বেদনা বুঝে না। ব্যথিত হৃদয় যে সহানুভূতি অন্বেষণ করে, জড় সে সহানুভূতি দিতে অক্ষম। সত্যই কি এ জড়ের অন্তরালে কিছু আছে? ব্যাকুল হৃদয়ে কবি ধুতুরাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—

"ত্যজিয়ে সংসার সার করেছ শ্মশান,
যার লাগি অনুরাগী, হইয়াছ সর্ব্বত্যাগী,
দেখিতে কি পাও তার বাঞ্ছিত বয়ান?"*

ভাগলপুরে থাকিয়া অফিসের কার্য্যে এবং অবকাশমত কবিতাদি রচনায় গিরিশ-

* এই কবিতাগুলি বহুকাল পরে 'নলিনী' নামে মাসিক পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। "হলদিঘাটের যুদ্ধ" কবিতাটী এত সুন্দর হইয়াছিল যে সুবিখ্যাত সাহিত্যিক স্বর্গীয় অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় তাঁহার 'সাধারণী' পত্রিকায় উক্ত কবিতা সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছিলেন,—"এরূপ গভীর শোকপূর্ণ কবিতা বঙ্গভাষায় বিরল।" স্ত্রী-বিয়োগের পূর্ব্বে গিরিশচন্দ্র যে সকল কবিতা, গীত, ইংরাজীর অনুবাদ বা পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন এবং অপ্রকাশিত অবস্থায় তাঁহার নিকট রক্ষিত ছিল, সেগুলি নিদারুণ শোকজনিত অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় নষ্ট হইয়া যায়।

চন্দ্র কিছুদিন অনেকটা শান্তিলাভ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তখনও তাঁহার দুঃসময় দূর হয় নাই। ভাগলপুর হইতে কলিকাতা আসিবার পূর্ব্বদিবস তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব চোরে লইয়া যায়। পরিধেয় বস্ত্র ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। ভাগলপুরে তখন তাঁহার এক প্রতিবাসী থাকিতেন, নিরুপায় হইয়া গিরিশচন্দ্র তাঁহার নিকট গিয়া দশটী টাকা ঋণ প্রার্থনা করেন। কিন্তু ভদ্রলোকটী তাহাতে উত্তর দেন,—"তোমায় দশ টাকা ধার দিতে পারি না, পাঁচ টাকা দান করিতে পারি।" তখন আর উপায় কি? সেই ভিক্ষার দান লইয়া গিরিশচন্দ্র গৃহে ফিরিলেন। তিনি বলিতেন, "অতি দুঃখেও সহজে আমার চক্ষে জল পড়ে না, কিন্তু এই ভিক্ষা গ্রহণ করিতে অশ্রুপাত হইয়াছিল।"

পরে ভদ্রলোকটী যখন কলিকাতায় আসেন, গিরিশচন্দ্র টাকা কয়টী ফিরাইয়া দেন। ফিরাইয়া দিবার সময় ভদ্রলোকটী বলিয়াছিলেন,—"তোমাকে তো এ টাকা দান করেছি।" গিরিশচন্দ্র বলিতেন,—"এ কথার উত্তর আমার জিহ্বায় আসিয়াছিল; কিন্তু যেরূপেই হউক—উপকৃত হইয়াছি। কিছু না বলিয়া টাকা পাঁচটী তাঁহার কাছে রাখিয়া নমস্কারপূর্ব্বক চলিয়া আসিলাম।"

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ—নূতন অফিস

ভাগলপুর হইতে প্রত্যাগমন করিয়া অল্পদিন পরেই গিরিশচন্দ্র ক্রাইবার্জ্জার কোম্পানী অফিসের কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন। বিদেশগমন ইত্যাদি নানা কারণে উক্ত অফিসের কার্য্য তাঁহার মনোনীত হয় নাই, এবং তাঁহার মানসিক অবস্থাও তখন পর্য্যন্ত ভাল ছিল না।

সুবিখ্যাত 'অমৃতবাজার পত্রিকা'-সম্পাদক স্বর্গীয় শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয় তাঁহার একজন বিশিষ্ট সুহৃদ ছিলেন। শিশিরবাবুকে সকলেই পরম বৈষ্ণব, স্বদেশভক্ত এবং তেজস্বী সম্পাদক বলিয়াই জানেন, কিন্তু বঙ্গীয় নাট্যশালার শ্রীবৃদ্ধিসাধনের নিমিত্ত তিনি যে প্রথম হইতেই একজন প্রধান উৎসাহদাতা ও উদ্যোগী ছিলেন, এবং অভিনয়ার্থে স্বয়ং নাটক পর্য্যন্ত রচনা করিয়া দিয়াছেন, ইহা বোধহয় অল্পসংখ্যক পাঠকই জানেন। বঙ্গ-রঙ্গভূমি তাঁহার অক্ষয়-স্মৃতি চিরদিন বক্ষে ধারণ করিয়া গৌরবান্বিতা হইবেন। তাঁহারই উৎসাহে গিরিশবাবু 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় মধ্যে-মধ্যে প্রবন্ধাদিও লিখিতেন। ক্রাইবার্জ্জার কোম্পানীর অফিসের কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবার পর শিশির-বাবুর অনুরোধে তিনি ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ইণ্ডিয়ান লিগের হেড ক্লার্ক ও কেশিয়ারের পদ গ্রহণ করেন। ছোটলাট টেম্পেল সাহেবের স্বায়ত্তশাসন-প্রথা প্রবর্ত্তনের সময়, ইণ্ডিয়ান লিগ নামে একটী সাধারণ সভা গঠিত হয়। এখানে প্রায় এক বৎসর কার্য্য করিয়া গিরিশচন্দ্র পার্কার কোম্পানীর অফিসে বুক-কিপার হইয়া প্রবেশ করেন।

ইণ্ডিয়ান লিগে কার্য্য করিবার সময় ইনি দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন। দ্বিতীয়া স্ত্রীর নাম ছিল সুরতকুমারী। ইনি কলিকাতা, সিমলার বিখ্যাত লালচাঁদ মিত্রের প্রপৌত্রী এবং বিহারীলাল মিত্রের প্রথমা কন্যা।

পার্কার সাহেব এক অদ্ভুত প্রকৃতির লোক ছিলেন। বাক্যব্যয় সঙ্কোচের নিমিত্ত তিনি অফিসে নিয়ম করেন, যাহাকে ডাকিবার প্রয়োজন হইবে, তিনি ঘণ্টা বাজাইয়া ডাকিবেন। একদিন গিরিশচন্দ্রের নিমিত্ত এইরূপ ঘণ্টা বাজিল। গিরিশচন্দ্র তাহা শুনিয়াও শুনিলেন না। সাহেবের চাপরাসী আসিয়া বলিল,—"বাবু, সাহেব আপনাকে ডাকছেন, শুনতে পাচ্ছেন না?" গিরিশচন্দ্র মুখ না তুলিয়া কার্য্য করিতে-করিতেই বলিলেন,—"না।" চাপরাসী বিস্মিত হইয়া চলিয়া গেল।

তৎক্ষণাৎ গরম মেজাজে পার্কার সাহেব আসিয়া গিরিশচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

—"তোমাকে ডাকিতেছি, তুমি শুনিতেছ না কেন?" গিরিশচন্দ্র গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন,—"আমি শুনি নাই।" এইরূপ দুই-তিনবার কথা কাটাকাটি হইবার পর তেজস্বী গিরিশচন্দ্র সাহেবকে বলিলেন—"সাহেব, আমি এতক্ষণ ভদ্রতার সহিত তোমার কথার উত্তর দিতেছিলাম। এখন প্রকৃত কথা বলি শোন,—তুমি মনে ক'র না যে আমি তোমার খানসামা কি বেয়ারা,—তোমার ঘণ্টায় উঠব-বসব।" গিরিশ-চন্দ্রের নির্ভীক উত্তরে সাহেবের শ্বেতমূর্ত্তি সহসা রক্তিম হইয়া উঠিল, কিন্তু তিনি তখনই আত্ম-সংবরণ করিয়া লইয়া বলিলেন,—"বাবু, দুঃখিত হইও না, আমি আমার এইরূপ অন্যায় কার্য্যের নিমিত্ত দুঃখিত হইয়াছি।" সেই অবধি গিরিশচন্দ্রকে তিনি প্রীতির চক্ষে দেখিতেন, মধ্যে-মধ্যে আপনার কক্ষে তাঁহাকে ডাকিয়া লইয়া গিয়া নানারূপ কথাবার্ত্তা কহিতেন। এক সময় অফিসের কার্য্যে বিস্তর লোকসান হওয়ায় অফিস ফেল হইবার সম্ভাবনা হয়। গিরিশচন্দ্র সে সময়ে কিরূপ উপায় অবলম্বন করিলে অফিস নিরাপদ হইতে পারে, পার্কার সাহেবকে সেইরূপ সুযুক্তি প্রদান করেন। তাঁহার পরামর্শমত কার্য্য করিয়া সাহেব উক্ত ক্ষতির হাত হইতে রক্ষা পান এবং আনন্দের সহিত তাঁহার আশাতিরিক্ত বেতন বাড়াইয়া দেন।

দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিয়া এবং অফিসে সাহেবের সদ্ব্যবহারে গিরিশচন্দ্র অনেকটা মানসিক শান্তিলাভ করিয়াছিলেন। এই সময়ে মাঝে-মাঝে আবার তিনি থিয়েটারে যাইতে আরম্ভ করেন।

'গ্রেট ন্যাসান্যাল থিয়েটারে'র অবস্থা এ সময়ে শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ভুবন-মোহনবাবু দিন-দিন ঋণজালে জড়িত হইয়া পড়িতেছিলেন। কোনওকালেই থিয়েটার সংক্রান্ত হিসাবপত্রের তাঁহার সুব্যবস্থা ছিল না। যেদিন অধিক বিক্রয় হইত, সেদিন রাত্রে পান-ভোজনের ধূম পড়িয়া যাইত। পৈত্রিক বিষয় ভুবনমোহন-বাবুর মাতার নামে ছিল, এ নিমিত্ত অর্থসংগ্রহের জন্য প্রায়ই তাঁহাকে হ্যাণ্ডনোট কাটিতে হইত। ছদ্মবেশী হিতৈষী বন্ধুরও অভাব ছিল না, হাজার টাকা পাইয়া দুই হাজার টাকা লিখিয়া দেওয়ার মহাজনেরও অসদ্ভাব ঘটিত না।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

'গ্রেট ন্যাসান্যাল থিয়েটার' লিজ গ্রহণ

১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দ, ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে 'গ্রেট ন্যাসান্যাল থিয়েটার' খোলা হয়, ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দ, জুলাই মাসে স্বত্বাধিকার ভুবনমোহনবাবু গিরিশচন্দ্রকে থিযেটার লিজ প্রদান করেন। এই সুদীর্ঘ সময় মধ্যে অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন (Dramatic Performances Control Bill) প্রবর্ত্তন বিশেষরূপ উল্লেখযোগ্য। গিরিশচন্দ্রের জীবন-ইতিহাস নাট্যশালার সহিত সর্ব্বাপেক্ষা অধিক জড়িত। এ নিমিত্ত 'গ্রেট ন্যাসান্যাল থিয়েটারে'র এই কয়েক বৎসরের একটী সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিলাম :

ধর্ম্মদাসবাবু প্রথমে 'গ্রেট ন্যাসান্যাল থিয়েটারে'র ম্যানেজার ছিলেন। তাঁহার হাতে cash থাকিত এবং হিসাব-নিকাশের টিকিট issue করিবাব ভার তাঁহার উপর ছিল। গিরিশচন্দ্র কর্ত্তৃক নাট্যাকারে পরিবর্ত্তিত 'মৃণালিনী' ও 'কপালকুণ্ডলা' অভিনয়ের পর 'গ্রেট ন্যাসান্যালে' মনোমোহন বসুর 'রামাভিষেক', দীনবন্ধুবাবুর 'কমলে কামিনী', হরলাল রায়ের 'হেমলতা' নাটক প্রথম অভিনীত হয় এবং রামনারায়ণ তর্করত্নের 'নব-নাটক', শিশিরকুমার ঘোষের 'নয়শো রূপেয়া', উমেশচন্দ্র মিত্রের 'বিধবাবিবাহ' নাটক প্রভৃতি পুনরভিনীত হইয়া থাকে। সুযোগ্য অভিনেতাগণ কর্ত্তৃক নাটকগুলি অভিনীত হইলেও ক্রমশঃ থিয়েটারের আয়ের হ্রাস এবং টাকাকড়ির গোলযোগ হওয়ায় ভুবন-মোহনবাবু ধর্ম্মদাসবাবুর স্থলে নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে ম্যানেজার ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে থিয়েটারের ডাইরেক্টর নিযুক্ত করিলেন।

স্ত্রী অভিনেত্রী কর্ত্তৃক স্ত্রী-চরিত্র অভিনীত হওয়ায় 'বেঙ্গল থিয়েটারে' দর্শকগণ সমধিক আকৃষ্ট হইত। 'দুর্গেশনন্দিনী' অভিনয়ে সম্প্রদায় সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছিল। সম্প্রতি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'পুরুবিক্রম' নাটকাভিনয়ে ইহাদের যশঃ-সৌরভ আরও বিস্তৃত হইয়া পড়ে। থিয়েটারের আয় বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত 'বেঙ্গল থিয়েটারে'র অনুকরণে 'গ্রেট ন্যাসান্যাল' সম্প্রদায়ও রাজকুমারী, ক্ষেত্রমণি, কাদম্বিনী, যাদুমণি এবং হরিদাসী নাম্নী পাঁচটী স্ত্রী-অভিনেত্রী সংগ্রহ করিয়া 'সতী কি কলঙ্কিনী' গীতিনাট্যের অভিনয় ঘোষণা করেন (১৮৭৪ খ্রী, ১৯শে সেপ্টেম্বর)। স্ত্রী-অভিনেত্রী প্রবর্ত্তনে এবং সঙ্গীতাচার্য্য মদনমোহন বর্ম্মণের সুমধুর সুর-সংযোজনে 'সতী কি কলঙ্কিনী' আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিল। অভাবনীয় কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়া 'গ্রেট ন্যাসান্যাল' সম্প্রদায় বিজয়গর্ব্বে 'বেঙ্গল থিয়েটারে' অভিনীত 'পুরুবিক্রম' অভিনয়েই কৃতসঙ্কল্প

হইলেন। নাটকের নায়িকার ভূমিকা কাহাকে দেওয়া হইবে, তাহা স্থির করিবার জন্য উপরোক্ত পাঁচটী অভিনেত্রীকে পরীক্ষা করা হয়। 'পুরুবিক্রম' নাটকের একস্থানে আছে,—"পাঞ্জাব প্রদেশস্থ সমস্ত নৃপতিবৃন্দ" ইত্যাদি—এই ছত্রটী একসঙ্গে স্পষ্ট উচ্চারণ করিবার জন্য প্রত্যেক অভিনেত্রীকে বলা হইল। তন্মধ্যে ক্ষেত্রমণিই কেবল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন;—এজন্য তাঁহাকেই নাটকের নায়িকা ঐলবিলার ভূমিকা প্রদত্ত হয়। ইহার পরে হরলালবাবুর 'রুদ্রপাল' নাটক অভিনীত হইয়া থাকে।* 'পুরুবিক্রম' ও 'রুদ্রপাল' নাটকাভিনয়ে 'গ্রেট ন্যাসান্যাল' বিশেষ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই,—দর্শকগণ 'সতী কি কলঙ্কিনী'র ন্যায় আর একখানি গীতিনাট্যের জন্য সে সময় উতলা হইয়া উঠেন। যাহাই হউক তৎপরে লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্ত্তীর 'আনন্দ কানন' গীতি-নাট্যাভিনয়ে দর্শকগণকে প্রীত করিয়া সম্প্রদায়ও বিশেষ লাভবান হইয়াছিলেন।

এই সময়ে নগেন্দ্রবাবু একদিন ভুবনমোহনবাবুকে বলেন,—"তুমি একখানি এগ্রিমেণ্ট পত্রে আমাকে লিখিয়া দাও, যদ্যপি আমাকে কখনও ম্যানেজারের কার্য্য হইতে ছাড়াইয়া দাও,—আমাকে কুড়ি হাজার টাকা ড্যামেজ দিবে।" ভুবনমোহনবাবু এরূপ এগ্রিমেণ্ট লিখিয়া দিতে অস্বীকার হওয়ায়, নগেন্দ্রবাবু থিয়েটার হইতে মদনমোহন বর্ম্মণ, কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু, যাদুমণি, কাদম্বিনী প্রভৃতি কতকগুলি অভিনেতা ও অভিনেত্রী সঙ্গে লইয়া চলিয়া যান।

ধর্ম্মদাসবাবু পুনরায় থিয়েটারের ম্যানেজার হইলেন এবং মহেন্দ্রলাল বসু, মতিলাল সুর, ক্ষেত্রমণি, গোলাপসুন্দরী প্রভৃতিকে লইয়া পুনরায় দল গঠিত করিলেন। হরলাল-বাবুর 'শত্রুসংহার' এবং উপেন্দ্রনাথ দাসের 'শরৎ-সরোজিনী' নাটক যথাক্রমে অভিনীত হয়। 'শরৎ-সরোজিনী' নাটকখানি সাধারণের বিশেষ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল।

নগেন্দ্রবাবু সম্প্রদায় লইয়া প্রথমে 'লুইস থিয়েটার' তথা হইতে হাওড়া রেলওয়ে ষ্টেজে কয়েকরাত্রি অভিনয় করিয়া শেষে 'বেঙ্গল থিয়েটারে'র সহিত মিলিত হইলেন। কিছুদিন পরে মদনমোহন বর্ম্মণ কাদম্বিনীকে লইয়া পুনরায় 'গ্রেট ন্যাসান্যালে' আসিয়া যোগ দেন।

গিরিশচন্দ্র দাস নামক কলিকাতা ফরেন অফিসের জনৈক উচ্চকর্ম্মচারী সে সময় সরকারী কার্য্যে (দিল্লীর দরবার উপলক্ষ্যে) দিল্লীতে থাকিতেন, তাঁহার উৎসাহে ধর্ম্মদাসবাবু তথায় অভিনয়ার্থে 'গ্রেট ন্যাসান্যাল' হইতে কতকগুলি লব্ধপ্রতিষ্ঠ অভিনেতা ও অভিনেত্রী লইয়া ১৮৭৫ খ্রী, মার্চ্চ মাসে দিল্লী যাত্রা করেন। কলিকাতায় মহেন্দ্রলাল বসু ম্যানেজারের প্রতিনিধি (Offg. Manager) লইয়া প্রথম 'সধবার একাদশী', 'হেমলতা' প্রভৃতি পুরাতন নাটক অভিনয় করিয়া ১৭ই এপ্রিল (১৮৭৫ খ্রী) তারিখে মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য' নাটকাকারে গঠিত করিয়া এই প্রথম অভিনয় করেন; কিন্তু অভিনয়ে কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে না পারিয়া, ৮ই মে তারিখে 'নন্দনকানন' নামক একখানি গীতিনাট্য অভিনয় করেন।

* 'রুদ্রপাল' সেক্সপীয়রের 'ম্যাক্‌বেথ' নাটক অবলম্বনে রচিত হইয়াছিল। এই নাটক অভিনয়ের পর গিরিশচন্দ্র 'ম্যাক্‌বেথ' নাটকের মূল অনুবাদে প্রবৃত্ত হন। বিস্তৃত বিবরণ ১১৭ পৃষ্ঠার টীকায় দ্রষ্টব্য।

দিল্লী হইতে লাহোর, আগ্রা, বৃন্দাবন, কানপুর, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি নানাস্থানে অভিনয় করিয়া, মে মাসের মাঝামাঝি ধর্ম্মদাসবাবু সদলে কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। সম্প্রদায় যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিয়া আনিয়াছিলেন, বিশেষতঃ লাহোরে কাশ্মীরের মহারাজের সম্মুখে অভিনয় করিয়া 'গ্রেট ন্যাসান্যাল' সম্প্রদায় যেরূপ অধিক অর্থ পাইয়াছিলেন, সেইরূপ শাল, জামিয়ার, স্বচ্ছ পাথর প্রভৃতি বহুমূল্য পুরস্কারলাভ করিয়াছিলেন। কলিকাতায় আসিয়া ইঁহারা থিয়েটারের মালিক ভুবনমোহনবাবুকে যৎসামান্য অর্থ এবং কাশ্মীরাধিপতির উপহারস্বরূপ একখানি অল্প মূল্যের রুমাল ও একখানি ছোট পাথরের রেকাবি প্রদান করেন। কিছুদিন পরে সমস্ত রহস্য প্রকাশ হওয়ায় এবং থিয়েটারে লোকসান ও হিসাবপত্রের গোলমাল ইত্যাদি নানা কারণে বিরক্ত হইয়া ভুবনমোহনবাবু আগষ্ট মাস (১৮৭৫ খ্রী) হইতে শ্যামপুকুর-নিবাসী কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় থিয়েটার লিজ প্রদান করেন। কৃষ্ণধনবাবু থিয়েটারের 'ইণ্ডিয়ান ন্যাসান্যাল থিয়েটার' নামকরণপূর্ব্বক মহেন্দ্রলালবাবুকে ম্যানেজার করিয়া থিয়েটার চালাইতে আরম্ভ করেন; কিন্তু চারিমাস যাইতে না যাইতে লাভ হওয়া দূরে থাকুক, তিনি ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন, থিয়েটারের ভাড়া পর্য্যন্ত দিতে পারিলেন না। ভুবনমোহনবাবু বাধ্য হইয়া পুনরায় থিয়েটার নিজ হস্তে গ্রহণ করিলেন।

এবারে 'গ্রেট ন্যাসান্যালে'র ডাইরেক্টর হইলেন উপেন্দ্রনাথ দাস এবং ম্যানেজার হইলেন নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু। 'শরৎ-সরোজিনী' এবং 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' নাটক লিখিয়া উপেন্দ্রবাবু নাট্যামোদিগণের নিকট সুপরিচিত হইয়াছিলেন। তিনি দেশভক্ত এবং কর্ম্মী পুরুষ ছিলেন। রঙ্গালয়ের অভিনেত্রীগণ হীন বারাঙ্গণাশ্রেণীভুক্ত না হইয়া সমাজ-অন্তর্গত একটী স্বতন্ত্র জাতি মধ্যে গণ্য হয়—উপেন্দ্রবাবুর ইহাই ইচ্ছা ছিল। তিনিই উদ্যোগী হইয়া গোলাপসুন্দরীর সহিত গোষ্টবিহারী দত্তের বিবাহ দিয়াছিলেন। গোলাপসুন্দরী 'শরৎ-সরোজিনী' নাটকে সুকুমারীর ভূমিকা এত সুন্দর অভিনয় করিয়াছিলেন যে, সেই সময় হইতে তাঁহাকে সকলে সুকুমারী বলিয়া ডাকিত। তাহার পর গোষ্ঠবিহারী দত্তের সহিত বিবাহ হওয়ায় সাধারণের নিকট তিনি সুকুমারী দত্ত নামে অভিহিতা হন।

উপেন্দ্রবাবুর উৎসাহেই 'গ্রেট ন্যাসান্যালে' সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'পুরুবিক্রম' ও 'সরোজিনী' নাটকের পুনরাভিনয় হয়। বহুদিন পূর্ব্বে 'বেঙ্গল থিয়েটারে উক্ত নাটক দুইখানি প্রথমে অভিনীত হইয়াছিল; কিন্তু 'গ্রেট ন্যাসান্যাল' সম্প্রদায় দক্ষতা সহকারে নাটক দুইখানির অভিনয় করিয়া দর্শক-হৃদয়ে জাতীয়তার বীজ অঙ্কুরিত করিয়াছিলেন। 'পুরুবিক্রম' নাটকের সঙ্গীত—"জয় ভারতের জয়, গাও ভারতের জয়" এবং 'সরোজিনী' নাটকের ক্ষত্রিয় মহিলাগণের জহর-ব্রতের গান—"জল্ জল্ চিতা, দ্বিগুণ, দ্বিগুণ—পরাণ সঁপিবে বিধবা বালা" সে সময়ে পথে-মাঠে-ঘাটে—সর্ব্বত্র গীত হইতে থাকে।

'গজদানন্দ' অভিনয়

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জ্যেষ্ঠ পুত্র, ভূতপূর্ব্ব সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড সে সময়ে যুবরাজ ছিলেন। তিনি ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে ভারতবর্ষ দর্শনে শুভাগমন করিয়াছিলেন। ১৮৭৬ খ্রী, জানুয়ারী মাসে তিনি কলিকাতায় পদার্পণ করেন। যুবরাজের অভ্যর্থনার নিমিত্ত কলিকাতায় অপূর্ব্ব সমারোহ হইয়াছিল। সে সময়ে ভারতের বড়লাট লর্ড নর্থব্রুক ছিলেন। কলিকাতা হাইকোর্টের সুপ্রসিদ্ধ উকীল স্বর্গীয় জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়* মহাশয়, যুবরাজকে তাঁহার ভবানীপুরস্থ ভবনে আহ্বান করেন। যুবরাজ বহির্বাটীতে প্রবেশ করিবার পর মুখোপাধ্যায়-গৃহিণী এবং অন্যান্য কুল-মহিলারা শঙ্খধ্বনি, হুলুধ্বনি, বরণ প্রভৃতি দেশীয় হিন্দু আচার-অনুষ্ঠানে যুবরাজকে সম্বর্দ্ধনা করেন। শিক্ষিত এবং সম্ভ্রান্ত অনেক হিন্দু-পরিবারে বর্ত্তমান চাল-চলন—পাশ্চাত্য রীতি-নীতির অনুকরণে যতটা পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন হইয়াছে—সে সময়ে ততটা হয় নাই। জগদানন্দবাবুর উক্ত কার্য্যের জন্য দেশে ও সমাজে তুমুল আন্দোলন চলিতে লাগিল—সংবাদপত্রসমূহে তীব্র প্রতিবাদ এবং নিন্দা বাহির হইতে লাগিল। "বেঁচে থাকো মুখুজ্যের পো, খেল্‌লে ভাল চোটে" বলিয়া কবিবর হেমচন্দ্রের "বাজীমাৎ" কবিতা বাহির হইল। 'গ্রেট ন্যাসান্যাল থিয়েটার'ও এই হুজুগে 'গজদানন্দ' নামক একখানি প্রহসনের অভিনয় ঘোষণা করিলেন। স্বর্গীয় উপেন্দ্রনাথ দাস প্রহসনখানি রচনা করেন এবং অনুরুদ্ধ হইয়া নট-গুরু গিরিশচন্দ্র তাহাতে কয়েকখানি গান বাঁধিয়া দিয়াছিলেন।† ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দ, ১৯শে ফেব্রুয়ারী, শনিবার তারিখে 'গ্রেট ন্যাসান্যাল থিয়েটারে' 'সরোজিনী' নাটক এবং 'গজদানন্দ' প্রহসন অভিনীত হয়। বলা বাহুল্য, রঙ্গালয়ে লোকারণ্য হইয়াছিল। প্রথিতনামা সম্ভ্রান্ত ও ধনাঢ্য ব্যক্তির উপর ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপের তীব্র কটাক্ষ—দর্শকগণ পরম আনন্দের সহিত উপভোগ করিয়াছিল। ২৩শে ফেব্রুয়ারী, বুধবারে নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয়ের benefit night উপলক্ষ্যে 'গ্রেট ন্যাসান্যালে' পুনরায় 'গজদানন্দ' এবং 'সতী কি কলঙ্কিনী'র অভিনয় হয়। একজন নিরপরাধ, সম্ভ্রান্ত এবং রাজভক্ত প্রজাকে থিয়েটারে এইরূপ ঘৃণিতভাবে চিত্রিত হইতে দেখিয়া পুলিশ হইতে 'গজদানন্দ' প্রহসনের অভিনয় বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। ২৬শে ফেব্রুয়ারী, শনিবার তারিখে 'গ্রেট ন্যাসান্যালে' 'কর্ণাট কুমার' নামক একখানি নূতন নাটক এবং 'গজদানন্দ' প্রহসনের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া 'হনুমান-চরিত্র' প্রহসন অভিনীত হয়। অভিনয়-রাত্রে ডাইরেক্টর উপেন্দ্রবাবু রঙ্গমঞ্চ হইতে একটী তীব্র

* সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা শ্রীযুক্ত রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায় ইঁহারই একজন বংশধর।

† আমরা বহু অনুসন্ধানে দুইখানি গীতের কিয়দংশ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি। প্রথম গীতটী অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেলবাবু) গাহিতেন। দৃশ্য—হাইকোর্টের সম্মুখ। গানের প্রথম ছত্র —"(ওরে) জজ হ'তে চাও গজ গিরিবর।" দ্বিতীয় গীতটী সুপ্রসিদ্ধা অভিনেত্রী ক্ষেত্রমণি গাহিতেন। যথা: "আমি পিসী থাকতে ভাবনা কিরে বোকা ছেলে। অনেক সুকৃতির ফলে আমার মতন পিসী মেলে।" ইত্যাদি।

বক্তৃতাও করেন।

পুনরায় পুলিশ হইতে 'হনুমান-চরিত্র' এবং 'কর্ণাটকুমারে'র অভিনয় বন্ধ করিবার আদেশ আইসে। তৎ-পরবর্ত্তী বুধবার ১লা মার্চ্চ তারিখে উপেন্দ্রবাবুর benefit night উপলক্ষ্যে 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' নাটক এবং 'The Police of Pig and Sheep' নামক নূতন প্রহসন অভিনীত হয়। অভিনয়-রাত্রে উপেন্দ্রবাবু পুনরায় একটী উত্তেজনাপূর্ণ ইংরাজী বক্তৃতা করেন।

ইহার পরিণাম বড়ই ভীষণ দাঁড়াইল। গভর্ণমেণ্ট থিয়েটার সম্প্রদায়কে কঠোর শিক্ষাদানে প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। বড়লাটের নিকট হইতে ordinance বাহির করিয়া, পুলিশ হইতে 'গজদানন্দ', 'হনুমান-চরিত্র', 'কর্ণাটকুমার' এবং 'The Police of Pig and Sheep'-এর অভিনয় বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। 'গ্রেট ন্যাসান্যাল থিয়েটার' সম্প্রদায় যদিও তৎপরে সংযত হইয়া ৪ঠা মার্চ্চ, শনিবার তারিখে 'সতী কি কলঙ্কিনী' গীতিনাট্য এবং 'উভয় সঙ্কট' প্রহসনের অভিনয় ঘোষণা করিয়াছিলেন, তথাপি সেইদিন—অভিনয়-রাত্রে যে ঘটনা ঘটিল, তাহা নাট্যশালার ইতিহাসে চির-স্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

অভিনয়-নিয়ন্ত্রণ আইন

(Dramatic Performances Control Bill)

যে প্রহসন অভিনয় করিয়া 'গ্রেট ন্যাসান্যাল' সম্প্রদায় গভর্ণমেণ্টের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন, তন্নিমিত্ত তাঁহাদের উপর দোষারোপ না করিয়া অন্য-এক অপ্রত্যাশিত কারণে গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদের দণ্ডের ব্যবস্থা করিলেন। ইতিপূর্ব্বে যে 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' নাটক 'গ্রেট ন্যাসান্যাল থিয়েটারে' অভিনীত হইয়াছিল, তাহা অশ্লীল (obscene) এবং সেই অশ্লীল নাটক অভিনয় ও অশ্লীল দৃশ্য প্রদর্শনের জন্য গভর্ণমেণ্ট থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষ এবং অভিনেতাগণকে গ্রেপ্তার করিবার আদেশ দিলেন।

৪ঠা মার্চ্চ, শনিবার 'গ্রেট ন্যাসান্যাল থিয়েটারে' 'সতী কি কলঙ্কিনী' গীতিনাট্য অভিনীত হইতেছে, এমন সময় হঠাৎ ডেপুটী পুলিশ কমিশনার ল্যাম্বার্ট সাহেব সদলবলে আসিয়া, 'গ্রেট ন্যাসান্যালে'র ডাইরেক্টর উপেন্দ্রনাথ দাস, ম্যানেজার শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু, লব্ধপ্রতিষ্ঠ অভিনেতা মতিলাল সুর, অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেলবাবু), শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, গোপালচন্দ্র দাস, সঙ্গীতাচার্য্য রামতারণ সান্ন্যাল প্রভৃতিকে ওয়ারেণ্টে ধরিয়া লইয়া যান।* সহসা পুলিশ আসিয়া ধর-পাকড় আরম্ভ করিলে

* শুনা যায় ষ্টেজ-ম্যানেজার ধর্ম্মদাস সুর মহাশয় ষ্টেজের উপর সিলিং-এ উঠিয়া লুকাইয়াছিলেন। মতিলাল সুর দেখিতে কৃষ্ণবর্ণ ছিলেন, তিনি ঝাঁকা-মুটে সাজিয়া পলায়ন করিবার সময় ধরা পড়েন। মহেন্দ্রলাল বসু তৎ-পরদিবস প্রাতে পাল্কীর দোর বন্ধ করিয়া যাইতেছিলেন, কিন্তু পুলিশের চক্ষু এড়াইতে না পারিয়া ধৃত হন। নট-গুরু গিরিশচন্দ্র ঘোষ সে সময়ে থিয়েটারের সহিত বিশেষরূপ

থিয়েটারে একটা ভীষণ হুলস্থূল পড়িয়া যায়। দর্শকগণ আতঙ্কে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে। অভিনেতারা ব্যাকুল হইয়া উঠেন এবং অভিনেত্রীগণ ক্রন্দন করিতে সুরু করেন; কিন্তু উপেন্দ্রবাবুর নির্ভীকতায় ও প্রবোধ-বাক্যে তাঁহারা আশ্বস্ত হন।

লালবাজার পুলিশ কোর্টে প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ডিকেন্সের নিকট বিচার হয়। 'গ্রেট ন্যাসান্যাল থিয়েটারে'র স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন নিয়োগী কোর্টে গিয়া surrender করেন। ডাইরেক্টর উপেন্দ্রনাথ দাস (হাইকোর্টের সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন উকীল শ্রীনাথ দাসের পুত্র) থিয়েটার সংক্রান্ত সর্ব্ববিষয়ের দায়িত্ব, তিনি স্বয়ং স্বত্বাধিকারীর নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন স্বীকার করায়, ভুবনমোহনবাবু অব্যাহতি পান।

বহু শিক্ষিত এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি নাটকখানি অশ্লীলতা-বর্জ্জিত বলিয়া সাক্ষ্য প্রদান করেন। কিন্তু তথাপি ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব ইণ্ডিয়ান পিনাল কোডের ২৯২ ও ২৯৪ ধারানুসারে দোষী সাব্যস্ত করিয়া থিয়েটারের ডাইরেক্টর উপেন্দ্রনাথ দাস এবং ম্যানেজার শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসুকে বিনা পরিশ্রমে এক মাস করিয়া কারাদণ্ড এবং অন্যান্য সকলকে অভিনেতা-মাত্র বলিয়া মুক্তি প্রদান করেন। (৮ই মার্চ্চ ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দ।)

হাইকোর্টে মোশান হয়। ইঁহাদের উকীল ছিলেন সুপ্রসিদ্ধ গণেশচন্দ্র চন্দ্র। সেদিন দোলের বন্ধ থাকা সত্ত্বেও হাইকোর্টের জজ ফিয়ার সাহেব কোর্টে আসিয়া ইঁহাদিগকে জামিনে খালাস প্রদান করেন। পরে বিচার হয়। বিচারে বসেন জাষ্টিস ফিয়ার ও মার্কবি। ইঁহাদের ব্যারিষ্টর ছিলেন মিঃ ব্রান্‌সন, মনোমোহন ঘোষ এবং টি. পালিত। বিচারে 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' অশ্লীল (obscene) প্রমাণিত না হওয়ায় উপেন্দ্রবাবু এবং অমৃতবাবু অব্যাহতি লাভ করেন (২০শে মার্চ্চ ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দ)। ইঁহারা তিনদিন মাত্র জেলে ছিলেন। সে সময়ে ডাক্তার মেকাঞ্জি সাহেব জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন। তিনি ইঁহাদিগকে সাহেবদের কোয়ার্টারে থাকিতে দিয়াছিলেন এবং ইঁহাদের সহিত বিশেষ সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন।

অতঃপর আদালতের উপর নির্ভর না করিয়া গভর্ণমেণ্ট স্বয়ং যাহাতে থিয়েটারে সন্দেহজনক নাটকাদির অভিনয় বন্ধ করিতে পারেন, তন্নিমিত্ত অভিনয়-নিয়ন্ত্রণ আইন (Dramatic Performances Control Bill) প্রস্তুতের নিমিত্ত তৎপর হইয়া উঠিলেন। মার্চ্চ মাসের মধ্যভাগেই মাননীয় মিঃ হবহাউস কাউন্সিলে আইনের একটী খসড়া দাখিল করিয়াছিলেন। যথা :—

"That whenever the Government was of opinion that any dramatic performance was scandalous or defamatory, or likely to excite feelings of dissatisfaction towards the Government or likely to cause pain to any private party in its performance, or was

সংশ্লিষ্ট ছিলেন না। মাঝে-মাঝে থিয়েটারে আসিতেন এবং প্রয়োজনমত সাহায্য করিতেন। তখন তিনি ইণ্ডিয়ান মিরে'র কার্য্য করিতেন। পুলিশ আসিবার পূর্ব্বেই তিনি থিয়েটার হইতে চলিয়া গিয়াছিলেন।

otherwise prejudicial to the interests of the public, Government might prohibit such performances."

গভর্ণমেণ্ট যদ্যপি কোনও নাট্যাভিনয় কুরুচিপূর্ণ ও মানহানিকর বা গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সাধারণের অসন্তোষ উৎপাদক ও ব্যক্তিবিশেষের মনঃপীড়াকারক বা জনসাধারণের স্বার্থ হানিকর বিবেচনা করেন, তাহা হইলে এইরূপ নাট্যাভিনয় বন্ধ করিয়া দিতে পারিবেন।

কাউন্সিলের মেম্বারগণ বিলখানি সমর্থন করিলে তাহা সিলেক্ট কমিটির হস্তে প্রদত্ত হয়। মিঃ ককরেল, রাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ বাহাদুর, স্যার আলেকজেণ্ডার আরবুদনট্ এবং মাননীয় মিঃ হবহাউস এই চারিজনকে লইয়া সিলেক্ট কমিটি গঠিত হয়। সকলে একমত হইয়া বিলখানি পাশ করাই সাব্যস্ত করেন; এবং 'ইণ্ডিয়া গেজেটে' (৩৪৬ পৃষ্ঠা। ২৫শে মার্চ্চ ১৮৭৬ খ্রী) ইহা বিজ্ঞাপিতও হয়।

কলিকাতা ও ভারতের নানা স্থান হইতে এই বিলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হইয়াছিল, তন্মধ্যে কলিকাতায় একটী প্রতিবাদ-সভার বিবরণ 'ইংলিশম্যান' হইতে সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি। ৪ঠা এপ্রিল, মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭টার সময় হাইকোর্টের জজ দ্বারকানাথ মিত্রের বাটীতে একটী প্রতিবাদ-সভা হয়। প্রখ্যাতনামা প্রাণনাথ পণ্ডিতের প্রস্তাবে ও চন্দ্রকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের অনুমোদনে সুপ্রসিদ্ধ 'রেজ এণ্ড রায়ত'-সম্পাদক শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভায় বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। একটী memorial ব্যবস্থাপক সভায় প্রেরণ করা স্থির হয়। সুবিখ্যাত রাসবিহারী ঘোষ, আশুতোষ বিশ্বাস প্রভৃতি কমিটির মেম্বার ছিলেন।

সাধারণের প্রতিবাদ সত্ত্বেও রাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ বাহাদুর এবং আরও অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি গভর্ণমেণ্টের এই নূতন আইনের সমর্থন করিয়াছিলেন। যাহা হউক ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই ডিসেম্বর তারিখে বড়লাট বাহাদুর অভিনয়-নিয়ন্ত্রণ আইন মঞ্জুর করেন। সেইদিন হইতে, বঙ্গ-নাট্যশালার চরণে যে শৃঙ্খল জড়িত হইয়াছে, আজিও তাহা সমভাবেই আছে।

উপেন্দ্রনাথ দাস হাইকোর্ট হইতে মুক্তিলাভ করিয়া ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে বিলাত চলিয়া যান। নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্তঅমৃতলাল বসু মহাশয়েরও উপেন্দ্রবাবুর সহিত বিলাত যাইবার বড়ই ইচ্ছা ছিল, কিন্তু বাটীতে বিশেষ বাধা পাইয়া মনঃক্ষুন্ন হইয়া থাকিতেন। তৎ-পরবৎসর ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে পুলিস ইন্সেপেক্টর স্বর্গীয় বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় (খ্যাতনামা অভিনেতা শ্রীযুক্ত হীরালাল চট্টোপাধ্যায়ের পিতা) মহাশয়ের সহিত পুলিশের কর্ম্ম গ্রহণ করিয়া পোর্ট ব্লেয়ার গমন করেন।

'গ্রেট ন্যাসান্যাল থিয়েটার' এ সময়ে ধর্ম্মদাসবাবুর অধ্যক্ষতায় পরিচালিত হইতেছিল। নাটকের আইন পাস হওয়ায় থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষগণ আর স্বেচ্ছামত নাটক অভিনয় করিতে সাহস করিতেন না। গীতিনাট্যেরই প্রায় অভিনয় হইত। সুপ্রসিদ্ধ গীতিনাট্যকার স্বর্গীয় অতুলকৃষ্ণ মিত্র-প্রণীত 'আদর্শ সতী বা সাবিত্রী-সত্যবান' নামক একখানি গীতিনাট্য এই সময়ে অভিনীত হয়। যুবক অতুলকৃষ্ণের প্রথম উদ্যমের এই

গীতিনাট্যখানি রামতারণবাবুর সুমধুর সুর-সংযোগে সাধারণের নিকট বিশেষ সমাদৃত হইয়াছিল।

তাহার পর স্বর্গীয় রাধামাধব হালদার মহাশয়-বিরচিত একখানি গীতিনাট্য 'গ্রেট ন্যাসান্যালে' অভিনীত হয়। গীতিনাট্যখানি সুবিধাজনক হয় নাই। নাট্যাচার্য্য অমৃত-লালবাবুর মুখে শুনিয়াছি, গিরিশচন্দ্র এই গীতিনাট্যের অভিনয় দেখিয়া দুইখানি হাসির গান বাঁধিয়াছিলেন। যথা :—

১ম গীত

আমায় ফিরিয়ে দে না আধুলি—
কি ঠকানটা ঠকালি! ইত্যাদি।

(বলা বাহুল্য, সে সময়ে সর্ব্বনিম্ন শ্রেণীর টিকিটের মূল্য আট আনা ছিল।)

২য় গীত

ও রাধানাথ, বাঁশরী কই?
তোমার কোথায় গেল চুড়োধড়া,
কোঁচড়-ভরা মুড়কি খই?
যাদু, থাকড়া টেনেছ, যেন ওগড়া বুনেছ
চাকা-চাকা লেখা জোকা কতই লিখেছে; ইত্যাদি।

যাহাই হউক দর্শক-সংখ্যা দিন-দিন কমিয়া যাওয়ায় এবং দেনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে থাকায়, ভুবনমোহনবাবু পুনরায় থিয়েটার লিজ দিবার সঙ্কল্প করিলেন।

'গ্রেট ন্যাসান্যাল থিয়েটার' প্রথম হইতেই একটা বিশৃঙ্খলায় পরিচালিত হইয়া আসিতেছিল। ভুবনমোহনবাবুর উপর যখন যিনি আধিপত্যলাভ করিতে পারিয়াছেন, তিনিই তখন থিয়েটারের কর্ণধার হইয়াছেন। গিরিশচন্দ্র এ-পর্য্যন্ত থিয়েটারের কোনও দায়িত্ব গ্রহণ করেন নাই। তাঁহাকে সমস্ত দিন অফিসে কার্য্য করিতে হইত, তাহার উপর পারিবারিক শোক-তাপ ও অশান্তিতে দীর্ঘকাল তিনি থিয়েটারের সংস্রবই রাখেন নাই। অনুরুদ্ধ হইয়া মাঝে-মাঝে আসিয়া 'মৃণালিনী' ও 'কপালকুণ্ডলা' নাটকাকারে গঠিত করিয়া দিয়াছিলেন, পশুপতি প্রভৃতি কয়েকটী ভূমিকায় রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং 'মাউসি', 'Charitable Dispensary', 'ধীবর ও দৈত্য', 'আলিবাবা', 'দুর্গাপূজার পঞ্চরং', 'Circus Pantomime', 'সহিস হইল আজি কবিচূড়ামণি' প্রভৃতি কয়েকখানি ক্ষুদ্র রঙ্গনাট্য এবং প্রয়োজনমত অন্যান্য নাটকাদিতে কতকগুলি গান বাঁধিয়া দেন।*

পূর্ব্বে একবার ভুবনমোহনবাবু শ্যামপুকুর-নিবাসী কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে

* পাণ্ডুলিপি না থাকায় গিরিশ-গ্রন্থাবলীতে এই সকল রঙ্গনাট্য প্রকাশিত হয় নাই। সান্যাল-বাটীতে অভিনীত 'ন্যাসান্যাল থিয়েটারে' 'Charitable Dispensary' পূর্ব্বে অভিনীত হইয়াছিল, 'গ্রেট ন্যাসান্যালে' তাহা কিছু সংশোধিত এবং পরিবর্দ্ধিত হয়। 'মাউসি' পঞ্চরংখানি 'গ্রেট ন্যাসান্যালে' যেদিন প্রথম অভিনীত হইবে বলিয়া বিজ্ঞাপিত হয়, সেদিনও বইখানি লেখা সমস্ত শেষ না হওয়ায়,

থিয়েটার লিজ দিয়াছিলেন। কিন্তু ভাড়া না পাইয়া নালিশ করিয়া পুনরায় থিয়েটার স্বহস্তে গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। এবার তিনি কোনও বিশ্বস্ত 'লেসি' খুঁজিতেছিলেন। গিরিশচন্দ্র লিজ লইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে ভুবনমোহনবাবু আনন্দ-সহকারে তিন বৎসরের নিমিত্ত তাঁহাকে থিয়েটার ভাড়া দেন। সুশিক্ষাদানে কলা-কৌশল দেখাইয়া ভাল নাটকের অভিনয় করিতে পারিলে আবার এই নিষ্প্রভ নাট্যশালাটীকে সমুজ্জ্বল করিয়া তোলা যায়, গিরিশচন্দ্রের এ বিশ্বাস ছিল। এই বিশ্বাস বলেই এবং তাঁহার কনিষ্ঠ শ্যালক দ্বারকানাথ দেব ও সুসাহিত্যিক সুহৃদ্ কেদারনাথ চৌধুরী মহাশয়দ্বয়ের বিশেষ উৎসাহে গিরিশচন্দ্র 'গ্রেট ন্যাসান্যাল থিয়েটার' স্বয়ং পরিচালনে অগ্রসর হইয়াছিলেন।

বিষয়ের ভাব গ্রহণ করিয়াই গিরিশচন্দ্র, অর্দ্ধেন্দুশেখর এবং সুপ্রসিদ্ধা অভিনেত্রী ক্ষেত্রমণি রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া মুখে-মুখে অভিনয় করিয়াছিলেন। এরূপভাবে অনেক পঞ্চরং অভিনীত হইত।

'ধীবর ও দৈত্যে' বেলবাবু ধীবরের ভূমিকা অভিনয় করিতেন। প্যাণ্টোমাইম অভিনয়ে তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন। নৃত্য ও অঙ্গভঙ্গির সহিত যখন তিনি গান গাহিতেন, দর্শকগণ যেন একটী ছবি দেখিতেন। গীতখানি এই :—

"যেয়া হাসুকে ব'লো, ও মুন্নাজান, জান গিযারে।
তোমার নাম ফুলকুমারী, তোমায় না দেখলে মরি,
তবে কেন রাধা পিয়ারি, নজরা মাররে॥"

"রঙ্গালয়ে নেপেন" পুস্তিকায় গিরিশচন্দ্র লিখিয়াছেন,—"এই সময়ে পঞ্চরংয়ের বিশেষ প্রাদুর্ভাব। ময়দানে 'লুইস থিয়েট্রারে'র আদর্শে-'একাধিক সহস্র রজনী'র বিষয়-বিশেষ লইয়া পঞ্চরং রচিত হইত ও তাহাতে নৃত্যগীত ভূরি পরিমাণে থাকিত। রামতারণ এইসকল পঞ্চরংয়ের একপ্রকার পরিচালক ছিলেন। 'আলিবাবা'তে রামতারণ মুচী (মুস্তাফা) সাজিতেন। তাঁহার উক্ত ভূমিকার নৃত্যগীত ও রং ঢং আমার চক্ষের উপর আজও রহিয়াছে।"

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ

গিরিশচন্দ্রের কর্তৃত্বাধীন 'ন্যাসান্যাল থিয়েটার'। 'মেঘনাদবধ' অভিনয়

'গ্রেট ন্যাসানাল থিয়েটার' লিজ লইয়া (১৮৭৭ খ্রী, জুলাই) গিরিশচন্দ্র থিয়েটারের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া পূর্ব্বের 'ন্যাসান্যাল থিয়েটার' নাম দিলেন এবং অভিনয়ার্থে মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের মহাকাব্য 'মেঘনাদবধ' নির্ব্বাচিত করেন। 'মেঘনাদবধ' নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া বহু পূর্ব্বে 'বেঙ্গল থিয়েটারে' অভিনীত হইযাছিল। উক্ত থিয়েটারে কাব্যখানি যেরূপভাবে নাট্যাকারে গঠিত হইযাছিল, তাহাতে নাট্য-কৌশলের ত্রুটী দেখিয়া এবং অভিনয-শিক্ষাদানও তাঁহার মনঃপূত না হওয়ায, তিনি সম্পূর্ণ নূতনভাবে 'মেঘনাদবধ' অভিনয়ের সঙ্কল্প করেন।

'বেঙ্গল থিয়েটারে'র অভিনয়ে কাব্যের মাধুর্য্য অনেক স্থলে অক্ষুণ্ণ থাকিত না। একপ্রকার গদ্য করিয়া বলিবারই চেষ্টা হইত। উক্ত থিয়েটারের অভিনেতারা গৌরব করিতেন যে, তাঁহাদের অভিনয স্বাভাবিক এবং সুরবর্জ্জিত। কিন্তু পদ্য, গদ্য করিতে যাইলে যে একটা অস্বাভাবিক সুর আসে এবং তাহাতে কাব্য-মাধুরীও নষ্ট হয়, ইহা তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল না।

গদ্য করিবার চেষ্টায় অভিনয়েরও হানি জন্মে। যথাস্থানে ভাবানুযায়ী নিম্ন ও উচ্চ সুর প্রয়োগ করা চলে না। কিন্তু 'বেঙ্গল থিয়েটারে'র অভিনয়ও কাব্যের গুণে দর্শককে আকৃষ্ট করিত। 'বেঙ্গল থিয়েটারে' অভিনীত 'মেঘনাদবধ' নাটকে রামের ভূমিকা অতি সামান্যই ছিল এবং পর-পর দৃশ্য-স্থাপনও নাটকীয় সুকৌশলে সংযোজিত হয় নাই।

নাট্যকাব্য অভিনয়ে 'যতি' রক্ষার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। ইহা প্রকাশ করিবার অভিপ্রায়ে এবং পূর্ব্ববর্ত্তী 'গ্রেট ন্যাসান্যাল থিয়েটারে' উপর্য্যুপরি গীতি-নাট্যাভিনয়ের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া গিরিশচন্দ্র একটী প্রস্তাবনা-কবিতা রচনা করেন। 'মেঘনাদবধ' অভিনয়ের প্রথম রজনীতে ইহা সর্ব্বপ্রথমে পঠিত হয় :

"যদি ধন প্রয়োজন না হইত কদাচন
রঙ্গভূমি হেরিত কি রসহীন জন ?
বিমল কবিত্ব-আশে, কেহ রঙ্গালয়ে আসে,
কেহ হেরে কামিনীর কটাক্ষ ঈক্ষণ।

আসি এই রঙ্গস্থলে, কত লোক কত বলে,
সবার কথায় মম নাহি প্রয়োজন,
কাব্যে যার অধিকার, দাস তার তিরস্কার,
অকপটে কহে, করে মস্তকে ধারণ।
সুধীজন-পদধূলি, রাখি আমি মাথে তুলি,
তিরস্কার তাঁর—দোষ বারণ কারণ;
'এন্‌কোর' 'ক্ল্যাপে' যার আছে মাত্র অধিকার,
তাঁর(ও) আজি করি আমি চরণ বন্দন।
সবিনয়ে কহে ভৃত্য, নহে বারাঙ্গনা-নৃত্য,
মেঘনাদে বীরমদে বিপুল গর্জ্জন;
ঝুনু ঝুনু নাহি আর, কঙ্কণের ঝনৎকার,
অস্ত্রে অস্ত্রাঘাত ঘোর অশনি পতন।
গভীর তুলিয়া তান, মধুর মধুর গান,
গদ্য পদ্য মাঝে এই মনোহর সেতু;
শেষাক্ষরে মিল নাই, গদ্য যদি বল তাই,
পদ্য বলা যায় যতি বিভাগের হেতু।
হ'লে কাব্য অভিনয়, জীবন সঞ্চার হয়,
কোন্ অনুরোধে যতি করিব বর্জ্জন?
পাষাণে বাঁধিয়া প্রাণ, সে যতিবে বলিদান
নাহি দিব, হই হব নিন্দার ভাজন।
যাঁর মনে উঠে যাহা, তিনি বলিবেন তাহা,
আমার যা কার্য্য আমি করিব এখন॥"

উপরোক্ত কবিতাটী গর্ব্বব্যঞ্জক। সেই গর্ব্ব 'ন্যাসান্যাল থিয়েটারে'র অভিনয়ে সম্পূর্ণ রক্ষিত হইয়াছিল। বস্তুতঃ গিরিশচন্দ্র এরূপ নিপুণতার সহিত এই মহাকাব্য নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত করিয়া ইহার শিক্ষাদান করিয়াছিলেন এবং অভিনয়-সৌকর্য্যার্থে কয়েকটী সঙ্গীত রচনা করিয়া নাটকখানি এরূপ উপাদেয় করিয়া তুলিয়াছিলেন, যে, যাঁহারা তৎপূর্ব্বে কেবল 'মেঘনাদবধ কাব্য' পাঠ করিয়াছিলেন, তাঁহারা এই দৃশ্যকাব্যের অভিনয় দর্শনে মাইকেলের ভাব ও ভাষার জীবন্ত মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিয়া বিস্ময় ও আনন্দে অভিভূত হন। শিক্ষিত ও সাহিত্যিক মহলে এই নাটকাভিনয় লইয়া কিছুদিন একটা আন্দোলন চলিতে থাকে।

মেঘনাদবধ, লক্ষ্মণের শক্তিশেল এবং প্রমীলার চিতারোহণ এই তিনটী বিষয় লইয়া 'মেঘনাদবধ' (trilogy) অভিনীত হইয়াছিল। এক্ষণে যে সকল সুযোগ্য অভিনেতৃ-বর্গের কলা-নৈপুণ্যে 'মেঘনাদবধ' দর্শকগণের প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছিল, তাঁহাদের নাম উল্লেখ করিতেছি:

রাম ও মেঘনাদ	গিরিশচন্দ্র ঘোষ।
লক্ষ্মণ	কেদারনাথ চৌধুরী।
রাবণ	অমৃতলাল মিত্র।
বিভীষণ ও মহাদেব	মতিলাল স্থর।
স্থগ্রীব, মারীচ ও সারণ	অতুলচন্দ্র মিত্র (বেভোল)।
হনুমান	যদুনাথ ভট্টাচার্য্য।
ইন্দ্র	আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়।
কার্ত্তিক ও দূত	অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেলবাবু)।
মদন	রামতারণ সান্ন্যাল।
মন্দোদরী	কাদম্বিনী দাসী।
প্রমীলা	শ্রীমতী বিনোদিনী দাসী।
চিত্রাঙ্গদা ও মায়া	লক্ষ্মীমণি দাসী।
শচী	বসন্তকুমারী।
রতি ও বা	কুসুমকুমারী (খোঁড়া)।
নৃমুণ্ডমালিনী ও প্রভাসা	ক্ষেত্রমণি দেবী। ইত্যাদি।

রামের ভূমিকা 'বেঙ্গল থিয়েটারে' একরূপ পরিত্যক্ত হইয়াছিল, কিন্তু 'ন্যাসান্যাল থিয়েটারে' রামের ভূমিকা একটী উচ্চ ভূমিকায় পরিগণিত হয়। 'সাধারণী'-সম্পাদক সাহিত্যরথী অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় গল্প করিতেন, "গিরিশবাবু যখন রাম-রূপে লক্ষ্মণকে বিদায় দেন, একদিন অভিনয়-রাত্রে ঠিক সেই সময়ে মহিলা-আসনের সম্মুখস্থ চিক খসিয়া পড়ে; কিন্তু স্ত্রী ও পুরুষ উভয় দর্শকই তৎকালে এরূপ মুগ্ধ যে, কাহারও ইহা লক্ষ্য হয় নাই। অঙ্ক-শেষে পটক্ষেপণ হইলে, নারী দর্শকবৃন্দ সতর্ক হইলেন।" এখনকার রঙ্গালয় দেখিয়া চিক পতন কি, হয়তো পাঠক বুঝিতে পারিতেছেন না। তখন রঙ্গালয় দ্বিতল ছিল এবং দ্বিতলের একপার্শ্বে চিক দিয়া স্ত্রীলোকের বসিবার স্থান হইত।

স্থপ্রসিদ্ধ অভিনেতা কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় 'বেঙ্গল থিয়েটারে' 'মেঘনাদ-বধ' নাটকে মেঘনাদের ভূমিকা অভিনয় করিতেন। যুদ্ধযাত্রাকালীন মন্দোদরীর নিকট বিদায়-দৃশ্যে, মাতাকে প্রবোধ দিবার নিমিত্ত মেঘনাদ-বেশী কিরণবাবু "কেন মা, ডরাও তুমি রাঘবে লক্ষ্মণে রক্ষোবৈরী" বলিয়া এমনই সবেগে তরবারী কোষমুক্ত করিতেন যে, সুতা কাটিয়া গিয়া একরাত্রে মন্দোদরীর হাতের তাবিজ ষ্টেজে পড়িয়া যায। বলা বাহুল্য, গিরিশচন্দ্র তরবারী স্পর্শও করিতেন না। সন্তানের অমঙ্গল আশঙ্কায় ব্যাকুলা জননীকে প্রবোধ দিবার নিমিত্ত, বীর ও মাতৃভক্ত সন্তানের যেরূপ বিনয়, গাম্ভীর্য্য এবং বীরত্বাভিমানের আবশ্যক, গিরিশচন্দ্র এই দৃশ্যে সেই রস অবতারণা করিতেন। আবার যজ্ঞাগার-দৃশ্যে যখন তিনি "ক্ষত্রকুলগ্লানি শত ধিক তোরে লক্ষ্মণ" বলিয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিতেন, তখন তাঁহার সেই শান্ত ও সৌম্য মূর্ত্তি মুহূর্ত্তের মধ্যে ক্রোধে আরক্তিম হইয়া উঠিত—বক্ষঃস্থল যেন দ্বিগুণ ফুলিয়া উঠিত। পলকের মধ্যে এই ভীষণ পরিবর্ত্তনে

দর্শকগণ স্তম্ভিত হইয়া যাইতেন। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই ফেব্রুয়ারী তারিখের 'সাধারণী' পত্রিকায় 'মেঘনাদবধ' অভিনয়ের দীর্ঘ সমালোচনা বাহির হয়। আমরা গিরিশচন্দ্রের মেঘনাদ-ভূমিকার অভিনয় সম্বন্ধে যেরূপ মন্তব্য বাহির হইয়াছিল, সেই অংশটুকু নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম:

"ন্যাসান্যাল থিয়েটার। ২রা ফেব্রুয়ারী রাত্রিতে 'মেঘনাদবধে'র অভিনয় দেখিতে গিয়া আমরা যে প্রীতিলাভ করিয়াছি, অনেক দিন আমাদের ভাগ্যে সে প্রকার সুখ আর ঘটে নাই। রামচন্দ্র এবং মেঘনাদ, এই দুই রূপে নাট্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ অভিনয় করেন। পাত্রদ্বয়ের চরিত্র, কার্য্য এবং ভাব সমস্তই বিভিন্ন, সুতরাং একই ব্যক্তির দ্বিবিধ রূপ পরিগ্রহ কিছু বিসদৃশ্যতা হইয়াছিল, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের অভিনয়-দক্ষতায় তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতায়, এ দোষ দেখিয়াও আমরা মনে কিছু করিতে পারি নাই, দোষ একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলাম এবং তাঁহার রাম-রূপের অভিনয়ে বারংবার আমাদের কঠোর চক্ষুও অশ্রুসিক্ত হইয়াছিল। লক্ষ্মণ যখন পূজাগারে প্রবেশ করেন, তখন গিরিশচন্দ্রের মেঘনাদ-সম্ভব সৌম্যভাব দর্শনে আমরা মুগ্ধ হই; আবার তৎ-পরক্ষণেই যখন মেঘনাদ সহসা রোষকষায়িত নেত্রে বীর-মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া বক্ষ প্রসারণপূর্ব্বক লক্ষ্মণের সহিত দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার উপক্রম করিলেন, তখন গিরিশচন্দ্র অভিনয়-পটুতার চরমসীমা দেখাইলেন, তাঁহার সে ভাব অদ্ভুত, বিস্ময়কর! তাহাতে আমরা মুগ্ধেরও অধিক হইয়াছিলাম। ইংলণ্ডের প্রথিত-নামা গ্যারিকের ক্ষমতার পরিচয় পুস্তকে পাঠ করিয়াছি, কিন্তু বঙ্গের গিরিশ অপেক্ষা কোনও গ্যারিক যে অধিকতর ক্ষমতা প্রদর্শন করিতে পারেন, ইহা আমাদের ধারণা হয় না। গিরিশচন্দ্র দীর্ঘজীবী হউন, আর এইরূপে আমাদের সুখ বর্দ্ধন করিয়া সাধুবাদ গ্রহণ করিতে থাকুন। গিরিশ বঙ্গের অলঙ্কার।"* 'সাধারণী', ৯ম ভাগ, ১৫ সংখ্যা।

'পলাশীর যুদ্ধ' অভিনয়

'মেঘনাদবধ' অভিনয়ে বিশেষরূপ কৃতকার্য্য হইয়া গিরিশচন্দ্র তৎপরে নবীনচন্দ্রের মহাকাব্য 'পলাশীর যুদ্ধ' নূতন করিয়া নাটকাকারে গঠিত করেন। প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে 'বেঙ্গল থিয়েটার' ভাড়া লইয়া 'নিউ এরিয়ান থিয়েটার' সম্প্রদায় একবার 'পলাশীর যুদ্ধ' অভিনয় করিয়াছিলেন। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের নবভাবে গঠিত এবং নূতনত্বপূর্ণ শিক্ষাদান-চাতুর্য্যে 'পলাশীর যুদ্ধ' ও 'মেঘনাদবধে'র ন্যায় নাট্যামোদিগণের পরম সমাদরলাভ করিয়াছিল। প্রথম অভিনয় রজনীর অভিনেতৃগণ:

ক্লাইভ	গিরিশচন্দ্র ঘোষ।
সিরাজদ্দৌলা	মহেন্দ্রলাল বসু।

* 'সাধারণী'-সম্পাদক অক্ষয়চন্দ্রের পুত্র শ্রীযুক্ত অজয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের সৌজন্যে 'সাধারণী'র প্রাচীন ফাইল হইতে সংগৃহীত।

জগৎশেঠ ও ঘাতক	অমৃতলাল মিত্র।
রাজবল্লভ	অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেলবাবু)।
রায়দুর্লভ ও উদাসীন	মতিলাল সুর।
মোহনলাল	কেদারনাথ চৌধুরী।
মীরণ	রামতারণ সান্ন্যাল।
বেগম	লক্ষ্মীমণি দাসী।
রাণী ভবাণী	কাদম্বিনী।
ইংলণ্ড-রাজলক্ষ্মী	শ্রীমতী বিনোদিনী দাসী। ইত্যাদি।

'পলাশীর যুদ্ধে'র ন্যায় এরূপ নিখুঁত অভিনয় বহুকাল বঙ্গ-রঙ্গালয়ে প্রদর্শিত হয় নাই। প্রত্যেক অভিনেতা ও অভিনেত্রী তাঁহাদের ভূমিকার একটী আকার প্রদান করিয়া দর্শক-হৃদয় রসাপ্লুত করিয়াছিলেন।

গ্রন্থকার নবীনচন্দ্র সেন এ সময়ে মফঃস্বলের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তিনি ছুটীতে কলিকাতায় আসিয়া 'পলাশীর যুদ্ধে'র অভিনয় দেখিয়া নিরতিশয় আনন্দ প্রকাশ করেন। এইসময় হইতেই গিরিশচন্দ্রের সহিত নবীনচন্দ্রের সৌহার্দ্দ্য স্থাপিত হয়। এই সৌহার্দ্দ্যের ভিত্তি শুধু 'পলাশীর যুদ্ধ' অভিনয় নহে—অনেকটা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়। প্রথম আলাপের দিন গিরিশচন্দ্র নবীনচন্দ্রকে বলেন, "আপনার 'পলাশীর যুদ্ধে' 'ক্রম ক'রে দূরে তোপ গর্জ্জিল অমনি' লাইনটী লর্ড বায়রণের *Childe Harold* হইতে গৃহীত।* বায়রণ যেমন ওয়াটারলু যুদ্ধের পূর্ব্বাবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন, আপনিও পলাশীর যুদ্ধের পূর্ব্বাবস্থা সেইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু আমার মনে হয়, 'ক্রম ক'রে দূরে তোপ গর্জ্জিল অমনি' এ লাইন ভাল অনুবাদ হয় নাই।" নবীনচন্দ্র বলিলেন, "আপনি কিরূপ অনুবাদ করিতেন?" উত্তরে গিরিশচন্দ্র বলিলেন, "মুখে-মুখে হঠাৎ বায়রণের অনুবাদ করা সহজ নয়, তবু বোধ করি, এইরূপ হইলে বায়রণের ভাব কতক বজায় থাকে—

নিকট, প্রকট, ক্রমে বিকট গর্জ্জন,
অস্ত্র ধর' অস্ত্র ধর' কামান ভীষণ!"

উদার-কবি গুণমুগ্ধ হইয়া গিরিশচন্দ্রকে ভ্রাতৃ-সম্বোধনে আলিঙ্গন করেন এবং সেই-দিন হইতে বরাবর 'ভাই' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। শেষ বয়স পর্য্যন্ত কবিদ্বয়ের পরস্পর একটা প্রাণের আকর্ষণ ছিল, যথাসময়ে পাঠকগণ সে রস আস্বাদন করিবেন।

'আগমনী' অভিনয়

এই সময়ে আশ্বিন মাসে শারদীয়া পূজা উপলক্ষ্যে গিরিশচন্দ্র 'ন্যাসান্যাল থিয়েটারে'র জন্য 'আগমনী' ও 'অকালবোধন' নামক দুইখানি নাট্যরাসক রচনা করেন। 'আগমনী'

* And nearer, clearer, deadlier than before.
Arm! Arm! it is—it is the cannon's opening roar!

১৪ই আশ্বিন (১২৮৪ সাল) প্রথম অভিনীত হয়। গিরিরাজ, মহাদেব, উমা এবং মেনকার ভূমিকা যথাক্রমে রামতারণ সান্যাল, কেদারনাথ চৌধুরী, শ্রীমতী বিনোদিনী এবং কাদম্বিনী দাসী গ্রহণ করিয়াছিলেন। 'আগমনী'র গীতগুলি ("ওমা কেমন করে পরের ঘরে ছিলি উমা বল মা তাই!" প্রভৃতি) এত মধুর এবং মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছিল যে দর্শকমাত্রেই মুগ্ধ হইয়া মুক্তকণ্ঠে ইহার প্রশংসা করিয়াছিলেন।

'অকালবোধন' অভিনয়

'আগমনী' সর্ব্বজন-সমাদৃত হওয়ায় গিরিশচন্দ্র উৎসাহিত হইয়া সঙ্গে-সঙ্গে 'অকাল-বোধন' নামক আর-একখানি নাট্যরাসক প্রণয়ন করেন। 'আগমনী' অভিনয়ের চারি-দিন পরেই (১৮ই আশ্বিন) 'ন্যাসান্যালে' ইহা অভিনীত হয়। গিরিশচন্দ্র স্বয়ং রামচন্দ্র এবং মহেন্দ্রলাল বসু ইন্দ্রের ভূমিকা অভিনয় করিয়া দর্শকগণের তৃপ্তিসাধন করিয়া-ছিলেন।

'আগমনী' ও 'অকালবোধন' দুইখানি পুস্তিকাই মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। গিরিশচন্দ্র স্বীয় নাম গ্রন্থকাররূপে প্রকাশ না করিয়া মুকুটাচরণ মিত্র ছদ্মনাম ব্যবহার করেন। 'গ্রেট ন্যাসান্যাল থিয়েটারে' তিনি যে কয়েকখানি রঙ্গনাট্য রচনা করিয়া দিয়াছিলেন, সেগুলিকে তিনি রচনার মধ্যেই গণ্য করেন নাই। 'আগমনী'ই তিনি তাঁহার প্রথম রচনা বলিয়া জ্ঞাপন করেন। 'আগমনী'র উৎসর্গ-পত্রপাঠে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। যথা:—

"স্নেহাস্পদ শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চৌধুরী। প্রিয় ভ্রাতঃ কেদার—

শারদীয় পুনর্ম্মিলন ছলে—তোমার কর-কমলে—অদ্য এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানি অর্পণ করিলাম—অবশ্য পূর্ব্বভাব ভুলিবে, এমন সকলে ভুলে থাকে—তা বলে এটীকে ভুল' না, আমার এই প্রথম রচনা-কুসুমটীকে অনাদর-অনল-শিখায় অর্পণ ক'র না। কিন্তু কি বলিয়া যত্ন করিতে বলিব, জানি না; কারণ এ পুস্তিকাখানির নাম 'নব যোগিনী' —'নবীনা কামিনী' বা 'নবীনা তপস্বিনী' নয়, সুতরাং প্রাচীন পদ্ধতিমতে "এই পুস্তিকাখানি নবীনা কামিনী বা যোগিনী বা তপস্বিনী আপনার করে অর্পণ করিলাম ইত্যাদি" বলিতে পারিলাম না; এখানি তোমায় দিলাম, যাহা ইচ্ছা করিও, এই দুই পংক্তি লিখিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলাম।

তোমারই—মুকুটা।"

অতি অল্পদিনের মধ্যেই 'ন্যাসান্যাল থিয়েটার' সাধারণের সুদৃষ্টি আকর্ষণে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু এই উন্নতির প্রথম মুখেই এমন একটী ঘটনা ঘটিল, যাহাতে গিরিশচন্দ্রকে থিয়েটারের 'লিজ' স্বত্ব পরিত্যাগ করিতে হইল। তাঁহার ভ্রাতা অতুলকৃষ্ণ ঘোষ তখন হাইকোর্টের নূতন উকীল হইয়াছেন। তিনি একদিন গিরিশচন্দ্রকে বলিলেন, "মেজদাদা, তুমি দিনেরবেলায় অফিসে কাজ কর,—রাত্রে থিয়েটারে বই

লেখা, রিহারস্থাল দেওয়া, অভিনয় করা—এইসব লইয়াই ব্যস্ত থাক। তুমি বিশ্বাসী ও সুযোগ্যবোধে যাহাদের উপর টিকিট বিক্রয়, হিসাবরক্ষা, গার্ড দেওয়া এবং থিয়েটারের অন্যান্য বিষয়ের তত্ত্বাবধানের ভার দিয়াছ, তাহারা যে বরাবর হুঁসিয়ার হইয়া কার্য্য করিবে, তাহারই বা প্রমাণ কি? ইহাদের দোষেই ভুবনমোহনবাবু নানা প্রকারে ঋণগ্রস্ত হইয়া অবশেষে থিয়েটার ভাড়া দিতে বাধ্য হইলেন। ভুবনমোহনবাবুর পরিণাম দেখিয়া আমি চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছি। হয় তুমি থিয়েটার ছাড়, নচেৎ এস—আমরা পৃথক হই।" অনুগত ভ্রাতার এইরূপ স্পষ্টবাক্যে গিরিশচন্দ্র বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "তুমি কি মনে কর, থিয়েটারের আয়-ব্যয় ও তত্ত্বাবধানের দিকে আমার দৃষ্টি নাই? আর যেরূপ বিক্রয় হইতেছে, তাহাতে কি তোমার ধারণা, আমার লোকসান হইবে?" অতুলকৃষ্ণ বলিলেন, "থিয়েটারের আভ্যন্তরিক অবস্থা যেরূপ, তাহাতে আমার বিশ্বাস, থিয়েটার করিয়া কেহই ঋণগ্রস্ত ভিন্ন লাভবান হইতে পারিবে না।" গিরিশচন্দ্র ভ্রাতার মানসিক চাঞ্চল্য বুঝিয়া বলিলেন, "তোমার যদি এইরূপ বিশ্বাসই হয়, তুমি নিশ্চিন্ত থাক, আমি তোমাকে বলিতেছি, থিয়েটারের সংস্রবে যতদিন থাকিব, আমি আর স্বত্বাধিকারী হইবার কখনই চেষ্টা করিব না।"

গিরিশচন্দ্র আজীবন স্বীয় বাক্য রক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি প্রধান পরিচালক হইয়া ইচ্ছামত যাহাকে-তাহাকে থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী করিয়া স্বয়ং তাঁহাদের বেতনভোগী হইয়া কার্য্য করিতেন। ইংলণ্ডে 'আর্ল অফ্ ওয়ারউইক' যেরূপ রাজা হইবার যোগ্যতা রাখিয়াও কখন স্বয়ং রাজা হইবার প্রয়াস না করিয়া নৃপতি-স্রষ্টা (King-maker) নামে অভিহিত হইয়াছিলেন,—গিরিশচন্দ্রও সেই পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনি নিজের স্বত্ব পরিত্যাগ করিলে, তাঁহাব শ্যালক দ্বারকানাথ দেব থিয়েটার ভাড়া লইলেন।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

'ন্যাসান্যাল থিয়েটার' নানা হস্তে

দ্বারকানাথবাবুর লিজের সময় গিরিশচন্দ্র 'মেঘনাদবধ', 'কৃষ্ণকুমারী' প্রভৃতি নাটকে রাম ও ইন্দ্রজিৎ, ভীমসিংহ প্রভৃতি ভূমিকা অভিনয় করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি দীনবন্ধুবাবুর 'যমালয়ে জীবন্ত মানুষ' গল্পটী প্রহসনাকারে পরিবর্ত্তিত করিয়া দেন। প্রহসনখানি বেশ জমিয়াছিল। কয়েকমাস পরে দোয়ারীবাবু থিয়েটার ছাড়িয়া দিলে ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম হইতে কেদারনাথ চৌধুরী মহাশয় সাব-লিজ গ্রহণ করিলেন।

কেদারবাবুর জন্মভূমি ডায়মণ্ড হারবারের অন্তর্গত ঘাটেশ্বরা গ্রাম। ইনি তথাকার জমীদার ছিলেন। বাল্যকাল হইতেই কাব্য ও নাট্যচর্চ্চা লইয়া থাকিতেন;—যৌবনের মধ্যভাগে 'ন্যাসান্যাল থিয়েটারে' আসিয়া যোগদান করেন। গিরিশচন্দ্রকে তিনি 'বাদশা' বলিয়া ডাকিতেন। তাঁহারই উৎসাহ এবং সাহায্যে কেদারবাবু মহাসমারোহে দল গঠিত করিয়া ৫ই জানুয়ারী 'পলাশীর যুদ্ধ' অভিনয় ঘোষণা করেন। লব্ধপ্রতিষ্ঠ অভিনেতা ও অভিনেত্রী সম্মিলনে 'পলাশীর যুদ্ধ' অতি সুন্দররূপ অভিনীত হয়।

বঙ্গ-নাট্যশালায় বড়লাট

এই নবগঠিত 'ন্যাসান্যাল' সম্প্রদায়ের প্রতি দর্শকগণের বিশেষরূপ সহানুভূতি দেখিয়া 'বেঙ্গল থিয়েটার' সম্প্রদায় একটা বড়রকম 'চাল' চালেন। এই সময়ে কলিকাতায় "পশুক্লেশ-নিবারণী সভা" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সভার তহবিল বৃদ্ধির নিমিত্ত উক্ত সভার সেক্রেটারী গ্র্যাণ্ট সাহেব উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছিলেন। দেশের রাজা, মহারাজা ও জমীদারগণের নিকট তিনি চাঁদা সংগ্রহ করিতেছিলেন। 'বেঙ্গল থিয়েটারে'র কর্ত্তৃপক্ষগণ এই সময়ে গ্র্যাণ্ট সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া উক্ত সভার সাহায্যার্থে একরাত্রি অভিনয় করিবার প্রস্তাব করেন এবং তাঁহারই উৎসাহে তৎকালীন বড়লাট লর্ড লিটনকে তাঁহার উপস্থিতি ও আনুকূল্যের নিমিত্ত আবেদন-পত্র প্রেরণ করেন। গ্র্যাণ্ট সাহেবের চেষ্টায় বড়লাট বাহাদুর 'বেঙ্গল থিয়েটারে'র প্রার্থনা মঞ্জুর করেন। ১৮ই জানুয়ারী, শুক্রবার তারিখে, রাজ-প্রতিনিধির সম্মুখে 'বেঙ্গল থিয়েটার' 'শকুন্তলা' নাটক অভিনয়

করেন। বঙ্গ-রঙ্গালয়ে রাজপ্রতিনিধির এই প্রথম শুভাগমন,—বঙ্গ-নাট্যশালার ইতিহাসে ইহা একটী স্মরণীয় রজনী।*

থিয়েটারে বঙ্কিমচন্দ্রের যুগ

২৬শে জানুয়ারী তারিখে 'ন্যাসান্যাল থিয়েটারে' 'আনন্দ-মিলন' নামক একখানি নূতন গীতিনাট্য অভিনীত হয়। কিন্তু গীতিনাট্যখানি তেমন জমে নাই।

দীনবন্ধুবাবু এবং মাইকেল মধুসূদন দত্তের পর এই সময়ে বঙ্গ-নাট্যশালায় বঙ্কিমচন্দ্রের যুগ চলিতেছিল বলা যায়। 'বেঙ্গল থিয়েটারে' 'দুর্গেশনন্দিনী' এবং 'মৃণালিনী' সগৌরবে অভিনীত হইতেছিল। 'ন্যাসান্যাল থিয়েটারে'ও 'মৃণালিনী' এবং 'কপালকুণ্ডলা'র অভিনয় ঘোষণা করিলে সমধিক দর্শকসমাগম হইত। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি দর্শকগণের বিশেষরূপ অনুরাগ দেখিয়া গিরিশচন্দ্র 'বিষবৃক্ষ' নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত করিয়া স্বয়ং নগেন্দ্রনাথের ভূমিকা অভিনয় করেন। দেবেন্দ্র, শ্রীশ, সূর্য্যমুখী, কুন্দনন্দিনী, কমলমণি এবং হীরার ভূমিকা যথাক্রমে রামতারণ সান্ন্যাল, মহেন্দ্রলাল বসু, কাদম্বিনী, শ্রীমতী বিনোদিনী, কমলা (সুকুমারী দত্তের ভগ্নী) এবং নারায়ণী গ্রহণ করিয়াছিলেন। 'বিষবৃক্ষ' অভিনয়ে 'ন্যাসান্যাল থিয়েটারে'র গৌরব আরও বাড়িয়া যায়। নগেন্দ্র দত্তের বিভিন্ন অবস্থার চিত্রগুলি গিরিশচন্দ্রের অদ্ভুত অভিনয়ে দর্শক-হৃদয়ে মুদ্রিত হইয়া যাইত।

* সে রাত্রির অভিনয় সম্বন্ধে 'ইংলিসম্যানে' নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছিল:—

"The Bengal Theatre.—On Friday night their Excellencies Lord & Lady Lytton, with Sir Richard Temple, accompanied by their respective suits visited this theatre and witnessed the play of Sakoontala, or the Lost Ring. We understood that this is the first occasion on which a Viceroy has ever visited a native theatre. Great pains were unmistakably taken by the management to make everything pleasant for their Excellencies, and the manner in which the piece was put on the stage reflects much credit on the proprietor. The scenery was very good, the dresses of the artists were effective, and the dialogues good, though with somewhat of a tendency to drag, specially in the bee scene, in which a young lady and her two attendants are much concerned with the extraordinary behaviour of a bee of immense dimensions. Lord and Lady Lytton, having stayed an hour in the theatre, left a little before eleven o'clock. The theatre was crammed, and must have contributed materially to the funds of the Society for the Prevention of Cruelty to Animals, in aid of which the proceeds of the evening were devoted. Mr. Grant, the energetic Secretary, was present and assisted in making the evening pass off agreeably."

Englishman, Monday, 21st January 1878.

'বিষবৃক্ষে'র আদর দেখিয়া 'বেঙ্গল থিয়েটার' সম্প্রদায়ও উৎসাহের সহিত ১৮৭৮ খ্রী, ১৬ই মার্চ্চ তারিখে বঙ্কিমচন্দ্রের 'চন্দ্রশেখর' অভিনয় করেন। চন্দ্রশেখর, প্রতাপ, ফষ্টর, দলনী ও কুলসমের ভূমিকা যথাক্রমে বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়, হরিদাস বৈষ্ণব, শরচ্চন্দ্র ঘোষ, শ্রীমতী বনবিহারিণী এবং এলোকেশী গ্রহণ করিয়াছিলেন। 'চন্দ্রশেখর' কিন্তু ইঁহারা তেমন জমাইতে পারেন নাই। উত্তরকালে 'ষ্টার থিয়েটারে' নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু কর্ত্তৃক নাট্যাকারে গঠিত 'চন্দ্রশেখরে'র অভিনয় দর্শনেই দেশ মাতিয়া উঠিয়াছিল।

যাহাই হউক 'বেঙ্গল থিয়েটারে' 'দুর্গেশনন্দিনী'র সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রতিপত্তি দেখিয়া কেদারবাবুও 'ন্যাসান্যালে' 'দুর্গেশনন্দিনী' অভিনয় করিবার জন্য গিরিশবাবুকে ধরিয়া বসিলেন।

কেদারবাবুর বিশেষরূপ আগ্রহ দর্শনে গিরিশচন্দ্র 'দুর্গেশনন্দিনী' নূতন করিয়া নাটকাকারে গঠিত করিয়া দিয়াছিলেন। ২২শে জুন (১৮৭৮ খ্রী) তারিখে 'ন্যাসান্যাল থিয়েটারে' ইহার প্রথম অভিনয় হয়। প্রথমাভিনয় রজনীতে জগৎসিংহের ভূমিকায় কেদারবাবু এবং ওসমানের ভূমিকায় কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কিন্তু 'বেঙ্গল থিয়েটারে' শরচ্চন্দ্র ঘোষ ও হরিদাস দাস (জাতিতে বৈষ্ণব) উক্ত ভূমিকা দুইটীর বহুবার অভিনয় করিয়া এতটা প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন, যে, দর্শকগণ উভয় থিয়েটারের অভিনয় তুলনা করিয়া 'বেঙ্গল থিয়েটারে'রই জয় ঘোষণা করেন। তেজস্বী গিরিশচন্দ্র ইহা সহ্য করিতে না পারিয়া স্বয়ং জগৎসিংহের ভূমিকা গ্রহণ করিলেন এবং ওসমানের ভূমিকা কিরণবাবুর পরিবর্ত্তে মহেন্দ্রলাল বসুকে প্রদান করিলেন।

পূর্ব্ব হইতেই তিলোত্তমা ও আয়েষার উভয় ভূমিকা শ্রীমতী বিনোদিনীকে এবং কতলু খাঁ, বিদ্যাদিগ্‌গজ, রহিম শেখ, বিমলা ও আসমানির ভূমিকা যথাক্রমে মতিলাল সুর, অতুলচন্দ্র মিত্র (বেডৌল), অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেলবাবু), কাদম্বিনী ও লক্ষ্মীমণিকে দেওয়া হইয়াছিল। শিক্ষাদানেও গিরিশচন্দ্র এবার একটু নূতনত্ব দেখাইয়া পুনরায় অভিনয় ঘোষণা করিলেন।

অপূর্ব্ব অভিনয়-নৈপুণ্যে এবার 'ন্যাসান্যাল থিয়েটার' সাধারণের মত পরিবর্ত্তনে সমর্থ হইয়াছিল। নাট্যামোদী-মহলে আবার 'ন্যাসান্যালে'র জয়ধ্বনি উত্থিত হয়। কিন্তু কেহ-কেহ এ কথা বলিতেও ছাড়েন নাই—" 'বেঙ্গল থিয়েটারে'র ন্যায় ইহারা তো আর ঘোড়া দেখাইতে পারিল না।"

আকৃতি, কণ্ঠস্বর, সুশিক্ষা এবং পর্য্যবেক্ষণ (observation) ও পরিকল্পনা (conception) শক্তির সম্যক্ মিলনে উৎকৃষ্ট অভিনেতা সৃষ্ট হয়। কবির ন্যায় অভিনেতারা জন্মগ্রহণ করেন—কেবলমাত্র শিক্ষায় গঠিত হন না। গিরিশচন্দ্রের এই সমস্ত গুণগুলিই ছিল। এ নিমিত্ত 'সধবার একাদশী' নাটকে নিমচাঁদ হইতে আরম্ভ করিয়া যে কোনও ভূমিকায় তিনি রঙ্গমঞ্চে বাহির হইয়াছেন, তাহাতেই দর্শকগণের চিত্তহরণে সমর্থ হইয়াছিলেন।

'ন্যাশন্যাল থিয়েটারে' এই সময়ে গিরিশচন্দ্রের মেঘনাদ, রাম, ক্লাইভ, পশুপতি, নগেন্দ্রনাথ, জগৎসিংহ প্রভৃতি ভূমিকার অভিনয় দর্শনে দর্শকমণ্ডলী যেন মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া যাইতেন। এই সকল ভূমিকায় অসাধারণ অভিনয়-নৈপুণ্যে মধ্যাহ্ন-ভাস্করসম তাঁহার অভিনয়-গৌরব চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

'দুর্গেশনন্দিনী' অভিনয়কালে একরাত্রি বিশেষ একটী দুর্ঘটনা ঘটে; এই ঘটনার পর গিরিশচন্দ্রকে দীর্ঘকাল অভিনয়কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। যে দৃশ্যে আসমানি, গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজের গৃহে প্রবেশ করিয়া, ব্রাহ্মণের ভোজনাবশিষ্ট খিচুড়ি নিজে খাইয়া বাকিটুকু বিদ্যাদিগ্‌গজকে খাওয়াইত,—সে দৃশ্যে ফুট গুলিয়া খিচুড়ি পরিকল্পিত হইত। উক্ত দৃশ্যাভিনয়ের পর জগৎসিংহ-বেশী গিরিশচন্দ্র রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করেন। যে স্থানে বিদ্যাদিগ্‌গজ খিচুড়ি খাইয়াছিল, সে স্থানে যে ফুটির খোসা পড়িয়া ছিল, তাহা তিনি লক্ষ্য না করিয়া যেমন তাহার উপর পা দিয়াছেন, অমনি পা হড়কাইয়া রঙ্গমঞ্চের উপর পড়িয়া যান। আঘাত এত গুরুতর হইয়াছিল যে তাঁহার বাম হস্তের কব্জি ভাঙ্গিয়া যায়। দর্শকগণ হায়-হায় করিয়া উঠেন। সঙ্গে-সঙ্গে ড্রপ ফেলিয়া দেওয়া হয়। কেদারবাবু দর্শকগণের অনুমতি লইয়া স্বয়ং জগৎসিংহ সাজিয়া সেদিনের অভিনয় একরূপ চালাইয়া দেন। সম্পূর্ণরূপ হাতের ব্যথা সারিতে গিরিশ-চন্দ্রের তিন মাস সময় লাগিয়াছিল। তাঁহার এই দীর্ঘকাল অনুপস্থিতিতে থিয়েটারের বিক্রয় কমিয়া যায় এবং তৎসঙ্গে সম্প্রদায়-মধ্যে নানারূপ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়।

গোপীচাঁদ শেঠির লিজ গ্রহণ

কেদারবাবু নানা কারণে থিয়েটার ছাড়িয়া দিলে, অবিনাশচন্দ্র করের উদ্যোগে গোপীচাঁদ কেঁইয়া (শেঠি) নামক জনৈক মাড়োয়ারী ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম হইতে 'ন্যাশন্যাল থিয়েটারে'র সাব-লিজ গ্রহণ করেন। অবিনাশবাবু তাঁহার থিয়েটারের ম্যানেজার হন।

অবিনাশচন্দ্র করের অধ্যক্ষতায় 'ন্যাশন্যাল থিয়েটারে' যে কয়েকখানি নাটক বা গীতিনাট্য অভিনীত হইয়াছিল, তন্মধ্যে গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়-প্রণীত 'কামিনীকুঞ্জ' গীতিনাট্যখানিই বিশেষরূপ উল্লেখযোগ্য। এই গীতিনাট্যখানি অভিনয়ে থিয়েটারের সুনাম হইয়াছিল।

রবিবারে অভিনয়

সান্যাল-ভবনে প্রথমতঃ সপ্তাহে শনিবার মাত্র রাত্রি ৯টার সময় অভিনয় আরম্ভ হইত; কিন্তু শনিবারে মফঃস্বলবাসী চাকুরীজীবিরা বাটী যাইতেন, বর্ত্তমান সময়ের

ন্যায় তাঁহারা daily passenger হইয়া প্রত্যহ বাটী হইতে যাতায়াত করিতেন না। তাঁহাদের সুবিধার নিমিত্ত তৎপরে বুধবারেও রাত্রি ৯টায় অভিনয় হইতে আরম্ভ হয়। অবিনাশবাবু একদিন রবিবার বেলা ২টার সময়, সখ করিয়া অভিনয় ঘোষণা করেন—তাহাতে খুব বিক্রয় হয়। সেই হইতে রবিবারেও অভিনয় চলিতে থাকে। ক্রমে সাধারণের সুবিধার নিমিত্ত তাহা সান্ধ্য অভিনয়ে দাঁড়ায়। অবিনাশবাবু উদ্যোগী পুরুষ ছিলেন। এতদ্দেশীয় অনাথ বালকগণের শিক্ষার নিমিত্ত সে সময়ে কলিকাতায় একটা সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই সভার সাহায্যার্থে তিনি তৎকালীন হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি গার্থ সাহেবের উপস্থিতি ও আনুকূল্যে 'ন্যাসন্যাল থিয়েটারে' 'নন্দন-কুসুম' নামক একখানি নূতন গীতিনাট্য অভিনয় করেন (২৬শে জুলাই ১৮৭৯ খ্রী)। এইরূপে প্রায় ছয় মাস কাটিল। তাহার পর নূতন নাটক জমাইতে না-পারিয়া 'শরৎ-সরোজিনী', 'বৃত্রসংহার' প্রভৃতি পুরাতন নাটক অভিনয় করিয়া অবিনাশবাবু শেষে সম্প্রদায় লইয়া ঢাকায় অভিযান করেন (অগস্ট ১৮৭৯ খ্রী)। ঢাকায় একটী ষ্টেজ ছিল, সেই ষ্টেজ অধিকার করিয়া সম্প্রদায় অভিনয় ঘোষণা করিলেন। 'ন্যাসান্যাল থিয়েটারে'র আগমনে সহর সরগরম হইয়া উঠিল। হঠাৎ ঢাকার বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ-মধ্যে একটা মহা উত্তেজনার সৃষ্টি হইল। তথাকার বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণ বিজ্ঞাপন প্রচার করিলেন, কলিকাতা হইতে সমাগত 'ন্যাসান্যাল থিয়েটারে'র অভিনেত্রীগণ বারাঙ্গনা; সুতরাং এই বেশ্যা সংশ্লিষ্ট থিয়েটার দেখিতে যাওয়া কোন ছাত্রের কর্তব্য নহে। নিষেধ সত্ত্বেও যে ছাত্র অভিনয় দেখিতে যাইবে, তাহাকে বিদ্যালয় হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হইবে। বিদ্যালয়ের এই কড়া হুকুমজারিতে থিয়েটার সম্প্রদায়কে প্রথমে বিশেষ বিব্রত হইয়া পড়িতে হইয়াছিল, কিন্তু ঢাকার নবাব গনিমিঞা বাহাদুর এবং সুপ্রসিদ্ধ জমীদার মোহিনীমোহনবাবুর সহানুভূতি এবং আনুকূল্যে তাঁহাদিগকে বিশেষরূপ বেগ পাইতে হয় নাই। তথায় মাসাবধি অভিনয় করিয়া দ্বারভাঙ্গার মহারাজার রাজ্যাভিষেক উপলক্ষ্যে বায়না পাইয়া সম্প্রদায় বাঁকীপুরে যাত্রা করেন। বাঁকীপুর হইতে বেথিয়ার রাজবাটী—তথা হইতে কাশী, এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি স্থানে অভিনয় করিয়া ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমেই থিয়েটার কলিকাতায় প্রত্যাগমন করে। স্বত্বাধিকারী গোপীচাঁদবাবু সম্প্রদায়ের সহিত বিদেশে গিয়াছিলেন; কিন্তু নানা কারণে বিরক্ত হইয়া তিনি অবিনাশবাবুকে থিয়েটার ছাড়িয়া দিয়া কাশী হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন।

থিয়েটারে উপহার

বিদেশ হইতে আসিয়া অবিনাশবাবুর দল ভাঙ্গিয়া যায়। এই সময়ে কেদারনাথ চৌধুরীর মাতুল কালিদাস মিত্র 'ন্যাসান্যাল থিয়েটার' ভাড়া লইয়া অভিনয় চালাইতে ছিলেন। কয়েক মাস পরে তিনিও ছাড়িয়া দিলেন। তাহার পর অনেকেই কেহ-বা

এক মাসের জন্য কেহ-বা এক সপ্তাহের জন্য ভাড়া লইয়া অভিনয় করেন। এইরূপে থিয়েটারের অবস্থা চরম অবনতির পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। অবশেষে যোগেন্দ্রনাথ মিত্র (ওরফে লঙ্কা মিত্র) থিয়েটার ভাড়া লইয়া দর্শক সংখ্যা বাড়াইবার জন্য অঙ্গুরীয়, ইয়ারিং, আয়না, রুমাল, সাবান, এসেন্স প্রভৃতি উপহার দিতে আরম্ভ করেন। থিয়েটারে উপহার প্রদান এই প্রথম। গ্যালারি ও পিটের দর্শক সংখ্যা ইহাতে বাড়িয়া যায়। সর্ব্বশেষে তরমুজ, ফুটি, লাউ, কুমড়া প্রভৃতি ফলমূলাদি প্রদানে যোগেন্দ্রবাবু এ কার্য্যের চরম করেন। বলা বাহুল্য ইহার পরেই থিয়েটার বন্ধ হইয়া যায়। কিছুদিন পরে ভুবনমোহনবাবুর দেনার দায়ে থিয়েটার নিলামে উঠে, প্রতাপচাঁদ জহুরী নামক জনৈক মাড়োয়ারী 'ন্যাসান্যাল থিয়েটার' হাউস কিনিয়া লন।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ

প্রতাপচাঁদ জহুরীর 'ন্যাসান্যাল থিয়েটারে' গিরিশচন্দ্রের অধ্যক্ষতা গ্রহণ

এ পর্য্যন্ত বঙ্গীয় সাধারণ নাট্যশালার ইতিবৃত্ত যতদূর লিখিত হইল, তৎপাঠে পাঠকগণ কতকটা বুঝিতে পারিয়াছেন,—সান্ন্যাল-ভবনে টিকিট বিক্রয় করিয়া প্রথম পেশাদারী থিয়েটার খোলা হইলেও ব্যবসায়ী হিসাবে তাহা পরিচালিত হয় নাই। আয়-ব্যয়ের হিসাব, অভিনেতাদের বেতন ইত্যাদি সম্বন্ধে ইঁহাদের কোনওরূপ একটা পাকা ব্যবস্থা ছিল না। তাহার পর ভুবনমোহনবাবু বৃহৎ বাড়ী তৈয়ারী করিয়া যখন 'গ্রেট ন্যাসান্যাল থিয়েটার' খুলিলেন, তখনও হিসাব রাখিবার দস্তুরমত সুব্যবস্থা হয় নাই। একটা বড় ব্যবসা চালাইতে হইলে যেমন তাহার সকল দিকে সুশৃঙ্খলা স্থাপন এবং উপযুক্ত কর্ম্মচারী নিয়োগের আবশ্যক, তিনি সে বিষয়ে যত্নবান হন নাই। ইহার অন্য কারণ কিছুই নাই,—তিনি সখ করিয়া থিয়েটার করিয়াছিলেন, ব্যবসা করিব বলিয়া নহে। সখও সকল প্রকারে মিটাইয়াছিলেন। ঢোল বাজাইবার তাঁহার সখ ছিল,—কিছুদিন কনসার্ট পার্টির পার্শ্বে স্বতন্ত্র আসনে বসিয়া তাকিয়ায় হেলান দিয়া ঢোলও বাজাইলেন। দর্শকগণ কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া স্বত্বাধিকারীকে দেখিতেন। ফলতঃ ভুবন-মোহনবাবু সরল এবং আমোদপ্রিয় ছিলেন, বিনা পয়সায় আমোদ করিবার লোকেরও অভাব ছিল না। ক্রমে তিনি ঋণগ্রস্ত হইয়া থিয়েটার ভাড়া দিতে বাধ্য হইলেন। কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় হইতে আরম্ভ করিয়া বহু লোকই থিয়েটার ভাড়া লইয়া-ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কেহই ব্যবসাদার ছিলেন না। প্রায় সকলেই নাট্যা-মোদী অথবা অভিনেতা। একমাত্র গোপীচাঁদ শেঠি ব্যবসাদার ছিলেন, তিনিও থিয়েটারে লাভ না পাইয়া বিদেশে অভিনয়কালীন অবিনাশচন্দ্র করকে থিয়েটার ছাড়িয়া দেন। ভুবনমোহনবাবু থিয়েটার ভাড়া দিলেও তাঁহার সময়ে যেরূপ প্রত্যেক অভিনয়-রাত্রেই পান-ভোজনের ধূম চলিত,—অন্যান্য স্বত্বাধিকারিগণের সময়েও সম্প্রদায়-মধ্যে সে রোগ সংক্রামক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। যেদিন কিছু বেশী বিক্রয় হইত, সেদিন স্বত্বাধিকারীরও উদারতা বাড়িয়া যাইত, আয়-ব্যয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কেহই চলেন নাই।

সুশিক্ষিত নাট্যানুরাগিগণ সে সময়ে থিয়েটার দেখিতে আসিতেন বটে, এবং অভিনয়-নৈপুণ্য দর্শনে প্রশংসা করিতেন, কিন্তু তাঁহারা অভিনেতাদের সংসর্গ পছন্দ করিতেন না। মহিলাগণের জন্য থিয়েটারে প্রথমে আসনের পৃথক ব্যবস্থা ছিল না—

পরে হইয়াছিল, কিন্তু স্ত্রী-দর্শক অধিক হইত না। অভিনেতাদের পান-দোষের দুর্নাম শুনিয়া অনেকে বাটীর স্ত্রীলোকদের থিয়েটারে পাঠাইতে ইচ্ছা করিতেন না।

প্রতাপচাঁদ জহুরীর সময় থিয়েটারের এই ধারা সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইল। কর্ম্মচারিগণের নির্দ্দিষ্ট বেতন ও হাজিরা-বহি এবং আয়-ব্যয় ও হিসাব-নিকাশের জন্য দস্তুরমত খাতা বাহির হইল। এক কথায় থিয়েটারের নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইল।

প্রতাপচাঁদবাবু পাকা ব্যবসাদার ছিলেন। তিনি বিশেষ সন্ধানে বুঝিয়াছিলেন,—উপযুক্ত অভিনেতৃগণ কর্ত্তৃক ভাল নাটক অভিনীত হইলে থিয়েটারে যথেষ্ট অর্থাগম হয়;—তবে সুযোগ্য পরিচালক চাই। তাঁহার জহরতের দোকান ও অন্যান্য ব্যবসায় ছিল। থিয়েটারটীও একটী লাভজনক ব্যবসায়ে পরিণত করিবার জন্য তিনি বিশেষ উদ্যোগী হইলেন। প্রতাপচাঁদবাবু গিরিশচন্দ্রের প্রতিভার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকেই তাঁহার থিয়েটারের বেতনভোগী ম্যানেজার করিবার সঙ্কল্প করিলেন। গিরিশবাবু সে সময়ে পার্কার কোম্পানীর অফিসের বুককিপার ছিলেন; মাসিক দেড়শত টাকা বেতন পাইতেন। প্রতাপচাঁদবাবুর প্রস্তাবে গিরিশচন্দ্র বলিলেন, "আমি অফিসের কার্য্য বজায় রাখিয়া পূর্ব্বে যেরূপ সন্ধ্যার পর থিয়েটারে আসিয়া শিক্ষাদান এবং আবশ্যক-বোধে অভিনয় করিতাম,—আপনার থিয়েটারেও সেইরূপ করিব, ইহার জন্য কাহারও নিকট কখনও অর্থ গ্রহণ করি নাই,—আপনার নিকটও করিব না।" প্রতাপচাঁদবাবু বলিলেন, —"না না বাবু—তাহা হইবে না, দুই কার্য্য একজনের দ্বারা ভাল হয় না—আপনাকে অফিসের কার্য্য ছাড়িয়া দিয়া আমার থিয়েটারের সকল ভার লইতে হইবে। আমি এখন আপনাকে মাসিক একশত টাকা করিয়া বেতন দিব। থিয়েটারের যেরূপ মুনাফা বাড়িবে, আপনার বেতনও সেইরূপ বাড়িতে থাকিবে।"

প্রতাপচাঁদবাবুর উদ্যম ও আগ্রহ দর্শনে এবং তাঁহার বিষয়বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া গিরিশচন্দ্রের মনে উদয় হইয়াছিল—এরূপ একজন পাকা ব্যবসাদারের সহিত মিলিত হইয়া যদ্যপি থিয়েটারের পরিচালন-ভার গ্রহণ করি, তাহা হইলে মনোনীত অভিনেতা ও অভিনেত্রী গ্রহণে থিয়েটারে একটা সুশৃঙ্খলা স্থাপন এবং ভাল নাটক অভিনয়ে নাট্যশালারও উৎকর্ষতা সাধন করা যায়। থিয়েটারটী সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলে ভবিষ্যতে নাট্যাভিনয় করিয়া অনেকের উপজীবিকার পথও সুপ্রশস্ত হইবে। বহু চিন্তা করিয়া গিরিশচন্দ্র পার্কার কোম্পানীর অফিসের দেড়শত টাকা বেতনের কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া প্রতাপচাঁদবাবুর থিয়েটারে একশত টাকা বেতনে ম্যানেজারের পদ গ্রহণ করিলেন। থিয়েটারের কার্য্যে তিনি এই প্রথম বেতনভোগী হইলেন।

পাঠকগণ পূর্ব্বেই জ্ঞাত আছেন, পার্কার সাহেব গিরিশচন্দ্রকে অতিশয় স্নেহ করিতেন। তিনি গিরিশচন্দ্রকে অফিসের কার্য্যে নিযুক্ত রাখিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। অবশেষে অফিস ও থিয়েটারের উভয় কার্য্য করিতে বলিয়াছিলেন; বেলা ১২টার পর তাঁহাকে অফিসে আসিবার অনুমতি দিয়াছিলেন। তথাপি গিরিশ-চন্দ্রের মত পরিবর্ত্তন করিতে পারেন নাই। বিধাতা যাঁহার উপর রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত করিবার ভার দিয়া এখানে পাঠাইয়াছেন, তাঁহার মত পরিবর্ত্তন করিবে কে?—যাহাই

হউক অফিসের হিসাব-নিকাশ বুঝাইয়া দিয়া যেদিন গিরিশচন্দ্র পার্কার সাহেবের নিকট শেষ বিদায় গ্রহণ করেন, তিনি অশ্রুনয়নে স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ তাঁহাকে একটী হীরকাঙ্গুরীয় প্রদান করেন। সওদাগিরি অফিসের কার্য্য গিরিশচন্দ্রের জীবনে এখানেই শেষ।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

নাট্যকার-জীবনের সূত্রপাত

অগ্রজ অতুলকৃষ্ণ কর্ত্তৃক প্রতিহত হইয়া গিরিশচন্দ্র কেদারনাথ চৌধুরীকে অবলম্বন করিয়া নাট্যশালার শ্রীবৃদ্ধিসাধনে অগ্রসর হইয়াছিলেন। কিন্তু নানা কারণে কেদারবাবুর থিয়েটার স্থায়ী না হওয়ায়, তাঁহার সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই। এক্ষণে প্রতাপচাঁদবাবুর ন্যায় ধনাঢ্য ব্যবসায়ীর সহিত মিলিত হইয়া থিয়েটারটী যাহাতে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন, গিরিশচন্দ্র তদ্বিষয়ে অধিকতর মনোযোগী হইলেন। 'ন্যাসান্যালে'র প্রবীণ ও নবীন অভিনেতৃগণকে তিনি আবার সাদরে আহ্বান করিলেন। ইতিপূর্ব্বে তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই থিয়েটার ছাড়িয়া দিয়া নানা দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিলেন। দলপতির সাদর আহ্বানে আনন্দের সহিত আবার সকলে আসিয়া একত্রিত হইলেন। নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বহুকাল পূর্ব্বে থিয়েটাব ছাড়িয়া দিয়াছিলেন।* অর্দ্ধেন্দুবাবু এ সময়ে কলিকাতায় ছিলেন না, ভারতবর্ষে নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া নাট্যসম্প্রদায় গঠন এবং অভিনয়-বিদ্যা প্রচার করিয়া বেড়াইতেছিলেন। এ সময়ে সকলেই তাঁহার অভাব অনুভব করিলেন।

যাহা হউক, নাট্যশিল্পী ধর্ম্মদাস সুর, মহেন্দ্রলাল বসু, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু, মতিলাল সুর, অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেলবাবু), সঙ্গীতাচার্য্য রামতারণ সান্ন্যাল, অমৃতলাল মিত্র, নীলমাধব চক্রবর্ত্তী, অতুলচন্দ্র মিত্র (বেড়োল), ক্ষেত্রমণি, কাদম্বিনী, লক্ষ্মীমণি, নারায়ণী, শ্রীমতী বিনোদিনী, বনবিহারিণী প্রভৃতি অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণকে একত্রিত করিয়া গিরিশচন্দ্র নূতন থিয়েটারের ভিত্তি সুদৃঢ় করিলেন।

'হামির' নাটকাভিনয়

মনোমত সম্প্রদায় গঠিত করিয়া গিরিশচন্দ্র অতঃপর নূতন নাটক সংগ্রহে মনোনিবেশ করিলেন। সুপ্রসিদ্ধ 'মহিলা' কাব্য-প্রণেতা কবিবর সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার

* প্রথমা কন্যার বিবাহের সম্বন্ধ লইয়া বহুদিন ব্যস্ত থাকায় এবং অন্যান্য কারণে নগেন্দ্রবাবু দীর্ঘকাল থিয়েটারের সহিত পৃথক ছিলেন। তাহার পর আর রঙ্গালয়ে যোগদান করেন নাই।

মহাশয়কে তিনি বহুদিন পূর্ব্বে 'গ্রেট ন্যাসান্যাল থিয়েটারে'র জন্য একখানি ঐতিহাসিক নাটক লিখিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, সুরেন্দ্রবাবু টডের 'রাজস্থান' হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া 'হামির' নামক একখানি ঐতিহাসিক নাটক লিখিয়াছিলেন। নাটকখানি শেষ হইবার অল্পদিন পরেই তাঁহার মৃত্যু হয়। গিরিশচন্দ্র উক্ত নাটকের পাণ্ডুলিপিখানি কবিবরের ভ্রাতা দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয়ের নিকট হইতে আনাইয়া এই নাটক লইয়াই থিয়েটার খুলিবার অভিপ্রায় করিলেন। নাটকে গান ছিল না, "পদ্মিনীর গীত" বলিয়া একটী সুদীর্ঘ কবিতা ছিল মাত্র। আবশ্যকমত গিরিশচন্দ্র চারিখানি গান বাঁধিয়া ইহাতে সংযোজিত করেন। অতি যত্নের সহিত ইনি 'হামিরে'র শিক্ষাপ্রদান করেন এবং মনোমত করিয়া যথাযথ দৃশ্যপট এবং পোষাক-পরিচ্ছদ প্রস্তুত করান। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী তারিখে মহাসমারোহে 'হামিরে'র অভিনয় ঘোষিত হয়।

হামিরের ভূমিকা গিরিশচন্দ্র স্বয়ং গ্রহণ করেন। উদয়ভট্ট, জাল, বীলনদেব, কমলা, লীলা এবং পান্নার ভূমিকা যথাক্রমে মহেন্দ্রলাল বসু, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু, অমৃতলাল মিত্র, কাদম্বিনী, শ্রীমতী বিনোদিনী এবং বনবিহারিণী অভিনয় করিযাছিলেন।

'হামির' হইতে আরম্ভ করিয়া সামান্য দূতের ভূমিকাটীর পর্য্যন্ত নিখুঁত অভিনয় দর্শনে দর্শকগণ সাতিশয় প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন। চিতোরের দুর্গতোরণ প্রদর্শনে ধর্ম্মদাসবাবু বিশেষরূপে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও 'হামির' উচ্চ শ্রেণীর নাটক বলিয়া শিক্ষিত নাট্যামোদিগণের নিকট গৃহীত হয় নাই। সুরেন্দ্রবাবু অসাধারণ কবি হইলেও নাটক-রচনার উদ্যম তাঁহার এই প্রথম। যখন এই নাটকখানি রচিত হয়, তখন তাঁহার জীবন-নাটকের যবনিকা পতনের অধিকদিন বিলম্ব ছিল না এবং তাঁহার প্রতিভাও নিষ্প্রভ হইয়া আসিতেছিল। গিরিশচন্দ্রও কবির প্রতি অসামান্য শ্রদ্ধাবশতঃ নাটকখানির কোনওরূপ পরিবর্ত্তন করেন নাই। নাট্যকার এ সময জীবিত থাকিলে হয়তো উভয-শক্তির সম্মিলনে নাটকখানির অধিকতর উৎকর্ষ সাধিত হইত।

'হামির' অভিনয়ের পর গিরিশচন্দ্র ভাল নাটকের অভাব বড়ই অনুভব করিতে লাগিলেন। দীনবন্ধু মিত্র, মধুসূদন দত্ত এবং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গ্রন্থগুলির অভিনয় পুরাতন হইয়া গিয়াছে। উৎকৃষ্ট নাটকের অভিনয় দর্শন করিয়া দর্শকগণও আর নিম্নশ্রেণীর নাটকাভিনয় দেখিতে চাহেন না এবং অভিনেতারাও অভিনয় করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন না। গিরিশচন্দ্র মহাসমস্যায় পড়িলেন। তিনি ক্ষমতাশালী লেখকগণকে উৎসাহিত করিবার নিমিত্ত থিয়েটারের হ্যাণ্ডবিলের নিম্নে উৎকৃষ্ট নাটকের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করিয়া বিজ্ঞাপন দিতে লাগিলেন।

ইহার তিনটী কন্যা ছিল। ১মা কন্যা ধরাসুন্দরী। প্রাতঃস্মরণীয় ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের পুত্র রায় বাহাদুর মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়ের সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। ইঁহারই কন্যাদ্বয় স্বর্গীয়া ইন্দিরা দেবী এবং শ্রীমতী অনুরূপা দেবী উৎকৃষ্ট উপন্যাস রচনায় বঙ্গসাহিত্যে যশস্বিনী হইয়াছেন। ২য়া কন্যা ব্রজসুন্দরী। ৩য়া কন্যা পুরসুন্দরী। পুরসুন্দরীর জ্যেষ্ঠ পুত্র সুসাহিত্যিক ও ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

ভাল নাটকের প্রতীক্ষায় থাকিয়া ইতিমধ্যে তিনি 'ন্যাসান্যাল থিয়েটারে'র জন্য 'মায়াতরু' ও 'মোহিনী প্রতিমা' নামক দুইখানি গীতিনাট্য এবং 'আলাদিন' নামক একখানি পঞ্চরং রচনা করেন। 'মায়াতরু' ১২৮৭ সাল, ১০ই মাঘ তারিখে এবং 'মোহিনী প্রতিমা' ও 'আলাদিন' একসঙ্গে ২৮শে চৈত্র তারিখে অভিনীত হয়।

'মায়াতরু'

'মায়াতরু' গীতিনাট্যের প্রথমাভিনয় রজনীর অভিনেতৃগণ :

চিত্রভানু	মহেন্দ্রলাল বসু।
সুব্রত	রামতারণ সান্যাল।
দমনক	বেলবাবু [অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়]।
মার্কণ্ড	বিহারীলাল বসু।
উদাসিনী	ক্ষেত্রমণি।
ফুলহাসি	শ্রীমতী বিনোদিনী।
ফুলধূলা	শ্রীমতী বনবিহারিণী। ইত্যাদি।

'মায়াতরু' গীতিনাট্যখানি সর্ব্বজন সমাদৃত হইয়াছিল। ইহার গানগুলি অতি সুন্দর। সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র 'মায়াতরু' অভিনয় দেখিতে আসিয়া "না জানি সাধের প্রাণে, কোন প্রাণে প্রাণ পরায় ফাঁসি!"* গীত শ্রবণে গিরিশচন্দ্রের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া যান। ব্রাহ্ম-সমাজের আচার্য্য স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয় "পবিত্র সঙ্গীত রসে মাতাও হৃদয়!" গীত শ্রবণে বলিয়াছিলেন, "রচয়িতা একজন উচ্চদরের কবি হইবে এবং তাহার ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইবে"। 'মায়াতরু'র সর্ব্বশেষ "হাস'রে যামিনী হাস' প্রাণের হাসিরে!" সঙ্গীতটী সাধারণের মুখে-মুখে এতটা প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছিল, যে রাস্তার গাড়োয়ানেরা পর্য্যন্ত এই গানখানি গাহিতে-গাহিতে চলিত।

'মোহিনী প্রতিমা'

'মোহিনী প্রতিমা' গীতিনাট্যখানি একটু উচ্চভাবাপন্ন হইয়াছিল। গিরিশচন্দ্র এই গীতিনাট্যের নায়িকা সাহানার মুখে একটী গল্প বলাইয়াছেন,— "একটী স্ত্রীলোক একজনের জন্য ভেবে-ভেবে পাষাণ হয়েছিল, সে সত্যকালের কথা। পাষাণ মূর্ত্তি হ'য়ে

* ফুলহাসির নিমিত্ত গিরিশচন্দ্র প্রথমে এই গীতের প্রথম ছত্রটী এইরূপ রচনা করিয়াছিলেন— "না জানি স্বাধীন প্রাণে কোন প্রাণে প্রাণ পরায় ফাঁসি!" ফুলহাসির ভূমিকা নাট্যসম্রাজ্ঞী শ্রীমতী বিনোদিনী দাসী গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি "না জানি সাধের প্রাণে" বলিয়া গানখানি গাহিতেন। সেই হইতে "স্বাধীন" স্থলে "সাধের" কথাটী চলিয়া যায়। পুস্তকেও সেইরূপ প্রকাশিত হয়।

কতদিন থাকে; দৈবে একদিন যার জন্ম পাষাণ হয়েছিল, সে তার কাছে উপস্থিত। পাষাণ-প্রতিমা মনে-মনে ভাবলে যে, হে পরমেশ্বর! আমি তো পাষাণ, কিন্তু যদি এক মুহূর্ত্তের জন্ম মানুষ হই, তাহলে আমি উহার সঙ্গে কথা কই,—বলতেই মানুষ হল।"

প্রেমের এই গভীরতা লইয়া গীতিনাট্যখানি রচিত হয়। ভাবুক দর্শকগণের নিকট ইহা প্রশংসিত হইয়াছিল।

প্রথম অভিনয় রজনীর অভিনেতৃগণ:

হেমন্ত	রামতারণ সান্যাল।
জম্বুভয়	বিহারীলাল বসু।
মহীন্দ্র	মহেন্দ্রলাল বসু।
নীহার	শ্রীমতী বনবিহারিণী।
সাহানা	শ্রীমতী বিনোদিনী।
কুসুম	কাদম্বিনী। ইত্যাদি।

পাঠকগণকে লক্ষ্য করিয়া সুকবি কেদারনাথ চৌধুরী মহাশয় নিম্নলিখিত কবিতাটী রচনা করিয়াছিলেন, 'মোহিনী প্রতিমা' পুস্তকেব প্রচ্ছদ-পৃষ্ঠায তাহা প্রকাশিত হইয়াছিল। যথা:—

"পাঠক ধীমান্—

পাষাণে প্রেমের স্থান, পাষাণে (ও) গলে প্রাণ,
পাষাণে প্রেমেব খেলা, কোথা তার সীমা?
প্রতি দিন আশা যায়, পাষাণ ফিরিয়া চায়,
পাষাণে অঙ্কিত দেখে মোহিনী প্রতিমা।"

'আলাদিন'

পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে, 'মোহিনী প্রতিমা' ও 'আলাদিন' একসঙ্গে অভিনীত হইয়াছিল। 'মোহিনী প্রতিমা' যেমন একটু ভারি হইয়াছিল,—'আলাদিন' সেইরূপ হাল্‌কা করিয়া একটু নূতন ঢংয়ে রচিত হইয়াছিল। প্রথমাভিনয রজনীর অভিনেতা ও অভিনেতৃগণ:

কুহকী	গিরিশচন্দ্র ঘোষ।
আলাদিন	রামতারণ সান্যাল।
বাদশাহ	মহেন্দ্রলাল বসু।
উজীর	নীলমাধব চক্রবর্ত্তী।
উজীর-পুত্র	শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ দত্ত।
কলু	গিরীন্দ্রনাথ ভদ্র।

জিনি	বেলবাবু [অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়]।
আলাদিনের মাতা	ক্ষেত্রমণি।
বাদশাহ-কন্যা ও পরী	শ্রীমতী বিনোদিনী।
দাসী	নারায়ণী। ইত্যাদি।

দৃশ্যপট উত্থিত হইলেই "কার তোয়াক্কা রাখি আর" শীর্ষক গীতটী নৃত্য সহকারে গাহিতে-গাহিতে "চীনেম্যানের" বেণী দুলাইয়া 'আলাদিন' যখন রঙ্গমঞ্চে বাহির হইত, দর্শকগণ আনন্দে যেন মাতিয়া উঠিত। গিরিশচন্দ্র কুহকীর ভূমিকা অদ্ভুত অভিনয় করিযাছিলেন। যখন তিনি যাদুদণ্ড ঘুরাইয়া মন্ত্রোচ্চারণ এবং "ল্যাড়্ খারে" বলিয়া আলাদিনকে সম্বোধন করিতেন, তখন তাঁহার সেই যাদুমিশ্রিত বিস্ফারিত রক্তিম চক্ষু এবং অপূর্ব্ব কণ্ঠস্বরে শুধু আলাদিন নহে, দর্শকগণ পর্যন্ত অভিভূত হইয়া পড়িতেন। আলাদিনের মাতা, বাদশাহ, উজীর প্রভৃতির ভূমিকাভিনয়ে হাস্যরসের ফোয়ারা ছুটিত। এই পঞ্চরংখানি সাধারণ দর্শকশ্রেণীর এতই মুখরোচক হইয়াছিল, যে এখনও পর্যন্ত অভিনয় ঘোষণা করিলে রঙ্গালয়ে যথেষ্ট লোকসমাগম হইয়া থাকে।

'আনন্দ রহো'

বিজ্ঞাপন ঘোষণা করিয়াও গিরিশচন্দ্র যখন মনোমত নাটক প্রাপ্ত হইলেন না, তখন তিনি স্বয়ং নাটক লিখিবার সঙ্কল্প করিলেন। উত্তরকালে গিরিশচন্দ্র প্রায়ই বলিতেন আমি সখ করিয়া নাটক লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। 'আনন্দ রহো' তাঁহার প্রথম নাটক। ৯ই জ্যৈষ্ঠ (১২৮৮ সাল) 'ন্যাসান্যাল থিয়েটারে' ইহার প্রথম অভিনয় হয়।

রাণা প্রতাপসিংহের সহিত আকবরের যুদ্ধ-সংক্রান্ত সন্ধি-প্রস্তাব ইত্যাদি কতকটা ঐতিহাসিক ঘটনা থাকিলেও অন্যান্য কাল্পনিক চরিত্রের অবতারণায় এবং রহস্যপূর্ণ নানা ঘটনা সমাবেশে 'আনন্দ রহো' নাটকখানি যেরূপ গ্রথিত হইয়াছে, তাহাতে ইহাকে ঠিক ঐতিহাসিক নাটক বলা যায় না। ইহার প্রধান চরিত্র বেতাল। নাটকেই প্রকাশ—"যেখানে-সেখানে একটা বেতাল কথা কয়ে ফেলে—তাই ওর নাম বেতাল।" বেতাল চরিত্র গিরিশচন্দ্রের সম্পূর্ণ নূতন ও অপূর্ব্ব সৃষ্টি। এই সময়ে ইনি ইচ্ছা-শক্তি (will-force) এবং মন্ত্র-শক্তির বিশেষরূপ আলোচনা করিতেছিলেন,—'আনন্দ রহো' নাটকে গুরুমন্ত্র সাধনা সম্বন্ধে তাঁহার তৎকালীন মানসিক ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। বেতাল নিষ্কাম ও সদানন্দময়—জীবনের সকল অবস্থাতেই সে 'আনন্দ রহো' বলিত এবং সম্পদে, কি বিপদে—সকলকেই সে আনন্দে থাকিবার পরামর্শ দিত,—বেতালের এই উক্তি অনুসারেই নাটকের নাম 'আনন্দ রহো' হইয়াছে। মানসিক বলে বলীয়ান—সুখে-দুঃখে সমভাব—সদানন্দ ও নিঃস্বার্থ ও পরোপকারীর যে মহান চিত্র গিরিশচন্দ্র বেতাল চরিত্রে প্রথম ফুটাইবার চেষ্টা করিয়াছে,—উত্তরকালে 'শ্রীবৎস-চিন্তা'য় বাতুল, 'ভ্রান্তি'তে রঙ্গলাল, 'ছত্রপতি শিবাজী'তে গঙ্গাজী, 'অশোকে' আকাল

প্রভৃতি চরিত্রসৃষ্টি, তাহারই বিভিন্ন আকারের সম্পূর্ণ বিকাশ মাত্র। বেতালের ভূমিকা স্বয়ং গিরিশচন্দ্র অভিনয় করিয়া বিশেষরূপ নূতনত্ব দেখাইয়াছিলেন। অন্যান্য ভূমিকা যথা—আকবর ও রাণা প্রতাপ, সেলিম, মানসিংহ, ভামসা, মহিষী, লহনা এবং যমুনা যথাক্রমে অমৃতলাল মিত্র, অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু, মতিলাল সুর, ক্ষেত্রমণি, শ্রীমতী বিনোদিনী এবং কাদম্বিনী ভালই অভিনয় করিয়াছিলেন। কিন্তু তথাপি 'আনন্দ রহো' সাধারণের নিকট সেরূপ আদৃত হয় নাই। ইহার প্রধান কারণ, 'আনন্দ রহো' গিরিশচন্দ্রের নাটক রচনার প্রথম উদ্যম,—বহু বিদেশী নাটক ও গল্পের বহি পড়িয়া তাঁহার কল্পনাশক্তি এই নাটকে অসংযতভাবে পরিচালিত হইয়াছিল। আকবর-প্রাসাদে ভূগর্ভনিম্নস্থ কারাগার, সুড়ঙ্গ, ষড়যন্ত্র, নানারূপ রহস্যপূর্ণ ঘটনাবলী এই নাটকে সংযোজিত হইয়াছে। নাট্যোল্লিখিত পাত্রপাত্রীগণও যেন কুজ্ঝটিকায় আচ্ছন্ন, সুস্পষ্ট মূর্ত্তি লইয়া কেহই নয়ন-সম্মুখে উপস্থিত হয় না। বস্তুতঃ 'আনন্দ রহো' নাটকে গিরিশচন্দ্রের নাট্য-প্রতিভার ছায়া পতিত হইয়াছে মাত্র—কায়া গঠিত হয় নাই।

স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর-সম্পাদিত 'ভারতী' মাসিক পত্রিকায় এই নাটকের নিন্দা বাহির হইয়াছিল। সমালোচনার শেষ ছত্র এই—"গিরিশবাবুর লেখায় আমরা এরূপ কল্পনার অরাজকতা আশা করি নাই।" বহুকাল পরে 'মিনার্ভা থিয়েটারে' 'আকবর' নাম দিয়া 'আনন্দ রহো' পুনরভিনীত হইয়াছিল। ইদানীং ইহার আর অভিনয় হয় না বটে, কিন্তু এই নাটকের "নেচে নেচে আয় মা শ্যামা" গীতটী এখনও ভিখারিগণ পর্যন্ত গাহিয়া থাকে।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

নাট্যশক্তির বিকাশ

বঙ্গ-নাট্যশালায় প্রথম ঐতিহাসিক নাটক অভিনীত হয় মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'কৃষ্ণকুমারী'। পাশ্চাত্য প্রথায় নাটক রচনার ইনিই প্রথম প্রবর্ত্তক। তাহার পর 'বেঙ্গল থিয়েটারে' যখন বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' নাট্যাকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া অভিনীত হইল, সেই আদর্শেই 'পুরুবিক্রম', 'সরোজিনী', 'অশ্রুমতী', 'হামির', 'আনন্দ রহো' প্রভৃতি নাটক রচিত হইয়া থাকে। কিন্তু ইহাদিগকে ঠিক ঐতিহাসিক নাটক বলা যায় না, কারণ এইসকল নাটকে ইতিহাসের একটা কঙ্কাল থাকিত মাত্র, কাল্পনিক নায়ক-নায়িকার প্রণয়-কাহিনীর রক্ত মাংসেই ইহাদের দেহের পরিপুষ্টি সাধিত হয়। এই-জাতীয় নাটক 'আনন্দ রহো' পর্যন্ত (এই নাটকে একটু বাড়াবাড়ি হইয়াছিল) অভিনীত হইয়া কিছুকালের জন্য স্থগিত থাকে।

'সিরাজদ্দৌলা', 'মীরকাশিম', 'ছত্রপতি শিবাজী' প্রভৃতি প্রকৃত ঐতিহাসিক নাটক বহুকাল পরে রচিত হয়। যথাসময়ে তাহার আলোচনা করিব।

'রাবণবধ' অভিনয়

অতঃপর পৌরাণিক নাটক অভিনয়ের যুগ আরম্ভ হয়। গিরিশচন্দ্র 'হামির' বা 'আনন্দ রহো' অভিনয়ে দর্শক-হৃদয় সেরূপ আকৃষ্ট হইল না দেখিয়া, ধর্ম্মপ্রাণ বাঙ্গালীর প্রিয় সামগ্রী, পৌরাণিক চিত্র অঙ্কনে মনোযোগী হইলেন,—তিনি 'রাবণবধ' নাটক লিখিলেন। ইহাই তাহার দ্বিতীয় নাটক। 'রাবণবধ ১৬ই শ্রাবণ (১২৮৮ সাল) 'ন্যাসান্যাল থিয়েটারে' প্রথম অভিনীত হয়। প্রথম অভিনয় রজনীর অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ

রাম	গিরিশচন্দ্র ঘোষ।
লক্ষ্মণ	মহেন্দ্রলাল বসু।
ব্রহ্মা	নীলমাধব চক্রবর্ত্তী।
ইন্দ্র	অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেলবাবু)।
হনুমান	অঘোরনাথ পাঠক।

সুগ্রীব	উপেন্দ্রনাথ মিত্র।
রাবণ	অমৃতলাল মিত্র।
বিভীষণ	শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু।
নিকষা কালী দুর্গা ও ত্রিজটা	ক্ষেত্রমণি।
সীতা	শ্রীমতী বিনোদিনী।
মন্দোদরী	কাদম্বিনী। ইত্যাদি।

নাটকের প্রত্যেক ভূমিকা যেরূপ সুন্দর অভিনীত হইয়াছিল, অভিনয় দর্শনে দর্শক-হৃদয়ও সেইরূপ রসাপ্লুত হইয়া উঠিয়াছিল। এ পর্য্যন্ত গিরিশচন্দ্র সাধারণের নিকট একজন উৎকৃষ্ট অভিনেতা এবং আচার্য্য বলিয়াই পরিচিত ছিলেন,—'রাবণবধ' রচনার পর তিনি সাধারণের নিকট সুনিপুণ নাট্যকার বলিয়া অভিনন্দিত হন। নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় বলেন, "'রাবণবধ' নাটক যেদিন প্রথম অভিনীত হয়, আমাদের বড়ই ভাবনা হইয়াছিল—পৌরাণিক নাটক চলিবে কিনা? কিন্তু অভিনয়-কালীন যে সময়ে জগজ্জননীর অভয় পাইয়া রাবণ অবধ্য হইয়া উঠিয়াছে, রামচন্দ্র হতাশ হইয়া লক্ষ্মণ, বিভীষণ, সুগ্রীব, হনুমান প্রভৃতি নেতৃবৃন্দকে বলিতেছেন:—

দেহ সবে বিদায় আমায়,
সাগর-সলিলে—ত্যজিব তাপিত প্রাণ!

তখন লক্ষ্মণ ক্রোধান্ধ হইয়া বলিলেন:—

ব্রহ্মঅস্ত্র দিয়াছেন গুরু দান—
স্থাবর জঙ্গম, দেব নব, গন্ধর্ব্ব কিন্নর,
সৃষ্ট বস্তু যা আছে সংসারে—
এখনি দহিব আমি অস্ত্র-অগ্নি-তেজে।

তদুত্তরে রামচন্দ্র বলিতেছেন:-

কি কাজ সাধিবা ভাই, নাশিয়া সংসার
নাশিবে আমারে—যার তবে
বনবাসী তুমি রাজ্য পরিহরি,
নাশিবে জানকী
শক্তিশেল হৃদে ধরেছিলে যার তরে,
বিনাশিবে পবননন্দন হনু—
বারবার প্রাণদান মোরা
পাইয়াছি যাহার প্রসাদে,
ভস্ম হবে অযোধ্যা নগরী,—
সর্ব্বনাশ কর কি কারণ?

তাহার পর বলিলেন:—

হের রে তূণীরে মম—কাল সর্পাকৃতি শর,
শূল, চক্র, পাশ, দণ্ড আদি মহা অস্ত্র

কি আছে জগতে—
বিমুখিতে নাহি পারি কোদণ্ড-প্রভাবে ?
কিন্তু তথাপিও নারি বিনাশিতে দশাননে !
তারার চরণে ভক্তি-অস্ত্র বিনে
কি পারে বিন্ধিতে আর !

রামচন্দ্র-বেশী গিরিশচন্দ্রের জলদগম্ভীর কণ্ঠ হইতে যখন শেষ দুই ছত্র :—

তারার চরণে ভক্তি-অস্ত্র বিনে
কি পারে বিন্ধিতে আর !

উচ্চারিত হইল, তখন দর্শকমণ্ডলী ভক্তিবিহ্বল কণ্ঠে যেরূপ সমবেত উল্লাসধ্বনি করিয়া উঠিলেন, তখনি আমাদের মনে হইল, এ নাটক চলিবে, ভক্তিপ্রধান বাঙ্গালী তাহার জন্মগত সংস্কার ভুলে নাই—ধর্ম্মপ্রাণ জাতির মর্ম্মস্থান এ নাটক ঠিক স্পর্শ করিয়াছে ।"

গৈরিশী ছন্দ

'রাবণবধ' নাটকে গিরিশচন্দ্র ভাঙ্গা অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রথম প্রবর্ত্তিত করেন। মধুসূদন তাঁহার 'মেঘনাদবধ কাব্য' অমিত্রাক্ষর ছন্দে প্রথম প্রচলন করিলেও পয়ারের ন্যায় চতুর্দ্দশ অক্ষর বজায় রাখিয়াছিলেন,—এই চতুর্দ্দশাক্ষরে আবদ্ধ থাকিয়া অনেক সময়ে ছন্দের স্বচ্ছন্দগতি ব্যাহত হয়, 'মেঘনাদবধ' অভিনয় ও তাহার শিক্ষাদানকালে গিরিশচন্দ্র ইহা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। যথা :—

"সত্য যদি রামানুজ তুমি, ভীমবাহু
লক্ষ্মণ," ইত্যাদি।

চতুর্দ্দশ অক্ষরের বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিলে ছন্দ আরও স্বাধীনতা প্রাপ্ত ও সুমধুর হয় এবং তাহা অধিকাংশ স্বল্পশিক্ষিত অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণেব আয়ত্তাধীন করিবার পক্ষেও বিশেষ সুবিধা হয়—গিরিশচন্দ্রের এই ধারণা জন্মে। এই অভাব পূরণের নিমিত্ত যখন তিনি চিন্তা করিতেছিলেন, হঠাৎ একদিন স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' গ্রন্থের প্রচ্ছদ-পৃষ্ঠায় (title page) মুদ্রিত কয়েক ছত্র কবিতার প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়ে। যথা :—

"হে সজ্জন !
স্বভাবের সুনির্ম্মল পটে,
রহস্য-রসের রঙ্গে,
চিত্রিনু চরিত্র দেবী সরস্বতী-বরে ;
কৃপা-চক্ষে হের একবার,
শেষে বিবেচনামতে,
তিরস্কার কিংবা পুরস্কার যাহা হয়,

দিও তাহা মোরে,
বহু মানে লব শির পাতি।”

গিরিশচন্দ্রের মুখে শুনিয়াছি, এই ভাঙ্গা অমিত্রাক্ষর ছন্দে গ্রথিত কবিতাটী পাঠ করিয়া তিনি পরম উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছিলেন ; তিনি যেমনটী চাহিতেছিলেন, কালীপ্রসন্নবাবু যেন তাঁহার মনোভাব পূর্ব্ব হইতে জানিতে পারিয়াই নমুনাস্বরূপ এই কয়েক ছত্র লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। যাহাই হউক, এই ছন্দই নাটকের উপযোগী বলিয়া তিনি গ্রহণ করিলেন এবং 'রাবণবধ' হইতে আরম্ভ করিয়া 'সীতার বনবাস', 'অভিমন্যুবধ', 'লক্ষ্মণ বর্জ্জন' প্রভৃতি যে সকল পৌরাণিক দৃশ্যকাব্য তিনি রচনা করেন, সকলগুলিতেই এই ছন্দ ব্যবহার করিতে লাগিলেন। সরল, সুমিষ্ট এবং সহজায়ত্ত হওয়ায় গিরিশচন্দ্রের প্রবর্ত্তিত এই ভাঙ্গা অমিত্রাক্ষর ছন্দে বঙ্গ-রঙ্গালয়ে বহুসংখ্যক নাটক রচিত হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে।

অনেক সময় দেখা যায়, প্রতিভাশালী ব্যক্তি কোনও একটা নূতন জিনিষ সৃষ্টি করিলে প্রথমে তাঁহাকে সাধারণের নিকট লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়। মধুসূদন যে সময়ে অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রথম প্রবর্ত্তন করিয়া 'মেঘনাদবধ কাব্য' বাহির করেন, সে সময়ে তাঁহাকে উপহাস করিয়া 'ছুছুন্দরীবধ' কাব্য প্রকাশিত হয়। গিরিশচন্দ্রেরও এই ভাঙ্গা অমিত্রাক্ষর ছন্দ বাহির হইলে অনেকেই বলিয়াছিলেন, "শ্লেটে গদ্য লিখিয়া তাহার দুই দিক মুছিয়া দাও, দেখিবে—'গৈরিশী ছন্দ' হইয়াছে।"

কিন্তু এই নূতন ছন্দ প্রকাশিত হইলে, লক্ষ্মী ও সরস্বতীর আনন্দ-নিকেতন যোড়াসাঁকোর সুপ্রসিদ্ধ ঠাকুরবাড়ী হইতে গিরিশচন্দ্র প্রথম হইতেই বিশেষরূপ উৎসাহ প্রাপ্ত হন। স্বর্গীয় দার্শনিক পণ্ডিত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর-সম্পাদিত 'ভারতী' মাসিক পত্রিকায় বাহির হয়,—"আমরা শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্রের নূতন ধরনের অমিত্রাক্ষর ছন্দের বিশেষ পক্ষপাতী। ইহাই যথার্থ অমিত্রাক্ষর ছন্দ। ইহাতে ছন্দের পূর্ণ স্বাধীনতা ও ছন্দের মিষ্টতা উভয়ই রক্ষিত হইয়াছে। কি মিত্রাক্ষরে কি অমিত্রাক্ষরে অলঙ্কার শাস্ত্রোক্ত ছন্দ না থাকিয়া হৃদয়ের ছন্দ প্রচলিত হয়, ইহাই আমাদের একান্ত বাসনা ও ইহাই আমরা করিতে চেষ্টা করিয়া আসিতেছি। গিরিশবাবু এ বিষয়ে আমাদের সাহায্য করাতে আমরা অতিশয় সুখী হইলাম।" ('ভারতী', মাঘ ১২৮৮ সাল)

১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দ, ২৩শে এপ্রিল তারিখে গিরিশচন্দ্র মহাকবি নবীনচন্দ্র সেনকে রেঙ্গুনে যে পত্র লিখেন, তন্মধ্যে গৈরিশী ছন্দের একটা কৈফিয়ৎ দিয়াছিলেন। নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম। এতৎপাঠে এই ছন্দ-প্রচলনের প্রয়োজনীয়তা কি—প্রবর্ত্তকের মুখেই তাহা পরিস্ফুট হইয়াছে।—

"... তুমি যুদ্ধ না করিলে কি হয়? আমি যুদ্ধ ক'রবো। যুদ্ধ আর কিছু নয়, 'গৈরিশী ছন্দের' একটা কৈফিয়ৎ। 'গৈরিশী ছন্দ' বলিয়া যে একটা উপহাসের কথা আছে, তার প্রতিবাদ। প্রতিবাদ এই, আমি বিস্তর চেষ্টা ক'রে দেখেছি, গদ্য লিখি সে এক স্বতন্ত্র, কিন্তু ছন্দোবন্ধ ব্যতীত আমরা ভাষা-কথা কইতে পারি না। চেষ্টা করলেও ভাষা-কথা কইতে গেলেই ছন্দ হবে। সেইজন্য ছন্দে কথা—নাটকের উপযোগী। উপস্থিত দেখা

যাক, কোন্ ছন্দে অধিক কথা হয়। দীর্ঘ ত্রিপদী, লঘু ত্রিপদী বা যে যে ছন্দ বাঙ্গালায় ব্যবহার হয়, সকলগুলি পয়ারের অন্তর্গত। অমিত্রাক্ষর ছন্দ পড়িবার সময় আমার যেমন ভাঙ্গা লেখা, তেমনি ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়তে হয়। যেখানে বর্ণনা, সেখানে স্বতন্ত্র, কিন্তু যেখানে কথাবার্ত্তা—সেইখানেই ছন্দ ভাঙ্গা। তারপর দেখা যাউক, কোন্ ছন্দ অধিক। দীর্ঘ ত্রিপদীর দ্বিতীয় চরণের সহিত শেষ চরণ মিলিত হইয়া অধিকাংশ কথা হয়:—

'…দেখিলাম সরোবরে, কমলিনী বান্ধিয়াছে করী।'

লঘু ত্রিপদীর দ্বিতীয় চরণ ও শেষ চরণ অনেক মিলিত হয়:—

' বিরস বদন, রাণীর নিকট যায়।'

এ সওয়ায় পয়ার, লঘু ত্রিপদীর এক এক পদ বিশেষতঃ শেষ পদ পুনঃ পুনঃ ব্যবহৃত হয়। আমার কথা এই যে, এ স্থলে নাটকে চৌদ্দ অক্ষরে বাঁধা পড়া কেন? চৌদ্দ অক্ষরে বাঁধা পড়লে দেখা যায় সময়ে-সময়ে সরল যতি থাকে না:—

'বীরবাহু, চলি যবে গেলা যমপুরে
অকালে।'

এইরূপ হামেসা-ই হবে। বাঙ্গালা ভাষায় ক্রিয়া 'হইযাছিল' প্রভৃতি অনেক সময়েই যতি জড়িত করিবে। কিন্তু 'গৈরিশী ছন্দে' সে আশঙ্কা নাই। যতি সম্পূর্ণ করিয়া সহজেই লেখা যাইবে। আর এক লাভ, ভাষা নীচ হ'তে বিনা চেষ্টায় উচ্চ স্তরে সহজেই উঠ্‌বে। সে সুবিধা চৌদ্দয় কিছু কম। কাব্যে তার বিশেষ প্রয়োজন নাই; কিন্তু নাটকে অধিকাংশ সময় তার প্রয়োজন।"

সাহিত্যরথী স্বর্গীয় অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়, তাঁহার 'সাধারণী' পত্রিকায় গিরিশচন্দ্রের প্রবর্ত্তিত এই ভাঙ্গা ছন্দের উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছিলেন, "এতদিনে নাটকের ভাষা সৃজিত হইয়াছে।"

চৌদ্দ অক্ষরে লেখা যে অধিক কঠিন নয়, তাহা দেখাইবার জন্য তিনি 'চণ্ড', 'মুকুল-মুঞ্জরা' এবং 'কালাপাহাড়' নাটক চতুর্দ্দশাক্ষরযুক্ত অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচনা করিয়াছিলেন।

'রাবণবধ' নাটকের সমালোচনা ইত্যাদি

শুধু ছন্দ সম্বন্ধে নহে, ১২৮৮ সালের মাঘ মাসের 'ভারতী'তে গিরিশচন্দ্রের 'রাবণবধ' এবং সেই সঙ্গে 'অভিমন্যুবধ' নাটকেরও উচ্চ প্রশংসা বাহির হইয়াছিল। সমালোচনা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি:—

"কি তাঁহার 'অভিমন্যুবধ', আর কি তাঁহার 'রাবণবধ'—এই উভয় নাটকেই তিনি রামায়ণ ও মহাভারতের নায়ক ও উপনায়কদের চরিত্র অতি সুন্দররূপে রক্ষা করিতে পারিয়াছেন। ইহা সামান্য সুখ্যাতির কথা নহে। এক খণ্ড কয়লার মধ্যে সূর্য্যের

আলোক ত প্রবেশই করিতে পারে না, কিন্তু এক খণ্ড স্ফটিকে শুদ্ধ যে সূর্য্যকিরণ প্রবেশ করিতে পারে এমন নয়, আবার স্ফাটিক্যগুণে সেই কিরণ সহস্রবর্ণে প্রতিফলিত হইয়া সূর্য্যের মহিমা ও স্ফটিকের স্বচ্ছতা প্রচার করে। শ্রীযুক্ত গিরিশবাবুর কল্পনা সেই স্ফটিকখণ্ড এবং তাঁহার 'অভিমন্যুবধ' ও 'রাবণবধ' প্রকৃত রামায়ণ ও মহাভারতের প্রতিফলিত রশ্মিপুঞ্জ। তাঁহার 'রাবণবধে' যদিও রাম-লক্ষ্মণের প্রকৃতি বিশেষরূপে পরিস্ফুট হয় নাই, তবুও তাঁহার রাবণ ও মন্দোদরী এমন জীবন্ত হইয়াছে, যে সেইজন্যই 'রাবণবধ' নাটকখানি এত প্রীতিকর লাগে। রাবণের মহান বীরত্ব ও মন্দোদরীর কবিত্বময় তেজস্বিতা এত পরিস্ফুটরূপে 'রাবণবধ' নাটকে প্রতিফলিত হইয়াছে যে তাহার উপর আমাদের একটী কথা কহিবার আবশ্যক নাই। বিশেষতঃ দেবী আরাধনা ও দেবীস্তোত্রগুলি অতি সুন্দর হইয়াছে। কেবল মৃত্যুবাণ আনয়ন ঘটনাটী ও সেই স্থানের বর্ণনাটী আমাদের বড় মনঃপূত হয় নাই।"

'ভারতী'র লেখক বোধহয় ততটা ভাবিয়া দেখেন নাই, থিয়েটারে শিক্ষিত, অশিক্ষিত সকল শ্রেণীরই দর্শক আসিয়া থাকে। সাধারণ শ্রেণীর প্রীতির নিমিত্ত নাটকে তরল হাস্যরসের দুই-একটা দৃশ্য সংযোজনার এইজন্যই প্রয়োজন হয়। রাবণের মৃত্যুবাণ সংগ্রহের নিমিত্ত বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ-বেশী হনুমান লঙ্কায় প্রবেশ করিয়া মন্দোদরীর পূজা-মন্দিরে প্রবেশকালীন ত্রিজটা কর্ত্তৃক বাধা পাইয়া কৃত্রিম কোপে বলিতেছে :—

"হনুমান। গেয়ে পূজোর কলা গণ্ডা গণ্ডা,
তুই বেটী হ'যেছিস ষণ্ডা,
উগ্রচণ্ডা বাকি্য বেটী ছাড়তো।
দোরে ছিল চাঁপদেড়ে,
বামুন দেখে দেছে ছেড়ে,
বেটী এলি খোবনা নেড়ে?
ত্রিজটা। বুড়োর ভেলা বাড়তো।
দাঁড়া, লাগাই তোরে তিন সোঁটা,
কপালে কেটেছিস ফোঁটা—
মাথায় তোর তরমুজের সোঁটা
উপড়ে নেব টেনে।" ইত্যাদি

সমস্ত নাটকের মধ্যে মাত্র এই একটী হাস্যরসাত্মক দৃশ্য। তাহা হইতেও বঞ্চিত করিতে যাইলে বেচারীদের উপর বড়ই অবিচার করা হয়। অবশ্যই সুরুচির গণ্ডী পার না হইলে যে হাস্যরসের অবতারণা করা যায় না, এ কথা বলা ভুল; কিন্তু ইহাও এ স্থলে বলা আবশ্যক, সে সময়ে সমস্ত বঙ্গদেশে যাত্রা ও কবির দলের পূর্ণ প্রভাব, এবং যাত্রায় কুরুচিপূর্ণ সংয়ের তখন বড়ই আদর। বলা বাহুল্য, গিরিশচন্দ্র তাঁহার রচনায় কুত্রাপি কুরুচির পোষকতা করেন নাই। তবে নাটকে জীবন্ত চরিত্র-অঙ্কনের প্রয়াসে, সময়ে-সময়ে গ্রাম্য ও চলিত (colloquial) ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন—এই মাত্র।

এক্ষণে গিরিশচন্দ্রের ভাষার প্রাঞ্জলতা ও রস-মাধুর্য্যের দৃষ্টান্তস্বরূপ সীতা দেবীর

মুখ-নিঃসৃত কয়েকছত্র পাঠকগণকে শুনাইতেছি। এই দৃশ্য অভিনয়কালীন এমন দর্শক ছিল না, যিনি অশ্রুবর্ষণ না করিয়া থাকিতে পারিতেন। 'রাবণবধে'র পর অশোক-কানন হইতে রামচন্দ্র-সম্মুখে সীতা দেবী আনীতা হইলে রামচন্দ্র বলিলেন :—

"শুন শুন জনকনন্দিনি,
রঘুকুলবধূ তুমি,
করিলাম দুষ্কর সমর—
রাখিতে বংশের মান ;
ছিলে দশ মাস রাক্ষসের ঘরে,
অযোধ্যা নগরে
না পারিব লইতে তোমারে,
না পারিব কুলে দিতে কালি,
যথা ইচ্ছা করহ গমন।"

উত্তরে সীতা দেবী যাহা বলিলেন, তাহার শেষাংশ এই :—

"কোন্ দোষে অপরাধী শ্রীচরণে ?
কহ, অধীনীরে কেন ত্যজ গুণনিধি ?
সতী নারী আমি,
কহি চন্দ্র-সূর্য্য সাক্ষী করি,—
সাক্ষী মম দিবস শর্ব্বরী,
সাক্ষী রুক্ষ কেশ, মলিন বসন,
সাক্ষী শীর্ণকায়,
সাক্ষী আপাদমস্তক বেত্রাঘাত,—
সাক্ষী বয়ানে রোদন-চিহ্ন
সাক্ষী দেখ নয়নের নীর
ঝরিতেছে অবিরল,
সাক্ষী পবননন্দন হনু,
সাক্ষী বিভীষণ,—
সাক্ষী নাথ, তোমার অন্তর!"

গিরিশচন্দ্রের প্রথম উদ্যমে রচিত নাটকের অনেক স্থানেই এইরূপ ভাবের সুগন্ধ আঘ্রাণে মুগ্ধ হইতে হয়।

'রাবণবধ' নাটকে বর্ণিত শ্রীরামচন্দ্রের দুর্গোৎসব মূল বাল্মীকির রামায়ণে নাই, ইহা কৃত্তিবাসের রামায়ণে আছে। গিরিশচন্দ্রের বাল্য-ইতিহাসে লিখিয়াছি,—শৈশবকাল হইতেই কৃত্তিবাসের রামায়ণ এবং কাশীরাম দাসের মহাভারত তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। বাল্যকাল হইতেই এই কবিদ্বয়ের ভাব ও ভাষা তাঁহার হৃদয়ে এতটা প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, যে, তিনি আজীবন কৃত্তিবাস ও কাশীরাম দাসের কবিত্বের একান্ত অনুরাগী এবং তাঁহাদের প্রতি সাতিশয় শ্রদ্ধান্বিত ছিলেন। একসময়ে সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ও

পণ্ডিত চন্দ্রনাথ বসু কোনও সাহিত্যিককে বলিয়াছিলেন—"গিরিশবাবুর পৌরাণিক নাটকের অনেক স্থানে কৃত্তিবাস ও কাশীরাম দাসের শুধু ভাব নহে, ভাষা পর্য্যন্ত আসিয়া পড়িয়াছে।" সেই সাহিত্যিকের মুখে চন্দ্রনাথবাবুর মন্তব্য শুনিয়া গিরিশচন্দ্র তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "চন্দ্রনাথবাবুকে বলিবেন, ইহাতে আমি গৌরবান্বিত। কৃত্তিবাসের রামায়ণ এবং কাশীরাম দাসের মহাভারত বাঙ্গালী কবির পৈত্রিক সম্পত্তি। মহাকবি মাইকেল আন্তরিক শ্রদ্ধার সহিত তাঁহাদের গুণগান করিতে গিয়াছেন।"

'রাবণবধ' নাটকের প্রচ্ছদ-পৃষ্ঠায় গিরিশচন্দ্র মাইকেলের নিম্নলিখিত কবিতা উদ্ধৃত করেন:—

"নমি আমি, কবি-গুরু, তব পদাম্বুজে,
বাল্মীকি! হে ভারতের শিরঃ-চূড়ামণি।"
... .
"কৃত্তিবাস কীর্ত্তিবাস কবি—
এ বঙ্গের অলঙ্কার!"

"মাইকেল মধুসূদন দত্ত।"

গুণগ্রাহী মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর গিরিশচন্দ্রের নাট্য-প্রতিভার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। যাঁহাদের চেষ্টায় ও উৎসাহে বাঙ্গালায় প্রথম থিয়েটারের সূত্রপাত হয়, মহারাজার নাম তন্মধ্যে বিশেষরূপ উল্লেখযোগ্য। কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের নিমিত্ত গিরিশচন্দ্র 'রাবণবধ' নাটক তাঁহার নামে উৎসর্গ করেন। যথা:—

"পরম পূজনীয় শ্রীযুক্ত মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুর
সি, এস, আই মহোদয় শ্রীচরণেষু।

দেব!

ক্ষুদ্র যজ্ঞের ফলাফলও যজ্ঞেশ্বর হরিতে অর্পিত হয়। এই দৃশ্যকাব্যখানি জন-পালক রাজ-করে অর্পণ করিলাম। মহাত্মন্! নিজগুণে গ্রহণ করিবেন, কমল ক্ষুদ্র হইলেও ভানু-করেই বিকাশ পায়। ইতি

কলিকাতা, বাগবাজার
১২৮৮ সাল।

সেবক
"শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ।"

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

পৌরাণিক নাটকাভিনয়ের যুগ।
'সীতার বনবাস'

'রাবণবধ' নাটকাভিনয়ে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া এবং পৌরাণিক নাটকে সাধারণের আগ্রহ দর্শনে গিরিশচন্দ্র উৎসাহের সহিত তাঁহার তৃতীয় নাটক 'সীতার বনবাস' রচনা করিলেন। ২রা আশ্বিন (১২৮৮ সাল) 'ন্যাসান্যাল থিয়েটারে' ইহার প্রথম অভিনয় হয়।

প্রথমাভিনয় রজনীর অভিনেতৃগণ :

রাম	গিরিশচন্দ্র ঘোষ।
লক্ষ্মণ	মহেন্দ্রলাল বসু।
ভরত	অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেলবাবু)।
বশিষ্ঠ	নীলমাধব চক্রবর্ত্তী।
বাল্মীকি	অমৃতলাল মিত্র।
দুর্ম্মুখ	শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু।
সুমন্ত্র	অতুলকৃষ্ণ মিত্র (বেতোল)।
অশ্বরক্ষক	অঘোরনাথ পাঠক।
লব	শ্রীমতী বিনোদিনী।
কুশ	কুসুমকুমারী (খোঁড়া)।
সীতা	কাদম্বিনী।
অলিক্ষরা	শ্রীমতী বনবিহারিণী।
নিকষা	ক্ষেত্রমণি। ইত্যাদি।

ভূমিকালিপির পরিচয় পাইয়া পাঠকগণ বুঝিয়াছেন, কিরূপ সুযোগ্য অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ কর্ত্তৃক নাটকখানি অভিনীত হইয়াছিল। সাধারণতঃ প্রত্যেক নূতন নাটকের প্রথমাভিনয় রজনীতে দেখিতে পাওয়া যায়, সুশিক্ষাদান সত্ত্বেও ছোট-ছোট ভূমিকাগুলি অল্পশক্তিবিশিষ্ট অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ কর্ত্তৃক অভিনীত হওয়ায় প্রায়ই নিখুঁত হয় না। কিন্তু এই নাটকের ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র ভূমিকা লইয়া যাঁহারা অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, ইতিপূর্ব্বে তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই অন্যান্য নাটকের নায়ক বা তত্তুল্য ভূমিকা অভিনয় করিয়া যশস্বী হইয়া আসিয়াছেন। 'সীতার বনবাস' বিষয়টী একেই

রামায়ণ মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা করুণরসাত্মক, তাহার উপর গিরিশচন্দ্রের রচনা-কৌশলে এবং সম্প্রদায়ের এই পূর্ণশক্তি সম্মেলনে অভিনীত হওয়ায় নাটকখানি কি শিক্ষিত কি অশিক্ষিত সকল শ্রেণীর দর্শকেরই মনোহরণে সমর্থ হইয়াছিল। রাম ও লক্ষ্মণের ভূমিকা গিরিশচন্দ্র ও মহেন্দ্রলাল বসু এত সুন্দর অভিনয় করিয়াছিলেন, যে, প্রবীণ নাট্যামোদি-গণের মুখে আজি পর্য্যন্ত তাঁহাদের সেই অতুলনীয় অভিনয়-কাহিনী শুনা যায়। লব ও কুশের অভিনয়ে শ্রীমতী বিনোদিনী ও কুসুমকুমারী এই নাটকখানিকে আরও মধুর এবং আরও উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিলেন। বার-বার ইঁহাদের অভিনয় দেখিয়াও দর্শক-মণ্ডলীর সাধ মিটিত না। মহিলাগণের নিমিত্ত পূর্ব্ব হইতেই দ্বিতলের একপার্শ্ব চিক দিয়া ঘেরা ছিল, এবং ইতিপূর্ব্বে প্রায়ই তাহা খালি পড়িয়া থাকিত। 'রাবণবধ' নাটক হইতে স্ত্রী-দর্শক কিছু বৃদ্ধি পায়, – কিন্তু 'সীতার বনবাসে'র শতমুখে সুখ্যাতি শুনিয়া মহিলাগণের সংখ্যা প্রত্যেক সপ্তাহে এরূপ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল যে স্বত্বাধিকারী প্রতাপচাঁদ জহুরী মহাশয়কে স্ত্রীলোকের আসনের সংখ্যা বাড়াইবার বিশেষ ব্যবস্থা করিতে হয়। ফলতঃ 'সীতার বনবাস' অভিনয় করিয়া 'ন্যাসান্যাল' যেরূপ অজস্র সুখ্যাতিলাভ, তৎসঙ্গে সেইরূপ প্রচুর অর্থ উপার্জ্জনও করিয়াছিল।

১২৮৮ সাল, ফাল্গুন মাসের 'ভারতী'তে মনীষী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর-লিখিত 'সীতার বনবাসে'র দীর্ঘ সমালোচনা বাহির হইয়াছিল। তাহা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম :—

"গিরিশবাবু রচিত পৌরাণিক দৃশ্যকাব্যগুলিতে তাঁহার কবিত্বশক্তির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। তিনি তাঁহার বিষয়গুলির সৌন্দর্য্য ও মহত্ত্ব কবির ন্যায় বুঝিয়াছেন ও তাহা অনেক স্থলে কবির ন্যায় প্রকাশ করিয়াছেন।...যতগুলি ঘটনা লইয়া এই কাব্যখানি রচিত হইয়াছে, তাহা একটী ক্ষুদ্রায়তন দৃশ্যকাব্যের মধ্যে পরিস্ফুটভাবে বর্ণিত হইতে পারে না। ইহাতে সমস্তটার একটী ছায়ামাত্র পড়িয়াছে। কিন্তু ইহাতে কবিতার অভাব নাই। সীতা বর্জ্জনের ভার লক্ষ্মণের প্রতি অর্পিত হইলে লক্ষ্মণ রামকে যাহা কহিয়াছিলেন, তাহা অতি সুন্দর। যদিও বনবাসের পর সীতার বিলাপ সংক্ষেপ ও মর্ম্মভেদী হয় নাই, দীর্ঘ ও অগভীর হইয়াছে, তথাপি সীতার শেষ প্রার্থনাটী অতি মনোহর হইয়াছে। যখন পৃথিবীতে জীবনের কোন বন্ধন নাই, অথচ জীবনরক্ষা কর্ত্তব্য, তখন দেবতার কাছে এই প্রার্থনা করা, সন্তান-বাৎসল্য ভিক্ষা করা,—

'জগৎমাতা,
শিখাওগো দুহিতারে জননীর প্রেম!
ছিন্ন অন্য ডুরি,
প্রেমে বাঁধা রেখ মা সংসারে ;
ওরে, কে অভাগা এসেছ জঠরে ?'

অতি সুন্দর হইয়াছে।

'যবে গভীরা যামিনী, বসি দ্বারে।
শিশুদুটী ঘুমায় কুটীরে,

চাঁদপানে চাহি কাঁদি সই,
চাঁদ মুখ পড়ে মনে।'

এইসকল কথায় সীতার বেশ একটী চিত্র দেওয়া হইয়াছে।"

'সীতার বনবাস' নাটকখানি গিরিশচন্দ্র পুণ্যশ্লোক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়েরু নামে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। উৎসর্গপত্রটী নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

"পূজনীয় শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় শ্রীচরণেষু—

গুরুদেব দীননাথ,

মাতৃভাষা জানি না বলা ভাল নয়, মন্দ। মহাশয়ের 'বেতাল' পাঠে বুঝিলাম। আচার্য্য! আমার পরীক্ষা গ্রহণ করুন। আমি চিরদিন মহাশয়কে মনে মনে বন্দনা করি।

কলিকাতা, বাগবাজার; মাঘ ১২৮৮। সেবক শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ।"

'অভিমন্যুবধ'

'সীতার বনবাস' নাটকে আশাতীত সাফল্যলাভ করিয়া গিরিশচন্দ্র এবার রামায়ণ ছাড়িয়া মহাভারত হইতে বিষয় নির্ব্বাচন করেন। তাহার চতুর্থ নাটক 'অভিমন্যুবধ'। ১২ই অগ্রহায়ণ (১২৮৮ সাল) 'ন্যাসান্যাল থিয়েটারে' প্রথম অভিনীত হয়। প্রথমাভিনয় রজনীর প্রধান অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ :

যুধিষ্ঠির ও দুর্য্যোধন	গিরিশচন্দ্র ঘোষ।
শ্রীকৃষ্ণ ও দ্রোণাচার্য্য	কেদারনাথ চৌধুরী।
ভীম ও গর্গ	অমৃতলাল মিত্র।
অর্জ্জুন ও জয়দ্রথ	মহেন্দ্রলাল বসু।
অভিমন্যু	অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেলবাবু)।
দুঃশাসন	নীলমাধব চক্রবর্ত্তী।
কর্ণ ও গণক	অঘোরনাথ পাঠক।
সুভদ্রা	গঙ্গামণি।
উত্তরা	শ্রীমতী বিনোদিনী।
রোহিণী	কাদম্বিনী। ইত্যাদি।

'অভিমন্যুবধ' নাটকের অভিনয় যেরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল, নাট্যামোদিগণের নিকট ইহার আদরও সেইরূপ হইয়াছিল। বেলবাবু অভিমন্যুর ভূমিকা অতি চমৎকার অভিনয় করিয়াছিলেন। গিরিশচন্দ্র যুধিষ্ঠির ও দুর্য্যোধন ভূমিকার পরস্পর-বিরোধী দুইটী বিভিন্ন রসের অভিনয়ে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র দুইটী ছবি দেখাইয়া দর্শকগণের বিস্ময়োৎপাদন করিয়াছিলেন। 'আর্য্যদর্শন' ব্যতীত সমস্ত সংবাদপত্রে এই নাটকের সুখ্যাতি বাহির হইয়াছিল। 'ভারতী' (মাঘ ১২৮৮ সাল) মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত সমালোচনাটী:

উদ্ধৃত করিলাম :—

"অভিমন্যুর নাম উচ্চারণ হইলেই আমাদের মনে যে ভাব উদয় হয়, 'অভিমন্যুবধ' কাব্য পড়িয়া সে ভাবের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় না, বরং সে ভাব আরও উজ্জ্বলতররূপে ফুটিয়া উঠে। যে অভিমন্যু বিশ্ববিজয়ী অর্জ্জুন ও বীরাঙ্গনা সুভদ্রার সন্তান, তাহার তেজস্বিতা ত থাকিবেই, অথচ অভিমন্যুর কথা মনে আসিলেই সূর্য্যের কথা মনে আসে না, কারণ সূর্য্য বলিতেই কেবল প্রখর তীব্র তেজোরাশির সমষ্টি বুঝায়—কিন্তু অভিমন্যুব সঙ্গে কেমন একটী সুকুমার সুন্দর যুবার ভাব ঘনিষ্ঠভাবে সংযোজিত আছে যে, তাহার জন্য অভিমন্যুকে মনে পড়িলেই চন্দ্রের কথা মনে হওয়া উচিৎ, কিন্তু তাহাও হইতে পারে না, কারণ চন্দ্রের তেজস্বিতা ত কিছুই নাই। সেইজন্য অভিমন্যুকে আমরা চন্দ্র সূর্য্য মিশ্রিত একটী অপরূপ সামগ্রী বলিয়াই মনে করি। 'অভিমন্যুবধে'র অভিমন্যু, আমাদের সেই মহাভারতের অভিমন্যু, সেই আমাদের অভিমন্যু—সেই কল্পনার আদর্শভূত অভিমন্যু। এই বঙ্গীয় নাটকখানিতে যেখানেই আমরা অভিমন্যুকে পাইয়াছি—কি উত্তরার সঙ্গে প্রেমালাপে, কি সুভদ্রার সঙ্গে স্নেহ বিনিময়ে, কি সপ্তরথীর দুর্ভেদ্য ব্যূহমধ্যে বীর-কার্য্যসাধনে,—সকল স্থানেই এই নাটকের অভিমন্যু প্রকৃত অভিমন্যুই হইয়াছে। বলিতে কি মহাভারতের সকল ব্যক্তিগুলিই শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্রের হস্তে কষ্টকর মৃত্যুতে, জীবন না ফুরাইলেও অপঘাত মৃত্যুতে প্রাণত্যাগ করে নাই। ব্যাসদেবের কথা অনুসারে, যাহার যখন মৃত্যু আবশ্যক, গিরিশবাবু তাহাই করিয়াছেন। মাইকেল মহাশয় যেমন অকারণে লক্ষ্মণকে অসময়ে মেঘনাদের সঙ্গে যুদ্ধে মারিয়াছেন, অর্থাৎ প্রকৃত প্রস্তাবে লক্ষ্মণের ধ্বংসসাধন করিয়াছেন, গিরিশবাবু অভিমন্যুকে, কি অর্জ্জুনকে, কি কৃষ্ণকে কোথাও সেরূপ হত্যা করেন নাই—ইহা তাঁহার বিশেষ গৌরব। তাঁহার আরও গৌরবের কথা বলিতে বাকী আছে। তাঁহার কল্পনার পরিচয় দিতে আমরা অত্যন্ত আনন্দলাভ করিতেছি। স্বপ্নদেবীর সঙ্গে রজনীর যে আলাপ আছে, তাহা আমাদের অত্যন্ত প্রীতিকর বোধ হইয়াছে, এবং রোহিণীও আমাদের প্রিয় সখী হইয়া পড়িয়াছেন। স্বপ্ন ও তদীয় সঙ্গিনীগণের গানে আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। তবে দোষ দেখাইয়া দেওয়া সমালোচকদের কর্ত্তব্য ভাবিয়াই বলিতে হইল যে নাটকের রাক্ষস-রাক্ষসীদের কথাগুলিতে 'বেণীসংহারে'র কথা আমাদের মনে পড়ে। কিন্তু তাহা মনে পড়িলেও আমরা এ কথা বলিতে সঙ্কুচিত হইব না যে শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র একজন প্রকৃত কবি—একজন প্রকৃত ভাবুক।"

ইহার উপর 'অভিমন্যুবধ' নাটক সম্বন্ধে অধিক লেখা নিষ্প্রয়োজন।

'অভিমন্যুবধ' বীররসপ্রধান নাটক হওয়ায় 'সীতার বনবাসে'র ন্যায় আবালবৃদ্ধ-বনিতার প্রিয় হয় নাই। সুচতুর প্রতাপচাঁদ জহুরী মহিলামহলে লব-কুশের সমধিক আকর্ষণ বুঝিয়া গিরিশবাবুকে বলিলেন, "বাবু, যব দুসরা কিতাব লিখগে, তব ফিন্ ওহি দুনো লেড়কা ছোড় দেও।" জহুরী মহাশয়ের পুনঃ-পুনঃ অনুযোগে গিরিশচন্দ্র পুনরায় লব-কুশের অবতারণার জন্য তৎপরে 'লক্ষ্মণ-বর্জ্জন' নাটক লিখেন। "অভিমন্যুবধ' নাটকখানি তিনি হাইকোর্টের বিচারপতি রমেশচন্দ্র মিত্র মহাশয়কে

উৎসর্গ করেন। যথা :—

"পরম শ্রদ্ধাস্পদ অনারেবল্ শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মিত্র মহাশয় বহুমাননিধানেষু,

যিনি স্বয়ং উৎকর্ষ লাভ ও মাতৃভূমির মুখোজ্জল করেন, তিনি সংসারে আদর্শ। মহোদয় আমার ক্ষুদ্র উপহার গ্রহণ করুন ; ভক্তির সহিত অর্পণ করিলাম। ইতি—

বাগবাজার, কলিকাতা। বিনয়াবনত

১২৮৮ সাল। শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ।

'লক্ষ্মণ-বর্জ্জন'

১৭ই পৌষ (১২৮৮ সাল) 'ন্যাসান্যাল 'থিয়েটারে' 'লক্ষ্মণ-বর্জ্জন' প্রথম অভিনীত হয়। এক অঙ্কে সমাপ্ত এই দৃশ্যকাব্যখানিতে গিরিশচন্দ্রের অপূর্ব্ব কবিত্ব এবং গভীর ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। রাম ও লক্ষ্মণের চরিত্র তিনি নাটকে যেরূপ উচ্চভাবে আঁকিয়াছিলেন, অভিনয়েও সেইরূপ উজ্জ্বলভাবে ফুটাইয়াছিলেন। রামচন্দ্র-বেশী গিরিশচন্দ্র এবং লক্ষ্মণ-বেশী মহেন্দ্রলাল বসুর সজীব অভিনয়ে দর্শকমণ্ডলী আত্ম-বিস্মৃত হইয়া যাইতেন। দৃশ্যকাব্যখানি কিরূপ উচ্চভাবাপন্ন হইয়াছিল, সুপ্রসিদ্ধ 'ভারতী' মাসিক পত্রিকায় (১২৮৮ সাল, ফাল্গুন) প্রকাশিত নিম্নোদ্ধৃত সমালোচনা পাঠে তাহার কতকটা পরিচয় পাওয়া যায়।

"লক্ষ্মণ-বর্জ্জন বিষয়টী অতি মহান্, কিন্তু তাহা দৃশ্যকাব্য রচনার উপযোগী কিনা সন্দেহ। লেখক রামচরিত্রের অর্থ, রামচরিত্রের মর্ম্ম ইহাতে নিবিষ্ট করিয়াছেন। রামের সমস্ত কাব্য, সমস্ত বীরত্ব-কাহিনীকে তিনি দুইটী অক্ষরে পরিণত করিয়াছেন। সে দুইটী অক্ষর—প্রেম। এই সংক্ষেপ দৃশ্যকাব্যখানিতে লেখক একটী মহান্ কাব্যের রেখাপাতমাত্র করিয়াছেন। ইহাতে লক্ষ্মণের মহত্ত্ব অতি সুন্দর হইয়াছে। কবি যাহা বলেন, তাহার মর্ম্ম এই, যে, বীরত্ব নামক গুণ স্বাবলম্বী গুণ নহে, উহা পরমুখাপেক্ষী গুণ। যেখানে বীরত্ব দেখা যাইবে, সেইখানেই দেখিতে হইবে, সে বীরত্ব কাহাকে আশ্রয় করিয়া আছে, সে বীরত্বের বীরত্ব কি লইয়া। কে কত মানুষ খুন করিয়াছে, তাহা লইয়া বীরত্ব বিচার করা উচিত নহে, কাহাকে কিসে বীর করিয়া তুলিয়াছে, তাহাই লইয়া বীরত্বের বিচার। কেহ-বা আত্মরক্ষার জন্য বীর, কেহ-বা পরের প্রাণ-রক্ষার জন্য বীর। জননী সন্তানস্নেহের জন্য বীর, দেশ-হিতৈষী স্বদেশ-প্রেমে বীর। তেমনি লক্ষ্মণও বীর বলিয়াই বীর নহেন, তিনি বীর হইয়া উঠিয়াছিলেন। কিসে তাঁহাকে বীর করিয়া তুলিয়াছিল? প্রেমে। রামের প্রেমে। অনেকে প্রেমকে হৃদয়ের দুর্ব্বলতা বলেন, কিন্তু সেই প্রেমের বলেই লক্ষ্মণ বীর। যখন সত্যের অনুরোধে রাম লক্ষ্মণকে ত্যাগ করিলেন, তখন লক্ষ্মণ কহিলেন—

'সেবা মম পূর্ণ এতদিনে,
আত্ম-বিসর্জ্জনে পূজা করি সম্পূরণ!

ত্যাগ শিক্ষা মোরে শিখাইলা দয়াময়,
করি আপনা বর্জ্জন,

... ...

সেই প্রেম স্মরি, সেই প্রেমবলে
জিনি অবহেলে পুরন্দরজয়ী অরি,
পঙ্গু আমি লঙ্ঘিনু সুমেরু।
সেই প্রেম-বলে
না টলিনু শক্তিশেল হেরি,
উচ্চহৃদে পেতে নিনু শেল।
রাম-প্রেমে শেলে পাইনু ত্রাণ!'

রাম ও লক্ষ্মণ—হিংসা, ঘৃণা, যশোলিপ্সা বা ধ্রুবাকাঙ্ক্ষার বলে বীর নহেন, তাহারা প্রেমের বলে বীর। তাঁহাদের বীরত্ব সর্ব্বোচ্চশ্রেণীর বীরত্ব। এই মহান্ ভাব এই সংক্ষেপ দৃশ্যকাব্যখানির মধ্যে নিহিত আছে।"

গিরিশচন্দ্র এই নাটকখানি তাঁহার শ্রদ্ধেয় সুহৃদ 'অমৃতবাজার পত্রিকা'-সম্পাদক পরমবৈষ্ণব স্বর্গীয় শিশিরকুমার ঘোষের নামে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। যথা:—

"শ্রীযুক্ত বাবু শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়েষু।

হে বৈষ্ণব! রামচরিত্র লিখিয়াছি, কিরূপ হইয়াছে অনুগ্রহপূর্ব্বক দেখুন।

অনুগত—শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ।

কলিকাতা, বাগবাজার, মাঘ ১২৮৮ সাল।"

'লক্ষ্মণ-বর্জ্জন নাট্যামোদিগণের আনন্দবর্দ্ধন করায় গিরিশচন্দ্র তৎপরে যথাক্রমে 'সীতার বিবাহ, 'রামের বনবাস' এবং 'সীতা-হরণ' লিখিয়া রামলীলা সম্পূর্ণ করেন। পাঠকগণের ধৈর্য্যচ্যুতি এবং তৎসঙ্গে গ্রন্থের কলেবর অত্যন্ত বাড়িয়া যাইবার আশঙ্কায় আমরা সংক্ষেপে নাটকগুলির পরিচয় প্রদান করিব।

'সীতার বিবাহ'

২৮শে ফাল্গুন (১২৮৮ সাল) 'সীতার বিবাহ' 'ন্যাসান্যাল থিয়েটারে' প্রথম অভিনীত হয়। প্রথম অভিনয় রজনীর অভিনেতৃগণ:

বিশ্বামিত্র	গিরিশচন্দ্র ঘোষ।
জনক	নীলমাধব চক্রবর্ত্তী।
রাম	অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেলবাবু)
লক্ষ্মণ	শ্রীযুক্ত কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়।
রাবণ	অঘোরনাথ পাঠক।
পরশুরাম ও কালনেমী	অমৃতলাল মিত্র।

জনকপত্নী	ক্ষেত্রমণি।
অহল্যা	কাদম্বিনী।
সীতা	ছোটরাণী। ইত্যাদি।

গিরিশচন্দ্রের বিশ্বামিত্রের ভূমিকাভিনয় হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যেক ভূমিকাই সুন্দররূপ অভিনীত হইয়াছিল। ধর্ম্মদাসবাবু জনকের রাজসভায় অভিনয় উপলক্ষ্যে রঙ্গমঞ্চের উপর রঙ্গমঞ্চ নির্ম্মাণ করিয়া দর্শকমণ্ডলীর প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। রঙ্গমঞ্চের উপর রঙ্গমঞ্চ বঙ্গ-নাট্যশালায় এই প্রথম প্রদর্শিত হয়। কিন্তু এতৎসত্বেও 'সীতার বিবাহ' দর্শকমণ্ডলীর নিকট সেরূপ সমাদৃত হয় নাই। বোধহয়—'রাবণবধ', 'সীতার বনবাস' ও 'লক্ষ্মণ-বর্জ্জনে'র অভিনয়ে রাম চরিত্রের চরমোৎকর্ষ দেখিয়া, রামের বাল্যলীলা দর্শনে দর্শকের আর ততটা আগ্রহ জন্মে নাই।

'রামের বনবাস'

ইহার একমাস পরেই—৩রা বৈশাখ (১২৮৯ সাল) 'ন্যাসান্যাল থিয়েটারে' গিরিশচন্দ্রের 'রামের বনবাস' নাটক প্রথম অভিনীত হয়। প্রথম অভিনয় রজনীর অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণের নাম :

রাম	মহেন্দ্রলাল বসু
লক্ষ্মণ	বেলবাবু [অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়]।
কঞ্চুকী ও ভরত	নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু।
শত্রুঘ্ন	রামতারণ সান্যাল।
দশরথ	অমৃতলাল মিত্র।
বশিষ্ঠ	নীলমাধব চক্রবর্ত্তী।
গুহক	অঘোরনাথ পাঠক।
কৈকেয়ী	শ্রীমতী বিনোদিনী।
সীতা	ভূষণকুমারী।
মন্থরা	ক্ষেত্রমণি।
কৌশল্যা	কাদম্বিনী।
গুহকপত্নী	গঙ্গামণি। ইত্যাদি।

'সীতার বিবাহ' সাধারণের সেরূপ প্রীতি আকর্ষণ করিতে না পারিলেও গিরিশচন্দ্র ইহাতে রাম চরিত্রের যে উন্মেষ দেখাইয়াছিলেন, তাহা 'রামের বনবাস' এবং 'সীতা-হরণে' সর্ব্বাঙ্গীণ বিকাশলাভ করিয়াছিল।

নাট্যসম্পদ এবং অভিনয়-গৌরবে 'রামের বনবাস' নাটক দর্শকমণ্ডলীর নিকট বিশেষ সমাদৃত হইয়াছিল। দশরথ, কৈকেয়ী এবং মন্থরার ভূমিকাভিনয়ে অমৃতলাল মিত্র, শ্রীমতী বিনোদিনী এবং ক্ষেত্রমণি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক যশোলাভ করিয়াছিলেন।

কঞ্চুকীর ভূমিকাটী ছোট হইলেও ভীমরতিগ্রস্ত বৃদ্ধের একটী সজীব ছবি দেখাইয়া নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় সর্ব্বসাধারণের ধন্যবাদার্হ হইয়াছিলেন।

বনবাসে গমনকালীন রামচন্দ্র গুহকের রাজ্যে উপস্থিত হইলে, গুহক ও চণ্ডালগণের সরলতা-মাখা উচ্ছ্বাসপূর্ণ "হো, হো, হো, এলো রামা মিতে", "জোর কাটি বাজা, আমার রামা রাজা, রামা আমার রে,—রামা আমার!" প্রভৃতি গানের তুলনা হয় না। সীতার প্রতি গুহক-পত্নীর একখানি গীত উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। গীতটী এই —

(সীতার প্রতি গুহক-পত্নী)

"গুটি গুটি ফিব্‌বো বনে দু টী,
লতা ছিঁড়ে তোর বাঁধবো ঝুঁটি।
তোর কানে দোলাবো লো' ঝুম্‌কো ফুল,
কত ডাকে বুলবুল,—
কোয়েলা দোয়েলা মিঠি মিঠি।
তোর কাছে বলি, বড় নেচে চলি,
মিন্সেকে বলিনি, তোরে ফুটি,—
হেথা থাক না মিতিনি, তোর পায়ে লুটি।"

চণ্ডাল-পত্নীব সারল্য সখ্যতা ও সহানুভূতি প্রকাশের কি সজীব ভাষা!

'রামের বনবাস' নাটকখানি গিরিশচন্দ্র সাহিত্যরথী স্বর্গীয় অক্ষয়চন্দ্র সবকাবের নামে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। উৎসর্গ-পত্রটী নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম —

"শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষযচন্দ্র সরকার বি, এল,
'সাধারণী' সম্পাদক মহোদযেষু

সুহৃদ্বর, এখানি কিরূপ হইয়াছে দেখুন। আমি যত্ন কবিযা লিখিযাছি, আপনি যত্নে গ্রহণ করিলে শ্রম সফল জ্ঞান কবিব।

কলিকাতা, বাগবাজার, ১২৮৯ সাল। প্রীতিপ্রযাসী—শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ।"

'সীতাহরণ'

৭ই শ্রাবণ (১২৮৯ সাল) 'সীতাহরণ' নাটক 'ন্যাসান্যাল থিয়েটাবে' প্রথম অভিনীত হয়। প্রথম অভিনয় রজনীব অভিনেতৃগণ —

রাবণ ও বালী	অমৃতলাল মিত্র।
রাম	মহেন্দ্রলাল বসু।
লক্ষ্মণ	বেলবাবু [অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়]।
সুগ্রীব	শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু।
ব্রহ্মা	নীলমাধব চক্রবর্ত্তী।

সাগর	শ্রীযুক্ত কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়।
ইন্দ্র	প্রবোধচন্দ্র ঘোষ।
ইন্দ্রজিৎ	উপেন্দ্রনাথ মিত্র।
খর ও হনুমান	অঘোরনাথ পাঠক।
জাম্বুবান	গিরীন্দ্রনাথ ভদ্র।
মহাদেব	গোপালচন্দ্র মল্লিক।
ব্যোমচর	রামতারণ সান্ন্যাল।
দুর্গা, মায়া ও তারা	কাদম্বিনী।
উগ্রচণ্ডা, শূর্পণখা ও চেড়ী	ক্ষেত্রমণি।
সাগর-পত্নী	ভূষণকুমারী।
মন্দোদরী	গঙ্গামণি।
সরমা	শ্রীমতী বনবিহারিণী।
সীতা	শ্রীমতী বিনোদিনী।

'সীতাহরণ' নাটকে যেরূপ ঘটনাবৈচিত্র্য—গিরিশচন্দ্রের নাট্য-চাতুর্য্যও ইহাতে সেইরূপ প্রস্ফুটিত হইয়াছিল—ক্রমেই তাঁহার ভাব, ভাষা ও নাটকীয় শক্তি উৎকর্ষলাভ করিতেছিল। 'সীতাহরণে'র প্রত্যেক চরিত্রই চমৎকার ফুটিয়াছে। অধিকন্তু 'রাবণ' চরিত্র অঙ্কনে গিরিশচন্দ্রের সৃষ্টি-কৌশলের বিশিষ্টরূপ পরিচয় পাওয়া যায়। সুবিখ্যাত অভিনেতা অমৃতলাল মিত্র মহাশয় ইহার অভিনয়ও অতি চমৎকার করিয়াছিলেন। বিস্তৃত সমালোচনার ভার সমালোচকগণের হস্তে অর্পণ করিয়া কেবলমাত্র তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণের নিমিত্ত একখানি গান উদ্ধৃত করিলাম। সুগ্রীবের সভায় নর্ত্তকীগণ নৃত্য করিতেছে। বানর-রাজার সভায় অবশ্যই বানরীরা নাচিতেছে। গিরিশচন্দ্র বানরীদের প্রকৃতি অবিকল বজায় রাখিয়া গানখানি কিরূপ কৌশলে রচনা করিয়াছেন দেখুন:—

(সুগ্রীব-সভায় নর্ত্তকীগণের গীত)

"বনফুল মধুপান,
বনে বনে করি গান,
মোরা, বনবিহঙ্গিনী লো!
বনে বনে ভ্রমি, ফুলে ফুলে চুমি,
মোরা, বনবিলাসিনী লো।
বনফুলহারে বাঁধি লো কবরী,
বনফুলহার হৃদয়ে ধরি,
মোরা, বন-ফল-হার-অঙ্গিনী লো।"

যদ্যপি কোন রাজকুমারীর সখিগণ বন-ভ্রমণে আসিয়া এই গীতখানি গাহিতেন, বাহ্যতঃ তাহা কোনওরূপ অশোভন হইত না। কিন্তু রসিক পাঠকগণ কিঞ্চিৎ মনোযোগ দিয়া পড়িলেই বুঝিবেন, বাহিরের গানের চাকচিক্য থাকিলেও ভিতরে-ভিতরে ঠিক

বানরীর স্বভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। অন্যত্র অশোকবনে চেড়ীগণের গীত—"দু'টী সাধ রইল মনে, একটি যাব ঈশেন কোণে," ইত্যাদি ঠিক রাক্ষসী-চরিত্রেরই পরিচায়ক। ইহাই গিরিশচন্দ্রের গীত-রচনার বৈশিষ্ট্য। সীতাকে লইয়া রাবণের পুষ্পক রথারোহণে শূন্য-পথে গমন—এই দৃশ্য দেখাইয়া ধর্ম্মদাসবাবু বিশেষরূপ সুখ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন।

'মেঘনাদবধ' রচনার সঙ্কল্প

এইসময়ে গিরিশচন্দ্র 'মেঘনাদবধ' নাটক লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, "মাইকেল রাম চরিত্র ঠিক অঙ্কিত করেন নাই। পৌরাণিক নাটক লিখিবার সময় একবার 'মেঘনাদবধ' নাটক লিখিবার কল্পনা করি; লেখাও আরম্ভ করিয়াছিলাম। যথা:—

রাবণ। রামরূপে কে এলো লঙ্কায়,
কোন্ পূর্ব্ব অরি পূর্ব্ব দুঃখ স্মরি
পশি স্বর্ণ-গৃহে জ্বালিলে এ কালানল।

কিন্তু কিয়দংশ লিখিবার পর গুরুস্থানীয় মাইকেল মধুসূদনের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে হইবে ভাবিয়া উক্ত নাটক লেখার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করি।"

'ব্রজ-বিহার'

'সীতার বিবাহ' লিখিবার পর 'ন্যাসান্যাল থিয়েটারে'র জন্য গিরিশচন্দ্র 'ব্রজ-বিহার' নামক একখানি গীতিনাট্য রচনা করিয়াছিলেন। চৈত্র মাসে (১২৮৮ সাল) ইহার প্রথমাভিনয় হয়। ইহাতে কথা ছিল না, সমস্তই গান—গানে গানেই অভিনয় চলিত—এইজাতীয় গীতিনাট্যকে 'ইটালিযান অপেরা' বলে। 'ব্রজ-বিহারে'র গানগুলি অতি সুন্দর। "আমার এ সাধের তরী প্রেমিক বিনা নেইনি কারে", "ধরম করম সকলি গেল লো, শ্যামা-পূজা মম হ'ল না।" প্রভৃতি গীত বঙ্গবাসী মাত্রেরই পরিচিত।

'ভোট-মঙ্গল'

২২শে আশ্বিন (১২৮৯ সাল) গিরিশচন্দ্র প্রণীত 'ভোট-মঙ্গল' (বা সজীব পুতুলো নাচ) নামক একখানি সাময়িক ব্যঙ্গ-নাট্য 'ন্যাসান্যাল থিয়েটারে' প্রথম অভিনীত হয়। বড়লাট লর্ড রিপনের শাসন-সময়ে কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটিতে প্রথম স্বায়ত্তশাসন-প্রথা (Local Self Government) প্রচলিত হয়। এইসময়ে কমিশনার নির্ব্বাচনে,

ভোট লইয়া সহরে মহা হুলস্থূল পড়িয়া যায়; সেইসময় এই ব্যঙ্গ-নাট্যখানি রচিত হইয়াছিল। গিরিশচন্দ্র স্বয়ং নাচওয়ালার ভূমিকা অভিনয় করিয়া সম্পূর্ণ নূতন ঢঙে প্রহসনখানি আদ্যোপান্ত পরিচালিত করিতেন। যাঁহারা অভিনয় না দেখিয়াছেন, তাঁহারা পুস্তকখানি পাঠে সে রস ঠিক উপলব্ধি করিতে পারিবেন না।

'মলিনমালা'

'মলিনমালা' গীতিনাট্যখানিও 'ব্রজ-বিহারে'র ন্যায় 'ইটালিয়ান অপেরা'র অনুকরণে রচিত হয়। ১২ই কার্ত্তিক (১২৮৯ সাল) 'ন্যাসান্যাল থিয়েটারে' ইহা প্রথম অভিনীত হয়; সুবিখ্যাত সঙ্গীতাচার্য্য রামতারণ সান্ন্যাল মহাশয় লহরকুমারের ভূমিকা গ্রহণে সুধাবর্ষী সঙ্গীতধারায় দর্শকগণকে মুগ্ধ করিতেন। রামতারণবাবু বঙ্গ-নাট্যশালার যুগপ্রবর্ত্তক সঙ্গীতাচার্য্য, কারণ পূর্ব্বে সুপ্রসিদ্ধ মদনমোহন বর্ম্মণ প্রভৃতি সঙ্গীতাচার্য্যগণ মনোমত সুর বসাইবার জন্য নাট্যকারগণকে পুরাতন গানের আদর্শ দিতেন, তাঁহারা সেই গানের কথাগুলিমাত্র বদলাইয়া দিতেন। গিরিশচন্দ্রকেও প্রথমে এইরূপ নমুনা পাইয়া তবে গান বাঁধিতে হইত। কিন্তু ইহাতে নাট্যকারগণের স্বাধীনতা বড়ই ক্ষুন্ন হইত। রামতারণবাবুই গিরিশচন্দ্র কর্ত্তৃক অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহাকে বলেন, "মহাশয়, আপনি ইচ্ছামত গান বাঁধিয়া যান, আমি পরে আপনার গানের ভাব ও রসানুযায়ী সুর সংযোজনা করিব।" এই নূতন পদ্ধতি প্রবর্ত্তনই রামতারণবাবুর অক্ষয় কীর্ত্তি। 'ন্যাসান্যাল থিয়েটারে' অভিনীত গিরিশচন্দ্রের সমস্ত নাটকাদিতেই রামতারণবাবু সুর সংযোজনা করিয়া অদ্ভুত কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। 'মলিনমালা' গীতিনাট্যখানি গিরিশচন্দ্র রামতারণবাবুকে উপহার প্রদান করেন। উৎসর্গ-পত্রে লিখিয়াছিলেন :—

"ব্রাহ্মণ!—তোমার অনুকম্পায় আমার পুস্তকগুলি উজ্জ্বল হইয়াছে। এখানির তুমি-ই অধিকারী, তোমার চরণে উপহার রাখিলাম।

সেবক শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ।"

গানগুলি সুন্দর গীত হইলেও 'মলিনমালা' দর্শকমণ্ডলীর মনঃপূত হয় নাই। রচনা-চাতুর্য্যের নমুনাস্বরূপ আমরা একখানি গীতের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম। পোত হইতে নামিয়া সাগরকূলে আসিয়া নাবিকগণ গাহিতেছে :—

"হৈ হৈ হৈ—জমী দোলে না চল্‌তে ঘুরি!
হেথা বালি ভারি, চলা কারিকুরি।" ইত্যাদি।

হেলিয়া দুলিয়া জাহাজ চলে—নাবিকগণ সেইরূপভাবে চলিতে অভ্যস্ত। বেলা-ভূমিতে আসিয়া তাহারা সেইরূপ হেলিয়া-দুলিয়া চলিতে গিয়া ঘুরিয়া পড়িতে লাগিল। কারণ জমী তো আর দুলিতেছে না। এই সূক্ষ্ম দৃষ্টিই রচয়িতার কৃতিত্বের পরিচায়ক।

'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস'

রামায়ণ ছাড়িয়া গিরিশচন্দ্র পুনরায় মহাভারত ধরিলেন। মহাভারত হইতে নির্ব্বাচিত তাঁহার দ্বিতীয় নাটক 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস'।

১লা মাঘ (১২৮৯ সাল) 'ন্যাসান্যাল থিয়েটারে' 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস' প্রথমাভিনয় হয়। প্রথম অভিনয় রজনীর অভিনেতৃগণের নাম :—

কীচক ও দুর্য্যোধন	গিরিশচন্দ্র ঘোষ।
অর্জ্জুন (বৃহন্নলা)	মহেন্দ্রলাল বসু।
ভীম, ভীষ্ম ও জনৈক ব্রাহ্মণ	অমৃতলাল মিত্র।
শ্রীকৃষ্ণ ও দ্রোণাচার্য্য	কেদারনাথ চৌধুরী।
বিরাট	অতুলচন্দ্র মিত্র (বেডৌল)।
যুধিষ্ঠির	শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মিত্র।
নকুল	বিহারীলাল বসু (জ্যেঠা)।
সহদেব	শ্রীযুক্ত কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়।
উত্তর	অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেলবাবু)।
কৃপাচার্য্য	নীলমাধব চক্রবর্ত্তী।
গোপ	জীবনকৃষ্ণ সেন।
অভিমন্যু	শ্রীমতী বনবিহারিণী।
দ্রৌপদী	শ্রীমতী বিনোদিনী।
সুদেষ্ণা	কাদম্বিনী।
উত্তরা	ভূষণকুমারী।
হাড়িনী	ক্ষেত্রমণি। ইত্যাদি।

এই নাটকখানি রচনায় গিরিশচন্দ্র যেরূপ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন—অভিনয়ও সেইরূপ আবালবৃদ্ধবনিতার হৃদয়স্পর্শী হইয়াছিল। মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বিরচিত মহাভারতের চরিত্রগুলি তাঁহার তুলিকাস্পর্শে যেন জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছিল। নাটকখানি নাতিদীর্ঘ হইলেও অভিনেতৃগণ নাটকীয় চরিত্রাভিনয়ে নিজ-নিজ কৃতিত্ব দেখাইবার যথেষ্ট সুযোগ পাইয়াছিলেন। যেমন অর্জ্জুন তেমনই ভীম—তেমনই কীচক—তেমনই দ্রৌপদী। এই নাটকের অভিনয়ে অভিনেতাগণের মধ্যে প্রতিযোগিতার ভাব এমনই পরিস্ফুট হইয়া উঠিত, যে দর্শকগণের মধ্যে একটা উন্মাদনার স্রোত বহিয়া যাইত। অর্জ্জুন—মহেন্দ্রলাল বসু, তাঁহার—

"বার-বার দ্রৌপদীর অপমান—
সম্মুখে আমার!
বনবাস, পরবাস,
লুক্কায়িত ক্লীববেশে,—

ভগবান্! কিবধিক আর ?
হৃদয়ে অনল যত,
শরানল প্রজ্বলিত তত
করিব সমর-স্থলে ;
খাণ্ডব-দাহনে হেন অগ্নি না জ্বলিল !
দেখিব দেখিব—অক্ষয় তূণীরদ্বয়
কত শর করিবে প্রসব
সব্যসাচী করে মোর,
বুঝিব—বুঝিব গাণ্ডীবের কত বল।"

ইত্যাদি বীররসাত্মক অপূর্ব্ব অভিনয়-নৈপুণ্যে দর্শকগণকে মোহিত করিলেন। পরবর্ত্তী দৃশ্যে ভীমের আবির্ভাব, দর্শকগণ মনে করিতেছেন, মহেন্দ্রবাবুর পর আসর জমান সহজ হইবে না, কিন্তু ভীম অমৃতলাল মিত্র

"কোথা তৃপ্তি—কীচকের একমাত্র প্রাণ !
ছার সূতের নন্দন,
পদাঘাতে পদাঘাত কিবা হবে শোধ !
মৃত্যু দেখি দয়াশীল যুধিষ্ঠির হ'তে।
ক্ষুদ্র বক্ষ ধরে দুঃশাসন,—
বিদারি শোণিত-তৃষা কি মিটিবে মোর !
দুর্য্যোধন, হুতাশন হুতাশন জ্বলে—"

ইত্যাদি এমনভাবে অভিনয় করিলেন যে দর্শক পূর্ব্বদৃশ্যের চিত্র একেবারে ভুলিয়া গেলেন। তাহার পর কীচক-লাঞ্ছিতা দ্রৌপদীর রন্ধনশালায় প্রবেশ। দর্শক ভাবিতেছেন—ইহার উপর সুর চড়ে কি করিয়া! কিন্তু দ্রৌপদী যখন তেজ ও অভিমানের ঝঙ্কারে কহিলেন :—

"ধিক্ ধিক্ বীরাঙ্গনা বলি মনে করি অভিমান।
তিন দিন যদি ব'য়ে যায়,
কীচক না হারায় পরাণ,
ভগবান্, আত্মহত্যা না ডরিব—
পাসরিব দুঃশাসনে—
বেণী না বাঁধিয়া,
জলে তনু দিব বিসর্জ্জন।
নিদ্রিত, কি শুইয়াছ মহানিদ্রা-কোলে—
উঠ উঠ সূপকার!" ইত্যাদি

দর্শকগণ স্তম্ভিত হইয়া যাইলেন—তাঁহাদের যেন শ্বাসরোধ হইয়া আসিতে লাগিল। তাহার পর-দৃশ্যেই উপবনে কীচক

"প্রভাত-সমীরে শীতল না হয় প্রাণ,
জ্বলে — দেহ জ্বলে,
উষ্ণ ভালে না পরশে বায়ু,
উষ্ণ ওষ্ঠ সলিলে সরস নাহি হয়!" ইত্যাদি।

গিরিশচন্দ্র সম্পূর্ণ বিভিন্ন রসের অবতারণা করিয়া কীচকের যে মূর্ত্তি দর্শকের সম্মুখে ধরিলেন, সে মূর্ত্তি দেখিয়া দর্শক বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া গেলেন। বেলবাবুর উত্তর, কেদারবাবুর শ্রীকৃষ্ণ — তাহারই বা তুলনা কোথায়? যুধিষ্ঠির, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি ভূমিকাগুলি ক্ষুদ্র হইলেও যেন সজীব — কোন ভূমিকাই উপেক্ষণীয় হয় নাই। বহু প্রতিভার একত্র সমাবেশ এবং পরস্পরকে পরাজিত করিবার একটা তীব্র প্রতিযোগিতায় তখনকার অনেক নাটকই এমনিভাবে দর্শকের মনে একটা স্থায়ী ছাপ দিয়া দিত, যাহা দর্শক সহজে ভুলিতে পারিত না। এ সময়ের অভিনয় — অভিনয়ের একটা tournament বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

'মাধবীকঙ্কণ' অভিনয়

প্রতাপচাঁদবাবুর থিয়েটারে 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস'ই গিরিশচন্দ্রের শেষ নাটক। ইহার পূর্ব্বে স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের 'মাধবীকঙ্কণ' উপন্যাসখানি তিনি নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত করেন। 'ন্যাসান্যাল থিয়েটারে' ইহা অভিনীত হইয়াছিল। নাটকান্তর্গত সাজাহান, দর্জ্জি, মুদ্দফরাস, (grave-digger) প্রভৃতি সাতটী ছোট বিভিন্নপ্রকার চরিত্রের ভূমিকাভিনয়ে সাতরকম ছবি দেখাইয়া গিরিশচন্দ্র অভিনেতাগণকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে, শক্তি বা প্রতিভা থাকিলে অভিনয়-চাতুর্য্যগুণে ক্ষুদ্র ভূমিকারও প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া দর্শক সাধারণকে মুগ্ধ করিতে পারা যায়। বলা বাহুল্য, এইসময়ে নাটকের বড় পার্ট লইয়া প্রধান অভিনেতাগণের মধ্যে রেষারেষির ভাব দেখা দিয়াছিল।

গিরিশচন্দ্রের রচনা-পদ্ধতি

'ন্যাসান্যাল থিয়েটারে' গিরিশচন্দ্র দুই বৎসর অধ্যক্ষতা করিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে তিনি নয়খানি নাটক এবং ছয়খানি গীতিনাট্যাদি লিখিয়াছিলেন। প্রায় দুই মাস অন্তর তাঁহার নূতন নাটক অভিনীত হইত। সান্যাল-ভবনস্থ 'ন্যাসান্যাল থিয়েটার' বা 'গ্রেট ন্যাসান্যাল থিয়েটারে' কোনও নাটক ধারাবাহিকরূপে দুই-তিন সপ্তাহের অধিক অভিনীত হইত না। ইহার কারণ — সে সময়ে থিয়েটারের দর্শক-সংখ্যা সীমাবদ্ধ ছিল — বর্ত্তমানকালের ন্যায় আপামর সাধারণ পয়সা খরচ করিয়া থিয়েটার দেখিত না।

যে-সকল নাট্যামোদী সে সময়ে টিকিট কিনিয়া থিয়েটার দেখিতেন—নূতন নাটক দুই-তিন সপ্তাহ অভিনীত হইলেই, তাঁহাদের নিকট তাহা পুরাতন হইয়া যাইত—আবার তাঁহারা নূতন নাটকের প্রতীক্ষা করিতেন। বঙ্কিমচন্দ্র ইঁহাদিগকেই রহস্য করিয়া 'বঙ্গদর্শনে' "বাবু" প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন, "ন্যাসান্যাল থিয়েটার যাঁহাদের তীর্থ—তাঁহারাই বাবু।"

যাহাই হউক, প্রতাপচাঁদ জহুরীর সময়ে গিরিশচন্দ্রের সরল ভাষায় রচিত পৌরাণিক নাটকগুলি একেই সুন্দর রূপ অভিনীত হইত, তাহার উপর উৎকৃষ্ট পোষাক-পরিচ্ছদ এবং দৃশ্যপটের সুযশ বিস্তৃত হইয়া পড়ায়, পুরুষ ও স্ত্রী দর্শকের সংখ্যা অনেকটা বাড়িয়া গিয়াছিল। এ নিমিত্ত পূর্ব্বপ্রথা পরিবর্ত্তিত হইয়া দুই সপ্তাহের স্থলে গিরিশচন্দ্রের নূতন নাটকের উপর্য্যুপরি প্রায় দুই মাস ধরিয়া অভিনয় চলিত। 'ন্যাসান্যালে' সে সময়ে ইহা একটা গৌরবের কথা ছিল।

কৌতূহলী পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, গিরিশচন্দ্র দুই মাস অন্তর কিরূপে নূতন নাটক লিখিয়া এবং তাহার শিক্ষাদান করিয়া অভিনয় ঘোষণা করিতেন? প্রথমে আমাদেরও এইরূপ আশ্চর্য্য বোধ হইত, কিন্তু তাঁহার সংস্রবে আসিয়া এবং তাঁহার দ্রুত রচনাশক্তির পরিচয় পাইয়া বুঝিয়াছিলাম—ইহা তাঁহার ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতা।

তাঁহার গ্রন্থ-রচনার বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি স্বহস্তে পুস্তক লিখিতে অভ্যস্ত ছিলেন না। তিনি মুখে-মুখে বলিয়া যাইতেন এবং অপরে লিখিতে থাকিতেন। নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু, কেদারনাথ চৌধুরী, অমৃতলাল মিত্র, 'মহিলা' কাব্য-প্রণেতা সুরেন্দ্রবাবুর ভ্রাতা দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার, গিরিশচন্দ্রের পরমাত্মীয় এবং পরম স্নেহাস্পদ শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি মহাশয়েরা তাঁহার পুস্তকলিখনকার্য্যে ব্রতী ছিলেন। তাঁহার জীবনের শেষ পনের বৎসর আমি তাঁহার সংস্রবে আসিয়া প্রায় নিত্যসহচররূপে অতিবাহিত করিয়াছি। এই পনের বৎসরের মধ্যে যাহা কিছু তিনি রচনা করিয়াছেন, আমাকেই তাহা লিখিতে হইয়াছে।

নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি, 'ন্যাসান্যাল' ও 'ষ্টার থিয়েটারে'র অভিনীত নাটকগুলি রচনাকালে গিরিশচন্দ্র কখনও বসিয়া, কখনও বেড়াইতে-বেড়াইতে এত দ্রুত বলিয়া যাইতেন যে, কলমে কালি তুলিয়া লইবার অবকাশ হইত না; এ নিমিত্ত তিন-চারিটী পেন্সিল কাটিয়া লইয়া তাঁহার সহিত লিখিতে হইত। গিরিশচন্দ্র ভাবে বিভোর হইয়া বলিয়া যাইতেন, লেখার দিকে একেবারেই লক্ষ্য থাকিত না। প্রথম-প্রথম আমি তাঁহার সহিত লিখিবার সময় মধ্যে-মধ্যে অনুসরণ করিতে না পারিয়া 'কি?' বলিয়া পুনরুল্লেখ করিতে অনুরোধ করিতাম। গিরিশচন্দ্র ভাব-ভঙ্গে বিরক্ত হইয়া বলিতেন—"কি ক্ষতি করিলে জানো? যাহা বলিয়াছি তাহা তো মনেই নাই, আর যাহা বলিতে যাইতেছিলাম, তাহাও গোলমাল হইয়া গেল। যে স্থান লিখিতে না পারিবে, দুইটী তারা (star) চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া তাহার পর লিখিয়া যাইবে, পরে আমি সেই পরিত্যক্ত অংশ পূরণ করিয়া দিব। যাহা বলিয়াছি, তাহা ঠিকটী আর তেমন বাহির না হইলেও একটা লাভ এই হইবে,

যাহা বলিতে যাইতেছিলাম, সেটা ঠিক থাকিবে।"

'ন্যাসান্যাল থিয়েটারে' অভিনীত পৌরাণিক নাটকগুলির এক-একখানি লিখিতে গিরিশচন্দ্রের এক সপ্তাহের অধিক সময় লাগিত না। গিরিশচন্দ্র একাধারে নট ও নাট্যকার ছিলেন। নাটক লিখিবার কালে অনেক সময়ে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তিনি নাট্যোক্ত পাত্র-পাত্রীর উক্তি-প্রত্যুক্তি অভিনয়-ভঙ্গিতেই বলিয়া যাইতেন। এই নিমিত্ত তাঁহার নাটক অভিনয় করিতে অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণের বিশেষ সুবিধা হইত। কেহ-কেহ বলিয়া থাকেন, এরূপ দ্রুত রচনার জন্যই তাঁহার ভাষা অনেক স্থলেই সালঙ্কারা হইবার সুযোগ পায় নাই। এবং এই কারণে তাঁহার নাটকে উপমার বাহুল্য দেখা যায় না। কিন্তু গিরিশচন্দ্র বলিতেন, "ঘাত প্রতিঘাতই নাটকের জীবন, শব্দালঙ্কারে তাহাকে অযথা ভূষিতা করিতে যাইলে অস্বাভাবিক এবং কৃত্রিমতাপূর্ণ হইয়া পড়ে। নাটকের ভাষা যত প্রাঞ্জল হইবে, অভিনয়ও সেইরূপ সাফল্যমণ্ডিত হইবে। আমি যেখানে সহজ কথায় ঠিক মনোভাব পরিস্ফুট হইতেছে না বুঝিয়াছি – সেই স্থানে মাত্র উপমা ব্যবহার করিয়াছি, নচেৎ অযথা উপমা কিম্বা অলঙ্কারের ছটায় ভাবকে ভারাক্রান্ত করিতে প্রবৃত্ত হই নাই। নাটকের ভাষা সরল এবং স্বাভাবিক হইলে উচ্চশিক্ষিত হইতে অল্পশিক্ষিত পর্য্যন্ত সকলেই সমভাবে উপভোগ করিয়া থাকে। ভাঙ্গা অমিত্রাক্ষর ছন্দও এই উদ্দেশ্যেই প্রবর্ত্তন করিযাছিলাম।"

নাট্যকার গিরিশচন্দ্র

প্রতাপচাঁদবাবুর স্বত্বাধিকারিত্বে বঙ্গ-নাট্যশালা একটী প্রকৃত ব্যবসায়ের ক্ষেত্র হইয়া দাঁড়ায়। 'গ্রেট ন্যাসান্যাল থিয়েটারে'র বিশৃঙ্খলতা এখানে ছিল না। এই থিয়েটার হইতেই গিরিশচন্দ্রের ম্যানেজার-জীবন আরম্ভ। তাঁহার অধ্যক্ষতায় থিয়েটার ঠিকমত বিধিনিষেধ মান্য করিয়া এইসময় হইতেই সুশৃঙ্খলায় পরিচালিত হইতে আরম্ভ হয়। গিরিশচন্দ্র পূর্ব্বে একজন উৎকৃষ্ট অভিনেতা বলিযাই সাধারণের নিকট পরিচিত ছিলেন—'ন্যাসান্যাল থিয়েটার' হইতেই তিনি নট, নাট্যকার ও নাট্যাচার্য্য বলিয়া দেশবাসিগণের নিকট সমাদৃত হন। ভাল নাটকের নিমিত্ত তিনি পূর্ব্বে পুরস্কার ঘোষণা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, বীণাপাণি বাগ্দেবী কিন্তু তাঁহার অধ্যবসায়ের পুরস্কারস্বরূপ তাঁহাকেই বঙ্গ-রঙ্গালয়ের নাট্যকারপদে প্রতিষ্ঠিত করেন।

থিয়েটারের এই সময়ের অবস্থা বর্ণনা করিয়া সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার শ্রীযুক্ত অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 'রূপ ও রঙ্গ' নামক সাপ্তাহিকপত্রে "রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর" প্রসঙ্গে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া বর্ত্তমান পরিচ্ছেদ সমাপ্ত করিলাম।—

"এতদিন থিয়েটার নাটকের জন্য পরমুখাপেক্ষী ছিল। পরদত্ত অনুগ্রহে পুষ্ট তাহার ক্ষীণ কায় ঠিক পায়ের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইতে পারিতেছিল না। আজ দীনবন্ধুর নাটক, কাল বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস নাটকাকারে অভিনীত হইয়া কায়ক্লেশে যেন

থিয়েটারের মর্য্যাদা রাখিতেছিল। তারপর দুর্ভিক্ষের সময়ে যেমন অন্নের বিচার থাকে না, লোকে কদন্ন আহার করে, তেমনি যার-তার ছাইপাঁশ রাবিশ নাটক অভিনয়ের চাপে রঙ্গমঞ্চ প্রাণশূন্য হইয়া পড়িতে লাগিল। নাট্যবাণীর বরপুত্র গিরিশচন্দ্র ইহার সেই মৃতকল্প দেহে জীবন সঞ্চার করিলেন। তাঁহার সময় হইতেই লোকে বুঝিল কেবলমাত্র অভিনয়-প্রতিভা লইয়া জন্মাইলেই নাট্যশালার সর্বাঙ্গীণ শ্রীবৃদ্ধি করিতে পারা যায় না। (নাট্যবাণীর পূজার প্রধান উপকরণ—ইহার প্রাণ—ইহার অন্ন—নাটক। গিরিশচন্দ্র এদেশের নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন মানে—তিনি অন্ন দিয়া ইহার প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন, বরাবর স্বাস্থ্যকর আহার দিয়া ইহাকে পরিপুষ্ট করিয়াছিলেন, ইহার মজ্জায়-মজ্জায় রস সঞ্চার করিয়া ইহাকে আনন্দপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছিলেন, আর এইজন্যই গিরিশচন্দ্র Father of the native stage. ইহার খুড়া, জ্যাঠা আর কেহ কোনদিন ছিল না। ইহা এক প্রকার অভিভাবকশূন্য বেওয়ারিশ অবস্থায় টলিতেছিল, পড়িতেছিল, ধূলায় গড়াইতেছিল। যে অমৃত পানে বাঙ্গলায় নাট্যশালা এই পঞ্চাশ বৎসরাধিক বাঁচিয়া আছে, প্রকৃতপক্ষে সে অমৃতের ভাণ্ড বহন করিয়া আনিয়াছিলেন গিরিশচন্দ্র। কাজেই বাঙ্গলা নাট্যশালার পিতৃত্বের গৌরবের অধিকারী একা গিরিশচন্দ্র।" / ('রূপ ও রঙ্গ', ১৬ই শ্রাবণ ১৩৩২ সাল।)

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

ধর্ম-জীবনের দ্বিতীয়াবস্থা

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে গিরিশচন্দ্রের নাস্তিক-অবস্থার কথা বর্ণিত হইয়াছে। সে সময়ে তাঁহার দেহে হস্তীর বল, বিদ্যা-বুদ্ধির অভিমানে কিছুই দৃক্‌পাত করিতেন না। নাস্তিকতার সমর্থনকারী অধিকাংশ গ্রন্থই তিনি এই সময়ে অধ্যয়ন করিতেন এবং বেশ ডাকহাঁক করিয়া বলিতেন 'ঈশ্বর নাই'। কিন্তু চিরদিন সমান যায় না। সংসারে রোগ, শোক, দুর্দ্দিন, দুর্ঘটনা, দুর্জ্জনের পীড়ন আছেই।

দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহের প্রায় ছয় মাস পরে গিরিশচন্দ্র বিসূচিকা পীড়ায় আক্রান্ত হইলেন। রোগ অবশ্য জড়-নিয়মের অধীন, কিন্তু আরোগ্যলাভ করিলেন অলৌকিকরূপে। আবার আশ্চর্য্য এই যে, জড়ের নিয়ম যেমন প্রত্যক্ষ, যে অলৌকিক উপায়ে জীবনরক্ষা হইয়াছে, গিরিশচন্দ্রের কাছে তাহাও তেমনি প্রত্যক্ষ। চিকিৎসকগণ জীবনের আশা ছাড়িয়া দিয়াছেন, আত্মীয়স্বজন রুদ্ধকণ্ঠে মৃত্যুর অপেক্ষা করিতেছিলেন। এমন সময়ে গিরিশচন্দ্র দেখিলেন, তাঁহার স্বর্গগতা জননী আসিয়া তাঁহার মুখে কি বস্তু দিয়া বলিলেন, "এই মহাপ্রসাদ খাও, তুমি ভাল হইয়াছ, ভয় নাই।" এতটুকু পর্য্যন্ত স্বপ্ন হইতে পারে, কিন্তু যখন পূর্ণ চেতনা হইল, ইন্দ্রিয়গণ যখন নিজ-নিজ কার্য্য করিতে লাগিল, গিরিশচন্দ্রের রসনায় সেই মাতৃদত্ত মহাপ্রসাদের আস্বাদ তখনও অনুভূত হইতেছে। এ কি?—গিরিশচন্দ্রের মনে একটু চমক লাগিল। এই ঘটনার পর হইতেই তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবনের নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইল।

বিসূচিকা হইতে আরোগ্যলাভ করিবার পর নানা কারণে তিনি নানা বিপদে পতিত হইয়াছিলেন, সে কথা তাঁহার নিজের কথায় বলি, "বন্ধু-বান্ধবহীন, চারিদিকে বিপজ্জাল, দৃঢ়পণ শত্রু সর্ব্বনাশের চেষ্টা করিতেছে; এবং আমারই কার্য্য তাহাদের সম্পূর্ণ সুযোগ প্রদান করিয়াছে। উপায়ান্তর না দেখিয়া ভাবিলাম, ঈশ্বর কি আছেন? তাঁহাকে ডাকিলে কি উপায় হয়? মনে-মনে প্রার্থনা করিলাম যে, হে ঈশ্বর, যদি থাক, এ অকূলে কূল দাও। গীতায় ভগবান বলিয়াছেন, কেহ-কেহ আর্ত্ত হইয়া আমায় ডাকে, তাহাকেও আমি আশ্রয় দিই। দেখিলাম গীতার কথা সম্পূর্ণ সত্য। সূর্য্যোদয়ে অন্ধকার যেরূপ দূর হয়, অচিরে আশা-সূর্য্য উদয় হইয়া হৃদয়ের অন্ধকার দূর করিল, বিপদ-সাগরে কূল পাইলাম।" কিন্তু তবু মনের সন্দেহ যায় না। মনের এই সন্দেহাকুল অবস্থা গিরিশচন্দ্র তাঁহার কোনও-কোনও নাটকে বর্ণনা করিয়াছেন। যথা:—

"সোমগিরি। এ সংসার সন্দেহ-আগার,
বিভু নহে ইন্দ্রিয় গোচর।
ঈশ্বর লইয়া
তর্কযুক্তি করে অনুমান।
যত করে স্থির,
সন্দেহ-তিমির ততই আচ্ছন্ন করে।"

'বিল্বমঙ্গল'। ৩য় অঙ্ক, ৩য় গর্ভাঙ্ক।

ক্রমে এই সংশয়-সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় জীবনধারণ করা তাঁহার পক্ষে একপ্রকার অসম্ভব হইয়া উঠিল। আপনার অবস্থার কথা ভাবিতে-ভাবিতে তাঁহার যেন শ্বাসরুদ্ধ হইয়া আসিত। যাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করেন, তিনিই বলেন গুরূপদেশ ভিন্ন সন্দেহ দূর হইবে না। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের মন বলিল "গুরু কে?" শাস্ত্রে বলে 'গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দ্দেব মহেশ্বরঃ'। মানুষকে কেমন করিয়া এ কথা বলিব? মনের মাৎসর্য্য কি সহজে যায়? গিরিশচন্দ্রের 'চৈতন্যলীলা'য় মাৎসর্য্য বলিতেছে:—

"যদি মাতা কর গো প্রত্যয়,
একা আমি করি সমুদয়;
অতি হীন শ্রেষ্ঠ ভাবে আপনায়;
কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ পরাজয়
বুদ্ধিবলে অনায়াসে হয়,
সেই বুদ্ধি কিঙ্কর আমার;
বুদ্ধি তারে বলে,
ভূমণ্ডলে ধার্ম্মিক সুজন সেই।
গুরু কেবা, কিবা উপদেশ দিবে?"

'চৈতন্যলীলা'। ১ম অঙ্ক, ১ম গর্ভাঙ্ক।

তবে কি আমার কোনো উপায় হইবে না? গিরিশচন্দ্র ভাবিতে লাগিলেন, তারকনাথ ব্যাধি হরণ করেন—তারকনাথের শরণাপন্ন হই।

গিরিশচন্দ্র কেশশ্মশ্রু রাখিলেন, নিত্য গঙ্গাস্নান, শিবপূজা ও হবিষ্যান্ন ভোজন করিতে লাগিলেন। প্রতি বৎসর পদব্রজে ৺তারকেশ্বরে গমন করিয়া অতি নিষ্ঠার সহিত শিবরাত্রির ব্রতও করিতেন।* প্রার্থনা,—তারকনাথ আমার সংশয় ছেদন

* সর্ব্বপ্রথম পদব্রজে ৺তারকনাথ দর্শন করিয়া ফিরিবার সময় পথে গিরিশচন্দ্র এই গীতটী রচনা করিয়াছিলেন:—

"ওরে হ'রে সন্ন্যাসী।
মিট্‌বে প্রেমের ক্ষুধা, সুধা পাবি রে রাশি-রাশি।
দেখ্‌ রে আমি প্রেমের তরে, জটাঘটা শিরোপরে,
জাহ্নবী শিরে বিহরে, প্রেম অভিলাষী।
যুগে যুগে ক'রে ধ্যান, হয়নি প্রেমের তত্ত্বজ্ঞান,
ভেবে পরম শক্তি, চাইনি মুক্তি, আজও রে শ্মশানবাসী।

-কর। যদি গুরূপদেশ ব্যতীত সংশয় দূর না হয়, তুমি আমার গুরু হও।" কিছুদিন এইরূপ করিতে করিতে তারকনাথের কৃপায় গিরিশচন্দ্রের হৃদয়ে ক্রমে বিশ্বাস বদ্ধমূল হইতে লাগিল। এইসময়ে তিনি তাঁহার কোনও আত্মীয়কে বলিয়াছিলেন, আমার মনে হয়, এক শতাব্দীর উন্নতি আমার একদিনে হইতেছে। কিছুদিন এইরূপ নিয়ম ও ব্রত পালন করিবার পর, শ্রীভগবানের প্রত্যক্ষদর্শনের জন্য গিরিশচন্দ্রের মন একান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। শুনিয়াছিলেন, কালীঘাট সিদ্ধ পীঠস্থান, সেখানে সকল কামনাই সিদ্ধ হয়। প্রতি সপ্তাহে শ'নি ও মঙ্গলবারে নিয়মিতরূপে গিরিশচন্দ্র কালীঘাটে যাইতেন এবং কালীঘাটে হাড়কাঠের নিকট বসিয়া তিনি সমস্ত রাত্রি জগদম্বাকে ডাকিতেন। তাঁহার ধারণা ছিল, এই স্থান হইতে কত প্রাণী কাতর প্রাণে মাকে ডাকিয়াছে, এই স্থানের উপর নিশ্চয় মার দৃষ্টি আছে। কিছুদিন এইরূপ করিতে-করিতে তাঁহার হৃদয়ে বিশ্বাসের সহিত ভক্তির প্রবাহ বহিতে লাগিল! 'কালী করাল-বদনা' প্রভৃতি মাতৃনাম সদাসর্ব্বদা তিনি আন্তরিকতার সহিত উচ্চারণ করিতেন।

পাঠকগণ জ্ঞাত আছেন, গিরিশচন্দ্র পূর্ব্বে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করিতেন, পরে তাহা ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। এক্ষণে শ্রীশ্রীতারকনাথ ও জগন্মাতার উপর তাঁহার বিশ্বাস এতটা দৃঢ় হইয়াছিল যে তিনি মাতৃনাম স্মরণে, ঔষধ না দিয়া, কেবলমাত্র বিশ্বাসবলে এবং একাগ্র ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগে অনেকেব পুরাতন ও কঠিন পীড়া আরোগ্য করিতে লাগিলেন।

অমৃতবাবুর একটী কথা

গিরিশচন্দ্রের বর্ত্তমান ধর্ম্ম-জীবন সম্বন্ধে প্রবীণ নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয়ের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার একটী বিষয় তাঁহার নিজের কথায় নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম।—

"ক্ষীরোদ সাগর মন্থন ক'রে, সুরাসুর সুধা হ'রে,
বিদিত আছে চরাচরে, আমি গরল-প্রয়াসী।
নিয়ে বাঘের ছাল আর ধুতুরা ফুল, দেখব প্রেমের পাই কি কূল,
(ওরে) নকুলে কি আছেরে কূল, প্রেম-নীরে সদাই ভাসি।
ভূত নাচে সব ফেরে সঙ্গে, মত্ত সদা ভূতের রঙ্গে,
হবি অভিভূত ভূতের ভঙ্গে, মহাকাল, আমি নাশি।
প্রাণ তো কেবল চায় রে ভোগ, হয় রে তার যোগাযোগ,
সুখ আশে কর্ম্মভোগ, আমি সুখে উদাসী।
সুখ পাবিনে সুখের তরে, মিছে ঘুরিস ভ্রান্ত নরে,
দুঃখ ধ'রে থাক্‌লে পরে, সুখ তোমার হবে দাসী।
(ওরে) দেখ রে চেয়ে দারা-সুত, তোর মত সব অভিভূত,
কেন মনকে দিয়ে ধাতামৃত, আপন গলায় দাও ফাঁসী।"

"প্রায় ৪২ বৎসর সৌহার্দ্দ্য ও সাহচর্য্যে নাট্যকলা সম্বন্ধে অনেক জ্ঞান আমি গিরিশবাবুর নিকট লাভ করিয়াছি, বিশেষতঃ সেই সুদূর কৈশোরকালে তিনি একরূপ জোর করিয়া আমার প্রবৃত্তিকে জাগাইয়া না তুলিলে, আমি যা দুই-একখানা নাটক বা কবিতা লিখিয়াছি, তাহাও লিখিতাম কিনা—সন্দেহ। কিন্তু অভিনয়-বিদ্যার হাতে খড়ি আমার অর্দ্ধেন্দুর কাছে; হাস্যরস-অভিনয়ে নিত্যসিদ্ধ অর্দ্ধেন্দু আর আমি বিদ্যালয়ে সহপাঠী ছিলাম, কিন্তু তাঁহার নিকটই আমার অভিনয়-বিদ্যার হাতে খড়ি। গিরিশচন্দ্রকে যে আমি গুরু বলিয়া ভক্তি ও সম্বোধন করিতাম, তাহার কারণ—নাট্যবিদ্যা-শিক্ষা অপেক্ষা অনেক উচ্চতর।

"আমাদের সংসার সেকেলে ধরনের; ছেলেবেলা খুব ঠাকুরদেবতা মানিতাম, খেলার ছলেও ঠাকুর পূজা করিতাম। পরে যৌবনের প্রথম উদ্গমে কেশববাবুর নব অভ্যুদয়কালে প্রতিমা-পূজাকে পৌত্তলিকতা মনে করিয়া ব্রাহ্মভাবে মনকে গঠিত করিতে চেষ্টা করি। তারপর যখন সাধারণ নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার সঙ্গে-সঙ্গে থিয়েটার করিতে আরম্ভ করিলাম তখন কেমন একটা মনে হইল যে ঈশ্বরকে ডাকিবার আমার আর কোনও অধিকার নাই। শেষে অভ্যাসের আধিপত্যে দেবতার দ্বার হইতে বহুদূরে অন্ধকারে পড়িয়া গেলাম। এইরূপে কতকদিন যায়, একদিন গিরিশবাবুতে আমাতে তাঁহার বাড়ী হইতে বিডন ষ্ট্রীটে থিয়েটার যাইবার উদ্দেশ্যে একত্রে যাত্রা করিয়াছি, পথিমধ্যে বাগবাজারের শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী তলায় দাঁড়াইয়া গিরিশবাবু মাকে প্রণাম করিলেন; আমি চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। প্রণাম শেষ করিয়া যাইতে-যাইতে গিরিশবাবু আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি প্রণাম করিলে না?' আমি বলিলাম, 'না'। গিরিশবাবু আর কোনও কথা কহিলেন না। পরে শোভাবাজারের যে পঞ্চানন্দ ঠাকুর আছেন, গিরিশবাবু আবার সেখানে প্রণাম করিলেন, আমি অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া রহিলাম। পরে চলিতে আরম্ভ করিলে এবার গিরিশবাবু আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ওখানে ঘাড়টা ফিরিয়ে ছিলে কেন?' আমি উত্তর করিলাম, 'ও বাবা ঠাকুরটি অপয়া।' গিরিশবাবু বলিলেন, 'অপয়া বলিয়া তোমার বেশ বিশ্বাস আছে?' আমি বলিলাম, 'সকলেই তো বলে, কাজেই বিশ্বাস করিতে হয়।' গিরিশবাবু বলিলেন, 'বেশ, ঐ বিশ্বাসই ঠিক রেখো, ও ঠাকুরের আর মুখ দেখো না।' এ সম্বন্ধে সেদিন আর কোনও কথা হইল না; কিন্তু আমার মনে কেমন একটা খট্‌কা লাগিল, ভাবিলাম, যদি অপয়া বিশ্বাস করি, তবে পয়মন্ত বিশ্বাস করি না কেন? গিরিশবাবুর জীবনে তখন একটা অসাধারণ পরিবর্ত্তনের অবস্থা; ঘোর অবিশ্বাসী নিরীশ্বরবাদী গিরিশের রসনা তখন 'মা, মা' রবে মুখরিত। তিনি অনবরত মা মা, মা কালী, কালী করালবদনা ইত্যাদি উচ্চারণ করেন, আর আমরা দেখিতে পাই যে তাঁহার বক্ষ যেন শক্তিতে স্ফীত হয়, মুখমণ্ডল যেন এক অনৈসর্গিক তেজে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠে। তাঁহার বিশ্বাস তখন এত দৃঢ়, এত সংশয়ের ছায়ামাত্র শূন্য যে তিনি দর্প করিয়া বলিতেন, 'বেটীকে গাল ভ'রে, বুক ভ'রে চেঁচিয়ে ডেকে যা চাব, তাই পাব।' সভ্যসমাজে কুসংস্কারাচ্ছন্ন মূর্খ বলিয়া প্রতিপন্ন হইবার আশঙ্কাকে উপেক্ষা৲

করিয়া বলিতেছি যে মা কালী করালবদনা ইত্যাদি স্তোত্রপাঠ করিয়া গিরিশবাবু অতি অল্প সময়ের মধ্যে অনেকের মজ্জাগত বহুদিনব্যাপী পুরাতন পীড়ার উপশম করিয়াছেন, ইহা আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। পরে একদিন 'মৃণালিনী' নাটকে পশুপতির ভূমিকা অভিনয় করিতে-করিতে তাঁহার এমন এক অবস্থা হয় যে তিনি সেইদিন, সেই সময়েই প্রতিজ্ঞা করেন যে, আব মার নিকট শক্তি চাহিব না, কিছু চাহিব না, ক্ষমতা জাহির করিব না। আমাদেরও ব'লিতেন, 'মাকে ডাকো, কিন্তু কিছু চেয়ে-টেয়ে কাজ নেই।'* গিরিশবাবু 'মা, মা' করিতেন, তাই থিয়েটারের অন্যান্য সকলেও 'মা, মা' করিত, সঙ্গে-সঙ্গে আমিও বচন আওড়াইতাম, কিন্তু প্রাণে তৃপ্তি হইত না, কেমন ফাঁকা ঠেকিত। একদিন সন্ধ্যার পর আমরা থিয়েটাবে ষ্টেজের উপর বসিয়া আছি, সেদিন যেটুকু রিহারস্যাল দিবার কার্য্য ছিল, তাহা সকাল-সকাল শেষ হইয়া গিযাছে। গিরিশবাবু আমাদের সঙ্গে মার নাম সম্বন্ধে নানা কথা বলিতেছেন, এমন সময় আমার প্রাণের ভেতর কেমন একটা কষ্টকব কাতরতা আসিল, বেদনার কণ্ঠে অতি দীনভাবে গিরিশবাবুকে বলিলাম যে মশায়, আমি তো একরকম ছিলুম, আপনার দেখাদেখি এখন

* "শ্রীযুক্ত গিরিশ এই সময়ে অভিনয়ান্তে একদিন নির্জ্জনে অন্ধকারে বসিযা শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে সকাতরে ডাকিতেছেন, এমন সময তাঁহার মনে হইল, ঘর যেন দিব্য আবেশে পূর্ণ হইতেছে এবং দূর হইতে কে যেন তাঁহাকে সম্বোধন করিযা বলিতেছেন, 'গিরিশ, তুই আমাকে দেখিতে চাহিযাছিস্, আমি আসিযাছি, ত্থাখ্। ইহজীবনের যত কিছু আশা, ভরসা আনন্দ, উল্লাস,—সর্ব্বস্ব অন্তর হইতে পরিত্যাগ কবিযা ত্থাখ্, কারণ, নিজে শব না হইলে কেহ কখন শবশিবাকে দেখিতে পায় না এবং আমার দর্শনলাভের পর সংসারে আবার কেহ কখন ফিরিয়া আসে না। অতএব শব হইযা আমাকে দেখিতে প্রস্তুত হও, মুহূর্ত্তমাত্র পরেই আমি তোর সম্মুখে আসিতেছি।'

"গিরিশচন্দ্র বলিতেন—ঐরূপ শুনিবামাত্র প্রাণভয়ে হৃদয় ব্যাকুল হইযা উঠিল এবং এখনি মরিলে আমার পুত্রকন্যার এবং আমার মুখাপেক্ষী আমাব দরিদ্র বন্ধুবর্গের কি দশা হইবে, সে-সকল কথা যুগপৎ মনে উদিত হইল; তখন চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বারম্বার বলিতে লাগিলাম, 'না, আমি ঐরূপে তোমাকে এখন দেখিতে পারিব না।' তখন পূর্ব্বাপেক্ষা স্পষ্ট শুনিতে পাইলাম—'আচ্ছা না দেখিবি ত আমার নিকট হইতে বর গ্রহণ কর, আমার আগমন কখনও ব্যর্থ হয় না, ইহসংসারে লভ্য যাহা কিছু তোর ইচ্ছা হয়, তাহাই চাহিযা নে।' তখন রূপরসাদিবিশিষ্ট ভোগ্য পদার্থ সকলের যে কোনটা চাহিয়া লইব বলিযা কল্পনা করিতে লাগিলাম, জাগ্রত বিবেক-বুদ্ধি তদুপভোগেরই ভীষণ পরিণাম-ছবি জ্বলন্ত বর্ণে অঙ্কিত করিয়া পূর্ব্ব হইতে মৃত্যুভয়ে ত্রস্ত হৃদয়ের সম্মুখে ধারণ করিতে লাগিল। তখন সভয়ে বলিয়া উঠিলাম, 'আমি বর লইব না।' ধীর গম্ভীর স্বরে পুনরায উত্তর আসিল—'আমার আগমন কখনই ব্যর্থ হইবে না, যদি বরও না লইবি ত আমায ডাকিয়া আনিলি কেন—আমার অভিসম্পাত গ্রহণ কর্, আমার এ উদ্যত খড়্গ তোর কিসের উপর পতিত করিয়া বিনষ্ট করিব, তাহা বল?' শুনিয়া, মনে ভীষণ ভয় হইল, কিন্তু ভয় হইলেও বিবেক-বুদ্ধি বলিয়া উঠিল—দেবতাকে মন্দ দ্রব্য দিতে নাই। তখন ভাবিয়া-চিন্তিয়া বলিলাম—'মা, সুনট বলিয়া আমার যে সুনাম আছে, তাহার উপরে তোমার খড়্গ পতিত হউক।' উত্তর আসিল—'তথাস্তু।'—পরে আর কিছু দেখিলাম না, শুনিতেও পাইলাম না। শাস্ত্রে যে বলিতে শুনিয়াছি, দেবতার ক্রোধও বরের তুল্য—'ক্রোধোঽপি দেবস্য বরেণ তুল্যঃ'—আমি তাহা পূর্ব্বোক্ত ঘটনায় বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি, কারণ, ঐ দর্শনের পর হইতে সত্যসত্যই আমার নটত্বের যশকে আমার সুলেখক বলিয়া খ্যাতি ক্রমে সম্পূর্ণরূপে প্রচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল।" শ্রীশ্রীশচন্দ্র মতিলাল, "ভক্ত গিরিশচন্দ্র", 'উদ্বোধন', ১৫শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, বৈশাখ ১৩২০, ২০০-০১ পৃষ্ঠা। (স্বামী শ্রীসারদানন্দ কর্ত্তৃক সম্যক্ সংশোধিত, পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত।)

'মা, মা' করিয়া ডাকি, কিন্তু তাতে প্রাণের ভেতর যেন আরও ফাঁক পড়িয়া যায়, এর চেয়ে না ডাকা ছিল ভাল। গিরিশবাবু প্রায় মিনিটখানেক চুপ করিয়া থাকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং আমাকে বলিলেন, 'শোনো—এদিকে এসো।' ষ্টেজের মাঝখানে একখানি সিন জোড়া ছিল, তাহার পশ্চাতে সব অন্ধকার। গিরিশবাবু সেখানে গিয়া আসনপিঁড়ি হইয়া বসিলেন, এবং আমাকে সেইরূপভাবে সম্মুখে বসিতে বলিলেন। পরে আমার দুই উরুতে তাঁহার দুইখানি হস্ত স্থাপন করিয়া অসুরনাশিনী শ্যামা নামের কোন স্তোত্র বিশেষ ঘন-ঘন পাঠ করিতে লাগিলেন, তাঁহার উপদেশমত আমিও তাঁহার দুই উরুতে হস্ত দিয়া, তাঁহার সঙ্গে-সঙ্গে সেই স্তোত্র পাঠ করিতে লাগিলাম; ক্রমে আমার শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল, ভিতরে যেন কি একটা সুখদ বিদ্যুৎ খেলিতে লাগিল, কম্পিত কলেবর কম্পিত কণ্ঠে আমি গিরিশবাবুর পা আঁকড়াইয়া ধরিয়া বলিলাম, 'গুরু, গুরু, আজ তুমি আমায় মাকে ডাকাইয়াছ, এ শান্তি—এ উল্লাস—এ আনন্দ আমি আর কখনও অনুভব করি নাই।' লোকে জানে গিরিশবাবু কেবল আমার নাট্যকলার গুরু, আমি জানি, তিনি আমার মনুষ্যত্বের গুরু।

শ্রীঅমৃতলাল বসু।"

ইচ্ছা-শক্তি-প্রয়োগ (will-force)

গিরিশচন্দ্র একদিন 'ন্যাসান্যাল থিয়েটারে'র সম্মুখে পদচারণা করিতে-করিতে তাঁহার পূর্ব-বন্ধু 'কামিনী-কুঞ্জ' গীতিনাট্য-রচয়িতা ও 'সাহিত্য-সংহিতা'-সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিহে গোপালবাবু, তোমার চেহারা এত খারাপ হইয়া গেল কিসে? তোমাকে আমি প্রথমে চিনিতেই পারি নাই।" গোপালবাবু উত্তর করিলেন, "অম্বলের ব্যারামে ভারি ভুগছি, এমন হয়েছে যে সাগু বার্লি খেলেও অম্বল হয়। উপবাস করেই দেখছি, শীগ্‌গির মৃত্যু হবে। এখন মলেই বাঁচি।" গিরিশচন্দ্র সে সময়ে ইচ্ছা-শক্তি (will-force)-প্রয়োগে অনেকেরই উৎকট রোগ আরোগ্য করিতেছিলেন। তিনি গোপালবাবুর কথা শুনিয়া হাসিতে-হাসিতে বলিলেন, "আজই তোমার ব্যারাম ভাল করে দিব।" এই বলিয়া বাজার হইতে গরম-গরম কচুরী এক ঠোঙা কিনিয়া আনাইলেন তাহাকে বলিলেন, "নির্ভয়ে পরিতোষপূর্ব্বক আহার কর।" গোপালবাবু ভয় পাওয়ায় গিরিশচন্দ্র বলিলেন, "ভয় কী—খাও, এই তো বলছিলে, মলেই বাঁচি, না খেয়ে মরতে, না হয় খেয়েই মরবে। আমার কথায় বিশ্বাস কর, আজ তোমার রোগ আরোগ্যের দিন।" গিরিশবাবু এত উৎসাহের সহিত অথচ গাম্ভীর্য্য সহকারে কথাগুলি বলিলেন, যে, গোপালবাবু ভরসা পাইয়া পরম তৃপ্তির সহিত সেগুলি আহার করিলেন। গিরিশচন্দ্র পরে তাঁহাকে এক গ্লাস সুশীতল জল খাইতে দিয়া বলিলেন, "তুমি নিশ্চয় জানবে তুমি আরোগ্য হয়ে গেছ, যাহা ইচ্ছা হবে খাবে, ভয় কর না।" কিছুদিন পরে

রোগমুক্ত গোপালবাবু বেশ হৃষ্টপুষ্ট হইয়া থিয়েটারে গিরিশচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন এবং তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করেন।

'ষ্টার থিয়েটারে' একদিন রাত্রে নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয়ের বিসূচিকা পীড়ার সূত্রপাত হয়। অমৃতবাবু ব্যাকুল হইয়া পড়েন, থিয়েটারের লোক সব ব্যস্ত। গিরিশচন্দ্র ইচ্ছা-শক্তি প্রয়োগ করিয়া বলেন, "যা তোর রোগ ভাল হয়ে গেছে।" বাস্তবিক সেই রাত্রি হইতেই অমৃতবাবু আরোগ্য হইতে থাকেন।

গিরিশচন্দ্রের ইচ্ছা-শক্তি-প্রয়োগে রোগ আরোগ্য সম্বন্ধে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের নিম্নলিখিত পত্রখানি প্রকাশিত হইল।—

"আমার বাল্যবন্ধু পরমপ্রীতিভাজন শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় উক্ত সময় ম্যালেরিয়া জ্বরে পীড়িত হন। একদিন অন্তরে বেলা দ্বিপ্রহরে জ্বর আসিত। এইরূপ ছয় মাস অতীত হইয়া গেল, কিছুতেই কিছু হইল না। আমি গিরিশদাদাকে বলিলাম। তিনি একটী সাগুদানা আমার হাতে দিয়া বলিলেন, 'তুই উপেনকে বলিস, গিরিশদাদা এই ঔষধ দিয়াছে, নিশ্চয় আরাম হবে!' জ্বরের পালার দিন উপেন্দ্রবাবুকে সাগুদানাটী খাওয়াইয়া আমি সেইরূপ বলিলাম। দ্বিপ্রহরের সময় উপেন্দ্রের চোখ ঈষৎ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, কপাল প্রভৃতিও ঈষৎ উষ্ণ হইল। আমি বলিলাম, 'আজ আর কিছুতেই জ্বর আসিবে না।' অল্পক্ষণের মধ্যেই উপেন্দ্রবাবুর অল্প-অল্প ঘাম হইয়া সে ভাব কাটিয়া গেল এবং সেইদিন হইতে এ পর্য্যন্ত আর তাঁহার সেরূপ জ্বর হয় নাই। ছয়টী পালার সময় অতীত হইবার পর আমি উপেন্দ্রবাবুকে সকল কথা ভাঙ্গিয়া বলি।

শ্রী দেবেন্দ্রনাথ বসু।"

"বন্ধুবর দেবেন্দ্রবাবুর বর্ণিত ঘটনা সম্পূর্ণ সত্য।

শ্রী উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

৭ নং শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯১৩ খ্রী।"

গিরিশচন্দ্রের পুত্র শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু) মহাশয় বলেন:—

"বাল্যকালে আমার একটী শালিক পাখী ছিল, তাহাকে বড়ই ভালবাসিতাম, নিজে তাহাকে খাওয়াইয়া দিতাম। একদিন স্কুল হইতে আসিয়া দেখি, পাখীটী খাঁচার ভিতর মরণাপন্ন অবস্থায় রহিয়াছে—আমি কাঁদিতে লাগিলাম। সে সময়ে বাপি (সুরেন্দ্রনাথ বাবা না বলিয়া 'বাপি' বলিয়া ডাকিতেন) বাটীর ভিতর আহার করিতেছিলেন। আমার কান্না শুনিয়া বলিলেন, 'কি হয়েছে?' আমি বলিলাম, 'আমার পাখীর 'শুকো' ধরেছে—ম'রে যাবে।' তখন আমের সময়, তাঁহাকে আম খাইতে দেওয়া হইয়াছিল, পাতের সামনে আমের খোসা পড়িয়াছিল। তিনি একটী খোসা তুলিয়া লইয়া বলিলেন, 'এই খোসা উহাকে খাইয়ে দে।' আমি বলিলাম, 'ও মরে, ও খাবে কি করে?' তিনি বিরক্ত হইয়া জোর করিয়া বলিলেন, 'তুই দে না।' আমি এক টুকরা খোসা লইয়া খাঁচার ভিতর গলাইয়া দিয়া ঠিক ঠোঁটের সামনে ফেলিয়া রাখিলাম। তাহার পর গৃহশিক্ষক আসায় পড়িতে যাইলাম।

মাষ্টারমহাশয় পড়াইয়া চলিয়া গেলে তাড়াতাড়ি পাখীর কাছে আসিয়া দেখি, পাখীটা ভাল হইয়া গিয়াছে, সে খাঁচার ভিতর আনন্দে গা-ঝাড়া দিয়া লাফাইয়া বেড়াইতেছে।"

সুরেন্দ্রবাবু এ সম্বন্ধে আর-একটা ঘটনা বলেন, "আমার পুরাতন গৃহশিক্ষকের পেটের মধ্যে কি হইয়াছিল—পেট উঁচুনিচু করিলে ঘটঘট করিয়া শব্দ হইত। সে শব্দ ঘরের বাহির পর্য্যন্ত শোনা যাইত। মাষ্টারমশায় নানারকম চিকিৎসা করাইয়াছিলেন, কিন্তু কোনও ফল পান নাই। আমি বাপিকে মাষ্টারমশায়ের পীড়ার কথা বলায়, তিনি তাঁহাকে একটা শিশিতে জল পুরিয়া তাহাতে একটু কর্পূর মিশাইয়া খাইতে দিলেন। প্রায় সপ্তাহ পরে মাষ্টারমহাশয় আসিয়া বলিলেন, 'আশ্চর্য্য, আমার পীড়া একেবারে সারিয়া গিয়াছে!'"

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শ্রীচরণে আশ্রয় লাভের পর গিরিশচন্দ্র এই শক্তি বর্জ্জন করেন। পরমহংসদেব এরূপ শক্তি-চালনার পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি বলিতেন, "এ সকল মানুষকে ক্রমে বুজ্‌রুক করিয়া তোলে, ও সব ভাল নয়।' গিরিশচন্দ্রের আর-একটী বিশেষ শক্তি ছিল, পত্র না খুলিয়া পত্রের মর্ম্ম বলিয়া দিতে পারিতেন। ইচ্ছা-শক্তি-বর্জ্জনের সঙ্গে-সঙ্গে ইহাও পরিত্যাগ করেন।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

'ষ্টার থিয়েটার' ও গিরিশচন্দ্র

প্রতাপচাঁদবাবুর থিয়েটার দুই বৎসর খুব জোরের সহিত চলিয়াছিল। তাঁহার থিয়েটারেই প্রথম প্রতিপন্ন হয় যে বাঙ্গলাদেশেও থিয়েটার করিয়া লাভ করা যায়। জহুরীমশায় পাকা ব্যবসাদার হইলেও, তাঁহার অর্থনীতি উদার ছিল না। যখন থিয়েটারে যথেষ্ট লাভ হইতেছে, তখন সম্প্রদায়ের বেতনবৃদ্ধির সঙ্গত প্রার্থনায় কর্ণপাত না করিয়া, তিনি দলের সহিত মনোমালিন্যের সূত্রপাত করিলেন। ফলতঃ বাঙ্গালী অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের প্রতি তাঁহার তেমন একটা সহানুভূতি ছিল না। গিরিশচন্দ্র ছিলেন অধ্যক্ষ—দলপতি তিনি, সুতরাং সম্প্রদায়ের অনুযোগ ও প্রার্থনাদি তাঁহাকেই শুনিতে হইত। কিন্তু কৃপণস্বভাব প্রতাপচাঁদবাবু যখন গিরিশচন্দ্রের পুনঃ-পুনঃ অনুরোধ সত্বেও তাঁহার কথা রাখিলেন না, তখন অগত্যা গিরিশচন্দ্রকে 'ন্যাসান্যাল থিয়েটারে'র সংস্রব পরিত্যাগ করিতে হইল। তাঁহার সঙ্গে অমৃতলাল মিত্র, অঘোরনাথ পাঠক, নীলমাধব চক্রবর্ত্তী, উপেন্দ্রনাথ মিত্র, কাদম্বিনী, ক্ষেত্রমণি, শ্রীমতী বিনোদিনী প্রভৃতিও থিয়েটার ছাড়িয়া দিলেন।

ইঁহাদিগের বেশীদিন বসিয়া থাকিতে হয় নাই। প্রতাপচাঁদবাবুর থিয়েটারে অনেক মাড়োয়ারীও দর্শক হিসাবে থিয়েটার দেখিতে আসিতেন। এই মাড়োয়ারী সম্প্রদায়ের একটী তরুণ যুবক থিয়েটারেব ব্যবসায়ে আমোদ ও অর্থের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দেখিয়া বোধহয় আর-একটী নূতন থিয়েটার খুলিবার ইচ্ছা করেন। ইঁহার নাম গুর্ম্মুখ রায়। ইঁহার পিতা হোরমিলার কোম্পানীর প্রধান দালাল ছিলেন। পিতৃ-বিয়োগের পব অল্পবয়সে ইনিও উক্ত কোম্পানীর প্রধান দালাল হইয়াছিলেন। ইঁহার স্বত্বাধিকারিত্বে এবং গিরিশচন্দ্রের তত্ত্বাবধানে ৬৮ নং বিডন ষ্ট্রীটস্থ জমী (উপস্থিত যেখানে 'মনোমোহন থিয়েটার') বাগবাজারের সুবিখ্যাত কীর্ত্তিচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের নিকট হইতে লিজ লইয়া তথায় নূতন নাট্যশালা নির্ম্মাণ আরম্ভ হইল। 'ন্যাসান্যাল থিয়েটার' কাষ্ঠনির্ম্মিত হইয়াছিল—এবার ইষ্টকনির্ম্মিত বাটী হইল, নাম হইল 'ষ্টার থিয়েটার'।

গিরিশচন্দ্রের রচিত 'দক্ষযজ্ঞ' নামক নূতন পৌরাণিক নাটক লইয়া ৬ই শ্রাবণ (১২৯০ সাল) 'ষ্টার থিয়েটার' মহাসমারোহে প্রথম খোলা হয়। প্রথম অভিনয় রজনীর অভিনেতৃগণ :—

দক্ষ	গিরিশচন্দ্র ঘোষ।
মহাদেব	অমৃতলাল মিত্র।
দধীচি	শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু।
ব্রহ্মা	নীলমাধব চক্রবর্ত্তী।
বিষ্ণু	শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মিত্র।
নারদ	মথুরানাথ চট্টোপাধ্যায়।
নন্দী	অঘোরনাথ পাঠক।
ভৃঙ্গী	প্রবোধচন্দ্র ঘোষ।
মন্ত্রী	গিরীন্দ্রনাথ ভদ্র।
দূতগণ	প্রবোধচন্দ্র ঘোষ, মহেন্দ্রনাথ চৌধুরী, অবিনাশচন্দ্র দাস (ব্রাণ্ডী) ও শ্রীযুক্ত পরাণকৃষ্ণ শীল।
প্রসূতি	কাদম্বিনী।
ভৃগু-পত্নী	গঙ্গামণি।
চেড়ী	যাদুকালী।
তপস্বিনী	ক্ষেত্রমণি।
সতী	শ্রীমতী বিনোদিনী। ইত্যাদি।

সম্পূর্ণরূপ হাস্যরস-বর্জ্জিত হইয়া আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার প্রীতি-আকর্ষণে 'দক্ষযজ্ঞ' নাটক যেরূপ সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, বঙ্গ-রঙ্গালয়ে এরূপ দ্বিতীয় নাটক বড়ই বিরল। নাটকান্তর্গত তপস্বিনী চরিত্রটী গিরিশচন্দ্রের নূতন সৃষ্টি। নাট্যসম্পদে এবং ভাবের গভীরতায় 'দক্ষযজ্ঞ' যেমন সাহিত্যিক-মহলে সমাদৃত হইয়াছিল, ইহার অভিনয়ও সেরূপ অতুলনীয় হইয়াছিল। গিরিশচন্দ্রের দক্ষের ভূমিকাভিনয় যিনি একবার দেখিয়াছেন, বোধহয় তিনি তাহা জীবনে ভুলিতে পারেন নাই। ব্রহ্মার বরে দক্ষ প্রজাপতি—প্রজা সৃষ্টি করিবার শক্তিলাভ করিয়াছিলেন। গিরিশচন্দ্রের অসাধারণ অভিনয়ে—তাঁহার অদ্ভুত ভাবভঙ্গিতে—যথার্থই যেন তাঁহাকেই সৃষ্টিকর্ত্তা (creator) বলিয়া বোধ হইত। যে-যে দৃশ্যে তিনি রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইতেন, দর্শকগণ সিংহের ন্যায় তাঁহার গাম্ভীর্য্য এবং বজ্রের ন্যায় কাঠিন্য দেখিয়া যেন স্পন্দনহীন হইয়া অবস্থান করিতেন। জনৈক সাহিত্যিক গল্প করিয়াছিলেন, "'ষ্টার থিয়েটারে' দক্ষের অভিনয় দেখিয়া আসিয়া দক্ষের মুখ-নিঃসৃত সতীর প্রতি সেই "অপমান—মান আছে যার; ভিখারীর মান কিরে ভিখারিণী?" তীব্রোক্তি সাত দিন ধরিয়া তাঁহার কানে

বাজিয়াছিল।" মহাদেবের ভূমিকায় অমৃতলাল মিত্র যখন "কে – রে দে রে – সতী দে আমার!" বলিয়া রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিতেন তখন যেন রঙ্গমঞ্চের সহিত সমস্ত দর্শকগণ পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিত। এইসময় হইতেই অমৃতলালবাবু অতি উচ্চশ্রেণীর অভিনেতা বলিয়া পরিগণিত হন। শ্রীমতী বিনোদিনীর সতীর ভূমিকাভিনয়ে সতীত্বের প্রভা যেন প্রত্যক্ষীভূত হইত। যজ্ঞস্থলে পিতার প্রতি সম্মানপ্রদর্শন অথচ দৃঢ়বাক্যে স্বামীর পক্ষ সমর্থন, পতিনিন্দায় প্রাণেব তীব্র ব্যাকুলতা তৎপরে প্রাণত্যাগ – স্তরে-স্তরে অতি দক্ষতার সহিত প্রদর্শিত হইত। দধীচি, প্রসূতি, তপস্বিনী, নন্দী, ভৃঙ্গী, ব্রহ্মা, বিষ্ণু প্রভৃতি প্রত্যেক ভূমিকাই নিখুঁতরূপ অভিনীত হইয়াছিল।

'দক্ষযজ্ঞ' নাটকে কাচের উপর আলো ফেলিয়া দশমহাবিদ্যার চমকপ্রদ আবির্ভাব ও তিরোভাব দেখাইয়া সুপ্রসিদ্ধ নাট্যশিল্পী জহরলাল ধর বিশেষরূপ প্রশংসালাভ করিয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীতাচায্য বেণীমাধব অধিকারী 'দক্ষযজ্ঞে'র গানগুলির সুমধুর সুর সংযোজনা করিয়াছিলেন।

এ স্থলে বলা আবশুক, গিরিশচন্দ্র প্রতাপচাঁদবাবুর থিয়েটার পরিত্যাগ করিয়া আসিবার সময় অনেককে তাঁহার সঙ্গে চলিয়া আসিতে দেখিয়া প্রতাপবাবু ব্যস্ত হইয়া মহেন্দ্রলাল বসু, কেদারনাথ চৌধুরী, রামতারণ সান্যাল, বেলবাবু, ধর্ম্মদাস সুর, শ্রীমতী বনবিহারিণী (ভুনি) প্রভৃতি কয়জনকে আটকাইয়া ফেলেন এবং কেদারনাথবাবুকে ম্যানেজার করিয়া থিয়েটার চালাইতে আরম্ভ করেন। নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় 'সীতাহরণ' নাটকাভিনয়ের পর 'ন্যাসান্যাল থিয়েটার' হইতে 'বেঙ্গল থিয়েটারে' চলিয়া গিয়াছিলেন। 'বেঙ্গল থিয়েটার' ছাড়িয়া এইসময়ে তিনি গিরিশচন্দ্রের সহিত পুনর্ম্মিলিত হন।

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে লিখিত হইয়াছে, গিরিশচন্দ্র কালীঘাটে গিয়া কালীমন্দিরে মাতৃনাম জপ করিতেন। এইসময়েই তিনি 'দক্ষযজ্ঞ' নাটক রচনা করেন। নাটকের শিক্ষাদান সমাপ্ত হইলে, এক রাত্রি মায়ের নাট-মন্দিরে ড্রেস রিহারস্যালস্বরূপ 'দক্ষযজ্ঞ' অভিনীত হয়। জগজ্জননী-সম্মুখে অভিনয় করিয়া গিরিশচন্দ্রের প্রাণে পরম তৃপ্তিলাভ হইয়াছিল। তাহার পর নিয়মিত বিজ্ঞাপন ঘোষণা করিয়া 'ষ্টার থিয়েটারে' ইহা অভিনীত হয়।

'ধ্রুবচরিত্র'

'ষ্টার থিয়েটারে' গিরিশচন্দ্রের দ্বিতীয় নাটক 'ধ্রুবচরিত্র' ২৭শে শ্রাবণ (১২৯০সাল) প্রথম অভিনীত হয়। প্রথম অভিনয় রজনীর অভিনেতৃগণ :—

উত্তানপাদ	অমৃতলাল মিত্র।
বিদূষক	শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু।
মহাদেব	উপেন্দ্রনাথ মিত্র।
ব্রহ্মা	নীলমাধব চক্রবর্ত্তী।
নারদ	অঘোরনাথ পাঠক।
ধ্রুব	ভূষণকুমারী।
সুনীতি	কাদম্বিনী।।
সুরুচি	শ্রীমতী বিনোদিনী। ইত্যাদি।

এই ভক্তিরসাত্মক পৌরাণিক নাটকখানির অভিনয় সর্ব্বজন-সমাদৃত হইয়াছিল। ধ্রুবের ভূমিকা ভূষণকুমারী অতি সুন্দর অভিনয় করিয়াছিলেন, ধ্রুবের সুমিষ্ট কথায় এবং গানে দর্শকমাত্রেই মুগ্ধ হইতেন। সাহিত্যরথী অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় "ফুটিলে ফুল ধ্রুব তোলে না,—ফুলে পূজা হবে তা তো ভোলে না।" গীতখানির বিশেষরূপ সুখ্যাতি করিয়াছিলেন। উত্তানপাদ, বিদূষক, নারদ, সুনীতি, সুরুচি প্রভৃতি ভূমিকাগুলিরও চমৎকার অভিনয় হইয়াছিল। বিদূষক চরিত্রাঙ্কনে গিরিশচন্দ্রের অপূর্ব্ব সৃষ্টিশক্তির কথা নাট্যামোদীমাত্রেরই নিকট পরিচিত। বলিয়া রাখা ভাল, এই নাটকেই তাঁহার সৃষ্ট বিদূষক চরিত্রের প্রথম সূচনা। এক্ষণে কি সূত্রে 'ধ্রুবচরিত্র' নাটকখানি লিখিত হয়, তৎসম্বন্ধে প্রবীণ অভিনেতা শ্রীযুক্ত হরিদাস দত্ত মহাশয় যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :

কথকতা-শক্তি

"সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা ও নাট্যকার স্বর্গীয় কেদারনাথ চৌধুরী মহাশয়ের কলিকাতার বাসাবাটীতে একদিন কথকতা সম্বন্ধে প্রসঙ্গ উঠে। গিরিশবাবু বলেন, 'কথকতা বড়ই কঠিন, একই ব্যক্তিকে একই সময় ভিন্ন-ভিন্ন চরিত্র ও রসের অবতারণা করিয়া অভিনয় করিতে হয়। বিশেষরূপ যোগ্যতা না থাকিলে প্রত্যেক চরিত্রের বিভিন্নতা দেখাইতে পারা বড় কঠিন, তার উপর সাজসরঞ্জাম, দৃশ্যপট ও সহকারী অভিনেতার সহায়তা থাকে না।' কেহ-কেহ বলিলেন, 'সুনিপুণ হইলেও একই ব্যক্তি কর্ত্তৃক ভিন্ন-ভিন্ন চরিত্র অভিনয়, বিশেষতঃ কণ্ঠস্বরের বিভিন্নতা প্রদর্শন, কদাচ সম্ভবপর নহে।' গিরিশচন্দ্র বলিলেন, 'আচ্ছা, কাল আমি কথকতা করিয়া তোমাদিগকে শুনাইব। চরিত্রগত পার্থক্য দেখান যায় কিনা, কণ্ঠস্বরের বৈলক্ষণ্য হয় কিনা, এবং রসের অবতারণায়

শ্রোতাকে মুগ্ধ করা যায় কিনা, তোমরাই বিবেচনা করিয়া দেখিবে।'

তৎপর দিবস কেদারবাবু বহু বন্ধু-বান্ধব নিমন্ত্রণ করিয়া বাসায় একটী ক্ষুদ্র উৎসবের আয়োজন করেন। গিরিশবাবু স্বয়ং কথকতা করিবেন শুনিয়া ৫০।৬০ জন ভদ্রলোক একত্র হন। গিরিশচন্দ্র 'ধ্রুবচরিত্রে'র কথা বলেন। বিভিন্ন রসে, বিভিন্ন ভাষায় এবং বিভিন্ন ভঙ্গীতে প্রত্যেক চরিত্রের বিভিন্ন অভিনয়ে সেদিন সকলেই এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন। এইসকল শ্রোতার অনুরোধে গিরিশবাবু পরে 'ধ্রুবচরিত্র' নাটক প্রণয়ন করেন।"

'নল-দময়ন্তী'

৭ই পৌষ (১২৯০ সাল) 'ষ্টার থিয়েটারে' গিরিশচন্দ্রের তৃতীয় নাটক 'নল-দময়ন্তী' প্রথম অভিনীত হয়। প্রথমাভিনয় রজনীর অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণের নাম :—

নল	অমৃতলাল মিত্র।
বিদূষক	শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু।
পুষ্কর	নীলমাধব চক্রবর্ত্তী।
কলি	অঘোরনাথ পাঠক।
দ্বাপর, শঙ্খ ও গ্রামবাসী	শ্রীযুক্ত পরাণকৃষ্ণ শীল।
ভীমসেন, মন্ত্রী ও মুনি	মহেন্দ্রনাথ চৌধুরী।
ঋতুপর্ণ ও হংস	উপেন্দ্রনাথ মিত্র।
ইন্দ্র ও প্রথম ব্যাধ	প্রবোধচন্দ্র ঘোষ।
অগ্নি ও সারথি	শ্রীযুক্ত কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়।
বরুণ ও দূত	শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (বাণুবাবু)।
দূত	শ্যামাচরণ কুণ্ডু।
ব্যাধ	গিরীন্দ্রনাথ ভদ্র।
দময়ন্তী	শ্রীমতী বিনোদিনী।
রাজমাতা	গঙ্গামণি।
সুনন্দা	ভূষণকুমারী।
রাণী, ব্রাহ্মণী ও জনৈক বৃদ্ধা	ক্ষেত্রমণি।
ধাত্রী	যাদুকালী। ইত্যাদি।

'ন্যাসান্যাল থিয়েটার' উভয় সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া যাওয়ায় 'ষ্টার থিয়েটারে' অনেক নবীন অভিনেতা প্রবেশলাভ করিয়াছিলেন। উত্তরকালে তাঁহারাও শিক্ষা-নৈপুণ্যে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছিলেন।

'নল-দময়ন্তী' নাটক রচনায় গিরিশচন্দ্রের যেরূপ কৃতিত্ব প্রকাশ পাইয়াছিল, ইহার অভিনয়ও সেইরূপ চমৎকার হইয়াছিল। অমৃতলাল মিত্রের নল, অমৃতলাল বসুর

বিদূষক, নীলমাধব চক্রবর্ত্তীর পুষ্কর, অঘোরনাথ পাঠকের কলি এবং শ্রীমতী বিনোদিনীর দময়ন্তী ভূমিকার জীবন্ত অভিনয় দর্শনে দর্শকগণ শতমুখে সুখ্যাতি করিয়াছিলেন। প্রত্যেক ভূমিকাই নির্দ্দোষভাবে অভিনীত হইয়াছিল। বেণীবাবুর সুর ও কাশীনাথবাবুর নৃত্যশিক্ষায় নাচগানেরও বড়ই বাহার খুলিয়াছিল। পূর্ব্বে থিয়েটারে নাচের কোনওরূপ একটা নিয়ম-পদ্ধতি ছিল না। নৃত্য যে সঙ্গীতের একটী প্রধান অঙ্গ, তাহাও নৃত্যে প্রস্ফুটিত হইত না—শুধু তালে-তালে পা ফেলিয়া চলিয়া যাইত মাত্র—তাহাকে নৃত্যকলা বলা যায় না। এই 'নল-দময়ন্তী' নাটক হইতে কাশীনাথবাবু পূর্ব্ব-প্রচলিত নৃত্যের ধারা অনেক বদলাইয়া কতকটা পরিমার্জ্জিত করিয়াছিলেন। বৈজ্ঞানিক শিল্প-প্রবর্ত্তনে রঙ্গমঞ্চের সৌন্দর্য্যবৃদ্ধির অভিপ্রায়ে গিরিশচন্দ্র 'নল-দময়ন্তী' নাটকে কমল-কোরক প্রস্ফুটিত হইয়া অপ্সরাগণের আবির্ভাব, বস্ত্র লইয়া সহসা পক্ষীর আকাশে উত্থান ইত্যাদি কয়েকটী দৃশ্য সংযোজন করিয়াছিলেন। নাট্য শিল্পী জহরলালবাবু তাহা সুসম্পন্ন করিয়া 'দক্ষযজ্ঞে' দশমহাবিদ্যা প্রদর্শনের ন্যায় সুযশ অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

উপর্য্যুপরি তিনখানি নাটক সগৌরবে অভিনীত হওয়ায় 'ষ্টার থিয়েটারে'র ভিত্তি যেরূপ সুদৃঢ় হইয়া উঠিল, গিরিশচন্দ্রের রচনাশক্তি এবং নাট্যপ্রতিভাও সেইরূপ সুপ্রতিষ্ঠিত হইল।

গুর্ম্মুখ রায়ের থিয়েটার ত্যাগ

উন্নতির এই প্রথম প্রভাতেই গুর্ম্মুখ রায় অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং তাঁহাকে সামাজিক শাসনের কঠোরতায় থিয়েটার ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইতে হয়। তিনি থিয়েটার বিক্রয় করিবার সঙ্কল্প করিলে গিরিশচন্দ্র সম্প্রদায়ের নেতা হইয়া তাঁহাদের সঙ্কটাবস্থার কথা গুর্ম্মুখবাবুকে বিশেষরূপ বুঝাইলে তিনি বলেন, "আমি বিস্তর টাকা-ব্যয়ে বাড়ী তৈরী করিয়াছি, আপনারা আমায় এগার হাজার টাকা মাত্র দিন, আমি আপনাদের হস্তে থিয়েটার ছাড়িয়া দিতেছি।" এই অপ্রত্যাশিত উত্তর পাইয়া গিরিশচন্দ্র সানন্দে সম্প্রদায়স্থ সকলকে বলিলেন, "যে টাকা আনিতে পারিবে, তাহাকেই থিয়েটারের মালিক করিয়া দিব, কে টাকা আনিবে আনো।" গিরিশচন্দ্রের সৎপরামর্শে এবং উৎসাহবাক্যে উৎসাহিত হইয়া অমৃতলাল মিত্র, শ্রীযুক্ত হরিপ্রসাদ বসু* এবং দাসুচরণ নিয়োগী—ইঁহারা কয়েক সহস্র টাকা লইয়া আসিলেন, অবশিষ্ট টাকা যোড়াসাঁকো-নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ হরিধন দত্ত মহাশয়ের ভ্রাতা কৃষ্ণধনবাবুর নিকট ঋণগ্রহণ করা হইল। নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় কার্য্যকুশল, বুদ্ধিমান

* হরিপ্রসাদবাবুর বাগবাজার চীৎপুর রোডের উপর একটী ডাক্তারখানা ছিল। গিরিশচন্দ্র থিয়েটারে যাইবার সময়ে প্রায়ই তাঁহার ডাক্তারখানায় একবার বসিয়া দুইটা গল্প করিয়া যাইতেন। হরিবাবুও গিরিশচন্দ্রকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। তিনি হিসাবপত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন।

এবং সুশিক্ষিত বলিয়া থিয়েটারে গিরিশচন্দ্রের দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন। গিরিশচন্দ্র ইঁহাকে লইয়া থিয়েটারের চারিজন স্বত্বাধিকারী নির্ব্বাচিত করিলেন, এবং গুর্ম্মুখ রায়ের টাকা শোধ করিয়া দিয়া থিয়েটারের স্বত্ব উক্ত চারিজনের নামে রেজিষ্টারী করিয়া লইলেন। গিরিশচন্দ্র ইচ্ছা করিলে তিনিও এ সময়ে একজন স্বত্বাধিকারী হইতে পারিতেন, কিন্তু অনুজ অতুলকৃষ্ণের নিকট তিনি সত্যবদ্ধ হইয়াছিলেন, যতদিন থিয়েটারের সংস্পর্শে থাকিবেন, থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী হইবার কখনও চেষ্টা করিবেন না। সে প্রতিজ্ঞা তিনি ভোলেন নাই। তিনি ইঁহাদিগকে স্বত্বাধিকারী করিয়া যেরূপ থিয়েটারের অধ্যক্ষতা, নাটক রচনা, শিক্ষাপ্রদান এবং আবশ্যকবোধে অভিনয় করিয়া আসিতেছিলেন, সেইরূপই করিতে লাগিলেন। স্বত্বাধিকারিগণও ইঁহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া ইঁহারই অধিনায়কত্বে আপন-আপন নির্দ্দিষ্ট কার্য্য করিয়া যাইতে লাগিলেন।

এইসময়ে কলিকাতায় গড়ের মাঠে 'ইণ্টারন্যাসান্যাল একজিবিসন' আরম্ভ হয়। এরূপ বিরাট এবং মহাসমারোহের একজিবিসন্ কলিকাতায় এ পর্য্যন্ত হয় নাই। সমস্ত ভারতবর্ষের নৃপতিগণ, দেশীয় রাজারাজড়া ও জমিদারগণ কলিকাতায় সমাগত হইয়াছিলেন। দেশ-বিদেশ হইতে অসংখ্য লোকসমাগমে কলিকাতা সহর সরগরম হইয়া উঠিয়াছিল। চৌরঙ্গীর পথে লোক চলাচলের সুবিধার নিমিত্ত মিউজিয়ম হাউস হইতে গড়ের মাঠ পর্য্যন্ত একটি সুপ্রশস্ত সেতু নির্ম্মিত হইয়াছিল। সহরে এইরূপ লোক-সমুদ্র দেখিয়া 'ষ্টার থিয়েটার' সম্প্রদায়ও প্রত্যহ 'নল-দময়ন্তী'র অভিনয় চালাইতে লাগিলেন। বিক্রয়ও যথেষ্ট হইতে লাগিল। ফলতঃ এই একজিবিসন্ হইতে সম্প্রদায়ের ঋণ-পরিশোধের বিশেষরূপ সুবিধা হইয়াছিল। থিয়েটারে একটিমাত্র রয়েল বক্স থাকিত, এইসময়ে একদিন থিয়েটারে অনেক রাজা আসিয়া উপস্থিত। কর্ত্তৃপক্ষগণ কি করিবেন —সম্মান সহকারে সাধারণ বক্সগুলিতেই তাঁহাদের বসাইয়া দিলেন। রয়েল বক্সের পূর্ণ মূল্য দিয়া সাধারণ বক্সে বসিয়াই তাঁহারা আনন্দের সহিত অভিনয় দেখিয়া গেলেন।

গিরিশবাবু তাঁহার হিসাব রাখিবার সুপ্রণালী এবং খাতাপত্রের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা দেখিয়া বড়ই আনন্দ প্রকাশ করিতেন। গুর্ম্মুখবাবুর থিয়েটার-বাটী নির্ম্মাণকালে হিসাবপত্র রাখিবার নিমিত্ত একজন সুনিপুণ কর্ম্মচারীর আবশ্যক হয়। গিরিশচন্দ্র হরিপ্রসাদবাবুকে লইয়া গিয়া উক্ত পদ প্রদান করেন। থিয়েটার-বাটী নির্ম্মাণ হইবার পর হরিবাবু থিয়েটারের কোষাধ্যক্ষের পদ প্রাপ্ত হন।

'কমলে কামিনী'

'নল-দময়ন্তী' নাটকে অভাবনীয় কৃতকার্য্য হইয়া গিরিশচন্দ্র অতঃপর কবিকঙ্কণের 'চণ্ডী অবলম্বনে 'কমলে কামিনী' নাটক রচনা করিলেন। ১৭ই চৈত্র (১২৯০ সাল) 'ষ্টার থিয়েটারে' ইহার প্রথম অভিনয় হয়। প্রথম অভিনয় রজনীর অভিনেতৃগণ :—

গুরুমহাশয় ও সভাসদ	শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু।
ধনপতি, গণক ও নারদ	অঘোরনাথ পাঠক।
বিশ্বকর্ম্মা ও জল্লাদ	নীলমাধব চক্রবর্ত্তী।
দারুব্রহ্মা	শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (রাণুবাবু)।
হনুমান	শ্যামাচরণ কুণ্ডু।
শালিবাহন	উপেন্দ্রনাথ মিত্র।
শ্রীমন্ত	শ্রীমতী বনবিহারিণী।
মন্ত্রী	ত্রৈলোক্যনাথ ঘোষাল।
কারাধ্যক্ষ ও কোটাল	শ্রীযুক্ত পরাণকৃষ্ণ শীল।
চণ্ডী ও খুল্লনা	শ্রীমতী বিনোদিনী।
পদ্মা ও দুর্ব্বলা	ক্ষেত্রমণি।
লহনা	গঙ্গামণি।
সুশীলা	ভূষণকুমারী।
ধাত্রী	যাদুকালী। ইত্যাদি।

'কমলে কামিনী'র উপাখ্যান একেই বঙ্গবাসীমাত্রেরই সুপরিচিত, তাহাতে গিরিশচন্দ্রের রচনাকৌশলে এবং বিচিত্র সৃষ্টিনৈপুণ্যে নাটকখানি পরম উপভোগ্য হইয়াছিল। জহরলালবাবুর গুণপনায় কালীদহে কমলে কামিনী প্রভৃতি দৃশ্যগুলিও অতি সুন্দর দেখান হইত। তাহার উপর শ্রীমন্তের ভূমিকায় শ্রীমতী বনবিহারিণী সুমধুর ভক্তিরসাত্মক সঙ্গীতে দর্শকগণকে মুগ্ধ করিয়া রাখিতেন। 'কমলে কামিনী' 'ষ্টার-থিয়েটার' ব্যতীত 'ক্লাসিক' ও 'মিনার্ভা থিয়েটারে' বহুবার সুখ্যাতির সহিত অভিনীত হইয়াছে।

'কমলে কামিনী' লিখিবার পূর্ব্বে গিরিশচন্দ্র সমুদ্র দর্শন করেন নাই। শ্রীমতী বনবিহারিণী শ্রীমন্তের ভূমিকাভিনয়ের কিছুদিন পরে ৺পুরীধামে জগন্নাথ দর্শনে গমন করেন। কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া একদিন থিয়েটারে গিরিশচন্দ্রকে বলিলেন, "মহাশয়, আপনি 'কমলে কামিনী' নাটকে যেরকম সমুদ্রের বর্ণনা করেছেন, ঠিক সেইরকম সাগর দেখে এলুম। আপনি সমুদ্র দেখে এসে বুঝি সেই ছবিটী মিলিয়ে নাটক লিখেছেন ?" গিরিশচন্দ্র বলিলেন, "আমি এ পর্য্যন্ত সাগর দেখি নাই, তবে নানা বই-এ সমুদ্রের বর্ণনা পড়েছি—লোকের মুখে শুনেছি,—সেইভাবেই লিখেছি।" বনবিহারিণী কোনওমতে গিরিশচন্দ্রের কথায় বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। তিনি পুনরায় বলিলেন, "না মশায়, চোখে না দেখে শুধু বই পড়ে এমন ঠিকঠাকটী লেখা যায়

না।" বনবিহারিণী কিছুতেই ধারণা করিতে পারিলেন না, যে, কবি ও নাট্যকার অনেক সময় অনেক জিনিষ প্রত্যক্ষ না করিয়াও স্বীয় কল্পনাবলে তাহার স্বরূপমূর্ত্তি চিত্রিত করিতে পারেন।

'বৃষকেতু' ও 'হীরার ফুল'

৫ই বৈশাখ (১২৯১ সাল) গিরিশচন্দ্রের দুই অঙ্কে সমাপ্ত 'বৃষকেতু' নাটক এবং 'হীরার ফুল' নামক একখানি 'অপ্সরা গীতিহার' 'ষ্টার থিয়েটারে' প্রথম অভিনীত হয়। ইহার সহিত নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসুর 'চাটুয্যে-বাড়ুয্যে' নামক একখানি প্রহসন — মোট তিনখানি একরাত্রে অভিনীত হইয়াছিল। 'বৃষকেতু' নাটকের প্রথম অভিনয় রজনীর অভিনেতৃগণ :—

কর্ণ	উপেন্দ্রনাথ মিত্র
প্রহরী	পরাণকৃষ্ণ শীল।
বিষ্ণু	অঘোরনাথ পাঠক।
বৃষকেতু	ভূষণকুমারী।
পাচক ব্রাহ্মণ	ত্রৈলোক্যনাথ ঘোষাল।
ভৃত্যগণ	নীলমাধব চক্রবর্ত্তী, অবিনাশচন্দ্র দাস (রাঙা) ও পরাণকৃষ্ণ শীল।
পদ্মাবতী	শ্রীমতী বিনোদিনী।
পরিচারিকা	গঙ্গামণি।
জনৈক স্ত্রীলোক	ক্ষেত্রমণি। ইত্যাদি।

উপযুক্ত অভিনেতা ও অভিনেত্রীর সম্মিলনে 'বৃষকেতু' অতি সুখ্যাতির সহিত অভিনীত হইয়াছিল। জহরলালবাবু রঙ্গমঞ্চের উপর বৃষকেতুর শিরশ্ছেদ দেখাইয়া দর্শকগণকে বিস্মিত ও চমকিত করিতেন। 'ষ্টার' ব্যতীত 'মিনার্ভা' 'ক্লাসিক', 'মনোমোহন' প্রভৃতি থিয়েটারে ইহার বহুবার অভিনয় হইয়া গিয়াছে।

'হীরার ফুল' গীতিনাট্যের প্রথমাভিনয় রজনীর অভিনেতৃগণ :—

মদন	শ্রীযুক্ত কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়।
অরুণ	প্রবোধচন্দ্র ঘোষ।
দৈত্য	শ্রীঅঘোরনাথ পাঠক।
রতি	ভূষণকুমারী।
শশীকলা	শ্রীমতী বিনোদিনী।
সঙ্গীত-শিক্ষক	বেণীমাধব অধিকারী।
নৃত্য-শিক্ষক	শ্রীযুক্ত কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়।

চুটকী গান ও চুটকী সুরের উপর 'হীরার ফুল' দর্শকগণের বড়ই মুখরোচক

হইয়াছিল। মদন ও রতির নৃত্য-গীতকালীন দর্শকগণের ঘন-ঘন আনন্দ ও করতালি-ধ্বনিতে রঙ্গালয় মুখরিত হইয়া উঠিত। 'হীরার ফুলে'র গানগুলি সে সময়ে সাধারণের মুখে-মুখে ফিরিত। বহু থিয়েটারে বহুবার ইহার অভিনয় হইয়া গিয়াছে।

'শ্রীবৎস-চিন্তা'

২৬শে জ্যৈষ্ঠ (১২৯১ সাল) 'ষ্টার থিয়েটারে' গিরিশচন্দ্রের 'শ্রীবৎস-চিন্তা' নামক পৌরাণিক নাটক প্রথম অভিনীত হয়। প্রথমাভিনয় রজনীর অভিনেতৃগণ:—

শ্রীবৎস	অমৃতলাল মিত্র।
বাতুল	শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু।
বাহুরাজ	উপেন্দ্রনাথ মিত্র।
শনি	নীলমাধব চক্রবর্ত্তী।
মন্ত্রী	মহেন্দ্রনাথ চৌধুরী।
সওদাগর	অঘোরনাথ পাঠক।
চিন্তা	শ্রীমতী বিনোদিনী।
ভদ্রা	ভূষণকুমারী।
লক্ষ্মীদেবী	গঙ্গামণি। ইত্যাদি।

'শ্রীবৎস-চিন্তা' নাটকের রচনা এবং অভিনয় অতি সুন্দর হইলেও 'নল-দময়ন্তী' নাটকের পর অভিনীত হওয়ায় ইহা দর্শকগণের নিকট তেমন নূতনত্বপূর্ণ হয় নাই। কলি-কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত নলরাজার উপাখ্যানের সহিত শনি-কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত শ্রীবৎস রাজার উপাখ্যান যে প্রায় একইরূপ, পাঠকগণকে তাহা বিস্তৃতভাবে বুঝান বাহুল্যমাত্র। কিন্তু এই নাটকে গিরিশচন্দ্রের বাতুল চরিত্র সম্পূর্ণ নূতন সৃষ্টি। দরিদ্র বাতুল মৃত্যুকে তো গ্রাহ্যই করে না। দুঃখের সঙ্গে বহুদিনের প্রণয়—দুঃখের সঙ্গে তাহার ঠাট্টা-বটকিরি চলে। রাজা দয়ার্দ্র হইয়া বাতুলকে রাজপুরে স্থান দেন। বাতুলের পেটে অন্ন পড়েছে শোবার শয্যা জুটেছে, বাতুলের চোখে আর নিদ্রা নাই। বাতুল বলে, "না বাবা, ঘুম হবার যো নেই, আজ রাস্তার সেই সুকোমল কাঁকর নেই, আর মাঝে-মাঝে কোটাল সাহেবের হুঙ্কার নেই, আবার বিষমস্ত বিষমং, উদরে অন্ন পড়েছে।" ইত্যাদি।

বহুকাল পরে এই নাটকের 'মিনার্ভা থিয়েটারে' পুনরভিনয় হইয়াছিল। সম্প্রদায় অভিনয়ে বিশেষ সুখ্যাতিলাভ করেন। সুবিখ্যাতা অভিনেত্রী এবং কোকিলকণ্ঠী গায়িকা শ্রীমতী সুশীলাবালা লক্ষ্মীর ভূমিকা গ্রহণ করিয়া সুমধুর সঙ্গীতে দর্শকগণকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন।

'চৈতন্যলীলা'

১৯শে শ্রাবণ (১২৯১ সাল), ২রা আগষ্ট ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে 'ষ্টার থিয়েটারে' গিরিশ-চন্দ্রের 'চৈতন্যলীলা' প্রথম অভিনীত হয়। প্রথম অভিনয় রজনীর অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ :—

জগন্নাথ মিশ্র	নীলমাধব চক্রবর্ত্তী।
নিমাই (চৈতন্য)	শ্রীমতী বিনোদিনী।
নিত্যানন্দ ও পাপ	শ্রীমতী বনবিহারিণী।
গঙ্গাদাস	মহেন্দ্রনাথ চৌধুরী।
অদ্বৈত	উপেন্দ্রনাথ মিত্র।
প্রতিবাসী ও লোভ	শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু।
শ্রীবাস	অবিনাশচন্দ্র দাস।
মুকুন্দ ও মাৎসর্য্য	শ্রীযুক্ত কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়।
অতিথি ও হরিদাস	অঘোরনাথ পাঠক।
জগাই ও বিবেক	প্রবোধচন্দ্র ঘোষ।
মাধাই, ক্রোধ ও কলি	অমৃতলাল মিত্র।
শচী ও ভক্তি	গঙ্গামণি।
লক্ষ্মী	প্রমদাসুন্দরী।
বিষ্ণুপ্রিয়া	কিরণবালা।
বৈরাগ্য	পরাণকৃষ্ণ শীল।
মোহ	ক্ষেত্রমণি। ইত্যাদি।

সঙ্গীতাচার্য্য বেণীমাধব অধিকারী মহাশয় এই নাটকের সুমধুর সুর সংযোজনা করেন। 'ইনি বামাং বৈষ্ণব, সুপ্রসিদ্ধ গায়ক আহম্মদ খাঁর প্রধান ছাত্র ও সহরে একজন উচ্চশ্রেণীর গায়ক বলিয়া পরিচিত ছিলেন। বৈষ্ণবী ঢংয়ে নৃত্য ইঁহার দ্বারাই প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়। শ্রীমতী বিনোদিনীর চৈতন্যের ভূমিকায় নৃত্য দর্শনে অনেক সাধু হৃদয় বিমুগ্ধ হইয়াছিল।'

'চৈতন্যলীলা'র রচনা যেরূপ মধুর এবং ভগবদ্ভক্তি-উদ্দীপক, ইহার অভিনয়ও সেইরূপ প্রাণস্পর্শী ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল। চৈতন্যের ভূমিকাভিনয়ে শ্রীমতী বিনোদিনী অদ্ভুত কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এতদ্‌সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্র শ্রীমতী বিনোদিনীর 'আমার কথা' গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছিলেন, "গৌরাঙ্গমূর্ত্তির ব্যাখ্যা—'অন্তঃ কৃষ্ণ বহিঃ রাধা—পুরুষ-প্রকৃতি এক অঙ্গে জড়িত।' এই পুরুষ-প্রকৃতির ভাব বিনোদিনীর অঙ্গে প্রতিফলিত হইত। বিনোদিনী যখন 'কৃষ্ণ কই—কৃষ্ণ কই?' বলিয়া সংজ্ঞাহীনা হইত, তখন বিরহবিধুরা রমণীর আভাস পাওয়া যাইত। আবার চৈতন্যদেব যখন ভক্তগণকে কৃতার্থ করিতেছেন, তখন পুরুষোত্তম-ভাবের আভাস বিনোদিনী আনিতে পারিত। অভিনয় দর্শনে অনেক ভাবুক এরূপ বিভোর হইয়াছিলেন যে, বিনোদিনীর

পদধূলি গ্রহণে উৎসুক হন।…বিনোদিনী অতি ধন্যা, পরমহংসদেব করকমল দ্বারা তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া শ্রীমুখে বলিয়াছিলেন, 'চৈতন্য হোক।' অনেক পর্ব্বত-গহ্বর-বাসী এ আশীর্ব্বাদের প্রার্থী।"

শুভক্ষণে গিরিশচন্দ্র এই নাটক লিখিয়া পাশ্চাত্যশিক্ষাভিমানী নব্যবঙ্গ ও মুণ্ডিত মস্তক তিলকধারী বৈষ্ণবকে একাসনে বসাইয়া কাঁদাইয়াছিলেন। নাট্যমন্দিরকে এই সময়ে বঙ্গবাসী ধর্ম্মমন্দিরের চক্ষে দেখিয়া যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করেন। 'চৈতন্যলীলা'র অভিনয় দর্শনে সমস্ত বঙ্গদেশ হরিনামে মাতিয়া উঠিয়াছিল। আমরা এ স্থলে একটী ঘটনার উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। নবদ্বীপের সুবিখ্যাত পণ্ডিত ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন মহাশয় 'চৈতন্যলীলা'র অভিনয় দর্শনের নিমন্ত্রণপত্র পাইয়া, এবং উক্ত নাটকের দেশব্যাপী সুখ্যাতি শ্রবণে, তাঁহার পুত্র পণ্ডিত মথুরানাথ পদরত্নকে বলেন, "হ্যাঁরে, থিয়েটারে 'চৈতন্যলীলা' হচ্ছে কি?—তবে কি আবার গৌর এলো? একবার কোলকাতা গিয়ে দেখে আয় তো।" মথুরানাথ কলিকাতা আসিয়া 'চৈতন্যলীলা'র অভিনয় দর্শনে উন্মত্তের ন্যায় গ্রন্থকারের পদধূলি লইতে অগ্রসর হইয়া পুনঃপুনঃ বলিয়াছিলেন, "তোর মনোবাঞ্ছা গৌর পূর্ণ করবেন।" সুবিখ্যাত সাধক প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী 'চৈতন্যলীলা' দেখিতে আসিয়া প্রেমোন্মত্তভাবে দর্শকের আসন হইতে উঠিয়া নৃত্য করিতে থাকেন।

নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় 'চৈতন্যলীলা' অভিনয় সম্বন্ধে লিখিয়া-ছিলেন:

"বখাটে নট ও অখাঁটি নটীবৃন্দ দ্বারা দেশে ধর্ম্ম প্রচার হইল। ছিঃ ছিঃ! এ কথা মনে আসিলেও, স্বীকার করিতে নাই, তাতে মহা পাপ আছে! কিন্তু কে জানে কেমন, তারিখে একটু গোলমাল করে, মনে হয় যেন এই নগণ্য সম্প্রদায়কে 'জঘন্য' বেদীতে শ্রীকৃষ্ণ-মহিমা কীর্ত্তন করিতে শুনিয়াই ধর্ম্মবিপ্লবকারী বীরগণ অন্তরে ঈষৎ কম্পিত হইলেন, আর ধর্ম্মপ্রাণ নিদ্রিত হিন্দু জাগরিত হইয়া ব্রজরাজ ও নবদ্বীপচন্দ্রের বিশ্বমোহন প্রেম প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। নগরে-নগরে, গ্রামে-গ্রামে, পল্লীতে-পল্লীতে সঙ্কীর্ত্তন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইল, গীতা ও চৈতন্যচরিতের বিবিধ সংস্করণে দেশ ছাইয়া পড়িল। বিলাত-প্রত্যাগত বাঙ্গালী সন্তানও লজ্জিত না হইয়া সগর্ব্বে আপনাকে হিন্দু হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে আরম্ভ করিল।"

ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব 'চৈতন্যলীলা' অভিনয়ের সুখ্যাতিশ্রবণে দক্ষিণেশ্বর হইতে ৫ই আশ্বিন তারিখে ভক্তগণসহ 'ষ্টারে' আসিয়া 'চৈতন্যলীলা' অভিনয় দেখিয়া পরম আনন্দ প্রকাশ করিয়া যান। অভিনয় সমাপ্ত হইলে জনৈক ভক্ত জিজ্ঞাসা করিয়া-ছিলেন, "কেমন দেখলেন?" ঠাকুর হাসিতে-হাসিতে বলেন, "আসল-নকল এক দেখলাম।"*

ঠাকুরের পদার্পণে নট-নটীগণের জীবন সার্থক এবং রঙ্গালয় ধন্য হয়। থিয়েটারে ঠাকুরের এই প্রথম আগমন।

* যাঁহারা বিস্তৃত বিবরণ জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা শ্রীম-কথিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত' (দ্বিতীয় ভাগ) পাঠ করুন।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

ধর্ম্ম-জীবনের তৃতীয় অবস্থা—গুরুলাভ

গুরুলাভের নিমিত্ত গিরিশচন্দ্রের তীব্র ব্যাকুলতার কথা ত্রিংশ পরিচ্ছেদে বলিয়াছি। মাতৃ-নাম সাধনে ক্রমে তাঁহার হৃদয়ে বিশ্বাসের সহিত ভক্তির প্রবাহ বহিতে লাগিল, গিরিশচন্দ্র 'চৈতন্যলীলা' লিখিলেন, পবম গুরুলাভের পথ মুক্ত হইল। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব ইচ্ছা করিয়াই 'চৈতন্যলীলা' দেখিতে আসিলেন। গিরিশচন্দ্র ইহাব পূর্ব্বে তাঁহাকে আব দুইবার দেখিয়াছিলেন, এইবার তাঁহার তৃতীয় দর্শন। কিন্তু কাল পূর্ণ না হইলে কোন কার্য্যই হয় না। চতুর্থবার দর্শনে গিরিশচন্দ্রের সুদিন উদয় হইল—তিনি গুরু কৃপা লাভ করিলেন। প্রথম ও দ্বিতীয় দর্শন কিরূপ হইল—ইহা জানিবার নিমিত্ত অনেকের আগ্রহ জন্মিতে পারে। তল্লিখিত "ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব" প্রবন্ধে তিনি গুরু-সন্দর্শন সম্বন্ধে স্বয়ং যাহা বলিয়া গিয়াছেন, 'দর্শন' বিভাগ কবিয়া নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম :

প্রথম দর্শন

"বহুদিন পূর্ব্বে 'ইণ্ডিয়ান মিরার'(সংবাদপত্র)-এ দেখেছিলাম যে দক্ষিণেশ্বরে একজন পরমহংস আছেন, তথায় স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেনের সশিষ্যে গতিবিধি আছে। আমি হীনবুদ্ধি, ভাবিলাম যে ব্রাহ্মরা যেমন হরি, মা প্রভৃতি বলা আরম্ভ করিয়াছে, সেইরূপ এক পরমহংস খাড়া করিয়াছে। হিন্দুরা যাহাকে পরমহংস বলে, সে পরমহংস ইনি নন। তাহার পর কিছুদিন বাদে শুনিলাম, আমাদের বসুপাড়ায় ৺দীননাথ বসুর বাড়ীতে পরমহংস আসিয়াছেন, কৌতূহলবশতঃ দেখিতে যাইলাম কিরূপ পরমহংস। তথায় যাইয়া শ্রদ্ধার পরিবর্ত্তে তাঁহার প্রতি অশ্রদ্ধা লইয়া আসিলাম। দীননাথবাবুর বাড়ীতে যখন আমি উপস্থিত হই, তখন পরমহংস কি উপদেশ দিতেছেন ও কেশববাবু প্রভৃতি তাহা আনন্দ করিয়া শুনিতেছেন। সন্ধ্যা হইয়াছে একজন সেজ জ্বালিয়া আনিয়া পরমহংসদেবের সম্মুখে রাখিল। তখন পরমহংসদেব পুনঃপুনঃ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, "সন্ধ্যা হইয়াছে?" আমি এইকথা শুনিয়া ভাবিলাম, "ঢং দেখ, সন্ধ্যা হইয়াছে, সম্মুখে সেজ জ্বলিতেছে, তবু ইনি বুঝিতে পারিতেছেন না যে, সন্ধ্যা হইয়াছে কিনা? আর কি দেখিব চলিয়া আসিলাম।"

দ্বিতীয় দর্শন

"ইহার কয়েক বৎসর পরে রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীটস্থ ৺বলরাম বসুর ভবনে পরমহংসদেব আসিবেন। সাধুত্তম বলরাম তাঁহাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত পাড়ার অনেককেই নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। আমারও নিমন্ত্রণ হইয়াছিল, দর্শন করিতে গেলাম। দেখিলাম পরমহংসদেব আসিয়াছেন, বিধু কীর্ত্তনী তাঁহাকে গান শুনাইবার জন্য নিকটে আছে। বলরামবাবুর বৈঠকখানায় অনেক লোকসমাগম হইয়াছে। পরমহংসদেবের আচরণে আমার একটু চমক হইল। আমি জানিতাম, যাঁহারা পরমহংস ও যোগী বলিয়া আপনাকে পরিচয় দেন, তাঁহারা কাহারও সহিত কথা কন না, কাহাকেও নমস্কার করেন না; তবে কেহ যদি অতি সাধ্যসাধনা করে, পদসেবা করিতে দেন। এ পরমহংসের ব্যাপার সম্পূর্ণ বিপরীত। অতি দীনভাবে পুনঃপুনঃ মস্তক ভূমিস্পর্শ করিয়া নমস্কার করিতেছেন। এক ব্যক্তি, আমার পূর্ব্বের ইয়ার, তিনি পরমহংসকে লক্ষ্য করিয়া ব্যঙ্গ করিয়া বলিলেন, "বিধু ওঁর পূর্ব্বের আলাপী, তার সঙ্গে রঙ্গ হচ্ছে।" কথাটা আমার ভাল লাগিল না। এমন সময়ে 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র সুবিখ্যাত সম্পাদক শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ঘোষ উপস্থিত হইলেন। পরমহংসদেবের প্রতি তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধা বোধ হইল না। তিনি বলিলেন, "চল আর কি দেখবে?" আমার ইচ্ছা ছিল, আরও কিছু দেখি, কিন্তু তিনি জেদ করিয়া আমায় সঙ্গে লইয়া আসিলেন। এই আমার দ্বিতীয় দর্শন।"

তৃতীয় দর্শন

"আবার কিছুদিন যায়, 'ষ্টার থিয়েটারে' (৬৮ নং বিডন ষ্ট্রীট) 'চৈতন্যলীলা'র অভিনয় হইতেছে, আমি থিয়েটারের বাহিরের কম্পাউণ্ড (বহিঃপ্রাঙ্গণ)-এ বেড়াইতেছি, এমন সময়ে মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় নামক একজন ভক্ত (এক্ষণে তিনি স্বর্গগত) আমায় বলিলেন, "পরমহংসদেব থিয়েটার দেখিতে আসিয়াছেন, তাঁহাকে বসিতে দাও, ভাল, নচেৎ টিকিট কিনিতেছি।" আমি বলিলাম, "তাঁহার টিকিট লাগিবে না, কিন্তু অপরের টিকিট লাগিবে।" এই বলিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে অগ্রসর হইতেছি, দেখিলাম তিনি গাড়ী হইতে নামিয়া থিয়েটারের কম্পাউণ্ড-মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন; আমি না নমস্কার করিতে-করিতে তিনি অগ্রে নমস্কার করিলেন; আমি নমস্কার করিলাম, পুনর্ব্বার তিনি নমস্কার করিলেন; আমি আবার নমস্কার করিলাম, পুনর্ব্বার তিনিও নমস্কার করিলেন। আমি ভাবিলাম, এইরূপই তো দেখিতেছি চলিবে। আমি মনে-মনে নমস্কার করিয়া তাঁহাকে উপরে লইয়া আসিয়া একটী 'বক্সে' বসাইলাম ও একজন পাখাওয়ালা নিযুক্ত করিয়া দিয়া শরীরের অসুস্থতাবশতঃ বাড়ী চলিয়া আসিলাম। এই আমার তৃতীয় দর্শন।"

চতুর্থ দর্শন

"আমার চতুর্থ দর্শন বিবৃত করিবার পূর্ব্বে আমার নিজের অবস্থা বলা প্রয়োজন। আমাদের পঠদ্দশায় যাঁহারা 'ইয়ং বেঙ্গল' নামে অভিহিত হইতেন, তাঁহারাই সমাজে মান্যগণ্য ও বিদ্বান বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। বাঙ্গালায় ইংরাজী শিক্ষার তাঁহারাই প্রথম ফল। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই জড়বাদী, অল্পসংখ্যক ক্রিশ্চিয়ান হইয়া গিয়াছিলেন, এবং কেহ-কেহ ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করেন। কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের প্রতি আস্থা তাঁহাদের মধ্যে প্রায় কাহারও ছিল না, বলিলেও বলা যায়। সমাজে যাঁহারা হিন্দু ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে মতভেদ, শাক্ত-বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব চলে এবং বৈষ্ণব-সমাজ এমন নানা শ্রেণীতে বিভক্ত যে পরস্পর পরস্পরের প্রতিবাদী। ইহা ব্যতীত অন্যান্য মতও প্রচলিত ছিল। প্রত্যেক মতেই অপর মতাবলম্বীর নরক ব্যবস্থা। ইহার উপর অনেক যাজক ব্রাহ্মণ ভ্রষ্টাচার হইয়াছেন। সত্যনারায়ণের পুঁথি লইয়া শ্রাদ্ধ করেন, মেটে দেওয়ালে পায়খানার ঘটী হইতে জল দিয়া গঙ্গামৃত্তিকার ফোঁটা ধারণ করেন। তাহার উপর ইংরাজীও দু-পাতা পড়িয়াছি, কালাপাহাড় জগন্নাথ ভাঙ্গিয়াছে প্রভৃতি। আবার জড়বাদীরা বুদ্ধি-বিদ্যায় সকলের শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য, ঈশ্বর না-মানা বিদ্যার পরিচয়, এ অবস্থায় স্ব-ধর্মের প্রতি আস্থা কিছুমাত্র রহিল না, কিন্তু মাঝে-মাঝে ঈশ্বর লইয়া সমবয়স্ক বন্ধুর সহিত তর্ক-বিতর্কও চলে। আদি সমাজেও কখনো-কখনো যাওয়া-আসা করি, একটী ব্রাহ্মসমাজও পাড়ার কাছে ছিল, সেখানেও মাঝে-মাঝে যাই। কিন্তু কিছু বুঝিতে পারিলাম না। ঈশ্বর আছেন কিনা সন্দেহ, যদি থাকেন, কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী হওয়া উচিৎ? নানা তর্ক-বিতর্ক করিয়া কিছু স্থির হইল না, ইহাতে মনের অশান্তি হইতে লাগিল। একদিন প্রার্থনা করিলাম, "ভগবান, যদি থাকো, আমায় পথ নির্দ্দেশ করিয়া দাও।" ইহার কিছুদিন পরেই দাম্ভিকতা আসিল। ভাবিলাম, জল, বায়ু, আলো—ইহজীবনের যাহা প্রয়োজন, তাহা অজস্র রহিয়াছে; তবে ধর্ম্ম, যাহা অনন্ত জীবনের প্রয়োজন, তাহা এত খুঁজিয়া লইতে হইবে কেন? সমস্তই মিথ্যা কথা, জড়বাদীরা বিদ্বান—বিজ্ঞ, তাঁহারা যে কথা বলেন, সেই কথাই ঠিক। ভাবিলাম, ধর্ম্মের আন্দোলন বৃথা, এইরূপ তমাচ্ছন্ন হইয়া চতুর্দ্দশ বর্ষ অতিবাহিত হইল। পরে দুর্দ্দিন আসিয়া ঠিক নিশ্চিন্ত থাকিতে দিল না। দুর্দ্দিনের তাড়নায় চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিয়া ভাবিতে লাগিলাম, বিপন্মুক্ত হইবার কোনও উপায় আছে কি? দেখিয়াছি, অসাধ্য রোগ হইলে তারকনাথের শরণাপন্ন হইয়া থাকে, আমারও তো কঠিন বিপদ; একরূপ উদ্ধার হওয়া অসাধ্য, এ সময়ে তারকনাথকে ডাকিলে কিছু হয় কি? পরীক্ষা করিয়া দেখা যাক। শরণাপন্ন হইবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু সেই চেষ্টাই সফল হইল, বিপজ্জাল অচিরে ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। আমার দৃঢ় ধারণা জন্মিল—দেবতা মিথ্যা নয়। বিপদ হইতে তো মুক্ত হইলাম, কিন্তু আমার পরকালের উপায় কি? আবার মনোমধ্যে ঘোর দ্বন্দ্ব, কোন্ পথ অবলম্বন করি? তারকনাথের মহিমা দেখিয়াছি, তারকনাথকেই ডাকি। ক্রমে দেবদেবীর প্রতি বিশ্বাস জন্মিতে লাগিল। কিন্তু

সকলেই বলে যে গুরু ব্যতীত উপায় নাই। ভাবিলাম, কেন উপায় নাই? এই তো ঈশ্বরের নাম রহিয়াছে, ঈশ্বরকে ডাকিলে কেন উপায় হইবে না? কিন্তু সকলেই বলে গুরু ব্যতীত উপায় হয় না। তবে গুরু কাহাকে করিব? শুনিতে পাই, গুরুকে ঈশ্বরজ্ঞান করিতে হয়; কিন্তু আমার ন্যায় মনুষ্যকে ঈশ্বরজ্ঞান কিরূপে করি? মন অতি অশান্তিপূর্ণ হইল। মানুষকে গুরু করিতে পারি না।

"গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুদেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরংব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥"

"এই বলিয়া গুরুকে প্রণাম করিতে হয়। সামান্য মানুষকে দেখিয়া ভণ্ডামি কিরূপে করিব? ঈশ্বরের নিকট অকপট হৃদয়ের প্রয়োজন, গুরুর সহিত ঘোর কপটতা করিয়া কিরূপে তাঁহাকে পাইব! যাক আমার গুরু হইবে না। বাবা তারকনাথের নিকট প্রার্থনা করি, যদি গুরুর একান্ত প্রয়োজন হয়, তিনি কৃপা করিয়া আমার গুরু হোন। শুনিয়াছিলাম, নরবেশ ধরিয়া কখনো-কখনো মহাদেব মন্ত্র দিয়া থাকেন। যদি আমার প্রতি তাঁহার এরূপ কৃপা হয় তবেই। নচেৎ আমি নিরুপায়। কিন্তু তারকনাথের তো কই দেখা পাই না, তবে আর কি করিব? প্রাতে একবার ঈশ্বরের নাম করিব, তারপর যা হয় হইবে। এ সময়ে একজন চিত্রকরের সঙ্গে আমার আলাপ হয়, তিনি একজন গৌড়ীয় বৈষ্ণব ছিলেন, সত্য হোক আর মিথ্যা হোক—একদিন তিনি আমায় বলিলেন, "আমি প্রত্যহ ভগবানকে ভোগ দিই, তিনি গ্রহণ করেন, কখনো-কখনো রুটীতে দাঁতের দাগ থাকে, কিন্তু এ ভাগ্য গুরুর নিকট উপদিষ্ট না হইলে হয় না।" আমার মন বড়ই ব্যাকুল হইল। তাহার নিকট হইতে চলিয়া গিয়া ঘরে দোর বন্ধ করিয়া রোদন করিতে লাগিলাম। এ ঘটনার তিনদিন পরে আমি কোন কারণবশতঃ আমাদের পাড়ার চৌরাস্তায় একটী রকে বসিয়া আছি, দেখিলাম চৌরাস্তার পূর্ব্ব দিক হইতে নারায়ণ, আর দুই-একটী ভক্ত সমভিব্যাহারে পরমহংসদেব ধীরে-ধীরে আসিতেছেন। আমি তাঁহার দিকে চক্ষু ফিরাইবামাত্র তিনি নমস্কার করিলেন। সেদিন আমি নমস্কার করায় পুনর্ব্বার নমস্কার করিলেন না। আমার সম্মুখ দিয়া ধীরে-ধীরে চৌমাথার দক্ষিণ দিকের রাস্তায় চলিলেন। তিনি যাইতেছেন, আমার বোধ হইতে লাগিল, যেন কি অজ্ঞানিত সূত্রের দ্বারা আমার বক্ষস্থল তাঁহার দিকে কে টানিতেছে। তিনি কিছুদূর গিয়াছেন, আমার ইচ্ছা হইল তাঁহার সঙ্গে যাই। এমন সময় তাঁহার নিকট হইতে আমায় একজন ডাকিতে আসিলেন, কে আমার স্মরণ হইতেছে না। তিনি বলিলেন, "পরমহংসদেব ডাকিতেছেন।" আমি চলিলাম, পরমহংসদেব ৺বলরাম-বাবুর বাটীতে উঠিলেন, আমিও তাঁহার পশ্চাতে গিয়া বৈঠকখানায় উপস্থিত হইলাম। (তৎকালে বলরামবাবু দেহ পরিত্যাগ করেন নাই।) বলরামবাবু বৈঠকখানায় শুইয়া-ছিলেন, বোধ হইল পীড়িত, পরমহংসদেবকে দেখিবামাত্র সসম্ভ্রমে উঠিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণি-পাত করিলেন। বসিয়া বলরামবাবুর সহিত দুই-একটী কথা বলিবার পর পরমহংসদেব হঠাৎ উঠিয়া, "বাবু আমি ভাল আছি—বাবু আমি ভাল আছি"—বলিতে-বলিতে কিরূপ এক অবস্থাগত হইলেন। তাহার পর বলিতে লাগিলেন, "না না, ঢং নয়—ঢং

নয়।" অল্প সময় এইরূপ অবস্থায় থাকিয়া পুনরায় আসন গ্রহণ করিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "গুরু কি?" তিনি বলিলেন, "গুরু কি জান,—যেন ঘটক।" আমি ঘটক কথা ব্যবহার করিতেছি, তিনি এই অর্থে অন্য কথা ব্যবহার করিয়াছিলেন। আবার বলিলেন, "তোমার গুরু হয়ে গেছে।" "মন্ত্র কি?" জিজ্ঞাসা করাতে বলিলেন, "ঈশ্বরের নাম।" দৃষ্টান্ত দিয়া বলিতে লাগিলেন, "রামানুজ প্রত্যহই প্রাতঃস্নান করিতেন। ঘাটের সিঁড়িতে কবীর নামে এক জোলা শুইয়াছিল। রামানুজ নামিতে-নামিতে তাঁহার শরীরে পাদস্পর্শ করায় সকল দেহে ঈশ্বরের অস্তিত্ব জ্ঞানে 'রাম' শব্দ উচ্চারণ করিলেন। সেই রামনাম কবীরের মন্ত্র হইল। আর সেই নাম জপ করিয়া কবীরের সিদ্ধিলাভ হইল।" থিয়েটারেরও কথা পড়িল। তিনি বলিলেন, "আর একদিন আমায় থিয়েটার দেখাইও।" আমি উত্তর করিলাম, "যে আজ্ঞে, যেদিন ইচ্ছা দেখিবেন।" তিনি বলিলেন, "কিছু নিও।" বলিলাম, "ভালো, আট আনা দিবেন।" পরমহংসদেব বলিলেন, "সে বড় র‍্যাজালা জায়গা।" আমি উত্তর করিলাম, "না, আপনি সেদিন যেখানে বসেছিলেন, সেইখানে বসবেন।" তিনি বলিলেন, "না, একটা টাকা নিও।" আমি "যে আজ্ঞে" বলায় এ কথা শেষ হইল। (স্থির হইল 'প্রহ্লাদ-চরিত্র' দেখিতে যাইবেন।)

"বলরামবাবু তাঁহার ভোগের নিমিত্ত কিছু মিষ্টান্ন আনাইলেন। তিনি একটা সন্দেশ হইতে কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিলেন মাত্র। অনেকেই প্রসাদ ধারণ করিলেন। আমারও ইচ্ছা ছিল, কে কি বলিবে, লজ্জায় পারিলাম না। ইহার কিছুক্ষণ পরেই হরিপদ নামে এক ভক্তের সহিত পরমহংসদেবকে প্রণাম করিয়া বলরামবাবুর বাটী হইতে বাহির হইলাম। পথে হরিপদ আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন দেখিলেন?" আমি বলিলাম, "বেশ ভক্ত।" তখন আমার মনে খুব আনন্দ হইয়াছে; গুরুর জন্যে হতাশ আর নই। ভাবিতেছি গুরু করিতে হয় মুখে বলে। এই তো পরমহংস বলিলেন, "আমার গুরু হয়ে গিয়েছে।" তবে আর কার কথা শুনি?

"যে কারণ মনুষ্যকে গুরু করিতে অনিচ্ছুক ছিলাম, তাহা একরূপ বলিয়াছি, কিন্তু এখন বুঝিতেছি, যে, আমার মনের প্রবল দম্ভ থাকায় আমি গুরু করিতে চাহি নাই। ভাবিতাম, এত কেন? গুরুও মানুষ, শিষ্যও মানুষ, তাহার নিকট জোড়হাত করিয়া থাকিবে, পদসেবা করিবে, তিনি যখন যাহা বলিবেন, তখন তাহা যোগাইবে; এ একটা আপদ যোটান মাত্র। পরমহংসদেবের নিকট এই দম্ভ চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল। থিয়েটারে প্রথমেই তিনি আমায় নমস্কার করিলেন, তাহার পর রাস্তায়ও আমায় প্রথম নমস্কার করিলেন। তিনি যে নিরহঙ্কার ব্যক্তি, আমার ধারণা জন্মিল এবং আমার অহঙ্কারও খর্ব্ব হইল। তাঁহার নিরহঙ্কারিতার কথা আমার মনে দিন-দিন উঠে।"

পঞ্চম দর্শন

"বলরামবাবুর বাটীর ঘটনার কিছুদিন পরে আমি থিয়েটারের সাজঘরে বসিয়া আছি, এমন সময় শ্রদ্ধাস্পদ ভক্তপ্রবর শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয় ব্যস্ত হইয়া আসিয়া আমায় বলিলেন, "পরমহংসদেব আসিয়াছেন।" আমি বলিলাম, "ভাল, বক্সে লইয়া গিয়া বসান।" দেবেন্দ্রবাবু বলিলেন, "আপনি অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া আসিবেন না?" আমি বিরক্ত হইয়া বলিলাম, "আমি না গেলে তিনি আর গাড়ী থেকে নামতে পারবেন না!" কিন্তু গেলাম। আমি পঁহুছিয়াছি, এমন সময় তিনি গাড়ী হইতে নামিতেছেন। তাঁহার মুখপদ্ম দেখিয়া আমার পাষাণ-হৃদয়ও গলিল। আপনাকে ধিক্কার দিলাম, সে ধিক্কার এখনও আমার মনে জাগিতেছে। ভাবিলাম, এই পরম শান্ত ব্যক্তিকে আমি অভ্যর্থনা করিতে চাহি নাই? উপরে লইয়া যাইলাম। তথায় শ্রীচরণ স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলাম। কেন যে করিলাম, তাহা আমি আজও বুঝিতে পারি না। আমার ভাবান্তর হইয়াছিল নিশ্চয়, আমি একটী প্রস্ফুটিত গোলাপ ফুল লইয়া তাঁহাকে দিলাম। তিনি গ্রহণ কবিলেন কিন্তু আমায় ফিরাইয়া দিলেন, বলিলেন, "ফুলের অধিকার দেবতার আব বাবুদের, আমি কি করিব?"

"ড্রেস সার্কেলের দর্শকের কনসার্টের সময় বসিবার জন্য 'ষ্টার থিয়েটারে'র দ্বিতলে স্বতন্ত্র একটী কামরা ছিল। সেই কামরায় পরমহংসদেব আসিলেন। অনেকগুলি ভক্ত তাঁহার সহিত আসিলেন। পরমহংসদেব একখানি চৌকিতে বসিলেন, আমিও অপর এক চৌকিতে বসিলাম। কিন্তু দেবেনবাবু প্রভৃতি ভক্তেরা অপর চৌকি থাকা সত্ত্বেও বসিতেছেন না। দেবেনবাবুর সহিত আলাপ ছিল। আমি পুনঃপুনঃ বলিতে লাগিলাম, "বসুন না।" কিন্তু তিনি অসম্মত। কারণ বুঝিতে পারিলাম না। আমার এতদূর মূঢ়তা ছিল যে গুরুর সহিত সম আসনে বসিতে নাই, ইহা আমি জানিতাম না। পরমহংসদেব আমার সহিত নানা কথা কহিতে লাগিলেন। আমার বোধ হইতে লাগিল, যে কি একটা স্রোত যেন আমার মস্তক অবধি উঠিতেছে ও নামিতেছে। ইতিমধ্যে তিনি ভাব নিমগ্ন হইলেন। একটী বালক ভক্তের সহিত ভাবাবস্থায় যেন ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। বহু পূর্ব্বে আমি এক দুর্দ্দান্ত পাষণ্ডের নিকট পরমহংসদেবের নিন্দা শুনিয়াছিলাম। এই বালকের সহিত এইরূপ ক্রীড়া দেখিয়া আমার সেই নিন্দার কথা মনে উঠিল। পরমহংস-দেবের ভাব ভঙ্গ হইল। তিনি আমায় লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "তোমার মনে বাঁক (আড়) আছে।" আমি ভাবিলাম, অনেক প্রকার বাঁক তো আছেই বটে, কিন্তু তিনি কোন বাঁক লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। জিজ্ঞাসা করিলাম, "বাঁক (আড়) যায় কিসে?" পরমহংসদেব বলিলেন, "বিশ্বাস করো।" "

ষষ্ঠ দর্শন

"আবার কিছুদিন গত হইল, আমি বেলা তিনটার সময় থিয়েটারে আসিয়াছি, একটু চিরকুট পাইলাম, যে মধু রায়ের গলিতে রামচন্দ্র দত্তের ভবনে পরমহংসদেব আসিবেন। পড়িবামাত্র আমাদের পাড়ার চৌরাস্তায় বসিয়া আমার হৃদয়ে যেরূপ টান পড়িয়াছিল, সেইরূপ টান পড়িল। আমি যাইতে ব্যস্ত হইলাম, কিন্তু আবার ভাবিতে লাগিলাম যে, অজানিত বাটীতে বিনা নিমন্ত্রণে কেন যাইব? ঐ অজানিত সূত্রের টানে সে বাধা রহিল না। চলিলাম, অনাথবাবুর বাজারের নিকটে গিয়া ভাবিলাম, যাইব না। ভাবিলে কি হয়, আমায় টানিতেছে। ক্রমে অগ্রসর হই আর থামি। রামবাবুর গলির মোড়ে গিয়াও থামিলাম। পরে রামবাবুর বাড়ী গিয়া পঁহুছিলাম। দোরে রামবাবু বসিয়া আছেন। ভক্তচূড়ামণি সুরেন্দ্রনাথ মিত্রও ছিলেন। সুরেন্দ্রবাবু আমায় স্পষ্টই জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন আমি তথায় গিয়াছি?" আমি বলিলাম, "পরমহংসদেবকে দর্শন করিতে।" রামবাবুর বাড়ীর নিকটেই সুরেন্দ্রবাবুর বাটী। তিনি তথায় আমায় লইয়া গেলেন এবং তিনি কিরূপে পরমহংসদেবের কৃপা পাইয়াছেন, তাহা আমায় বলিতে লাগিলেন। আমার সে সব কথা ভাল লাগিল না। আমি তাঁহারই সহিত রামবাবুর বাটীতে ফিরিয়া আসিলাম।

"তখন সন্ধ্যা হইয়াছে, রামবাবুর উঠানে, রামবাবু খোল বাজাইতেছেন, পরমহংসদেব নৃত্য করিতেছেন, ভক্তেরাও তাঁহাকে বেড়িয়া নৃত্য করিতেছে। গান হইতেছে, "নদে টল্‌মল্ টল্‌মল্ করে গৌরপ্রেমের হিল্লোলে!" আমার বোধ হইতে লাগিল, সত্যই যেন রামবাবুর আঙ্গিনা টল্‌মল্ করিতেছে! আমার মনে খেদ হইতে লাগিল, এ আনন্দ আমার ভাগ্যে ঘটিবে না। চক্ষে জল আসিল। নৃত্য করিতে-করিতে পরমহংসদেব সমাধিস্থ হইলেন, ভক্তেরা পদধূলি গ্রহণ করিতে লাগিলেন, আমার ইচ্ছা হইল গ্রহণ করি, কিন্তু লজ্জায় পারিলাম না। ভাবিলাম, তাঁহার নিকটে গিয়া পদধূলি গ্রহণ করিলে কে কি মনে করিবে। আমার মনে যে মুহূর্ত্তে এইরূপ ভাবের উদয় হইল, তৎক্ষণাৎ পরমহংসদেবের সমাধি ভঙ্গ হইল ও নৃত্য করিতে-করিতে ঠিক আমার সম্মুখে আসিয়া সমাধিস্থ হইলেন। আমার আর চরণ-স্পর্শে বাধা রহিল না। পদধূলি গ্রহণ করিলাম। সংকীর্ত্তনের পর পরমহংসদেব রামবাবুর বৈঠকখানায় আসিয়া বসিলেন। আমিও উপস্থিত হইলাম। পরমহংসদেব আমারই সহিত কথা কহিতে লাগিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমার মনের বাঁক (আড়) যাইবে তো?" তিনি বলিলেন, "যাইবে।" আমি আবার ঐ কথা বলিলাম। তিনি ঐ উত্তর দিলেন। আমি পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলাম, পরমহংসদেবও ঐ উত্তর দিলেন। কিন্তু মনোমোহন মিত্র নামে একজন পরমহংসদেবের পরম ভক্ত কিঞ্চিৎ রূঢ়স্বরে আমায় বলিলেন, "যাও না, উনি বললেন, আর কেন ওঁকে ত্যক্ত কচ্ছ?" এরূপ কথার উত্তর না দিয়া আমি ইতিপূর্ব্বে কখন ক্ষান্ত হই নাই। মনোমোহনবাবুর পানে ফিরিয়া চাহিলাম, কিন্তু ভাবিলাম ইনি সত্যই বলিয়াছেন; যাহার এক কথায় বিশ্বাস নাই, তিনি শতবার বলিলেও তো

তাহার কথা বিশ্বাসের যোগ্য নয়। আমি পরমহংসদেবকে প্রণাম করিয়া থিয়েটারে ফিরিলাম। দেবেনবাবু কিয়দ্দূর আমার সঙ্গে আসিলেন ও পথে অনেক কথা বুঝাইয়া আমায় দক্ষিণেশ্বরে যাইতে পরামর্শ দিলেন।"

সপ্তম দর্শন

"এই ঘটনার কিছুদিন পরে একদিন দক্ষিণেশ্বরে যাইলাম। উপস্থিত হইয়া দেখি, তিনি দক্ষিণদিকের বারাণ্ডায় একখানি কম্বলের উপর বসিয়া আছেন, অপর একখানি কম্বলে ভবনাথ নামে একজন পরম ভক্ত বালক বসিয়া তাঁহার সঙ্গে কথা কহিতেছেন। আমি যাইয়া পরমহংসদেবের পাদপদ্মে প্রণাম করিলাম। মনে-মনে "গুরুর্ব্রহ্মা" ইত্যাদি এই স্তবটীও আবৃত্তি করিলাম। তিনি আমায় বসিতে আদেশ করিলেন এবং বলিলেন, "আমি তোমার কথাই বলিতেছিলাম; মাইরি, একে জিজ্ঞাসা করো।" পরে কি উপদেশের কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। আমি তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিলাম, "আমি উপদেশ শুনিব না, আমি অনেক উপদেশ লিখিয়াছি, তাহাতে কিছু হয় না। আপনি যদি আমার কিছু করিয়া দিতে পারেন, করুন।" এ কথায় তিনি সন্তুষ্ট হইলেন। রামলালদাদা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাকে বলিলেন, "কিরে—কি শ্লোকটা বলতো?" রামলালদাদা শ্লোকটী আবৃত্তি করিলেন, শ্লোকের ভাব—"পর্ব্বতগহ্বরে নির্জ্জনে বসিলেও কিছু হয় না, বিশ্বাসই পদার্থ।" আমার তখন মনে হইতেছে আমি নির্ম্মল। আমি ব্যাকুল হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কে?" আমার জিজ্ঞাসার অর্থ এই, যে, আমার ন্যায় দাম্ভিকের মস্তক কাহার চরণে অবনত হইল। এ কাহার আশ্রয় পাইলাম—যে আশ্রয়ে আমার সমুদয় ভয় দূর হইয়াছে। আমার প্রশ্নের উত্তরে পরমহংসদেব বলিলেন, "আমায় কেউ-কেউ বলেন—আমি রামপ্রসাদ, কেউ বলে—রাজা রামকৃষ্ণ,—আমি এইখানেই থাকি।" আমি প্রণাম করিয়া বাটীতে ফিরিতেছি, তিনি উত্তরের বারাণ্ডা অবধি আমার সঙ্গে আসিলেন। আমি তখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমি আপনাকে দর্শন করিয়াছি, আবার কি আমায় যাহা করিতে হয়, তাহা করিতে হইবে?" ঠাকুর বলিলেন, "তা করো না!" তাঁহার কথায় আমার মনে হইল, যেন যাহা করি, তাহা করিলে দোষ স্পর্শিবে না।

"তদবধি গুরু কি পদার্থ, তাহার কিঞ্চিৎ আভাস আমার হৃদয়ে আসিল, গুরুই সর্ব্বস্ব আমার বোধ হইল। যাঁহার গুরু আছেন, তাঁহার উপর পাপের আর অধিকার নাই। তাঁহার সাধন-ভজন নিষ্প্রয়োজন। আমার দৃঢ় ধারণা জন্মিল—আমার জন্ম সফল।

"ইহার পর অনেক ঘটনা ঘটিয়াছে, এই যে পরম আশ্রয়দাতা, ইঁহার পূজা আমার দ্বারা হয় নাই। মদ্যপান করিয়া ইঁহাকে গালি দিয়াছি। শ্রীচরণ সেবা করিতে দিয়াছেন; ভাবিয়াছি, এ কি আপদ। কিন্তু এ সকল কার্য্য করিয়াও আমি দুঃখিত নই। গুরুর কৃপায় এ সকল আমার সাধন হইয়াছে। গুরুর কৃপায় একটী অমূল্য রত্ন

পাইয়াছি। আমার মনে ধারণা জন্মিয়াছে যে গুরুর কৃপা আমার কোন গুণে নহে। অহেতুকী কৃপাসিন্ধুর অপার কৃপা, পতিতপাবনের অপার দয়া—সেই জন্য আমায় আশ্রয় দিয়াছেন। আমি পতিত, কিন্তু ভগবানের অপার করুণা, আমার কোন চিন্তার কারণ নাই। জয় রামকৃষ্ণ!"

ত্রয়োত্রিংশ পরিচ্ছেদ

নাম-ভক্তি প্রচারের যুগ

'শ্রীবৎস-চিন্তা' অভিনয়ের পর পৌরাণিক নাটকাভিনয়ের যুগ শেষ হয়। এই যুগে নাটকে নৃত্য-গীত পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বাড়িয়া গিয়াছিল এবং অভিনয়-প্রথারও কতকটা পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। নাট্যাচায্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় বলেন, "এই যুগেই দর্শকদের রুচিপরিবর্ত্তনের একটা মহা সন্ধিস্থল।" তাহার পর 'চৈতন্যলীলা'র অভিনয় হইতেই বঙ্গ-নাট্যশালায় হরিনামের যুগ আরম্ভ হয়। এই যুগেই গিরিশচন্দ্রের 'প্রহ্লাদ-চরিত্র', 'নিমাই-সন্ন্যাস', 'প্রভাস-যজ্ঞ', 'বিল্বমঙ্গল ঠাকুর' ও 'রূপ-সনাতন' নাটকগুলির অভিনয় হইয়া থাকে। এইসময় 'বুদ্ধদেবচরিত' নাটক এবং 'বেল্লিকবাজার' নামক একখানি পঞ্চরং রচিত হইয়া অভিনীত হইয়াছিল— অবশ্যই এই দুইখানি ভিন্ন রসাত্মক। আমরা সংক্ষেপে নাটকগুলির পরিচয় প্রদান করিতেছি।

'প্রহ্লাদচরিত্র'

'চৈতন্যলীলা'র পর গিরিশচন্দ্র দুই অঙ্কে সমাপ্ত 'প্রহ্লাদচরিত্র' নাটক রচনা করেন। ৮ই অগ্রহায়ণ (১২৯১ সাল) 'প্রহ্লাদচরিত্র' এবং নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু-প্রণীত 'বিবাহ-বিভ্রাট' প্রহসন 'ষ্টার থিয়েটারে' প্রথম অভিনীত হয়। 'প্রহ্লাদচরিত্র' সংক্ষিপ্তভাবে লিখিত হওয়ায়, হিরণ্যকশিপু এবং প্রহ্লাদ এই দুইটী চরিত্রই বিশেষরূপ প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। স্বর্গীয় অমৃতলাল মিত্র এবং শ্রীমতী বিনোদিনী হিরণ্যকশিপু ও প্রহ্লাদের ভূমিকা অতি সুন্দররূপ অভিনয় করিয়াছিলেন।* 'ষ্টারে'

* ৩০শে অগ্রহায়ণ তারিখে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ভক্তগণ সঙ্গে 'ষ্টার থিয়েটারে' "প্রহ্লাদ-চরিত্র" অভিনয় দর্শনে আসিয়াছিলেন। গিরিশচন্দ্রের সহিত তাঁহার এইরূপ কথাবার্ত্তা হইয়াছিল :

"শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। বা তুমি বেশ সব লিখেছো।

গিরিশ। মহাশয়, ধারণা কই? শুধু লিখে গেছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ। না, তোমার ধারণা আছে। সেদিন তো তোমায় বল্লাম, ভিতরে ভক্তি না থাকলে চালচিত্র আঁকা যায় না—

গিরিশ। মনে হয়, থিয়েটারগুলো আর করা কেন।

'চৈতন্যলীলা'র অভাবনীয় কৃতকার্য্যতা দর্শনে 'বেঙ্গল থিয়েটার'ও এইসময় কবিবর রাজকৃষ্ণ রায়-বিরচিত 'প্রহ্লাদচরিত্র' অভিনয় করেন। ভক্তিরসাত্মক 'চৈতন্যলীলা'র পর পাছে 'প্রহ্লাদচরিত্র' একই রূপ হইয়া যায়, এ নিমিত্ত গিরিশচন্দ্র ইহাতে অধিক সংকীর্ত্তনাদি না দিয়া ইহাকে অনেকটা পাশ্চাত্য-শিক্ষিত দর্শকগণের-রুচি-উপযোগী করিয়া রচনা করেন। হিরণ্যকশিপুর চিত্রাঙ্কনে অদ্ভুত কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। কিন্তু 'চৈতন্যলীলা'র অভিনয়ে দেশ তখন হরিনামে মাতিয়া উঠিয়াছে ; গিরিশচন্দ্রের উচ্চ নাট্যকলা শিক্ষিত-সমাজে সমাদৃত হইলেও সাধারণ দর্শক তাহাতে তেমন তৃপ্তিলাভ করিতে পারিল না। 'বেঙ্গল থিয়েটারে' অভিনীত 'প্রহ্লাদচরিত্রে' প্রচুর সংকীর্ত্তন, প্রহ্লাদের মুখে সহজ কথা ও ভক্তিরসাত্মক সঙ্গীতে বঙ্গের নর-নারী-সাধারণের সংস্কারগত ভক্তির উৎস মুক্ত করিয়া দিয়াছিল। আবার ষণ্ড ও অমার্কের নিম্নশ্রেণীর হাস্যরসের অবতারণায় এবং সাপুড়িয়া প্রভৃতির গীতে রঙ্গালয়ে হাসির তরঙ্গ ছুটিতে থাকিত। কুসুমকুমারী নামে এক অভিনেত্রী 'বেঙ্গল থিয়েটারে' প্রহ্লাদের ভূমিকা অভিনয় করিতেন, তাঁহার সুমধুর সঙ্গীতে দর্শকগণের কর্ণে যেন সুধাবর্ষণ করিত। সেই হইতে 'প্রহ্লাদ কুশী' নামে তিনি সাধারণের নিকট পরিচিতা হইয়াছিলেন। শ্রীমতী বিনোদিনী প্রতিভাশালিনী অভিনেত্রী হইলেও সেরূপ গায়িকা ছিলেন না। যাহাই হউক 'প্রহ্লাদচরিত্র' অভিনয়ে 'বেঙ্গল থিয়েটার'ই সাধারণের অধিক প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছিল। 'ষ্টার থিয়েটারে' 'বিবাহ-বিভ্রাটে'র সুখ্যাতি কিন্তু অপরিসীম হইয়াছিল। এই চিরনূতন প্রহসনখানির পরিচয়প্রদান বাহুল্যমাত্র।

শ্রীরামকৃষ্ণ। না না, ও থাক, ওতে লোকশিক্ষা হবে।
গিরিশ। ...কি রকম দেখলেন ?
শ্রীরামকৃষ্ণ। দেখলাম, সাক্ষাৎ তিনিই সব হয়েছেন। যারা সেজেছে, তাদের দেখলাম, সাক্ষাৎ আনন্দময়ী মা। যারা গোলকে রাখাল সেজেছে, তাদের দেখলাম, সাক্ষাৎ নারায়ণ। তিনিই সব হয়েছেন।
গিরিশ। ...আর কর্ম্মই বা কেন ?
শ্রীরামকৃষ্ণ। না গো, কর্ম্ম ভাল। জমি পাট করা হ'লে যা রুইবে, তাই জন্মাবে। তবে কর্ম্ম নিষ্কামভাবে কত্তে হয়। ...তুমি পরের জন্যে রাখবে।
গিরিশ। আপনি তবে আশীর্ব্বাদ করুন। ইত্যাদি।
(শ্রীম-কথিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত', তৃতীয় ভাগে বিস্তারিত বিবরণ দ্রষ্টব্য।)

'নিমাই-সন্ন্যাস'

'প্রহ্লাদচরিত্রে'র পর 'নিমাই-সন্ন্যাস' ('চৈতন্যলীলা' দ্বিতীয় ভাগ) 'ষ্টার থিয়েটারে' ১৬ই মাঘ (১২৯১ সাল) প্রথম অভিনীত হয়। প্রথমাভিনয় রজনীর অভিনেতৃগণ :—

নিমাই	শ্রীমতী বিনোদিনী।
নিতাই	শ্রীমতী বনবিহারিণী।
প্রতাপরুদ্র	প্রবোধচন্দ্র ঘোষ।
রায় রামানন্দ	উপেন্দ্রনাথ মিত্র।
কেশব ভারতী	অমৃতলাল মিত্র।
সার্ব্বভৌম	অঘোরনাথ পাঠক।
অদ্বৈত	নীলমাধব চক্রবর্ত্তী।
হরিদাস	অবিনাশচন্দ্র দাস।
মুকুন্দ	শ্রীযুক্ত কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়।
চন্দ্রশেখর	মহেন্দ্রনাথ চৌধুরী (মাষ্টার)।
সার্ব্বভৌমের শিষ্যদ্বয়	বেলবাবু [অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়] ও শ্রীযুক্ত পরাণকৃষ্ণ শীল।
সার্ব্বভৌমের জামাতা	অতুলচন্দ্র মিত্র (বেভোল)।
নট	রামতারণ সান্ন্যাল।
শচী	গঙ্গামণি।
বিষ্ণুপ্রিয়া	ভূষণকুমারী।
মালিনী ও ধোপানী	ক্ষেত্রমণি। ইত্যাদি।

'চৈতন্যলীলা'র অভিনয় দর্শনে 'অমৃতবাজার পত্রিকা'-সম্পাদক পরমবৈষ্ণব স্বর্গীয় শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয় মুগ্ধ হইয়া গিরিশচন্দ্রকে 'নিমাই-সন্ন্যাস' লিখিবার নিমিত্ত বিশেষরূপ উৎসাহিত করিয়াছিলেন এবং গ্রন্থ রচনাকালে মহাপ্রভুর লীলার যে আধ্যাত্মিক ভাব তাঁহার নিজের প্রাণে ছিল, সেই ভাবটী যাহাতে গিরিশচন্দ্রের লেখনী দ্বারা নাটকে প্রকটিত হয়, তন্নিমিত্ত বিশেষ যত্নবান হইয়াছিলেন। নাট্যাচার্য্য অমৃতলালবাবু বলেন, "বোধহয় এই গূঢ় আধ্যাত্মিক ভাবের আধিক্য অভিনয়ে তেমন অভিব্যক্ত হয় নাই বা হওয়া সম্ভব নহে, এবং সেই ভাব সাধারণ দর্শকের পক্ষে উপলব্ধি করাও কঠিন হইয়াছিল, এই নিমিত্তই 'চৈতন্যলীলা'র ন্যায় 'নিমাই-সন্ন্যাস' সর্ব্বজন-সমাদৃত হয় নাই। এই নাটকের গানগুলি দীর্ঘ হইলেও বড়ই মর্ম্মস্পর্শী। পুরীধামে প্রবেশকালীন দূরে শ্রীমন্দিরের চূড়া দেখিয়া যখন নিতাই ও ভক্তগণ বিভোরভাবে গাহিতে লাগিলেন "দেখ দেখ কানাইয়ে আঁখি ঠারে ওই !" শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব একদিন থিয়েটার দেখিতে আসিয়া ঐ সময়ে ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়েন। অভিনয়ান্তে তিনি গিরিশচন্দ্রকে উন্মত্তভাবে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন।

'প্রভাস যজ্ঞ'

'নিমাই-সন্ন্যাসে'র পর ২১শে বৈশাখ (১২৯২ সাল) 'প্রভাস যজ্ঞ' নাটক 'ষ্টারে' প্রথম অভিনীত হয়। প্রথম অভিনয় রজনীর অভিনেতৃগণ :—

বসুদেব	শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু।
নন্দ	শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মিত্র।
শ্রীকৃষ্ণ	বেলবাবু [অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়]।
বলরাম	প্রবোধচন্দ্র ঘোষ।
ব্রহ্মা	নীলমাধব চক্রবর্ত্তী।
নারদ	অঘোরনাথ পাঠক।
আয়ান	শ্যামাচরণ কুণ্ডু।
শ্রীদাম	রামতারণ সান্ন্যাল।
সুদাম	শ্রীযুক্ত কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়।
যশোদা	গঙ্গামণি।
রাধিকা	শ্রীমতী বনবিহারিণী।
সত্যভামা	শ্রীমতী বিনোদিনী।
বিশাখা	কুসুমকুমারী (খোঁড়া)।
জটিলা	ক্ষেত্রমণি। ইত্যাদি।

'প্রভাস যজ্ঞ' বিষয়টী একেই গভীর করুণরসাত্মক, তাহার উপর গিরিশচন্দ্রের রস-মাধুর্য্য এবং ভাষার লালিত্যে নাটকখানি বড়ই হৃদয়ভেদী হইয়াছিল। যশোদা, রাধিকা এবং রাখালবালকগণের গীতগুলি পাঠ করিলেও পাষাণহৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। এই নাটক রচনায় গিরিশচন্দ্র বিশেষরূপ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। কিন্তু ইহার অভিনয় সেরূপ সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম, শ্রীদাম, সুদাম প্রভৃতির ভূমিকা বেলবাবু, প্রবোধবাবু, রামতারণবাবু, কাশীনাথবাবু প্রভৃতি অধিকবয়স্ক অভিনেতারা গ্রহণ করায় দর্শকগণের চক্ষে বড়ই বিসদৃশ ঠেকিয়াছিল। 'বেঙ্গল থিয়েটারে'ও এইসময় নাট্যাচার্য্য বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়-বিরচিত 'প্রভাস-মিলন' অভিনীত হয়। ইহারা শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম ও রাখাল-বালকগণের ভূমিকা অভিনেত্রীগণ কর্ত্তৃক অভিনয় করাইয়া 'ষ্টার থিয়েটার' অপেক্ষা দর্শকগণের অধিকতর সহানুভূতি লাভ করিয়াছিলেন। বহুকাল পরে 'মিনার্ভা থিয়েটারে' সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা শ্রীযুক্ত চুণীলাল দেব মহাশয়ের উৎসাহে গিরিশচন্দ্রের 'প্রভাস যজ্ঞ' পুনরভিনীত হয়। সুবিখ্যাতা অভিনেত্রী তিনকড়ি দাসী যশোদার, সুধাকণ্ঠী গায়িকা সুশীলাবালা শ্রীকৃষ্ণের এবং শ্রীমতী হিঙ্গনবালা (হেনা) রাধিকার ভূমিকা অভিনয় করিয়াছিলেন, রাখাল-বালকগণ অবশ্যই বালিকা অভি-নেত্রীগণ কর্ত্তৃক অভিনীত হইয়াছিল। অশ্রুভারাক্রান্ত নয়নে দর্শকগণ প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত নাটকের অভিনয় দেখিয়াছিলেন এবং এক-বাক্যে ইহার প্রশংসা করিয়াছিলেন। প্রভাসযাত্রাকালে রাধিকার সখিগণের একখানি গীত এই নাটককে চিরস্মরণীয় করিয়া

রাখিয়াছে। এমন বাঙালী খুব কমই আছেন, যিনি প্রভাস যজ্ঞের এই গানটী জানেন না বা শোনেন নাই, তখনকার দিনে কাপড়ের পাড়ের উপর পর্য্যন্ত এই গানটী উঠিয়াছিল। গানখানি এই, "চল লো বেলা গেল লো, দেখবো রাধা শ্যামের বামে" ইত্যাদি।

'বুদ্ধদেবচরিত'

৪ঠা আশ্বিন (১২৯২ সাল) 'বুদ্ধদেবচরিত' নাটক 'ষ্টার থিয়েটারে' প্রথম অভিনীত হয়। প্রথমাভিনয় রজনীর অভিনেতৃগণ :—

সিদ্ধার্থ (বুদ্ধদেব)	অমৃতলাল মিত্র।
শুদ্ধোদন	শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মিত্র।
গণকদ্বয় এবং সিদ্ধার্থের শিষ্যদ্বয়	শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু ও বেলবাবু [অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়]।
বিষ্ণু ও যন্ত্রী	শ্রীযুক্ত কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়।
রাহুল	শ্রীমতী পুঁটুরানী।
ছন্দক	বেলবাবু [অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়]।
শ্রীকালদেবল ও কাশ্যপ	মহেন্দ্রনাথ চৌধুরী।
ব্রাহ্মণ	নীলমাধব চক্রবর্ত্তী।
বিদূষক	শিবচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।
নালক	রাণুবাবু [শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়]।
বিম্বিসার ও বণিক	প্রবোধচন্দ্র ঘোষ।
মার	অঘোরনাথ পাঠক।
আত্মবোধ, দয়া ও পুত্রহারা রমণী	ক্ষেত্রমণি।
সন্দেহ	অবিনাশচন্দ্র দাস।
মন্ত্রী	ত্রৈলোক্যনাথ ঘোষাল।
রাখাল	অনুকূলচন্দ্র বটব্যাল।
রুগ্ন	শ্রীযুক্ত পরাণকৃষ্ণ শীল।
মহামায়া	শ্রীমতী বনবিহারিণী।
গৌতমী	গঙ্গামণি।
গোপা	শ্রীমতী বিনোদিনী।
সুজাতা	প্রমদাসুন্দরী।
পূর্ণা ও রানীর সখী	কুসুমকুমারী (খোঁড়া)।
দেববালাদ্বয়	কুসুমকুমারী (খোঁড়া) ও ভূষণকুমারী। ইত্যাদি।

'বুদ্ধদেবচরিত' রচনায় গিরিশচন্দ্র যেরূপ তাঁহার অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয়

দিয়াছিলেন, ইহার অভিনয়ও সেইরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল। সিদ্ধার্থ-বেশী অমৃতলাল মিত্র তাঁহার অমৃতকণ্ঠে দর্শকমণ্ডলীর কর্ণে যেন অমৃতের ধারা বর্ষণ করিতেন। 'চৈতন্য-লীলা'র অভিনয়ে দেশবাসীর হৃদয়ে যেরূপ একটা প্রেমানন্দের উচ্ছ্বাস তরঙ্গায়িত হইয়াছিল, 'বুদ্ধদেবচরিত' অভিনয়েও সেইরূপ শান্তরসের উৎস ছুটিয়াছিল। এই নাটকের "জুড়াইতে চাই কোথায় জুড়াই, কোথা হ'তে আসি কোথা ভেসে যাই" বৈরাগ্যপূর্ণ গীতটী গিরিশচন্দ্রকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। গানখানি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের পরম প্রিয় ছিল। এই গীতিখানি গাহিতে-গাহিতে বিবেকানন্দ স্বামী আত্মহারা হইয়া যাইতেন!*

৺শারদীয়া পূজার অব্যবহিত পূর্ব্বে, এই নাটকের অভিনয় দর্শনে বাগবাজারের সুপ্রসিদ্ধ জমীদার স্বর্গীয় রায় নন্দলাল বসু মহাশয়ের জীবহিংসায় এতদূর বিরাগ জন্মিয়াছিল যে, সেই বৎসর হইতেই তিনি তাঁহার বাটীতে ৺পূজায় বলি বন্ধ করেন এবং বলির নিমিত্ত সদ্যক্রীত ছাগগুলিকে মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন।

কলিকাতার জনৈক লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক পুত্রশোকাতুর হইয়া ক্ষণিক অন্যমনস্ক হইবার নিমিত্ত 'বুদ্ধদেব' অভিনয় দেখিতে আসিয়াছিলেন। 'বুদ্ধদেবচরিতে' বর্ণিত আছে, জনৈক পুত্রহারা রমণী বুদ্ধদেবের নিকট আসিয়া মৃত পুত্রের জীবন প্রার্থনা করায় বুদ্ধদেব বলেন, "যে বাটীতে মৃত্যু হয় নাই—সেই বাটী হইতে কিঞ্চিৎ কৃষ্ণ তিল লইয়া আইস।" রমণী বহু অনুসন্ধানে সেরূপ বাড়ী না পাইয়া পুনরায় বুদ্ধদেবের নিকট ফিরিয়া আসেন। বুদ্ধদেব তখন স্ত্রীলোকটীকে বলিলেন, "তবেই বুঝ, মৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার কাহারও উপায় নাই। ধৈর্য্যই ইহার একমাত্র ঔষধ।" স্ত্রীলোকটী উত্তরে বলিলেন,

"পিতা, তব উপদেশে—
ধৈর্য্যের বন্ধন দিব প্রাণে।
কিন্তু নয়ন—আনন্দ ছিল নন্দন আমার!"

ডাক্তার উদ্‌গ্রীব হইয়া রমণীর উত্তর শুনিতেছিলেন। "কিন্তু নয়ন-আনন্দ ছিল নন্দন আমার!" এক কথাটী শুনিবামাত্র তিনি আত্মহারা হইয়া কাঁদিয়া ফেলেন এবং উত্তেজিতভাবে গিরিশচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলেন, "মহাশয় আপনি এ প্রাণের কথা কেমন করিয়া বাহির করিলেন? আমার এই দারুণ পুত্রশোকে আত্মীয় বন্ধু-বান্ধবগণ আমাকে অনেক সান্ত্বনা দিয়াছে, অনেক রকম করিয়া বুঝাইয়াছে, 'কিন্তু,

* স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যম ভ্রাতা শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় তাঁহার 'শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামিজীর জীবনের ঘটনাবলী' গ্রন্থে লিখিয়াছিলেন: "নরেন্দ্রনাথ (বিবেকানন্দ) যখন এই গানটী গভীর রাত্রিতে শয্যাত্যাগ করিয়া সিমলার গৌরমোহন মুখার্জ্জীর ষ্ট্রীটস্থ বাড়ীর দালানে আপনার মনে পায়চারি করিতে করিতে গাহিতেন, তখন তাঁহার মুখ হইতে গানটী এমন শ্রুতিমধুর হইত যে বাড়ীর আশেপাশের ঘরের নিদ্রিত ব্যক্তিরা নিদ্রাত্যাগ করিয়া স্থির হইয়া শুনিতেন। সুর তাল রাগের কথা নহে, কিন্তু ভিতরের প্রাণ থেকে ঠিক নিজের অবস্থাটা প্রকাশ করিয়া তিনি জীবন্তভাবে গানটী গাহিতেন। যাঁহারা নরেন্দ্রনাথের মুখে রাত্রিতে সেই গান শুনিতেন, তাহাদের তখন আর বাহ্যজ্ঞান কিছু থাকিত না—সংসারের মায়া মমতা ভুলিয়া গিয়া কোথায় এক অসীম জগতে প্রবেশ করিতেন। এই গানটী বরাহনগর মঠে সর্ব্বদাই গীত হইত।" (তৃতীয় ভাগ, ৮৬ পৃষ্ঠা।)

নয়ন-আনন্দ ছিল নন্দন আমার!'—আমার প্রাণের ভিতরের এ কথা তো কেহ বুঝিতে পারে নাই।"

কবিবর স্যার এডুইন আরনল্ডের *Light of Asia* কাব্য অবলম্বনে গিরিশচন্দ্র এই নাটকখানি রচনা করিয়াছিলেন এবং "ঋণী শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ" নাম স্বাক্ষর করিয়া পুস্তকখানি তাঁহার নামে উৎসর্গপূর্ব্বক নিজ মহত্বের পরিচয় প্রদান করেন। আরনল্ড সাহেব দেশ পর্য্যটনে বাহির হইয়া যে সময়ে কলিকাতায় আসেন, তিনি সে সময়ে 'বুদ্ধদেবচরিতে'র অভিনয় দেখিয়া বঙ্গ-নাট্যশিল্পের উন্নতিকল্পে গিরিশচন্দ্রের যত্ন, উদ্যম ও অভিজ্ঞতার যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া যান। তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তের এক স্থানে লিখিত আছে, "বঙ্গ-রঙ্গভূমির দৃশ্যপটাদি দেখিয়া বিলাতী থিয়েটারের অধ্যক্ষেরা যদিও হাস্য করিতে পারেন, কিন্তু গভীর ভাবসম্পন্ন নাটকাভিনয় ও অভিনয়-চাতুর্য্য দর্শনে তাঁহাদিগকে নিশ্চয়ই চমৎকৃত হইতে হইবে।"

'বিল্বমঙ্গল ঠাকুর'

'বিল্বমঙ্গল ঠাকুর' ২০শে আষাঢ় (১২৯৩ সাল) 'ষ্টার থিয়েটারে' প্রথম অভিনীত হয়। প্রথমাভিনয় রজনীর অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ:—

বিল্বমঙ্গল	অমৃতলাল মিত্র।
সাধক	বেলবাবু [অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়]
ভিক্ষুক	অঘোরনাথ পাঠক।
সোমগিরি	প্রবোধচন্দ্র ঘোষ।
বণিক ও দারোগা	শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মিত্র।
রাখাল-বালক	পুঁটুরাণী।
পুরোহিত	শ্যামাচরণ কুণ্ডু।
ভৃত্য	শ্রীযুক্ত পরাণকৃষ্ণ শীল।
দেওয়ান	মহেন্দ্রনাথ চৌধুরী।
সোমগিরির শিষ্যগণ	রামতারণ সান্যাল, অবিনাশচন্দ্র দাস, শ্রীযুক্ত কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় ও শ্যামাচরণ কুণ্ডু।
চিন্তামণি	শ্রীমতী বিনোদিনী।
থাক	ক্ষেত্রমণি।
পাগলিনী	গঙ্গামণি।
অহল্যা	শ্রীমতী বনবিহারিণী।
মঙ্গলা	কুসুমকুমারী (খোঁড়া)।
জনৈক স্ত্রীলোক	প্রমদাসুন্দরী। ইত্যাদি।

'বিল্বমঙ্গল ঠাকুর' প্রেম ও বৈরাগ্যমূলক নাটক। ইহার আখ্যানভাগ 'ভক্তমাল' হইতে গৃহীত। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণের পর পরমহংসদেবের শ্রীমুখে বিল্বমঙ্গলের উপাখ্যান শুনিয়া গিরিশচন্দ্র এই নাটক লিখিতে প্রবৃত্ত হন। ভক্ত চরিত্রের সহিত একটী ভণ্ড চরিত্র অঙ্কনে তিনি ইঙ্গিত করিয়াছিলেন। সাধক চরিত্রের ইহাই মূল। পরমহংসদেব একদিন ভণ্ড সাধুদের হাবভাব গিরিশচন্দ্রকে হুবহু নকল করিয়া দেখাইয়াছিলেন। এই নাটকের পাগলিনী চরিত্র গিরিশচন্দ্রের সম্পূর্ণ নূতন সৃষ্টি এবং বঙ্গ-সাহিত্যে ইহা তাঁহার একটী অপূর্ব্ব দান।* সাংসারিক স্থূল ঘটনার মধ্যে অধ্যাত্ম চরিত্র সৃষ্টি করিয়া এবং তাহার দ্বারা নাটকের অন্যান্য চরিত্র বিশ্লেষণে গিরিশচন্দ্র যে কৃতিত্ব ও নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন, তাহা জগতের যে কোন সাহিত্যে সুদুর্লভ। পাগলিনীর পর-পর গানগুলি সাধকের সাধন-অবস্থার ক্রমবিকাশ —ইহা একটী লক্ষ্য করিবার বিষয়। জনৈক ভাবুক দর্শক এই নাটকের অভিনয় দেখিয়া সাগ্রহে গিরিশচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলেন, "মহাশয়, আপনি যে 'কৃষ্ণদর্শনের ফল—কৃষ্ণদর্শন' লিখিয়াছেন, ঐ এক কথাতেই 'বিল্বমঙ্গল' লেখা সার্থক হইয়াছে।"

যিনি কেবল মনস্তত্ত্ব হিসাবে 'বিল্বমঙ্গল' পড়িবেন, 'বিলমঙ্গল' তাঁহাকে যেমন তৃপ্তি দিবে, তেমনি তৃপ্তি দিবে হিন্দু দার্শনিক পাঠককে। বারবণিতা ও লম্পটের প্রেমাভিনয়ের মধ্যে উচ্চ বৈষ্ণব দর্শন নাটকীয় রসের ব্যাঘাত না করিয়া যেভাবে রসবিকাশের সাহায্য করিয়াছে, তাহা ভারতের কবি গিরিশচন্দ্রেই সম্ভব। 'চৈতন্যলীলা' ও 'বুদ্ধদেবচরিত' লিখিয়া তিনি বঙ্গবাসীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন, 'বিল্বমঙ্গল' নাটক রচনায় তিনি দেশবাসীর হৃদয় অধিকার করেন।

বিশ্ববিজয়ী স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন, " 'বিল্বমঙ্গল' সেক্সপীয়ারের উপর গিয়াছে। আমি এরূপ উচ্চভাবের গ্রন্থ কখনও পড়ি নাই।" সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ও সমালোচক স্বর্গীয় চন্দ্রনাথ বসু বলিতেন, " 'বিল্বমঙ্গল' গিরিশবাবুর master-piece." সুদূর ইয়ুরোপ ও আমেরিকায় পর্য্যন্ত এই নাটকের অভিনয় হইয়া থাকে।

* দক্ষিণেশ্বরে পরমহংসদেবের নিকট বহুপূর্ব্বে এক ব্রাহ্মণী ভৈরবী আসিয়াছিলেন। তাহার অনেক পরে এক পাগলী যাতায়াত করিত। শুনিয়াছি, ইঁহাদের অদ্ভুত চরিত্র সম্বন্ধে নানারূপ গল্প শুনিয়া গিরিশচন্দ্র এই পাগলিনী চরিত্র পরিকল্পনা করিয়াছিলেন।

'বেল্লিক বাজার'

১০ই পৌষ (১২৯৩ সাল) 'ষ্টার থিয়েটারে' 'বেল্লিক বাজার' পঞ্চরং প্রথম অভিনীত হয়। প্রথমাভিনয় রজনীর অভিনেতৃগণ :—

ললিত	শ্রীযুক্ত কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়।
পুঁটিরাম	মহেন্দ্রনাথ চৌধুরী।
ক্ষুদিরাম	প্রবোধচন্দ্র ঘোষ।
দোকড়ি	নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু।
কান্তিরাম	শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মিত্র।
নসীরাম	শ্যামাচরণ কুণ্ডু।
মুক্তারাম	রাণুবাবু [শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়]।
শিবু চৌধুরী	অমৃতলাল মিত্র।
পুরোহিত	অবিনাশচন্দ্র দাস।
খানসামা ও রামা মুর্দ্দফরাস	শ্রীযুক্ত পরাণকৃষ্ণ শীল।
মুর্দ্দফরাস, মেথর ও চিনাম্যান	রামতারণ সান্যাল।
রঙ্গদার	বেলবাবু [অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়]।
ললিতের মা ও মুর্দ্দফাসনী	গঙ্গামণি।
ললিতের পিসী ও মগ	ক্ষেত্রমণি।
রঙ্গিণী	শ্রীমতী বিনোদিনী দাসী।
খেমটাওয়ালীদ্বয়	ভূষণকুমারী ও কুসুমকুমারী (খোঁড়া)। ইত্যাদি।

সমাজের উচ্ছৃঙ্খল এবং বিকৃত চরিত্র স্বার্থান্ধদের উপর তীব্র কটাক্ষপাত করিয়া 'বেল্লিক বাজার' রচিত হয়। বহু রঙ্গচিত্রে এই নক্সাখানি এরূপ বিচিত্রভাবে চিত্রিত, যে ইহা পঞ্চরং নামেই আখ্যাত হইয়াছে। এই সং-রং-ঢং-পূর্ণ সজীব অভিনয়ের সম্পূর্ণ নূতনত্ব পাইয়া সে সময়ে বঙ্গ-নাট্যশালায় একটা তুমুল আন্দোলন পড়িয়া গিয়াছিল। 'বেল্লিক বাজারে' গিরিশচন্দ্র যে একটী নূতন ধরনের পঞ্চরং-এর সৃষ্টি করেন, সেই অনুকরণেই এ পর্য্যন্ত রঙ্গালয়ে নক্সাগুলি রচিত হইতেছে। সুবিখ্যাত সমালোচক স্বর্গীয় অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় লিখিয়াছিলেন, "'বেল্লিক বাজার' রুচি বিকারে ফুটিয়াছে। 'বেল্লিক বাজার' অভিনয়ে বড়ই ফুটন্ত! জীবন্ত! রঙ্গরুচি যে আমাদিগের মজ্জায়-মজ্জায় প্রবেশ করিয়া নীতি-প্রীতির মূল উল্টাইয়া আমাদিগকে পদে-পদে পেষণ করিতেছে, পদে-পদে স্বার্থের দায় ভদ্রাচারে জলাঞ্জলি দিতেছে, তাহা ইহাতে এক-রকম চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখান হইয়াছে।" ('নববিভাকর সাধারণী', ১৯৮ পৃষ্ঠা। ১২৯৪ সাল।)

৮ই জ্যৈষ্ঠ (১২৯৪ সাল) 'ষ্টার থিয়েটারে' 'রূপ-সনাতন' নাটক প্রথম অভিনীত হয়। প্রথমাভিনয় রজনীর অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ:—

চৈতন্যদেব	বেলবাবু [অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়]।
সনাতন	অমৃতলাল মিত্র।
রূপ	শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মিত্র।
বল্লভ	শ্রীযুক্ত কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়।
ঈশান	মহেন্দ্রনাথ চৌধুরী।
সুবুদ্ধি	নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু।
জীবন চক্রবর্ত্তী	নীলমাধব চক্রবর্ত্তী।
হোসেন সা ও দস্যু	অঘোরনাথ পাঠক।
রামদিন ও শ্রীকান্ত	প্রবোধচন্দ্র ঘোষ।
নসির খাঁ	শ্যামাচরণ কুণ্ডু।
চৌবে বালক	ভূষণকুমারী।
অলকা	শ্রীমতী বনবিহারিণী।
করুণা ও চৌবে-রমণী	গঙ্গামণি।
বিশাখা	কিরণবালা। ইত্যাদি।

'বুদ্ধদেবচরিত' কি 'বিল্বমঙ্গল ঠাকুর'—এমনকি 'বেল্লিক বাজার' পর্য্যন্ত দর্শক-সমাজে যেরূপ উৎসাহ ও আনন্দের উচ্চ তরঙ্গ তুলিয়াছিল, 'রূপ-সনাতন' যদিচ তাহা পারে নাই, তথাপি এই নাটক রচনায় গিরিশচন্দ্র তাঁহার বিশেষ শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়াছিলেন এবং সুদক্ষ অভিনেতৃ-সম্মিলনে ইহার অভিনয়ও উৎকৃষ্ট হইয়াছিল। এই নাটক প্রসঙ্গে একটী ঘটনার উল্লেখ করিতেছি।

'রূপ-সনাতন' নাটকে (৪র্থ অঙ্ক, ২য় গর্ভাঙ্কে) কাশীধামে রূপ, অনুপম ও বৈষ্ণবগণ-পরিপূর্ণ চন্দ্রশেখরের বাটীতে চৈতন্যদেব কর্ত্তৃক ভক্তগণের পদধূলিগ্রহণ দৃশ্য গিরিশচন্দ্র এইরূপ দেখাইয়াছেন। যথা:—

"২য় বৈষ্ণব। প্রভু, করছেন কি?

চৈতন্যদেব। আমি কৃষ্ণ-বিরহে বড় কাতর, তাই ভক্তবৃন্দের পদরজ অঙ্গে ধারণ করছি, ভক্তের কৃপা হবে।"

'ষ্টার থিয়েটারে' এই দৃশ্যের অভিনয় দর্শনে কোন-কোন গোস্বামী বিরক্ত হন এবং মহাপ্রভুর এইরূপ ভক্ত-পদধূলি শ্রীঅঙ্গে গ্রহণ অতি গর্হিত বলিয়া ক্রোধ প্রকাশ, এমনকি গিরিশচন্দ্রকে কটূক্তিও করেন। গিরিশচন্দ্র তাঁহাদের বিরক্তিতে বিচলিত না হইয়া দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছিলেন, "আমি যে স্বচক্ষে পরমহংসদেবকে ভক্তপদধূলি গ্রহণ করিতে দেখিয়াছি।" তিনি বলিতেন, "আমি স্বয়ং বিশেষরূপ উপলব্ধি না করিয়া কোনও কথা লিখি না। একদিন কোনও এক ভক্তের বাটীতে ভগবৎ প্রসঙ্গ এবং

সংকীর্ত্তনাদির পর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব সেই স্থানের ধূলি লইয়া অঙ্গে প্রদান করিলেন। ভক্তগণ ব্যস্ত হইয়া নিবারণ করিতে যাইলে ঠাকুর বলিলেন, 'কি জানো, বহু ভক্তের সমাগমে এবং ঈশ্বরীয় কথা ও নাম-সংকীর্ত্তনে এই স্থান পবিত্র হইয়াছে। হরিনাম হইলে হরি স্বয়ং তাহা শুনিতে আসেন। ভক্ত-পাদস্পর্শে এই স্থানের ধূলি পর্য্যন্ত পরম পবিত্র হইয়াছে।' "

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

শ্রীরামকৃষ্ণ ও গিরিশচন্দ্র। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কৃপা-পরীক্ষা

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া গিরিশচন্দ্রের মনে প্রশ্ন উঠিতে লাগিল যে—ইনি কে? আমি তো ইঁহার কাছে আসি নাই; ইনিই আমায় খুঁজিয়া লইয়াছেন। ইনি কখনই সামান্য মানব নন। পরমহংসদেব কিরূপ তাঁহাকে কৃপা করিয়াছেন, এবং তাঁহার মহিমা কিরূপ তাহা পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত গিরিশচন্দ্র একদিন কোনও অভিনেত্রীর আলয়ে রাত্রি যাপনের সঙ্কল্প করেন। তাঁহার স্বভাব ছিল, বাহিরে যে কোনও কার্য্যে যত রাত্রিই হউক না কেন, রাত্রির শেষভাগেও বাটী আসিয়া আপন শয্যায় শয়ন করিবেন। তিনি ইচ্ছা করিয়াই বারাঙ্গনা-গৃহে রাত্রি কাটাইবার নিমিত্ত তথায় শয়ন করিলেন। তাঁহার মুখেই শুনিয়াছি, রাত্রি যখন তৃতীয় প্রহর, তখন তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে একটা জ্বালা উপস্থিত হইল, যেন তাঁহাকে বিছায় কামড়াইতেছে, ক্রমে যন্ত্রণা এরূপ অসহ্য হইয়া উঠিল যে তিনি শয্যা হইতে উঠিয়া পড়িলেন, এবং বাক্সর চাবি বৈঠকখানায় ফেলিয়া আসিয়াছেন বলিয়া তৎক্ষণাৎ বাটী চলিয়া আসিলেন। বাটী আসিয়া তবে তিনি শান্তিলাভ করিলেন। তৎপরদিবস দক্ষিণেশ্বরে গিয়া তিনি গত-রাত্রির ঘটনা এবং তাঁহার সন্দিগ্ধ চিত্তের কথা অকপটে ঠাকুরকে নিবেদন করিলেন। পরমহংসদেব ধীরভাবে সমস্ত শুনিয়া হঠাৎ উত্তেজিতভাবে বলিলেন, "শালা, তুই কি ভেবেছিস—তোকে ঢ্যাম্‌না সাপে ধরেছে, যে পালিয়ে যাবি?—এ জাত সাপে ধরেছে—তিন ডাক ডেকেই চুপ করতে হবে।" ঠাকুরের কথায় গিরিশচন্দ্র সম্পূর্ণ আশ্বস্ত হইলেন এবং সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিলেন—যিনি শ্রীচৈতন্য অবতারে জগাই-মাধাইকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, ইনি নিশ্চয় তিনি।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে বকল্‌মা প্রদান

গিরিশচন্দ্র এইরূপে পরমহংসদেবকে সর্ব্বতোভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া একদিন তাঁহাকে বলিলেন, "এখন থেকে আমি কি করবো?" শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিলেন, "যা করচো, তাই ক'রে যাও। এখন এদিক (ভগবান) ওদিক (সংসার) দু'দিক রেখে চলো, তার পর যখন একদিক ভাঙবে, তখন যা হয় হবে। তবে সকাল-বিকালে তাঁর

স্মরণ-মননটা রেখো।" গিরিশচন্দ্র ভাবিতে লাগিলেন, "তাই ত! সকল সময় সকল কাজের আমার হুঁস থাকে না। হয়তো কোন কঠিন মকদ্দমা লইয়াই ব্যস্ত হইয়া আছি, গুরুর কাছে স্বীকার করিব, যদি কথা রাখিতে না পারি!" এই ভাবিয়া নীরব হইয়া রহিলেন। গিরিশচন্দ্রকে নীরব দেখিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিলেন, "আচ্ছা তা যদি না পারো ত খাবার-শোবার আগে একাবার স্মরণ-মনন ক'রো।" কোন বাঁধাবাঁধি নিয়মের ভিতর থাকিতে গিরিশচন্দ্র একেবারেই অপারগ ছিলেন, এজন্য তাঁহার জীবনে আহার-নিদ্রার পর্য্যন্ত কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম ছিল না। তাঁহার স্বভাবতঃ মুক্ত স্বভাব-মন যেমন বদ্ধ কক্ষে অবস্থান করিতে হাঁপাইয়া উঠিত, একটা বাঁধাবাঁধি নিয়মের ভিতর পড়িতেও তেমনি ব্যাকুল হইয়া উঠিত। এবারেও গিরিশচন্দ্র নীরব হইয়া রহিলেন। তাঁহার ভাব দেখিয়া পরমহংসদেব সহসা ভাবাবিষ্ট হইয়া বলিলেন, "তুই বলবি, 'তাও যদিও না পারি?' আচ্ছা, তবে আমায় বকল্‌মা দে।" শ্রীভগবানে পাপ-পুণ্যের ভার দিয়া সম্পূর্ণ আত্ম-সমর্পণের নাম বকল্‌মা। গিরিশচন্দ্র আর কাল বিলম্ব না করিয়া বকল্‌মা দিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। "গিরিশচন্দ্র তখন বকল্‌মা বা ঠাকুরের উপর সমস্ত ভার দেওয়ার এইটুকু অর্থই বুঝিলেন যে তাঁহাকে আর নিজে চেষ্টা বা সাধন-ভজন করিয়া কোন বিষয় ছাড়িতে হইবে না, ঠাকুরই তাঁহার মন হইতে সকল বিষয় নিজ শক্তিবলে ছাড়াইয়া লইবেন। কিন্তু নিয়ম-বন্ধন গলায় পরা অসহ্য বোধ করিয়া তাহার পরিবর্ত্তে যে তদপেক্ষা শতগুণে অধিক ভালবাসার বন্ধন—স্বেচ্ছায় গলায় তুলিয়া লইলেন, তাহা তখন বুঝিতে পারিলেন না। ভাল-মন্দ যে অবস্থায় পড়ুন না কেন, যশ-অপযশ যাহাই আসুক না কেন, দুঃখ-কষ্ট যতই উপস্থিত হউক না কেন, নিঃশব্দে তাহা সহ্য করা ভিন্ন তাহার বিরুদ্ধে তাঁহার যে আর বলিবার বা করিবার কিছুই রহিল না, সে কথা তখন আর তলাইয়া দেখিলেন না, দেখিবার শক্তিও রহিল না। অন্য সকল চিন্তা মন হইতে সরিয়া যাইয়া কেবল দেখিতে লাগিলেন—শ্রীরামকৃষ্ণের অপার করুণা!" *

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিষ্য-স্নেহ

গিরিশচন্দ্র বলিতেন, "বাল্যকালে পিতার কাছে যেরূপ আদর পাইয়াছিলাম, পরমহংসদেবের কাছে ঠিক সেইরূপ আদর পাইয়াছি। আমার সকল আবদারই তিনি পূর্ণ করিতেন। অন্য সকলে তাঁহার কত গুণের কথা বলেন, আমি কেবল তাঁহার অপার অলৌকিক স্নেহের কথাই ভাবি।" তিনি তাঁহার "পরমহংসদেবের শিষ্য-স্নেহ" প্রবন্ধে লিখিয়াছেন: "পরমহংসদেবের নিকট যাঁহারা গিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলে শিষ্ট, শান্ত ও ধর্ম্মপরায়ণ। নরেন্দ্র প্রভৃতি যাঁহারা তাঁহার স্বগণের মধ্যে গণ্য, তাঁহারা নির্ম্মল বালক

* স্বামী সারদানন্দ-প্রণীত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ' (গুরুভাব—পূর্ব্বার্দ্ধ) গ্রন্থে সবিস্তার পাঠ করুন।

বয়সে প্রভুর নিকট যান ও প্রভুর স্নেহে আবদ্ধ হইয়া পিতামাতা ভুলিয়া প্রভুর কার্য্যে নিযুক্ত হন। তাঁহাদের প্রতি প্রভুর স্নেহ-বর্ণনায় তাঁহার প্রকৃত স্নেহ হয়তো বুঝান যাইবে না। পবিত্র বালকবৃন্দ সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া শরণাপন্ন হইয়াছে, ইহাতে স্নেহ জন্মিবার কথা। কিন্তু আমার প্রতি স্নেহ, অহেতুকী দয়াসিন্ধুর পরিচয়। ভগবানের একটী নাম পতিতপাবন, মানবদেহে সে নামের সার্থকতা আমিই দেখিয়াছি। পতিতপাবন রামকৃষ্ণ আমায় স্নেহ করিয়াছেন, সেই নিমিত্ত আমার প্রতি স্নেহের কথা বলিতে প্রবৃত্ত হইলাম। পরমহংসদেবের নিকট যাঁহারা গিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ-বা চঞ্চল প্রকৃতির থাকিতে পারেন, কিন্তু আমার তুলনায় সকলেই সাধু। কাহার কখনও-বা পদস্খলন হইয়া থাকিতে পারে, কিন্তু আমার গঠনই স্বতন্ত্র, সোজা পথে চলিতে জানিতাম না। পরমহংসদেবের স্নেহের বিকাশ আমাতে যেরূপ পাইয়াছে, সেরূপ আর অন্য কোথাও হয় নাই।··

"যে সময়ে পরমহংসদেব আমায় আশ্রয় প্রদান করেন, তখন আমি হৃদি-দ্বন্দ্বে বিকলিত। পূর্ব্বের শিক্ষা-দীক্ষা, বাল্যকাল হইতে অভিভাবকশূন্য হইয়া যৌবন-সুলভ চপলতা—সমস্তই আমায় ঈশ্বর-পথ হইতে দূরে লইয়া যাইতেছিল। সে সময়ে জড়-বাদী প্রবল, ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করা একপ্রকার মূর্খতা ও হৃদয়দৌর্ব্বল্যের পরিচয়; সুতরাং সময়বয়স্কের নিকট একজন কৃষ্ণ-বিষ্ণু বলিয়া পরিচয় দিতে গিয়া, 'ঈশ্বর নাই'—এই কথাই প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করা হইত। আস্তিককে উপহাস করিতাম, এবং এ-পাত ও-পাত বিজ্ঞান উল্টাইয়া স্থির করা হইল যে ধর্ম্ম কেবল সংসার রক্ষার্থ কল্পনা, সাধারণকে ভয় দেখাইয়া কুকার্য্য হইতে বিরত রাখিবার উপায়। দুষ্কর্ম ধরা পড়িলেই দুষ্কর্ম্ম। গোপনে করিতে পারা বুদ্ধিমানের কার্য্য, কৌশলে স্বার্থ-সাধন করাই পাণ্ডিত্য, কিন্তু ভগবানের রাজ্যে এ পাণ্ডিত্য বহুদিন চলে না। দুর্দ্দিন অতি কঠিন শিক্ষক। সেই কঠিন শিক্ষকের তাড়নায় শিখিলাম যে, কুকার্য্য গোপন রাখিবার কোনও উপায় নাই—"ধর্ম্মের ঢাক আপনি বাজে।" শিখিলাম বটে—কিন্তু কার্য্যজনিত ফলভোগ আরম্ভ হইয়াছে, নিরাশ-ব্যঞ্জক পরিণাম মানসপটে উদয় হইতেছে। শাস্তি আরম্ভ হইয়াছে মাত্র, কিন্তু শাস্তি এড়াইবার কোন উপায় দেখিতেছি না। বন্ধু-বান্ধবহীন, চতুর্দ্দিকে বিপজ্জাল···।" ইত্যাদি। (১৭৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

তাহার পর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আশ্রয় লাভ করিয়া গিরিশচন্দ্র লিখিতেছেন: "মন তখন আনন্দে পরিপ্লুত! যেন নূতন জীবন পাইয়াছি। পূর্ব্বের সেই ব্যক্তি আমি নাই, হৃদয়ে বাদানুবাদ নাই। ঈশ্বর সত্য, ঈশ্বর আশ্রয়দাতা, এই মহাপুরুষের আশ্রয় লাভ করিয়াছি, এখন ঈশ্বরলাভ আমার অনায়াসসাধ্য—এইভাবে আচ্ছন্ন হইয়া দিন-যামিনী যায়। শয়নে-স্বপনেও এই ভাব,—পরম সাহস, পরমাত্মীয় পাইয়াছি, আমার সংসারে আর কোনও ভয় নাই। মহাভয়—মৃত্যুভয়—তাহাও দূর হইয়াছে।

"আমি তো এইরূপ ভাবি। এদিকে পরমহংসদেবের নিকট হইতে যে ব্যক্তি আসেন, তাঁহারই মুখে শুনি, যে প্রভু আমার কথা কতই বলিয়াছেন। যদি কেহ আমার নিন্দা করে, খুঁজিয়া নিন্দা বাহির করিতে হয় না, তিনি তৎক্ষণাৎ বলেন,—

'না, জান না, ওর খুব বিশ্বাস।'

"*মাঝে মাঝে থিয়েটারে আসেন। দক্ষিণেশ্বর হইতে, আমাকে খাওয়াইবার জন্য* খাবার লইয়া আসেন। প্রসাদ না হইলে, আমার খাইতে রুচি হইবে না, সেইজন্য মুখে ঠেকাইয়া আমাকে খাইতে দেন। আমার ঠিক বালকের ভাব হয়, পিতা মুখ হইতে খাবার দিতেছেন, আমি আনন্দে তাহা ভোজন করি।

"একদিন দক্ষিণেশ্বরে গিয়াছি, তাঁহার ভোজন শেষ হইয়াছে। আমায় বলিলেন,—'পায়েস খাও।' আমি খাইতে বসিয়াছি, তিনি বলিলেন,—'তোমায় খাওয়াইয়া দি।' আমি বালকের ন্যায় বসিয়া খাইতে লাগিলাম। তিনি কোমল হস্তে আমাকে খাওয়াইয়া দিতে লাগিলেন। মা যেমন চেঁচে-পুঁছে খাওয়াইয়া দেন, সেইরূপ চেঁচে-পুঁছে খাওয়াইয়া দিলেন। আমি যে বুড়ো ধাড়ি, তাহা আমার মনে রহিল না। আমি মায়ের বালক, মা খাওয়াইয়া দিতেছেন,—এই মনে হইল। যখন মনে হয় যে অনেক অস্পর্শীয় ওষ্ঠে আমার ওষ্ঠ স্পর্শিত হইয়াছে, সেই ওষ্ঠে তিনি নির্ম্মল হস্তে পায়েস দিয়াছেন, তখন যেন আত্মহারা হইয়া ভাবি, এ ঘটনা কি সত্য হইয়াছিল, না স্বপ্নে দেখিয়াছি! একজন ভক্তের মুখে শুনিয়াছিলাম যে তিনি দেব-দৃষ্টিতে আমাকে উলঙ্গ বালক দেখিয়াছিলেন। সত্যই আমি তাঁহার নিকট গিয়া, যেন নগ্ন বালকের ন্যায় হইতাম। যে সকল দ্রব্য আমার রুচিকর, তিনি কিরূপে জানিতেন, তাহা আমি জানি না, সেই সকল দ্রব্য, আমাকে সম্মুখে বসাইয়া খাওয়াইতেন। স্বহস্তে আমাকে জল ঢালিয়া দিতেন।* আমি বর্ণনা করিতেছি মাত্র, কিন্তু আমি তাঁহার স্নেহ প্রকাশ করিতে পারিতেছি কি না—জানি না। বোধ হয় আমার সম্পূর্ণ অনুভব হইতেছে না,—সম্পূর্ণ অনুভব হইলে, যাহা বলিতেছি, বলিতে পারিতাম না, ক্বচিৎ কখনও সে ভাব উদয় হইলে জড় হইয়া যাই।...

"এক দিনে পদসেবা করিতে দিয়াছেন, আমি বেজার। ভাবিতেছি,—কি আপদ,

* "গিরিশের জন্য জলখাবার আসিয়াছে। ফাগুর দোকানের গরম কচুরী, লুচি ও অন্যান্য মিষ্টান্ন। বরাহনগরে ফাগুর দোকান। ঠাকুর নিজে সেই সমস্ত খাবার সম্মুখে রাখাইয়া প্রসাদ করিয়া দিলেন। তারপর নিজ হাতে করিয়া খাবার গিরিশের হাতে দিলেন। বলিলেন, বেশ কচুরী।

গিরিশ সম্মুখে বসিয়া খাইতেছেন। গিরিশকে খাবার জল দিতে হইবে, ঠাকুরের শয্যার দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে কুঁজোয় করিয়া জল আছে। গ্রীষ্মকাল বৈশাখ মাস, ঠাকুর বলিলেন, 'এখানে বেশ জল আছে।'

ঠাকুর অতি অসুস্থ। দাঁড়াইবাব শক্তি নাই।

ভক্তেরা অবাক হইয়া কি দেখিতেছেন? দেখিতেছেন, ঠাকুরের কোমরে কাপড় নাই। দিগম্বর, বালকের ন্যায় শয্যা হইতে এগিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন। নিজে জল গড়াইয়া দিবেন! ভক্তদের নিশ্বাসবায়ু স্থির হইয়া গিয়াছে। ঠাকুর রামকৃষ্ণ জল গড়াইলেন। গেলাস হইতে একটু জল হাতে লইয়া দেখিতেছেন, ঠাণ্ডা কি না। দেখিতেছেন, জল তত ঠাণ্ডা নয়। অবশেষে অন্য ভাল জল পাওয়া যাইবে না বুঝিয়া অনিচ্ছাসত্ত্বে ঐ জলই দিলেন।"

(শ্রীম-কথিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত'। দ্বিতীয় ভাগ, ষড়বিংশ খণ্ড। ঠাকুর রামকৃষ্ণ কাশীপুর বাগানে ভক্ত সঙ্গে।)

কে বসে এখন পায়ে হাত বুলোয়! সে কথা যখন মনে হয়, আমার প্রাণ বিকল হ'য়ে উঠে, কেবল তাঁহার অসীম স্নেহ স্মরণ করিয়া শান্ত হই।

"পীড়িত অবস্থায়, আমি দেখিতে যাইতাম না। কেহ যদি বলিত, অমুক দেখিতে আসে না, তিনি অমনি বলিতেন,—'আহা, সে আমার যন্ত্রণা দেখিতে পারে না।'"

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি কটুবাক্য-প্রয়োগ

ঠাকুরের অন্যান্য ভক্তগণকে অতি নিষ্ঠার সহিত গুরুসেবা করিতে দেখিয়া গিরিশ-চন্দ্রের মনে হইত, "গুরুসেবা কেমন করিয়া করিতে হয়, আমি জানি না—আমি কিছুই করিতে পারিলাম না! ঠাকুর যদি আমার সন্তানরূপে জন্মগ্রহণ করেন, তাহা হইলে বোধহয়, মমতাবশতঃ সাধ মিটাইয়া সেবা করিতে পারি।"

শ্রীরামকৃষ্ণদেব একদিন থিয়েটার দেখিতে আসিয়াছেন। গিরিশচন্দ্র দোকান হইতে গরম-গরম লুচি ভাজাইয়া আনিয়া পরমহংসদেবের আহারের ব্যবস্থা করিলেন, কারণ দক্ষিণেশ্বরে গিয়া আহার করিতে তাঁহার অধিক রাত্রি হইয়া যায়। পরমহংসদেব অভিনয় দর্শনান্তে আহার করিয়া যে সময়ে বাহির হইবার উদ্যোগ করিতেছেন, গিরিশচন্দ্র মদ্যপান করিয়া আসিয়া ঠাকুরকে ধরিয়া বসিলেন, "তুমি আমার ছেলে হও।" পরমহংসদেব বলিলেন, "তা কেন, আমি তোর ইষ্ট হ'য়ে থাক্‌বো।" গিরিশচন্দ্র যত বলেন, পরমহংসদেবের ঐ এক কথা, "তোর ইষ্ট হ'য়ে থাক্‌বো। আমার বাপ অতি নির্ম্মল ছিলেন, আমি তোর ছেলে কেন হবো?" মত্ততাপ্রযুক্ত গিরিশচন্দ্র অকথ্য ভাষায় ঠাকুরকে গালি দিতে আরম্ভ করিলেন। ভক্তগণ কুপিত হইয়া গিরিশচন্দ্রকে শাস্তি দিতে উদ্যত। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহাদিগকে নিবারণ করিয়া হাসিতে-হাসিতে বলিলেন, "এটা কোন্ থাকের ভক্ত রে? এটা বলে কি?" গিরিশচন্দ্রের মুখের তোড় ততই চলিতে লাগিল।

ঠাকুর ভক্তগণকে লইয়া যে সময়ে গাড়ীতে উঠিলেন, গিরিশচন্দ্র সঙ্গে-সঙ্গে আসিয়া, গাড়ীর সম্মুখে কর্দ্দমাক্ত রাস্তার উপর লম্ববান হইয়া শুইয়া পড়িয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন। পরমহংসদেব দক্ষিণেশ্বরে চলিয়া গেলেন।

গিরিশচন্দ্রের মনে কিছুমাত্র শঙ্কা নাই। আদুরে গোপাল—বয়াটে ছেলে যেরূপ বাপকে গালি দিয়া নিশ্চিন্ত থাকে, তিনিও পরমহংসদেবের আদুরে বয়াটে ছেলের মত কার্য্য করিয়া নির্ভয়ে রহিলেন। ঠাকুরের স্নেহের উপর তাঁহার এতটা নির্ভর, তাঁহার স্নেহ এত অসীম—যে ঠাকুর তাঁহাকে পরিত্যাগ করিবেন—এ আশঙ্কা একবারও তাঁহার জন্মিল না।

পরমহংসদেবের ভক্তগণ সকলেই ব্যথিত এবং বিরক্ত। পরদিন দক্ষিণেশ্বরে গিয়া ঠাকুরের সম্মুখে অনেকেই বলিতে লাগিলেন, "ওটা পাষণ্ড আমরা জানি, ওর কাছেও আপনি যান?" কেহ বলিলেন, "আর ওর সঙ্গে সম্বন্ধ রেখে কাজ নাই।" এইরূপ

কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময়ে ঠাকুরের পরমভক্ত রামচন্দ্র দত্ত আসিয়া উপস্থিত। ঠাকুর তাঁহাকে বলিলেন, "শুনেছ গা, রাম! দেড়খানা লুচি খাইয়ে গিরিশ ঘোষ আমার পিতৃচ্ছন্ন-মাতৃচ্ছন্ন করেছে।" ভক্তচূড়ামণি রামবাবু বলিলেন, "কি করবেন? সে তো ভালই করেছে।" শ্রীরামকৃষ্ণদেব উপস্থিত ভক্তগণকে বলিলেন, "শোন-শোন রাম কি বলে,—এর পর আমায় যদি মারে?" অম্লানবদনে রামচন্দ্র উত্তর করিলেন, "মার খেতে হবে।" ঠাকুর কহিলেন, "মার খেতে হবে!" তখন রামবাবু বলিলেন, "গিরিশের অপরাধ কি? কালীয় সর্পের বিষে রাখাল-বালকগণের মৃত্যু হ'লে শ্রীকৃষ্ণ কালীয় নাগের যথাবিহিত শাস্তি বিধান ক'রে বলেছিলেন, 'তুমি কি জন্য বিষ উদ্গীরণ কর?' নাগ তাহাতে উত্তর দিয়াছিল, 'প্রভু, যাকে অমৃত দিয়েছ, সে তাই দিতে পারে, কিন্তু আমায় খালি বিষ দিয়েছ, আমি অমৃত কোথায় পাব?' গিরিশ ঘোষকে যাহা দিয়াছেন, সে তাই দিয়ে আপনার পূজা করেছে। আমাদের বলিলে, হয়তো, এতক্ষণ তাঁর নামে রাজদ্বারে অভিযোগ করা হ'ত, আপনি পতিতপাবন—নিজে অঞ্জলি পেতে ল'য়ে এসেছেন!"

"রামবাবুর কথায় ঠাকুরের মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠিল, তাঁহার অক্ষিদ্বয়ে জল আসিল। ভক্তবৎসল করুণাময় তখনই উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন, 'রাম, তবে গাড়ী আন, আমি গিরিশ ঘোষের বাড়ী যাব।' কোন-কোন ভক্ত সেই দুই প্রহরের সূর্য্যোত্তাপে তাঁহার ক্লেশ হইবে বলিয়া আপত্তি করিলেন, কিন্তু তিনি তাহা না শুনিয়া সেই দণ্ডে শকটারোহণে গিরিশের বাটীতে চলিলেন।"*

এদিকে গিরিশচন্দ্র নিশ্চিন্ত মনে আছেন, তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, যে তাঁহার মহা অপরাধ হইয়াছে। গিরিশচন্দ্র বলিলেন, "অপরাধ ক'টা সামলাইব, তিনি যদি আমার অপরাধ ধরেন, তাহ'লে আমি রেণুর রেণু হ'য়ে যাই!" তবে ঠাকুরের ভক্তগণের হৃদয়ে ব্যথা দিয়াছেন বলিয়া গিরিশচন্দ্র অতিশয় অনুতপ্ত—ভক্তসমাজে কেমন করিয়া আর মুখ দেখাইবেন!

এমন সময় ভক্তগণসঙ্গে সহসা শ্রীরামকৃষ্ণদেব আসিয়া বলিলেন, "ঈশ্বর ইচ্ছায় এলুম।"

ঐ দিন পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দ গিরিশচন্দ্রের পদধূলি লইয়া বলিয়াছিলেন, "ধন্য তোমার বিশ্বাস ভক্তি!"

গিরিশচন্দ্র লিখিয়াছেন, "জন্মদাতা পিতা যে অপরাধে ত্যজ্যপুত্র করে, সে অপরাধ—আমার পরম পিতার নিকট অপরাধ বলিয়া গণ্য হইল না। তিনি আমার বাড়ী আসিলেন, দর্শনলাভে চরিতার্থ হইলাম। কিন্তু দিন দিন অন্তর কুঞ্চিত হইতে লাগিল। তিনি স্নেহময়—সম্পূর্ণ ধারণা রহিল; কিন্তু নিজ কার্য্যের আলোচনায় আপনি লজ্জিত হইতে লাগিলাম। ভক্তেরা কত প্রকারে তাঁহার পূজা করে, ভাবিতে লাগিলাম। আপনাকে ধিক্কার দিতে লাগিলাম।"

* স্বর্গীয় রামচন্দ্র দত্ত-প্রণীত 'পরমহংসদেবের জীবন-বৃত্তান্ত' দ্রষ্টব্য।

শ্রীরামকৃষ্ণের অভয়বাণী

"ইহার কিছুদিন পরে ভক্তচূড়ামণি দেবেন্দ্রনাথ মজুমদারের বাসায় প্রভু উপস্থিত হইলেন। আমিও তথায় উপস্থিত। চিন্তিত হইয়া বসিয়া আছি, তিনি ভাবাবেশে বলিলেন—'গিরিশ ঘোষ, তুই কিছু ভাবিস্‌নে, তোকে দেখে লোক অবাক হয়ে যাবে।'" *

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিক্ষাদান-কৌশল

গিরিশচন্দ্র তাঁহার "পরমহংসদেবের শিষ্য-স্নেহ" প্রবন্ধে লিখিয়াছেন: "তাঁহার শিক্ষাদানের এক আশ্চর্য্য কৌশল, বাল্যকাল হইতে আমার প্রকৃতি এই যে, যে কার্য্য কেহ নিবারণ করিবে, সেই কার্য্য আগে করিব। পরমহংসদেব একদিনের নিমিত্ত আমায় কোন কার্য্য করিতে নিষেধ করেন নাই। সেই নিষেধ না করাই, আমার পক্ষে পরম নিষেধ হইয়াছে। অতি ঘৃণিত কার্য্য মনে উদয় হইলে, আমার পুরুষ-প্রকৃতিকে প্রণাম আসে। সে স্থলে পরমহংসদেবের উদয়। কোথায় কোন ঘৃণিত আলোচনা হইলে পরমহংসদেবের কথায় বহুরূপী ভগবানকে মনে পড়ে। তিনি মিথ্যা কথা কহিতে সকলকে নিষেধ করিতেন। আমি বলিলাম, 'মহাশয়, আমি তো মিথ্যা কথা কই কিরূপে সত্যবাদী হইব?' তিনি বলিলেন, 'তুমি ভাবিও না, তুমি আমার মত সত্য-মিথ্যার পার।' মিথ্যা কথা মনে উদয় হইলে, পরমহংসদেবের মূর্ত্তি দেখিতে পাই, আর মিথ্যা বাহির হইতে চাহে না। সাংসারিক ব্যবহারে চক্ষু-লজ্জায় দু'একটা এদিক ওদিক কথা কহিতে হয়, কিন্তু যে আমি মিথ্যা বলিতেছি, তাহা জানান দিবার বিশেষ চেষ্টা থাকে। পরমহংসদেব আমার হৃদয়ের সম্পূর্ণ অধিকারী, সে অধিকার তাঁহার স্নেহের। এ স্নেহ অতি আশ্চর্য্য! তাঁহার কৃপায় যদি আমার কোনও গুণ বর্ত্তিয়া থাকে, সে গুণগৌরব আমার। তিনি কেবল আমার পাপ গ্রহণ করিয়াছেন, স্পষ্ট কথায় গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার ভক্তের মধ্যে যদি কেহ বলিত আমি পাপী, তিনি শাসন করিতেন, বলিতেন,—'ওকি? পাপ কিসের? আমি কীট আমি

* "শ্রীরামকৃষ্ণ। (ভাবাবিষ্ট হইয়া গিরিশের প্রতি) তুমি গালাগাল খারাপ কথা অনেক বল; তা' হউক, ওসব বেরিয়ে যাওয়াই ভাল। বদরক্ত রোগ কারু-কারুর আছে। যত বেরিয়ে যায় ততই ভাল।

উপাধিনাশের সময়েই শব্দ হয়। কাঠ পোড়বার সময় চড়-চড় শব্দ করে। সব পুড়ে গেলে আর শব্দ থাকে না।

তুমি দিন-দিন শুদ্ধ হবে। তোমার দিন-দিন খুব উন্নতি হবে। লোকে দেখে অবাক হবে।

আমি বেশী আসতে পারব না;—তা' হউক,—তোমার এম্নিই হবে।"

(শ্রীম-কথিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত'। তৃতীয় ভাগ, পঞ্চম খণ্ড, তৃতীয় পরিচ্ছেদ। দেবেন্দ্রের বাড়ীতে ভক্ত সঙ্গে। ৬ই এপ্রিল ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ, ২৫শে চৈত্র ১২৯১।)

কীট বলিতে বলিতে কীট হইয়া যায়। আমি মুক্ত আমি মুক্ত, এ অভিমান রাখিলে মুক্ত হইয়া যায়। সর্ব্বদা মুক্ত অভিমান রাখো, পাপ স্পর্শ করিবে না।' ”

ঈশ্বরজ্ঞানে শ্রীরামকৃষ্ণ-পদে প্রথম অঞ্জলি

“রামদাদা” প্রবন্ধে গিরিশচন্দ্র লিখিয়াছেন, “পীড়িত অবস্থায় প্রভু শ্যামপুকুরের একটী বাটী ভাড়া করিয়া আছেন। কালীপূজার দিন উপস্থিত হইল (৬ই নভেম্বর ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ)। ঠাকুর শ্রীমান কালীপদ ঘোষ নামক একজন ভক্তকে বলিয়াছিলেন, ‘আজ কালী পূজার উপযোগী আয়োজন করিও।’ কালীপদ অতি ভক্তির সহিত উদ্যোগ করিয়াছে। সন্ধ্যার সময় প্রভুর সম্মুখে পূজার উপযোগী সামগ্রী স্থাপিত হইল। একদিকে নানাবিধ ভোজ্যসামগ্রী, প্রভু অন্য আহার করিতে পারিতেন না, তাঁহার জন্য বার্লিও আছে। অপরদিকে স্তূপাকার ফুল, – রক্তকমল, রক্তজবাই অধিক। পূর্ব্ব-পশ্চিমে লম্বা ঘর ভক্তে পরিপূর্ণ। ঘরের পশ্চিম প্রান্তে রামদাদা, আমি তাঁহার নিকট আছি। আমার অন্তর অতিশয় ব্যাকুল হইতেছে, ছটফট করিতেছে, প্রভুর সম্মুখে যাইবার জন্য আমি অস্থির। রামদাদা আমায় কি বলিলেন, ঠিক আমার স্মরণ নাই, আমার প্রকৃত অবস্থা তখন নয়, কি একটা ভাবান্তর হইয়াছে। রামদাদা যেন আমায় উৎসাহ দিয়া বলিলেন, – ‘যাও যাও!’ রামদাদার কথায় আর সঙ্কোচ রহিল না, ভক্ত-মণ্ডলী অতিক্রম করিয়া প্রভুর সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। প্রভু আমায় দেখিয়া বলিলেন, – ‘কি কি – এ সব আজ করতে হয়।’ আমি অমনি – ‘তবে চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিই’ বলিয়া, দুই হাতে ফুল লইয়া ‘জয় মা’ শব্দ করিয়া পাদ-পদ্মে দিলাম। অমনি সকল ভক্তই পাদ-পদ্মে পুষ্পাঞ্জলি দিতে লাগিলেন। প্রভু বরাভয়কর-প্রকাশ হইয়া সমাধিস্থ রহিলেন। সে দৃশ্য যখন আমার স্মরণ হয়, রামদাদাকে মনে পড়ে। মনে হয়, রাম-দাদা আমাকে সাক্ষাৎ কালীপূজা করাইলেন।”* অগাধ বিশ্বাস এবং প্রবল অনুরাগেই গিরিশচন্দ্র তাঁহার গুরুভ্রাতাগণের মধ্যে সর্ব্বাগ্রে ঠাকুরকে বুঝিয়া তাঁহার আধ্যাত্মিক সূক্ষ্মদর্শিতার পরিচয় দিয়াছিলেন।

* এতদ্-সম্বন্ধে যাঁহারা বিস্তৃত বিবরণ পাঠ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা স্বর্গীয় রামচন্দ্র দত্ত-প্রণীত ‘পরমহংসদেবের জীবন-বৃত্তান্ত’ (অষ্টবিংশ পরিচ্ছেদ), স্বামী সারদানন্দ-প্রণীত ‘শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ’ (ঠাকুরের দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ, দ্বাদশ অধ্যায়, দ্বিতীয় পাদ) এবং শ্রীম-কথিত ‘শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত’, তৃতীয় ভাগ, একবিংশ খণ্ড (৺কালীপূজার দিবসে শ্যামপুকুর বাটীতে ভক্ত সঙ্গে) পাঠ করুন।

গিরিশচন্দ্র ও বিবেকানন্দের তর্কযুদ্ধ

বিশ্ববিজয়ী স্বামী বিবেকানন্দ হৃদয়মধ্যে গুরুদেবকে সাক্ষাৎ ভগবান জানিলেও গিরিশচন্দ্রের সহিত তর্ক করিয়া বলিতেন, "ঠাকুরকে ভগবান বলিয়া আমি স্বীকার করি না।" পরমহংসদেব উভয়কে এ সম্বন্ধে তর্কে লাগাইয়া দিয়া আনন্দ অনুভব করিতেন। গিরিশচন্দ্র বলিতেন, "ভগবানের সর্ব্ব লক্ষণ তাঁহাতে, অস্বীকার করিবার উপায় নাই।" এই তর্ক চলিত। উভয়েই শিক্ষিত, উভয়েই নানা বিদ্যায় পণ্ডিত, সমাগত ভক্তমণ্ডলী নীরবে সেই সুদীর্ঘ সারবান তর্কযুক্তি শ্রবণ করিতেন। (বিস্তৃত বিবরণ শ্রীম-কথিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত', প্রথম ভাগ, চতুর্দ্দশ খণ্ড দ্রষ্টব্য।) "ঐরূপ তর্কে স্বামীজির মুখের সাম্‌নে বড় একটা কেহ দাঁড়াইতে পারিতেন না এবং স্বামীজির তীক্ষ্ণ যুক্তির সম্মুখে নিরুত্তর হইয়া কেহ-কেহ মনে-মনে ক্ষুণ্ণও হইতেন। ঠাকুরও সে কথা অপরের নিকট অনেক সময় আনন্দের সহিত বলিতেন, 'অমুকের কথাগুলো নরেন্দর সেদিন ক্যাঁচ-ক্যাঁচ ক রে কেটে দিলে—কি বুদ্ধি!' সাকারবাদী গিরিশের সহিত তর্কে কিন্তু স্বামীজিকে একদিন নিরুত্তর হইতে হইয়াছিল। সেদিন ঠাকুর শ্রীযুত গিরিশের বিশ্বাস আরও দৃঢ় ও পুষ্ট করিবার জন্যই যেন তাঁহার পক্ষে ছিলেন বলিয়া আমাদের বোধ হইয়াছিল।"*

স্বামীজি নিরুত্তর হইলে ঠাকুর আনন্দ করিয়া গিরিশচন্দ্রকে বলিলেন, "ওর কাছ থেকে লিখে নাও যে, ও হার মান্‌লে!" ("ভক্ত গিরিশচন্দ্র", 'উদ্বোধন', জ্যৈষ্ঠ ১৩২০ সাল।)

মহেন্দ্রলাল সরকারের তর্কে পরাজয়

স্বনামধন্য চিকিৎসক মহেন্দ্রলাল সরকার সি.-আই.-ই. মহাশয় পরমহংসদেবের চিকিৎসায় আসিয়া একদিন গিরিশচন্দ্রকে বলেন, "আর সব কর—but do not worship him as God. এমন ভাল লোকটার মাথা খাচ্চ?" গিরিশচন্দ্র বলিলেন, "কি করি মহাশয়! যিনি এ সংসার-সমুদ্র ও সন্দেহ-সাগর থেকে পার করলেন তাঁকে আর কি করবো বলুন। তাঁর গু কি গু বোধ হয়?"

তাহার পর গুরুপূজা, মহাপুরুষ ও জীবের পাপ গ্রহণ সম্বন্ধে তর্ক চলিতে লাগিল। ভক্তগণ বিস্মিত হইয়া উভয়ের তর্ক শুনিতেছেন। অবশেষে ডাক্তার সরকার গিরিশ-চন্দ্রকে বলিলেন, "তোমার কাছে হেরে গেলুম, দাও পায়ের ধূলো দাও।" গিরিশচন্দ্রের পদধূলি লইয়া তিনি নরেন্দ্রকে (বিবেকানন্দ স্বামী) বলিলেন, "আর কিছু না, his intellectual power (গিরিশের বুদ্ধিমত্তা) মানতে হবে।" যাঁহারা বিস্তৃত বিবরণ

* স্বামী সারদানন্দ-প্রণীত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ' (গুরুভাব—পূর্ব্বার্দ্ধ)।

জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত' (প্রথম ভাগ) পাঠ করুন।
টীকায় কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম।*

শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীমুখে বেদান্ত শ্রবণ

গিরিশচন্দ্র বলিতেন, "আমার মস্তিষ্ক নিতান্ত দুর্ব্বল নহে, একদিন তাঁহার শ্রীমুখে বেদান্তের কথা শুনিতেছিলাম। তিনি বলিতেছিলেন, 'সচ্চিদানন্দ স্বরূপ মহাসমুদ্র দূর হ'তে দর্শন ক'রেই মহর্ষি নারদ ফিরলেন, শুকদেব তিনবার মাত্র স্পর্শ করেছিলেন আর জগদ্‌গুরু শিব তিন গণ্ডূষ জলপান ক'রেই কাৎ হ'য়ে পড়লেন!' শুনিতে-শুনিতে আমি তাঁহাকে বলিতে বাধ্য হইলাম, 'মহাশয় আর বলিবেন না। আমার মাথা টন্ টন্ করিতেছে, আর ধারণা করিতে আমি অক্ষম।' "

গিরিশচন্দ্রের বিশ্বাস, ভক্তি ও বুদ্ধি

পরমহংসদেব বলিতেন, "গিরিশের বুদ্ধি পাঁচ সিকে পাঁচ আনা (অর্থাৎ ষোল আনার উপর)। তার বিশ্বাস ভক্তি আঁকড়ে পাওয়া যায় না।"

ভক্তচূড়ামণি স্বর্গীয় রামচন্দ্র দত্ত তাঁহার 'পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত' গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "গিরিশবাবুর ভক্তির তুলনা নাই। পরমহংসদেব তাঁহাকে বীরভক্ত, সুর-ভক্ত বলিয়া ডাকিতেন। গিরিশকে পাইলে তিনি যে কি আনন্দিত হইতেন, তাহা

* "ডাক্তার। (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি) ভাল, তুমি যে ভাব হ'য়ে লোকের গায়ে পা দাও, সেটা ভাল নয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আমি কি জানতে পারি গা, কার গায়ে পা দিচ্ছি কি না?

ডাক্তার। ওটা ভাল নয়, এটুকু তো বোধ হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ। আমার ভাবাবস্থায় আমার কি হয়, তা তোমায় কি বলবো? সে অবস্থার পর এমন ভাবি, বুঝি রোগ হচ্ছে ঐ জন্যে। ঈশ্বরের ভাবে আমার উন্মাদ হয়। উন্মাদে এরূপ হয়, কি ক'রবো?

ডাক্তার। (শিষ্যগণের প্রতি) উনি মেনেছেন। He expresses regret for what he does ; কাজটা sinful এটা বোধ আছে।

গিরিশ। (ডাক্তারের প্রতি) মহাশয়! আপনি ভুল বুঝেছেন। উনি সে জন্য দুঃখিত হন নি। এঁর দেহ শুদ্ধ—অপাপবিদ্ধ। ইনি জীবের মঙ্গলের জন্য তাদের স্পর্শ করেন। তাদের পাপ গ্রহণ ক'রে এঁর রোগ হবার খুব সম্ভাবনা, তাই কখনও কখনও ভাবেন। আপনার যখন Colic (শূল বেদনা) হয়েছিল, তখন আপনার কি regret (দুঃখ) হয় নাই, কেন রাত জেগে এত পড়তুম? তা ব'লে রাত জেগে পড়াটা কি অন্যায় কাজ? রোগের জন্য regret হ'তে পারে, তা ব'লে জীবের মঙ্গলসাধনের জন্য স্পর্শ করাকে অন্যায় কাজ মনে করেন না।"

যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিতে পারিয়াছেন। তিনি বলিতেন যে, গিরিশের ন্যায় বুদ্ধিমান ব্যক্তি আর দ্বিতীয় দেখেন নাই। মথুরবাবুর বারো আনা বুদ্ধি ছিল এবং গিরিশের ষোল আনার উপরে চারি-ছয় আনা।"

পরমপূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ তাঁহার 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গে' (গুরুভাব—পূর্ব্বার্দ্ধ) লিখিয়াছেন, "গৃহী ভক্তগণের ভিতর শ্রীযুত গিরিশের তখন প্রবল অনুরাগ। ঠাকুর কোনও সময়ে তাঁহার অদ্ভুত বিশ্বাসের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া অন্য ভক্তগণকে বলিয়াছিলেন, "গিরিশের পাঁচ সিকে পাঁচ আনা বিশ্বাস! ইহার পর লোকে ওর অবস্থা দেখে অবাক হবে!" বিশ্বাস-ভক্তির প্রবল প্রেরণায় গিরিশ তখন হইতে ঠাকুরকে সাক্ষাৎ ভগবান—জীবোদ্ধারের জন্য কৃপায় অবতীর্ণ বলিয়া অনুক্ষণ দেখিতেন এবং ঠাকুর তাঁহাকে নিষেধ করিলেও তাঁহার ঐ ধারণা সকলের নিকট প্রকাশ্যে বলিয়া বেড়াইতেন।"

গিরিশের নিমিত্ত শ্রীরামকৃষ্ণের শক্তি-প্রার্থনা

"ঠাকুরের নিকটে যখন বহু লোকের সমাগম হইতে থাকে, তখন ধর্ম্ম বিষয়ে আলোচনা করিতে-করিতে পরিশ্রান্ত ও ভাবাবিষ্ট হইয়া তিনি এক সময়ে শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে বলিয়াছিলেন, 'মা আমি আর এত বকতে পারি না, তুই কেদার, রাম, গিরিশ ও বিজয়কে* একটু-একটু শক্তি দে, যাতে লোকে তাদের কাছে গিয়ে কিছু শেখবার পরে এখানে (আমার নিকটে) আসে এবং তুই এক কথাতেই চৈতন্যলাভ করে!" ('শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ' ঠাকুরের দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ।)

গিরিশচন্দ্রের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য

পরমহংসদেব বলিতেন, "মন ও মুখ এক করাই সর্ব্ব সাধনের শ্রেষ্ঠ সাধন।" গিরিশচন্দ্র ভাল বা মন্দ কোন কার্য্যই লুকাইয়া করিতে অভ্যস্ত ছিলেন না। তিনি সুরাপান করিতেন, তাহা প্রকাশ্যেই করিতেন, লোক-নিন্দার ভয়ে লুকাইয়া পান করিতেন না। 'চৈতন্যলীলা' অভিনয় দর্শনে মুগ্ধ হইয়া কতকগুলি গোস্বামী ও বিশিষ্ট বৈষ্ণব তাঁহাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত তাঁহার বাটীতে আসেন। গিরিশচন্দ্র তখন মদ্যপান করিতেছিলেন, নিকটেই বোতল রহিয়াছে। বৈষ্ণবগণের ধারণা ছিল, তিনি একজন পরমভক্ত এবং সাধুপুরুষ, কিন্তু তাঁহাকে মদ খাইতে দেখিয়া জনৈক গোস্বামী সন্দিগ্ধ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও কি, ঔষধ সেবন ক'চ্চেন?" নির্ভীক গিরিশচন্দ্র অম্লানবদনে উত্তর

* শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, রামচন্দ্র দত্ত, গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

করিলেন, "না, মদ খাচ্চি।" বৈষ্ণবেরা বড়ই ব্যথিত হইয়া প্রস্থান করিলেন। গিরিশচন্দ্র বলিতেন, "ঔষধ খাইতেছি বলিলেও বৈষ্ণবগণ সন্তুষ্ট হইতেন, কিন্তু মিথ্যা বলিতে আমার প্রবৃত্তি হইল না। ভক্তি লইয়া তাঁহারা আসিয়াছিলেন—ঘৃণা করিয়া চলিয়া গেলেন।"

মদিরা তাঁহাকে উত্তেজিত করিলেও উচ্ছৃঙ্খল করিত না, পরন্তু তাঁহার কবিত্ব-বিকাশেরই সাহায্য করিত, এ নিমিত্ত পরমহংসদেবের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াও গিরিশচন্দ্র সুরাপান পরিত্যাগ করেন নাই এবং পরমহংসদেবও তাঁহাকে কখনও নিষেধ করেন নাই।

কোন-কোন ভক্ত বেশ্যা-সংসর্গ এবং মদ্যপানের নিমিত্ত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট গিরিশচন্দ্রের নিন্দা করিতেন। তাহাতে তিনি উত্তর করিয়াছিলেন, "তাতে ওর দোষ হবে না। ওর ভৈরবের অংশে জন্ম। আমি বহুদিন আগে গিরিশকে মা কালীর মন্দিরে দেখেছি—উলঙ্গ অবস্থা, ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, কাপড়খানি মাথায় পাগড়ির মতন জড়ান, বগলে বোতল—নাচতে-নাচতে এসে আমার কোলে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে আমার বুকে মিশিয়ে গেল!"

গিরিশচন্দ্রকে ঠাকুর একদিন বলিয়াছিলেন, "সংসার করো, অনাসক্ত হয়ে। গায়ে কাদা লাগবে, কিন্তু ঝেড়ে ফেলবে, পাঁকাল মাছের মত। কলঙ্ক সাগরে সাঁতার দেবে, তবু কলঙ্ক গায়ে লাগবে না!" ('শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত', তৃতীয় ভাগ, ত্রয়োদশ খণ্ড।)

আর একদিন পরমহংসদেব, গিরিশচন্দ্র সম্বন্ধে বহু ভক্তগণ সমক্ষে, বিবেকানন্দ স্বামীকে বলিয়াছিলেন, "ওর থাক আলাদা। যোগও আছে, ভোগও আছে, যেমন রাবণের ভাব—নাগকন্যা, দেবকন্যাও লেবে আবার রামকেও লাভ ক'রবে।" ('শ্রীশ্রীরাম-কৃষ্ণ কথামৃত', দ্বিতীয় ভাগ, ত্রয়োবিংশ খণ্ড।)

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ

'এমারেল্ড থিয়েটারে' গিরিশচন্দ্র

'রূপ-সনাতন' নাটক অভিনয়কালীন 'ষ্টার থিয়েটারে' এক বিপ্লব উপস্থিত হয়। 'ষ্টারে'র অসামান্য প্রতিপত্তি দর্শনে কলুটোলার সুবিখ্যাত মতিলাল শীলের পৌত্র স্বর্গীয় গোপাললাল শীল মহাশয়ের থিয়েটার করিবার সখ হইল। পিতৃবিয়োগের পর তখন তিনি অগাধ সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছেন। গোপালবাবু 'ষ্টার থিয়েটারে'র জমী কিনিয়া লইয়া উক্ত থিয়েটারের স্বত্বাধিকারিগণকে থিয়েটার-বাটী স্থানান্তরিত করিবার নোটিস দিলেন। সম্প্রদায় বিষম সমস্যায় পড়িলেন। বড়লোকের সহিত বিবাদের পরিণাম চিন্তা করিয়া তাঁহারা বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন।

অবশেষে গিরিশচন্দ্র শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু, ৺অমৃতলাল মিত্র, শ্রীযুক্ত হরিপ্রসাদ বসু এবং দাশুচরণ নিয়োগী স্বত্বাধিকারিগণের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন, থিয়েটার-বাটীটী গোপাললালবাবুকে বিক্রয় করা যাউক, কিন্তু 'ষ্টার থিয়েটারে'র নাম (গুডউইল) হাতছাড়া করা হইবে না, বিক্রয় করিয়া যে টাকা পাওয়া যাইবে, তাহা লইয়া অন্যত্র জমী খরিদ করিয়া 'ষ্টার থিয়েটারে'র নূতন পত্তন করিতে হইবে।

তাঁহাদের প্রস্তাবে গোপাললালবাবু সম্মত হইয়া ত্রিশ হাজার টাকা দিয়া বাড়ীখানি ক্রয় করিয়া লইলেন। বিদায়-সম্ভাষণের বিশেষ বিজ্ঞাপন প্রচারপূর্ব্বক 'ষ্টার থিয়েটার' সম্প্রদায় 'বুদ্ধদেব' ও 'বেল্লিক বাজার' শেষ অভিনয় করিয়া বিডন ষ্ট্রীট হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিলেন। সেদিনের অভিনয়রাত্রে সাহিত্যরথী স্বর্গীয় অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। তৎ-সম্পাদিত 'নববিভাকর সাধারণী' সাপ্তাহিকপত্র হইতে তাঁহার মন্তব্য নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :

"গিরিশবাবু সদলে 'ষ্টার থিয়েটার' ভবন হইতে বিদায় লইলেন। 'ষ্টার থিয়েটার'-বাড়ীটীর সহিত আর তাঁহাদের কোন সম্পর্ক রহিল না। বঙ্গের সর্ব্বপ্রধান রঙ্গালয়ের এই আকস্মিক তিরোভাব বড়ই আক্ষেপের কথা। দর্শকে-সমালোচকে প্রকৃত রঙ্গ-রসপান গিরিশবাবুর প্রসাদেই করিতেছিলেন।...'বুদ্ধদেবচরিত' ও 'বেল্লিক বাজার' 'ষ্টার থিয়েটারে'র দুটী শেষ অভিনয়। শেষদিনে রঙ্গশালা জনতায় যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। রঙ্গক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠা পর্য্যন্ত কোথাও কখনও এত জনতা হইয়াছিল কি না সন্দেহ। নবীন-প্রবীণ দর্শকদল সাধ মিটাইয়া গিরিশবাবুর রঙ্গময়ী কল্পনার সাধনের বিজয়া দেখিলেন। অভিনয়ান্তে 'বিবাহ-বিভ্রাট'-প্রণেতা শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু এই ক্ষুদ্রকালে তাঁহাদের যে

রাশি-রাশি ক্রটী হইয়াছে, তাহা স্বীকার করিয়া অতি বিনীত বচনে সর্ব্বসমক্ষে ক্ষমা চাহিলেন। পর্ণকুটীর বাঁধিয়া কখনও প্রকাশ্যে আবার দেখা দিবেন, তাহার আভাস দিলেন। কলুটোলাস্থ প্রসিদ্ধ শীল বংশীয় শ্রীযুক্ত গোপাললাল শীল যে ইহার সর্ব্বস্বত্বে অধিকার লাভ করিয়াছেন, তাহাও স্পষ্টাক্ষরে সাধারণের গোচর করিলেন। সকলেই যেন শোকে ম্রিয়মাণ।

গোপালবাবুর একে তরুণ বয়স, তায় তিনি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী, এ সময় কিছু সাবধানে সন্তর্পণে চলা তাঁহার পক্ষে অতি কর্ত্তব্য। তিনি যেমন ভাগ্যবন্ত, তাহাতে তাঁহার নিকট অনেক আশা করা যায়। গোপালবাবুর এটা বেশ বোঝা উচিত, যে, 'ষ্টার থিয়েটার'-গৃহ অর্থ-সামর্থ্যে যেমন সহজে দখল লইলেন, অর্থ-সামর্থ্যে যশের রাজ্যে তেমন সহজে দখল লইতে পারিবেন না। আমাদের শেষ কথা,—·· সঙ্গে-সঙ্গে যেন নাটকাভিনয়ের পরিপোষণে ভাগ্যবান গোপালবাবুর বিশেষ দৃষ্টি থাকে।" 'নববিভাকর সাধারণী', ১২৯৪ সাল, ১৯৮ পৃষ্ঠা।

গোপাললালবাবুর নিকট প্রাপ্ত উক্ত ত্রিশ হাজার টাকায় 'ষ্টার থিয়েটার' সম্প্রদায় কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটস্থ হাতিবাগানে জায়গা কিনিয়া পুনরায় 'ষ্টার থিয়েটারে'র ভিত্তিপ্রতিষ্ঠা করিলেন, এবং শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মিত্র ও ধর্ম্মদাস সুরেব উপরে রঙ্গালয় নির্ম্মাণের ভারার্পণ করিয়া ঢাকায় সদলে অভিনয়ার্থে গমন করিলেন।

গোপালবাবু 'ষ্টার থিয়েটারে'র নাম পরিবর্ত্তন করিয়া 'এমারেল্ড থিয়েটার' নাম দিলেন এবং নাট্যশালা সুসংস্কৃত করিয়া ভাঙ্গা 'ন্যাসান্যাল থিয়েটার'* হইতে অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী, মহেন্দ্রলাল বসু, কেদারনাথ চৌধুরী, রাধামাধব কর, মতিলাল সুর প্রভৃতিকে লইয়া দল গঠিত করিলেন। কেদারবাবু ম্যানেজার হইলেন। তাঁহার রচিত 'পাণ্ডব নির্ব্বাসন' নাটকের মহলা আরম্ভ হইল। গোপালবাবু বিস্তর অর্থব্যয়ে স্বতন্ত্র ডায়নামো বসাইয়া থিয়েটারের ভিতর-বাহির এই প্রথম বৈদ্যুতিক আলোক-

* পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, 'ন্যাসান্যাল থিয়েটার' হইতে গিরিশচন্দ্র চলিয়া আসিবার পর প্রতাপচাঁদ জহরী, কেদারনাথ চৌধুরীকে ম্যানেজার করিয়া থিয়েটার চালাইতে থাকেন। কেদারবাবু-বিরচিত 'ছত্রভঙ্গ' (দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গ) নাটক এবং তৎ-কর্ত্তৃক নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' এইসময়ে সুখ্যাতির সহিত অভিনীত হইয়াছিল। তাহার পর প্রতাপচাঁদবাবুর নিকট হইতে থিয়েটার ভাড়া লইয়া অনেকেই অনেক নাটক অভিনয় করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা পণ্ডিত শ্রীহরিভূষণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের 'কুমারসম্ভব' নাটক বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ধর্ম্মদাসবাবু কর্ত্তৃক চমকপ্রদ সুন্দর দৃশ্যপটাদি সংযোজনে এবং অভিনয়-নৈপুণ্যে নাটকখানির সুখ্যাতি হইয়াছিল। ইহার কিছুদিন পরে ভুবনমোহনবাবুর মাতৃবিয়োগ (১৮৮৪ খ্রী) হইলে তিনি পুনরায় তাঁহার স্ত্রীর নামে ঐ বাটী কিনিয়া লন এবং কেদারনাথবাবুকেই তাঁহার থিয়েটারের ম্যানেজার রাখেন। এইসময়ে যে কয়েকখানি নাটক অভিনীত হয়, তন্মধ্যে কেদারবাবু কর্ত্তৃক নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বউঠাকুরাণীর হাট' খুব জমিয়াছিল। প্রবীণ অভিনেতা স্বর্গীয় রাধামাধব কর বসন্ত রায়ের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া সুমধুর সঙ্গীতে দর্শকগণকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। অতঃপর ভুবনমোহনবাবুর দেনার দায়ে পুনরায় থিয়েটার নিলামে উঠে এবং 'ষ্টার থিয়েটারে'র স্বত্বাধিকারিগণ তাহা কিনিয়া লইয়া বাড়ী ভাঙিয়া ফেলেন।

ঝাড়ায় বিভূষিত করিলেন। বলা বাহুল্য, সে সময়ে কলিকাতায় ইলেকট্রিক লাইটের এরূপ প্রচলন ছিল না। ৮ই অক্টোবর (১৮৮৭ খ্রী) মহাসমারোহে 'এমারেল্ড থিয়েটারে' 'পাণ্ডব নির্ব্বাসন' প্রথমাভিনীত হয়। সুপ্রসিদ্ধ শিল্পী জহরলাল ধর এবং শ্রীযুক্ত শশীভূষণ দে-সম্পাদিত উৎকৃষ্ট দৃশ্যপট এবং বহুমূল্য পোষাক-পরিচ্ছদ, বিদ্যুতালোকে প্রতিফলিত হইয়া দর্শকমণ্ডলীকে চমৎকৃত করিয়া তুলিয়াছিল।

কিন্তু দুই মাস যাইতে না-যাইতে গোপাললালবাবু গিরিশচন্দ্রের অভাব বোধ করিতে লাগিলেন। এত টাকা ঢালিলেন, কিন্তু থিয়েটার তেমন জমিল কই? গোপালবাবুকে অনেকেই বলিতে লাগিলেন, "মহাশয়, থিয়েটারে যদি ফুল ফুটাইতে চান—গিরিশবাবুকে লইয়া আসুন, এ যে আপনার শিবহীন যজ্ঞ হইতেছে।" গোপালবাবু গিরিশচন্দ্রকে তাঁহার থিয়েটারের ম্যানেজার করিবার নিমিত্ত তৎপর হইলেন।

হাতিবাগানে 'ষ্টার থিয়েটারে'র নূতন বাড়ীর নির্ম্মাণকার্য্য তখন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। যে টাকা তাঁহারা গোপালবাবুর কাছে পাইয়াছিলেন, তাহা জমী কিনিতেই গিয়াছিল, পরে স্বত্বাধিকারিগণ নিজ-নিজ চেষ্টায় যে টাকা আনিয়াছিলেন, তাহা হইতেই বাটী নির্ম্মিত হইতেছিল, এক্ষণে সে টাকাও ফুরাইয়া গিয়াছে, টাকার এক্ষণে বড়ই টানাটানি। গিরিশচন্দ্রের উৎসাহ ও ভরসা পাইয়া এবং তাঁহাকেই অবলম্বন করিয়া 'ষ্টার থিয়েটারে'র স্বত্বাধিকারিগণ ঋণগ্রস্ত হইয়া নূতন বাড়ী নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইযাছেন, এক্ষণে এই সঙ্কটাবস্থায় তাঁহাদিগকে ফেলিয়া তিনি যান কি করিয়া? গিরিশচন্দ্র গোপালবাবুর প্রেরিত লোককে 'এমারেল্ড থিযেটারে' যোগদানে তাঁহার অসম্মতি জানাইলেন। গোপালবাবুও ছাড়িবার পাত্র নহেন, তিনি নগদ কুড়ি হাজার টাকা বোনাস এবং মাসিক ৩৫০৲ টাকা করিয়া বেতন দিবার প্রস্তাব করিয়া পুনরায় লোক পাঠাইলেন।

এই প্রস্তাবে গিরিশচন্দ্র ভাবিলেন, "গোপালবাবু বোনাসস্বরূপ তাঁহাকে কুড়ি হাজার টাকা দিতে চাহিতেছেন, সেই অর্থে তাঁহার 'ষ্টার থিয়েটারে'র প্রিয় শিষ্যদের অর্থাভাব ঘুচিয়া নির্ব্বিঘ্নে রঙ্গালয় নির্ম্মাণ সুসম্পন্ন হইবে। তাঁহার শিক্ষাতে তাহারা কার্য্যক্ষম হইয়াছে—[illegible] চালাইতেও পারিবে। কিন্তু না যাইলে গোপালবাবুর কোপে পড়িতে হয়।" গোপালবাবু পরম্পরায় প্রকাশ করিতেছিলেন যে, "গিরিশবাবু কুড়ি হাজার টাকা লইয়া, 'এমারেল্ড থিয়েটারে'র ম্যানেজার হন—ভাল, নচেৎ তিনি ঐ কুড়ি হাজার টাকা ব্যয় করিয়া 'ষ্টার থিয়েটারে'র সমস্ত অভিনেতা ও অভিনেত্রী ভাঙ্গাইয়া লইবেন।" এইরূপ সঙ্কটে পড়িয়া গিরিশচন্দ্র গোপালবাবুর নিকট ২০ হাজার টাকা বোনাস ও ৩৫০৲ টাকা মাসিক বেতনে, পাঁচ বৎসরের এগ্রিমেণ্টে আবদ্ধ হইয়া 'এমারেল্ড থিয়েটারে' প্রবেশ করিলেন। শিষ্য-বৎসল গিরিশচন্দ্র উক্ত কুড়ি হাজার টাকা হইতে ষোল হাজার টাকা শিষ্যদের নিঃস্বার্থভাবে দান করিয়া, রঙ্গালয় নির্ম্মাণের ব্যয় সঙ্কুলান করেন এবং স্বত্বাধিকারিগণকে বিশেষ অনুরোধ করিয়া বলেন, "তোমরা ভদ্রসন্তান, নানা প্রোপ্রাইটার কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত হইয়া, এক্ষণে ঈশ্বরের ইচ্ছায় স্বাধীন

হইলে ; আমার অনুরোধ, যে সকল ভদ্রসন্তান তোমাদের আশ্রয় গ্রহণ করিবে, তাহারা যেন কখন কোনরূপ লাঞ্ছিত না হয়।"

'পূর্ণচন্দ্র'

'এমারেল্ড থিয়েটারে' গিরিশচন্দ্রের 'পূর্ণচন্দ্র' এবং 'বিষাদ' নামে দুইখানি নাটক অভিনীত হয়। দুইখানি নাটকই আজি পর্য্যন্ত নাট্যামোদিগণের নিকট পরম আদরের জিনিষ হইয়া রহিয়াছে। 'পূর্ণচন্দ্র' নাটক ৫ই চৈত্র (১২৯৪ সাল) প্রথম অভিনীত হয়। অভিনয় আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী গোপাললাল-বাবুর উক্তি ও তাঁহার স্বাক্ষরিত একটী কবিতা মহেন্দ্রলাল বসু কর্ত্তৃক পঠিত হয়। কবিতাটী গিরিশচন্দ্রের রচিত। যথা—

"সঞ্চালিত বাসনায়, মত্ত মন সদা ধায়,
বারণ না মানে হায় প্রমত্ত বারণ !
অবহেলি প্রতিবাদ, যখন যা উঠে সাধ,
আশার ছলনে ভুলি, করি আস্বাদন।
আছে যার ধন জন, রসহীন সে জীবন—
প্রেমের কাঙ্গালী কেবা তার সম হায় !
বিসর্জ্জন প্রেম-আশে, স্বার্থ-আশে সবে আসে,
বিড়ম্বনা—বুঝিবে কি অন্ধ সে ঈর্ষায় !
প্রতারণাপূর্ণ হাসি, নহি আর অভিলাষী,
পরিতৃপ্ত—তিক্ত বোধ হয় সমুদয় ,
বিমল কবিত্ব রসে অন্তর আনন্দে রসে,
রস-বশে রঙ্গালয় করেছি আশ্রয়।
দেখায়ে প্রাণের ছবি, ভাবে ভোর গায় কবি ;
প্রাণ খুলি ধরি তুলি চিত্রে চিত্রকর।
ভাঙ্গিয়া কালের দ্বার, প্রকাশে ঘটনা হার,
হাওয়ায় নূতন সৃষ্টি করে নটবর।
উচ্চ সাধ অপরাধ, লোকে দেয় অপবাদ,
পরিহাসে মন্দ ভাষে নিন্দক কুজন ;
কেহ কত বলে ছলে, এত অর্থ গেল জলে,
বোধহীন যুবা—শীঘ্র হইবে পতন !
কেহ কয় অভিনয়, নির্দ্দোষ তেমন নয়,
অজ্ঞ যেই—বিজ্ঞ সাজে, বোঝে কি কথায় ?
ক্রমে ফুলকলি হাসে, পদ্মে মধু ক্রমে আসে,
শশধর পূর্ণকায় কলায় কলায় !

গঞ্জনায় নাহি ডরি,   কুচ্ছ কথা তুচ্ছ করি,
নব রসে ভাসে দীন—এই আকিঞ্চন,
নবরস বিহীন দীন   যেই জন রসহীন,—
কাব্যরসে তারও যেন মগ্ন রহে মন।
শ্রীগোপাললাল শীল, প্রোপ্রাইটার।"

এই নাটকের প্রথমাভিনয় রজনীর অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ:—

শালিবাহন	মহেন্দ্রলাল বসু।
পূর্ণচন্দ্র	গোলাপসুন্দরী (সুকুমারী দত্ত)।
দামোদর	মতিলাল সুর।
সেবাদাস	পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিভূষণ ভট্টাচার্য্য।
জম্বু (চামার)	শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
গোরক্ষনাথ	ঠাকুরদাস চট্টোপাধ্যায় (দাসুবাবু)।
ইচ্ছা	ক্ষেত্রমণি।
লুনা	শ্রীমতী বনবিহারিণী।
শারি	কুসুমকুমারী (হাড়কাটা গলির)।
সুন্দরা	কিরণশশী (ছোট রাণী)। ইত্যাদি।
সঙ্গীতাচার্য্য	শশীভূষণ কর্ম্মকার।
রঙ্গভূমি-সজ্জাকর	ধর্ম্মদাস সুর ও শ্রীযুক্ত শশীভূষণ দে।

গিরিশচন্দ্রের জীবনই আধ্যাত্মিকতাপূর্ণ। যৌবনের উচ্ছৃঙ্খল অবস্থাতেও আমরা তাঁহাকে মুমূর্ষুর সেবা করিতে দেখিয়াছি এবং ভগবৎকৃপালাভের নিমিত্ত তাঁহার আন্তরিক ব্যাকুলতার পরিচয় পাইয়াছি। পরমহংসদেবের আশ্রয়লাভ করিবার পূর্ব্বেও তিনি যে সকল নাটক লিখিয়াছিলেন, সে সকল নাটকের স্থানে-স্থানে তাঁহার স্বভাবজাত আধ্যাত্মিক ভাবের স্ফুরণও লক্ষিত হয়। প্রথম-প্রথম সাক্ষাতের পর শ্রীরামকৃষ্ণদেব গিরিশচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন, "তোমার হৃদয়-আকাশে অরুণোদয় হয়েছে, নইলে কি 'চৈতন্যলীলা' লিখতে পারো, শীগ্‌গির জ্ঞান-সূর্য্য প্রকাশ পাবে।" যাহাই হউক ঠাকুরের কৃপালাভ করিবার পর 'বুদ্ধদেব', 'বিল্বমঙ্গল', ও 'রূপ-সনাতন' নাটকে গিরিশচন্দ্রের আধ্যাত্মিক ভাব বিশেষরূপ বিকশিত হইয়াছিল। তাহার পর 'পূর্ণচন্দ্র' নাটক হইতে তাঁহার সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক দৃষ্টি কিরূপ খুলিয়া গিয়াছিল, যাঁহারা তাঁহার 'নসীরাম', 'জনা', 'করমেতিবাঈ', 'কালাপাহাড়', 'পাণ্ডব-গৌরব', 'ভ্রান্তি', 'শঙ্করাচার্য্য' প্রভৃতি নাটকগুলি মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আর বিশেষ করিয়া বুঝাইতে হইবে না।

"ঈশ্বর মঙ্গলময়, শিক্ষার নিমিত্ত তিনি মানবকে দুঃখ দেন,—অসংশয় চিত্তে ভগবানে বিশ্বাস রাখো"—গিরিশচন্দ্র 'পূর্ণচন্দ্র' নাটকে এই শিক্ষাপ্রদান করিয়াছেন। নাটকের অভিনয় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল, সংবাদপত্র ও শিক্ষিত সমাজে ইহার যথেষ্ট সুখ্যাতি বাহির হইয়াছিল। দামোদর, ইচ্ছা ও পূর্ণচন্দ্রের ভূমিকাভিনয়ে মতিলাল

সুর, ক্ষেত্রমণি ও গোলাপসুন্দরী অদ্ভুত কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। এই নাটকের অভিনয় দর্শনে সুপ্রসিদ্ধ 'রেজ এণ্ড রাইয়ৎ' পত্রের প্রতিভাশালী সম্পাদক স্বর্গীয় শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছিলেন, "এক 'পূর্ণচন্দ্রে' গোপালবাবুর বিশ হাজার টাকার উপর আদায় হইয়াছে।"

'বিষাদ'

২১শে আশ্বিন (১২৯৫ সাল) 'এমারেল্ড থিয়েটারে' গিরিশচন্দ্রের 'বিষাদ' নাটক প্রথম অভিনীত হয়। প্রথমাভিনয় রজনীর অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ :—

অলর্ক	মহেন্দ্রলাল বসু।
মাধব	মতিলাল সুর।
শিবরাম ও দূত	পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিভূষণ ভট্টাচার্য্য।
জিৎসিং	খগেন্দ্রনাথ সরকার।
ফকিরত্রয়	শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত ঠাকুরদাস চট্টোপাধ্যায় (দাসুবাবু) ও যাদবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
চোরগণ	শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কুমুদনাথ সরকার ও ক্ষীরোদচন্দ্র পলশ্রী।
দাড়ী	দাসুবাবু [ঠাকুরদাস চট্টোপাধ্যায়]।
সরস্বতী (বিষাদ)	কুসুমকুমারী (হাড়কাটা গলির)।
উজ্জ্বলা	কিরণশশী (ছোট রাণী)।
সোহাগী	ক্ষেত্রমণি।
রাজমাতা	হরিমতী (গুল্‌ফন)। ইত্যাদি।
সঙ্গীত-শিক্ষক	মোহিতমোহন গোস্বামী ও শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ঘোষ।
রঙ্গভূমি-সজ্জাকর	ধর্ম্মদাস সুর ও শ্রীযুক্ত শশীভূষণ দে।

সরস্বতী (বিষাদ) চরিত্র গিরিশচন্দ্রের একটি অপূর্ব্ব সৃষ্টি। স্বামী বেশ্যাসক্ত—বেশ্যাগৃহেই থাকেন। সরস্বতী পতিসেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়া বালকের ছদ্মবেশ ধারণ করিলেন এবং 'বিষাদ' নাম গ্রহণ করিয়া বেশ্যার দাসত্ব স্বীকার করিলেন। 'নববিভাকরে' প্রকাশিত হয়, "হিন্দু-রমণীর পতির কল্যাণে আত্মবিসর্জ্জন বিরল নহে। কিন্তু পত্নীভাব বিস্মৃত হইয়া, পতি প্রভু বুঝিয়া—তদ্গতা-প্রাণা হইয়া দাসীর ন্যায় থাকিতে মাত্র এই সরস্বতীকে দেখিলাম। গিরিশবাবুর এটী একটী সৃষ্টি।" 'বঙ্গবাসী'তে বাহির হয়, "লোকশিক্ষার জন্যই অভিনয়ের সৃষ্টি। 'বিষাদে' এ লোক-শিক্ষার প্রচুর চেষ্টা আছে। সুনিপুণ অভিনেতা এবং অভিনেত্রীগণের অভিনয়চাতুর্য্যে

এ চেষ্টা রঙ্গমঞ্চে আরও প্রস্ফুটিত হইতেছে। সম্পত্তিসম্পন্ন যুবক সঙ্গদোষে কুলটার কৌশলে পড়িয়া কেমন করিয়া সর্ব্বস্বান্ত হয়, আপনার বংশমাহাত্ম্য নষ্ট করে, নীচাদপি নীচ হইয়া পশুবৎ হইয়া পড়ে—গিরিশবাবুর লেখনী-কৌশলে এ পাপচিত্র অতি উজ্জ্বল বর্ণে 'বিষাদে' চিত্রিত হইয়াছে। একদিকে যেমন এই নারকীয় দৃশ্য, অপরদিকে তেমনই পুণ্যাত্মা সতীর পবিত্র পতিভক্তি। স্বামী ক্রমে-ক্রমে যতই পাপপঙ্কে ডুবিতেছেন, সতীর পতিভক্তি ততই স্বর্ণাক্ষরে প্রতিভাত হইতেছে। কেমন করিয়া পতিভক্তি করিতে হয়, কেমন করিয়া স্বামীর দোষসমূহ উপেক্ষা করিয়া নির্ব্বিশেষে স্বামীপূজা করিতে হয়, স্বামীর জন্য কেমন করিয়া স্বার্থত্যাগ করিতে হয়, আত্মবলি দিতে হয়, বিষাদে এ চিত্র অতি সুন্দররূপে চিত্রিত হইয়াছে। বিসদৃশ এই চিত্রদ্বয়ের সমাবেশে 'বিষাদ' বড়ই মনোহর হইয়াছে। চরিত্র-চিত্রে অতিরঞ্জনের দোষ কেহ-কেহ দিয়া থাকেন, আমরা কিন্তু রঙ্গমঞ্চে বিষাদের অভিনয় দেখিয়া রচয়িতা কবির মহত্ত্বই উপলব্ধি করিলাম।" ইত্যাদি।

মাধব চরিত্র গিরিশচন্দ্রের একটী অভিনব সৃষ্টি। মাধবের উদ্দেশ্য সৎ কিন্তু মন্দ কার্য্য দ্বারা সেই সৎ উদ্দেশ্যসাধন করিতে গিয়া, মাধব শুধু নিজে ঠকে নাই, অলর্ক ও বিষাদের সর্ব্বনাশ করিয়াছিল। 'বিষাদ' নাটকের গানগুলি অতুলনীয়। "আমরা চাররকমের চার বিরহিনী", "চাও চাও মুখ ঢেকো না", "প্রেমের এই মানা", "বিরহ বরং ভাল এক রকমে কেটে যায়" প্রভৃতি গানগুলি অতি প্রসিদ্ধ।

'দুখিয়া' নাম দিয়া এলাহাবাদ হইতে 'বিষাদ' নাটকের একখানি হিন্দি অনুবাদ বাহির হইয়াছিল।

'এমারেল্ডে'র সম্বন্ধ ত্যাগ

দুই বৎসর পর গোপাললালবাবুর সখ মিটিয়া গেলে তিনি 'এমারেল্ড থিয়েটার' মতিলাল সুর, শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, পণ্ডিত শ্রীহরিভূষণ ভট্টাচার্য্য এবং ব্রজলাল মিত্র—এই চারিজনকে ভাড়া দিলেন। এই স্থলে গিরিশচন্দ্রের সহিত গোপালবাবুর কার্য্য-সম্বন্ধ ফুরাইল। তিনি পুনরায় কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটে প্রতিষ্ঠিত 'ষ্টার থিয়েটারে' আসিয়া ম্যানেজারের পদ গ্রহণ করিলেন।

ষড়্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয়া পত্নী-বিয়োগ, গণিত-চর্চ্চা, 'নসীরাম' অভিনয়। 'ষ্টারে' যোগদান

'এমারেল্ড থিয়েটারে' কার্য্যকালীন গিরিশচন্দ্রের দ্বিতীয় পক্ষের পত্নী ইহলোক ত্যাগ করেন। ইঁহার গর্ভে দুইটী কন্যা এবং একটী পুত্রসন্তান হইয়াছিল। প্রথমা কন্যা রাধারাণী যেরূপ সুন্দরী, সেইরূপ স্নেহশীলা ছিল; বাটীর কেহই তাহাকে নয়নের অন্তরাল করিয়া থাকিতে পারিত না। কিন্তু দুইটী কন্যাই জননীর জীবদ্দশায় তিন বৎসর বয়ঃক্রমেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। শেষে একটী পুত্র প্রসব করিবার পর প্রসূতি কঠিন পীড়ায় আক্রান্তা হন। বহু চিকিৎসায় যখন কোনও ফললাভ হইল না, এবং চিকিৎসকগণ জীবনের আশা পরিত্যাগ করিলেন, তখন আত্মীয়-স্বজনগণ গিরিশচন্দ্রকে বলিলেন, "ইঁহাকে গঙ্গাতীরস্থিত কোনও এক বাটীতে লইয়া গিয়া রাখিতে পারিলে, গঙ্গার হাওয়া লাগিয়া রোগের উপশম হইলেও হইতে পারে।" গিরিশচন্দ্রের সম্মতি পাইয়া ইঁহারা গঙ্গার উপর স্যার রাজা রাধাকান্ত দেবের মুমূর্ষু-নিকেতনে রোগীকে লইয়া যান।

তিন-চারিদিন তথায় বাস করিবার পর গিরিশচন্দ্রের ভ্রাতা অতুলকৃষ্ণ ঘোষ তাঁহার পরমাত্মীয় শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়কে বলিলেন, "দেখ, মেজদা মন থেকে মেজো বৌকে বিদায় দিচ্চে না ব'লে ওঁর এই ভোগ। দেবেন, তুমি বই আর কেউ পারবে না, যদি মেজদার দুটী পায়ের ধূলো এনে দিতে পার, তাহ'লে রোগী যন্ত্রণামুক্ত হয়। একবার ভাই চেষ্টা ক'রে দেখ।" দেবেন্দ্রবাবু বাটী আসিতেই গিরিশচন্দ্র বলিলেন, "কিরূপ অবস্থা?" দেবেন্দ্রবাবু বলিলেন, "অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়, মৃত্যুমুখে, মৃত্যু হইতেছে না, তাঁকে আর আটকে রাখা উচিত নয়। অন্ততঃ আমরা আর সে যন্ত্রণা দেখতে পারবো না।" গিরিশচন্দ্র বলিলেন, "তাহ'লে ছেড়ে দিই?" দেবেন্দ্রবাবু এক টুকরা কাগজে কিছু ধূলা সংগ্রহ করিয়া তাঁহার পায়ে ঠেকাইয়া গঙ্গাতীরে লইয়া গেলেন এবং মুমূর্ষুর মাথায় দিবামাত্র অন্ততঃ বিংশতিজন দর্শকের সমক্ষে তাঁহার প্রাণবায়ু (১২৯৫ সাল, ১২ই পৌষ, বুধবার প্রাতে) অনন্তে লয় হইল।

এই পত্নীর জীবিতাবস্থায় গিরিশচন্দ্র অদ্বিতীয় নট, নাট্যকার এবং নাট্যাচার্য্য বলিয়া সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। গুরুলাভ, যশঃলাভ এবং অর্থসমাগমে এইসময়ে ইনি পরম শান্তিতে কাটাইয়াছিলেন। অনেকে বলিয়া থাকেন, "এই পত্নী হইতেই তাঁহার সর্ব্ব সৌভাগ্যের সূচনা।" যাহাই হউক, পত্নী-বিয়োগের পরে গিরিশচন্দ্র পরমহংস-

দেবকে বকল্‌মা প্রদানের গুরুত্ব উপলব্ধি করিলেন। তিনি তাঁহার পাপ-পুণ্য, সুখ-দুঃখ সমস্তই পরমহংসদেবকে অর্পণ করিয়াছেন, এক্ষণে এই দারুণ শোক নীরবে সহ্য করা ভিন্ন তাঁহার আর অন্য উপায় নাই। তবে সান্ত্বনার কথা এই, পুত্রটী অতি সুলক্ষণযুক্ত হইয়াছিল। গিরিশচন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে বলিয়াছিলেন, "তুমি আমার ছেলে হও, আমি সাধ মিটাইয়া তোমার সেবা করিব।" এক্ষণে তাঁহার দৃঢ় প্রতীতি জন্মিল, নিশ্চয় ঠাকুর তাঁহার পুত্ররূপে আসিয়াছেন। গিবিশচন্দ্র পরম যত্নে এই মাতৃহারা শিশুটীকে লালন-পালন করিতে লাগিলেন। এই পুত্রের অদ্ভুত চরিত্র যথাসময়ে পাঠকগণ জ্ঞাত হইবেন।

গণিতচর্চ্চা

নিদারুণ মানসিক চাঞ্চল্য দূর করিবার নিমিত্ত এইসময়ে তিনি গণিতশাস্ত্রের আলোচনা করিতে আরম্ভ করেন। তিনি বলিতেন, "অঙ্কবিদ্যার অনুশীলনে মতি স্থির হয়।" তৎ-প্রণীত 'নল-দময়ন্তী' নাটকে ঋতুপর্ণ নলকে গণনা-বিদ্যা দিবার সময় বলিতেছেন :

"ঋতুপর্ণ। চিত্তস্থৈর্য্য এ বিদ্যার মূল।"

'নল-দময়ন্তী', ৫ম অঙ্ক, ৩য় গর্ভাঙ্ক।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু) মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি, এইসময়ে কতকগুলি গণিতগ্রন্থ লইয়া তিনি সমস্ত দিন শ্লেট-পেন্‌শিল লইয়া বালকের ন্যায় অঙ্ক কসিতেন ও মুছিয়া ফেলিতেন।

'নসীরাম'

গিরিশচন্দ্র-প্রণীত 'নসীরাম' নাটক লইয়া ১৩ই জ্যৈষ্ঠ ১২৯৫ সাল (২৫শে মে ১৮৮৮ খ্রী) ফুলদোলের দিন হাতিবাগানে 'ষ্টার থিয়েটার' মহাসমারোহে প্রথম খোলা হয়। গিরিশচন্দ্র সে সময়ে 'এমারেল্ড থিয়েটারে' কার্য্য করিতেছিলেন। এ নিমিত্ত 'নসীরাম' নাটকে তাঁহার নাম প্রকাশিত না হইয়া 'সেবক-প্রণীত' বলিয়া বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল। শুনিয়াছি, গিরিশচন্দ্র পূর্ব্বে 'ষ্টার থিয়েটারে'র জন্য 'পূর্ণচন্দ্র' নাটকখানি লিখিয়া দিয়াছিলেন; কিন্তু 'এমারেল্ড থিয়েটারে' যোগদান করিয়া দেখিলেন, থিয়েটারে নূতন নাটকের বিশেষ প্রয়োজন, এবং স্বত্বাধিকারী গোপাললালবাবুও নূতন নাটকের জন্য বড়ই ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। গিরিশচন্দ্র 'ষ্টার থিয়েটারে'র স্বত্বাধিকারিগণের নিকট হইতে 'পূর্ণচন্দ্র' নাটকের পাণ্ডুলিপি লইয়া 'এমারেল্ড থিয়েটারে' প্রদান করেন এবং সেই সঙ্গে প্রতিশ্রুত হন, তাঁহাদের নবপ্রতিষ্ঠিত রঙ্গালয়ের নিমিত্ত একখানি নূতন

নাটক লিখিয়া দিবেন।

'চৈতন্যলীলা' অভিনয়ে অভাবনীয় কৃতকার্য্যতা লাভ করায়, ষ্টার থিয়েটারে'র স্বত্বাধিকারিগণ গিরিশচন্দ্রকে হরিভক্তিপূর্ণ একখানি নাটক লিখিবার নিমিত্ত অনুরোধ করেন। গিরিশচন্দ্র তাঁহাদের অনুরোধে পরমহংসদেবের ভাব গ্রহণে ভগবদ্বাক্যমূলক এই 'নসীরাম' নাটকখানি লিখিয়া দিয়াছিলেন।

নাটকাভিনয়ের পূর্ব্বে গিরিশচন্দ্র-বিরচিত নিম্নলিখিত প্রস্তাবনা-কবিতাটী* নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় কর্ত্তৃক পঠিত হয়।

"হে সজ্জন, পদে নিবেদন—
নির্ব্বাসিত মনোদুঃখে, বঞ্চিলাম অধোমুখে
বঞ্চিত বাঞ্ছিত তব চরণ বন্দন।
যুগ সম বর্ষের ভ্রমণ—
আজি পুনঃ পূর্ণ আকিঞ্চন
স্বাগত সুজন!

করে দাস—করুণা প্রয়াস,
রস-বশে গুণাকর, ভুল' দোষ—গুণ ধর'—
তব পূজা আশৈশব উচ্চ অভিলাষ!
পারি হারি না বুঝি আভাস,
হর্ষ সনে দ্বন্দ্ব করে ত্রাস
পূরিবে কি আশ?

অভিনয় ইতিহাস কয়—
দেশ ভেদে নানা মত, যে জাতি যে রসে রত,
আদি, হাস্য, বীভৎস, শোণিত কোথা বয়,
হিন্দু-প্রাণ কোমলতাময়,
ধর্ম্ম-প্রাণ শ্রেষ্ঠ পরিচয়,—
ধর্ম্ম—রঙ্গালয়!"

প্রথমাভিনয় রজনীর অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ :—

নসীরাম	শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু।
যোগেশনাথ	শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মিত্র।
অনাথনাথ	অমৃতলাল মিত্র।
কাপালিক	অঘোরনাথ পাঠক।
শম্ভুনাথ	বেলবাবু [অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়] ৮

* সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত ললিতমোহন ঘোষাল মহাশয়ের সৌজন্যে কবিতাটি প্রাপ্ত হইয়াছি।

ভূতনাথ	শ্রীযুক্ত কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়।
পাহাড়িয়া বালক	শ্রীমতী তারাসুন্দরী।*
বিরজা	কাদম্বিনী।
মাধুরী	হরিমতী।
সোনা	গঙ্গামণি। ইত্যাদি।
শিক্ষক	শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু।
সঙ্গীতাচার্য্য	রামতারণ সান্ন্যাল।
নৃত্য-শিক্ষক	শ্রীযুক্ত কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়।
রঙ্গভূমি-সজ্জাকর	দাসুচরণ নিয়োগী।

নূতন রঙ্গমঞ্চে নব উদ্যমে অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ যথাসাধ্যমত অভিনয় করিলেও 'নসীরাম' সর্ব্বসাধারণের মনোহরণে সমর্থ হয় নাই। নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় বলেন, "চিন্তাশীল দর্শকেরা 'নসীরাম' খুব লইয়াছিলেন, কিন্তু সাধারণ দর্শক সেরূপ ভাবগ্রহণ করিতে পারে নাই। কারণ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাবকে মূর্ত্তিমন্ত করিয়া 'নসীরাম' চরিত্র গঠিত। সে সময়ে পরমহংসদেবের বাণী সাধারণ-মধ্যে ততটা প্রচারিত হয় নাই, বোধহয়, এই ভাবগ্রহণে অক্ষমতাই ইহার প্রধান কারণ। ক্রমে পরমহংসদেবের সম্বন্ধে নানারূপ গ্রন্থ প্রচারিত হইতে লাগিল। কয়েক বৎসর পরে 'ষ্টার থিয়েটারে' পুনরায় যখন 'নসীরাম' অভিনয় করিয়াছিলাম, সে সময় 'নসীরাম' খুব জমিয়াছিল। এই নাটকের গানগুলির, বিশেষতঃ সোনার গানের তুলনা হয় না। গিরিশবাবুর কি রাধকৃষ্ণবিষয়ক, কি শ্যামাবিষয়ক গান মহাজন-পদাবলীর পরেই উল্লেখযোগ্য।"

'ষ্টার থিয়েটার' ব্যতীত 'ক্লাসিক', 'মিনার্ভা' ও 'আর্ট থিয়েটারে'ও 'নসীরাম' অভিনীত হইয়াছিল। নসীরাম ও সোনা গিরিশচন্দ্রের অপূর্ব্ব সৃষ্টি, দর্শকগণ ইহাদের অপূর্ব্ব ভাবে অপূর্ব্ব আনন্দলাভ করিতেন।

কামের দুর্দ্দমনীয় ও বীভৎস প্রভাব এই নাটকের জীবন। ইহাতে যে নাটকীয় সংস্থান (dramatic situation) আছে, বঙ্গ-নাট্যসাহিত্যে তাহা অতি বিরল। একমাত্র 'ওথেলো'র সঙ্গে তাহার তুলনা হইতে পারে। অকৃত্রিম ভালবাসা স্বার্থের ষড়যন্ত্রে ভিন্নভাবে প্রতীয়মান হইয়া যে কিরূপে ছিন্ন-বিছিন্ন হইয়া যায়, এ নাটকে তাহার অতিমর্ম্মস্পর্শী চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। তবে দেশভেদে রুচিভেদে নাটকের গতি ভিন্নরূপ হয়, 'ওথেলো' নাটকের পরিণাম নিবিড় তিমিরাচ্ছন্ন, এ নাটকের পরিণাম—ভক্তির আলোকময় চিত্রে সমুজ্জ্বল।

* প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী শ্রীমতী তারাসুন্দরী এই পাহাড়িয়া বালকের ভূমিকায় একটীমাত্র কথা ("ওরে হরি বল, নইলে কথা কি কইবে না") লইয়া রঙ্গমঞ্চে সর্ব্বপ্রথম অবতীর্ণা হন।

'ষ্টারে' গিরিশচন্দ্র

'নসীরাম' নাটকের পর 'ষ্টার থিয়েটারে' শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু কর্তৃক নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত স্বর্গীয় তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়-প্রণীত 'স্বর্ণলতা' উপন্যাস 'সরলা' নাম দিয়া অভিনীত হয়। করুণ ও হাস্যরসের প্রবল সম্মিলনে বাঙ্গালীর ঘরের নিখুঁত ছবি দেখাইয়া 'সরলা' আবালবৃদ্ধবণিতার নিকট সমাদৃত হইয়াছিল। তৎপরে অমৃতলাল বাবু-বিরচিত 'তাজ্জব ব্যাপার' নামে একখানি সামাজিক নক্সা অভিনীত হয়। নক্সা-খানি যেরূপ নূতনত্বপূর্ণ হইয়াছিল, সেইরূপ দর্শকমণ্ডলীকে মাতাইয়াছিল।

'তাজ্জব ব্যাপার' অভিনয়কালে গিরিশচন্দ্র 'ষ্টার থিয়েটারে' যোগদান করিয়া পুনরায় ম্যানেজারের পদ গ্রহণ করেন। ইতিপূর্ব্বে শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয়ের নাম "ম্যানেজার" বলিয়া বিজ্ঞাপিত হইত।

'প্রফুল্ল'

'সরলা' অভিনয়ে নাট্যামোদিগণের সামাজিক নাটকের দিকে প্রবল আগ্রহ দেখিয়া এবং স্বত্বাধিকারিগণ কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া গিরিশচন্দ্র 'প্রফুল্ল' নাটক প্রণয়ন করেন। পত্নী-বিয়োগজনিত শোকাগ্নি তখনও তাঁহার অন্তঃস্থল দগ্ধ করিতেছিল, সেই অগ্নিশিখারই বোধহয় এক কণা—"আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল!"

১৬ই বৈশাখ (১২৯৬ সাল) 'ষ্টার থিয়েটারে' গিরিশচন্দ্রের 'প্রফুল্ল' সামাজিক নাটক প্রথম অভিনীত হয়। প্রথমাভিনয় রজনীর অভিনেতৃগণ :—

যোগেশ	অমৃতলাল মিত্র।
রমেশ	শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু।
সুরেশ	শ্রীযুক্ত কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়।
যাদব	শ্রীমতী তারাসুন্দরী।
পীতাম্বর	মহেন্দ্রনাথ চৌধুরী।
কাঙালীচরণ	শ্যামাচরণ কুণ্ডু।
শিবনাথ	রাণুবাবু [শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়]।
মদন ঘোষ ও ১ম ব্যাপারী	নীলমাধব চক্রবর্ত্তী।
ভজহরি	বেলবাবু [অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়]
অনাঃ ম্যাজিষ্ট্রেট	রামতারণ সান্যাল।
ব্যাঙ্কের দাওয়ান ও জমাদার	শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মিত্র।
ইন্সপেক্টর	প্রবোধচন্দ্র ঘোষ
ইণ্টারপ্রেটার ও জেল ডাক্তার	বিনোদবিহারী সোম (পদবাবু)।
২য় ব্যাপারী ও টারন্কি	অক্ষয়কুমার চক্রবর্ত্তী।

শুঁড়ি	শশীভূষণ চট্টোপাধ্যায়।
ডাক্তার	নীলমণি ঘোষ।
জনৈক লোক	অঘোরনাথ পাঠক।
উমাসুন্দরী	গঙ্গামণি।
জ্ঞানদা	কিরণবালা।
প্রফুল্ল	ভূষণকুমারী।
জগমণি	টুন্নামণি।
বাড়ীওয়ালী	শ্রীমতী জগত্তারিণী।
ইতর স্ত্রীলোক (মাতালনী)	শ্রীমতী বনবিহারিণী।
খেমটাওয়ালীদ্বয়	প্রমদাসুন্দরী ও কুসুমকুমারী (খোঁড়া)। ইত্যাদি।

অনেকের ধারণা ছিল, 'সরলা'র পর পুনরায় সামাজিক নাটক জমান বড়ই কঠিন হইবে। কিন্তু 'প্রফুল্ল' নাটকের রচনা-নৈপুণ্য এবং হৃদয়ভেদী অভিনয় দর্শনে তাঁহাদের সে ধারণা দূর হইয়াছিল। সুরার মোহিনীশক্তি এবং অমোঘ আকর্ষণ এই নাটকের মূল ভিত্তি। গিরিশচন্দ্র স্বয়ং ভুক্তভোগী হইয়া তৎ-বিরচিত সঙ্গীতে, খণ্ডকাব্যে এবং নাটকীয় চরিত্রের উক্তিতে বহুবার এই মোহিনী মায়াবিনীর অমোঘ অনিবার্য্য শক্তির প্রভাব ব্যক্ত করিয়াছেন। এ নাটকে তাহা কিরূপ অত্যুজ্জ্বল চিত্রে চিত্রিত হইয়াছে পাঠকমাত্রেই তাহা অবগত, অধিক ব'লিবার প্রয়োজন নাই।

এই নাটকের সমালোচনা 'স্টেট্‌সম্যান' পত্রিকায় ধারাবাহিক তিন দিবস বাহির হয়। এরূপ সমালোচনা দেশীয় কোনও পুস্তকের এতাবৎ ঘটে নাই। স্বর্গীয় অমৃতলাল মিত্র, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু, বেলবাবু, নীলমাধব চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি নাট্যরথিগণ যোগেশ, রমেশ, ভজহরি, মদন ঘোষ প্রভৃতির ভূমিকা অতি দক্ষতার সহিত অভিনয় করিযাছিলেন। অমৃতবাবুর রমেশের অভিনয় অতুলনীয় হইয়াছিল। স্বর্গীয় শ্যামাচরণ কুণ্ডু এবং টুন্নামণি কাঙ্গালীচরণ ও জগমণির অভিনয়ে দুইটি জীবন্ত ছবি দর্শকগণ সম্মুখে ধরিয়াছিলেন। ফলতঃ নাট্যামোদিগণের নিকট 'প্রফুল্ল' পরমসমাদৃত হইয়াছিল, কিন্তু ইহার কযেক বৎসর পরে 'মিনার্ভা থিয়েটারে' যে সময়ে 'প্রফুল্ল' পুনরভিনীত হয় এবং গিরিশচন্দ্র স্বযং যোগেশের ভূমিকা অভিনয় করেন, সেই সময় হইতেই 'প্রফুল্ল' নাটকের বিশেষত্ব সাধারণের চক্ষে ধরা পড়ে।* 'প্রফুল্ল' নাটকের বিচিত্র চরিত্রসৃষ্টির বিশ্লেষণ-

* 'ষ্টারে' অভিনীত হইবার ছয় বৎসর পরে 'মিনার্ভা থিয়েটারে' 'প্রফুল্ল' নাটকাভিনয়ের আয়োজন হয়। প্রতিযোগিতায় 'ষ্টার'ও এইসময়ে 'প্রফুল্ল'র পুনরভিনয় ঘোষণা করেন। 'ষ্টার থিয়েটারে'র বিজ্ঞাপনে গিরিশচন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া লিখিত হইয়াছিল :

"তোমার শিক্ষিত-বিদ্যা দেখাব তোমায়।"

'মিনার্ভা'র প্রথমে যোগেশের ভূমিকা দেওয়া হইয়াছিল সুবিখ্যাত অভিনেতা স্বর্গীয় মহেন্দ্রলাল বসুকে। মহেন্দ্রবাবু যোগেশের ভূমিকার রিহারস্তালও দিয়াছিলেন। গিরিশচন্দ্র 'ষ্টারে' স্বর্গীয় অমৃতলাল মিত্রকে যোগেশের ভূমিকা শিক্ষাপ্রদান করেন। 'মিনার্ভা'র সে ছবি বদলাইয়া দিয়া

পূর্ব্বক নানা সমালোচনা নানা সাময়িকপত্রে হইয়া গিয়াছে। গ্রন্থের কলেবর-বৃদ্ধি ভয়ে আমরা চরিত্র-সমালোচনায় ক্ষান্ত থাকিয়া সম্পাদক-শ্রেষ্ঠ, সুপণ্ডিত স্বর্গীয় পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়-লিখিত 'প্রফুল্ল' নাটক সমালোচনার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম :—

"বাঙ্গালীর গার্হস্থ্য জীবনে দুঃখের যে বিরাট কাল মেঘ সর্ব্বদাই বিভীষিকা উৎপাদন করে, তাহাকে অবলম্বন করিয়া অপূর্ব্ব লিপিচাতুরীর বলে এই শোকপূর্ণ বিয়োগান্ত নাটক রচিত হইয়াছে। আমাদের মনে হয় যে, এমন মর্ম্মভেদী বিয়োগান্ত নাটক বাঙ্গালা ভাষায় বুঝি আর নাই। যোগেশের 'সাজান বাগান শুকাইয়া গেল', আব হইল না। পরন্তু পুণ্যেব প্রতিষ্ঠা তো হইল, পাপের দমন তো হইল। সমাজের পক্ষে ইহাই লাভ। যে কবি এই সৎশিক্ষার প্রচার করিয়াছেন, তিনি সমাজের পূজ্য। কবি গিরিশচন্দ্র নির্দ্দয়ভাবে শোকের এবং পাপের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার এ নির্দ্দয়তা কুলালের নির্দ্দয়তার তুল্য। কুম্ভকার পাকা হাঁড়ি গড়িবার জন্য মাটীর হাঁড়িতে ঘন-ঘন আঘাত করিয়া থাকে, তখন সে আঘাত দেখিয়া মনে হয়, এ কার্য্য বড়ই নির্দ্দয়তার কার্য্য। কিন্তু যখন সেই হাঁড়িতে দেবতার প্রসাদ প্রস্তুত হয়, তখন মাটীর সংসারে মাটীর হাঁড়িও ধন্য হইয়া যায়। গিরিশবাবুও তেমনই মানুষের সংসারে মানুষের সমাজকে দেবতার উপভোগ্য করিবার জন্য নির্দ্দয়ভাবে 'প্রফুল্লে'র ন্যায় ভীষণ বিয়োগান্ত নাটককে লোকলোচনের গোচর করিয়াছেন। তিনি ধন্য।"
('রঙ্গালয়', ৪ঠা মাঘ ১৩০৮ সাল।)

মহেন্দ্রবাবুকে নূতনরূপে শিখাইতে আরম্ভ করেন। পরে সম্প্রদায়স্থ সকলের অনুরোধে গিরিশচন্দ্রকে বাধ্য হইয়া এই ভূমিকা লইতে হইয়াছিল। তিনি এইসময়ে বলিয়াছিলেন, "আমাকে আমার আপনার বিরুদ্ধে অস্ত্র-প্রয়োগ করিতে হইবে। যোগেশের ভূমিকায় যাহা শিখাইবার, অমৃতকে তাহা শিখাইয়াছি। এখন কি নূতন ছবি দিব, তাহাই ভাবিতেছি।"

'ষ্টারে' যোগেশ—অমৃতলাল মিত্র, 'মিনার্ভা'য় স্বয়ং গিরিশচন্দ্র—গুরু-শিষ্যে যুদ্ধ। নাট্যামোদিগণের মধ্যে একটা মহা আন্দোলন পড়িয়া গেল—সহর সরগরম হইয়া উঠিল। গিরিশচন্দ্র অতি সূক্ষ্মভাবে অভিনেতৃগণকে শিক্ষাদান করিয়াছিলেন এবং প্রত্যেক চরিত্রটী জীবন্ত করিয়া ফুটাইবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন। উভয় থিয়েটারেই মহাসমারোহে অভিনয় আরম্ভ হইল।

পুরাতনকে কেমন করিয়া সম্পূর্ণ নূতন ছাঁচে গড়িতে হয়, গিরিশচন্দ্র যোগেশের ভূমিকাভিনয়ে তাহা দেখাইয়াছিলেন। যে অতুলনীয় নূতন ছবি তিনি দর্শকসাধারণের চক্ষের সম্মুখে ধরিয়াছিলেন, দর্শকগণ সে দৃশ্য দর্শনে বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। সুরাপানে সুশিক্ষিত ও সম্রান্ত ব্যক্তি কিরূপ স্তরে-স্তরে অধঃপতিত হইয়া দুর্দ্দশার গভীর পঙ্কে নিমজ্জিত হয়, আদর্শ চরিত্র, লোকমান্য ব্যক্তি মদের মহিমায় কিরূপে স্ত্রীকে পথের ভিখারিণী করিয়া তাহার শেষ সম্বল ভাঙ্গা বাক্সটী পর্য্যন্ত কাড়িয়া লইয়া যায়, শিশুপুত্রের হাত মুচড়াইয়া তাহার খাবারের পয়সা ছিনাইয়া লইয়া যায়, এক ছটাক মদ পাইবার লোভে শ্মশানে আসিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, একটা পয়সার জন্য হাত পাতিয়া পথিকের পশ্চাৎ-পশ্চাৎ ছোটে, চক্ষের সম্মুখে এই ভীষণ ও জীবন্ত ছবি দেখিয়া দর্শক শিহরিয়া উঠিল। বুঝিল—এই সুরাপানে দেশের কি সর্ব্বনাশ হইতেছে—কত বড় ঘর উৎসন্ন যাইতেছে—কত লোকের কত সাজান বাগান শুকাইয়া যাইতেছে।

এই অভিনয়ের পর হইতেই 'প্রফুল্ল' নাটকের চরিত্রসৃষ্টির বৈচিত্র্য—ইহার রস-মাধুর্য্য দর্শকগণ বিশেষরূপ উপলব্ধি করিয়াছিলেন। সেই হইতে 'প্রফুল্ল' সর্ব্বোৎকৃষ্ট সামাজিক নাটক বলিয়া বঙ্গ-নাট্যশালায় এবং বঙ্গ-সাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

'প্রফুল্ল' নাটকের বম্বে গার্গ হিন্দি পুস্তক ভাণ্ডার হইতে একখানি হিন্দি অনুবাদ বাহির হইয়াছে।

'হারানিধি'

'প্রফুল্ল' নাটক সর্ব্বজন-সমাদৃত হওয়ায় গিরিশচন্দ্র তৎপরে 'হারানিধি' নামে আর-একখানি সামাজিক নাটক প্রণয়ন করেন। বঙ্গ-রঙ্গালয়ের এই সময়টাকে সামাজিক নাটকের যুগ বলা যাইতে পারে। ২৪শে ভাদ্র (১২৯৬ সাল) 'ষ্টার থিয়েটারে' সর্ব্ব-প্রথম 'হারানিধি' অভিনীত হয়। প্রথমাভিনয় রজনীর অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ :

মোহিনীমোহন	শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মিত্র।
হরিশ	অমৃতলাল মিত্র।
নীলমাধব	শ্রীযুক্ত কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়।
অঘোর	অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেলবাবু)।
নব	মহেন্দ্রনাথ চৌধুরী।
গুণনিধি	প্রিয়লাল মিত্র।
ধরণীধর	প্রবোধচন্দ্র ঘোষ।
তেজবাহাদুর	রাণুবাবু [শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়]।
ভৈরব	নীলমাধব চক্রবর্ত্তী।
ব্রজেন্দ্রচন্দ্র	শ্রীযুক্ত পরাণকৃষ্ণ শীল।
ধনীরাম	শ্যামাচরণ কুণ্ডু।
সোনাউল্লা	উমেশচন্দ্র দাস।
হৈমবতী	শ্রীমতী জগত্তারিণী।
সুশীলা	শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা।
কমলা	কিরণবালা।
হেমাঙ্গিনী	শ্রীমতী তারাসুন্দরী।
কাদম্বিনী	গঙ্গামণি। ইত্যাদি।

গিরিশচন্দ্র তাঁহার অপূর্ব্ব প্রতিভাবলে 'প্রফুল্ল' ও 'হারানিধি' নাটকে দেখাইয়াছেন গৃহস্থ বাঙ্গালীর শান্ত হৃদয়েও ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে ইয়ুরোপের সাহিত্য-গর্ব্ব গ্রীক ট্রাজিডির তমসাপূর্ণ উত্তাল তরঙ্গও সংঘটিত হইতে পারে। 'হারানিধি' মিলনান্ত নাটক। সাধারণতঃ মিলনান্ত নাটকের ঘটনা ও ঘাত-প্রতিঘাত কিছু মৃদু হইয়া থাকে, কিন্তু 'হারানিধি' ট্রাজিডির ঘটনার মধ্য দিয়া চলিতে-চলিতে সহসা বিদ্যুৎ-বিকাশের ন্যায় এক অপ্রত্যাশিত ঘটনার সমাবেশে মিলনান্ত নাটকে পরিণত হইয়াছে। বঙ্গ-সাহিত্যে এ ধরনের কমিডি আর নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

এই নাটকে অঘোর চরিত্র গিরিশচন্দ্রের সম্পূর্ণ নূতন সৃষ্টি—বড়ই বৈচিত্র্যময়।

হরিশ আজন্ম পরোপকার মন্ত্রে দীক্ষিত। পুত্র-কন্যাকেও বাল্যাবধি সেই শিক্ষাদানে গঠিত করিয়াছিলেন, সেই শিক্ষার প্রভাবেই নীলমাধব এবং সুশীলার আদর্শ চরিত্রে নাটকখানি আরও সমুজ্জল হইয়াছে। মোহিনী স্বার্থান্ধ ও লম্পট ধনাঢ্য ব্যক্তির জীবন্ত দৃষ্টান্ত, কিন্তু একমাত্র কন্যা-স্নেহেই তাহার পরিবর্ত্তন ঘটিল—চরিত্র-অঙ্কনে এই কৌশলটুকুই গিরিশচন্দ্রের কৃতিত্ব। নব, কাদম্বিনী, হেমাঙ্গিনী প্রভৃতি চরিত্র-সৃজনেও গিরিশচন্দ্র বিলক্ষণ নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন। ধনাঢ্যের সহিত গৃহস্থের বন্ধুত্ব এবং অসৎ উপায়ে সদুদ্দেশ্য সাধনের প্রচেষ্টা—উভয়েরই পরিণাম যে অশুভজনক, গ্রন্থকার তাহা এই নাটকে সুস্পষ্টরূপে দেখাইয়া দিয়াছেন। বিচিত্র নাট্যচরিত্র এবং অপূর্ব্ব ঘটনা-সংঘটনে 'হারানিধি' বড়ই উজ্জলে-মধুরে ফুটিয়াছে। অনেকে বলিয়া থাকেন, 'হারানিধি' গিরিশচন্দ্রের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সামাজিক নাটক।

গ্রন্থের সর্ব্বশেষ দৃশ্যে গ্রন্থকার স্বয়ং এই অপূর্ব্ব নাটকের মূল ভাব মোহিনীর মুখে ব্যক্ত করিয়াছেন। হরিশ যখন জিজ্ঞাসা করিল, "মোহিনী, আমার সর্ব্বনাশে তোমার প্রবৃত্তি হলো কেন?" মোহিনী উত্তরে বলিল, "ধন-মদ-মাতালের আবার প্রবৃত্তি, অপ্রবৃত্তি কি? অর্থের আশ্চর্য্য মহিমা! এই অর্থকে আমি সর্ব্বস্ব জ্ঞান করেছি, কি মত্ততা! কেউ-বা মনে করতে পারে—'আমি অর্থহীন, অর্থ হ'লে অকাতরে দান ক'রে দেশের দুঃখ নিবারণ কবতে পারতুম, অনাথার, বিধবার অশ্রুজল মোচন করতে পারতুম, ক্ষুধাতুরকে অন্ন দিতুম, নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দিতুম!' কিন্তু না—তার ভ্রম! যার অর্থ নাই, সে অর্থ কি বিষময় পদার্থ সে জানে না, অর্থে কেবল অনর্থ হয়, দুর্ব্বলকে আশ্রয় দেওয়া দূরে যাক, দুর্ব্বল-পীড়ন প্রথম শিক্ষা দেয়। অষ্ট প্রহর মনকে উপদেশ দেয়, সতীর সতীত্ব নাশ কর, পরের অপহরণ কর! এই অর্থের প্রতারণায় যে প্রতারিত না হয়, সে সাধু, আমি মত্ত হয়েছিলুম।"

নাটকের প্রত্যেক ভূমিকাই অতি সুন্দররূপ অভিনীত হইয়াছিল। অঘোরের ভূমিকা বেলবাবু এত সুন্দর অভিনয় করিয়াছিলেন এবং তাঁহার অভিনয় দর্শনে দর্শক-মণ্ডলী এরূপ উত্তেজিত হইয়া উঠিতেন যে, হঠাৎ অমৃতলালের শোচনীয় মৃত্যুতে থিয়েটারের কর্তৃপক্ষগণ 'হারানিধি'র অভিনয় বন্ধ করিতে সে সময়ে বাধ্য হইয়াছিলেন। বেলবাবু সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্র বলিয়াছিলেন, "বেলবাবু দেখিতে যেরূপ সুপুরুষ, সেইরূপ অমায়িক এবং মিষ্টভাষী ছিলেন। ভগবান তাঁহাকে যেন অভিনেতা করিয়াই সংসারে পাঠাইয়াছিলেন। 'হারানিধি' নাটকে অঘোরের ভূমিকাই তাঁহার শেষ অভিনয়। 'হারানিধি' খুলিবার কয়েক মাস পরে বেলবাবুর মৃত্যু হয়। এই নাটকখানি বেলবাবুর স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ তাঁহার নামে উৎসর্গ করিবার মনস্থ করিয়াছিলাম, কিন্তু পুস্তক-প্রকাশক দুর্গাদাস দে-কে শ্রদ্ধা-উপহারপ্রদানে বিশেষরূপ উৎসুক দেখিয়া তাঁহাকে অনুমতি দিয়া নিরস্ত হই।* বেলবাবুর অকালমৃত্যুতে রঙ্গভূমির যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা এ পর্য্যন্ত পরিপূর্ণ হয় নাই।"

* দুর্গাদাসবাবুর লিখিত উৎসর্গ-পত্রটী উদ্ধৃত করিলাম:—

'চণ্ড' গিরিশচন্দ্রের প্রথম ঐতিহাসিক নাটক। টডের 'রাজস্থান' অবলম্বনে ইহা লিখিত। 'ন্যাসান্যাল থিয়েটারে' তৎ-প্রণীত 'আনন্দ রহো' ঐতিহাসিক নাটক বলিয়া পূর্ব্বে অভিনীত হইলেও সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদে 'আনন্দ রহো' প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছি, ইহাকে ঠিক ঐতিহাসিক নাটক বলা যায় না। 'চণ্ড' নাটকে গিরিশচন্দ্র মাইকেল মধুসূদনের প্রবর্ত্তিত চৌদ্দ অক্ষরে অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করিয়াছেন। তিনি বলিতেন, "যেরূপে 'মেঘনাদ' পড়, পর-পর লিখিয়া যাও। তাহা চৌদ্দ অক্ষরে না লিখিয়া আমি যেরূপ লিখি, তাহার সহিত কি প্রভেদ? যদি প্রভেদ না থাকে, তবে আবদ্ধ হইবার প্রয়োজন কি? আমার লেখা না দেখিয়া যদি কেহ বলিতে পারেন, যে ইহা চৌদ্দ অক্ষরে লিখিত হয় নাই, তাহা হইলে চৌদ্দ অক্ষরের লেখার সহিত আমার যে পার্থক্য আছে, তাহা স্বীকার করিব। চৌদ্দ অক্ষরের লেখা যে কঠিন নয়, তাহা দেখাইবার জন্য আমি 'চণ্ড' নাটক লিখিয়াছি। 'মুকুল-মুঞ্জরা', 'কালাপাহাড়' নাটকেও আমার চৌদ্দ অক্ষরের রচনা দেখিতে পাইবে।"

১১ই শ্রাবণ (১২৯১ সাল) 'ষ্টার থিয়েটারে' গিরিশচন্দ্রের 'চণ্ড' প্রথম অভিনীত হয়। প্রথম অভিনয় রজনীর অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ:—

চণ্ড	অমৃতলাল মিত্র।
পূর্ণরাম	শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু।
রঘুদেবজী	শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু)
মুকুলজী	শ্রীমতী তারাসুন্দরী।
শিখণ্ডী	শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মিত্র।
রণমল্ল	নীলমাধব চক্রবর্ত্তী।
যোধরাও	প্রবোধচন্দ্র ঘোষ।
খাণ্ডাধারী	মহেন্দ্রনাথ চৌধুরী।
ভীল-সর্দ্দার	অঘোরনাথ পাঠক।
ঘাতক	বিনোদবিহারী সোম (পদবাবু)।
গুঞ্জমালা	শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা।
বিজুরী	গোলাপসুন্দরী (সুকুমারী দত্ত)।
কুশলা	টুন্নামণি।
সূচনা	শ্রীযুক্ত কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়।
পরিশিষ্ট	শ্রীমতী মানদাসুন্দরী। ইত্যাদি।

*স্মরণোপহার।

প্রকাশ্য নাট্যমন্দিরের সংস্থাপনা হইতে যে নটকুলভূষণ অমৃতায়মান সরস বচনচ্ছটায় রসজ্ঞ শ্রোতৃবর্গকে অপরিমেয় আনন্দ প্রদান করিয়াছেন, যে রসভাব-বিশারদ রঙ্গভূমি সমুজ্জ্বল নাট্যশাস্ত্রকুশল

দুর্জ্জয় রাজ্যলিপ্সা—কামের সংমিশ্রণে কিরূপ আত্মবিস্মৃত হইয়া, নিজ আত্মজের সর্ব্বনাশসাধনে প্রবৃত্ত হয়, গিরিশচন্দ্র এই নাটকে তাহা চিত্রিত করিয়াছেন। কালোপযোগী পোষাক-পরিচ্ছদ ও দৃশ্যপট সংযোগে এবং রণস্থলে বহুসংখ্যক চিতোর, রাঠোর ও ভীল-সৈন্যের সুশৃঙ্খলার সহিত একত্র সমাবেশে 'চণ্ড' মহাসমারোহে অভিনীত হইয়াছিল।

নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু, নীলমাধব চক্রবর্ত্তী, গোলাপসুন্দরী (সুকুমারী দত্ত) প্রভৃতি অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ তাহাদের অভিনয়-চাতুর্য্য প্রদর্শন করিলেও নাটকখানি অধিকদিন চলে নাই। ইহার কারণ, বোধহয়, পাঁচ অঙ্কের উপাদান থাকিতেও নাটকখানি চারি অঙ্কে সমাপ্ত হওয়ায় শেষাংশ কতকটা সংক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তাহার উপর সে সময়ে সামাজিক নাটকাভিনয়ের যুগ চলিতে থাকায়, এই ঐতিহাসিক নাটকখানির যে প্রভাব বিস্তার করা উচিত ছিল, তাহাও করিতে পারে নাই।

গিরিশচন্দ্রের শিক্ষার নূতনত্বে সুবিখ্যাতা অভিনেত্রী গোলাপসুন্দরী (সুকুমারী দত্ত) বিজুরীর ভূমিকায় সর্ব্বোচ্চ প্রশংসালাভ করিয়াছিলেন।

'চণ্ড' নাটক অভিনীত হইবার কিছুদিন পূর্ব্বে গিরিশচন্দ্রের সুযোগ্য পুত্র বঙ্গের অপ্রতিদ্বন্দ্বী অভিনেতা শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু) মহাশয় 'ষ্টার থিয়েটারে' যোগদান করিয়া প্রথম-প্রথম পুরাতন 'দক্ষযজ্ঞ', 'নল-দময়ন্তী' ও 'রূপ-সনাতন' নাটকে যথাক্রমে বিষ্ণু, ইন্দ্র ও চৈতন্যদেবের ছোট-ছোট ভূমিকা অভিনয় করিয়াছিলেন। রঘুদেবজীর ভূমিকা লইয়া নূতন নাটকে তিনি এই প্রথম রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হন। সুরেন্দ্রনাথের সুমধুর ও মর্ম্মস্পর্শী অভিনয় দর্শনে আকৃষ্ট হইয়া দর্শকমণ্ডলী এই কিশোর-বয়স্ক দিব্যকান্তি নবীন যুবকটীর পরিচয় জানিতে আগ্রহ প্রকাশ করেন, যখন তাঁহারা জ্ঞাত হইলেন ইনিই নটগুরু গিরিশচন্দ্রের পুত্র তখন তাঁহারা বিস্ময়-আনন্দে মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছিলেন, "ভবিষ্যতে এই যুবক অভিনয়-কলা প্রদর্শনে পিতৃগৌরব রক্ষা করিতে পারিবে।"

'মলিনা-বিকাশ'

২৯শে ভাদ্র (১২৯৭ সাল) গিরিশচন্দ্রের 'মলিনা-বিকাশ' গীতিনাট্য এবং শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু-প্রণীত 'বাঙ্গারাম' নামক একখানি প্রহসন একসঙ্গে 'ষ্টার থিয়েটারে' সর্ব্বপ্রথম অভিনীত হয়। প্রথমাভিনয় রজনীর অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ :—

অভিনেতার বিচিত্র হাবভাব-বিলাসে দর্শকমণ্ডলী অমৃত-হ্রদে নিমগ্ন হইতেন, যাঁহার অমৃতময় ছবি অদ্যাপি রসগ্রাহী দর্শক-হৃদয়ে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে, যাঁহার জীবন-নাটকের শোচনীয় যবনিকা পতনের অব্যবহিত পূর্ব্বেও চিরপরিচিত অভিনয়-পারিপাট্য এই নাটকের "অঘোরে" বিশেষ স্ফূর্ত্তিলাভ করিয়াছে, সেই লব্ধপ্রতিষ্ঠ 'বেলবাবু' বা স্বর্গীয় অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়ের স্মরণার্থে "ষ্টার" রঙ্গমঞ্চের 'হারানিধি' গ্রন্থ-রচয়িতার অনুমত্যানুসারে উপহার প্রদত্ত হইল।—প্রকাশক।'

বিকাশ	গোলাপসুন্দরী (সুকুমারী দত্ত)।
বিলাস	শ্রীযুক্ত কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়।
মহেশ্বরী	এলোকেশী।
মলিনা	শ্রীমতী মানদাসুন্দরী।
তরলা	শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা। ইত্যাদি।

রচনা-মাধুর্য্য, অভিনয়-চাতুর্য্য এবং গীতি-নৃত্যের সৌন্দর্য্যে 'মলিনা-বিকাশ' আবালবৃদ্ধবনিতার চিত্তবিনোদন করিয়াছিল। মলিনার সুধাবর্ষী সঙ্গীত এবং বিলাস ও তরলার অপূর্ব্ব দ্বৈত-গীতে দর্শকগণ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিতেন। 'পাখী তোর পেলে মধুর স্বর', 'দেখলে তারে আপনহারা হই', 'যদি ওই মনোমোহিনী পাই', 'মন কেড়ে নে দেখ গো গলায়'—ইত্যাদি গীতগুলি দর্শকগণের এত ভাল লাগিয়াছিল যে, সে সময়ে ইহা পথে-ঘাটে গীত হইতে আরম্ভ হয়। আধুনিক গীতিনাট্যগুলিতে যে নৃত্যসহ দ্বৈত-গীতের ছড়াছড়ি দেখিতে পাওয়া যায় 'মলিনা-বিকাশ' গীতিনাট্যেই ইহার সূচনা, এবং 'আবু হোসেনে' তাহার পূর্ণ বিকাশ। 'রঙ্গালয়ে নেপেন' নামক পুস্তিকায় গিরিশচন্দ্র 'মলিনা বিকাশ' সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :

" 'ষ্টার থিয়েটার' হাতিবাগানে উঠিয়া আসিবার পর 'মলিনা-বিকাশ' গীতিনাট্য অভিনীত হয়। সঙ্গীতাচার্য্য রামতারণ গীতগুলির সুর সংযোজন করেন এবং নৃত্য-শিক্ষাপ্রদানের ভার জনপরিচিত দর্শকপ্রিয় কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়ের উপর অর্পিত হয়। কাশীনাথের সাহায্যার্থে কাস্তা নামে একজন হিন্দুস্থানী নিযুক্ত হইয়াছিল। কিন্তু ঢং-ঢাং সমস্তই কাশী শিক্ষা দেন। Duetয়ে নৃত্যগীত 'মলিনা-বিকাশে'ই প্রথম উল্লেখযোগ্য। নৃত্যের পরিপাট্যে দর্শকবৃন্দ বিশেষ মুগ্ধ হন।"

'মহাপূজা'

১০ই পৌষ (১২৯৭ সাল) গিরিশচন্দ্র-প্রণীত 'মহাপূজা' নামক একখানি রূপক 'ষ্টার থিয়েটারে' প্রথম অভিনীত হয়। প্রথমাভিনয় রজনীর অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ :

বৃটানিকা	শ্রীমতী মানদাসুন্দরী।
সরস্বতী	শ্রীমতী তারাসুন্দরী।
লক্ষ্মী	শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা।
ভারতমাতা	শ্রীমতী বনবিহারিণী।
ভারত-সন্তানগণ	অমৃতলাল মিত্র, অঘোরনাথ পাঠক, রামতারণ সান্ন্যাল, শ্রীযুক্ত কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়, মহেন্দ্রনাথ চৌধুরী। ইত্যাদি।

কলিকাতায় জাতীয় মহাসমিতির (Congress) অধিবেশন উপলক্ষ্যে এই রূপক-খানি রচিত হইয়াছিল। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে গিরিশচন্দ্রের গভীর দেশভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। বিস্তৃত আলোচনায় বিরত হইয়া আমরা ভারত-সন্তানগণের একখানিমাত্র গান উদ্ধৃত করিলাম :

"নয়ন-জলে গেঁথে মালা পরাব দুখিনী মায়।
ভক্তি-কমল-কলি দিব মায়ের রাঙা পায়॥
শিখ হৃদি উচ্চ শিক্ষা, মাতৃ-মন্ত্রে লহ দীক্ষা,
ত্যজ স্বার্থ মাগি ভিক্ষা, রহ জননী-সেবায়॥
যে নামে দুরিত হরে, রাখ যত্নে হৃদে ধরে,
অবনী তারে আদরে, জননী প্রসন্না যায়॥"

অভিনয় দর্শনে প্রীত হইয়া স্বর্গীয় কালীকৃষ্ণ ঠাকুর মহোদয় গিরিশচন্দ্রকে এক হাজার টাকা পুরস্কারপ্রদান করেন। গিরিশচন্দ্র সে টাকা অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণকে বণ্টন করিয়া দিবার নিমিত্ত থিয়েটারের স্বত্বাধিকারিগণের হস্তে প্রদান করেন।

ইহার অল্পদিন পরেই 'ষ্টার থিয়েটারে'র সহিত গিরিশচন্দ্রের যে কারণে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়, তাহা পরবর্ত্তী অধ্যায়ে সবিস্তারে বলিতেছি।

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ

অবস্থা-বিপর্য্যয়। গুরু-স্থান-দর্শন। পুত্র-বিয়োগ

কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটস্থ 'ষ্টার থিয়েটারে' গিরিশচন্দ্র দুই বৎসর কার্য্য করিয়াছিলেন। এ সময়টা তাঁহার মানসিক অশান্তিতেই কাটিতেছিল। পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে উল্লেখ করিয়াছি, দ্বিতীয় পক্ষের পত্নী-বিয়োগের পর শিশুপুত্রটীকে তিনি পরমযত্নে প্রতিপালন করিতে-ছিলেন। এই পুত্রটী সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্র এবং তাঁহার ভগ্নী দক্ষিণাকালীর মুখে নানারূপ অদ্ভুত গল্প শুনিয়াছি।* শিশুটী অন্য কাহারও কোলে যাইতে চাহিত না, কিন্তু পরম-হংসদেবের শিষ্যগণ আদর করিয়া কোলে লইতে যাইলে—আনন্দে তাঁহাদের বক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িত। অন্য দ্রব্য ফেলিয়া ঠাকুর লইয়া খেলা করিতে ভালবাসিত, কখনও বা ঠাকুরের মূর্ত্তি সম্মুখে রাখিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বসিয়া থাকিত। পরমহংসদেবের ছবি দেখিয়া একদিন শিশু অতিশয় রোদন করিতে লাগিল, কোনওমতে তাহার কান্না থামান যায় না, অবশেষে 'ছবিখানি পাড়িয়া দিতে বলিতেছে', এইরূপ অনুমান করিয়া দেওয়াল হইতে নামাইয়া দেখা গেল ছবিখানির পশ্চাৎভাগ অসংখ্য পিপীলিকায় পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। তৎক্ষণাৎ বস্ত্র দ্বারা পিপীলিকাগুলিকে ঝাড়িয়া ফেলিয়া ছবি-খানি পরিষ্কার করিয়া ফেলা হইল, শিশুও শান্ত হইল। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহধর্ম্মিণী পরমপূজনীয়া মাতা ঠাকুরাণী সময়ে-সময়ে গিরিশচন্দ্রের বাটীতে আসিলে শিশু তাঁহার কোলে বসিয়া পরম আনন্দ প্রকাশ করিত।

অল্পদিন পরেই কিন্তু শিশুটী পীড়িত হইয়া দিন-দিন কৃশ হইয়া পড়িতে লাগিল। যখন রোগের যন্ত্রণায় কাঁদিতে থাকিত, কোনওমতে তাহাকে শান্ত করা যাইত না, কিন্তু হরিনাম করিলে শিশু স্থির হইয়া ঘুমাইয়া পড়িত। পুত্রের এইসব লক্ষণে গিরিশ-চন্দ্রের সম্পূর্ণ ধারণা জন্মিয়াছিল—ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু পরমহংসদেব সত্যই তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছেন। দেবশিশু জ্ঞানে তিনি সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া পুত্রের সেবা-শুশ্রূষায় তৎপর হইয়াছিলেন।

নানারূপ চিকিৎসার পর বিশেষ ফল না পাওয়ায় এবং ডাক্তারগণের পরামর্শে গিরিশচন্দ্র বায়ু-পরিবর্ত্তনের নিমিত্ত পুত্রকে লইয়া মধুপুরে যাইলেন। তথায় কিছুদিন

* শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু) বলেন, "গর্ভাবস্থায় জননী মধ্যে-মধ্যে 'হরিবোল' 'হরিবোল' বলিয়া উন্মাদের ন্যায় চীৎকার করিয়া উঠিতেন। কুলবধূ হইয়া এইরূপ চীৎকার করায় বাটীতে তাঁহাকে প্রথমে অনেক তিরস্কার সহ্য করিতে হইয়াছিল।

অবস্থানের পর হঠাৎ একদিন 'ষ্টার থিয়েটারে'র স্বত্বাধিকারিগণ তাঁহার নামে হাইকোর্টে অভিযোগ আনয়ন করিয়াছেন সংবাদে উদ্বিগ্ন হইয়া পুত্রসহ কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন।

পীড়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকায়, গিরিশচন্দ্র পূজ্যপাদ বিবেকানন্দ স্বামীকে ডাকিয়া বলিলেন, "নরেন, আমি ইহাকে কিছুতেই বাঁচাইতে পারিতেছি না, যদি আমি স্বত্ব ত্যাগ করিলে রক্ষা পায়, তুমি ইহাকে সন্ন্যাস-মন্ত্র দান করিয়া তোমাদের দলভুক্ত করিয়া লও।" স্বামীজী গিরিশচন্দ্রের আগ্রহ দর্শনে শিশুর কর্ণে সন্ন্যাস-মন্ত্র দান করিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না—স্বর্গীয় কুসুম দিন-দিন শুকাইতে লাগিল। প্রায় তিন বৎসর বয়ঃক্রমে শিশুটী ইহলোক ত্যাগ করিল। এই পুত্রের মুখ দেখিয়া গিরিশচন্দ্র প্রিয়তমা পত্নীর শোক সহ্য করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রাণাধিক পুত্রের বিরহে তাঁহার হৃদয় দগ্ধ হইতে থাকিলেও পরমহংসদেবের প্রতি অটল বিশ্বাসবশতঃ নীরবে এই শেল তাঁহাকে বক্ষে ধারণ করিতে হইয়াছিল। পত্নী ও পুত্র-বিয়োগে শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে বকল্‌মাপ্রদানের নিগূঢ় মর্ম্ম গিরিশচন্দ্র সম্পূর্ণরূপ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন, বুঝিয়াছিলেন পুত্রের প্রাণরক্ষার নিমিত্ত ঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করিবার অধিকারও তাঁহার আর ছিল না।

কর্ম্মচ্যুতি

পুত্রটী দীর্ঘকাল ধরিয়া রোগভোগ করায় গিরিশচন্দ্র থিয়েটারে নিয়মিতরূপ যাইতে পারিতেন না। তত্রাচ এইসময়ে 'মলিনা-বিকাশ' গীতিনাট্য ও 'মহাপূজা' রূপকখানি তিনি লিখিয়া দিয়াছিলেন। দুর্ঘটনাস্রোত সে সময়ে তাঁহার উপর খরতর বহিতেছিল, প্রথমতঃ শিশুপুত্রটীর সাংঘাতিক পীড়া, গিরিশচন্দ্রও স্বয়ং কঠিন পীড়া হইতে আরোগ্যলাভ করিয়াছেন মাত্র। এইসময়ে নবকুমার রাহা নামক এক ব্যক্তি 'ষ্টার থিয়েটারে' অবৈতনিক সেক্রেটারী হইয়াছিলেন, তাঁহারই ভেদমন্ত্র-প্রভাবে, থিয়েটারের স্বত্বাধিকারিগণ গিরিশচন্দ্রকে কর্ম্মচ্যুতি-পত্র প্রেরণ করিলেন।

যে উৎসাহ ও আনন্দ লইয়া তিনি 'ষ্টার থিয়েটারে' পুনরায় ফিরিয়া আসিয়াছিলেন, দিন-দিন তাহা নৈরাশ্য এবং বিষাদে পরিণত হইয়াছিল। "গিরিশচন্দ্র 'ষ্টারে' ফিরিয়া দেখিলেন, যে 'ষ্টার' তিনি ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন, সে 'ষ্টার' আর নাই, 'ষ্টার' এখন স্বাবলম্বন শিখিয়াছে, গিরিশচন্দ্রকে বাদ দিয়া যে থিয়েটার চলিতে পারে, 'সরলা', 'তাজ্জব ব্যাপার' প্রভৃতি খুলিয়া 'ষ্টার' তাহা বুঝিয়াছে। ইতঃপূর্ব্বে 'ষ্টারে'র অধ্যক্ষ ছিলেন অমৃতলাল বসু; গিরিশচন্দ্র আসিয়া অধ্যক্ষ হইলেন বটে, কিন্তু নানা বিষয়ে তাঁহার সহিত কর্ত্তৃপক্ষের মতবিরোধ ঘটিতে লাগিল। শাস্ত্রে লেখে, পুত্র বড় হইলে তাহার সঙ্গেই তো মিত্রবৎ ব্যবহার করিতে হয়, সুতরাং শিষ্য বড় হইলে বা মুনিব হইলে চাণক্যনীতি কিরূপ হওয়া উচিত, গিরিশচন্দ্র তাহা অত্যধিক শিষ্য-স্নেহের মোহে

বোধহয় ভুলিয়া গিয়াছিলেন, অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে-সঙ্গে মানুষের মনও ত বদলায়! পূর্ব্বকার মত গিরিশচন্দ্রের কর্ত্তৃত্ব 'ষ্টার' সম্প্রদায়ের আর ভাল লাগিল না। যে গিরিশচন্দ্র আত্মগোপন করিয়া একদিন 'ষ্টারে'র জন্য নাটক লিখিয়া দিয়াছিলেন, যে গিরিশচন্দ্র পাঁচ বৎসরের জন্য নিজেকে বিক্রয় করিয়া ষোল হাজার টাকা 'ষ্টার'কে দিয়াছিলেন, 'ষ্টার থিয়েটার' সেই গিরিশচন্দ্রকেই বরখাস্ত করিয়া চিঠি পাঠাইলেন।" *

গিরিশচন্দ্রের কর্ম্মচ্যুতির পর 'ষ্টার থিয়েটার' সম্প্রদায়-মধ্যে একটা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। নাট্য-সম্রাটের প্রতি এরূপ অপ্রত্যাশিত ব্যবহারে অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণের মধ্যে অনেকেই চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিলেন। সম্প্রদায়-মধ্যে একটা চক্রান্ত চলিতে থাকে —হঠাৎ একদিন স্বর্গীয় নীলমাধব চক্রবর্ত্তী, অঘোরনাথ পাঠক, প্রবোধচন্দ্র ঘোষ, রাণুবাবু, দানিবাবু, প্রমদাসুন্দরী, মানদাসুন্দরী প্রভৃতি পনেরজন অভিনেতা ও অভিনেত্রী থিয়েটার পরিত্যাগ করিলেন। ইহাদের দলপতি ছিলেন নীলমাধববাবু, সে সময়ে মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটে কবিবর রাজকৃষ্ণ রায়-প্রতিষ্ঠিত 'বীণা থিয়েটার' খালি পড়িয়াছিল। † নীলমাধববাবু, অঘোরনাথ পাঠক ও প্রবোধচন্দ্র ঘোষ তিনজন প্রোপ্রাইটার হইয়া উক্ত থিয়েটার ভাড়া লইলেন এবং 'সিটী থিয়েটার' নাম দিয়া অভিনয় ঘোষণা করিলেন। গিরিশচন্দ্রের 'বিল্বমঙ্গল', 'বুদ্ধদেবচরিত', 'মলিনা-বিকাশ', 'বেল্লিক বাজার' প্রভৃতি নাটকাদি অভিনয় হইতে লাগিল। নীলমাধববাবুর নাম থিয়েটারের ম্যানেজার বলিয়া বিজ্ঞাপিত হইত। গিরিশচন্দ্র এই থিয়েটারে যোগদান করেন নাই। তথাপি 'ষ্টার থিয়েটারে'র স্বত্বাধিকারিগণ, ঐসকল নাটকাদির অভিনয়-স্বত্ব তাঁহাদের নিজস্ব, কিন্তু গ্রন্থকার ঐসকল নাটকাদি অন্য থিয়েটারে অভিনয় করিবার অনুমতি দিয়াছেন এবং নীলমাধববাবু তাঁহার 'সিটী থিয়েটারে' অভিনয় করিয়াছেন—

* শ্রীযুক্ত অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় লিখিত "রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর" প্রবন্ধ। 'রূপ ও রঙ্গ'। ২৩ শ্রাবণ ১৩৩২ সাল।

† রাজকৃষ্ণবাবু তৎ-প্রণীত 'প্রহ্লাদচরিত্র' নাটক অভিনয়ে বেঙ্গল থিয়েটার'কে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিতে দেখিয়া স্বয়ং একটী থিয়েটার করিবার সঙ্কল্প করেন। তাঁহার অনেক বন্ধু-বান্ধব তাঁহাকে পরামর্শ দেন—"বারাঙ্গনা-সংশ্লিষ্ট থিয়েটারে অনেকে যাইতে ইচ্ছা করেন না, কিন্তু যদি বালক লইয়া স্ত্রী-চরিত্র অভিনীত হয়, তাহা হইলে সর্ব্বসাধারণেই থিয়েটার দেখিতে পারেন এবং তাঁহার ন্যায় সুলেখকের নাটক অভিনীত হইলে অর্থাগমও যথেষ্ট হইবে।" তাঁহাদের এইরূপ বাক্যে উৎসাহিত হইয়া রাজকৃষ্ণবাবু বহু অর্থব্যয়ে মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটে 'বীণা থিয়েটার' নাম দিয়া এই নূতন নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত করেন এবং নূতন-নূতন নাটকাদি রচনা করিয়া অভিনয় করিতে থাকেন। কিন্তু অভিনেত্রীর পরিবর্ত্তে বালক লইয়া অভিনয় করায় তাঁহার থিয়েটারে তেমন দর্শক সমাগম হইল না, এমনকি যাঁহারা তাঁহাকে বালক লইয়া অভিনয়ের পরামর্শ দিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যেও বড় কেহ একটা থিয়েটারে আসিতেন না। দর্শকাভাবে ক্রমে তিনি ঋণ-জালে জড়িত হইতে লাগিলেন, নিরুপায় হইয়া শেষে বালকের পরিবর্ত্তে অভিনেত্রী গ্রহণ করিলেন। কিন্তু তাহাতেও সুবিধা করিতে না পারিয়া অবশেষে চারি পয়সার টিকিটে প্রত্যহ দুইবার করিয়া অভিনয় করিতে লাগিলেন। ঋণের দায়ে অতঃপর তাঁহার থিয়েটার বিক্রয় হইয়া যায়। 'সুধাসিন্ধু' ঔষধ-বিক্রেতা প্রিয়নাথ দাস থিয়েটারবাটী ক্রয় করিয়াছিলেন; নীলমাধববাবু প্রভৃতি তাঁহার নিকট হইতে থিয়েটার ভাড়া লন।

এই অজুহাতে গিরিশচন্দ্র এবং নীলমাধববাবুর নামে হাইকোর্টে অভিযোগ আনয়ন করেন। গিরিশচন্দ্র সে সময়ে রুগ্ন পুত্রটীকে লইয়া মধুপুরে গিয়াছিলেন। এ সংবাদে তিনি সত্বর কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। অল্পদিন পরেই শিশুপুত্রের মৃত্যু হয়। এই অশান্তির সময় 'ষ্টার থিয়েটারে'র স্বত্বাধিকারিগণের সহিত তাঁহার এইরূপ স্বত্বে একটী লেখাপড়া হয় : 'ষ্টার থিয়েটারে'র স্বত্বাধিকারিগণ তাঁহার নামে মকদ্দমা তুলিয়া লইবেন, কিন্তু নীলমাধববাবুর নামে চালাইতে পারিবেন।* গিরিশচন্দ্রকে তাঁহারা যাবজ্জীবন মাসিক একশত টাকা করিয়া পেন্সন দিবেন, কিন্তু তিনি কোনও প্রকাশ্ব বা অপ্রকাশ্ব থিয়েটারে যোগদান বা তাহাদের কোনরূপ সাহায্য করিতে পারিবেন না। যত্তপি তিনি কোনও নাটকাদি রচনা করেন, তাহার অভিনয়-স্বত্ব তাহারা উপযুক্ত মূল্য দিয়া ক্রয় করিয়া লইবেন। যত্তপি কোনও নাটক তাঁহাদের মনোনীত না হয়, তাহা তিনি অন্য থিয়েটারে দিতে পারিবেন; তবে তাঁহাদের থিয়েটারে গিয়া শিখাইতে পারিবেন না। উভয়পক্ষের মধ্যে যিনি এই স্বত্ব ভঙ্গ করিবেন, তাঁহাকে পাঁচ হাজার টাকা ড্যামেজ দিতে হইবে। নিদারুণ মানসিক অশান্তিতে গিরিশচন্দ্রের আর থিয়েটার করিবার ইচ্ছা ছিল না; তিনি এই এগ্রিমেণ্টে সহি করিয়া দিয়া উদ্বেগ দূর করিলেন।

বিজ্ঞান-অনুশীলন

প্রথম হইতেই গিরিশচন্দ্রের বিজ্ঞান-শিক্ষায় অনুরাগ ছিল, বহুপূর্ব্বে দুই-একখানি মাসিকপত্রিকায় তাঁহার বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধও বাহির হইয়াছিল। দ্বিতীয় পক্ষের পত্নী-বিয়োগের পর চিত্তস্থৈর্য্যের নিমিত্ত গণিতচর্চ্চার ন্যায় ইনি বিজ্ঞানানুশীলনও করিতেন। 'ষ্টার থিয়েটারে' কার্য্যকালীন গিরিশচন্দ্র ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের বিজ্ঞান-সভার (Science Association) মেম্বার হইয়া প্রায় প্রত্যেক লেক্‌চারে উপস্থিত হইতেন। এক্ষণে তিনি যথেষ্ট অবসর পাইয়া নিয়মিতভাবে উক্ত সভায় যাতায়াত আরম্ভ করিলেন। লেক্‌চার দিবস, নির্দ্দিষ্ট সময়ের তিন-চারি ঘটা পূর্ব্বে উপস্থিত হইয়া, লেক্‌চারের উপযোগী যন্ত্রাদি ও গ্যাস প্রস্তুতের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিবার নিমিত্ত, তিনি তথায় শিশি পরিষ্কারের কার্য্য পর্য্যন্ত করিতেন। এইরূপে প্রত্যেক লেক্‌চারে যোগদান এবং বহু বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া বিজ্ঞান-শাস্ত্রে স্থূলতঃ একটা জ্ঞানলাভ করেন। গিরিশচন্দ্রের উৎসাহ ও প্রতিভা দর্শনে ডাক্তার সরকার তাঁহাকে বিশেষরূপ স্নেহ করিতেন।

* হাইকোর্টে নীলমাধববাবুই জয়লাভ করিয়াছিলেন। জষ্টিস্ উইলসন সাহেব বিচার করিয়া রায় প্রকাশ করেন, যে কোনও মুদ্রিত নাটক বাজারে বিক্রয় হইতে আরম্ভ হইলেই সে নাটক সকল থিয়েটারেই বিনা বাধায় অভিনীত হইতে পারিবে। বহুকাল পরে নূতন আইন প্রবর্ত্তনের ফলে নাটকাভিনয়ের এই স্বাধীনতা রহিত হয়।

এইরূপে প্রায় বৎসরাধিক গিরিশচন্দ্র বিজ্ঞান ও গণিতচর্চ্চা এবং অবশিষ্ট সময় তাঁহার গুরুভ্রাতা অর্থাৎ পরমহংসদেবের সন্ন্যাসী শিষ্যগণের সহিত শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গ এবং ধর্ম্মালোচনায় অতিবাহিত করিতেন। পাঠকগণের বোধহয় স্মরণ আছে, গিরিশচন্দ্র একদিন পরমহংসদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আমি এখন কি করিব?" ঠাকুর তদুত্তরে বলিয়াছিলেন, "এখন যাহা করিতেছ, তাহাই করিয়া যাও, পরে যখন একদিক (সংসার) ভাঙ্গিবে, তখন যাহা হয় হইবে।" (২১৯ পৃষ্ঠা) ঠাকুর এক্ষণে তাঁহাকে কোন পথে লইয়া যাইবেন, গিরিশচন্দ্র তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। "তিনি এখন তাঁহার সন্ন্যাসী গুরুভ্রাতাগণের সঙ্গেই নিরন্তর কালযাপন করিতেন এবং ঠাকুরের অলৌকিক গুণাবলী ও অপার করুণার কথা তাঁহাদের সহিত আলোচনা করিয়াই উল্লসিত অন্তরে অবস্থান করিতেন। ঐরূপ চর্চ্চাকালে তাঁহার সংসারের সর্ব্বপ্রকার বিপদ ও প্রলোভনকে গোষ্পদের ন্যায় জ্ঞান হইত; ক্ষুধা, তৃষ্ণা এবং সর্ব্বপ্রকার দুঃখ-কষ্ট অবিচলিতভাবে সহ্য করাটা কিছুই মনে হইত না, এবং দিনরাত্র যে কোথা দিয়া চলিয়া যাইত, তাঁহার জ্ঞান থাকিত না। স্বামী নিরঞ্জনানন্দ নামক তাঁহার এক গুরুভ্রাতা একদিন ঐকালে তাঁহাকে বলেন, 'ঠাকুর ত তোমায় সন্ন্যাসী করিয়াছেন, তুমি কি করিতে আর বাটীতে রহিয়াছ? চল, দুইজনে কোথাও চলিয়া যাই।' গিরিশ বলিলেন, 'তোমরা যাহা বলিবে, তাহা ঠাকুরের কথা জ্ঞানে আমি এখনই করিতে প্রস্তুত, কিন্তু নিজে ইচ্ছা করিয়া সন্ন্যাসী হইতেও আমার সামর্থ্য নাই; কারণ ঠাকুরকে আমি যে বকল্‌মা দিয়াছি।' স্বামী নিরঞ্জনানন্দ বলিলেন, 'তবে চলিয়া আইস, সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া চলিয়া আইস, আমি বলিতেছি।' গিরিশও আর কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া নগ্নপদে, এক বস্ত্রে বাটী ছাড়িয়া তাঁহার সহিত বাহির হইলেন এবং ঐ বেশে অন্যান্য সন্ন্যাসী গুরুভ্রাতাগণের নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা তখন, এতকাল ভোগসুখে লালিত-পালিত গিরিশের দেহে ভিক্ষাটনাদির কষ্ট কখন সহ্য হইবে না স্থির করিয়া এবং গিরিশের ন্যায় বিশ্বাসী ভক্তের ঐরূপ পরিশ্রমে শরীর নষ্ট করিবার কিছুমাত্র আবশ্যকতা নাই বুঝিয়া তাঁহাকে ঐ কথা বুঝাইয়া বলিলেন এবং বাটীতে সকল বিষয়ের বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া স্বামী নিরঞ্জনানন্দের সহিত ঠাকুরের জন্মভূমি ৺কামারপুকুরে গমনকরতঃ শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করিয়া আসিবার পরামর্শ দিলেন। গিরিশও তাঁহাদিগের ঐ কথা ঠাকুরেরই কথা জ্ঞানে ঐরূপ অনুষ্ঠান করিলেন।"

গুরু-গৃহ দর্শনে গমন

"ঠাকুর এবং শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর জন্মভূমি ৺কামারপুকুর ও জয়রামবাটী গ্রামে গমন করিয়া গিরিশচন্দ্র নিজ জীবন পরিচালনার জন্য নূতনালোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেখানে কৃষাণদিগের সহিত তাহাদিগের সুখ-দুঃখের আলোচনায় তাহাদিগের সরল

ধর্ম্ম-বিশ্বাস, নির্ভরশীল জীবন ও নিঃস্বার্থ ভালবাসার অনুষ্ঠানে ঠাকুর এইসকল দীন গ্রাম্যলোকের ভিতর আবির্ভূত হইয়া কিভাবে বাল্য ও কৈশোরে ইহাদিগের জীবন মধুময় করিয়া তুলিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ের চর্চ্চায় এবং সর্ব্বোপরি শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর অদ্ভুত অকৃত্রিম ভালবাসায় গিরিশের বিশ্বাসী কবি-হৃদয় এককালে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর পুণ্যদর্শন এমনভাবে গিরিশ কখনও প্রাপ্ত হন নাই, হইবার চেষ্টাও করেন নাই। গিরিশ এখন প্রাণে-প্রাণে বুঝিলেন, বাস্তবিকই ইনি তাঁহার মাতা, অপরের সংসারে তাঁহাকে নানা কারণে কিছুকালের জন্য রাখিয়া দিয়াছিলেন মাত্র।* গিরিশ ঠাকুরের সম্মুখে যেমন আপনার বিদ্যা-বুদ্ধি-বয়স প্রভৃতি সকল কথা ভুলিয়া পিতার স্নেহের বালক হইয়া যাইতেন, এখানেও তদ্রূপ সকল কথা ভুলিয়া শ্রীশ্রীমার স্নেহে আপ্যায়িত হইয়া বালকের ন্যায় কয়েক মাস নিশ্চিন্ত মনে কাটাইয়াছিলেন। দরিদ্র ভিখারী সুদূর গ্রামান্তর হইতে ভিক্ষা করিতে আসিয়া ভাঙ্গা বেহালার সহিত সুর মিশাইয়া গান ধরিত :

কি আনন্দের কথা উমে (গো মা)
ওমা লোকের মুখে শুনি, সত্য বল শিবাণী,
অন্নপূর্ণা নাম তোর কি কাশীধামে।
অপর্ণে, যখন তোমায় অর্পণ করি,
ভোলানাথ ছিলেন মুষ্টির ভিখারী,
আজ কি সুখের কথা শুনি শুভঙ্করি,
বিশ্বেশ্বরী তুই কি বিশ্বেশ্বরের বামে।
'খ্যাপা খ্যাপা' আমায় বল্‌তো দিগম্বরে,
গঞ্জনা সয়েছি কত ঘরে পরে,
এখন দ্বারী নাকি আছে দিগম্বরের দ্বারে,
দরশন পায় না ইন্দ্র চন্দ্র যমে!
বিষয় বুদ্ধি বটে বিশ্বাস হইল মনে,
তা না হলে গৌরীর এতেক গৌরব ক্যানে,
নয়নে না দেখে আপন সন্তানে
মুখ বাঁকায়ে রয় রাধিকার নামে।

তখন গিরিশ উহাতে ঠাকুরের ও শ্রীশ্রীমার বাল্যজীবনের জলন্ত ছবি দেখিতে

* গিরিশচন্দ্র বলিতেন, "একদিন দেখিলাম মাতাঠাকুরাণী সাবান, বালিসের ওয়াড় ও বিছা চাদর লইয়া নিকটবর্ত্তী পুকুরঘাটের দিকে যাইতেছেন। রাত্রে শয়ন করিবার সময় দেখি, আ বিছানা সাদা ধপ-ধপ করিতেছে। এ কার্য্য মায়েরই বুঝিয়া প্রাণে কষ্টও হইল, আবার মার অ স্নেহের কথা ভাবিয়া হৃদয় আনন্দে আপ্লুত হইয়া উঠিল।"

পাইয়া উল্লাসে আত্মহারা হইতেন।* গিরিশ মাঠে-ঘাটে সরল কৃষাণদের সহিত বেড়াইতেন,† উদর পূর্ণ করিয়া মার নিকট প্রসাদ পাইতেন এবং চেষ্টা না করিয়া স্বতঃই শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবন-কথা আলোচনা করিয়া সর্ব্বক্ষণ উচ্চ কবিত্ব বা অধ্যাত্ম-চিন্তায় ভরপুর হইয়া থাকিতেন। ফিরিবার কালে গিরিশ শ্রীশ্রীমাকে অকপটে অন্তরের সকল কথা খুলিয়া বলিয়া অতঃপর তাঁহার ইতিকর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়া লইয়াছিলেন। এখন হইতে সম্পূর্ণ অন্য এক ব্যক্তি হইয়া গিরিশ কলিকাতায় ফিরিলেন এবং ঠাকুরের অলৌকিক চরিত্র এবং শিক্ষা-দীক্ষা লইয়া পুস্তক-সকলের প্রণয়নে অবশিষ্ট জীবন নিয়োগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।" ("ভক্ত গিরিশচন্দ্র", 'উদ্বোধন', ১৩২০ সাল আষাঢ়। শ্রীশ্রীশচন্দ্র মতিলাল-প্রণীত এবং স্বামী শ্রীসারদানন্দের দ্বারা সম্যক্ সংশোধিত, পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত।)

কলিকাতায় ফিরিয়া আসিবার পর পাথুরিয়াঘাটার সুপ্রসিদ্ধ ৺প্রসন্নকুমার ঠাকুর মহোদয়ের দৌহিত্র স্বর্গীয় নাগেন্দ্রভূষণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় গিরিশচন্দ্রকে লইয়া ১২৯৯

* গিরিশচন্দ্রের মুখে শুনিয়াছি: "ভিখারী যখন এই গান গাহিতেছে, আমরা একদিকে কাঁদিতেছি এবং অন্যদিকে স্ত্রীলোকদের মধ্যে মাতাঠাকুরাণীও নয়নজলে ভাসিতেছেন।"

† গিরিশচন্দ্র-বিরচিত "বাঙ্গাল" নামক গল্পে বর্ণিত হইয়াছে: হরেন্দ্র ও রাধাকান্ত কলিকাতার কোনও স্কুলে এক ক্লাসে পড়িত। হরেন্দ্র ধনাঢ্য সন্তান, রাধাকান্ত পাড়াগেঁয়ে ভালমানুষ—স্কুলে 'বাঙ্গাল' বলিত। স্কুলের দিন ফুরাইল, এখন উভয়ে সংসারে। হরেন্দ্র পিতার মৃত্যুর পর অগাধ সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছে, রাধাকান্ত 'মেসে' থাকিয়া সওদাগরি অফিসে ২৫৲ টাকা বেতনে বিল-সরকারের কার্য্য করে। বহুকাল পর হঠাৎ একদিন হরেন্দ্র রাধাকান্তকে দেখিতে পাইয়া তাহার বাটীতে লইয়া যায় এবং তাহাকে অফিসের কাজ ছাড়াইয়া আপনার বৈষয়িক কর্ম্মে নিযুক্ত করে। পারিবারিক অশান্তিবশতঃ হরেন্দ্র রাধাকান্তের দেশে বেড়াইতে যাইতে উৎসুক হইল। কিন্তু গৃহস্থ রাধাকান্ত আবাল্য সুখ-প্রতিপালিত ধনাঢ্য সন্তানকে তাহার পল্লীগ্রামের পর্ণকুটীরে লইয়া যাইতে ভীত হইয়া পড়িল। কিন্তু হরেন্দ্র ছাড়িল না। রাধাকান্তকে অগত্যা তাহাকে সঙ্গে লইয়া দেশে যাইতে হইল। হরেন্দ্রের এই পল্লীবাস বর্ণনার সহিত গিরিশচন্দ্রের 'জয়রামবাটী' গ্রামে অবস্থানের অনেকটা আভাস আছে। যথা:

"হরেন্দ্র চণ্ডীমণ্ডপে যখন মাদুরে বসিয়া দা-কাটা তামাক পরম তৃপ্তির সহিত টানিতে লাগিল, রাধাকান্তের মা, ছেলের বন্ধুকে ছেলের মত যত্ন করিয়া চিঁড়ে-ভাজা, চাল-ভাজা তেল-নুন মাখিয়া জল খাইতে দিল, তখন রাধাকান্ত আড়ষ্ট। কিন্তু হরেন্দ্র যেরূপ তৃপ্তির সহিত ভাজাভুজি, গুড়পাটালি খাইল, অতি উপাদেয় দ্রব্য তাহাকে এরূপ ভাবে খাইতে রাধাকান্ত দেখে নাই। তাহার পর অন্ন, কলায়ের দাল, সজনিখাড়া চচ্চড়ি, আধপোড়া পোনামাছ ভাজা, উত্তম ঘৃত-দুগ্ধ—পুত্রবৎ যত্নের সহিত রাধাকান্তের মা হরেন্দ্রকে খাইতে দিল। হরেন্দ্র বাটীতে যাহা খাইত, তাহার দ্বিগুণ খাইল। তথাপি মা-মাগী ঘোমটা টানিয়া কথা কহিয়া বলিল, 'বাবা, আর দুটি ভাত ভাঙ্গিয়া খাও। আহা বাবা, এ খেয়ে যোয়ান বয়সে কি ক'রে থাকবে?' এইসকল স্নেহবাক্যে হরেন্দ্রের চক্ষে জল আসিল। রাধাকান্ত সাবান সঙ্গে লইয়াছিল। বালিসের ওয়, বিছানা প্রভৃতি কাচিয়া রাখিয়াছিল।...পরদিন প্রাতে রাধাকান্তের চাকর রাখাল, মাহিন্দর ও অন্যান্য কৃষি চাকরেরা, হাতে কলিকা টানিতে-টানিতে হরেন্দ্রকে আদর করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, 'হ্যাগা বাবু, তোমার নিজ বাড়ী কি কলকাতায়?'... হরেন্দ্র প্রায়ই কৃষকদিগকে খাওয়ায় এবং তাহাদের সহিত খায়। সন্ধ্যার পর তাহাদের সহিত নৃত্যগীত করে। সাঁতার দেয়—একসঙ্গে ছোটে—কখনও বা তাহাদের তামাক সাজিয়া খাওয়ায়।" ইত্যাদি।

সালে 'মিনার্ভা থিয়েটার' নামে একটী নূতন রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত করেন। 'গ্রেট ন্যাসান্যাল থিয়েটারে'র জমী এ পর্য্যন্ত খালি পড়িয়াছিল। উক্ত জমীর স্বত্বাধিকারী মহেন্দ্রলাল দাসের নিকট 'লিজ' লইয়া সেই স্থানেই 'মিনার্ভা থিয়েটারে'র ভিত্তি স্থাপিত হইল। বলা বাহুল্য, 'ষ্টার থিয়েটারে'র স্বত্বাধিকারিগণের সহিত এগ্রিমেণ্ট খারিজের জন্য নাগেন্দ্রভূষণবাবু গিরিশচন্দ্রকে ড্যামেজের পাঁচ হাজার টাকা প্রদান করেন। সেই টাকা দিয়া গিরিশচন্দ্র 'ষ্টার থিয়েটারে'র সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিলেন।

অষ্টত্রিংশ পরিচ্ছেদ

'মিনার্ভা'য় গিরিশচন্দ্র

নীলমাধববাবুর অধ্যক্ষতায় সিটী থিয়েটার সম্প্রদায় 'বীণা থিয়েটারে' ন্যূনাধিক এক বৎসরকাল থিয়েটার পরিচালনা করিয়াছিলেন ; কিন্তু ক্ষুদ্র রঙ্গালয়ে স্থানের অল্পতা ও নানা অসুবিধাবশতঃ তাঁহারা একটী নূতন নাট্যশালা নির্ম্মাণের নিমিত্ত একজন ধনীর সন্ধান করিতেছিলেন। গিরিশবাবুর প্রস্তাবে নাগেন্দ্রভূষণবাবু ইঁহাদিগকে তাঁহার নূতন রঙ্গালয়ের লভ্যাংশ দানে স্বীকৃত হওয়ায়, সিটী সম্প্রদায় নবোৎসাহে এই নূতন রঙ্গালয়ের ভিত্তি স্থাপন হইতেই তাঁহার সহিত যোগদান করেন। কিন্তু নাগেন্দ্রভূষণবাবু থিয়েটার-নির্ম্মাণে যে টাকা ব্যয় হইবে অনুমান করিয়াছিলেন, কার্য্য প্রায় অর্দ্ধাংশ হইয়া আসিলে বুঝিলেন তাহার প্রায় তিনগুণ অধিক খরচ পড়িবে। এ নিমিত্ত তাঁহাকে দেনাও করিতে হইয়াছিল। তিনি সিটী সম্প্রদায়কে এইসময়ে স্পষ্টই বলিলেন, "আমি রঙ্গালয়-নির্ম্মাণে ঋণগ্রস্ত হইয়াছি, এখনও ঋণ করিতে হইবে, যতদিন আমার এই ঋণ পরিশোধ না হয়, ততদিন আমি আপনাদিগকে লভ্যাংশ দিতে পারিব না।" নীলমাধববাবু প্রমুখ সিটী সম্প্রদায় জিদ ধরিলেন, আমরা কাহারও চাকুরী করিব না, প্রথম হইতেই আমাদিগকে অংশ দিতে হইবে।" গিরিশ-চন্দ্র সকল দিক বিবেচনা করিয়া মধ্যস্থতা করিলেন, "নাগেন্দ্রভূষণবাবু ঋণ পরিশোধ হইলেই সিটী সম্প্রদায়কে লভ্যাংশ দিবেন, কিন্তু এই মর্ম্মে তাঁহাকে এখন হইতেই পাকা লেখাপড়া করিয়া দিতে হইবে।" নাগেন্দ্রবাবু ইহাতে সম্মত হইলেন, কিন্তু নীলমাধব-বাবু সম্মত হইলেন না। গিরিশচন্দ্র অনেক বুঝাইলেন, নীলমাধববাবু কোনওমতে স্বীকৃত না হইয়া দল লইয়া চলিয়া গেলেন।

গিরিশচন্দ্র একটু বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন ; কিন্তু তাঁহার স্বভাব ছিল, কোনও বিষয়ে বাধা পাইলে অণুমাত্র নিরুৎসাহ না হইয়া, নবোদ্যমে সেই কার্য্যে সাফল্যলাভের নিমিত্ত বদ্ধপরিকর হইয়া উঠিতেন। তিনি নবব্রতী অভিনেতা ও নবীন যুবকগণকে লইয়া একটী নূতন দল গঠনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। উদ্যোগ-আয়োজন চলিতেছে, এমন সময়ে নটকুলশেখর অর্দ্ধেন্দুশেখর আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন— মণি-কাঞ্চন সংযোগ হইল। পাঠকগণ জ্ঞাত আছেন, অর্দ্ধেন্দুবাবু স্থায়ীভাবে একস্থানে থাকিতেন না ; কখনও কলিকাতায় কখনও বা ভারতের পূর্ব্ব ও পশ্চিম নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। ইহার কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। অর্দ্ধেন্দু-

বাবুকে সহকারী পাইয়া গিরিশচন্দ্রের বিশেষ সুবিধা হইল।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু), শ্রীযুক্ত চুণীলাল দেব ও নিখিলেন্দ্রকৃষ্ণ দেব ভ্রাতৃদ্বয়, স্বর্গীয় বিনোদবিহারী সোম (পদবাবু), কুমুদনাথ সরকার, কৃষ্ণলাল চক্রবর্ত্তী, অনুকূলচন্দ্র বটব্যাল, মানিকলাল ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত নীলমণি ঘোষ, নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি যুবকগণকে লইয়া নূতন দল গঠিত হইল। ইহাদিগকে সম্পূর্ণ নূতনভাবে শিক্ষাদান করিয়া বঙ্গ-রঙ্গভূমির পুরাতন ধারা বদলাইয়া দিবেন—গিরিশচন্দ্র স্থির করিয়াছিলেন।

'ম্যাক্‌বেথ' অনুবাদ

নাটকাভিনয়েও নূতন যুগ আনিবার নিমিত্ত গিরিশচন্দ্র এইসময়ে মহাকবি সেক্সপীয়রের 'ম্যাক্‌বেথ' নাটকের দ্বিতীয়বার অনুবাদ করেন। পাঠকগণের বোধহয় স্মরণ আছে, 'গ্রেট ন্যাসান্যাল থিয়েটারে' 'রুদ্রপাল' নাটকাভিনয় প্রসঙ্গে হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি স্বর্গীয় গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় গিরিশচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন, 'ম্যাক্‌বেথ' নাটকের ডাকিনী(witch)দের ভাষার বঙ্গানুবাদ বড়ই কঠিন (১১৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। গিরিশচন্দ্র ঔৎসুক্যবশতঃ উক্ত নাটকের অনুবাদে প্রবৃত্ত হইয়া প্রায় তাহা শেষ করিয়া আনিয়াছিলেন, কিন্তু অ্যাট্‌কিন্সন কোম্পানীর অফিস ফেল হইবার সময় পাণ্ডুলিপিখানি খোয়া যায় (৯৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। এক্ষণে তিনি পুনরায় অতি যত্নের সহিত ঐ নাটকখানি নূতন করিয়া অনুবাদ করেন। তাঁহার মুখে শুনিয়াছিলাম, পূর্ব্বস্মৃতি হইতে অনেক স্থানে তিনি সাহায্য পাইয়াছিলেন।

'ম্যাক্‌বেথ' অনুবাদে গিরিশচন্দ্র কিরূপ অদ্ভুত পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার পরিচয়স্বরূপ নাটকের প্রারম্ভেই প্রথম ডাকিনীর উক্তির মূল ও অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি :

> When shall we three meet again
> In thunder, lightning, or in rain ?

সম্ভবতঃ গুরুদাসবাবুর ধারণা ছিল, সাধারণ অনুবাদক এমন একটা ইহার অনুবাদ করিবে, যাহাতে ডাকিনীর ভাষার 'ধাত' (spirit) বজায় থাকিবে না, যথা :

> আবার মিলিব বল কোথা তিন জনে—
> বজ্রধ্বনি, দামিনী, বা বারি বরিষণে ?

কিন্তু গিরিশচন্দ্র ডাকিনীর ভাষার বিশেষত্ব রক্ষার নিমিত্ত কিরূপ প্রয়াস করিয়াছেন—পাঠ করুন :

> দিদি লো, বল না আবার মিলব কবে তিন বোনে—
> যখন ঝরবে মেঘা ঝুপুর ঝুপুর,
> চক চকাচক হানবে চিকুর,
> কড় কড়াকড় কড়াৎ কড়াৎ ডাকবে যখন ঝনঝনে ?

পুনশ্চ, ১ম অঙ্ক, ৩য় দৃশ্যে ১মা ডাকিনী :

A sailor's wife had chestnuts in her lap,
And mounch'd, and mounch'd, and mounch'd

এলো চুলে মালার মেয়ে, ব'সে উদোম গায়,
ভোর কোঁচড়ে ছেঁচা বাদাম, চাকুম চাকুম খায়।

উক্ত দৃশ্যেই ডাকিনীগণ 'নাচন-কোঁদন' করিতেছে :

Thrice to thine, and thrice to mine,
And thrice again, to make up nine.
Peace! — the charm's wound up.

তিন পাক তোর, তিন পাক মোর,
তিন তিরিখ্যে ন' পাক হবে, আর তিন পাক ঘোর ;
থাম্ থাম্ থাম্ নাচোন-কোঁদন, পুরলো কুহক ঘোর।

৪র্থ অঙ্ক, ১ম দৃশ্যে জলন্ত কটাহে কুহক-সৃষ্টির আয়োজনে ডাকিনীগণ

Scale of dragon, tooth of wolf ;
Witches' mummy ; maw, and gulf,
Of the ravin'd salt-sea shark ;
Root of hemlock, digg'd i'th' dark ;
Liver of blaspheming Jew ;
Gall of goat, and slips of yew,
Sliver'd in the moon's eclipse ;
Nose of Turk, and Tartar's lips ;
Finger of birth-strangled babe,
Ditch-deliver'd by a drab,
Make the gruel thick and slab :
Add thereto a tiger's chaudron,
For th' ingredience of our cauldron.

ছেড়ে দে নেক্‌ড়ে বাঘের দাঁত,
সাপের এঁসো মিশিয়ে নে তার সাথ ;
শুঁটকী করা ডাইনি মরা,
নোনা হাঙর খিদেয় জরা,
টুঁটিটে নে না ছিঁড়ে,
বা'র ক'রে নে ভুঁড়ি ফেঁড়ে ;
বিষের চারার শেকড় খানা
আঁধার রেতে খুঁড়ে আনা ;

দেবতাকে গাল দেছে সেঁটে,
সে এ য়ীহুদীর মেটে ;
ছাগলের পিত্তি থোবা,
নিয়ে লো কড়ায় চোবা ;
কবর ভুঁইয়ের ঝাউয়ের ডাঁটা,
গেরণের রেতে কাটা ;
তুরকির নাকের বোঁটা,
তাতারের ঠোঁটটা মোটা ;
বিয়িয়ে ছেলে খানার ধারে
মুখ টিপে তার দেছে সেরে,
ন্যাল্‌নেলে আঙুল চেলে,
এনে দে লো কড়ায় ফেলে,
থকথকে ঘন ঘন,
কর ঝোল কথা শোন ;
বাঘের ভুঁড়ি তার উপরে,
মসলা রাখ কড়া ভ'রে।

ভাব অক্ষুণ্ন রাখিয়া অথচ সরল এবং ওজস্বিনী ভাষায় তাঁহার অনুবাদ কিরূপ সুন্দর হইয়াছে, তাহা দেখাইতে হইলে সমস্ত বইখানি উদ্ধৃত করিতে হয়, আমরা কেবলমাত্র সর্ব্বজন-প্রশংসিত বিশিষ্ট কয়েকটী স্থান নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :

১। রাজহত্যা-সম্বন্ধে লেডি ম্যাক্‌বেথ (১ম অঙ্ক, ৫ম দৃশ্য) :

Come, you Spirits
That tend on mortal thoughts, unsex me here,
And fill me, from the crown to the toe, top-full
Of direst cruelty ! make thick my blood,
Stop up th'access and passage to remorse ,
That no compunctious visitings of Nature
Shake my fell purpose, nor keep peace between
Th'effect and it ! Come to my woman's breasts,
And take my milk for gall, you murth'ring ministers,
Wherever in your sightless substances
You wait on Nature's mischief ! Come, thick Night,
And pall thee in the dunnest smoke of Hell,
That my keen knife see not the wound it makes,
Nor Heaven peep through the blanket of the dark,
To cry, 'Hold, hold !'

আয় আয়, আয় রে নরকবাসি পিশাচনিচয় !
ডাকিছে জিঘাংসা তোরে আয় ত্বরা করি ;
হর নারী-কোমলতা হৃদি হ'তে মম,
আপাদমস্তক কর কঠিনতাময়।
কর ঘন শোণিত-প্রবাহ
রুদ্ধ রাখ হৃদয়ের দ্বার,
মানব-স্বভাব-জাত অনুতাপ যেন নাহি পশে ;
না টলায় উদ্দেশ্য ভীষণ, দ্বন্দ্ব নাহি উঠে মনে,
যদবধি কার্য্য নাহি হয় সমাধান !
এস হত্যা-উত্তেজনাকারি,
ভ্রম যারা অদৃশ্য শরীরে,
মানব-স্বভাবে পাপ-উত্তেজনা হেতু,
এস এস নারীর হৃদয়ে,
পয়ঃ পরিবর্ত্তে বিষ দেহ পয়োধরে !
আয় আয় ঘোররূপা তামসী ত্রিযামা,
ভীষণ নরক-ধূমে আবরিয়া কায় !
যেন তীক্ষ্ণ ছুরী না হেরে আঘাত ;
তমাচ্ছন্ন আবরণ ভেদিয়া গগন
"কি কর, কি কর !" নাহি বলে।

২। ম্যাক্‌বেথ (১ম অঙ্ক, ৭ম দৃশ্য) :

If it were done, when 'tis done, then 't were well
It were done quickly : if th'assassination
Could trammel up the consequence, and catch
With his surcease, success ; that but this blow
Might be the be-all and the end-all – here,
But here, upon this bank and shoal of time,
We'd jump the life to come. – But in these cases,
We still have judgement here ; that we but teach
Bloody instructions, which, being taught, return
To plague th'inventor : this even-handed Justice
Commends th'ingredience of our poison'd chalice
To our own lips.

এ কঠিন ব্রত যদি উদ্যাপনে হ'ত উদ্যাপন,
শ্রেয়ঃ তবে শীঘ্র সমাধান।

নরকাম হত্যা যদি বারিতে পারিত পরিণাম,
অস্ত্রাঘাতে ফুরাত সকলি,
ভুঞ্জিতে না হ'ত ফলাফল ইহকালে।
সংকীর্ণ এ ভব-কূলে দাঁড়ায়ে নির্ভয়ে,
করিতাম অবহেলা পরলোকে।
কিন্তু এই গুরু পাপে দণ্ড ইহলোকে,
অন্যে শিখে এ শোণিত খেলা,
শিক্ষকে দেখায় সেই খেলা প্রাণনাশী।
বিষম অপক্ষপাতী বিধির নিয়ম,
যার বিষপাত্র, আনি ধরে তার মুখে।

৩। ডাক্তারের প্রতি ম্যাকবেথ (৫ম অঙ্ক, ৩য় দৃশ্য) :

Canst thou not minister to a mind diseas'd,
Pluck from the memory a rooted sorrow,
Raze out the written troubles of the brain,
And with some sweet oblivious antidote
Cleanse the stuff'd bosom of that perilous stuff,
Which weighs upon the heart ?

পার না কি মনোব্যাধি করিতে মোচন,
স্মৃতি হ'তে উখাড়িতে নার কি হে তুমি
দুরন্ত সন্তাপ বদ্ধমূল ?
অগ্নিবর্ণে থরে থরে মস্তিষ্ক মাঝারে
লেখা অনুতাপ লিপি—
আছে কি কৌশল তব মুছিবারে তায় ?
অন্তর গরল যার প্রবল পীড়নে !
ব্যথিত হৃদয়াগার—
বিস্মৃতি অমৃত বারি করি দান
ধৌত কর—পার যদি।

উদ্ধৃত অংশ পাঠে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে ইংরাজি এবং বাঙ্গালা ভাষায় প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি না থাকিলে এরূপ চমৎকার অনুবাদ সহজসাধ্য নহে।

'ম্যাক্‌বেথ' অভিনয়

'ম্যাক্‌বেথ' নাটকের রিহারস্যাল আরম্ভকালীন 'এমারেল্ড থিয়েটার' হইতে পণ্ডিত শ্রী হরিভূষণ ভট্টাচার্য্য এবং 'সিটী থিয়েটার' হইতে স্বর্গীয় অঘোরনাথ পাঠক ও শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (রাণুবাবু) আসিয়া গিরিশচন্দ্রের সহিত যোগদান করেন। প্রায় সাত মাস ধরিয়া 'ম্যাক্‌বেথ' এবং তৎসঙ্গে গিরিশচন্দ্রের 'মুকুল-মুঞ্জরা' নামক আর একখানি নাটকের* রিহারস্যাল চলিয়াছিল।

নবনির্ম্মিত রঙ্গালয়ের নামকরণের নিমিত্ত প্রথমে তিনটি নাম প্রস্তাবিত হয় — ক্লাসিক, মিনার্ভা ও আনন্দময়ী থিয়েটার। অবশেষে সর্ব্ববাদীসম্মতিক্রমে 'মিনার্ভা থিয়েটার' নামই গৃহীত হয়। উত্তরকালে স্বর্গীয় অমরেন্দ্রনাথ দত্ত যে সময়ে 'এমারেল্ড থিয়েটার' ভাড়া লইয়াছিলেন, তিনি তাঁহার থিয়েটারের 'ক্লাসিক' নাম রাখিয়াছিলেন।

১৬ই মাঘ ১২৯৯ সাল (২৮শে জানুয়ারী ১৮৯৩ খ্রী) 'ম্যাক্‌বেথ' লইয়া 'মিনার্ভা থিয়েটার' প্রথম খোলা হয়। প্রথম অভিনয়-রজনীর অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ :

ডন্‌ক্যান	পণ্ডিত শ্রী হরিভূষণ ভট্টাচার্য্য।
ম্যাকম	শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু)।
ডনাল্‌বেন	শ্রীযুক্ত নিখিলেন্দ্রকৃষ্ণ দেব।
ম্যাক্‌বেথ	গিরিশচন্দ্র ঘোষ।
ব্যাঙ্কো	কুমুদনাথ সরকার।
ম্যাক্‌ডফ ও হিকেট	অঘোরনাথ পাঠক।
লেনক্স	বিনোদবিহারী সোম (পদবাবু)।
রস	কৃষ্ণলাল চক্রবর্ত্তী।
মেনটিয়েথ, ৩য় হত্যাকারী ও ৩য়া ডাকিনী	শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
অ্যাঙ্গাস	অনুকূলচন্দ্র বটব্যাল।
কেথ্‌নেস, ২য় হত্যাকারী ও রক্তাক্ত সৈনিক	শ্রীযুক্ত চুণীলাল দেব।
ফ্লিয়েন্স	শ্রীমতী কুসুমকুমারী।
বৃদ্ধ সিউয়ার্ড	শ্রীযুক্ত ঠাকুরদাস চট্টোপাধ্যায় (দাসুবাবু)।
যুবা সিউয়ার্ড ও ২য়া ডাকিনী	শ্রীযুক্ত নীলমণি ঘোষ।
সিটন	শ্রীযুক্ত নন্দহরি ভট্টাচার্য্য (প্রম্পটার)।
দ্বারপাল, ১ম ডাকিনী, বৃদ্ধ, ১ম হত্যাকারী ও ডাক্তার	অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী।

* 'ষ্টার থিয়েটারে'র নিমিত্ত গিরিশচন্দ্র পূর্ব্বে 'মুকুল-মুঞ্জরা' ও 'আবু হোসেন' রচনা করিয়াছিলেন। নানা কারণে পুস্তক দুইখানি তথায় অভিনীত হয় নাই।

ভূতত্রয়	মাণিকলাল ভট্টাচার্য্য ও তিতুরাম দাস।
ম্যাক্‌ডফের পুত্র	চয়নকুমারী।
লেডী ম্যাক্‌বেথ	তিনকড়ি দাসী।
লেডী ম্যাক্‌ডফ	প্রমদাসুন্দরী।
পরিচারিকা	হরিমতী (ডেকৃচি)। ইত্যাদি।
সঙ্গীত-শিক্ষক	শ্রীযুক্ত দেবকণ্ঠ বাগচী।
রঙ্গভূমি-সজ্জাকর	ধর্ম্মদাস সুর, জহরলাল ধর ও শ্রীযুক্ত শশীভূষণ দে (সহকারীদ্বয়)।

ষোড়শ পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে, মিসেস্ লুইসের সহিত ঘনিষ্ঠতায় এবং 'লুইস থিয়েটারে' প্রায়ই অভিনয় দর্শনে যুবক গিরিশচন্দ্রের নাট্যপ্রতিভা স্ফুরিত হইয়া থাকে। তৎপরে কলিকাতায় আগত লব্ধপ্রতিষ্ঠ বহু বিলাতী থিয়েটারে সেক্সপীয়রের শ্রেষ্ঠ নাটকগুলির অভিনয় দেখিয়া তিনি পাশ্চাত্য নাট্যকলায় বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করেন। সেই অভিজ্ঞতায় ও স্বভাবপ্রদত্ত নাট্যপ্রতিভায় তিনি 'ম্যাক্‌বেথে'র শিক্ষাদানে এবং স্বয়ং ম্যাক্‌বেথের ভূমিকা অভিনয় করিয়া প্রতিপন্ন করেন বাঙ্গালীর দ্বারা বাঙ্গালা ভাষাতেও বিলাতের সুবিখ্যাত অভিনেতৃগণের ন্যায় রস সৃষ্টি করা যায়। নাটকের প্রত্যেক ভূমিকাই সুন্দর এবং নির্দোষভাবে অভিনীত হইয়াছিল।

অর্দ্ধেন্দুশেখর পাঁচটী বিভিন্ন রসের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া অসাধারণ অভিনয়-চাতুর্য্যের পরিচয় দিয়াছিলেন। সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য স্বর্গীয়া তিনকড়ি দাসীর লেডী ম্যাক্‌বেথের অভিনয়। বিলাতের বড়-বড় শিক্ষিতা অভিনেত্রী যে ভূমিকা অভিনয় করিতে ভীতা হন, সেই ভূমিকা এক নগণ্যা অশিক্ষিতা বাঙ্গালী স্ত্রীলোকের দ্বারা অভিনয় যে একেবারেই অসম্ভব, ইহাই শিক্ষিত সমাজের ধারণা ছিল, কিন্তু তিনকড়ি তাহার অসামান্য অধ্যবসায় এবং গিরিশচন্দ্রের অদ্ভুত শিক্ষা-প্রভাবে তাঁহাদের সেই ভ্রান্ত ধারণা দূর করিয়াছিলেন।

গিরিশচন্দ্রের আশ্চর্য্য শিক্ষাদান ও অভিনয়-কৌশল এবং তাঁহার অদ্ভুত অনুবাদ-শক্তির পরিচয় পাইয়া কি শত্রু, কি মিত্র উভয়পক্ষই বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়াছিলেন। এমনকি, যাহারা গিরিশচন্দ্রের একান্ত পক্ষপাতী, তাঁহাদেরও আশ্চর্য্যের সীমা ছিল না। এইসময় হইতেই তিনি বিদ্বজ্জন সমাজে ইংরাজী সাহিত্যে সুপণ্ডিত বলিয়াসমাদৃত হন।

'ইংলিশম্যানে'র সম্পাদক অভিনয় দর্শনে লেখেন, "A Bengali Thane of Cawdor is a lively suggestion of incongruity, but the reality is an admirable reproduction of all the conventions of an English stage." অর্থাৎ বাঙ্গালী ম্যাক্‌বেথ একটী হাসির কথা, কিন্তু যাহা হইয়াছে, তাহা ইংরাজী ষ্টেজের অভিনয়-নিপুণতার আশ্চর্য্য অনুকরণ। স্বর্গীয় গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় 'ম্যাক্‌বেথ' অভিনয় দেখিবার নিমিত্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া সাধারণ বঙ্গ-রঙ্গালয়ে এই প্রথম আগমন করেন। গিরিশচন্দ্রের অভিনয় এবং তাঁহার অনুবাদ এই উভয় শক্তিরই অপূর্ব্ব লীলা-বিকাশ দেখিয়া ভূয়সী প্রশংসা করিয়া যান। ভূতপূর্ব্ব 'ইণ্ডিয়ান নেসন' পত্রিকার

সম্পাদক, মেট্রোপলিটন ইনিষ্টিটিউসনের প্রিন্সিপাল, পণ্ডিতপ্রবর স্বর্গীয় এন. ঘোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, "সেক্সপীয়ারের 'ম্যাক্‌বেথ' নাটক, ফরাসী ভাষায় সুন্দররূপ অনুবাদিত হইয়াছে, কিন্তু গিরিশবাবুর অনুবাদ তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট।" 'ক্লাসিক থিয়েটারে' যৎকালে 'ম্যাক্‌বেথে'র পুনরভিনয় হয়, সে সময়ে হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতিদ্বয় মহামান্য চন্দ্রমাধব ঘোষ ও গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবিখ্যাত কে. জি. গুপ্ত এবং সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার পি. এল. রায় একযোগে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, "To translate the inimitable language of Shakespeare was a task of no ordinary difficulty; but Babu Girish Chandra Ghose has performed that difficult task very creditably on the whole, and his translation is in many places quite worthy of the original."

স্বর্গীয় মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহোদয় বলিয়াছিলেন, "গিরিশবাবুর অনুবাদের এই বিশেষত্ব দেখিলাম, যে-যে স্থানে অনুবাদ করা অতীব দুরূহ, সেই-সেই স্থানে তাঁহার শক্তিমত্তা সমধিক প্রকাশ পাইয়াছে।"

'ম্যাক্‌বেথ' অভিনয়ে নাট্যশিল্পের বহু উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। গিরিশচন্দ্র বিখ্যাত চিত্রকর উইলিয়ার্ড সাহেবকে নিযুক্ত করিয়া, সমস্ত চিত্রপট অঙ্কিত করাইয়াছিলেন। তাঁহার অঙ্কিত 'ড্রপ সিন' যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন, এরূপ দৃশ্যপট পূর্ব্বে তাঁহারা আর কখনও দেখেন নাই।* এই 'ড্রপ সিনের' বিশিষ্টতা ছিল এই – water colour-এর painting যেন oil painting-এর মতন দেখাইত। প্রসিদ্ধ রূপ-সজ্জাকর পিম সাহেবকে নিযুক্ত করিয়া গিরিশচন্দ্র আধুনিক রঙ্গালয়ে সাজসজ্জা-নৈপুণ্যেরও অনেক উৎকর্ষসাধন করিয়াছিলেন।

যেরূপ অক্লান্ত পরিশ্রম, অধ্যবসায় এবং যথেষ্ট অর্থব্যয়ে এই নাটক অভিনীত হইয়াছিল, আর্থিক হিসাবে কিন্তু সেরূপ ফললাভ হয় নাই। শিক্ষিত সমাজে ইহার কতকটা আদর হইলেও দর্শকসাধারণের মন 'ম্যাক্‌বেথ' আকৃষ্ট করিতে পারে নাই। তাঁহাদের চিরপরিচিত পৌরাণিক বা সামাজিক নাটকের পরিবর্ত্তে এই রুদ্ররসাত্মক বিলাতী নাটক তেমন রুচিকর হইল না। ক্রমশঃ বিক্রয় হ্রাস হইতে থাকায় নাটকের অভিনয় বন্ধ হইল। সেই সঙ্গে গিরিশচন্দ্রের একে-একে সেক্সপীয়রের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাটকগুলির বঙ্গানুবাদ-বাসনা মন হইতে বিলীন হইল। বঙ্গদেশের দুর্ভাগ্য, তাই বঙ্গ-নাট্যশালার নাট্যকারগণকে সাধারণ শ্রোতার মুখ চাহিয়া নাটক লিখিতে হয়। গিরিশচন্দ্রের অল্প-আয়াস-রচিত 'আবু হোসেন' কৌতুক-গীতিনাট্যের অভিনয়কালীন দর্শকবৃন্দের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত মহা উল্লাসে হাস্য ও করতালি ধ্বনিতে রঙ্গালয় কম্পিত হইতে দেখিয়া, 'ম্যাক্‌বেথ'-অনুবাদক 'আবু হোসেনে'র রচয়িতা হইয়াও সাধারণ দর্শকের রুচি দর্শনে ক্ষুব্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন, "নাটক দেখিবার যোগ্যতালাভে ইহাদের এখনও বহু

* ১৩২৯ সাল ১লা কার্ত্তিক, বুধবার 'মিনার্ভা থিয়েটার' ভস্মীভূত হয়। সেই সঙ্গে এই দৃশ্যপটখানিও চিরদিনের জন্য লুপ্ত হয়।

বৎসর লাগিবে, নাটক বুঝিবার সাধারণ দর্শক এখনও বাঙ্গালায় তৈয়ারী হয় নাই। পেশাদার থিয়েটার প্রতিষ্ঠানে আমার যে আপত্তি ছিল—ইহাও তাহার একটী কারণ।"

'মুকুল-মুঞ্জরা'

২৪শে মাঘ (১২৯৯ সাল) রবিবার, 'মিনার্ভা থিয়েটারে' গিরিশচন্দ্রের 'মুকুল-মুঞ্জরা' নাটক প্রথম অভিনীত হয়।* প্রথমাভিনয় রজনীর অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ :

অচ্যুতানন্দ	অঘোরনাথ পাঠক।
জয়ধ্বজ	পণ্ডিত শ্রী হরিভূষণ ভট্টাচার্য্য।
চন্দ্রধ্বজ	শ্রীযুক্ত চুণীলাল দেব।
বীরসেন	শ্রীযুক্ত ঠাকুরদাস চট্টোপাধ্যায় (দাসুবাবু)।
মুকুল	শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু)।
ক্ষিতিধর	শ্রীযুক্ত নিখিলেন্দ্রকৃষ্ণ দেব।
সুষেণ	শ্রীযুক্ত নীলমণি ঘোষ।
বরুণচাঁদ	অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী।
মন্ত্রী	কুমুদনাথ সরকার।
ভজনরাম	বিনোদবিহারী সোম (পদবাবু)
তারা	তিনকড়ি দাসী।
মুঞ্জরা	শ্রীমতী কুসুমকুমারী।
চামেলী	হরিসুন্দরী (বিড়াল)।
পান্না	শ্রীমতী হরিদাসী (টল)। ইত্যাদি।

* সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসুর সৌজন্যে 'মিনার্ভা থিয়েটার' হইতে প্রকাশিত এই সপ্তাহের একখানি পুরাতন হ্যাণ্ডবিল পাইয়াছি। গিরিশচন্দ্রের 'হ্যাণ্ডবিল' লিখিবার বিশিষ্টতা ছিল বিনা আড়ম্বরে বক্তব্য প্রকাশ। পাঠকগণের কৌতূহল নিবারণার্থে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম :

"মিনার্ভা থিয়েটার, ৬নং বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা। শনিবার, ২৩শে মাঘ ১২৯৯ সাল, রাত্রি ৯ ঘটিকা। ম্যাক্‌বেথ (তৃতীয় অভিনয় রজনী)। I have freely availed myself of European aid in mounting and dressing the piece with strict adherence to time and place. সুযোগ্য ইংরাজ চিত্রকর দ্বারা চিত্রপটগুলি চিত্রিত ও ইংরাজ তত্ত্বাবধানে পরিচ্ছদ প্রস্তুত।

খুলিয়া কালের দ্বার, আছে যার অধিকার, দেখ আসি চিত্র পরিচ্ছদ।
উচ্চ কাব্য অভিনয়, যদি কারু প্রাণে লয়, বিকাশ হইবে তার চিত্ত-কোকনদ।

It is hoped that the patronage kindly accorded to me on two precious occasions, may not be withdrawn this time. আমার উৎসাহদাতাগণ দুইবার (অর্থাৎ 'ন্যাসান্যাল' ও 'ষ্টার থিয়েটার' প্রতিষ্ঠার সময়) যেরূপ উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন, ভরসা করি এবারও সেইরূপ করিবেন।

'মুকুল-মুঞ্জরা' আদিরসাত্মক দৃশ্যকাব্য। প্রকৃত প্রেম কাহাকে বলে, প্রকৃত প্রেমিক-প্রেমিকার লক্ষণ কি—প্রেমের কিরূপ অদ্ভুত শক্তি, গিরিশচন্দ্র তাঁহার অসামান্য কবি-প্রতিভায় সেই ছবি এই নাটকে নিখুঁতভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন। প্রেমালোকে জড়েরও কুঞ্চিত হৃদয়-কমল যে পূর্ণবিকশিত হইতে পারে, এই নাটকে মুকুলের চরিত্রে তাহা অতি সুন্দররূপ প্রস্ফুটিত হইয়াছে। তারা, যুবরাজ এবং মুঞ্জরার প্রেম-চরিত্রও বড়ই বৈচিত্র্যময়, ইহা বিলাতী আদর্শে গঠিত উপন্যাসের প্রেমিক-প্রেমিকার চিত্র নহে—খাঁটি এ দেশের জিনিষ।

নূতন নাটকের প্রত্যেক অভিনেতা ও অভিনেত্রীর নিখুঁত ছবি প্রায় দেখা যায় না, কিন্তু এই নাটকের পাত্রপাত্রীগণ কি আকৃতি-প্রকৃতি—কি বয়স হিসাবে এরূপ সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াছিলেন, যে অভিনয়-সাফল্যে কোন চরিত্রেরই উচ্চ-নিম্ন বিচার করিবার সুযোগ ছিল না,—সকলেই স্ব-স্ব চরিত্র অতি কৃতিত্বের সহিত অভিনয় করিয়াছিলেন। বরুণচাঁদ ও ভজনরামের হাস্যরস দর্শকসাধারণের এতটা মুখরোচক হইয়াছিল যে বহুদিন ধরিয়া তাহাদের ভূমিকার সরস 'বুকনি' নাট্যামোদিগণের মুখে-মুখে চলিয়াছিল। "ছড়ায় এত ভালবাসা কোথায় পায়?", "(আমায়) বিলিয়ে দিতে চাও কি প্রাণসই?", "কেন ফুল ফোটে কে জানে!" প্রভৃতি 'মুকুল-মুঞ্জরা' নাটকের গানগুলি সঙ্গীতপ্রিয়গণের মুখে এখনও শুনা যায়।

সৌন্দর্য্যসৃষ্টির সুবিকাশে এই নাটকখানি গিরিশচন্দ্রের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাটকগুলির মধ্যে স্থান পাইয়াছে। 'বঙ্গবাসী'-সম্পাদক রায়সাহেব স্বর্গীয় বিহারীলাল সরকার-লিখিত 'জন্মভূমি' মাসিকপত্রিকায় (ফাল্গুন ১২৯৯ সাল) এই নাটকের পনের পৃষ্ঠা-ব্যাপী এক দীর্ঘ সমালোচনা বাহির হইয়াছিল। নিম্নে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম:

"'মুকুল-মুঞ্জরা' নাটকখানি চরিত্রে, ঘটনা-বৈচিত্র্যে এবং নাট্যমঞ্চের প্রকৃত ফলোপধায়ক কার্য্যকারিত্বে পরিপূর্ণ। ভাষা, ভাব, শিল্প, সৌন্দর্য্য, কবিত্ব, কাব্যের বরণীয় বিষয়মাত্রের সবিশেষ বিকাশ 'মুকুল-মুঞ্জরা'য়। নাট্যসঙ্গত তদীয় লিপি-কৌশল অতি সুন্দর।...'মুকুল-মুঞ্জরা'য় গিরিশবাবুকে অন্যান্য নাট্যকার হইতে অনেক স্বতন্ত্র করিয়া ফেলিয়াছে, এবং 'মুকুল-মুঞ্জরা'য় গিরিশবাবুকে সহজে বুঝিয়া লওয়া যায়। 'মুকুল-মুঞ্জরা' বাক্-বিন্যাসের, ঘাত-প্রতিঘাতের এবং কল্পনা-উদ্ভাবকতার উচ্চতম আদর্শ। রহস্য ও সৌন্দর্য তীব্রভাবে এবং উজ্জ্বলরাগে উচ্ছ্বসিত ও উদ্ভাসিত। মানব চরিত্রের

পরদিন রবিবার, ২৪শে মাঘ, ১২৯৯ সাল, সন্ধ্যার সময়—শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ (অধীন) নূতন মিলনান্ত নাটক—মুকুল-মুঞ্জরা। প্রথম অভিনয় রজনী। I have exerted my best as usual in making this new piece acceptable to an appreciative public, not only by mounting and dressing it suitably, but by thoroughly rehearsing the Company, so as to justify the hope of a favorable reception. সাবিনয় নিবেদন,—যথাযোগ্য দৃশ্যপট ও পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিয়াছি। যথাসাধ্য সম্প্রদায়কে শিক্ষা দিয়াছি। ভরসা করি, দর্শকবৃন্দ নিজগুণে আমার এ নব উদ্যমে উৎসাহ প্রদান করিবেন। Sheer anxiety to appear before the public with new books by way of variety compels me to substitute *Mukul Munjara* for *Macbeth* on Sunday, notwithstanding the favorable reception of the latter.
G. C. Ghosh, Manager."

গভীরতানুভব করিবার শক্তি গিরিশবাবুর কিদৃশী এবং রহস্য-রসাবতরণে বিজয়লাভ করিবার ক্ষমতা তাঁহার কতদূর, 'মুকুল-মুঞ্জরা'য় তাহা স্পষ্টীকৃত হইয়াছে।"

'আবু হোসেন'

১৩ই চৈত্র (১২৯৯ সাল) 'মিনার্ভা থিয়েটারে' গিরিশচন্দ্রের কৌতুকপূর্ণ 'আবু হোসেন' গীতিনাট্য প্রথম অভিনীত হয়। প্রথমাভিনয় রজনীর অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ :

আবুহোসেন	অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী।
হারুণ-অল-রসিদ	দাসুবাবু [ঠাকুরদাস চট্টোপাধ্যায়]।
উজীর	পদবাবু [বিনোদবিহারী সোম]।
মশুর	রাণুবাবু [শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়]।
১ম বৈতালিক	অঘোরনাথ পাঠক।
২য় বৈতালিক ও খোস্‌বোওয়ালা	তিতুরাম দাস।
পাগলগণ	পণ্ডিত শ্রী হরিভূষণ ভট্টাচার্য্য, কুমুদনাথ সরকার, পদবাবু, রাণুবাবু ও শ্রীযুক্ত নীলমণি ঘোষ।
বিচারপ্রার্থী পুরুষগণ	শ্রীযুক্ত চুণীলাল দেব, শ্রীযুক্ত নিবারণ-চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও অনুকূলচন্দ্র বটব্যাল ওরফে অ্যাজাস।*
হাকিম	কৃষ্ণলাল চক্রবর্ত্তী।
ইমাম	কুমুদনাথ সরকার।
মেওয়াওয়ালা	শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
রোশেনা	হরিসুন্দরী (বিড়াল)।
বেগম	শ্রীমতী বসন্তকুমারী (ভূষণকুমারীর ভগ্নী)।
আবু হোসেনের মাতা	গুল্‌ফম হরি [মতী দাসী]।
দাই	তিনকড়ি দাসী।
১মা সখী	শ্রীমতী কুসুমকুমারী।
বিচারপ্রার্থিনী স্ত্রীদ্বয়	শ্রীমতী হেমন্তকুমারী ও শ্রীমতী হরিদাসী (টল)। ইত্যাদি।

* 'ম্যাক্‌বেথ' নাটকে Angus-এর ভূমিকা অভিনয় করিয়া অনুকূলবাবু সাধারণের নিকট 'অ্যাজাস' নামে পরিচিত হন।

আরব্যোপন্যাসের একটী গল্প অবলম্বনে গিরিশচন্দ্র সম্পূর্ণ নূতন ভঙ্গিতে এই কৌতুকপূর্ণ গীতিনাট্যখানি রচনা করেন। গিরিশচন্দ্রের এই অপূর্ব্ব রচনা-চাতুর্য্যের উপর সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত দেবকণ্ঠ বাগচী এবং সুপ্রসিদ্ধ নৃত্যশিক্ষক স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (রাণুবাবু) ইহাতে সুর এবং নৃত্য সংযোজনায় বিশেষরূপ নূতনত্ব প্রকাশ করায়, 'আবু হোসেন' দর্শকমণ্ডলীর নিকট এক অপূর্ব্ব জিনিষ হইয়া উঠিয়াছিল। আজি পর্য্যন্ত 'আবু হোসেন' চির নূতন হইয়া নাট্যামোদিগণকে আনন্দ প্রদান করিতেছে। দাই ও মশুরের দ্বৈত-সঙ্গীত ও নৃত্যের মৌলিকতায় এবং চমৎকারিত্বে তিনকড়ি দাসী ও রাণুবাবু রঙ্গমঞ্চে এক অপূর্ব্ব রসের বন্যা ছুটাইয়াছিলেন। 'আবু হোসেনে'র অনুকরণে এ পর্য্যন্ত রঙ্গালয়ে বহুসংখ্যক গীতিনাট্যের সৃষ্টি হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে। এই গীতিনাট্যের গানগুলি যেমনি চটকদার সেইরূপ কবিত্বপূর্ণ। দুইখানি গীত উদ্ধৃত করিতেছি :

১ম। আবু হোসেনের নিদ্রাভঙ্গে সখিগণ :—

"জুট্‌লো অলি ফুট্‌লো কত ফুল।
দোলে হায় ধীর পবনে সৌরভে আকুল ॥
ঝর্ ঝর্ ঝর্‌ছে শিশির, যেন সোনায় গাঁথা মালা মতির,
পাখীর তানে প্রাণে হানে তীর,
আকাশে উষা হাসে, জলে কমলকুল ॥"

২য়। রোশেনার প্রতি সখিগণ :—

"একে লো তোরা ভরা যৌবন।
রসে করেছে অবশ, আবেশে ঢলে নয়ন ॥
ঘোর বিরহ-বিকার তাতে, জোর ক'রেছে নারীর ধাতে,
বাই কুপিতে সরল মন মাতে,—
ভরা হৃদি, গুরু উরু—বিষম কুলক্ষণ।"

"রাম রহিম ন জুদা করো দিল্‌কি সাঁচ্চা রাখো জী!" গানখানি বোধহয়, এরূপ বাঙ্গালী নাই যে শুনেন নাই।

আবু হোসেনের ভূমিকা গ্রহণে স্বর্গীয় অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী মহাশয় দেশব্যাপী সুযশ অর্জ্জন করিয়াছিলেন। এই তরল হাস্যরসাত্মক গীতিনাট্যের ভিতরেও গিরিশচন্দ্রের প্রতিভার বিকাশ পাইয়াছে পাগলাগারদের দৃশ্যে। সহিত্যিক, ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক প্রভৃতি পাগলদের চিত্র বিশেষরূপ উপভোগ্য।

'আবু হোসেনে'র অভিনয়ে 'মিনার্ভা থিয়েটার' সর্ব্বসাধারণের নিকট যেরূপ সমাদৃত হইয়াছিল, সেইরূপ অজস্র অর্থাগমে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছিল।

'সপ্তমীতে বিসর্জন'

২২শে আশ্বিন (১৩০০ সাল) 'মিনার্ভা থিয়েটারে' গিরিশচন্দ্রের 'সপ্তমীতে বিসর্জন' পঞ্চরং প্রথম অভিনীত হয়। প্রথমাভিনয় রজনীর অভিনেতা ও অভিনেত্রী-গণ:

মামা	অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী।
গোঁসাই	পণ্ডিত শ্রী হরিভূষণ ভট্টাচার্য্য।
গোবর্দ্ধন (কাপ্তেনবাবু)	পদবাবু [বিনোদবিহারী সোম]।
উকীল ও প্যালারাম	কুমুদনাথ সরকার।
সাতকড়ি ও দালাল	শ্রীযুক্ত গোবর্দ্ধনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
বলরাম	শ্রীযুক্ত দেবকণ্ঠ বাগচী।
যাত্রার দলের অধিকারী	পূর্ণচন্দ্র বসু।
আদালতেব বেলিফ	অ্যাঙ্গাস [অনুকূলচন্দ্র বটব্যাল]।
ওয়ারেণ্টের আসামী ও ধনী	কৃষ্ণলাল চক্রবর্ত্তী।
বিরাজ	তিনকড়ি দাসী।
বিরাজের মাতা	গুলফম হরি [মতী দাসী]।
রেবতী	ভবতারিণী।
যশোদা	দাসুবাবু [ঠাকুরদাস চট্টোপাধ্যায়]।
কৃষ্ণ	টল হরি [দাসী]।
রাধিকা	ভূষণকুমারী। ইত্যাদি

পূজার বাজাবে কাপ্তেনবাবুদেব অবস্থা বর্ণনা করিয়া এই সামাজিক শ্লেষাত্মক পঞ্চরংখানি লিখিত। ইংরাজীতে যাহাকে Extravaganza বলে, ইহা সেই প্রকৃতিব। ইহা সম্বন্ধে অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। সামাজিক নাটক বাস্তব সংসারে ঘটনা ও চরিত্র লইয়া রচিত হয়, এইরূপ বিদ্রূপাত্মক প্রহসনের গল্প এবং চবিত্র সম্ভব-রাজ্যের প্রান্তসীমা হইতে আহৃত হইয়া থাকে—ইহার সকলই উচ্ছৃঙ্খল।

'জনা'

৯ই পৌষ (১৩০০ সাল) গিরিশচন্দ্রের 'জনা' পৌরাণিক নাটক 'মিনার্ভা থিয়েটারে' প্রথম অভিনীত হয়। প্রথমাভিনয় রজনীর অভিনেতৃগণ:

নীলধ্বজ	পণ্ডিত শ্রী হরিভূষণ ভট্টাচার্য্য।
প্রবীর	শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু)।
অগ্নি ও ভৈরব	অঘোরনাথ পাঠক।
বিদূষক	অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী।

শ্রীকৃষ্ণ	রাণুবাবু [শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়]।
মহাদেব ও ভীম	দাসুবাবু [ঠাকুরদাস চট্টোপাধ্যায়]।
অর্জ্জুন	শ্রীযুক্ত চুণীলাল দেব।
বৃষকেতু	কৃষ্ণলাল চক্রবর্ত্তী।
অনুশাল্ব ও উলুক	অ্যাজাস [অনুকূলচন্দ্র বটব্যাল]।
১ম গঙ্গারক্ষক	পদবাবু [বিনোদবিহারী সোম]।
২য় গঙ্গারক্ষক	শ্রীযুক্ত গোবর্দ্ধনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
কাম	শ্রীমতী হরিদাসী (টল)।
মন্ত্রী	শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
সেনাপতি ও পাণ্ডব-দূত	শ্রীযুক্ত নীলমণি ঘোষ।
সেনানায়ক	বিজয়কৃষ্ণ বসু।
প্রবীরের দূত	মাণিকলাল ভট্টাচার্য্য।
জনা	তিনকড়ি দাসী।
স্বাহা ও রতি	শ্রীমতী শরৎকুমারী।
মদনমঞ্জরী	ভূষণকুমারী।
বসন্তকুমারী	শ্রীমতী কুসুমকুমারী।
নায়িকা	ভবতারিণী।
ব্রাহ্মণী ও গঙ্গা	হরিমতী (গুলফম)। ইত্যাদি।

মহাভারতের অশ্বমেধ-পর্ব্বান্তর্গত 'জনা'র উপাখ্যান লইয়া এই নাটকখানি রচিত। এরূপ নবরসের সম্মিলন, বঙ্গ-নাট্যসাহিত্যে বড়ই বিরল। 'জনা' ও 'পাণ্ডব-গৌরব' গিরিশচন্দ্রের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পৌরাণিক নাটক। জনার মাতৃত্ব ও বিদূষকের ভক্তি-রসে নাটকখানি সমুদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে।

একদিকে গিরিশচন্দ্র যেইরূপ প্রধান চরিত্রগুলির শিক্ষাদান করিতেন, অন্যদিকে সেইরূপ অন্যান্য ভূমিকাগুলির শিক্ষাদানে অর্দ্ধেন্দুবাবু এক-একটী সজীব ছবি খাড়া করিয়া দিতেন। উভয়ের সহযোগিতায় 'মিনার্ভা থিয়েটারে'র প্রত্যেক বহিগুলিই নিখুঁতভাবে অভিনীত হইয়া আসিতেছিল। নাট্যসম্পদে 'জনা' যেরূপ অতুলনীয়, ইহার প্রত্যেক ভূমিকাও সেইরূপ জীবন্তভাবে অভিনীত হইয়াছিল। পরলোকগতা তিনকড়ি দাসী লেডী ম্যাকবেথের পর জনার ভূমিকা অভিনয় করিয়া অভিনেত্রীগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা বলিয়া অভিহিতা হইয়াছিলেন।

অধিকাংশ সংস্কৃত নাটকে বিদূষক-চরিত্র পেটুক, সরল ও রাজার প্রণয়-মন্ত্রীরূপে বিচিত্র হইয়াছে,—কিন্তু গিরিশচন্দ্র এই চরিত্রে শ্লেষচ্ছলে ভক্তিভাব মিশাইয়া অতীব উজ্জ্বল এবং পরম উপভোগ্য করিয়া তুলিয়াছেন। এ চরিত্র কি দেশী কি বিলাতী কোন নাটকেই এ পর্য্যন্ত দেখা যায় নাই। পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন মহাশয় ১৩৩১ সালে, 'ষ্টার থিয়েটারে' আহূত গিরিশচন্দ্র-স্মৃতিসভার সভাপতি হইয়া, গিরিশচন্দ্রের বিদূষক-চরিত্রসৃষ্টির অসমান্ত নৈপুণ্য বিষয়ে এইভাবেই মন্তব্য প্রকাশ

করিয়াছিলেন। মর্ম্মস্পর্শী এবং নাটকীয় বিচিত্র রসে গীতরচনায় গিরিশচন্দ্র চিরদিনই সিদ্ধহস্ত ছিলেন। 'আবু হোসেনে'র ন্যায় 'জনা'র গীতগুলিও সাধারণে বহুপ্রচারিত হইয়া পড়ে। 'সাহিত্য'-সম্পাদক স্বর্গীয় সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয়ের পরম প্রিয় নীলধ্বজ-রাজ্যে শ্রীকৃষ্ণের আগমনে বালকগণের কৃষ্ণ-লীলার গীতখানি 'জনা' হইতে উদ্ধৃত করিলাম :

"ঘরে কি নাইকো নবনী —
কেন অমন ক'রে পরের ঘরে চুরি করিস নীলমণি ?
ওরে, ক্ষিদে যদি পায়, মা ব'লে ডেকো রে আমায়,
সইবে কেন পরে,কত কথা ব'লে যায় !
ওরে, পথে জুজু আছে ব'সে, যেও না যাদুমণি।
খেতে ব'সে ছড়িয়ে ফেলে দাও,
মুখে তুলে খাইয়ে দিলে কইরে যাদু খাও ?
মন্দ বলে — তবু কেন পরের বাড়ি যাও ?
ওরে, ঘরে কি মোর মন ওঠে না, মিষ্টি কি পরের ননী ?"

আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার চিরপ্রিয় এই নাটক সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার ভার সমালোচকগণের হস্তে অর্পণ করিয়া আমরা আর-একটী প্রয়োজনীয় কথার উল্লেখে 'জনা'-প্রসঙ্গ শেষ করিব।

অর্দ্ধেন্দুবাবু বিদুষকের ভূমিকাভিনয়ে যথেষ্ট সুখ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু কয়েক রাত্রি অভিনয় করিয়া তিনি 'মিনার্ভা থিয়েটার' পরিত্যাগকরতঃ 'এমারেল্ড থিয়েটার' ভাড়া লইয়া স্বয়ং স্বত্বাধিকারী হইয়া থিয়েটাব পরিচালনে প্রবৃত্ত হন।*

* পাঠকগণ পঞ্চত্রিংশ পবিচ্ছেদে জ্ঞাত আছেন, গোপাললালবাবুর সখ মিটিয়া গেলে তিনি তাঁহার 'এমারেল্ড থিয়েটার', পণ্ডিত শ্রী হরিভূষণ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, মতিলাল সুর এবং ব্রজনাথ মিত্র — এই চাবিজনকে লিজ (ভাড়া) দেন। ইঁহাবা বৎসবাবধি থিয়েটাব চালাইবাব পর গোপালবাবু পুনরায় থিয়েটার নিজহস্তে লইযা সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার স্বর্গীয় মনোমোহন বসু মহাশয়কে ডাইরেক্টার ও স্বর্গীয় কেদারনাথ চৌধুরী মহাশয়কে ম্যানেজার করিয়া থিয়েটার চালাইতে থাকেন। কয়েক বৎসর নানাভাবে থিয়েটার পবিচালিত হইবার পব ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দেব জুন মাস হইতে স্বর্গীয় মহেন্দ্রলাল বসু এবং সুপ্রসিদ্ধ গীতি-নাট্যকার স্বর্গীয় অতুলকৃষ্ণ মিত্র মহাশযদ্বয় 'এমারেল্ডে'র লিজ গ্রহণ কবেন। ইঁহাদেব সময়ে অতুলবাবু কর্ত্তৃক নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত 'বিষবৃক্ষ', 'কপালকুণ্ডলা', 'মাধবীকঙ্কণ' প্রভৃতি সুখ্যাতির সহিত অভিনীত হইযাছিল। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে ইঁহাদেব লিজ ফুরাইলে অর্দ্ধেন্দুবাবু আসিযা 'লেসি' হইলেন; কিন্তু তিনি নাট্যবিশারদ হইলেও ব্যবসায়ী ছিলেন না, স্বয়ং থিয়েটার চালাইতে গিয়া ঋণের দায়ে অবশেষে তাঁহার বসতবাটীখানি পর্য্যন্ত বিক্রয় হইয়া যায়।

'বঙ্গীয় নাট্যশালায় নটচূড়ামণি স্বর্গীয় অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী' নামক পুস্তিকায় গিরিশচন্দ্র অর্দ্ধেন্দুবাবু সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :

"যখন শ্রীযুক্ত নাগেন্দ্রভূষণ মুখোপাধ্যায মিনার্ভা থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত করেন, তখন আমি ও অর্দ্ধেন্দু পুনর্ব্বার একত্রিত হই। মধ্যে তিনি নানা স্থান ভ্রমণ করেন। মিনার্ভার প্রথম অভিনয় 'ম্যাক্‌বেথ' — ইহাতে অর্দ্ধেন্দু Porter, Witch, Old man ও Doctor এই চারিটী অংশ গ্রহণ করেন। এই অভিনয়ে তাঁহার পূর্ব্ব-প্রতিষ্ঠা পুনরুদ্দীপ্ত হইল। পরে আবুহোসেনে 'আবুহোসেন', মুকুল-মুঞ্জরায়

গিরিশচন্দ্রকে বাধ্য হইয়া স্বয়ং বিদূষকের ভূমিকা লইয়া রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইতে হয়। অনেকে সন্দেহ করিয়াছিলেন অর্দ্ধেন্দুবাবু বিদূষকের অভিনয়ে যেরূপ হাস্যরসের সৃষ্টি করিতেন, গিরিশচন্দ্র বোধহয় সেরূপ পারিবেন না, কিন্তু গিরিশচন্দ্র অর্দ্ধেন্দুবাবুর অনুসরণ না করিয়া বিদূষকের ছবি বদলাইয়া দিলেন। তিনি অর্দ্ধেন্দুবাবুর তরল হাস্যের পরিবর্ত্তে গাম্ভীর্য আনিয়া serio-comic জিনিসটি কি—দর্শকগণকে অভিনয় করিয়া বুঝাইয়া দেন। গিরিশচন্দ্রের অভিনয়ে বাহ্যিক হাস্যরসের আবরণে বিদূষকের অন্তর্নিহিত ভক্তি-রসধারার আস্বাদনে দর্শকমণ্ডলী যেরূপ পুলকিত সেইরূপ বিস্মিত হইয়া উঠিলেন। 'জনা'র অভিনয় আরও সতেজে চলিতে লাগিল।

'বড়দিনের বখ্‌সিস'

১০ই পৌষ (১৩০০ সাল) 'মিনার্ভা থিয়েটারে' গিরিশচন্দ্রের 'বড়দিনের বখ্‌সিস' পঞ্চরংখানি সর্ব্বপ্রথম অভিনীত হয়। প্রথমাভিনয় রজনীর অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ:

পরিমন্ত্রী	পণ্ডিত শ্রী হরিভূষণ ভট্টাচার্য্য।
নজর	বাপুবাবু [শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়]।
পুঁটে মিত্র	পদবাবু [বিনোদবিহারী সোম]।
গয়ারাম	অঘোরনাথ পাঠক।
মিঃ ডস	শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু)।
ভুলু বাবা	হেমন্তকুমারী।

'বরুণচাঁদ', জনায় 'বিদূষক' প্রভৃতি অভিনয়-দক্ষতায় নবশ্রেণীর দর্শক চমৎকৃত ও প্রত্যেক নাট্যামোদীর মুখে অর্দ্ধেন্দুর ভূয়সী ব্যাখ্যা। জনার 'বিদূষক' দুই চারি রজনী অভিনয়ের পর তিনি স্বয়ং স্বত্বাধিকারী হইয়া থিয়েটার চালাইবেন—এই অভিপ্রায়ে এমারেল্ড থিয়েটার ভাড়া লইলেন। কতকগুলি অভিনেতাও তাঁহার থিয়েটারে যোগদান করিলেন। এইটী অর্দ্ধেন্দুর জীবনে একটী ভ্রম। তিনি অভিনেতা ছিলেন, বিষয়ী ছিলেন না। তিনি শিক্ষা দিতে জানিতেন, কিন্তু কিরূপে সকল দিক সামঞ্জস্য রাখিয়া থিয়েটার চালাইতে হয়, তাহা জানিতেন না। যথা নূতন নাটকের অভিনয়ের তারিখ বিজ্ঞাপিত হইয়াছে, সকলকে বিশেষ শিক্ষা দিবার প্রয়োজন, বড় বড় অংশ, যাহাতে সর্ব্বাঙ্গীণ পুষ্ট হয়, তাহার বিশেষ চেষ্টা আবশ্যক; কিন্তু অর্দ্ধেন্দু কোন এক ক্ষুদ্র অংশ ভাল হয় নাই, তাহা কিরূপে সম্পূর্ণ হইবে, তাহারই জন্য বিব্রত। যাহারা বড় অংশ গ্রহণ করিয়াছে, তাহারা শিক্ষা গ্রহণের জন্য উৎসুক হইলে বিরক্ত, ক্ষুদ্র অভিনেতা কোনওরূপে শিখিতেছে না, অর্দ্ধেন্দু তাহাকে কোনরূপে শিখাইবেনই। যদি কোনও অভিনয়-শিক্ষালয় থাকিত, যথায় ছাত্রেরা শিক্ষিত হইয়া রঙ্গালয়ে প্রবেশ করিবে, তাঁহার এরূপ শিক্ষাদান প্রশংসার হইত, কিন্তু রঙ্গালয়-কার্য্য চালাইতে হইবে, অভিনয়-রাত্রি বিজ্ঞাপিত হইয়াছে, এখন আর সময় অপব্যয় করিবার নয়, ইহা তিনি শিখাইবার জেদে অল্প বুঝিতেন। তাঁহার কার্য্যে কেহ বাধা দিলে অতিশয় বিরক্ত হইতেন, নিখুঁত না হইলে সে অভিনেতার নিস্তার নাই। এরূপ কার্য্যের ফলাফল তিনি স্বয়ং থিয়েটার করিয়া অল্পদিনের মধ্যেই বুঝিয়াছিলেন। এইপ্রকার নানা বিষয়ে কার্য্যের উপযোগিতা তিনি বুঝিতেন না, এ নিমিত্ত ঋণগ্রস্ত হইয়া তিনি থিয়েটার রাখিতে পারিলেন না।" (২৯ ও ৩০ পৃষ্ঠা)

প্রেমদাস	দাসুবাবু [ঠাকুরদাস চট্টোপাধ্যায়]।
শ্যামধন ঘোষ	খগেন্দ্রনাথ সরকার।
থিয়েটারের ম্যানেজার	অর্দ্ধেন্দুশেখর মস্তফী।
পরিরাণী	আসমানি।
গুলজার	তিনকড়ি দাসী
মিসেস হাজরা ও ভেট্‌কিমাছওয়ালী	টল হরি [দাসী]।
মিসি বাবা	শ্রীমতী হিঙ্গনবালা (হেনা)।
প্রেমদাসী	গুল্‌ফম হরি [সতী দাসী]।
ফুলকপি ও ফুলওয়ালী	ভূষণকুমারী।
লেবুওয়ালী	শরৎকুমারী। ইত্যাদি।

বড়দিন উপলক্ষ্যে 'বেকুবের একুজাই' (Paradise of Fools) নাম দিয়া প্রথমে এই পঞ্চরংখানির অভিনয় ঘোষিত হয়। কিন্তু কোনও বিশেষ কারণে পুলিস হইতে বহিখানি পাস হয় নাই। বড়দিনের তখন পাঁচ-ছয়দিন মাত্র বাকী। গিরিশচন্দ্র তাড়াতাড়ি ইহার কতকটা কাটিয়া-ছাঁটিয়া কতকটা বা বাড়াইয়া 'বড়দিনের বখ্‌সিস' নাম দিয়া, পঞ্চরংখানি পুনরায় খাড়া করেন এবং পুলিস হইতে পাস করাইয়া বড়দিনের মান রাখেন। এখানিও 'সপ্তমীতে বিসর্জ্জন' পঞ্চরং-এর অনুরূপ।

'স্বপ্নের ফুল'

২রা অগ্রহায়ণ (১৩০১ সাল) গিরিশচন্দ্রের 'স্বপ্নের ফুল' গীতিনাট্য 'মিনার্ভা থিয়েটারে' প্রথম অভিনীত হয়। প্রথমাভিনয় রজনীর অভিনেতৃগণ :

ধীর	শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (রাণুবাবু)।
অধীর	শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু)।
মনহরা	তিনকড়ি দাসী।
মনথরা	শ্রীমতী হিঙ্গনবালা (হেনা)।
যূথী	শ্রীমতী কুসুমকুমারী।
বেলা	ভূষণকুমারী। ইত্যাদি।

এখানি একখানি রূপক গীতিনাট্য। প্রেম ইহার বিষয়, কিন্তু যে প্রেম সম্বন্ধে মধুসূদন লিখিয়াছেন :

"যে যাহারে ভালবাসে, সে যাইবে তার পাশে,
মদন-রাজার বিধি লঙ্ঘিব কেমনে ?
যদি অবহেলা করি, রুষিবে শম্বর-অরি,
কে সম্বরে স্মর-শরে এ তিন ভুবনে ?"

এই গীতিনাট্যের বিষয়ীভূত প্রেম সে প্রেম নহে। এ প্রেম অর্থে ভোগ নয় আত্মত্যাগ। ভোগলুব্ধ বাস্তব সংসারে এই নিঃস্বার্থ ভালবাসাই স্বপ্নের ফুল। আনন্দে ইহার সৃষ্টি। গ্রন্থের আরম্ভেই মনহরারূপে মহমায়ার আবির্ভাব এবং তাহার প্রথম উক্তি "ফুটলো কলি নয়ন-জল ঢেলে।"

গিরিশচন্দ্র বহুপূর্ব্বে 'কমলে কামিনী' নাটকে (২য় অঙ্ক, ১ম গর্ভাঙ্কের ক্রোড়াঙ্ক) এই প্রেমের আভাস দিয়াছেন। সেখানেও চণ্ডী, সহচরী পদ্মাকে বলিতেছেন:

"না ঝরিলে নয়নের জল,
না ফোটে কমল,
প্রেমে কমলিনী পানে—
না চায় চৈতন্য রবি।"

কেবল 'কমলে কামিনী'তে নয়, অন্যান্য নাটকেও এ আভাস আমরা পাইয়া থাকি। এ অশ্রু—আনন্দাশ্রু।

এই গীতিনাট্যেরনায়ক দুইটী—ধীরএবং অধীর, নায়িকাওদুইটী—যূথী এবং বেলা। ইহাদের সাংসারিক পরিচয় নাই, জিজ্ঞাসা করিলে বলে, "আমরা স্বপ্নের মানুষ, স্বপ্নে কথা কই, স্বপ্নে দেখা দিই, ঘুম ভাঙ্গলেই চলে যাই।" ধীর—উদাসী, নারী-বিরাগী, অধীর—অনুরাগী। কিন্তু উভয়ের প্রকৃতিগত এই বিষম বৈষম্য থাকিলেও পরস্পরের স্বার্থশূন্য সৌখ্যে পরস্পরে আবদ্ধ। নায়িকাযুগলেরও অনুরূপ ভাব। স্বার্থশূন্য সৌহার্দ্দ্যের বন্ধনে উভয়ে বাঁধা। নামে আকৃষ্ট হইয়া ইহারা সকলেই নগরপ্রান্তের উপবনে স্বপ্নের ফুল দেখিবার জন্য সমাগত। উপবন রমণীয়, রাত্রি রম্যতরা, মদন আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, শর প্রয়োগ করিলেন। কিন্তু শরে আহত হইল কেবল বেলা, যূথী ও অধীর। ধীর নারী-বিরাগী, সে সর্ব্বদাই বলে:

"সাবধান সাবধান, তোরে সদা বলি প্রাণ,
সাবধান কুটীল নয়না।
যদি দেবী মূর্ত্তি হয় চেও মাত্র রাঙ্গা পায়,
সাহসে বদন তুলে বদন দেখ না।"

অধীর এবং বেলা পরস্পরের প্রতি পরস্পরে প্রথম আকৃষ্ট হইল। যূথী ধীরের অনুরাগিণী, কিন্তু এ অনুরাগ নিষ্ফল, প্রতিদানবিহীন। অনঙ্গের সৃষ্ট এই অনুরাগ বৈজ্ঞানিক ভাষায় যাহাকে যৌন আকর্ষণ এবং প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন বলে, অবস্থানুসারে বিষের বিষে জর্জ্জরিত হয়। এইজন্য এই সম্ভোগমূলক অনুরাগের প্রথম আকর্ষণেই মনখরার আবির্ভাব। মনখরা বলিতেছে:

"পিরীত ক'রে আমার মনখরা,
তাইতে নাম নিয়েছি মনখরা,
... ...
জেলে দেব বিষের বাতি, দেখি যদি প্রেম করা।"

কিন্তু মহামায়া স্বয়ং যে স্বপ্নের ফুল পরিস্ফুট করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন,

মদনের সকল প্রয়াসই সেখানে নিষ্ফল। মানবের সংসার-প্রবৃত্তি মোহ হইতে উদ্ভূত। এই মোহ মানবকে জন্ম-জন্মান্তরেও পরিত্যাগ করে না, পূর্ব্বজন্মের সংস্কাররূপে তাহা সঙ্গে থাকে। ধীর সংসার-বাসনায় উদাসীন হইলেও তাহার মোহ সম্পূর্ণ কাটে নাই। সে মোহ স্বার্থশূন্য সৌহার্দ্দ্যের রূপ ধারণ করিলেও তাহা মোহ। মহামায়া তাহাকে বলিতেছেন :

"দিন গিয়েছে রাত হয়েছে, ফের হয়েছে ভোর।
ঠাউরে দেখ ছিটেফোঁটা যায়নি নেশার ঘোর॥"

অর্থাৎ জন্মের পর আবার জন্ম হইয়াছে, তোমার সংসার-বাসনা প্রবল না হইলেও 'ঠাউরে দেখ ছিটেফোঁটা যায়নি নেশার ঘোর'। স্বর্ণ-শৃঙ্খল হইলে কি হয়, এই নিঃস্বার্থ সৌহার্দ্দ্যও বন্ধন। মহামায়ার কৃপায় কিন্তু এই নিঃস্বার্থ সৌহার্দ্দ্য স্বার্থশূন্য প্রেমে পরিণত হইয়া মোহের বন্ধন মোচন করিয়া দিল।

অনঙ্গের সৃষ্ট অনুরাগ-বিরাগের সংঘর্ষে এই অপূর্ব্ব গীতিনাট্যের আখ্যানভাগ গঠিত হইয়াছে। যৌন আকর্ষণে ইহার বীজ বপন, সখাদ্বয় এবং সখীদ্বয়ের পরস্পরের জন্য স্বার্থত্যাগে ইহার অঙ্কুর, শাস্ত্র যাহাকে অমৃত বলিয়া আখ্যান দিয়াছে—এই গীতিনাট্যের পরিণাম ফল তাহাই—এক কথায় জীবন্মুক্তি। এই অমৃতত্বলাভের জন্য শাস্ত্রের উপদেশ—জপ, তপ, ধ্যান-ধারণা প্রভৃতি। কবির ইঙ্গিত স্বার্থশূন্য ভালবাসা—তুমি ভাল, তাই তোমায় ভালবাসি। মানব স্বভাবতঃ উদাসী, মহামায়ার কৌশলে নারী তাহাকে মোহমুগ্ধ করিয়া সংসারে আবদ্ধ করে। সে বন্ধন-মুক্তির উপায়—মহামায়া স্বয়ংই বলিয়া দিতেছেন,

"দেখ্‌লি, কেমন মোহের কাঁটা, প্রেমের কাঁটা দিয়ে উঠে গেল, এখন দুটোই ফেলে দে—

দুটো কাঁটা ফেলে দে দেখ্, সেই সেই সেই রে।
দেখ্ খুঁজে পেতে আর কি পাবি, আমি ত নেই রে॥"

ইহাই জীবন্মুক্তির ইঙ্গিত। পাঠক এইদিক দিয়া গীতিনাট্য আলোচনা করিলে ইহার রস সম্যক্ উপলব্ধি করিবেন।

'সভ্যতার পাণ্ডা'

১১ই পৌষ (১৩০১ সাল) গিরিশচন্দ্রের 'সভ্যতার পাণ্ডা' পঞ্চরং 'মিনার্ভা থিয়েটারে' প্রথম অভিনীত হয়। প্রথমাভিনয় রজনীর অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ :

পুরাতন বর্ষ	শ্রীযুক্ত গোবর্দ্ধনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
নূতন বর্ষ	রাণুবাবু [শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়]।
নীলকান্ত ও সেল মাষ্টার	অঘোরনাথ পাঠক।
পুরোহিত	রসিকচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

সৃষ্টিধর	দানিবাবু [সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ]।
শশীভূষণ	পণ্ডিত শ্রী হরিভূষণ ভট্টাচার্য্য।
দীনু	অক্ষয়কুমার চক্রবর্ত্তী।
সর্ব্বেশ্বর	ঠাকুরদাস চট্টোপাধ্যায় (দাসুবাবু)।
নসে ও বিডার	শ্যামাচরণ কুণ্ডু।
বদ্যিনাথ	শ্রীযুক্ত নিখিলেন্দ্রকৃষ্ণ দেব।
ক্রসমাস্	শ্রীযুক্ত নীলমণি ঘোষ।
খুদে বর	ভোনা [বিজয়কৃষ্ণ দাস]।
যুবা বর	মাণিকচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।
বেহারা	অটলবিহারী চক্রবর্ত্তী।
গর্দ্দভ	তিতুরাম দাস।
ভেড়া	জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ।
হাড়গিলে	শ্রীযুক্ত বামাচরণ সেন।
সভ্যতা	তিনকড়ি দাসী।
ভবতারিণী ও বৃদ্ধা	জগত্তারিণী।
বিশ্বেশ্বরী	গুল্‌ফম হরি [মতী দাসী]।
কুমুদিনী	হরিসুন্দরী (ব্ল্যাকী)। ইত্যাদি।

'সভ্যতার পাণ্ডা' ইহাও একখানি রূপক—পঞ্চরং। পূর্ব্ব-পূর্ব্ব পঞ্চরং-এর ন্যায় ইহাও সামাজিক শ্লেষাত্মক নব্যসভ্যতার চিত্র। এইসকল বিদ্রূপরসাত্মক রচনার মধ্য দিয়া আমরা জাতীয় ধর্ম্ম, আচার ও অনুষ্ঠান এবং প্রাচীন সভ্যতার উপর গিরিশচন্দ্রের প্রগাঢ় ভক্তি ও অনুরাগের পরিচয় পাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ সভ্যতার গীতখানি উদ্ধৃত করিলাম :

"আমার মুখে হাসি, চোখে ফাঁসী ভুবনমোহিনী।
মাদকতা, প্রবঞ্চনা চিরসঙ্গিনী॥
অনাচার—আমার কণ্ঠহার,
দাসী হ'য়ে চরণ সেবা করে ব্যভিচার,
আমি মধুমাখা কথা ক'য়ে, আগে ভোলাই কামিনী॥
হৃদাসনে সযতনে পূজি অহংকার,
সে যে প্রাণপতি আমার,
আমার হৃদয়রতন, যতনের ধন, জোর করি তো তার,
আমি তার গরবে গরবিনী, আদরে আদরিণী॥"

বর্ত্তমান সমাজে হিন্দুর সেই প্রাচীন সভ্যতা, নিষ্ঠা, আচার প্রভৃতি কিরূপ পশুভাবে একাধিপত্য করিতেছে, এ প্রহসনে তাহা পশুশালার দৃশ্যে উজ্জ্বলভাবে চিত্রিত হইয়াছে। সমাজের উপর প্রভাব বিস্তার করুক বা নাই করুক, জাতীয় যুগ কবি প্রতিভার উদ্দীপনায় সময়ের এইরূপ চিত্র অঙ্কিত করিয়া থাকেন। পাশ্চাত্য সভ্যজাতির ইতিহাসেও তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়। রঙ্গমঞ্চের এই চিত্র সমাজের

তাৎকালিক গতি, মতি, প্রকৃতি, প্রবৃত্তি প্রভৃতির নির্ণয়ে ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকগণকে সহায়তা করিবে। এইজন্যই জাতীয় রঙ্গমঞ্চ যুগধর্ম্মের দর্পণ বলিয়া কথিত হয়।

গিরিশচন্দ্র ইহাতে যেরূপ অতি সুন্দর ষড়ঋতুর ছয়খানি গান রচনা করিয়াছিলেন, সেইরূপ বহু অর্থব্যয়ে বিলাতি 'প্যানোরামা' প্রবর্ত্তন করাইয়া ষড়ঋতুর আশ্চর্য্য দৃশ্য প্রদর্শনে রঙ্গমঞ্চের চিত্রশিল্পের উন্নতিসাধন করেন।

'করমেতি বাঈ'

৫ই জ্যৈষ্ঠ (১৩০২ সাল) 'মিনার্ভা থিয়েটারে' গিরিশচন্দ্রের ভক্তি ও জ্ঞানমূলক 'করমেতি বাঈ' দৃশ্যকাব্যখানি প্রথম অভিনীত হয়। প্রথম অভিনয় রজনীর অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ:

শ্রীকৃষ্ণ	শ্রীমতী কুসুমকুমারী।
রাজা	শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ সরকার।
মন্ত্রী	শ্রীযুক্ত বামাচরণ সেন।
পরশুরাম	শ্রীযুক্ত গোবর্দ্ধনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
আলোক	শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু)।
আগমবাগীশ	পণ্ডিত শ্রী হরিভূষণ ভট্টাচার্য্য।
টুকরো	অক্ষয়কুমার চক্রবর্ত্তী।
দেমো	শ্রীযুক্ত নীলমণি ঘোষ।
বৈদ্য	বিজয়কৃষ্ণ বসু।
রাধিকা	ভূষণকুমারী।
কৃত্তিকা	জগত্তারিণী।
করমেতি	তিনকড়ি দাসী।
অম্বিকা	গুল্‌ফম হরি [মতী দাসী]। ইত্যাদি।

'ভক্তমাল' গ্রন্থের উপাখ্যান লইয়া এই নাটকখানি রচিত। গিরিশচন্দ্র তাঁহার অসামান্য প্রতিভাবলে এই ভক্তিরসাত্মক উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া একদিকে সরস ভক্তিতত্ত্ব এবং অন্যদিকে কঠোর বৈদান্তিক তত্ত্বের সংঘর্ষে একখানি অতীব হৃদয়গ্রাহী ও মর্ম্মস্পর্শী নাটকের সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহার সকল চরিত্রই পরিস্ফুট, কিন্তু অভিনয় সেরূপ সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই।

যে উদীয়মান অভিনেতার 'চণ্ড', 'ম্যাকবেথ' ও 'মুকুল-মুঞ্জরা' নাটকে রঘুদেবজী, ম্যাকম ও মুকুলের ভূমিকাভিনয়ে নাট্যপ্রতিভার বীজ এবং 'জনা'য় প্রবীরের ভূমিকাভিনয়ে অঙ্কুর দেখা দিয়াছিল, বর্ত্তমান নাটকে আলোকের ভূমিকাভিনয়ে সেই প্রতিভা বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল;—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু) এই ভূমিকায় প্রাণস্পর্শী অভিনয়ে নাট্যামোদীমাত্রেরই পরমপ্রীতিভাজন হইয়াছিলেন। আগমবাগীশ,

টুকরো, মেমো ও অম্বিকার অভিনয়ে রঙ্গমঞ্চ প্রবল হাস্যরসে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু যাহাকে লইয়া নাটক—সেই নায়িকার ভূমিকায় ভক্তিরসের পূর্ণবিকাশ হয় নাই। যে তিনকড়ি দাসী লেডী ম্যাক্‌বেথ ও জনার ভূমিকাভিনয়ে আশাতীত সুযশ অর্জ্জন করিয়াছিলেন, করমেতির ভূমিকাভিনয়ে তাঁহার প্রতিভার পূর্ণ অভিব্যক্তি হয় নাই। লেডী ম্যাক্‌বেথের ভূমিকা কঠোর বাস্তবের চিত্র, জনার মাতৃচরিত্র বাস্তবের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া ক্রমে-ক্রমে কল্পনা-রাজ্যে উন্নীত হইয়াছে, কিন্তু করমেতির প্রথম হইতেই একটা স্বপ্নাচ্ছন্ন ভাব এবং সেই স্বপ্ন যেখানে বাস্তবে পরিণত হইল সেখানে কল্পনার চরম বিকাশ। এরূপ চরিত্রের অভিনয় তিনকড়ি দাসীর ধাতুগত নহে। শিক্ষা কিংবা চেষ্টার অভাব না হইলেও মূল অভিনেত্রীর এই প্রধান ত্রুটীতেই নাটকখানি সাধারণের সেরূপ তৃপ্তিদায়ক হয় নাই। 'করমেতি বাঈ' যে দীর্ঘকাল রঙ্গমঞ্চ অধিকার করিয়া থাকিতে পারে নাই, ইহা তাহার প্রথম কারণ। দ্বিতীয় কারণ, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ মীরাবাঈ প্রভৃতির চরিত্র-চিত্রে অভ্যস্ত, কিন্তু বঙ্গদেশে সতীত্ব এবং স্বামী-ভক্তির ধারণা ভিন্নরূপ। যে দেশে স্বামীকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর অপেক্ষা উচ্চাসন প্রদান করে, সে দেশের স্বামীর পরিবর্ত্তে শ্যামের প্রতি অনুরাগ সাধারণের হৃদয়গ্রাহী হইতে পারে না।

'ফণির মণি'

১১ই পৌষ (১৩০২ সাল) 'মিনার্ভা থিয়েটারে' গিরিশচন্দ্রের 'ফণির মণি' গীতিনাট্য প্রথম অভিনীত হয়। প্রথম অভিনয় রজনীর অভিনেতৃগণ :

রাজা	পণ্ডিত শ্রী হরিভূষণ ভট্টাচার্য্য।
সৌরভকুমার	অনুকূলচন্দ্র বটব্যাল (অ্যাজাস)।
চিৎকুমার	শ্রীযুক্ত গোবর্দ্ধনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
বিরাগ	শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু)।
বাহার	নীরদচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
ফক্‌রে	শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু।
ধাঙড়	শ্যামাচরণ কুণ্ডু।
দূতদ্বয়	বিজয়কৃষ্ণ বসু ও মানিকচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।
শিখা	তিনকড়ি দাসী।
বিমলা	শ্রীমতী পুঁটুরাণী।
বারি	ভূষণকুমারী।
ফক্‌রের মা	ক্ষেত্রমণি।
ধাঙড়-কন্যা	শ্রীমতী কুসুমকুমারী।
বেদিনী	শ্রীমতী হরিসুন্দরী (ব্ল্যাকী)। ইত্যাদি।

রেভারেণ্ড লালবিহারী দে-কর্ত্তৃক অনুবাদিত *Folk Tales of Bengal* নামক পুস্তক হইতে এই গীতিনাট্যের উপাদান সংগৃহীত। প্রত্যেক অভিনেতা ও অভিনেত্রীর অভিনয়-নৈপুণ্যে 'ফণির মণি' দর্শক-মণ্ডলীর নিকট বিশেষ প্রশংসিত হইয়াছিল। সুবিখ্যাত নৃত্যশিক্ষক শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু 'সভ্যতার পাণ্ডা'য় ভালুকের নৃত্যগীতে দর্শকগণের প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, এই গীতিনাট্যে ফকুরের ভূমিকায় তিনি হাস্যরসের উচ্চ তরঙ্গ তুলিয়া সাধারণের নিকট যথেষ্ট বাহবা পান। ধাঙড়-কন্যা এবং বেদিনীর ভূমিকায় শ্রীমতী কুসুমকুমারী ও শ্রীমতী হরিসুন্দরী নৃত্য-গীতে সুযশলাভ করিয়াছিলেন। বেদিনীর "এনেছি ভাতার ধরা ফাঁদ" গানখানির প্রথম রজনীতে চারি-পাঁচবার 'এনকোর' হইয়াছিল। ফলতঃ 'ফণির মণি' গীতিনাট্যে শ্রেষ্ঠ প্রশংসালাভ করিয়াছিলেন এই ব্ল্যাকী হরি।

নাট্যশিল্পী ধর্ম্মদাসবাবু-প্রদর্শিত জলটুঙির দৃশ্যে দর্শকগণ মুগ্ধ হইয়াছিলেন। রাণুবাবু কিছুদিন পূর্ব্বে থিয়েটার পরিত্যাগ করায় শ্রীযুক্ত গোবর্দ্ধনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই গীতি-নাট্যে নৃত্যশিক্ষাদানে উচ্চ প্রশংসালাভ করেন। অভিনয় এবং নৃত্য-শিক্ষকতায় গোবর্দ্ধনবাবু কিরূপ নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, তৎ-সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্রের মন্তব্য আমরা তাঁহারই লিখিত 'রঙ্গালয়ে নেপেন' পুস্তিকা হইতে উদ্ধৃত করিলাম :

"রাণুবাবু মিনার্ভা ত্যাগ করিলেন। রসসাগর অর্দ্ধেন্দুশেখরও প্রতিদ্বন্দ্বী থিয়েটার স্থাপন করিয়াছেন। মিনার্ভায় অর্দ্ধেন্দুশেখরের 'মুকুল-মুঞ্জরা'য় বরুণচাঁদের ভূমিকায় ও 'আবু হোসেনে' আবু হোসেনের ভূমিকা গ্রহণ করিতে কেহই সাহস করে না। নৃত্য-শিক্ষকের স্থানও অপূর্ণ। এইসময় নাট্যানুরাগী শ্রীমান গোবর্দ্ধন বন্দ্যোপাধ্যায় রাণুবাবুর স্থান পূরণ ও রসরাজ অর্দ্ধেন্দুর উক্ত দুই অংশ গ্রহণ করিয়া যোগ্যতার সহিত মিনার্ভার মান রক্ষা করিলেন। তাঁহার নৃত্যকলা-বিদ্যা-বলে 'ফণির মণি', 'পাঁচ ক'নে' প্রভৃতি গীতিনাট্য ও পঞ্চরং দর্শকমনোহারী হইয়াছিল। শ্রীমান গোবর্দ্ধন এক্ষণে মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহোদয়ের আনুকূল্যে কাশিমবাজারে স্থাপিত রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষ-পদে নিযুক্ত। সাধারণ রঙ্গালয়ে গোবর্দ্ধনের অভাব অদ্যাবধি অপূর্ণ রহিয়াছে।"

'ফণির মণি' উত্তরকালে 'ক্লাসিক থিয়েটারে'ও উচ্চ প্রশংসার সহিত অভিনীত হইয়াছিল।

'পাঁচ ক'নে'

২২শে পৌষ (১৩০২ সাল) গিরিশচন্দ্রের 'পাঁচ ক'নে' পঞ্চরং 'মিনার্ভা থিয়েটারে' প্রথম অভিনীত হয়। প্রথমাভিনয় রজনীর অভিনেতৃগণ :

কালাচাঁদ	অক্ষয়কুমার চক্রবর্ত্তী।
অমূল্য	দানিবাবু [সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ]।
নসীরাম	শ্যামাচরণ কুণ্ডু।

শান্তিরাম	পণ্ডিত শ্রী হরিভূষণ ভট্টাচার্য্য।
লক্ষ্মীচরণ	শ্রীযুক্ত চুনীলাল দেব।
নিধিরাম ও ওজনদার	শ্রীযুক্ত নিখিলেন্দ্রকৃষ্ণ দেব।
সিদ্ধেশ্বর	অ্যাজাস [অনুকূলচন্দ্র বটব্যাল]।
বিশ্বেশ্বর	পদবাবু [বিনোদবিহারী সোম]।
মেদো ও ভট্টাচার্য্য	মাণিকলাল ভট্টাচার্য্য।
হীরে	বিজয়কৃষ্ণ দাস (ভোনা)।
উড়ে	তিতুরাম দাস।
টহলদার	শ্রীযুক্ত গোবর্দ্ধনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
দোকানী	শ্রীযুক্ত নৃসিংহচন্দ্র মিত্র।
ধাঙড়	বিজয়কৃষ্ণ বসু।
সাহেব	অটলবিহারী চক্রবর্ত্তী।
বর	শরচ্চন্দ্র দাস।
সত্য ও বিপিনকুমারী	তিনকড়ি দাসী।
ত্রেতা	ভূষণকুমারী।
দ্বাপর	ব্ল্যাকী হরি [সুন্দরী]।
কলি এবং কাঠকুড়ানী	শ্রীমতী কুসুমকুমারী।
বনবিহারিণী	শ্রীমতী হেমন্তকুমারী (বড়)।
মাতঙ্গিনী	শ্রীমতী জগত্তারিণী।
গিন্নী ও বাঙ্গালনী	গুলফম হরি [মতী দাসী]।
উড়েনী	ক্ষেত্রমণি।
ভিখারিণী বালিকা	পানি। ইত্যাদি।

ইহাও একখানি শ্লেষাত্মক সামাজিক পঞ্চরং 'সভ্যতার পাণ্ডা'য় এইজাতীয় প্রহসন সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছি। সুতরাং এ পুস্তক সম্বন্ধে নূতন করিয়া আর-কিছু বলিবার আবশ্যক নাই। তবে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগের চারিখানি বিভিন্ন রসাত্মক গীত ইহাতে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উড়েনী, কাঠকুড়ানী, বাঙ্গালনী ও ভিখারিণী বালিকার গানগুলিও বড়ই বৈচিত্র্যময়।

'বেজায় আওয়াজ'

'মিনার্ভা থিয়েটারে' যে কয়েকখানি পঞ্চরং অভিনীত হইয়াছিল, তন্মধ্যে সুসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু-প্রণীত 'বেজায় আওয়াজ' (Royal Salute) পুস্তকখানিই বিশেষভাবে সমাদরলাভ করিয়াছিল। তাহার কারণ বোধহয়, বাঙ্গালী দর্শক যাহা চায়, এই পুস্তকে পঞ্চরং-এর ঘটনা ক্ষুদ্র একটী গল্পের শৃঙ্খলে গ্রথিত হইয়াছিল।

ইহার অধিকাংশ গীতই গিরিশচন্দ্র বাঁধিয়া দেন। দেবেন্দ্রবাবু 'মিনার্ভা থিয়েটারে'র প্রথমাবধি তাঁহার সহকারী ছিলেন।

পুরাতন নাটকের অভিনয়

নাগেন্দ্রবাবুর 'মিনার্ভা থিয়েটারে' 'পাঁচ ক'নে'ই গিরিশচন্দ্রের নূতন পুস্তক। এতদ্ব্যতীত 'মিনার্ভা'য় তিনি 'সধবার একাদশী', 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস', 'দক্ষযজ্ঞ', 'পলাশীর যুদ্ধ', 'প্রফুল্ল', 'মেঘনাদবধ' প্রভৃতি বহু পূর্ব্বাভিনীত নাটকের পুনরভিনয় ঘোষণা করিয়া নিমচাঁদ, কীচক, দক্ষ, ক্লাইভ, যোগেশ, রাম ও ইন্দ্রজিৎ প্রভৃতির ভূমিকাগ্রহণে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস' 'মিনার্ভা'য় পুনরভিনয়কালীন স্বর্গীয় অঘোরনাথ পাঠক প্রথমে কীচকের ভূমিকা অভিনয় করেন। এই ভূমিকায় অশ্লীলতার আভ্রাণ পাইয়া পুলিস-কমিশনার নাটকের অভিনয় বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। অনেক যুক্তি দেখাইয়া এবং দুই-এক স্থল কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়া গিরিশচন্দ্র ইহার উদ্ধারসাধন করেন এবং স্বয়ং কীচকের ভূমিকা অভিনয় করিয়া নাট্যামোদিগণকে পূর্ণানন্দ প্রদান করেন। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু) বৃহন্নলার ভূমিকাভিনয়ে অসামান্য নাট্যপ্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনকড়ি দাসী, পণ্ডিত হরিভূষণ ভট্টাচার্য্য এবং শ্রীযুক্ত গোবর্দ্ধনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্রৌপদী, ভীম এবং উত্তরের চরিত্রাভিনয়ও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

'মিনার্ভা'য় অভিনীত 'প্রফুল্ল' নাটক সম্বন্ধে ২৪৩ পৃষ্ঠায় সবিস্তৃত লিখিত হইয়াছে। এ নিমিত্ত এ স্থলে আর কিছু লেখা হইল না।

'মেঘনাদবধে'র অভিনয় যেরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল,—তৎ-সঙ্গে নাট্যশিল্পী ধর্ম্মদাসবাবু-প্রদর্শিত স্বর্গ ও নরকের অপূর্ব্ব দৃশ্যে এবং গোবর্দ্ধনবাবুর নৃত্য-সংযোজনার নূতনত্বে নাটকখানি আরও চমকপ্রদ হইয়া উঠিয়াছিল। 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস', 'প্রফুল্ল' এবং 'মেঘনাদবধ' অভিনয়ে নূতন নাটকের ন্যায় 'মিনার্ভা থিয়েটারে' প্রচুর অর্থাগম হইয়াছিল।

'মিনার্ভা'র সহিত বিচ্ছেদ

প্রায় চারি বৎসর 'মিনার্ভা থিয়েটার' সগৌরবে পরিচালিত করিয়া গিরিশচন্দ্র থিয়েটার পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। স্বত্বাধিকারী নাগেন্দ্রভূষণবাবু স্বল্প মূলধন লইয়াই নূতন নাট্যশালা প্রতিষ্ঠায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। নাট্যশালা সম্পূর্ণ করিতে এবং 'ম্যাকবেথ' ও 'মুকুল-মুঞ্জরা'র দৃশ্যপট ও পোষাক-পরিচ্ছদ প্রস্তুত এবং অন্যান্য

নানা কারণে তাঁহাকে বিস্তর টাকা ঋণ করিতে হইয়াছিল।

অভিনেতা ও অভিনেত্রী নিয়োগ, পদচ্যুতি বা তাহাদের বেতনবৃদ্ধি ইত্যাদি ক্ষমতা গিরিশচন্দ্রের হস্তে ন্যস্ত ছিল। টিকিট বিক্রয় ও টাকাকড়ি সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্য নাগেন্দ্রভূষণবাবুর উপর ছিল। গিরিশচন্দ্রের সহিত তাহার কোনওরূপ সম্বন্ধ ছিল না।

থিয়েটারের আয় যথেষ্ট হইতে লাগিল, কিন্তু ব্যয় অপরিমিত, ঋণ পরিশোধের প্রতি লক্ষ্য নাই। এইরূপে কয়েক বৎসর মধ্যে নাগেন্দ্রবাবু দুশ্ছেদ্য ঋণজালে জড়িত হইয়া পড়িলেন। থিয়েটারের বিক্রয়ের হ্রাস নাই, কিন্তু আয়ের সমস্ত অর্থই সুদ গ্রাস করিতে থাকে। অবশেষে বাধ্য হইয়া তিনি থিয়েটারের অর্দ্ধাংশ শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ দাস নামক জনৈক যুবককে বিক্রয় করেন।

যাঁহারা থিয়েটারের সাজ-সরঞ্জাম সরবরাহ করিতেন, তাঁহারা তাঁহাদের প্রাপ্য নিয়মিতরূপে না পাওয়ায় অতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিলেন, কিন্তু গিরিশচন্দ্রের মুখ চাহিয়া তখনও তাঁহারা সরবরাহ করিতেন। ক্রমে যখন তাঁহাদের পাওনা অত্যন্ত অধিক হইয়া পড়িল, তখন তাঁহারা গিরিশচন্দ্রের কাছে আসিয়া কাঁদাকাটি আরম্ভ করিলেন। এরূপ অবস্থায় তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, তিনি স্বয়ং ক্যাসের দায়িত্ব লইয়া শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়কে পাওনাদারদের সহিত একটা বন্দোবস্ত করিয়া লইবার ভার দিলেন। কিন্তু এরূপ বন্দোবস্ত প্রথম স্বত্বাধিকারী নাগেন্দ্রভূষণবাবুর মনোনীত হইল না, গিরিশচন্দ্রের সৎপরামর্শ গ্রহণে তিনি শৈথিল্য প্রদর্শন করিতে লাগিলেন, ইহাই গিরিশচন্দ্রের 'মিনার্ভা থিয়েটার' পরিত্যাগের প্রধান কারণ। তিনি এবং দেবেন্দ্রবাবু সর্ব্বাগ্রে থিয়েটার পরিত্যাগ করেন; পরে অন্যান্য অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণের মধ্যে অধিকাংশই ইঁহাদের অনুসরণ করেন। 'মিনার্ভা'র সুগঠিত দল এইরূপে ভাঙ্গিয়া গেল।

গিরিশচন্দ্রের 'মিনার্ভা' ত্যাগ-সংবাদ প্রচার হইবামাত্র, 'ষ্টার থিয়েটারে'র স্বত্বাধিকারিগণ সেই রাত্রেই গিরিশচন্দ্রের বাটীতে আসিয়া, যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও ভক্তি-প্রদর্শনে তাঁহাকে নিজ সম্প্রদায়ের নাট্যাচার্য্যরূপে বরণ করিয়া লইয়া যান। 'বীণা থিয়েটার' পরিচালনে ঋণগ্রস্ত হইয়া কবিবর স্বর্গীয় রাজকৃষ্ণ রায় 'ষ্টার থিয়েটারে' আসিয়া নাট্যকার হইয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বে তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় তাঁহাদের নাটক লিখিবার লোক ছিল না, গিরিশচন্দ্রকে লইয়া তাঁহাদের সে অভাব দূর হইল।

উনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

'ষ্টারে' পুনরায় গিরিশচন্দ্র

এবার 'ষ্টার থিয়েটারে' আসিয়া গিরিশচন্দ্র ম্যানেজারের পদগ্রহণে অসম্মত হওয়ায় "নাট্যাচার্য্য" (Dramatic Director) বলিয়া তাঁহার নাম ঘোষিত হয়। এই উপাধি বঙ্গ-নাট্যশালায় এই প্রথম প্রচলিত হয়। এখানে তাঁহার প্রথম নাটক 'কালাপাহাড়'।

'কালাপাহাড়'

১১ই আশ্বিন (১৩০৩ সাল) 'কালাপাহাড়' 'ষ্টার থিয়েটারে' প্রথম অভিনীত হয়। প্রথমাভিনয় রজনীর অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ :

কালাপাহাড়	অমৃতলাল মিত্র।
চিন্তামণি	গিরিশচন্দ্র ঘোষ।
মুকুন্দদেব	শ্রীযুক্ত অক্ষয়কালী কোঙার।
মন্ত্রী	বিষ্ণুচরণ দে।
বীরেশ্বর	শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মিত্র।
সলিমান	সুরেন্দ্রনাথ মিত্র (ফট্টাই)।
লাটু	শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু)।
দুলাল	শ্রীযুক্ত অসিতভূষণ বসু।*
জেল-দারোগা	নটবর চৌধুরী।
ফেরেব খাঁ	জীবনকৃষ্ণ সেন।
চঞ্চলা	প্রমদাসুন্দরী।
ইমান	শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা।
দোলেনা	শ্রীমতী নরীসুন্দরী।
মুরলার ছায়ামূর্ত্তি	গঙ্গা বাইজী ইত্যাদি।

* নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান অসিতভূষণ বসু দুলালের ভূমিকা লইয়া এই প্রথম রঙ্গমঞ্চে বাহির হন।

বাঙ্গালার নবাব সলিমানের সেনাপতিত্ব গ্রহণ করিয়া কালাপাহাড় উড়িষ্যাধিপতি মুকুন্দদেবকে সিংহাসনচ্যুত এবং জগন্নাথদেবের মূর্ত্তি দগ্ধ করেন, এই ঐতিহাসিক সত্যটুকু 'কালাপাহাড়' নাটকে থাকিলেও ইহাকে ঠিক ঐতিহাসিক নাটক বলা যায় না। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের অপূর্ব্ব গুরুভাব প্রকাশই ইহার প্রধান উপাদান। পাঠকগণ জ্ঞাত আছেন, প্রথমে গিরিশচন্দ্র নাস্তিক ছিলেন, মানুষকে গুরু বলিয়া তিনি বিশ্বাস করিতে চাহিতেন না, অবশেষে পরমহংসদেবের কৃপায় তিনি নবজীবন লাভ করেন। এই নাটকে বর্ণিত চিন্তামণি চরিত্র পরমহংসদেবের চরিত্রের ছায়ামাত্র অবলম্বন করিয়া গঠিত। গিরিশচন্দ্রের প্রথম ধর্ম্ম-জীবনে যে হৃদয়-দ্বন্দ্ব সূচিত হইয়াছিল, কালাপাহাড় চরিত্রে তাহার আভাস পাওয়া যায়, এই চরিত্র শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের প্রভাবে অনুকল্পিত। প্রেম, ভক্তি ও ভালবাসা যে ঈশ্বরলাভের প্রকৃষ্ট পন্থা —এই নাটকে গিরিশচন্দ্র তাহা উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন। ইহার অধিকাংশ চরিত্রেরই পরিণাম প্রেম, ভক্তি ও ভালবাসার বলে সংসার-যন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ।

প্রেম এবং ঈর্ষ্যার অপূর্ব্ব সংঘর্ষে এই নাটকের গল্প এবং চরিত্র অতি নিপুণভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। চঞ্চলা চরিত্রের ইহাই ভিত্তি এবং এই দুইটী পরস্পর-বিরোধীভাব সে তাহার মাতা-পিতা হইতে উত্তরাধিকার সূত্রে পাইয়াছিল। চঞ্চলা প্রেমে কুসুমকোমলা, আবার ঈর্ষ্যাজনিত প্রতিহিংসায় ভীষণা। বঙ্গ-নাট্যসাহিত্যে ইহা কবির একটী অপূর্ব্ব দান। চঞ্চলা এবং ইমানের চরিত্র দুইটী পাশাপাশি অঙ্কিত করিয়া গিরিশচন্দ্র স্বার্থমূলক এবং নিস্বার্থ প্রেমের সজীব ছবি অঙ্কিত করিয়াছেন। বীরেশ্বর গিরিশচন্দ্রের আর-একটী অপূর্ব্ব সৃষ্টি। ভগবানের নিকট কেহ শক্তি, কেহ-বা মুক্তি চায় এবং সেই শক্তিলাভ করিয়া স্বভাবতই তাহার অপব্যবহার করে। বীরেশ্বর তাহাই করিয়াছিল, পরিণামে পত্নীর অলৌকিক ভালবাসাই তাহার উদ্ধারের কারণ হয়।

এ নাটকে আর-একটী সুন্দর ভাব অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা জাতিনির্ব্বিশেষে ধর্ম্মানুরাগ এবং ঈশ্বর-প্রেম। পরমহংসদেব-কথিত সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়ের ইহা আভাসমাত্র। সকল চরিত্রের বিশদ সমালোচনা করিবার স্থানাভাব, নহিলে এই নাটকের প্রত্যেক চরিত্রের বিশ্লেষণ বাঞ্ছনীয়। আমরা দুই-একটী প্রধান চরিত্রের ইঙ্গিতমাত্র করিয়াই ক্ষান্ত হইলাম।

ভাবে-ভাষায়, নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাতে, চরিত্রের অভিব্যক্তিতে এবং সর্ব্বোপরি ধর্ম্মপ্রাণতায় এ নাটক কেবল বঙ্গ-সাহিত্যে কেন পাশ্চাত্ত্য নাট্যসাহিত্যেও তুলনাহীন। গভীর হৃদয়-রহস্যের এরূপ মর্ম্মস্পর্শী বিশ্লেষণ জগতের নাট্যসাহিত্যে বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। লৌকিক এবং অলৌকিক উভয়ের সমাবেশে এ নাটক যেমন রহস্যময় তত্ত্বপূর্ণ, তেমনই মনোজ্ঞ হইয়াছে। অসংশয়ে বলিতে পারা যায় এমন দিন আসিবে, যেদিন এই অপূর্ব্ব দৃশ্যকাব্য নাট্যজগতে আপনার যোগ্যস্থান অধিকার করিবে।

'কালাপাহাড়' অভিনয় দর্শনে, চঞ্চলার চরিত্রবিশেষ লক্ষ্য করিয়া সাহিত্যরস-রসিক, পণ্ডিতপ্রবর, সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয়

গিরিশচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন, "তোমার চরিত্রসৃষ্টি সব সেক্সপীয়রের মত, আশীর্ব্বাদ করি, তুমি চিরজীবী হও।" সহৃদয় রসজ্ঞ ব্যক্তির এই আন্তরিক আশীর্ব্বচন ব্যর্থ হইবে না, 'কালাপাহাড়' জাতীয় সাহিত্যে গিরিশচন্দ্রকে চিরজীবী করিয়া রাখিবে।

উত্তরকালে 'মনোমোহন থিয়েটারে' 'কালাপাহাড়' পুনরভিনীত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ (দানিবাবু) চিন্তামণির এবং শ্রীমতী তারাসুন্দরী চঞ্চলার ভূমিকাভিনয়ে বিশেষরূপ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

'হীরক জুবিলী'

৭ই আষাঢ় (১৩০৪ সাল) 'ষ্টার থিয়েটারে' 'হীরক জুবিলী' প্রথম অভিনীত হয়। প্রথমাভিনয় রজনীর অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ :

নট	অমৃতলাল মিত্র।
মাতাল	শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু)।
বঙ্গবাসী	মহেন্দ্রনাথ চৌধুরী।
পুরোহিত	হরিচরণ ভট্টাচার্য্য।
মুটে	শ্রীযুক্ত কালীনাথ চট্টোপাধ্যায়।
দ্বীপান্তর-প্রত্যাগত পুরুষ	জীবনকৃষ্ণ সেন।
শাড়ীওয়ালা	শশীভূষণ ঘোষ।
চুরিকাঁচিওয়ালা	আঙ্গুরবালা।
খবরের কাগজওয়ালা	শ্রীমতী সরযূবালা।
ফুলওয়ালী	বসন্তকুমারী।
খিলিওয়ালী	শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা।
চুটকিওয়ালী	গঙ্গা বাইজী। ইত্যাদি।

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ষাট বৎসর রাজ্যকাল পূর্ণ হওয়ায় 'ডায়মণ্ড জুবিলী' উৎসব উপলক্ষ্যে 'নটের রাজভক্তি উপহার'স্বরূপ এই গীতিনাট্যখানি রচিত হয়।

পুস্তকখানি ক্ষুদ্র, মহারাণীর গুণকীর্ত্তন ইহার প্রধান লক্ষ্য হইলেও গিরিশচন্দ্রের স্বদেশপ্রাণতা এবং জাতীয়তা এই নাটিকার পত্রে-পত্রে ছত্রে-ছত্রে পরিস্ফুট হইয়াছে। 'হীরক জুবিলী' রঙ্গে-ব্যঙ্গে এবং রসতরঙ্গে দর্শকগণের বিশেষ উপভোগ্য হওয়ায় অনেকদিন ধরিয়া ইহার অভিনয় হইয়াছিল। সাময়িক চিত্র হইলেও তাৎকালিক অবস্থা বর্ণনায় ইহা সাহিত্যে চির আদরণীয় হইয়া থাকিবে।

বঙ্গবাসীর মুখ দিয়া মহারাণী ভিক্টোরিয়ার নিকট গিরিশচন্দ্র যে রাজনৈতিক আবেদন করাইয়াছেন, "তোমার শ্বেত সন্তানের সহিত মন্ত্রণা-গৃহে বসে ভারতের উন্নতি সাধন করবো।"—তাঁহার এ কল্পনা কালে যে অন্ততঃ কতক পরিমাণে কার্য্যে পরিস্ফুট হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

'পারস্য-প্রসূন'

২৭শে ভাদ্র (১৩০৪ সাল) 'ষ্টার থিয়েটারে' 'পারস্য-প্রসূন' প্রথম অভিনীত হয়
প্রথম অভিনয় রজনীর অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ :

হারুণ-উল-রসিদ	অঘোরনাথ পাঠক।
জাফের	ননিলাল দত্ত।
সুলতান মহম্মদ	মহেন্দ্রনাথ চৌধুরী।
এলফ্‌দল ও জেলে	হরিচরণ ভট্টাচার্য্য।
নুরুদ্দিন	শ্রীযুক্ত কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়।
এলমোইন	শ্রীযুক্ত অক্ষয়কালী কোঙার।
সেনজারা	শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মিত্র।
ইব্রাহিম	জীবনকৃষ্ণ সেন।
দালাল ও ইয়ারগণ	বিষ্ণুচরণ দে, ননিলাল দত্ত, হীরালাল দত্ত, আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়, শশীভূষণ ঘোষ
পারিসানা	শ্রীমতী নরীসুন্দরী।
আরসা	কামিনীমণি।
এনসানি	গঙ্গামণি বাইজী।
জেলেনী	শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা।
পরিচারিকা	নলিনী। ইত্যাদি।
সঙ্গীত-শিক্ষক	রামতারণ সান্ন্যাল।
নৃত্য-শিক্ষক	

আরব্যোপন্যাস যেরূপ 'আবু হোসেনে'র মূল ভিত্তি, 'পারস্য-প্রসূন' তদ্রূপ পারস্যোপন্যাসের গল্প অবলম্বনে রচিত। ইহার নায়ক নুরুদ্দিনের উদারতা, নায়িকা পারিসানার পতিপ্রাণতা, হারুণ-উল-রসিদের মহানুভবতা, এলমোইনের স্বার্থপরতা, সেনজারার সহৃদয়তা, ইব্রাহিমের ধর্ম্মের ভণ্ডামি ইত্যাদি নানা রসে 'পারস্য-প্রসূন' নাট্যামোদিগণের পরম প্রিয় হইয়াছিল। ইহার গানগুলির রচনা যেরূপ সুন্দর, সঙ্গীতাচার্য্য রামতারণবাবু-প্রদত্ত সুরসংযোগে সেইরূপ সুমধুর হইয়া উঠিয়াছিল। লব্ধপ্রতিষ্ঠ অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ কর্ত্তৃক 'পারস্য-প্রসূনে'র অভিনয় অতি সুন্দর হইয়াছিল। কোকিলকণ্ঠী গায়িকা শ্রীমতী নরীসুন্দরী পারিসানার ভূমিকাভিনয়ে উচ্চপ্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার বীণা-বিনিন্দিত স্বর-লহরীতে দর্শকমণ্ডলী মাতোয়ারা হইয়া উঠিতেন। স্বর্গীয় জীবনকৃষ্ণ সেন ভণ্ড ইব্রাহিমের জীবন্ত চিত্র প্রদর্শনে প্রবল হাস্যতরঙ্গে রঙ্গভূমি উচ্ছ্বসিত করিয়া তুলিতেন।

'সিটী', 'মিনার্ভা' ও 'মনোমোহন থিয়েটারে' 'পারিসানা' নাম দিয়া এই সরস গীতিনাট্যখানি বহুবার অভিনীত হয়। গীতিনাট্যে নাটকীয় চরিত্রের অবতারণ

'পারস্য-প্রসূনে'র বৈশিষ্ট্য। এই পুস্তকের মর্মস্পর্শী বহুসংখ্যক গীত হইতে আমরা দুইখানি পাঠকগণকে উপহার দিতেছি।

১ম। গোলাম-বাজারে বিক্রয়ের নিমিত্ত আনীতা পারিসানা :—

"যো লেওয়ে, সো পাওয়ে, দিল মেরি নেহি।
দরদি সহি, বেদরদি সহি ॥
মস্‌গুল হোকে, কই কদরসে গুল্‌কো দেখে,
ছাতি'পর উঠায়ে রাখে, অমিন্‌মে তোড়কে ফেঁকে,
গুল্‌ ওয়সে রহে, যো যায়সা রাখে,
মুঝে যায়সি রাখো, ম্যায় ঐসি রহি ॥"

ক্রীতদাসীর হৃদয়ের কি গভীর প্রাণস্পর্শী অভিব্যক্তি!

২য়। সঙ্গীত-রচনায় সিদ্ধকবি গিরিশচন্দ্র বলিতেন, "মানব-হৃদয়ের এমন ভাব নাই, যাহা অবলম্বনে সঙ্গীত রচনা করা যায় না।" ডাকিনী, যোগিনী, চণ্ড, চেড়ী, বানরী, নারদের ঢেঁকী, নিন্দা, নিদ্রা-স্বপ্ন-তন্দ্রা, কিরণ-কিঙ্করী, ভাব-সঙ্গিনী, স্বর-সঙ্গিনী, সাগরবালা, প্রভৃতি বিভিন্ন ভাব এবং রসের কতই না সঙ্গীত তিনি রচনা করিয়াছেন। এই গীতখানি সুপ্রসিদ্ধ গ্রীক দার্শনিক ইপিকিউরাসের প্রবর্ত্তিত মত (Epicurean philosophy) অবলম্বনে রচিত :—

"কাল কি হবে, আজকে ভেবে কি হবে।
ভেবে ভেবে ভবের খেলা, বুঝতে পারে কে কবে?
ভেবে ভেবে যায় তো চিরকাল,
ভেবে কে বদলেছে কার হাল,
আজ ভাবে কাল সুখে রবে, আসে না সে কাল,
সময়ের স্রোত বয়ে যায়, ওঠা নাবা ঢেউ চলে তায়,
কাল ভেবে যে কাল কাটাবে, ভয়েভয়ে সে রবে।
ছেড় না, পেয়েছ, আমোদ ক'রে নাও তবে ॥"

পাঠকগণের মধ্যে বোধহয় অনেকেই জানেন, ইপিকিউরাসের মত ছিল, "Happiness or enjoyment is the summum bonum of life."

'মায়াবসান'

৪ঠা পৌষ (১৩০৪ সাল) গিরিশচন্দ্রের 'মায়াবসান' সামাজিক নাটকখানি 'ষ্টার থিয়েটারে' প্রথম অভিনীত হয়। প্রথমাভিনয় রজনীর অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ :

কালীকিঙ্কর বসু	গিরিশচন্দ্র ঘোষ।
মাধব	সুরেন্দ্রনাথ মিত্র (ফট্রাই)।
যাদব	শ্রীযুক্ত কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়।

হলধর	শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু)।
সাতকড়ি চাটুজ্যে	হরিচরণ ভট্টাচার্য্য।
শান্তিরাম	নটবর চৌধুরী।
গণপতি শর্ম্মা	শ্রীযুক্ত অক্ষয়কালী কোঙার।
কৃষ্ণধন বসু	ননিলাল দত্ত।
টি. রে	শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মিত্র।
মিঃ ডি	শ্রীযুক্ত হীরালাল দত্ত।
মিঃ গুঁই	জীবনকৃষ্ণ সেন।
দীননাথ চক্রবর্ত্তী	মহেন্দ্রনাথ চৌধুরী (মাষ্টার)।
ম্যাজিষ্ট্রেট	বিষ্ণুচরণ দে।
অন্নপূর্ণা	শ্রীমতী তারাসুন্দরী।
মন্দাকিনী	বসন্তকুমারী।
নিস্তারিণী	শ্রীমতী সরযূবালা।
বিন্দু	শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা।
রঙ্গিনী	শ্রীমতী নরীসুন্দরী।
ম্যাজিষ্ট্রেট-পত্নী	কামিনীসুন্দরী। ইত্যাদি।

'কালাপাহাড়' রচনার প্রায় এক বৎসর পরে গিরিশচন্দ্র 'মায়াবসান' রচনা করেন। 'কালাপাহাড়' নাটক যেমন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাবে, 'মায়াবসান' নাটক তেমনি স্বামী বিবেকানন্দের ভাবে অনুপ্রাণিত। যবনিকা-পতনের পূর্ব্বে দুইখানি নাটকে যে দুইটী সঙ্গীত সংযোজিত হইয়াছে আমরা সেই দুইটী নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। পাঠকগণ তাহা হইতেই দুইখানি নাটকের প্রকৃতি, গতি ও পরিণতি সম্পূর্ণ বুঝিতে পারিবেন।

১ম। 'কালাপাহাড়' নাটকের শেষ গীত :—

"প্রেম-রসে আজ হৃদয় রসেছে।
দেখ রে দেখ হৃদয়-নিধি—
সিংহাসনে বসেছে॥
রূপের ছটা দেখ রে ভুবনময়,
ঝলকে পুলকে উথলে বয়,
জয় জয় জয়, জগন্নাথের জয়—
মনোমোহন চাঁদবদন হেরে,
ভবের বাঁধন খসেছে॥"

২য়। 'মায়াবসান' নাটকের শেষ গীত :—

"মেদিনী মিশিল তরল সলিলে
তপন শুষিল বারি।
তপন নিভিল, অনিল বহিল,
বিপুল ব্যোমচারী॥

নীরব রব শূন্য শরীরে,
শূন্যে শূন্য মিশিল ধীরে,
নিবিড় তিমিরে চেতন ঝলসে
মায়া কায়াহারী॥"

'কালাপাহাড়ে' যেরূপ ভগবৎপ্রেম, ভক্তি ও ভালবাসার বিকাশ, 'মায়াবসানে' সেইরূপ জ্ঞান ও চৈতন্যোদয়ে অবিদ্যার নাশ। কালীকিঙ্কর বসু এই নাটকের নায়ক —কঠোর সত্যানুরাগী, জ্ঞানপিপাসু, পরদুঃখকাতর, কিন্তু দীর্ঘকাল ধরিয়া কেবল জড়-বিজ্ঞানের আলোচনা করিয়াছেন। যখন তাঁহার সুখের সংসার, পরের অনিষ্টসাধনে চিরব্রতী শাতকড়ি চাটুজ্যের চক্রে ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল, তখন এই চাটুজ্যেকেই কালী-কিঙ্কর বলিতেছেন, "সমস্ত রাত্রি জাগরণ করে দূরবীক্ষণে আকাশে তারার গতি লক্ষ্য করেছি, অণুবীক্ষণে কীটাণুর ব্যাভার দেখেছি,—বিজ্ঞানচর্চ্চা, জীবন উপেক্ষা ক'রে তড়িৎ পরীক্ষা, রাসায়নিক পরীক্ষা, নিজ দেহের দ্রব্যগুণ পরীক্ষা করেছি। যা-যা দেখেছি, যা-যা ভেবেছি, সব ওতে টুকে রেখেছি, কেন জান? ভেবেছিলেম, এ প্রকাশ করলে মানুষের উপকার হবে, কিন্তু আজ বুঝেছি যে মানব-দুঃখের এক কণাও কমবে না।"

বিজ্ঞান আলোচনা এবং পরীক্ষা করিয়া কালীকিঙ্কর যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেন, তাহা লিখিয়া রাখিতেন। চাটুজ্যে তাঁহার লেখা কাগজগুলি চুরি করিবার জন্য আসিয়াছিল। উদ্দেশ্য ছিল, সেগুলি পুড়াইয়া ফেলিয়া তাঁহাকে চরম আঘাত দিবেন। কালীকিঙ্কর প্রশ্ন করিলেন, "তাতে তোমার লাভ?" কিন্তু চাটুজ্যে লাভালাভ খতায় না, পরের যাহাতে দুঃখ, পরের যাহাতে অনিষ্ট তাহাতেই তাহার আনন্দ। বলিল, "আমি আমুদে লোক, আমোদ করেই বেড়াই। কার কি হলো—কার কি হবে, অত ধার ধারিনে।" চাটুজ্যে চলিয়া গেল, কালীকিঙ্কর ভাবিতে লাগিলেন, "পরের অনিষ্ট জীবনের ব্রত; কিন্তু আশ্চর্য্য—একে তো আমি একদিনও বিমর্ষ দেখি না।" তাঁহার মনে আজ ঘোরতর দ্বন্দ্ব উপস্থিত—সুখ কি? দুঃখ কি? আনন্দ কোথায়? ভাবিতে-ভাবিতে তাঁহার মনে হইল, "নিষ্কম্প দীপশিখার ন্যায় মন! শুনেছি—সেই আনন্দের অবস্থা! কিন্তু এ কি সম্ভব? কখন না—কল্পনামাত্র। প্রলোভন বাক্য! সুখ-দুঃখ প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী, বায়ু সঙ্ঘর্ষণে ঘোরতর ঘূর্ণবায়ু উপস্থিত হয়। দীপ নির্ব্বাণ সম্ভব, নিষ্কম্প দীপ অসম্ভব—স্বভাবে অসম্ভব। ঐ যে দীপ কম্পিত হচ্ছে, প্রবল বায়ুতে নির্ব্বাণ হবে, বায়ুহীন হ'লেও নির্ব্বাণ হবে। এ দীপ নির্ব্বাণ হবে, মৃত্যুতে কি জ্ঞানদীপ নির্ব্বাণ হবে? অসম্ভব। জড়েরই পরিবর্ত্তন—জড়েরই ধ্বংস। চৈতন্যের বিনাশ! —কল্পনা করা যায় না। বিপদ—ঘোর বিপদ—অনন্ত বিপদ! এ কি? এ কি আভাস? আত্মত্যাগ!—সে কি? সে কি? নূতন কথা—নূতন কথা! আপনার জন্যই সব, আপনার জন্যই যন্ত্রণা—আত্মত্যাগ সম্ভব—সম্ভব—সম্ভব!"

এই চরম জ্ঞানলাভ করিয়া কালীকিঙ্কর তাঁহার সযত্ন-শিক্ষিত শিষ্যা রঙ্গিনীকে তাহা দিবার নিমিত্ত ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। ইতোপূর্ব্বেই তিনি সংসার, আত্মীয়-স্বজনের

মমতা মন হইতে দূর করিয়াছেন, কিন্তু গুরু-শিষ্যের বন্ধন অতি দৃঢ়—পূর্ণজ্ঞান না দিয়া তাহা সহজে কাটে না। তাই তিনি পরিণামে রঙ্গিনীকে বলিতেছেন, "তোমায় একটা কথা বলতে এসেছি, এই আমার শেষ কথা। তুমি কথাটী বুঝলে আমার বন্ধন কাটে। শুনেছিলে কি? আত্মত্যাগ। মনে করেছিলাম, একটা কথার কথা চলে আসছে, তা নয়, সত্যই আত্মত্যাগ আছে। মরণে আত্মত্যাগ হবে না, আত্মা সঙ্গে যাবে, এইখানে আপনাকে বিলিয়ে দিলে তবে আত্মত্যাগ হবে।"

রঙ্গিনী বলিল, "ছোটবাবু, কি বলছ? আমি তোমার কথা কিছু বুঝতে পাচ্ছি নে।"

কালীকিঙ্কর তাহার উত্তর দিলেন, "তোমায় এতদিন উপদেশ দিয়েছি—পরের উপকার কর; আমিও পরহিতে জীবন উৎসর্গ করেছিলেম। কিন্তু শান্তি পাইনি কেন জান? মুখে বলতেম, নিষ্কাম ধর্ম্ম—নিষ্কাম ধর্ম্ম; কিন্তু অভিমান ফল-কামনা ছাড়ে না। সুখ-আশায় পরহিত করেছি, ধর্ম্ম উপার্জ্জন করতে পরহিত করেছি, ফল-কামনায় পরহিত করেছি। আজ গঙ্গাজলে ফল বিসর্জ্জন দিয়ে পরকার্য্যে রইলেম; রইলেম কি—জগতে মিশলেম।

রঙ্গিনী। আমিও আভাস পাচ্ছি, আমিও মিলিয়ে যাচ্ছি।

কালীকিঙ্কর। বেশ! আমাদের অপূর্ব্ব মিলনে আর বিচ্ছেদ হবে না।

রঙ্গিনী। সত্য—অবিচ্ছিন্ন মিলন!—প্রতিপরমাণুতে মিলন—অনন্ত মিলন!"

নাটকের পরিণাম এবং তাহার রচনার উদ্দেশ্যের কথঞ্চিৎ আভাস আমরা গিরিশ-চন্দ্রের কথাতেই ব্যক্ত করিলাম। এই পরিণামে উপনীত হইতে যে কিছু ঘটনা এবং চরিত্রের প্রয়োজন, গিরিশচন্দ্র সে সকলের অপূর্ব্ব সমাবেশ করিয়াছেন। একদিক দিয়া চাটুজ্যে যেমন, অন্তদিকে পুরাতন ভৃত্য শান্তিরাম তেমনি এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি। শান্তিরাম নিরক্ষর মূর্খ হইলেও তাহার উক্তিসকল সাংসারিক জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতায় পূর্ণ। যে ভাব মহাকবি সেক্সপীয়র মনস্তত্ত্ববিদ এবং দার্শনিক হ্যামলেটের মুখ দিয়া বাহির করিয়াছেন, এই শান্তিরাম তাহার গ্রাম্য ভাষায় তাহার অনুরূপ ভাব ব্যক্ত করিতেছে, "মনের পচা পাঁক উটকে দেখলে কেউ কারুকে দুর্জ্জন বলতোনি, তা আমরা মুক্‌খু, আমরা আর তোমাদের কি বলবো।" *

রঙ্গিনী এই নাটকের আর-একটী বিচিত্র সৃষ্টি। রঙ্গিনী দরিদ্র-কন্যা—কালীকিঙ্করের সযত্ন-শিক্ষিতা, গুরুবাক্যে অখণ্ড বিশ্বাস এবং সত্যনিষ্ঠা এ চরিত্রের বিশেষত্ব। ইহারই স্নেহে কালীকিঙ্কর উৎকট ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করিয়া মৃত্যু-দ্বার হইতে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। সে শক্তির উদ্বোধন করিতে কারাবদ্ধ কালাপাহাড় বলিয়াছিলেন:—

"শক্তি, তুমি প্রত্যক্ষ ভুবনে
বিরাজিত, বিদ্যমান অন্তরে অন্তরে

*"Use every man after his desert, and who should 'scape whipping?" *Hamlet*, Act II, Sc 2.

নেহারি তোমারে, আজীবন করিয়াছি
তব উপাসনা, এ সঙ্কটে প্রবঞ্চনা
করো না করো না! দেহ বল এ শৃঙ্খল
হোক দূর! করি চুর কঠিন পিঞ্জর!
জড় বা চেতন অন্বেষণ প্রয়োজন
নাহি, হও যেবা তুমি, ব্যাপিত আকাশ-
ভূমি, কিম্বা পুরুষপ্রকৃতি, নিরাকার
অথবা সাকার, আকর্ষণ করি ব্রহ্ম-
তেজে, ত্বরা দেহ তেজ, তেজের আকর!"

'কালাপাহাড়', ২য় অঙ্ক, ৪র্থ গর্ভাঙ্ক।

সেই শক্তির বলে কালীকিঙ্কর মৃত্যুমুখ হইতে "Oh Holy Energy!" বলিয়া ফিরিয়া আসেন। কিন্তু কালাপাহাড় যাহার স্তব করিতেছেন তাহা ব্রহ্মশক্তি! কালীকিঙ্কর যাহার আহ্বান করিতেছেন তাহা জড়।

'কালাপাহাড়' এবং 'মায়াবসানে' ধর্ম্মজগতের দুইটী উচ্চ তত্ত্বের অবতারণা করা হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, যে দুইখানি নাটক গিরিশচন্দ্রের উর্ব্বর ও পরিণত মস্তিষ্কের ফল, সেই দুইখানি তাঁহার মস্তিষ্ক-বিকৃতির পরিচায়ক বলিয়া রঙ্গালয় হইতে প্রচারিত হয় এবং অধিকাংশ দর্শকও সেই মতের সমর্থন করেন।

চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

হাফ্-আকৃড়াই ও পাঁচালি

হাফ্-আকৃড়াই সঙ্গীতের জন্য বাগবাজার সুবিখ্যাত। বাগবাজার-নিবাসী স্বর্গীয় মোহনচাঁদ বসু ইহার আবিষ্কারক। একসময়ে কলিকাতায় বহু ধনাঢ্য ভবনে হাফ্-আকৃড়াই-এর লড়াই শিক্ষিত ভদ্রমণ্ডলী এবং জনসাধারণের পরম উপভোগ্য ছিল। গিরিশচন্দ্রের সময়ে কবিবর মনোমোহন বসুই হাফ্-আকৃড়াই গানের উৎকৃষ্ট বাঁধনদার বলিয়া সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন। 'কাল-পরিণয়' নাটক-প্রণেতা স্বর্গীয় গোপাললাল বন্দ্যোপাধ্যাযের নামও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গিরিশচন্দ্র বন্ধু-বান্ধবগণ কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া জয়লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সমস্ত উদ্যম ও অধ্যবসায় থিয়েটারের উন্নতিকল্পে প্রযুক্ত হওয়ায় হাফ্-আকৃড়াই-এর প্রতি তেমন অধিক মনঃসংযোগ করিতে পারেন নাই। কালক্রমে শিক্ষিতগণের রুচির পরিবর্ত্তনে এবং সৌখীন ধনাঢ্য ব্যক্তিদের অনুরাগ ও সহানুভূতির অভাবে এই বহুব্যয়সাধ্য সঙ্গীত-সংগ্রাম লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। বহুকাল পরে গত ১৩২৫ সালে শোভাবাজার রাজবাটীতে সমারোহ সহকারে ইহার শেষ আসর হইয়াছিল। জোড়াসাঁকো সম্প্রদায়ের বাঁধনদার হইয়াছিলেন নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু এবং প্রতিপক্ষ কাঁসারিপাড়া সম্প্রদায়ের বাঁধনদার ছিলেন স্বর্গীয় শশীভূষণ দাস।

গিরিশচন্দ্র যে কয়েকটী আসরে গান বাঁধিয়াছিলেন. তাহা রক্ষিত না হওয়ায় আমরা বিশেষ চেষ্টা করিয়া কয়েকটী গীতের ভাবার্থমাত্র জ্ঞাত হইয়াছি , কেবলমাত্র দুইখানি গীত সংগ্রহে সমর্থ হইয়াছিলাম। মৎ-প্রকাশিত 'গিরিশ-গীতাবলী' হইতে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি। হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব ডিপুটী রেজিষ্ট্রার ভবানীপুর-নিবাসী স্বর্গীয় গিরিশ-চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে এই গীত দুইটী গীত হয়। গিরিশচন্দ্র সে সময়ে 'ন্যাসান্যাল থিয়েটারে'র ম্যানেজার, তিনি কালীঘাটের হইয়া গান বাঁধিয়াছিলেন। প্রতিবাদী ভবানীপুরের দল ছিল, তাঁহাদের বাঁধনদার ছিলেন পূর্ব্বোল্লিখিত স্বর্গীয় গোপাললাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

গিরিশচন্দ্র রাধাতন্ত্রের প্রকৃতি-পূজা অবলম্বন করিয়া এই চাপানটী দেন :—

"কুমুদিনী মোদিনী বিলাইয়ে প্রাণ,
কহে অনিল আসি, কলি সম্ভাষি,—
'প্রেয়সী, খোল লো বয়ান !'

শাখী-শাখা-শিরে পিক গায়
কুহুতান হানে ফুলবাণ—
কুলমান মজে তায়।
নীল তমাল 'পরে, লতিকা বিহারে,
শিহরে মরি ধীর বায়।
অনুরাগে, তারা জাগে,
নির্ম্মল গগনে বসি, ক্ষীর-নীরে যেন শশী
কৌমুদী সলিলে পশি হাসে সোহাগে।
তরঙ্গে তরী কেন হেরি হায়,
অপরূপ যুগলরূপ কিবা তায়,
যেন নীরদে দামিনী, মেঘ-মোহিনী,
পুলকে ঝলকে কি লীলায়,—
কি লীলা, চন্দ্রাবলি, বল আমায়,
তুলা-নিশায় কি করে দোঁহে সই ?"

বিপক্ষের বাঁধনদারের উত্তর দিতে বিলম্বে হওয়ায়, অনবরত ঢোলই বাজিতে লাগিল। হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র মিত্রের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র মিত্র সে সময়ে একজন উৎকৃষ্ট ঢোলবাদক ছিলেন। তিনি দুইজন সহকারী সমেত তিনবার ঢোল বাজাইলেন, তথাপি যখন উত্তর প্রস্তুত হইল না, তখন তিনি তাঁহাদের দলের লোক হইয়াও বিরক্ত হইয়া ঢোল ফেলিয়া দেন। ইঁহারা উত্তরদানে অসমর্থ হওয়ায় গিরিশচন্দ্র স্বয়ং ইহার উত্তর দিয়াছিলেন। উত্তরের প্রথম ছত্রটী মাত্র সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি। যথা: "রাম-রস-মাধুরী করি, সখি, পান।"

তৎপরে বিরহের আসর। গিরিশচন্দ্র প্রথমে দ্রৌপদী-হরণে পাণ্ডব-লাঞ্ছিত জয়দ্রথের প্রতি জয়দ্রথ-পত্নীর উক্তিস্বরূপ এই চাপানটী দেন:

"আমারে ভুলেরে প্রাণ, ভাল তো ছিলে।
কি জন্য আর দেখিনে হে, পথ ভুলে কি এলে ?
শুনছি লোকে, প্রাণ, ক'রে ভান—
ঢুকলে গে কার অন্দরে!
মুখে ছাই, দেখলে কামাই,
ধরলে খপ্‌ ক'রে, সরমে মরমে মরি ছিঃ—
গায়ে কি দাগ দেখি ?
ননদী কাছে না যায়, যে ব্যাভার,
ভ্যালা বুড়ো প্রাণ মস্তানি মচ্‌কেচে এবার,
পাঁচ চুলো গোলাম ওরে প্রাণ!"

বিপক্ষদল আশা-বর্জ্জিত এক অসঙ্গত উত্তর দেন। গিরিশচন্দ্রের দল প্রত্যুত্তর দিবার নিমিত্ত আসর লইয়াছেন, মহা উৎসাহে সাজ-বাজনা আরম্ভ হইয়াছে। বিপক্ষ

সম্প্রদায় গতিক খারাপ বুঝিয়া কাউরে ঢোল বাজাইয়া আসর ভঙ্গ করেন। শুনা যায়, বিপক্ষদল পরাজিত হইয়া ক্রোধে গিরিশচন্দ্রকে প্রহারের উদ্যোগ করে, তিনি লুকাইয়া তাঁহার এক সাব-জজ বন্ধুর (স্বর্গীয় ব্রজবিহারী সোম) গাড়ীর দ্বার বন্ধ করিয়া পলায়ন করেন।

যে সময় 'ষ্টার থিয়েটারে' গিরিশচন্দ্র ম্যানেজার ছিলেন, সেই সময়ে বাগবাজারের সুপ্রসিদ্ধ জমীদার স্বর্গীয় নন্দলাল বসুর বাটীতে একবার হাফ্-আকৃড়াই হয়। প্রথম পক্ষের বাঁধনদার ছিলেন স্বর্গীয় গোপাললাল বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিতীয় পক্ষের বাঁধনদার ছিলেন স্বর্গীয় মনোমোহন বসু; গিরিশচন্দ্র মনোমোহনবাবুর সহকারী হইয়াছিলেন। গোপালবাবু গান্ধারীর ছাগপতি উপলক্ষ্য করিয়া চাপান দেন। মনোমোহনবাবু উত্তরদানে ইতস্ততঃ করায়, গিরিশচন্দ্র উত্তর বাঁধিয়া দিয়া স্বপক্ষের সম্মানরক্ষা করিয়াছিলেন। গীতখানির প্রথম কয়েক ছত্র মাত্র আমরা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি:

"ঋষির অভিশাপে, মরি মনস্তাপে,
কু-লোকে কু-কথা রটায়,—
এমন ভারত ছাড়া কথা, বল, কোথায় পাও?"

গিরিশচন্দ্র বলিতেন, "হাফ্-আকৃড়াই বা কবির লড়াইএ জয়লাভ করিবার কৌশল এই, যিনি পুরাণ, উপপুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্র-গ্রন্থ হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া চাপান দিবেন, সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ প্রতিপক্ষের বাঁধনদার তাহার তো জবাব দিবেনই। কিন্তু জয়াভিলাষী চাপানদারকে এস্থলে একটু কূটনীতি অবলম্বন করিতে হইবে। যেমন রাবণবধের পর বিভীষণের সহিত মন্দোদরীর পুনরায় বিবাহ হয়। রাবণের জীবিতকালে মন্দোদরী মনে-মনে বিভীষণের অনুরাগী ছিলেন কিনা, তাহা তো কেহ নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে না। এই অনুমিত অনুরাগ কল্পনা-সাহায্যে বাস্তবে পরিণত করিয়া চাপানদার তাঁহার বিষয় স্থির করিলেন:

"লক্ষ্মণ নাক-কান কাটিয়া দিলে প্রতিহিংসাপরায়ণা সূর্পণখা লঙ্কাপুরে রাবণকে উত্তেজিত করিয়া অন্তঃপুরে গিয়া উপস্থিত। মন্দোদরী সূর্পণখার মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া উপহাস করিয়া বলিল, "ছিঃ ছিঃ ঠাকুরঝি সুন্দরী সেজে মানুষের সঙ্গে প্রেম করতে গেলে। প্রেম করা দূরে থাক, নাক কান দুটো কেটে দিলে! ছিঃ ছিঃ—এই তুমি সতার বড়াই কর?" মন্দোদরীর এইরূপ উক্তিতে কুপিতা হইয়া সূর্পণখা যেন বলিল, "আমি তো অসতী, আর তুই যে কত সতী, লঙ্কাপুরে তা জানতে কারো বাকী নেই। বিভীষণের সঙ্গে এত তোর কিসের কথা লা?—লুকিয়ে-লুকিয়ে দু'জনের হাসি-তামাসা কে না দেখেছে ইত্যাদি।" বিভীষণ পরমধার্ম্মিক বলিয়া সর্ব্বজনবিদিত। রাবণের জীবিতকালে মন্দোদরীর সহিত কুভাবে কথোপকথন তাঁহার পক্ষে কখনই সম্ভবপর নহে। কিন্তু আবার রাবণের মৃত্যুর পর মন্দোদরীকে বিবাহ করিলেন। কার্য্যকারণের সূত্র ধরিয়া এবং শেষের সহিত মিল রাখিয়া চাপানটী বেশ জটিল হইয়া উঠিল।"

এইরূপ চাপান দিয়া গিরিশচন্দ্র একটী আসর জিতিয়াছিলেন। হাফ্-আকৃড়াই

একেই বহুব্যয়সাধ্য, তাহার উপর জয়-পরাজয়ে উভয়পক্ষের ঝগড়া মনোবিবাদ, সময়ে-সময়ে দাঙ্গা-হাঙ্গামাও ঘটিত। এইরূপ নানা কারণে এবং সময় ও সমাজের রুচি পরিবর্ত্তনে ইহার প্রভাব একপ্রকার লুপ্ত হইয়া আসিয়াছে।

হাফ্-আকড়াইয়ের ন্যায় সে সময়ে পাঁচালিরও খুব আদর ছিল। ভদ্রসমাজে পাঁচালির প্রতিপত্তি বড়-একটা আর দেখা যায় না। ইহা এক্ষণে অপেক্ষাকৃত নিম্নশ্রেণীতে গিয়া, তাহার ক্ষীণ অস্তিত্বটুকু রক্ষা করিতেছে মাত্র। গিরিশচন্দ্রের রচিত দুইখানি পাঁচালিসঙ্গীত শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের নিকট হইতে পাইয়াছিলাম। 'গিরিশ-গীতাবলী' হইতে নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম :

(১)

ত্রিম চতুরঙ্গে এলো প্রাণকান্ত।
গুণ্ গুণ্ গুণ্ গুণ্, গুণ্ গুণ্ ক'রে,
ভ্রমরা দিশেহারা,
ঝিঁঝে ঝিঁঝে কোহেলা কেঁদে সারা,
হলো দুরন্ত বসন্ত শান্ত ॥
ধা কিটিতাক্ ধুম কিটিতাক্,
ধি ধা যৌবন-তরঙ্গ,
অঙ্গে অঙ্গে রসরাজ সঙ্গ, রঙ্গে আতঙ্কে অনঙ্গভঙ্গ,
বারেবারে কে জেনে কে হারে
তোম্ দেরে দেরে দেরে তানা না না,
নয়নে-নয়নে হানা,
সুরথ-সমর ঘোরে ক্লান্ত নিতান্ত ॥

(২)

ত্রিম চতুরঙ্গে বাঁশী ফোঁকে কালা।
ধা কিটিতাক্ ধুম কিটিতাক্
বাজে বাঁশী তেলেঙ্গা,—
চাঙ্গা গোপিনী-প্রাণ করে ঝালাপালা ॥

একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

রামপুর-বোয়ালিয়ায় গিরিশচন্দ্র

সুপ্রসিদ্ধ ক্ল্যারিওনেট-বাদক এবং সঙ্গীতাচার্য্য স্বর্গীয় অমৃতলাল দত্ত (হাবুবাবু) মহাশয় রাজসাহী তালন্দের জমীদার স্বর্গীয় ললিতমোহন মিত্র মহাশয়ের বিশেষ আগ্রহ এবং যত্নে তাঁহার রামপুর-বোয়ালিয়ায় প্রাসাদতুল্য ভবনে মধ্যে-মধ্যে গিয়া অবস্থান করিতেন। ললিতমোহনবাবু যেরূপ গীতবাদ্যপ্রিয়, সেইরূপ নাট্যানুরাগী ছিলেন। কলিকাতার সাধারণ নাট্যশালার ন্যায় রামপুর-বোয়ালিয়ায় একটী সাধারণ নাট্যশালা প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য সময়ে-সময়ে তিনি বিশেষরূপ উৎসাহিত হইয়া উঠিতেন।

গিরিশচন্দ্র যে বৎসর (১৩০৪ সাল, ফাল্গুন) 'ষ্টার থিয়েটার' পরিত্যাগ করেন, সে বৎসর কলিকাতায় প্রথম প্লেগ দেখা দেয়। প্লেগের আতঙ্কে ঝটিকা-বিক্ষুব্ধ সাগরের ন্যায় কলিকাতা বিচঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে, আবালবৃদ্ধবনিতা দলে-দলে সহর ত্যাগ করিয়া যাইতেছে, ব্যবসা-বাণিজ্য একপ্রকার বন্ধ বলিলেই হয়, সে দৃশ্য যিনি দেখিয়াছেন, তিনি তাহা জীবনে বিস্মৃত হইবেন না। এই সময়ে ললিতমোহনবাবু সুযোগ বুঝিয়া, হাবুবাবুর সাহায্যে কলিকাতার সাধারণ নাট্যশালা হইতে অভিনেতা ও অভিনেত্রী সংগ্রহপূর্ব্বক রামপুর-বোয়ালিয়ায় রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হন।

হাবুবাবু স্বয়ং গুণী ছিলেন, তাহার উপর গুরুভ্রাতা বিবেকানন্দ স্বামীর পরম আত্মীয় বলিয়া গিরিশচন্দ্র তাঁহাকে বিশেষ প্রীতির চক্ষে দেখিতেন। ললিতবাবুর আগ্রহাতিশয্যে হাবুবাবু আসিয়া গিরিশচন্দ্রকে রামপুর-বোয়ালিয়ায় লইয়া যাইবার জন্য ধরিয়া বসিলেন এবং বলিলেন, "ললিতবাবু আপনার সম্মান ও উপযুক্ত পারিশ্রমিক প্রদানে সম্মত, এবং এ সময়ে আপনার কলিকাতা পরিত্যাগও বাঞ্ছনীয়।"

'ষ্টার থিয়েটারে'র সহিত গিরিশচন্দ্র তখন সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়াছেন, কলিকাতাতে এই হুলস্থূল ব্যাপার, গিরিশচন্দ্র অগত্যা এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন, এবং তিন সহস্র মুদ্রা 'বোনাস' স্বরূপ পাইয়া রামপুর-বোয়ালিয়ায় গমন করিলেন। স্বর্গীয় নীলমাধব চক্রবর্ত্তী, প্রবোধচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু), ভূষণকুমারী, সুশীলাবালা প্রভৃতি লব্ধপ্রতিষ্ঠ অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণও যথাযোগ্য বেতন এবং অল্লাধিক 'বোনাস' পাইয়া ইতিপূর্ব্বে রামপুর-বোয়ালিয়ায় যাত্রা করিয়াছিলেন।

ললিতমোহনবাবু উদ্যোগী পুরুষ ছিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই রঙ্গালয়-নির্ম্মাণকার্য্য

শেষ করিয়া আনিলেন। এদিকে গিরিশচন্দ্র দল সংগঠিত করিয়া কয়েকখানি উৎকৃষ্ট নাটক অভিনয়ার্থে প্রবৃত্ত করিলেন। থিয়েটারের নামকরণ হইল 'মার্ভাল (Marval) থিয়েটার'।

প্রথম রাত্রে 'বিল্বমঙ্গল' নাটক অভিনীত হয়। অভিনয় আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে গিরিশচন্দ্র-কর্তৃক রচিত নিম্নলিখিত কবিতাটী পঠিত হয়:

"ইতিহাস করে গান, রাজসাহী রাজস্থান
সুজলা সুফলা শ্যামা সুন্দরী প্রদেশ;
নব রস-বশ-চিত, সুধীবৃন্দ বিরাজিত
মরালস্বভাব-গুণ-আকর অশেষ!
বিকাশ নটের প্রাণ, সহৃদয় বিদ্যমান
অমানীর মানদাতা সম্মান-পয়োধি;
উত্তেজিত নব আশে, অন্তর পুলকে ভাসে,
উৎসাহ পাইব—ত্রুটী হয় শত যদি।
দুর্দ্দান্ত দুর্দ্দিনোদয়, আসিয়াছি পেয়ে ভয়,
উচ্চাশ্রয়ে অভয়ে গাইব হরিনাম;
এই ক্ষুদ্র রঙ্গালয়, তব দৃশ্য যোগ্য নয়—
ত্যজি দোষ, গুণ ধর—ওহে গুণধাম!
কর যদি তিরস্কার, মানি লব পুরস্কার
বহু মানে শির পাতি করিব গ্রহণ,
সবিনয় নিবেদন, জানায় হে অকিঞ্চন—
বহু আশে আসিয়াছি—করো না বঞ্চন!"

খ্যাতনামা অভিনেতৃগণ-সম্মিলনে অভিনয়ও যেরূপ উৎকৃষ্ট হইয়াছিল, দর্শকগণের ভিড়ও সেইরূপ অসম্ভব হইয়াছিল। পরম আগ্রহে বহুদূর হইতে বহু গ্রামের দর্শকগণ আসিতে থাকে—সমস্ত দেশে একটা হুলস্থূল পড়িয়া যায়।

অল্পদিনের অভিনয়ের পর ললিতমোহনবাবুর অভিভাবকগণ বুঝিলেন যে ক্ষুদ্র সহরে টিকিট বিক্রয় করিয়া লাভবান হওয়া দুরাকাঙ্ক্ষা মাত্র। তাঁহারাই উদ্যোগী হইয়া থিয়েটার বন্ধ করিয়া দেন। এদিকে কলিকাতায় তখন প্লেগের আতঙ্ক অপেক্ষাকৃত কমিয়া গিয়াছে। সম্প্রদায় নির্ভয়ে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। সহৃদয় ললিত-মোহনবাবুর যত্ন এবং সদ্ব্যবহারে সম্প্রদায় পরম আনন্দে তথায় অবস্থান করিয়াছিলেন।

প্লেগের সময় সঙ্কীর্ত্তন

প্লেগের সময় কলিকাতায় প্রায় প্রত্যেক পল্লীতেই হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন সম্প্রদায় স্থাপিত হয়। 'দর্জ্জিপাড়া সঙ্কীর্ত্তন সম্প্রদায়' কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া গিরিশচন্দ্র একখানি

গান বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। সাময়িক সঙ্গীত যেভাবে রচিত হয়, এ গীতখানিতে তাহা হইতে একটু নূতনত্ব এবং বিশেষত্ব আছে। নিম্নে সঙ্কীর্ত্তন-গীতখানি উদ্ধৃত হইল :

"কলিকাতা আনন্দধাম।
প্লেগ বন্ধু হ'য়ে এসেছে হে ছড়াছড়ি হরিনাম॥
কাঁপিয়ে ভুবন গগনভেদী রোল,
হুহুঙ্কারে ওথ্‌লে উঠে হরি হরি বোল,
মত্ত হ'য়ে নৃত্য সদা গর্জ্জে শত খোল,—
ঝঙ্কারে করতালি ঝঞ্ঝা সম অবিরাম॥
মরণ তো হবে, এড়ায় কে কবে,
চার যুগে কে মরে এমন নামের উৎসবে ?
হরিবোল—বোল হরিবোল—
হরি হরি—ধুলোট হয় ভবে,
ওরে ভয় কি তবে গভীর রবে—
নাম গেয়ে আয় পুরাই কাম॥
যে নামে হয় রে মৃত্যুঞ্জয়,
তত্ত্ব জেনে মত্ত হ'য়ে গায় রে মৃত্যুঞ্জয়,
যে অভয় নামে—নাইরে যমের ভয়,—
নামের সনে হৃদ্‌মাঝারে নাচে নব ঘনশ্যাম॥
প্লেগ,—থাক্‌বি যদি থাক্‌,
শমনদমন নামে শমন হয়েছে অবাক,
হরিনাম প্রাণভরে শোন, এই কথাটী রাখ,
নাম শুনে প্রাণ ত্যজ্‌বে যে জন—
কিনবে হরি গুণধাম॥"

দ্বিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

'ক্লাসিকে' গিরিশচন্দ্র

রামপুর-বোয়ালিয়া হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিবার অল্পদিন পরেই গিরিশচন্দ্র নাট্যরথী স্বর্গীয় অমরেন্দ্রনাথ দত্তের প্রতিষ্ঠিত 'ক্লাসিক থিয়েটারে' যোগদান করেন। অমরেন্দ্রনাথ সুবিখ্যাত 'রেলি ব্রাদার্স' অফিসের মুৎসুদ্দী ৺দ্বারিকানাথ দত্তের তৃতীয় পুত্র এবং পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের অনুজ ছিলেন। আশৈশব নাট্যানুরাগবশতঃ অমরবাবু গিরিশচন্দ্রের নিকট প্রায়ই যাতায়াত করিতেন। তিনি দূরসম্পর্কে গিরিশচন্দ্রের ভাগিনেয় ছিলেন। অমরেন্দ্রনাথের বিনয়, সৌজন্য এবং মিষ্টভাষিতায় গিরিশচন্দ্র প্রথম হইতেই ইঁহাকে স্নেহের চক্ষে দেখিতেন।

মাসিকপত্রের সম্পাদকতা

বিংশতি বৎসর বয়ঃক্রমে অমরবাবু গিরিশচন্দ্রকে সম্পাদক করিয়া 'সৌরভ' নামক একখানি মাসিকপত্র ১৩০২ সাল, শ্রাবণ মাস হইতে বাহির করেন। এই মাসিকপত্রে গিরিশচন্দ্রের কয়েকটী প্রবন্ধ ও কবিতা প্রকাশিত হইয়াছিল এবং 'ঝালোয়ার দুহিতা' নামে একখানি উপন্যাস ক্রমশঃ বাহির হইতে থাকে। কাগজখানি বেশীদিন চলে নাই।

'ক্লাসিক থিয়েটার' প্রতিষ্ঠা

অমরবাবু তাঁহার স্বভাবজাত নাট্যপ্রতিভার উন্মেষণায়, রেলির বাড়ীর কেশিয়ারের পদ পরিত্যাগ করিয়া নাট্যাভিনয়ে প্রণোদিত হন। গিরিশচন্দ্র তখন 'মিনার্ভা থিয়েটারে', তাঁহারই নিকট শিক্ষাগ্রহণ করিয়া এবং তাঁহারই পৃষ্ঠপোষকতায় অমরবাবু লব্ধপ্রতিষ্ঠ অভিনেতা শ্রীযুক্ত চুণীলাল দেব, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু) প্রভৃতি 'মিনার্ভা থিয়েটারে'র অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণকে লইয়া 'Indian Dramatic Club' নাম দিয়া 'করিন্থিয়ান' এবং 'মিনার্ভা থিয়েটারে' দুই রাত্রি 'পলাশীর যুদ্ধ'

অভিনয় করেন। অমরবাবু স্বয়ং সিরাজদ্দৌলার ভূমিকা অভিনয় করিয়া সুনট বলিয়া সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। অতঃপর ১৩০৩ সালের শেষদিকে তিনি 'এমারেল্ড থিয়েটার' ভাড়া লইয়া 'ক্লাসিক থিয়েটার' প্রতিষ্ঠিত করেন।*

'ক্লাসিক থিয়েটারে'ও গিরিশচন্দ্র 'ষ্টার থিয়েটারে'র ন্যায় ম্যানেজারের পদ গ্রহণে অসম্মত হওয়ায় 'নাট্যাচার্য্য' বলিয়া তাঁহার নাম বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল। প্রথমে আসিয়া তিনি কোনও নূতন নাটকাদি রচনা করেন নাই। মধ্যে-মধ্যে 'প্রফুল্ল', 'মেঘনাদবধ', 'দক্ষযজ্ঞ' প্রভৃতি নাটকে যোগেশ, মেঘনাদ ও রাম, দক্ষ প্রভৃতির ভূমিকাভিনয় করিতেন মাত্র।

'ক্লাসিকে' গিরিশচন্দ্রের যোগদানের পূর্ব্বেও অমরবাবু তাঁহার নিকট যাতায়াত করিতেন এবং থিয়েটার সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ে তাঁহার উপদেশ এবং সাহায্য গ্রহণ করিতেন। 'হরিরাজ', 'কাজের খতম', 'আলিবাবা', নাট্যাকারে গঠিত বঙ্কিমচন্দ্রের 'ইন্দিরা', 'নির্ম্মলা' প্রভৃতি এ পর্য্যন্ত 'ক্লাসিকে' অভিনীত অধিকাংশ পুস্তকই গিরিশচন্দ্র দেখিয়া দিয়াছিলেন এবং 'আলিবাবা'য় কয়েকখানি গানও বাঁধিয়া দেন।

গিরিশচন্দ্রের লেখকরূপে আমার যোগদান

'ক্লাসিকে' গিরিশচন্দ্রের প্রথম রচনা 'দেলদার'। তাঁহার লেখকরূপে নিযুক্ত হইয়া এই 'দেলদার' আমার প্রথম লেখা। গিরিশচন্দ্রের হৃদয় যেরূপ উদার, সেইরূপ স্নেহপ্রবণ ছিল। আমি নিযুক্ত হইবার পর তিনি আমার পিতৃপরিচয় প্রাপ্ত হন। সেই হইতে বন্ধু-পুত্রজ্ঞানে জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত আমাকে অকপট পুত্রস্নেহে প্রতিপালিত করিয়াছিলেন। কিন্তু আমার জীবনের এই পরম সুযোগ এবং সৌভাগ্য-লাভের মূল শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু—গিরিশচন্দ্রের পিতৃস্বসেয়। ইঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ভূপেন্দ্রনাথ বসুর সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠতা থাকায় আমি প্রায়ই ইঁহাদের বাড়ী যাইতাম। ইতঃপূর্ব্বে আমি সামুদ্রিক বিদ্যাবিশারদ স্বর্গীয় রমণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়-প্রতিষ্ঠিত ও সম্পাদিত 'অদৃষ্ট' নামক মাসিকপত্রিকা পরিচালন করিতাম। রমণকৃষ্ণ-বাবুর অকালমৃত্যুতে এই কাগজখানি বন্ধ হইয়া যায়। দেবেন্দ্রবাবু আমাকে কর্ম্মপ্রার্থী জানিয়া, গিরিশচন্দ্রের নিকট লইয়া যান এবং আমাকে তাঁহার লেখক নিযুক্ত করিয়া দেন।

* অর্দ্ধেন্দুবাবুর পর বেনারসী দাস নামক জনৈক মাড়োয়ারী 'এমারেল্ড থিয়েটার' ভাড়া লইয়াছিলেন। ১৩০২ সাল পর্য্যন্ত এইরূপ নানাভাবে কাটিবার পর ১৩০০ সালের প্রথম হইতে স্বর্গীয় নীলমাধব চক্রবর্ত্তী প্রমুখ 'সিটি' সম্প্রদায় 'এমারেল্ড' ভাড়া লইয়া প্রায় দশ মাস অভিনয় করেন। স্বর্গীয় অতুলকৃষ্ণ মিত্র-কর্ত্তৃক নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত বঙ্কিমচন্দ্রের 'দেবী চৌধুরাণী' অভিনয় করিয়া 'সিটি থিয়েটার' সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া উঠিতেছিল। এমন সময়ে 'এমারেল্ড থিয়েটার' অমরবাবুর হস্তগত হইল।

'দেলদার'

২৮শে জ্যৈষ্ঠ (১৩০৬ সাল) 'ক্লাসিক থিয়েটারে' গিরিশচন্দ্রের 'দেলদার' গীতিনাট্য প্রথম অভিনীত হয়। প্রথমাভিনয় রজনীর অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ :

দেলদার	শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু।
নেশা	শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ঘোষ।
গহন	অমরেন্দ্রনাথ দত্ত।
সরল	শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু)।
কুহকী	অঘোরনাথ পাঠক।
পিয়াসা	শ্রীমতী কুসুমকুমারী।
ধারা	ভূষণকুমারী।
রেখা	প্রমদাসুন্দরী।
কুহকিনী	শ্রীমতী পান্নারাণী।
সঙ্গীত-শিক্ষক	শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ঘোষ।
নৃত্য-শিক্ষক	শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু।
রঙ্গভূমি-সজ্জাকর	আশুতোষ পালিত।

'স্বপ্নের ফুল' গীতিনাট্যের ন্যায় 'দেলদার'খানিও একখানি রূপক। সাঁইত্রিশ বৎসর বয়সে গিরিশচন্দ্র 'মোহিনী প্রতিমা' লিখিয়াছিলেন। তাহার সহিত এই 'দেলদারে'র কিছু-কিছু সাদৃশ্য আছে। অভিমানশূন্য নিঃস্বার্থ ভালবাসা পাষাণপ্রতিমাকেও সজীব করে, 'মোহিনী প্রতিমা'র এই চিত্র 'দেলদারে' পরিস্ফুট হইয়াছে।

'দেলদার' গীতিনাট্যের প্রস্তাবনায় গিরিশচন্দ্র বলিতেছেন, এই দুনিয়া বিপরীত-ধর্ম্মী অর্থাৎ ভালমন্দ-মিশ্রিত। ইহাতে ভাল দেখিলে সবই ভাল, মন্দ দেখিলে সবই মন্দ। কবির ভাব বুঝাইবার জন্য আমরা প্রস্তাবনা-গীতটী নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :

"চল্ চল্ দুনিয়া দেখে আসি আয়।
শুনেছি সখের বাজার, সখ ক'রে পায় যে যা চায়॥
বিবেক সুধা আর গরল, কুটীল আর সরল,
বিকোয় অনল শীতল জল,
মনের গুণে বিকোয় সখের ফল ;
সুধা ফেলে গরল কেনে এমন সখ কে কোথায় পায়।
কেন সখে জ্ব'লে হয়লো সারা, সখ হ'লে ত' নিবে যায়॥"

যে সরল মনে—খোলা প্রাণে—ভাল চোখে ভাল দেখে, এ দুনিয়ায় মনের গুণে সেই সখের ফল পায়। দেলদার প্রস্তাবনায় তাহাই বলিতেছে : "দুনিয়ায় সবই দেখবার—ওর আর রকম-বেরকম নেই। মন্দ কিছু না দেখলেই মন্দ নেই,—ভাল না দেখলেই ভাল নেই। আমি ভালই দেখি, মন্দ দেখিনে।" ইহার অনতিপূর্ব্বেই সে বলিয়াছে,— "জেনেশুনে দেলদারি হয় না। ভালমন্দ জেনে যে দেলদারি করে, তার দেলদারি

নয়—ঝকমারি।"

এ দেলদারি অর্থ—ভালমন্দ নির্ব্বিচারে আপনাকে বিলাইয়া দেওয়া। 'মোহিনী প্রতিমা' গীতিনাট্যের সাহানা 'দেলদারে' পরিস্ফুট হইয়াছে। সাহানা বলিতেছে, "আমি তাঁরে যত ভালবাসি, তিনি যদি তত ভালবাসতেন তাহ'লে তাঁর হাত ধ'রে, আমার ব'লে প্রথম যেদিন দাঁড়াতেম, তখন আমাদের পরস্পরের মুখের ভাব দেখে, তাঁর কঠোর প্রাণও তৃপ্ত হত।" (২য় অঙ্ক, ২য় গর্ভাঙ্ক) দেলদার একই কথা বলিতেছে, "যখন বরের বাঁয়ে দাঁড়িয়ে মুখ চেপে হেসে, আড়নয়নে দেখবে, দু'জনের মুখ দেখেই আমার ঘটক বিদায় পাব।" (প্রস্তাবনা) স্বার্থশূন্য এই ভালবাসার চিত্রই উভয় গীতি-নাট্যের কল্পনা। গিরিশচন্দ্র কখনও-কখনও একটী মহাজন-পদ বলিতেন :

"সখী-ভাব হৃদে ধরো, যতন করো, সদাই থাকো রূপ নেহারে।
খেলে সে প্রেমের ননি, সত্য বাণী, কাম-কামনা যাবে দূরে॥"

এই ইঙ্গিতের উপর সাহানা এবং দেলদার গঠিত। ইহাই গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ বর্ণিত সখীভাব, এবং সখী ব্যতীত প্রেম-চিত্র সম্পূর্ণ হয় না। 'মোহিনী প্রতিমা'র সর্ব্বশেষে গিরিশচন্দ্র তাহাই ইঙ্গিত করিয়াছেন। হেমন্ত সাহানাকে বলিতেছে, "শুধু আমাদের মুখের ভাব তুলিতে তুললে হবে না, এ মুখখানিও চাই। আমার হৃদয়ের যোগিনীও সেই পুরুষ প্রকৃতির আরাধনা করবে।"

বাহুল্য ভয়ে আমরা 'দেলদারে'র বিস্তৃত আলোচনা করিলাম না। কেবল মূল ভাবের ইঙ্গিত করিলাম মাত্র। ইহাতে আর-একটী কথা বলিবার আছে, এই গীতিনাট্যে গিরিশচন্দ্র দুইটী নূতন সৃষ্টি করিয়াছেন—ভাব-সঙ্গিনী ও স্বর-সঙ্গিনী। মনের ভাব ও প্রাণের কথা যেন মূর্তিমতী হইয়া ইহাদের সঙ্গীতের ভিতর দিয়া সপ্রকাশ হইতেছে। পুরাতন গ্রীসদেশীয় নাটকে 'কোরাস' যে কার্য্য করে, এই ভাব ও স্বর-সঙ্গিনীদের কার্য্য কতকটা তাহারই অনুরূপ।

এই গীতিনাট্যের সঙ্গীত-রচনায় গিরিশচন্দ্র তাঁহার অসামান্য কবিত্বশক্তির পরিচয় দিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ নিম্নে দুইখানি গীত উদ্ধৃত করিলাম।

১ম। পিয়াসা ও স্বর-সঙ্গিনীগণ :

কেমন ফুল প'রেছে মেদিনী,
তারার হারে তাইতো সেজে, দেখতে এল যামিনী!
যামিনী মোহিনী বেশে, দেখে চাঁদ যায় ভেসে হেসে,
তাই মেদিনী মনমোহিনী, গরবে আমোদিনী!
রাখতে শশী, রাখতে নিশির মান,
অবোলা পাখীর মুখে গান,
গানে প্রাণ মিলিয়ে সমান, ঢালবো তান-তরঙ্গিণী॥

২য়। দেলদার ও স্বর-সঙ্গিনীগণ (হাম্বির—পঞ্চম সোয়ারী) :

অভিমান তার সাজে যে রাখতে জানে মান।
তাপে নয় যায় শুকিয়ে ফুলধরা বাগান॥

না জানি কেমন মনের কান,
নারে ছাড়তে অভিমান,
মনের ছলে, আগুন জেলে, প্রাণ করে শ্মশান
সাধতে কি সাধ করে না,
ধরতে সেধে মন সরে না,
মনের ঘোরে বুঝতে নারে মনে টান ॥

'পাণ্ডব-গৌরব'

'দেলদার' অভিনীত হইবার পর অমরবাবুর 'শ্রীকৃষ্ণ' গীতিনাট্য, 'মজা' নামে একখানি প্রহসন এবং তৎ-কর্ত্তৃক নাটকাকারে গঠিত বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণকান্তের উইল' — 'ভ্রমর' নাম দিয়া 'ক্লাসিক থিয়েটারে' বিশেষ সুখ্যাতির সহিত অভিনীত হয়। 'মজা'র অনেকগুলি গীত গিরিশচন্দ্র বাঁধিয়া দিয়াছিলেন এবং 'ভ্রমরে'র বারুণীপুকুর ও পোস্টাফিসের দুইটী দৃশ্য লিখিয়া দেন। 'ভ্রমর' অভিনয়ে 'ক্লাসিক থিয়েটার' সুযশে এবং প্রভূত অর্থ-সমাগমে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছিল।

৬ই ফাল্গুন (১৩০৬ সাল) 'ক্লাসিকে' গিরিশচন্দ্রের 'পাণ্ডব-গৌরব' প্রথম অভিনীত হয়। প্রথমাভিনয় রজনীর অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ :

দণ্ডী	পণ্ডিত হরিভূষণ ভট্টাচার্য্য।
কঞ্চুকী	গিরিশচন্দ্র ঘোষ।
ভীষ্ম	মহেন্দ্রলাল বসু।
ভীম	অমরেন্দ্রনাথ দত্ত।
ব্রহ্মা	শশীভূষণ ঘোষ।
মহাদেব ও দুর্ব্বাসা	চণ্ডীচরণ দে।
ইন্দ্র, অনিরুদ্ধ, বিদুর ও সহদেব	শ্রীযুক্ত হীরালাল চট্টোপাধ্যায়।
কার্ত্তিক ও দুর্য্যোধন	গোষ্ঠবিহারী চক্রবর্ত্তী।
নারদ, শকুনি ও দ্বারকার দূত	অক্ষয়কুমার চক্রবর্ত্তী।
বলরাম	শ্রীযুক্ত অহীন্দ্রনাথ দে।
শ্রীকৃষ্ণ	প্রমদাসুন্দরী।
সাত্যকী ও কর্ণ	শ্রীযুক্ত অতীন্দ্রলাল ভট্টাচার্য্য।
প্রদ্যুম্ন ও নকুল	শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।
দ্রোণ ও সহিস	শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র রায়।
যুধিষ্ঠির	নটবর চৌধুরী।

অর্জ্জুন	শ্রীযুক্ত নীলমণি ঘোষ।
দুঃশাসন	তিতুরাম দাস।
প্রতিকামী ও দূত	বনমালী দাস।
ঘেসেড়া	শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু।
কুন্তী	হরিমতী (গুলফম্)।
রুক্মিণী	ভূষণকুমারী।
সুভদ্রা	তিনকড়ি দাসী।
দ্রৌপদী	শ্রীমতী গোলাপসুন্দরী।
উর্ব্বশী	শ্রীমতী কুসুমকুমারী।
উত্তরা	শ্রীমতী টুকুমণি।
জয়া	রাণীমণি।
ঘেসেড়ানী	লক্ষ্মীমণি।
সঙ্গীত-শিক্ষক	শ্রীযুক্ত জানকীনাথ বসু।
নৃত্য-শিক্ষক	শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু।
রঙ্গভূমি-সজ্জাকর	আশুতোষ পালিত।

'পাণ্ডব-গৌরব' গিরিশচন্দ্রের সুবিখ্যাত পৌরাণিক নাটক। এই নাটকের অভিনয়ে 'ক্লাসিক থিয়েটার' দেশব্যাপী গৌরবলাভ করিয়াছিল। নাটকের চতুর্থ অঙ্কে গিরিশচন্দ্র ভীমের মুখ দিয়া বলিয়াছেন, "মায়ায় সংসারে ধর্ম্ম মাত্র ধ্রুবতারা"—সেই ধর্ম্মের আবার সার ধর্ম্ম—'আশ্রিত রক্ষণ'—ইহাই নাটকের ভিত্তি।

দণ্ডীর উপাখ্যান মহাভারতের অন্তর্গত নহে, দণ্ডীপর্ব্ব বলিয়া একখানি পৃথক্ গ্রন্থ আছে, তাহা হইতেই এই নাটকের উপাদান সংগৃহীত। গিরিশচন্দ্র কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্ব্বে নাটকীয় ঘটনার কাল নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই কালনির্দ্দেশ তাঁহার নাটকত্ব-জ্ঞানের বিশেষ পরিচায়ক। দুই-চারিজন ব্যতীত ভারতের সকল বিশিষ্ট রাজাই কৌরবপক্ষ অবলম্বন করিয়াছে। পাণ্ডবপক্ষে এই দুই-চারিজন সহায়, আর ভরসা—ধর্ম্মবল এবং শ্রীকৃষ্ণ। এই সঙ্কট-সময়ে ঘটনাচক্রে শ্রীকৃষ্ণকে বৈরী করিতে হইল। যিনি এই বৈরিতার মূল তিনি আবার শ্রীকৃষ্ণের ভগিনী—"সুভদ্রা সম্বন্ধে যদু পরম আত্মীয়।" কিন্তু পাণ্ডবের বল ধর্ম্ম আর ভরসা যে শ্রীকৃষ্ণ, অরি—তিনিই, ইঁহারই সহিত সাংঘাতিক যুদ্ধে পাণ্ডবগণের প্রাণান্তিক পণ। ঘটনার সংঘর্ষে, ঘাত-প্রতিঘাতে, হৃদয়-দ্বন্দ্বে এবং চরিত্র-পরিপুষ্টিতে গিরিশচন্দ্রের 'পাণ্ডব-গৌরব' অপূর্ব্ব।

গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক চরিত্র

বীর এবং ভক্তি এই দুই রস এ নাটকের জীবন। গিরিশচন্দ্র পৌরাণিক চরিত্র বিকৃত করিয়া নাটক লিখিবার পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি বলিতেন, এইসকল

চরিত্র অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ব্যাস বাল্মীকির সৃষ্টির ছায়ামাত্র প্রতিফলিত করিতে পারিলেই যথেষ্ট কৃতিত্ব। আমাদের পুরাণ ভাব এবং চরিত্রসৃষ্টির অক্ষয় ভাণ্ডার, "এখনও পাঁচ সাতটা সেক্সপীয়ারকে আসিয়া শিখিতে হইবে, ব্যাস-রচিত ভারতে কি-কি ভাব আছে। ম্যাক্‌বেথ, হ্যামলেট, ওথেলো, লীয়ার প্রভৃতি সেক্সপীয়ার-রচিত উচ্চশ্রেণীর নাটক। এ সকল কঠোর নাটকেও পিতার আদেশে মাতার মস্তকছেদন নাই, গর্ভস্থ শিশুবধ নাই এবং কোন জাতীয় কোন নাটক বা কবিতায় সুপ্ত শিশুহন্তা অশ্বত্থামারও মার্জ্জনা নাই।" ("পৌরাণিক নাটক" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।)

কুরুপাণ্ডবের সাংঘাতিক সংঘর্ষের পূর্ব্বে এই নাটকের চরিত্র সকল যেন আগ্নেয়গিরির কন্দররুদ্ধ গৈরিকের ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিতেছে। একপক্ষে শ্রীকৃষ্ণ এবং অপরপক্ষে ভীষ্ম, ভীম, অর্জ্জুন এমনভাবে চিত্রিত এবং পরিপুষ্ট হইয়াছে যে সে ঔজ্জ্বল্যে গিরিশচন্দ্রের নাম বঙ্গ-সাহিত্যে চিরদিন সমুজ্জ্বল হইয়া থাকিবে। নাটকীয় ঘটনায় উর্ব্বশীর চরিত্র প্রধান হইলেও সুভদ্রা এই নাটকের নায়িকা। সুভদ্রা একদিকে যেমন প্রতিজ্ঞায় কঠিনা, অন্যদিকে তেমনই কারুণ্যে কোমলা।

কঞ্চুকী চরিত্রের বিশিষ্টতা

কিন্তু এই নাটকে অতি অপূর্ব্ব সৃষ্টি কঞ্চুকী, ব্রাহ্মণ সত্যভাষী সরলবিশ্বাসী এবং প্রভুর কল্যাণসাধনে দৃঢ়পণ ও নির্ভীক। বয়স যে কত হইয়াছে, তাহার নির্ণয় নাই, নিজেই একস্থানে বলিতেছে, "আচ্ছা ভাখ্, আমার কত বয়স ঠাওরাচ্ছিস্? খুব বয়স তো মনে কচ্ছিস? তা তাই বটে। আচ্ছা মনে কর, তোর মত ছুঁড়ীও দেখেছি, তার মত কেলে ছোঁড়াও দেখেছি। দেখেছি ত—বল? আচ্ছা। কিন্তু তার মত আমি ছোঁড়া দেখিনি। তার কি কল্লি বল? কেমন? তুই বলবি, আমি বুড়ো হ'য়ে বোকা হয়েছি, পুব পশ্চিম জানিনি। আমায় সেই ছোঁড়া বলেছিল, পুব-পশ্চিমের ধার ধারিসনে। বলেছিল, সব বিশ্বাস করিস।" (৩য় অঙ্ক, ৪র্থ গর্ভাঙ্ক) গিরিশচন্দ্র এই বৃদ্ধের মুখে বার্দ্ধক্যের যে ভাষা যোজনা করিয়াছেন, তাহাও অতি অপূর্ব্ব। তিনি তাঁহার নাটকে যে সকল বিদূষক-চরিত্র চিত্রিত করিয়াছেন, তন্মধ্যে 'জনা' ও 'তপোবনে'র বিদূষক (সদানন্দ) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কঞ্চুকী যদিচ বিদূষক নহে, কিন্তু অপর দুই বিদূষক নাটকে যে কাজ করিতেছে, কঞ্চুকীর বর্ত্তমান কার্য্য একইপ্রকারের। ইহারা সকলেই সত্যবাদী, সরলবিশ্বাসী এবং প্রভুর পরমহিতৈষী। কিন্তু অবস্থাগত হইয়া এই তিন চরিত্রই পরস্পর পৃথকভাবে গঠিত হইয়াছে। তুলনায় সমালোচনা করিবার পক্ষে আমাদের স্থানাভাব এবং অন্যান্য চরিত্রেরও উক্তি উদ্ধৃত করিয়া বিশদ আলোচনা করিতে হইলে সমগ্র পুস্তকখানি উদ্ধৃত করিতে হয়। এজন্য আমরা চরিত্রের মূলভাবের ইঙ্গিত মাত্র করিয়া ক্ষান্ত হইলাম।

গিরিশচন্দ্র স্বয়ং কঞ্চুকীর ভূমিকা গ্রহণ করিয়া সরল বিশ্বাসী, প্রভুভক্ত ব্রাহ্মণের

বিচিত্র হাবভাব এবং কথাবার্ত্তায় যেন মূর্ত্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। উদার, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, নির্ভীক ভীমের ভূমিকাভিনয়ে অমরেন্দ্রনাথ অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। সুভদ্রা, উর্ব্বশী, ভীম, দণ্ডী, শ্রীকৃষ্ণ, ঘেসেড়া, ঘেসেড়ানী প্রভৃতি প্রত্যেক চরিত্রেরই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অভিনয় দর্শনে দর্শকমণ্ডলী পরমপরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন। সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত জানকীনাথ বসু মহাশয়-কর্ত্তৃক সুমধুর সুর-সংযোজনায় এবং তাঁহার শিক্ষায় সুভদ্রার ভূমিকায় তিনকড়ি দাসী তাঁহার অসাধারণ অভিনেত্রী-গৌরবের সহিত সুগায়িকা বলিয়া পরিগণিতা হন।

কবিবর নবীনচন্দ্র সেন একদিন সস্ত্রীক অভিনয় দেখিতে আসিয়াছিলেন। অভিনয়ান্তে তিনি অমরবাবুকে বলেন, "অভিনয় দর্শনে মুগ্ধ হইয়াছি। কৃষ্ণসঙ্গিনীগণের গীত শ্রবণে আমরা দু'জনে কেবল কাঁদিয়াছি। গিরিশের আমরা গোলাম হইয়া রহিলাম।"

'পাণ্ডব-গৌরব' রচনা সম্বন্ধে একটি কথা

গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে থাকিয়া আমি যে সকল নাটকাদির লেখকতা করিয়াছি, সে সম্বন্ধে যেটুকু বিশেষত্ব দেখিয়াছি, পাঠকবর্গকে তাহা উপহার দিলাম। সাধারণতঃ নাটকের প্রথম দুই অঙ্ক লিখিতে তাঁহার একটু বিলম্ব হইত, যেন সন্তর্পণে পদক্ষেপ করিতেছেন। এমন অনেকসময় হইয়াছে যে প্রথম অঙ্ক এমনকি দ্বিতীয় অঙ্ক পর্য্যন্ত লিখিয়া তিনি নির্ম্মমভাবে ফেলিয়া দিয়া নূতন করিয়া আবার আরম্ভ করিয়াছেন। ক্রমে গল্প ও চরিত্র-পুষ্টির সঙ্গে-সঙ্গে তাঁহার ভাব ও কল্পনা যত স্ফূর্ত্তি পাইত, ততই রচনা দ্রুত চলিত এবং ছাঁচে ঢালাই করার মত সুস্পষ্ট আকার ধারণ করিত। এই 'পাণ্ডব-গৌরব' যখন লেখা হয়, রাত্রিজাগরণে অনভ্যাসবশতঃ লিখিতে-লিখিতে আমার সময়ে-সময়ে বিষম নিদ্রাকর্ষণ হইত। তিনি ইহাতে বিরক্ত হইয়া উঠিতেন। আমিও বিশেষ লজ্জিত হইতাম। এমনই করিয়া তৃতীয় অঙ্ক পর্য্যন্ত চলিল। চতুর্থ অঙ্কে এইরূপ বাধা অতিশয় বিরক্তিকর হইবে বুঝিয়া আমি সে রাত্রে লিখিবার সময়ে উপর্য্যুপরি তিন-চার বাটী চা পান করিলাম। আমার চক্ষে নিদ্রা নাই। যখন চতুর্থ অঙ্ক লেখা শেষ হইল, তখন রাত্রি আড়াইটা। গিরিশচন্দ্র বলিলেন, "আজ এই পর্য্যন্ত থাক্। তুমি শোও গে।" শোব কি, তখন আমার মনে হইতেছে যে মহানিদ্রা ব্যতীত এ চক্ষে আর ঘুম আসিবে না। তাঁহাকে বলিলাম, "আমার চক্ষে আদৌ ঘুম নাই, লেখা চলুক না কেন?" শুনিয়া তিনি বলিলেন, "বেশ, আমি প্রস্তুত, আমার সব সাজান রহিয়াছে। তুমি পারলেই হ'ল, লিখিতে চাও—লেখ।" পঞ্চম অঙ্ক আরম্ভ হইল। তিনি বিভোর হইয়া বলিয়া যাইতে লাগিলেন, আমিও দ্বিগুণ উৎসাহে লিখিয়া যাইতে লাগিলাম। নাটক সমাপ্ত হইল। সর্ব্বশেষে সঙ্গীত "হের হর-মনমোহিনী কে বলে রে কালো মেয়ে!" গানখানির প্রথম তিন ছত্র সঙ্গে-

সঙ্গে বাঁধিয়া তিনি বলিলেন, "থাক্, আজ এই পর্য্যন্ত। গানগুলি সব কাল বেঁধে দেব। তুমি দোর-জানালাগুলো খুলে দাও, ঘর বড় গরম হয়ে উঠেছে।" দরজা-জানালা খুলিয়া দেখি বিলক্ষণ রৌদ্র উঠিয়াছে, ঘড়ির পানে চাহিয়া দেখি বেলা তখন ৮টা। তিনি ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "যাও-যাও, বাড়ী যাও, স্নানাহার ক'রে সমস্ত দিন ঘুমিয়ে সন্ধ্যার পর এসো।"

দ্বিতীয়বার 'মিনার্ভা'য়

পাঠকগণ জ্ঞাত আছেন, মহেন্দ্রলাল দাসের জমী লিজ লইয়া নাগেন্দ্রভূষণবাবু 'মিনার্ভা' রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, এবং ঋণজালে জড়িত হইয়া অবশেষে তিনি তাঁহার বন্ধকাধীন (subject of mortgage) রঙ্গালয়ের অর্দ্ধাংশ শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ দাসকে বিক্রয় করেন।

তৎপরে উভয়ের দেনার দায়ে উক্ত বন্ধকাধীন থিয়েটার বাটী হাইকোর্টে নিলাম হয়, খুলনার উকীল স্বর্গীয় বেণীভূষণ রায় এবং বাবু অতুলচন্দ্র রায় উভয়ে উক্ত বাটী নিলামে খরিদ করেন। শ্রীপুরের (জেলা খুলনা) নাবালক জমীদার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সরকারের বিষয় সম্পত্তির (estate) উক্ত বেণীভূষণবাবু ম্যানেজার এবং অতুলবাবু তাঁহার সহকারী ছিলেন। নরেন্দ্রবাবু সাবালক হইয়া নাট্যানুরাগবশতঃ উঁহাদের নিকট উক্ত থিয়েটারবাটী উচ্চদরে ক্রয় করিয়া 'মিনার্ভা থিয়েটার' পরিচালনে প্রবৃত্ত হন।

নরেন্দ্রবাবু স্বয়ং নাট্যকার এবং অভিনেতা ছিলেন। 'মদালসা' নামক তৎ-প্রণীত একখানি নাটক 'মিনার্ভা থিয়েটারে' প্রথম অভিনীত হয়, এই সময়ে ৺দুর্গাদাস দে-প্রণীত 'শ্রী' নামক একখানি নাটক অভিনীত হইয়াছিল, উভয় নাটকেই তিনি নায়কের ভূমিকা অভিনয় করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার থিয়েটার সেরূপ জমিল না।

এদিকে 'ভ্রমর' ও 'পাণ্ডব-গৌরবা'দির অভিনয়ে 'ক্লাসিক থিয়েটার' বঙ্গ-নাট্যশালা-গুলির মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে, স্থানাভাবে শত-শত দর্শক ফিরিয়া যাইতেছে। উন্নতির এই চরম সময়ে কোনও কারণবশতঃ অমরবাবুর সহিত গিরিশচন্দ্রের মনোমালিন্য ঘটে। এই সুযোগে নরেন্দ্রবাবু 'মিনার্ভা থিয়েটার'কে উন্নীত করিবার জন্য গিরিশচন্দ্রের নিকট আসিয়া পরম আগ্রহের সহিত তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করেন। গিরিশচন্দ্র নরেন্দ্রবাবুর স্বরূপ অবস্থা শুনিয়া দয়াপরবশ চিত্তে তাঁহার থিয়েটারে যোগ দিলেন।

অমরবাবুর চিন্তা হইল পাছে নিষ্প্রভ 'মিনার্ভা থিয়েটার' গিরিশচন্দ্রের প্রভায় পুনরায় সমুজ্জ্বল হইয়া উঠে। তিনি গিরিশচন্দ্রকে 'ক্লাসিকে' আনিবার সঙ্কল্পে তাঁহার উপরে injunction বাহির করিবার জন্য হাইকোর্টে মকদ্দমা রুজু করিলেন। অমরবাবুর তরফে ব্যারিষ্টার ছিলেন মিঃ জ্যাক্সন, Mr. W. C. Bonnerjee এবং

মিঃ আর. মিত্র। গিরিশবাবুর তরফে ব্যারিষ্টার ছিলেন মিঃ ইভান্স ও মিঃ গার্থ। বিচারপতি সেল সাহেবের ঘরে মকদ্দমা হয়। তাঁহার বিচারে গিরিশচন্দ্রই জয়লাভ করেন।

'সীতারাম' অভিনয়

'মিনার্ভা'য় যোগদান করিয়া ত্বরায় নূতন নাটক অভিনয়ের আয়োজন করিবার জন্য গিরিশচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্রের 'সীতারাম' উপন্যাস নাটকাকারে পরিবর্তিত করিয়া দিলেন। মকদ্দমা প্রভৃতি লইয়া গিরিশচন্দ্র তখন এত ব্যস্ত ও বিব্রত যে নূতন নাটক রচনা করিবার সম্পূর্ণ সময়াভাব। এক সপ্তাহে 'সীতারাম' রিহারস্তালে পড়িল।

৯ই আষাঢ় (১৩০৭ সাল) 'সীতারাম' 'মিনার্ভা থিয়েটারে' প্রথম অভিনীত হয়। প্রথমাভিনয় রজনীর প্রধান-প্রধান অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ :

সীতারাম	গিরিশচন্দ্র ঘোষ।
গঙ্গারাম	শ্রীযুক্ত স্বরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু)।
চন্দ্রচূড়	অঘোরনাথ পাঠক।
মৃণ্ময়	শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ ঘোষ।
শাহ্ ফকীর	শ্রীযুক্ত কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
গঙ্গাধর স্বামী	ঠাকুরদাস চট্টোপাধ্যায় (দাসুবাবু)।
চাঁদশাহ্	শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দাস।
ফৌজদার-শ্যালক	অ্যাঙ্গাস [অনুকূলচন্দ্র বটব্যাল]।
ঐ মোসাহেব	শ্রীযুক্ত নীলমণি ঘোষ।
পিয়ারীলাল	শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল চক্রবর্ত্তী।
পাঁড়ে	কিশোরীমোহন কর।
চণ্ডাল	শ্রীযুক্ত চুণীলাল দেব।
শ্রী	তিনকড়ি দাসী।
জয়ন্তী	সুশীলাবালা।
নন্দা	সরোজিনী।
রমা	শ্রীমতী পুঁটুরানী।
মুরলা	শ্রীমতী সুধীরাবালা (পটল)।
ধাত্রী	শ্রীমতী হিঙ্গনবালা (হেনা)। ইত্যাদি।

উপন্যাস এবং নাটকে বৈশিষ্ট্য

দুই-চারিটী দৃশ্য ব্যতীত উপন্যাসের প্রায় সমস্ত দৃশ্য ও উক্তি গিরিশচন্দ্র নাটকে সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন। নূতন সংযোজিত দৃশ্যের ভিতর উল্লিখিত 'সীতারামে'র পরিণাম-দৃশ্যটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যে সহানুভূতি আকর্ষণ নাটকীয় চরিত্রসৃষ্টির প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, বঙ্কিমচন্দ্রের বর্ণিত পরিণামে তাহা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইয়া যায়। রূপজ মোহ সীতারামের সর্ব্বনাশের কারণ। বীর সীতারামকে বীরত্বের রমণীয় চিত্র দেখাইয়া সয়তান মজাইয়াছিল, কিন্তু মজাইলেও সয়তান একেবারে তাহাকে মনুষ্যত্ব-হীন করিতে পারে নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের বর্ণনায় এই মনুষ্যত্ব বিকারে পরিণত হইয়াছে, কিন্তু গিরিশচন্দ্রের পরিণাম-দৃশ্যে তাহা উজ্জ্বলভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। নাটকের এই পরিণাম-দৃশ্যে সীতারামের অন্তর্দ্বন্দ্বে দর্শকবৃন্দ সীতারামের উপর সম্পূর্ণ সহানুভূতি-সম্পন্ন হইয়া অশ্রুসিক্ত নয়নে রঙ্গালয় ত্যাগ করেন, ইহা আমরা বহুবার দেখিয়াছি। উপন্যাস এবং নাটকের পার্থক্য আরও একটু বিশদভাবে আলোচনা করিলে আমাদের বক্তব্য পাঠকবর্গের হৃদয়ঙ্গম হইবে। উপন্যাসে সীতারামের পরিণাম বর্ণিত হইয়াছে, "সীতারাম অনায়াসে নিজ মহিষী ও পুত্রকন্যা ও হতাবশিষ্ট সিপাহীগণ লইয়া মুসলমান কটক কাটিয়া বৈরিশূন্য স্থানে উত্তীর্ণ হইলেন।" শ্রী ও জয়ন্তী সম্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে, "সেই রাত্রিতে তাহারা কোথায় অন্ধকারে মিশিয়া গেল—কেহ জানিল না।" ইহারই পূর্ব্বে শ্রী, সীতারামের পায়ে হাত দিয়া বলিয়াছে, "আমি আর সন্ন্যাসিনী নই, আমার অপরাধ ক্ষমা করিবে? আমায় আবার গ্রহণ করিবে?" পাঠক এবং দর্শককে এতদূর পর্য্যন্ত প্রস্তুত করিয়া আনিয়া বঙ্কিমবাবুর বর্ণিত অনিশ্চিত পরিণাম চিত্তাকর্ষক হয় না। শ্রী মৃত্যুসঙ্কল্প করিয়া আসিয়াছিল। তাহা ঘটিল না। সীতারামও মৃত্যুসঙ্কল্প করিয়া দুর্গের বাহির হইয়াছিলেন, কিন্তু কতকটা তাঁহার নিজের বীর্য্যের এবং কতকটা ভগবানের অনুকম্পায় তাহা ঘটিল না। সীতারামের চরিত্রহীনতায় ভাগ্যের পরিবর্ত্তনে তাঁহার মস্তিষ্কে যে বিপর্যয় উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে পতি-পত্নীভাবে শ্রী ও সীতারামের মিলন সম্ভবপর নহে। গিরিশচন্দ্র এইরূপ অবস্থায় যে পরিণাম-দৃশ্য কল্পনা করিয়াছেন, আমরা তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। পাঠক তাহা হইতে গিরিশচন্দ্রের কৃতিত্ব বুঝিবেন।

ভাগ্য-বিপর্য্যয়ে যেন কুহকাচ্ছন্ন সীতারাম জীবনের ঘটনা বিশ্লেষণ করিয়া আপনাকে আপনি ঠিক চিনিতে পারিতেছেন না, ভাবিতেছেন, "জীবনে কোন্‌টা ঠিক? আমি সীতারাম—ভারতবিজয়ী যবন বিরুদ্ধে হিন্দুরাজ্য সংস্থাপন ক'রবো—সেইটে ঠিক?—একাকী প্যারীলালের সাহায্যে যবন সৈন্য জয় করেছি—সেইটে ঠিক? হিন্দুর জন্য সর্বস্ব অর্পণ ক'রে জীবনদানে প্রস্তুত ছিলেম—সেইটে ঠিক? কি রণরঙ্গিণী মূর্ত্তি দেখে উন্মাদ হয়েছিলেম—সেইটে ঠিক? তার জন্য পতিপ্রাণা রমার মৃত্যুর কারণ হয়েছিলেম, সেইটে ঠিক? নন্দার বিষপানে মৃত্যু—সন্তান-সন্ততির মুখে মিষ্টান্নের ন্যায় বিষ প্রদান—সেইটে ঠিক?—না কোন্‌টা ঠিক? আমি কোন্ সীতারাম? প্রজাপালক

হিন্দুধর্ম-সংস্থাপক—আত্মত্যাগী—পরহিতব্রত সীতারাম—সেইটে ঠিক না কোনটা ঠিক ? না কামুক সীতারাম—সেইটে ঠিক ?"

ভাবনার কূল না পাইয়া হৃদয়-দ্বন্দ্বে ব্যাকুল হইয়া সীতারাম কাতরপ্রাণে ভাবিতেছেন, "দেহসুখ এ মর্ম্মান্তিক দুঃখের কারণ—সত্যই কারণ,—বোধহয় বুঝেছি, না বুঝে থাকি—ভগবান। এ দুঃখের সময় বুঝিয়ে দাও!" সীতারামের স্ত্রীর প্রতি বিরাগ আসিয়াছে কিন্তু মোহ কাটিতেছে না, এই সময়ে স্ত্রী আসিয়া বলিল, "মহারাজ, আমায় গ্রহণ করুন।" বিক্ষিপ্তচিত্ত সীতারাম বলিলেন, "ক'রবো—ক'রবো—গ্রহণ ক'রবো,—নদীর জলে গ্রহণ ক'রবো কি কোথায় গ্রহণ ক'রবো ? দেখ—অট্টালিকায় গেলে তোমার সঙ্গে আমার কথা হবে না—সেথা রমা ম'রেছে—আমায় ভালবেসে মরেছে! নদীর জলে তোমায় গ্রহণ করা হবে না—যবন সৈন্য মরেছে! প্রান্তরে তোমায় গ্রহণ করা হবে না—প্রান্তরে অনেক প্রাণনাশ হ'য়েছে! নগরে তোমায় গ্রহণ করা হবে না—সোনার মহম্মদপুর ভস্মীভূত হ'য়েছে। কুটীরে তোমায় গ্রহণ করা হবে না—কুটীর শূন্য ক'রে কুটীরবাসী পালিয়েছে! ক'রবো—ক'রবো—গ্রহণ ক'রবো—চল স্থান খুঁজিগে চল! ক'রবো—ক'রবো—গ্রহণ ক'রবো আমার এখনও মমতা যায় নি। ক'রবো—ক'রবো—তোমায় গ্রহণ ক'রবো, চল—চল—স্থান খুঁজিগে চল! তুমি কি আমায় চাও ? তবে এস—স্থান খুঁজিগে চল!"

'সীতারাম' নাটকের শিক্ষাদান

'সীতারামে'র প্রত্যেক চরিত্রই অতি সুন্দররূপে অভিনীত হইয়াছিল, এমনকি, চণ্ডাল, প্যারীলাল, পাঁড়ে, ফৌজদার-শ্যালক প্রভৃতি ছোট-ছোট ভূমিকাগুলি যেন একটী ছবি হইয়াছিল। নাটকের সর্ব্বশেষ দৃশ্যে গিরিশচন্দ্র যে অভিনয়-প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা অতুলনীয়।

নাটকখানির নিখুঁত অভিনয় প্রদর্শনের নিমিত্ত গিরিশচন্দ্র অতি যত্নের সহিত শিক্ষাদান করিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং নৃত্য-গীতে পারদর্শী না হইলেও একজন উচ্চদরের সমজদার ছিলেন, তাঁহার নাটকাদির গানে যে সকল সুর বা নৃত্য সংযোজিত হইত, তন্মধ্যে যেগুলি তাঁহার মনোমত না হইত, সে সকল গান বা নৃত্যের ভাবোপযোগী তিনি একটী 'আদরা' করিয়া দিতেন, সেই আদর্শে সঙ্গীত এবং নৃত্য-শিক্ষক উভয়ে গানের সুর ও নৃত্যের ভঙ্গি ঠিক করিয়া লইতেন। 'আবু হোসেন' গীতিনাট্যের "রাম রহিম না জুদা করো" গীতটীর সুর সঙ্গীতাচার্য্য দেবকণ্ঠবাবু এবং বর্ত্তমান 'সীতারাম' নাটকের উড়েনীগণের নৃত্যের ভঙ্গি নৃত্যাচার্য্য রাণুবাবু এইরূপে গিরিশচন্দ্রের নিকট ঠিক করিয়া লইয়াছিলেন। 'বিষাদ' নাটকের "হেরি চম্পক কলি পড়ে ঢলি ঢলি" গীতটীর সুর গিরিশচন্দ্র স্বয়ং প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত বহু সঙ্গীতের সুরের মুখপাত তাঁহারই করা।

উপন্যাস এবং নাটকের পার্থক্য আর-একদিক দিয়া আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিব। সীতারাম মুষ্টিমেয় সৈন্য লইয়া সূচিব্যূহ প্রস্তুত করিয়া বিশাল সাগরের ন্যায় মুসলমান সৈন্য ভেদ করিতেছেন, এই সময় শ্রী ও জয়ন্তী গাহিতেছে :

"জয় শিব শঙ্কর ত্রিপুর নিধনকর
রণে ভয়ঙ্কর! জয় জয়রে!
চক্র গদাধর! কৃষ্ণ পীতাম্বর!
জয় জয় হরিহর! জয় জয়রে!"

'সীতারাম', ৩য় খণ্ড, ত্রয়োবিংশতম পরিচ্ছেদ।

যাঁহারা হরিহর—এক আত্মা বুঝিয়াছেন এবং জীবন-মরণ ভেদজ্ঞান রহিত হইয়াছেন, এ সঙ্গীত সেই সন্ন্যাসিনীদের উপযোগী। শ্রীভগবান রক্ষাকর্ত্তা, তাঁহার নিকট বিজয় প্রার্থনা করা এই সঙ্গীতের প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু নাট্যকবিকে অবস্থা বিবেচনা করিয়া সঙ্গীত সংযোজন করিতে হয়। এস্থলে মুষ্টিমেয় সৈন্য অসাধ্যসাধনে অগ্রসর হইতেছে, তাহাদের একমাত্র ভরসা নিজের বীর্য্যবল। এই নিমিত্ত প্রলয়ের চিত্র সম্মুখে রাখিয়া মৃত্যুঞ্জয়ের জয়গান করিতে-করিতে মৃত্যুকে অগ্রাহ্য করিয়া অগ্রসর হওয়াই অধিকতর উপযোগী। গিরিশচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রের উক্ত সঙ্গীতের পরিবর্ত্তে নিম্নলিখিত সঙ্গীতটী যোজনা করিয়াছিলেন :

"ত্রিপুরান্তকারী, ভৈরব শূলধারী, ভুবন সংহার কারণ হে।
ঊর্দ্ধ বদনে 'নাশ নাশ' রব, সৃষ্টিধ্বংসকর প্রলয় ভৈরব,
বব ব্যোম্ বব ব্যোম্ ঘোর রব, দশ-দিশা-গ্রন্থি ভঞ্জন হে॥
ভূতপ্রেত সনে তাণ্ডব নর্ত্তন, টল টল ঢল ঢল ত্রিভুবন—
পদভরে কম্পন, আপন জীবননাশন হে॥"

সুবিখ্যাতা অভিনেত্রী এবং সুধাকণ্ঠী গায়িকা পরলোকগতা সুশীলাবালা এই নাটকে জয়ন্তীর ভূমিকা অভিনয়ে বিশেষরূপ সুযশ অর্জ্জন করিয়াছিলেন। এই জয়ন্তীর ভূমিকাভিনয়ই সুশীলাবালার প্রতিষ্ঠার মূল। গিরিশচন্দ্র রচিত নিম্নলিখিত জয়ন্তীর গীতখানি সে সময়ে সাধারণে অতিশয় প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল :

"উদার অম্বর, শূন্য সাগর, শূন্যে মিলাও প্রাণ।
শূন্যে শূন্যে ফোটে কত শত ভুবন,
তারকা চন্দ্রমা কত শত তপন,
শূন্যে ফোটে অভিমান॥
অহম অহম্ ইতি শূন্যে বিভাসিত,
শূন্যে বিকশিত মনোবুদ্ধিচিত,
মদ-মাৎসর্য্য, ভোক্তা-ভোজ্য, শূন্য সকলি এ ভান॥"

খোদার উপর খোদকারি

"মিনার্ভা থিয়েটারে' 'সীতারাম' অভিনয়কালীন 'ক্লাসিক থিয়েটারে'ও অমরবাবু 'সীতারামে'র অভিনয় ঘোষণা করেন। যে সময়ে উভয় থিয়েটারে 'সীতারাম' অভিনীত হইতেছিল, সে সময়ে একদিন 'মহাভারত'-নাট্যকার স্বর্গীয় প্রফুল্লচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 'বেঙ্গল থিয়েটারে'র কোনও বিশিষ্ট কর্ত্তৃপক্ষকে বলেন, "আপনারাও 'সীতারাম', অভিনয় করুন না?" তিনি উত্তরে বলেন, "আমরা তো 'সীতারাম' বহুদিন পূর্ব্বে 'বেঙ্গল থিয়েটারে' অভিনয় করেছি। নাটকে আমরা যেটুকু নূতনত্ব করিয়াছিলাম, গিরিশবাবু বা অমরবাবু কেহই তাহা পারেন নাই।" প্রফুল্লবাবু সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিরূপ?" তিনি বলিলেন, "মেনা হাতীর (মৃন্ময়) সহিত আমরা জয়ন্তীর বিবাহ দিয়াছিলাম।" প্রফুল্লবাবু বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "সে কি মহাশয়, জয়ন্তী যে সন্ন্যাসিনী?" উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, "বঙ্কিমবাবু জয়ন্তীকে সমস্ত জীবন সন্ন্যাসিনীর অবস্থাতেই রেখে দিয়েছেন। আমরা ভাবলুম, একটা সুন্দরী যুবতী চিরকালটাই কি গেরুয়া পরে চিম্‌টে ঘাড়ে করে বেড়াবে,—তাই তার একটা হিল্লে করে দিয়েছিলুম। মৃন্ময়কে না মেরে তারই সঙ্গে শেষটা জয়ন্তীর বিবাহ দিয়ে ছুঁড়িটার একটা গতি ক'রে দেওয়া গেল।"* ইহার উপর আর কথা কি?

'মণিহরণ'

৭ই শ্রাবণ (১৩০৬ সাল) 'মিনার্ভা থিয়েটারে' গিরিশচন্দ্রের 'মণিহরণ' গীতিনাট্য প্রথম অভিনীত হয়। প্রথমাভিনয় রজনীর অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ:

সত্রাজিত	শ্রীযুক্ত চুণীলাল দেব।
জাম্বুবান	অঘোরনাথ পাঠক।
সত্রাজিত-দূত	শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ ঘোষ।
সূর্য্য	শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সরকার।
উষা	শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল চক্রবর্ত্তী।
শ্রীকৃষ্ণ	সুশীলাবালা।
প্রসেন	অ্যাজাস [অনুকূলচন্দ্র বটব্যাল]।
কুমার	শ্রীমতী চারুশীলা।
জাম্বুবান দূতত্রয়	জ্ঞানকালী চট্টোপাধ্যায়, মাণিকলাল ভট্টাচার্য্য ও প্রমথনাথ ঘোষ।
রুক্মিণী	শ্রীমতী পান্না (পানি)।

* 'রঙ্গালয়ের রঙ্গকথা' পুস্তকের ২৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

রাণী	সরোজিনী।
জাম্বুবতী	শ্রীমতী হিঙ্গলবালা (হেনা)।
সহচরীদ্বয়	শ্রীমতী প্রকাশমণি ও নগেন্দ্রবালা। ইত্যাদি।
সঙ্গীত-শিক্ষক	শ্রীযুক্ত দেবকণ্ঠ বাগচি।
নৃত্য-শিক্ষক	শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (রাণুবাবু)।
রঙ্গভূমি-সজ্জাকর	ধর্ম্মদাস সুর।

'মণিহরণ' রচনার কথা

জাম্বুবতীর বিবাহ বা স্যমন্তক মণি উদ্ধারে শ্রীকৃষ্ণের কলঙ্কমোচন—এই পৌরাণিক বিষয় লইয়া 'মণিহরণ' রচিত হয়। এই গীতিনাট্যখানি রচনার একটু বিশেষত্ব আছে। তৎকালে প্রত্যেক শনিবারে মহাসমারোহে 'সীতারাম' অভিনীত হইতেছে; গিরিশচন্দ্র 'সীতারামে'র ভূমিকায় রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হন। সেদিন রবিবার, 'প্রফুল্ল' অভিনয়—যোগেশ গিরিশচন্দ্র, তখনও অভিনয় আরম্ভ হয় নাই। চুণীলালবাবুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা 'মিনার্ভা থিয়েটারে'র সুপ্রসিদ্ধ ব্যাণ্ডমাষ্টার নন্তিবাবু (স্বর্গীয় নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব) গিরিশচন্দ্রকে বলিলেন, "রবিবার আপনার একখানি পুরাতন নাটকের সঙ্গে আপনার নূতন একখানি ছোট গীতিনাট্য যোগ করিয়া দিলে, আপনাকে আর উপরি-উপরি দুই দিন খাটিতে হয় না।" গিরিশচন্দ্র বলিলেন, "দুই রাত্রি অভিনয়ের পর কল্য দিবাভাগে একটু বিশ্রাম না করিলে লিখিতে বসি কিরূপে? অথচ নূতন বহিখানি লেখা শেষ করিয়া কল্য সোমবার হইতেই রিহারস্যালে ফেলিতে না পারিলে নৃত্যগীত-শিক্ষা হইবে কি করিয়া? নাচগানই গীতিনাট্যের প্রধান অঙ্গ। কথা যেন মুখস্ত হইল, সুচারুরূপে নৃত্যগীত-শিক্ষা না হইলে বই তো জমিবে না। আচ্ছা—দেবগুরু প্রসাদে জিহ্বাগ্রে সরস্বতী (এইরূপ সঙ্কটের সময় গিরিশচন্দ্রের মুখে অনেকবার আমরা এই উক্তিটী শুনিয়াছি)—, কাগজ-কলম নিয়ে এসো, ঠাকুরের কৃপায় আমি আজই বই লিখে দিচ্চি।" লেখক কাগজ-কলম আনিলে, সঙ্গে-সঙ্গে বিষয় নির্ব্বাচন করিয়া রচনা আরম্ভ হইল।

তিনি একবার অভিনয় করিতে রঙ্গমঞ্চে গমন করেন, আবার আসিয়া বই লিখিতে বসেন। একজন হুঁসিয়ার্ লোককে নিয়োগ করা হইল—সে যেন তাঁহার অভিনয়-কাল উপস্থিত হইলেই যথাসময়ে আসিয়া তাঁহাকে খবর দেয়। এইরূপে অভিনয়ের অবসরে-অবসরে গীতিনাট্যখানি রচিত হইয়া গেল। অভিনয়ান্তে ষ্টেজে বসিয়া এই গীতিনাট্যের আটাশখানি গান বাঁধিয়া দিয়া চুণীলালবাবুকে বলিলেন, "ইচ্ছা করো, আর-একখানি নক্সা আজই লিখিয়া দিতে পারি।" চুণীবাবু সাগ্রহে সম্মতি জানাইলে তিনি সেই রাত্রেই 'Charitable Dispensary' নামক আর-একখানি পঞ্চরং লিখিয়া দিয়া বাটী আসিলেন। সপ্তাহ মধ্যেই নাচ-গান ও রিহারস্যাল সম্পূর্ণ হইয়া রবিবারে 'মণিহরণ'

প্রশংসার সহিত অভিনীত হয়। 'Charitable Dispensary' পরে অভিনীত হইবার কথা ছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইহার পাণ্ডুলিপি থিয়েটার হইতেই হারাইয়া যায়।

রায়সাহেব স্বর্গীয় বিহারীলাল সরকার অভিনয় দর্শনে পরম প্রীত হইয়া তৎ-সম্পাদিত 'বঙ্গবাসী' পত্রে (১৩ই শ্রাবণ ১৩০৭ সাল) এক সুদীর্ঘ সমালোচনা বাহির করেন, তাহা হইতে কয়েকছত্র মাত্র উদ্ধৃত করিলাম :

"বিবিধ পূর্ণপ্রস্ফুট কুসুমরাজি-বিরাজিত পৌরাণিক কাব্যোদ্যানের কোন প্রান্ত নিপতিত অনাদৃত উপেক্ষিত একটী ঈষদ্ মুকুলিত কুসুম লইয়া গিরিশবাবু তাহাতে স্বকীয় নাটকীয় কল্পনা-প্রসূত নূতন চরিত্র, গীত, নৃত্য, ভাব, রসের ললিত লতাপুষ্প, আর শ্যামল কিশলয়গুচ্ছ জড়াইয়া, নয়ন-মন প্রীতিপ্রদ তোড়া তৈয়ারী করিয়াছেন।" ইত্যাদি।

'নন্দদুলাল'

১লা ভাদ্র (১৩০৭ সাল) জন্মাষ্টমী উপলক্ষ্যে 'মিনার্ভা থিয়েটারে' গিরিশচন্দ্রের 'নন্দদুলাল' গীতিনাট্য প্রথম অভিনীত হয়। প্রথমাভিনয় রজনীর অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ :

কংস	কিশোরীমোহন কর।
কংস-পারিষদ ও আয়ান	দানিবাবু [সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ]।
বসুদেব ও ১ম ব্রাহ্মণ (বাচস্পতি)	অঘোরনাথ পাঠক।
নন্দ	অ্যাঙ্গাস [অনুকূলচন্দ্র বটব্যাল]।
উপানন্দ	শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল চক্রবর্ত্তী।
বলরাম	শ্রীমতী পুঁটুমণি।
শ্রীকৃষ্ণ, দেবকী ও দারোয়ানী	তিনকড়ি দাসী।
শ্রীদাম, যোগমায়া ও বৃন্দা	শ্রীমতী সুধীরাবালা (পটল)।
সুবল ও নিদ্রা	শ্রীমতী হরিমতী।
বসুদাম ও তন্দ্রা	শ্রীমতী প্রমদাসুন্দরী (ছোট)।
১ম দারোয়ান ও হিজড়া	রাণুবাবু [শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়]।
২য় দারোয়ান ও ৪র্থ ব্রাহ্মণ (শিরোমণি)	শ্রীযুক্ত নিখিলেন্দ্রকৃষ্ণ দেব।
২য় ব্রাহ্মণ (তর্কালঙ্কার)	মাণিকলাল ভট্টাচার্য্য।
৩য় ব্রাহ্মণ (বিদ্যাবাগীশ)	প্রমথনাথ ঘোষ।
গোপ	শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সরকার।

স্বপ্ন ও বিশাখা	শ্রীমতী পান্না (পানি)।
যশোদা	সরোজিনী।
রোহিনী ও ললিতা	বসন্তকুমারী।
বিষ্ণুপ্রাণা, রাধিকা ও গোপিনী	সুশীলাবালা।
জটিলা	নগেন্দ্রবালা।
কুটিলা	শ্রীমতী প্রকাশমণি। ইত্যাদি।
সঙ্গীত-শিক্ষক	শ্রীযুক্ত দেবকণ্ঠ বাগচী ও শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সরকার।
নৃত্য-শিক্ষক	রাণুবাবু [শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়]।

এই ত্রয়াঙ্ক পৌরাণিক গীতিনাট্যখানি জন্মাষ্টমী উপলক্ষ্যে লিখিত হয়। প্রথম অঙ্কে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম, দ্বিতীয় অঙ্কে শ্রীকৃষ্ণের অন্নভিক্ষা এবং তৃতীয় অঙ্কে কৃষ্ণকালী—এই তিনটী বিষয় নাট্যাকারে গ্রথিত হইয়াছে। 'মণিহরণ' গীতিনাট্যখানি যেরূপ চলিয়াছিল, এখানি যদিচ সেরূপ চলে নাই, কিন্তু প্রতি বৎসর জন্মাষ্টমীতে ইহার প্রথম অঙ্ক 'জন্মাষ্টমী' নামে প্রত্যেক সাধারণ বঙ্গ-নাট্যশালায় অভিনীত হইয়া থাকে। নন্দোৎসবের জমাট দুইখানি গান নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

১ম। নন্দালয়ে হিজড়াগণ :

কেলে গোপাল দোলে কোলে।
কেলে ছেলে আলো দিচ্চে ঢেলে॥
হিজড়া নেবে ছেলের আলাই-বালাই,
জীও খোকা, কালী মায়ীর দোহাই ;
নেব জোড়া টাকা, নেব জোড়া শাড়ী,
না পেলে হিজড়া ফিরবে না বাড়ী ;
খোকা নিয়ে বুকে, চাঁদ মুখটী দেখে,
লাখে লাখে চুমো দে কেলে-চাঁদের মুখে,
মার কোল জুড়ে খেলবে কেলে ছেলে॥

২য়। নন্দালয়ে গোপ-গোপিনীগণ :

দৈ ঢেলে দে হলুদ গুলে,
আমাদের ঢেউ উঠেছে গোকুলে।
নন্দ ঘোষের ঘর ক'রে আলো,
দেখ্‌, দেখ্‌, কে কালো এলো—
যশোমতীর কোল জোড়া হলো ;
গোকুলবাসী সবাই মিলে, নাচি আয় কুতূহলে,
নন্দের গোপাল থাকুক কুশলে,
দেখবে কে কালোনিধি, দেখলে যাই আপন ভুলে।

'দোললীলা'

'নন্দদুলাল' যেরূপ জন্মাষ্টমী উপলক্ষ্যে লিখিত হইয়াছিল, সেইরূপ 'আগমনী' ও 'অকাল বোধন' ৺শারদীয়া পূজা উপলক্ষ্যে এবং 'দোললীলা' ১২৮৪ সাল, ফাল্গুন মাসে দোল উৎসব উপলক্ষ্যে লিখিত হইয়াছিল, তিনখানিই 'ন্যাসান্যাল থিয়েটারে' অভিনীত হয়। 'আগমনী' ও 'অকাল বোধন' সম্বন্ধে ১৩৬-৩৭ পৃষ্ঠায় আমরা আলোচনা করিয়াছি; কিন্তু ভ্রমক্রমে 'দোললীলা' সম্বন্ধে কোন কথা বলা হয় নাই। এই ক্ষুদ্র গীতিনাট্যখানি স্বর্গীয় কেদারনাথ চৌধুরী মহাশয় পুস্তকাকারে প্রকাশিত করেন। তিনি গ্রন্থের প্রারম্ভে নিম্নলিখিতরূপ ভূমিকাটী লিখিয়াছিলেন :

"ন্যাশন্যাল থিয়েটারের অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণের কার্য্য-সৌকর্য্যার্থে মাত্র, দোললীলা নামক অত্র নাট্যরাসক পুস্তকখানি প্রকাশিত হইল। গ্রন্থকারের গানগুলি রচনা করিবার সময় দুইটি অনুরোধ রক্ষা করিতে হইয়াছিল। প্রথমটি,—দোললীলা আদ্যন্তই আনন্দসূচক—অন্য রসের কিছুমাত্র সমাবেশ থাকে না। অথচ নাটকাকারে লিখিত হইলে অপর রসের অবতারণার প্রয়োজন। সুতরাং গ্রন্থকারকে প্রাচীন রাসলীলা হইতে ইহার আভাস লইতে হইয়াছে। দ্বিতীয়টি, হোরি শ্রেণীর গীতি বঙ্গভাষায় ছিল না, হিন্দি ভাষায় ইহার প্রাচুর্য্য দেখা যায়, তাতে কবিই গায়ক, সুরের ও ছন্দের জন্য তাঁহাকে ব্যস্ত হইতে হয় না। আমাদের গ্রন্থকারের হিন্দি গানের অবয়বের উপর লক্ষ্য রাখিতে হইয়াছে। অনুরোধে কবিতা হয় না। ইহাতে কবিত্ব আছে কিনা জানিয়া সাধারণে দেখিবেন। শ্রীকেদার চৌধুরী—প্রকাশক।"

পুনরায় 'ক্লাসিকে'

গিরিশচন্দ্রকে 'মিনার্ভা থিয়েটারে' আনিয়া আর্থিক সচ্ছলতা হইলেও নরেন্দ্রবাবু আন্তরিক তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলেন না। তাঁহার অভিপ্রায় ছিল, তিনি নাটক লিখিবেন এবং নাটকের প্রধান-প্রধান ভূমিকা অভিনয় করিবেন। গিরিশচন্দ্র তাঁহাকে ভরসা দিয়াছিলেন, "তুমি কিছুদিন অপেক্ষা করো, 'ক্লাসিকে'র সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আগে থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা হউক, তাহার পর তোমাকে আমি তৈয়ারী করিয়া নিব।" কিন্তু নরেন্দ্রবাবু ধৈর্য্য ধরিতে পারিলেন না। এইসময় সুযোগপ্রয়াসী তাঁহার কয়েকজন স্বার্থপর উপদেষ্টা বিবিধপ্রকারে তাঁহার কর্ণে কুমন্ত্রণা দিতে আরম্ভ করিল। ইহাদেরই প্ররোচনায় নরেন্দ্রবাবু গিরিশচন্দ্রের সহিত অকৌশল করিয়া ফেলিলেন এবং যাহারা স্বার্থসাধনের জন্য তৎপর হইয়াছিল, তাহারা সত্বরেই কৃতকার্য্য হইল। অপরিণতবুদ্ধি নরেন্দ্রনাথ আপনার ইষ্ট ভুলিয়া তাঁহার ইষ্টেটের তৎকালীন ম্যানেজার স্বর্গীয় অতুলচন্দ্র রায়ের সহযোগে গিরিশচন্দ্রের এগ্রিমেণ্ট বাতিল (cancel) করিলেন।

ওদিকে অমরেন্দ্রনাথও আপনার ভুল বুঝিতে পারিয়া গিরিশচন্দ্রকে পুনরায়

'ক্লাসিকে' লইয়া যাইবার জন্য বিশেষভাবে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। তিনি এ সুযোগ ছাড়িলেন না। গিরিশচন্দ্রের নিকট আসিয়া আত্মত্রুটী স্বীকার এবং মার্জ্জনাভিক্ষা করিয়া গিরিশচন্দ্রকে পুনরায় তাঁহার 'ক্লাসিকে' লইয়া আসিলেন; এবং তাঁহার থিয়েটারের 'হ্যাণ্ডবিলে' (৬ই অগ্রহায়ণ ১৩০৭ সাল) 'বিশেষ দ্রষ্টব্য' উল্লেখ করিয়া নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপন বাহির করিলেন:

"নাট্যামোদী সুধীবৃন্দকে আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, নটকুলচূড়ামণি পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের সহিত, আমাদের সকল বিবাদ-বিসম্বাদ মিটিয়া গিয়াছে। বাঙ্গালায় যে কয়েকটী স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত হইয়াছে, সকলগুলিরই সৃষ্টিকর্ত্তা—শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র! প্রায় সকল অভিনেতা ও অভিনেত্রীই—'গিরিশচন্দ্রের' শিক্ষায় গৌরবান্বিত! তাহার মধ্যে আমি একজন। গিরিশবাবুর সহিত বিবাদ করিয়া, নিতান্তই ধৃষ্টতার পরিচয় দিয়াছিলাম—বড়ই সুখের বিষয়, সমস্ত মনোমালিন্য অন্তর হইতে মুছিয়া ফেলিয়া, তাঁহার স্নেহময় কোলে আবার তিনি টানিয়া লইয়াছেন। গিরিশবাবুর কোনও থিয়েটারের সহিত, এখন কোনও প্রকার সম্বন্ধ নাই। তাঁহার সমস্ত নূতন নূতন নাটক, গীতিনাট্য ও পঞ্চরং এখন 'ক্লাসিকে' অভিনীত হইবে। 'ক্লাসিক থিয়েটার' ব্যতীত অপর কোনও রঙ্গমঞ্চের সহিত গিরিশবাবুর কিছুমাত্র সম্পর্ক নাই। শ্রীযুক্ত 'গিরিশচন্দ্র' এখন 'ক্লাসিকের'! নিবেদনমেতি।"

গিরিশচন্দ্র 'ক্লাসিকে' যোগ দিলে নরেন্দ্রবাবুও বুঝিলেন তিনিও বিষম ভুল করিয়াছেন; কিন্তু গিরিশচন্দ্র এই অব্যবস্থচিত্ত যুবকের উপর কোনওরূপ আস্থা স্থাপন করিতে পারিলেন না। নরেন্দ্রনাথের সকল দিক দিয়া সকল চেষ্টাই বিফল হইল।

কন্যার মৃত্যু

'ক্লাসিকে' যোগদান করিবার অল্পদিন পরেই অগ্রহায়ণ মাসের (১৩০৭ সাল) কৃষ্ণা ত্রয়োদশী তিথিতে, গিরিশচন্দ্রের একমাত্র কন্যার সূতিকারোগে মৃত্যু হয়। নানারূপ চিকিৎসায় গিরিশচন্দ্র কন্যার জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন; তথাপি মৃত্যুর পূর্ব্বদিনে কন্যা যখন বলিলেন, "বাপি যদি তারকেশ্বরে গিয়া আমার জন্য বাবার চরণামৃত লইয়া আসে, তাহা হইলে আমি ভাল হই।" মুমূর্ষু কন্যার তৃপ্তির জন্য তিনি তৎপরদিন তারকেশ্বরে গমন করেন। আমিও তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিলাম। মোহান্তের গদিতে পূজার টাকা জমা দিবার সময় জনৈক কর্ম্মচারী গিরিশচন্দ্রের দিকে পুনঃ-পুনঃ চাহিয়া বলিলেন, "মহাশয়কে যেন পূর্ব্বে কোথায় দেখিয়াছি।" গিরিশচন্দ্র বলিলেন, "আমি থিয়েটারের নটো গিরিশ ঘোষ।" লোকটী আপ্যায়িত করিবার পূর্ব্বেই তিনি বাবার মন্দিরে পূজা দিবার নিমিত্ত প্রবেশ করিলেন। পূজা দিয়া তিনি গম্ভীরভাবে মন্দির হইতে বাহির হইলেন। পূজা দিয়া গিরিশচন্দ্রের মনে আশার সঞ্চার হয় নাই। কলিকাতায় যখন আমরা ফিরিয়া আসিলাম, তখন তাঁহার প্রিয়তমা

কন্যার দেহ ভস্মীভূত হইয়াছে। এই দুহিতা একটী কন্যা ও তিনটী অপোগণ্ড পুত্র রাখিয়া সতীলোকে গমন করেন। তন্মধ্যে মধ্যমপুত্র ও কন্যাটী গিরিশচন্দ্রের জীবিতাবস্থাতেই ইহলোক ত্যাগ করে। শ্রীমান দুর্গাপ্রসন্ন ও ভগবতীপ্রসন্ন বসুকে রাখিয়া গিরিশচন্দ্র মানবলীলা সংবরণ করেন। কয়েক বৎসর গত হইল ভগবতীপ্রসন্নও ইহধাম ত্যাগ করিয়াছে। শ্রীভগবান শ্রীমান দুর্গাপ্রসন্নকে দীর্ঘজীবী করুন। কলিকাতার চোরবাগানের প্রসিদ্ধ বসু-বংশোদ্ভব শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বসু গিরিশচন্দ্রের জামাতা।

'অশ্রুধারা'

এবার 'ক্লাসিকে' আসিয়া মহারাণী ভিক্টোরিয়ার স্বর্গারোহণ উপলক্ষ্যে গিরিশচন্দ্র 'অশ্রুধারা' নামক একখানি সাময়িক ক্ষুদ্র নাট্য প্রথম রচনা করেন।

১৩ই মাঘ (১৩০৭ সাল) 'ক্লাসিক থিয়েটারে' 'অশ্রুধারা' প্রথম অভিনীত হয়। প্রথমাভিনয় রজনীর অভিনেতৃগণ :

ভারতমাতা	শ্রীমতী কুসুমকুমারী।
দুর্ভিক্ষ	অক্ষয়কুমার চক্রবর্ত্তী।
প্লেগ	নটবর চৌধুরী।
অরাজকতা	পণ্ডিত শ্রীহরিভূষণ ভট্টাচার্য্য।
ভারত-সন্তানগণ	অমরেন্দ্রনাথ দত্ত।
	প্রবোধচন্দ্র ঘোষ।
	গোষ্ঠবিহারী চক্রবর্ত্তী। ইত্যাদি।

ভারতবাসী নর-নারীর গভীর শোকোচ্ছ্বাসের সঙ্গে-সঙ্গে হর্ষোল্লাসমত্ত দুর্ভিক্ষ, প্লেগ ও অরাজকতার রূপক-চিত্র এই গীতিনাট্যে জীবন্তভাবে প্রস্ফুটিত হইয়াছে। ইহার গীতগুলি সুপ্রসিদ্ধ অমৃতলাল দত্ত (হাবুবাবু) কর্ত্তৃক সুরলয়ে সুগঠিত হইয়াছিল।

'মনের মতন'

৭ই বৈশাখ (১৩০৮ সাল) গিরিশচন্দ্রের 'মনের মতন' নাটক 'ক্লাসিক থিয়েটারে' প্রথম অভিনীত হয়। প্রথমাভিনয় রজনীর অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ :

মির্জ্জান	শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু)।
কাউলফ্	অমরেন্দ্রনাথ দত্ত।
সায়েদ খাঁ	নটবর চৌধুরী।
টাহার	শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু।
নেহার	অক্ষয়কুমার চক্রবর্ত্তী।

ফকির	অঘোরনাথ পাঠক।
সমরকন্দাধিপতি	প্রবোধচন্দ্র ঘোষ।
কাজি	শ্রীযুক্ত অতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।
বণিক	চণ্ডীচরণ দে।
দূত	রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
ভৃত্যদ্বয়	মাণিকলাল ভট্টাচার্য্য ও শ্রীযুক্ত হীরালাল চট্টোপাধ্যায়।
গোলেন্দাম	শ্রীমতী তারাসুন্দরী।
দেলেরা	শ্রীমতী কুসুমকুমারী।
সানিয়া	গুলফম্ হরি [মতী দাসী]।
পরিয়া	রাণীমণি।
মনিয়া	কিরণবালা। ইত্যাদি।
সঙ্গীত-শিক্ষক	শ্রীযুক্ত দেবকণ্ঠ বাগচী।
নৃত্য-শিক্ষক	নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু।
রঙ্গভূমি-সজ্জাকর	আশুতোষ পালিত।

'মায়াতরু', 'মোহিনী প্রতিমা', 'স্বপ্নের ফুল', 'দেলদার' এবং আমাদের বর্ত্তমান আলোচ্য নাটক 'মনের মতনে' একটী ক্রমবিকাশের ধারা আছে। 'মায়াতরু', 'মোহিনী প্রতিমা', 'স্বপ্নের ফুল' ও 'দেলদার' এই চারিখানি গীতিনাট্যই প্রেমমূলক। 'মনের মতন'ও তাহাই, তবে গীতিনাট্যরূপ ভিত্তিপত্তন করিয়া ইহা নাটকের আকারে গঠিত হইয়াছে। তৎ-সম্বন্ধে একটী বিস্ময়কর ইতিহাস আছে। দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে দেলেরার বাটীতে কাউলফ্, দেলেরা এবং ছদ্মবেশী বাদসা মির্জ্জান একত্র বসিয়া আমোদ-প্রমোদ করিতেছিলেন, কথায়-কথায় বেগম গোলেন্দামের আলোচনা তুলিয়া দেলেরা, পরিহাস করিতে আরম্ভ করিল। সহসা ছদ্মবেশী মির্জ্জান উত্থিত হইয়া কঠোরস্বরে ডাকিলেন, "কাউলফ্।" বাদসার মুখ দিয়া এই সম্ভাষণ বাহির হইতেই গিরিশচন্দ্র বলিয়া উঠিলেন, "এ কি—এ যে 'নাটকের' সূত্রপাত হইল, এ তো আর 'গীতিনাট্য' হইতে পারে না।" কোনও বিখ্যাত সমালোচক (Sir Walter Raleigh) বলিয়াছেন, "কবির হৃদয় বাণীর বীণাস্বরূপ, দেবী তাহাতে যে সুর তোলেন, সেই সুরই বাজে।" গিরিশচন্দ্র মুহূর্ত্ত পূর্ব্বেও জানিতেন না, যে এই গীতিনাট্য নাটকের আকার ধারণ করিবে। সহসা বাণীর অঙ্গুলীস্পর্শে দৃশ্যকাব্যের সুর উঠিল। বিস্মিত গিরিশচন্দ্র বলিলেন, "এ যে নাটক হয়ে উঠলো। আচ্ছা তবে তাই হোক।"

প্রেমই মানব-হৃদয়ের চরম বিকাশ, কিন্তু প্রেমের পরম শত্রু—অবিশ্বাস, ঈর্ষ্যা এবং সংশয়। গিরিশচন্দ্র এই নাটকে প্রেম এবং সংশয়ের অপূর্ব্ব সংঘর্ষ দেখাইয়াছেন। 'ওথেলো' দৃশ্যকাব্যে মহাকবি সেক্সপীয়ার বলিয়াছেন, "সংশয় বিষম শত্রু দাম্পত্য জীবনে।" *

* শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু-কর্ত্তৃক অনুদিত। ৩য় অঙ্ক, ৩য় দৃশ্য।

সেক্সপীয়ার *Winter's Tale* নামক মিলনান্ত নাটকেও প্রেম এবং সংশয়ের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, এ নাটকেও বন্ধুর উপর সংশয়। কিন্তু সূচনায় সামান্যতঃ এই সাদৃশ্য থাকিলেও 'মনের মতন' নাটকের পরিণাম *Winter's Tale* হইতে যেমন সম্পূর্ণ বিভিন্ন, ঘটনাস্রোতও তেমনই সম্পূর্ণ অন্যরূপ।

গিরিশচন্দ্র পারস্য-উপন্যাসের একটী গল্প অবলম্বনে এই মনোরম দৃশ্যকাব্য গঠন করিয়াছেন। বাদসা মির্জ্জান প্রেমিক, কিন্তু ঘটনাচক্রে সন্দেহ-পীড়িত, কিন্তু তাহার সন্দেহ সম্পূর্ণ নূতন প্রকৃতির, ওথেলো যেরূপ ভাবিয়াছিল যে ডেসডিমোনা কেসিওর প্রণয়াকাঙ্ক্ষিণী, মির্জ্জানের সন্দেহ সেরূপ নয়। বাদশাহের সন্দেহ, কাউলফ্ গোলেন্দামের প্রেমপ্রার্থী। মির্জ্জান বেগমকে বলিতেছেন, "তুমি নির্দ্দোষী, তুমি পতি-প্রাণা, তুমি সত্যবাদিনী, তোমায় দেখে আমি বুঝতে পেরেছি। কিন্তু কাউলফ্ কি সাহসে সেই বারবিলাসিনীদের সমক্ষে তোমার নাম উচ্চারণ করেছিল?" কাউলফ্ বীর, বাদসার সুহৃদ এবং সেনাপতি, সৌন্দর্য্যের উপাসক, দেলেরার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ—তাহার প্রণয়প্রার্থী, যে দেলেরা তাঁহার সর্ব্বনাশের হেতু। যন্ত্রণা হইতে শান্তিলাভের আশায় কোন এক ফকিরের নিকট গিয়া সে বলিতেছে, "আমি ভুলেও ভুলতে পাচ্ছি-নি,—আমার সর্ব্বনাশের হেতু হয়েও আমার প্রাণের সহিত জড়িত।"

এ নাটকে অপর দুই প্রধান চরিত্র টাহার ও নেহার—দুই বন্ধু রূপের মোহে আচ্ছন্ন। পরিণামে মির্জ্জান এবং কাউলফ্ প্রেমিকযুগলের সকল সন্দেহ এবং ক্ষোভ বিদূরিত হইয়াছে—প্রণয়িনীযুগলকে পুনরায় মনের মতন রূপে পাইয়াছে। টাহার ও নেহার দুই অব্যবস্থচিত্ত যুবকের রূপজ মোহ বিদূরিত হইয়া হৃদয়ে প্রেমের বিকাশে মনের মতন পাইয়াছে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, 'মায়াতরু', 'মোহিনী প্রতিমা', 'স্বপ্নের ফুল' এবং 'দেলদার' এই কয়েকখানি গীতিনাট্য এবং 'মনের মতন' দৃশ্যকাব্যে একটী ক্রমবিকাশের ধারা আছে। একটু ইঙ্গিত করিলেই পাঠক তাহা বুঝিবেন। 'দেলদারে'র রেখা বলিতেছে :

"যেতে সই ভয় যদি হয়,
এমন তো নয়—না গেলে নয়।
মন চেয়েছে, দেখি কেমন!
ফিরবো, না হয় মনের মতন।
যা হয় হবে, নিই তো খেলে,
মনের স্রোতে দিই গা ঢেলে।"

কাউলফের সহিত সাক্ষাৎ পরিচয়ের পূর্ব্বে দেলেরা গাহিতেছে :

"আমার অগাধ জলে জাল ফেলা,
পারি হারি ভুলতে নারি, খেলে দেখি খেলা।
রতন পাই পাবো, নইলে জলে ঝাঁপ দেবো,
থাকতে সাগর, তীরে কেন নুড়ি কুড়োবো!
যে ঢেউ দেখে পায় ভয়, রত্ন তার তরে তো নয়,

হয় বা না হয়, যা হয় হবে, শেষ দেখে যাবো।
যৌবন সাধের মেলা, সাধ ক'রেনি এই বেলা।"

তবে যে ঈর্ষ্যা এবং সংশয়ের চিত্র 'দেলদারে' আবছায়ারূপে দেখা যায়, 'মনের মতনে' তাহা পরিস্ফুট।

শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত মিলনের পর গিরিশচন্দ্র যে সকল নাটক লিখিয়াছেন, তাহার অধিকাংশ চরিত্রের পরিকল্পনা পরমহংসদেবের ভাবে অনুপ্রাণিত। এ নাটকে ফকিরের চরিত্র দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করিতে পারা যায়।

হিন্দি গান রচনা সম্বন্ধে স্বামীজির কথা

'মনের মতন' মুদ্রিত হইবার পর, একদিন বিবেকানন্দ স্বামী গিরিশচন্দ্রের বাটীতে আসিয়া নাটকখানি পাঠ করিতে-করিতে বলিলেন, "জি. সি.—তোমার ফকিরের গান দু'খানি চমৎকার হয়েছে, কিন্তু ভাষার মাথামুণ্ড নাই—না বাংলা—না হিন্দি—না উর্দ্দু,—এ কি বল দেখি?" উত্তরে গিরিশচন্দ্র বলিলেন, "খাঁটি হিন্দি বা উর্দ্দু সাধারণ দর্শক বুঝিতে পারে না, দুই-চারিজন তাহার মর্ম্ম-গ্রহণ করিতে পারে। হিন্দি কি উর্দ্দুর একটা ভোল আর ধরণ দেখাতে পারলেই চরিত্র যে স্বতন্ত্র তাহাও দেখান হয়, আর দর্শকও গানের মর্ম্ম-গ্রহণ করে। আমার তাহাই প্রয়োজন, নইলে দীনবন্ধুবাবুর 'লীলাবতী' নাটকে উড়িয়া চরিত্রের মত প্রতি কথায় টীকা করিয়া দিতে হয়।"

পাঠকগণের অবগতির নিমিত্ত ফকিরের একখানি গীত উদ্ধৃত করিলাম :

"লাগা রহো মেরি মন,
পরম ধন কি মিলে বিন্ যতন।
যাঁহা ভাসাওয়ে হুঁয়াই ভাসকে চল্ না,
কব আঁধিয়া উঠে, উস্কা ক্যা ঠিকানা,
মগন রহে কো আপনা সামাল্না—
হরদম উসিপর নজর ফেল্না;
ওহি হ্যায় দোস্ত, আওর কাঁহা মিলে কোন্?
ওহি আপনা, সব ভি বেগানা,
সমজ লেনা কো আপন—
এক হ্যায়—উও পরম ধন!"

সুযোগ্য অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণের সুসম্মিলনে নাটকখানি নিখুঁতরূপে অভিনীত হইয়া দর্শকগণের প্রীতি উৎপাদন করিয়াছিল। মির্জ্জান ও গোলেন্দামের ভূমিকাভিনয় বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য 'মিনার্ভা থিয়েটারে' এই নাটকখানি পুনরভিনীত হয়। লব্ধপ্রতিষ্ঠ নট-নাট্যকার শ্রীযুক্ত অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কাউলফের ভূমিকাভিনয়ে বিশেষ কৃতিত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন।

'কপালকুণ্ডলা'

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে লিখিত হইয়াছে, স্যার রাজা রাধাকান্ত দেবের নাটমন্দিরে "ন্যাসান্যাল থিয়েটার' সম্প্রদায় কর্ত্তৃক 'কপালকুণ্ডলা' নাটকাকারে গঠিত হইয়া সর্ব্বপ্রথম অভিনীত হয়। তাহার পর গিরিশচন্দ্র কর্ত্তৃক পুনরায় নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া 'গ্রেট ন্যাশান্যাল থিয়েটারে' অভিনীত হইয়াছিল। পাণ্ডুলিপি রক্ষিত না হওয়ায় 'ক্লাসিক থিয়েটারে'র জন্য তিনি পুনরায় একরাত্রে চারিজন লেখক লইয়া 'কপালকুণ্ডলা' নাটকাকারে পরিণত করেন। এরূপ দ্রুত রচনা সত্বেও গিরিশচন্দ্রের তুলিকায় 'কপালকুণ্ডলা' বিশেষরূপ প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্রকে অক্ষুন্ন রাখিয়া কাপালিকের মুখ দিয়া তান্ত্রিক সাধনতত্ত্বের যে আভাস তিনি দিয়াছিলেন, তাহাতে দর্শকগণ একটু নূতনত্বও পাইয়াছিলেন।

১৭ই জ্যৈষ্ঠ (১৩০৮ সাল) 'ক্লাসিক থিয়েটারে' 'কপালকুণ্ডলা' প্রথম অভিনীত হয়। প্রথমাভিনয় রজনীর অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ :

নবকুমার	অমরেন্দ্রনাথ দত্ত।
কাপালিক	অঘোরনাথ পাঠক।
জাহাঙ্গীর	প্রবোধচন্দ্র ঘোষ।
বালক ভৃত্য	দানিবাবু [সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ]।
সর্দ্দার উড়ে	নটবর চৌধুরী।
কপালকুণ্ডলা	শ্রীমতী কুসুমকুমারী।
মতিবিবি	শ্রীমতী তারাসুন্দরী।
মেহেরউন্নিসা	শ্রীমতী ভুবনেশ্বরী।
শ্যামা	রাণীমণি।
পেশমান	লক্ষ্মীমণি। ইত্যাদি।

নবকুমার, কপালকুণ্ডলা, কাপালিক প্রভৃতি ভূমিকাভিনয়ে অমরবাবু, শ্রীমতী কুসুমকুমারী, পাঠক মহাশয় প্রভৃতি প্রত্যেক অভিনেতা ও অভিনেত্রী বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন ; কিন্তু মতিবিবির ভূমিকায় বিশেষতঃ নবকুমার কর্ত্তৃক তাহার প্রত্যাখ্যান-দৃশ্যে শ্রীমতী তারাসুন্দরীর অভিনয় অতুলনীয় হইয়াছিল।

পাঁচটী ভূমিকায় গিরিশচন্দ্র

শ্রীমতী কুসুমকুমারীর মতিবিবির ভূমিকা অভিনয় করিবার মনে-মনে ইচ্ছা ছিল। কিন্তু উক্ত ভূমিকায় তারাসুন্দরী পূর্ব্ব হইতেই নির্ব্বাচিতা হওয়ায় কুসুমকুমারী একটু মনঃক্ষুণ্ণা হইয়াছিলেন। গিরিশচন্দ্র তাঁহার মনোভাব অবগত হইয়া বলিয়াছিলেন, "শক্তিশালী অভিনেতা ও অভিনেত্রীর পক্ষে সকল ভূমিকাই সমান

আদরণীয়। পূর্বে 'ন্যাসান্যাল থিয়েটারে' সুপ্রসিদ্ধ অভিনেত্রী শ্রীমতী বিনোদিনীকে যখন কপালকুণ্ডলার ভূমিকা দেওয়া হয়, তাহার কথায় বা ভাবে মতিবিবির ভূমিকা গ্রহণের জন্ত কোনরূপ আগ্রহ প্রকাশ পায় নাই। ফলতঃ কয়েকটী দৃশ্তে তাহার অভিনয় এত উৎকৃষ্ট ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল যে দর্শকবৃন্দ তাহাকেই সর্ব্বোচ্চ প্রশংসা দিয়া যায়। নাট্যকার যে চরিত্রকেই উচ্চাসন দিন না কেন, অভিনেতা বা অভিনেত্রীর কৃতিত্বে অতি ক্ষুদ্র ভূমিকাও সজীব হইয়া দর্শকের উচ্চপ্রশংসা লাভ করিতে পারে।" তাঁহার এই উক্তি প্রতিপন্ন করিবার জন্ত গিরিশচন্দ্র কপালকুণ্ডলার দুই-তিনটী অভিনয়-রজনীতে অধিকারী, চটীরক্ষক, মাতাল, মুটে ও প্রতিবাসী এই পাঁচটী ভূমিকার অভিনয় করেন। বলা বাহুল্য, এই পাঁচটী ভূমিকাতেই তিনি পরস্পর-বিরোধী রসাভিনয়ে উচ্চপ্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন। উনত্রিংশ পরিচ্ছেদে উল্লিখিত হইয়াছে, এইরূপ অবস্থাগত হইয়া গিরিশচন্দ্র 'ন্যাসান্যাল থিয়েটারে' 'মাধবীকঙ্কণে' সাতটী ভূমিকা অভিনয় করেন।

'কপালকুণ্ডলা'য় গিরিশচন্দ্র কয়েকটী নূতন দৃশ্য রচনা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে কাপালিক-সংক্রান্ত দুইটী দৃশ্য ১৩৩১ সাল, ১৫ই কার্ত্তিক তারিখের 'রূপ ও রঙ্গে' (১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা) প্রকাশিত হইয়াছিল। একটী হাস্তরসাত্মক দৃশ্য নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

তৃতীয় অঙ্ক পঞ্চম দৃশ্য

সপ্তগ্রাম মতিবিবির বাটীর সম্মুখ

দুইজন মুটের প্রবেশ।

১ম মুটে। হ্যাদে মামু, যা চিজ চেপিয়েছে, গরদানটা ঝুকি পরতিছে; এ সাতগার মদ্দি কেডা আলো?

২য় মুটে। আরে ব্যাগম আইচেরে—ব্যাগম আইচে।

১ম মুটে। কোয়ান থে আলো, কইতে পারিস?

২য় মুটে। ব্যাগমগুলা ক্যাবল গুরতিছে,—এহানে আসতিছে—ওহানে যাতিছে, যেহানে আজ্ঞা গাড়তিছে—লটণ্ঠন ঝুলাইচে—তেরনালঅলা পাক রাখতিছে।

১ম মুটে। হ্যাদে ব্যাগমডা কেমনরে মামু?

২য় মুটে। ব্যাগমডা বড় জবর,—এই গোলাপ শুকতিছে, এই আতর নাকে গুজতিছে; মারতিছে তো ফুলির তোরা ছুড়িই মারতিছে। সোনা খাতিছে—রূপা পাইখানা যাতিছে,—ক্যাবলই চুল হিচুড়ছে—চুল হিচুড়ছে।

১ম মুটে। হ্যাদে মামু, ব্যাগমডা চ্যাটাই পর চাদর বিছুয়ে শোয়, কি বলিস?

২য় মুটে। ব্যাগমডা শোবে? তোর মত ছোট লোক পাইছিস?—ব্যাগমডা খালি ঘুরতি আছে আর বকৃতি আছে।

১ম মুটে। হ্যাদে—ব্যাগমডা মাইয়া মাহুষ না মরদরে মামু?

২য় মুটে। ও মাইয়াও হতি পারে—মরদও হতি পারে। ও ঘোড়ার ওপর

চড়চে, হাতীর ওপর চড়চে, উটির ওপর চড়চে—তাজ মাথায় দিত্তিছে—আর ট্যারা হয়ে চলত্তিছে।

১ম মুটে। হ্যাদে মামু, ব্যাগমডাকে দেখবার মোর বড় ঝোক আছে।

২য় মুটে। ঝোক করবা কিসে? বিড়ার মতন পাগড়ি জরায়ে সব ব্যাগমডারে ঘিরি রইচে। ব্যাগমডা ফিকির-ফিকির হাসত্তিছে আর ইদিক-উদিক চাইত্তিছে, আর বলত্তিছে "ইডারে পাকড় লও, ওডারে ঝুটী ধর!"—আর তেরনল থেচে সব ছুটত্তিছে।

১ম মুটে। মামু, ব্যাগমডারে মুই দেখবার চাই।

২য় মুটে। আচ্ছা চল, দরয়ানজীরে ক'য়ে যদি দেহাতে পারি, তার ফিকির করব অ্যানে গাট থে কিছু ছারবার হবে, নইলে দরয়ানজী পথ ছাড়বে না।

১ম মুটে। কাছায় মুই চার আনা বাঁদি রাখচি, চার আনা দিলি.অইবে না?

২য় মুটে। তা হতি পারে।

১ম মুটে। হ্যাদে মামু, ঝুল-ঝুল করি ঝুলত্তিছে, ঠুন-ঠুন করি বাজত্তিছে,—বিচে লটঠন জলত্তিছে, তারে কি কয়রে?

২য় মুটে। তারে কয়—ঝার।

১ম মুটে। আর হ্যাদে মামু, ঐ যে পানি ছিটায়, আর গোলাপের খোসবো ছিটায়, তারে কি কয়?

২য় মুটে। তুই পুচ করত্তিছিস, মোর গরদানটা ঝুকি যাত্তিছে, চল বাড়ীর মদ্দি ঘুসি। মোট বইবার আইচিস—মোট বোয়ে যা।

১ম মুটে। হ্যাদে মামু, খোসবো দেহিছিস—পরাণটা তর করে দিছে!

[উভয়ের বাটীর মধ্যে প্রবেশ।]

আমরা বহুবার বলিয়াছি যে গীত রচনায় গিরিশচন্দ্র সিদ্ধ কবি। এমন ভাব এবং রস নাই, যাহা লইয়া গিরিশচন্দ্র গান রচনা করেন নাই। কাপালিকের দুইখানি ভয়ানক এবং শ্যামাসুন্দরীর একখানি মধুর রসাশ্রিত গীত উদ্ধৃত করিতেছি। এই তিনখানি গীতে কল্পনা, রচনাভঙ্গি এবং শব্দযোজনার পার্থক্য পাঠক সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিবেন।

১। পূজারত কাপালিকের গীত:

বিষমোজ্জ্বল জ্বালা বিভাসিত কপাল,
খলখল করাল হাসিনী।
সদ্যচ্ছেদিত নরমুণ্ড-শোভিত কর,
ঘোর গভীর কাদম্বিনী-বরণী ভীমা ভুবনত্রাসিনী॥
অতি বিশাল বদনমণ্ডল—
লকলক রুধির লোলুপ রসনা,
রুধির ধার-স্রুত বিপুল দশনা,
অস্থি-চর্ম্ম সার, কঙ্কাল হার—
বিভূষিত দিকবসনা ব্যোমগ্রাসিনী॥

অতি ক্ষীণ কটী-বেষ্টিত নর-কর-কিঙ্কিণী,
মহাকাল কামিনী,
উৎকট আসব-পান-মগনা,
রক্তনয়না শবাসনা বিভীষণা,
নিবিড় মেঘজাল লটপট কেশী, নরমাংসাশী—
ঈশান-মর্দ্দিনী টলটল মেদিনী !
ভয়ঙ্করী ভীষণা শ্মশানবাসিনী ॥

২। দৃঢ় হস্তে নবকুমারকে ধরিয়া কাপালিকের গীত :

নর-রুধির-তৃষাতুর নেহার ভূমি দূরে !
শতশিবানাদিনী, ভৈরবী-সঙ্গিনী,
শিবানীশ্রেণী 'ফে' রবে ভুবন পূরে ॥
নরশির চূর্ণ কত গৃধিণী-চঞ্চু-বলে,
উন্নত তরুশির প্রভঞ্জন দলে,
ঘনঘন ঘোর গভীর রোলে,
যথা ভৈরব করতালে গায় বিকট স্বরে ॥
দাবানল বলে, প্রবল বহ্নি জ্বলে,
ঘন ঘনাকারে ধূম গগনমণ্ডলে,
হীন জ্যোতি শশধর তারকা—
অস্থি-গ্রন্থি কত শোভে মেদিনী-উরে ॥

৩। কপালকুণ্ডলার প্রতি শ্যামাসুন্দরী :

তোমার কাঁচা পিরীত তাইতে জানো না।
পুরুষ পরশ পিরীত মাখা, ঠেকলে পরে হয় সোনা। ॥
পরশে প্রাণ থাকবে না বশে, গ'লবে প্রেম-রসে,
মলা মাটী উঠবে লো ভেসে,
হয় লো খাঁটি সোনা, দাগ থাকে না—
পরশে-পরশে ;
এখন মন মজেনি, তাই বোঝোনি,
তাইতে পিরীত মানো না,
আমার ঠেকে শেখা, নয় কথা শোনা ॥

'মৃণালিনী'

'কপালকুণ্ডলা' দর্শকমণ্ডলীর হৃদয়গ্রাহী হওয়ায়, অমরবাবুর উৎসাহ এবং অনুরোধে গিরিশচন্দ্র পুনরায় 'মৃণালিনী' নাটকাকারে গঠিত করেন। গিরিশচন্দ্র কর্ত্তৃক নাট্যাকারে

পরিবর্ত্তিত 'মৃণালিনী' সর্ব্বপ্রথম 'গ্রেট ন্যাসান্যাল থিয়েটারে' অভিনীত হয়। বিংশ পরিচ্ছেদে এতদ্-সম্বন্ধে সুবিস্তৃত লিখিত হইয়াছে। 'গ্রেট ন্যাসান্যাল' হইতে পাণ্ডুলিপি পাইয়া 'বেঙ্গল থিয়েটারে'ও উচ্চপ্রশংসার সহিত বহু শত রজনী 'মৃণালিনী' অভিনীত হয়। অমরবাবু 'বেঙ্গল থিয়েটার' হইতে 'মৃণালিনী'র খাতা আনয়ন করায়, গিরিশচন্দ্রকে এবার বেশী পরিশ্রম করিতে হয় নাই, তথাপি একটু নূতনত্বের জন্য লক্ষ্মণ সেনের রাজসভা, মুসলমানের ভয়ে লক্ষ্মণ সেনের গুপ্তদ্বার দিয়া পলায়ন, গিরিজায়া ও দিগ্বিজয়ের প্রেমালাপ প্রভৃতি কয়েকটী দৃশ্য এবং কয়েকখানি নূতন গান সংযোজিত করিয়া দিয়াছিলেন।

১০ই শ্রাবণ (১৩০৮ সাল) 'ক্লাসিক থিয়েটারে' 'মৃণালিনী' প্রথম অভিনীত হয়। প্রথমাভিনয় রজনীর অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ :

পশুপতি	গিরিশচন্দ্র ঘোষ।
হৃষীকেশ	অঘোরনাথ পাঠক।
হেমচন্দ্র	অমরেন্দ্রনাথ দত্ত।
দিগ্বিজয়	শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু।
ব্যোমকেশ	শ্রীযুক্ত হীরালাল চট্টোপাধ্যায়।
মাধবাচার্য্য	পণ্ডিত শ্রীহরিভূষণ ভট্টাচার্য্য।
লক্ষ্মণ সেন	নটবর চৌধুরী।
শান্তশীল	শ্রীযুক্ত অহীন্দ্রনাথ দে।
মৃণালিনী	কিরণবালা।
গিরিজায়া	শ্রীমতী কুসুমকুমারী।
মনোরমা	প্রমদাসুন্দরী। ইত্যাদি।

মহাসমারোহে 'মৃণালিনী'র সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অভিনয় হইয়াছিল। তিনটী বৃহৎ অশ্বারোহণে মুসলমান সৈন্যত্রয় রঙ্গমঞ্চে বাহির হইত। প্রথম দুই রাত্রি অভিনয়ের পর কোনও বিশেষ কারণে গিরিশচন্দ্র পশুপতির ভূমিকা পরিত্যাগ করায়, তাঁহার সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু) তৃতীয়াভিনয় রজনী হইতে প্রথম পশুপতির ভূমিকায় রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হন। যে সকল ভূমিকা অভিনয় করিয়া সুরেন্দ্রবাবু বঙ্গ-নাট্যশালায় প্রভূত গৌরব অর্জ্জন করিয়াছেন, পশুপতির ভূমিকা তাহার অন্যতম।

পশুপতি-ভূমিকাভিনয়ে গিরিশচন্দ্রের অসম্মতি

যে বিশেষ কারণে গিরিশচন্দ্র পশুপতির ভূমিকা পরিত্যাগ করেন, তাহা এই :

চতুর্থ অঙ্কের শেষ দৃশ্যে মুসলমান কর্ত্তৃক পশুপতির গৃহে অগ্নি প্রদত্ত হইয়াছে। পশুপতি 'অষ্টভুজা' মূর্ত্তি বিসর্জ্জন করিবার নিমিত্ত দেবী-মন্দিরে আসিয়াছেন। মনোরমা ভস্মীভূতা হইয়াছে নিশ্চয় করিয়া, একদিকে পশুপতির অন্তরে যেরূপ অগ্নি

জলিতেছে, অন্তদিকে বাহিরেও সেইরূপ উর্দ্ধে—নিম্নে—চতুর্দ্দিকে—অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ ছুটিতেছে। ষ্টেজ-ম্যানেজার উপর হইতে তুবড়ির নিম্নমুখ করিয়া সেই অগ্নি-স্ফুলিঙ্গের খেলা দেখাইতেন। পশুপতির ভূমিকায় গিরিশচন্দ্র পাগড়ি পরিতেন, মাথা গরম হইবার আশঙ্কায় তাহার ভিতরের চাঁদি খুব পাতলা কাপড়ে প্রস্তুত করা হইত। দ্বিতীয় রজনীতে তুবড়ির অগ্নি সেই চাঁদির উপর পড়ায় মস্তকের চর্ম্ম স্থানে-স্থানে দগ্ধ হইয়া ফোস্কা পড়ে। গিরিশচন্দ্র কাতর হইয়া ষ্টেজ-ম্যানেজারকে নিবৃত্ত হইতে বলেন, কিন্তু দর্শকবৃন্দের আনন্দ-কোলাহল এবং করতালি ধ্বনিতে তাঁহার কাতরোক্তি ষ্টেজ-ম্যানেজারের কর্ণে পহুঁছিল না—সমানভাবে তুবড়ির খেলা চলিতে লাগিল। অসীম ধৈর্য্যে গিরিশচন্দ্র তাহা সহ্য করিয়া অভিনয় সমাপ্ত করিলেন। অভিনয়ান্তে অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ তাঁহার দগ্ধ পোষাক এবং মস্তকের কেশে বহু ফোস্কা দেখিয়া যেরূপ ব্যথিত হইলেন, সেইরূপ বিস্ময়ের সহিত তাঁহার অটল ধৈর্য্যের পুনঃ-পুনঃ প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তৃতীয় রজনীতে গিরিশচন্দ্র কিন্তু আর এ অগ্নি-পরীক্ষায় অগ্রসর হইতে সম্মত হইলেন না।

'মৃণালিনী'র নিমিত্ত গিরিশচন্দ্র যে কয়েকখানি নূতন গান বাঁধিয়া দিয়াছিলেন, তন্মধ্য হইতে দুইখানি গীত নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

১ম। পর্য্যটকের গীত :

মন, বায়ু পরাজিত তব গমনে !
কার অন্বেষণে, মন, রত ভ্রমণে
বুদ্ধি স্মৃতি সাথী পরিহরি, চল আশা ধরি,
পিয়াসা কি মিটিল না ভ্রমণ করি ?
আত্মহারা, চল ক্ষিপ্তপারা, নিরাশ-সাগরে পন্থাহারা ;
মন, বুঝ যতনে—দিন গেল, মন, ভুল কেমনে ?

২য়। পরস্পর মাল্য বিনিময় করিয়া দিগ্বিজয় ও গিরিজায়া :

গিরিজায়া। তুই তুই যা স'রে, তোরে মালা দিছি রাগ ক'রে।
দিগ্বিজয়। তুই মার ধ'রে, কে সরে প্রাণ ধ'রে।
গিরি। তুই আমার চোখের বালাই,
দিগ্বি। তোর কাছে-কাছে ঘুরিলো তাই ;
গিরি। তোরে আমি দেখতে পারি নে,
দিগ্বি। ও কথার ধারও ধারি নে,—
ও কথা কাণে ধরি নে ;
গিরি। নে-নে, তুই স'রে যা,—
দিগ্বি। এই যে—এই যে—তুই বদন তুলে চা ;
গিরি। কেন রে ছোঁড়া, কেন রে মুখপোড়া,
তুই আসবি কি গায়ের জোরে ?
দিগ্বি। ও ছুঁড়ি, ও ছুঁড়ি,—
ওলো প্রাণ কাঁদে যে তোর তরে !

'অভিশাপ'

১২ই আশ্বিন (১৩০৮ সাল) গিরিশচন্দ্রের 'অভিশাপ' গীতিনাট্য 'ক্লাসিক থিয়েটারে' প্রথম অভিনীত হয়। প্রথমাভিনয় রজনীর অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ :

বিষ্ণু	প্রমদাসুন্দরী।
নারদ	পণ্ডিত শ্রীহরিভূষণ ভট্টাচার্য্য।
পর্ব্বত	অঘোরনাথ পাঠক।
অম্বরীষ	প্রবোধচন্দ্র ঘোষ।
কণ্ঠীদাস	শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু)।
তিলকদাস	শ্রীযুক্ত অহীন্দ্রনাথ দে।
আগড়ব্যোম	শ্রীযুক্ত অতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।
ডমুরবাগীশ	শ্রীযুক্ত হীরালাল চট্টোপাধ্যায়।
মন্ত্রী	নটবর চৌধুরী।
দারুক	গোষ্ঠবিহারী চক্রবর্ত্তী।
দুষ্টা সরস্বতী	শ্রীমতী তারাসুন্দরী।
শ্রীমতী	শ্রীমতী কুসুমকুমারী।
বল্লরী	রাণীমণি।
সুষমা	শ্রীমতী ভুবনেশ্বরী।
বিষ্ণু-কিঙ্করী	ভূষণকুমারী।
তমঃ	বিনোদিনী (হাঁদি)। ইত্যাদি।
সঙ্গীত-শিক্ষক	শ্রীযুক্ত দেবকণ্ঠ বাগচী।
নৃত্য-শিক্ষয়িত্রী	শ্রীমতী কুসুমকুমারী।*

এখানি পৌরাণিক গীতিনাট্য। 'অদ্ভুত রামায়ণ' হইতে গল্পাংশ গ্রহণ করিয়া ইহা রচিত হইয়াছে।

গিরিশচন্দ্র সকল পৌরাণিক নাটকেই তাঁহার সৃষ্টিশক্তির বিশিষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। এ গীতিনাট্যে দুষ্টা সরস্বতীর অবতারণা তাহার দৃষ্টান্ত। ইহার একদিক যেমন কৌতুক —অন্যদিক তেমনই উচ্চভাবপূর্ণ। উদাহরণস্বরূপ দুষ্টা সরস্বতীর সঙ্গিনীগণের গীতটী নিম্নে উদ্ধৃত হইল :

> "অভিমানে সৃজন ভুবন—অভিমানের এ মেলা,—
> অভিমানের মধুর গানে সংসারে চলে খেলা।

* স্ত্রীলোক কর্ত্তৃক নৃত্যশিক্ষা বঙ্গ-নাট্যশালায় এই প্রথম। শ্রীমতী কুসুমকুমারীর নৃত্য-শিক্ষা-কৌশল দর্শনে প্রীত হইয়া, গিরিশচন্দ্র এই গীতিনাট্যের দ্বিতীয়াভিনয় রজনীতে কুসুমকুমারীকে একখানি সুবর্ণপদক প্রদান করেন। এইসময়ে সুপ্রসিদ্ধ নৃত্য-শিক্ষক শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু 'ক্লাসিক থিয়েটার' পরিত্যাগ করিয়া কিছুদিনের জন্য অন্য থিয়েটারে যোগদান করিয়াছিলেন।

অহঙ্কার এ ভব-পাথার, এমন শক্তি আছে কার,
জ্ঞান-তরণী বিনা পাথার হ'তে পারে পার ?
মোহময় এ ঘোর আঁধার,
আঁধারে সাঁতার—তরঙ্গে ওঠা নাবা করে বারে বার,
সরল-মনে শরণ নিলে তবে সে জন পায় ভেলা,
নইলে নাচে দু'বেলা, মহামায়া যে ক'রে হেলা।"

'শাস্তি'

২৪শে জ্যৈষ্ঠ (১৩০৯ সাল) 'ক্লাসিক থিয়েটারে' গিরিশচন্দ্রের 'শাস্তি' নামক রূপক গীতিনাট্য প্রথম অভিনীত হয়। প্রথম অভিনয় রজনীর অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ :

বৃটিশ-রাজমন্ত্রী	পণ্ডিত শ্রীহরিভূষণ ভটাচার্য্য।
লর্ড কিচনার	অঘোরনাথ পাঠক।
ডিলেরি	শ্রীযুক্ত অতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।
ডিউয়েট	শ্রীযুক্ত অহীন্দ্রনাথ দে।
বুয়র-রাজলক্ষ্মী	শ্রীমতী কুসুমকুমারী।
বুয়র-রমণী	প্রমদাসুন্দরী। ইত্যাদি।
সঙ্গীত-শিক্ষক	শ্রীযুক্ত দেবকণ্ঠ বাগচী।
রঙ্গভূমি-সজ্জাকর	শ্রীযুক্ত নবগোপাল রায়।
নৃত্য-শিক্ষয়িত্রী	শ্রীমতী কুসুমকুমারী।

এই ক্ষুদ্র রূপকখানি বুয়র-যুদ্ধের অবসানে সন্ধিস্থাপন উপলক্ষ্যে রচিত হয়। সুপ্রসিদ্ধ সজ্জাকর পিম্ সাহেব অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণকে ইংরাজ ও বুয়রের বেশে যথাযথরূপে সাজাইয়া দিয়াছিলেন।

'ভ্রান্তি'

৩রা শ্রাবণ (১৩০৯ সাল) গিরিশচন্দ্রের 'ভ্রান্তি' নাটক 'ক্লাসিক থিয়েটারে' প্রথম অভিনীত হয়। প্রথমাভিনয় রজনীর অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ :

রঙ্গলাল	গিরিশচন্দ্র ঘোষ।
নিরঞ্জন	অমরেন্দ্রনাথ দত্ত।
পুরঞ্জন	শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু)।
উদয়নারায়ণ	অঘোরনাথ পাঠক।
শালিগ্রাম	পণ্ডিত শ্রীহরিভূষণ ভট্টাচার্য্য।

মুর্শিদকুলি খাঁ	নটবর চৌধুরী।
জয়করাজ খাঁ	শ্রীযুক্ত অতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।
গোলাম মহম্মদ ও ২য় প্রহরী	গোষ্ঠবিহারী চক্রবর্ত্তী।
দয়ারাম ও জমীদার	শ্রীযুক্ত হীরালাল চট্টোপাধ্যায়।
জমীদার ও ১ম প্রহরী	চণ্ডীচরণ দে।
মুসলমানদ্বয়	শ্রীযুক্ত অহীন্দ্রনাথ দে ও শ্রীযুক্ত ননিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।
জমীদার ও জমাদার	শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
বৃদ্ধ মুসলমান ও রাজদূত	পান্নালাল সরকার।
অন্নদা	প্রমদাসুন্দরী।
মাধুরী	শ্রীমতী ভুবনেশ্বরী।
ললিতা	রাণীমণি।
গঙ্গা	শ্রীমতী কুসুমকুমারী।
বৃন্দা	কুমুদিনী। ইত্যাদি।
সঙ্গীত-শিক্ষক	শ্রীযুক্ত দেবকণ্ঠ বাগচী।
নৃত্য-শিক্ষয়িত্রী	শ্রীমতী কুসুমকুমারী।
রঙ্গভূমি-সজ্জাকর	শ্রীযুক্ত কালীচরণ দাস।

বাঙ্গালার নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর বিরুদ্ধে রাজসাহীর জমীদার রাজা উদয়নারায়ণের বিদ্রোহ—ইতিহাস-বর্ণিত হইলেও 'ভ্রান্তি' নাটককে ঐতিহাসিক নাটক বলা চলে না। মহাকবি সেক্সপীয়ারের হ্যামলেট, ম্যাক্‌বেথ, লীয়ার যেমন ঐতিহাসিক চরিত্র হইয়াও কল্পনাপ্রধান—'ভ্রান্তি'ও তাহাই। একটা কাল্পনিক ভ্রান্তি হাওয়ায়-হাওয়ায় পুষ্ট হইয়া কেমন করিয়া মহা ঝড় তুলিতে পারে, এ নাটকে তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে।

মানব-জীবনের অধিকাংশ সুখ-দুঃখই কল্পনা-প্রসূত, ভ্রান্তির উপর প্রতিষ্ঠিত—সত্যের সহিত তাহার সংস্রব অতি সামান্য। গিরিশচন্দ্র এ নাটকে তাহা অতি উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন। সংসারে একমাত্র যাহা সত্য, তাহা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, আর সেই রসস্বরূপের চারিদিকে কল্পনার সহায়ে রসের তরঙ্গ উঠিতেছে—পড়িতেছে। ইহাই সংসারের দৈনন্দিন খেলা।

রাজসাহীর জমীদার উদয়নারায়ণ তাঁহার পালিতা বন্ধু-কন্যা ললিতা এবং নিজ-কন্যা মাধুরীকে লইয়া দেবীপূজার জন্য বনে আসিয়াছেন। এই মাধুরী সম্বন্ধে একটু রহস্য আছে। মাধুরী তাঁহার পরিণীতা পত্নী অন্নদার কন্যা, পিতার অনভিমতে গোপনে বিবাহ করিয়া উদয়নারায়ণ পত্নীকে ঘরে আনিতে পারেন নাই, কিন্তু তাঁহার গর্ভজাতা কন্যাকে যত্নে পালন করিতেন। লোকে বলিত, মাধুরী উদয়নারায়ণের উপ-পত্নীর কন্যা। তাহার মাতা কাশীতে গিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে। উদয়নারায়ণও পত্নীর কোনও সঠিক সংবাদ জানিতেন না। এইটুকু পূর্ব্ব ইতিহাস।

মাধুরী এবং ললিতা যখন পুষ্পিত-যৌবনা, সেইসময়ে উদয়নারায়ণ একদিন ইহাদের

লইয়া বনে দেবী-পূজার্থে আসিয়াছিলেন। দৈবের নির্ব্বন্ধে সেইদিন রাজমহলের জমীদার শালিগ্রামের পুত্র নিরঞ্জন এবং মালদহের জমীদার-পুত্র পুরঞ্জন সেই বনে শিকার করিতে আসে। উভয়ে অভিন্নহৃদয় বন্ধু। নিরঞ্জনের সহিত ললিতার এবং মাধুরীর সহিত পুরঞ্জনের সাক্ষাৎ হইল। কিন্তু জীবনের এই বিশিষ্ট ঘটনা পরস্পরে পরস্পরের নিকট ব্যক্ত করিল না, কেননা উভয়েই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিল—উভয়ে চিরজীবন অবিবাহিত থাকিবে। সখ্যের স্থলে দাম্পত্য প্রেমকে হৃদয়ে স্থান দিবে না। অতঃপর উদয়নারায়ণের প্রাসাদে হোরি উৎসবে উভয়েরই নিমন্ত্রণ হইল। সুযোগ পাইয়া ললিতার সহিত নিরঞ্জন এবং পুরঞ্জনের সহিত মাধুরী আবির খেলিল, তাহাতে রং ধরিল যুবক এবং যুবতীদ্বয়ের অন্তরে। ইতিমধ্যে হোলি খেলিতে-খেলিতে নিরঞ্জন যখন ললিতার কাছে মনোভাব ব্যক্ত করিতেছিল, সেইসময় দূর হইতে কে 'মাধুরী' বলিয়া আহ্বান করে। যুবতীর সহজাত লজ্জায় 'সখীরা ডাকছে' অছিলা করিয়া ললিতা চলিয়া গেল। এইখানেই ভ্রান্তির বীজ। নিরঞ্জন ললিতাকে মনে করিল মাধুরী—উদয়নারায়ণের কন্যা। একটা-না-একটা কারণে বাধা পড়িয়া এ ভুল ভাঙিবার আর সুযোগ হইল না এবং ভ্রান্তি হইতেই যত কিছু অনর্থের সৃষ্টি।

এ নাটকের সূচনা মহাকবি কালিদাসের 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলা'র অনুরূপ, পশু-মৃগয়ার পরিণতি প্রেম-মৃগয়ায়। আভিজাত্য-অভিমান, আশা-নিরাশা, গঞ্জনা-লাঞ্ছনা, সৌহার্দ্দ্য-শত্রুতা, প্রেম-প্রতিহিংসা প্রভৃতির সংঘর্ষে এই দৃশ্যকাব্যে অঙ্কের পর অঙ্ক যেরূপভাবে গঠিত হইয়াছে, তাহা নাট্যসাহিত্যে অতি বিরল। সহৃদয় পাঠক নাটকের সর্ব্বত্র সে ঘাত-প্রতিঘাতের পরিচয় পাইবেন।

নিরঞ্জনের ভ্রান্তি কতবার কত স্থলে সংশোধিত হইবার সুযোগ আসিয়াছে, কিন্তু গিরিশচন্দ্রের অপূর্ব্ব কলাকৌশল ও নাট্য-নৈপুণ্যে সে সুযোগ দূর হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছে, অথচ তাহাতে গল্পের স্বাভাবিক গতির কোনও ব্যতিক্রম ঘটে নাই। রঙ্গলাল একস্থলে বলিতেছে, "আর একটু আগে তোমার এই কথা জানলে ঘটনা-স্রোত আর-একরকম চলত।" নাটকের বিস্তৃত আলোচনা বা চরিত্র বিশ্লেষণ করিবার আগ্রহ এবং ইচ্ছা থাকিলেও আমাদের স্থানাভাব; কিন্তু 'ভ্রান্তি'র অপূর্ব্ব সৃষ্টি রঙ্গলালের কিছু পরিচয় না দিয়া তাহাকে সহজে বিদায় দেওয়া যায় না।

'ভ্রান্তি' এবং 'মায়াবসান' এই দুই নাটক রচনায় দীর্ঘ পাঁচ বৎসরের ব্যবধান থাকিলেও মনে হয় যেন 'মায়াবসানে'র কালীকিঙ্কর 'ভ্রান্তি'তে রঙ্গলাল-রূপে পুনর্জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। তবে 'মায়াবসানে' যাহার বীজ বপন করা হইয়াছে, 'ভ্রান্তি'তে তাহা বৃক্ষরূপে পরিণত। কালীকিঙ্কর বসুর শেষ কথা, "মুখে বলতেম, নিষ্কাম ধর্ম্ম—নিষ্কাম ধর্ম্ম; কিন্তু অভিমান ফল-কামনা ছাড়ে না। সুখ-আশায় পরহিত করেছি, ধর্ম্ম উপার্জ্জন করতে পরহিত করেছি, আত্মোন্নতির জন্য পরহিত করেছি, ফল-কামনায় পরহিত করেছি। আজ গঙ্গাজলে ফল বিসর্জ্জন দিয়ে পরকার্য্যে রইলেম, রইলেম কি—জগতে মিশলেম।" নিরভিমান, ফল-কামনাশূন্য রঙ্গলালের চরিত্র আলোচনা করিলে পাঠক আমাদের সহিত একমত হইবেন, আশা করি।

নিরঞ্জন ও পুরঞ্জনের বন্ধু ব্যতীত রঙ্গলালের অন্য পরিচয় নাটকে নাই। 'ভ্রান্তি' নাটকে তাহার এইটুকুই প্রয়োজন, সুতরাং তাহার এইটুকু পরিচয়ই দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু কার্য্যতঃ সে সকলের বন্ধু। কথায় কাজে তাহাকে যেটুকু ধরা যায়, তাহাতে মনে হয়, তাহার সত্তা যেন সমগ্র সংসার ব্যাপিয়া বিদ্যমান। রঙ্গলাল মানবধর্ম্মী, নিষ্কাম কর্ম্মী। মানুষ তাহার দেবতা, নিঃস্বার্থ সেবা তাহার কর্ম্ম। দেবীমূর্ত্তির সম্মুখে সে গঙ্গাকে বলিতেছে, "অমন পাথুরে মাকে মানি না মানি, তাতে বড় এসে যায় না। ...আমার দেবতা প্রত্যক্ষ! আমার দেবতা কথা কয়; আমার দেবতার প্রাণ আছে; আমার দেবতা অমন দৃষ্টিভোগ খায় না, সত্যি ভোগ খায়, আমার দেবতা পরম সুন্দর!" গঙ্গা প্রশ্ন করিল, "কে তোমার দেবতা শুনি?" রঙ্গলাল উত্তর দিল, "মানুষ আমার দেবতা!...আমার দেবতা প্রাণময় মানুষ,—যার সেবা করলে প্রাণ ঠাণ্ডা হয়। যার সেবা ক'রে মনকে জিজ্ঞাসা করতে হয় না, ভাল করেছি কি মন্দ করেছি। যে দেবতার পূজায় কোন শাস্ত্রে নিন্দা নাই, তর্ক-বিতর্ক নাই।"

পুরঞ্জনকে বলিতেছে, "সংসার যে সাগর বলে, এ কথা ঠিক। কূল-কিনারা নাই। তাতে একটী ধ্রুবতারা আছে, দয়া। দয়া যে পথ দেখায়, সে পথে গেলে নবাবও হয় না, বাদশাও হয় না, তবে মনটা কিছু ঠাণ্ডা থাকে। এটী প্রত্যক্ষ, তর্ক-যুক্তির দরকার নাই।"

এ কথা রঙ্গলাল কালীকিঙ্কর বসু-রূপে তাহার শিষ্যা রঙ্গিণীর নিকট শিখিয়াছিল। রঙ্গিণী বলিতেছে, "ঘোর অন্ধকার, কেবল দূরে একটী ক্ষীণ আলো—দয়া। সকলই অন্ধকার। কেবল দয়ারই উজ্জ্বল শিখা দেখতে পাচ্ছি?" কালীকিঙ্কর বলিলেন, "বালিকা আমার শিক্ষাদাত্রী, বালিকা আমার গুরু।"

কালীকিঙ্করের পুরাতন ভৃত্য শান্তিরামও একদিন তাহাকে বলিয়াছিল, "মনের পচা পাক উট্‌কে দেখলে কেউ কারুকে দুর্জ্জন বলত নি। তা আমরা মুরুখ্যু, আমরা আর তোমাদের কি বলব।"

এ শিক্ষাও রঙ্গলাল ভুলে নাই। পুরঞ্জনকে বলিতেছে, "দুর্জ্জনের দণ্ড, কপটতার শাস্তি বলতে কইতে বড় সোজা, কিন্তু মনটা উট্‌কে-পাট্‌কে দেখলে ক'জন যে বুকে হাত দিয়ে বলতে পারে, আমি দুর্জ্জন নই, তা আমি আমার মন দিয়ে বুঝতে পারি নি।"

শাস্ত্রে বলে পূর্ব্বজন্মার্জ্জিতা বিদ্যা, পূর্ব্বজন্মের সংস্কার মানুষ ভুলে না। রঙ্গলালের হৃদয়ে এ দুটী কথা যদি দৃঢ়রূপে অঙ্কিত না হইত, তাহা হইলে শত্রু-মিত্র, সুজন-দুর্জ্জন নির্ব্বিশেষে নর-সেবা সম্ভব হইত না। এই সেবাকার্য্যে তাহার সত্য-মিথ্যার বিচার পর্য্যন্ত নাই। গঙ্গা যখন তাহাকে তিরস্কার করিল, "এই গঙ্গাতীরে তুমি আমায় মিথ্যা কথা কইতে শেখাচ্ছ, আর তুমিও মিথ্যা কথা কও?"

রঙ্গলাল উত্তর করিল, "আমি তো তোমায় বলি নাই যে আমি ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির, মিথ্যা কথা কই না।" সত্য! যে পরার্থে জীবন উৎসর্গ করিয়াছে, সে সত্য-মিথ্যার পার। রঙ্গলাল যখন কারাগার হইতে নিরঞ্জন ও তাহার পিতা শালিগ্রামকে উদ্ধার

করে, কথায় কাজে সে কি চতুরতার সহিত না প্রহরীদ্বয়কে প্রতারিত করিতেছে! তারপর পিতা-পুত্রের যখন উদ্ধার হইল, তখন সে প্রতারিত প্রহরীদ্বয়কে রক্ষা করিবার জন্য আপনি বন্ধন পরিল। গঙ্গা জিজ্ঞাসিল, "কি কচ্ছ, ধরা দেবে না কি?"

রঙ্গলাল অতি সহজভাবে বলিল, "তা নয় তো কি, এই গরীব দু'জনের সর্ব্বনাশ করব?"

রঙ্গলাল সদাই প্রফুল্ল। কোন্ অবস্থায় কাতর বা বিষণ্ণ নহে। পরকার্য্যসাধনের জন্য গণিকার গালি সে সচন্দন তুলসী-পত্রের ন্যায় গ্রহণ করে। গঙ্গাকে বলিতেছে, "তুমি একবার তোমার ক্ষেতের বুলি ধ'রে গাল দাও।" গঙ্গা বলিল, "দেখ দিনরাতই দিচ্ছি। তোমার গালে লজ্জা আছে কি? এমন বেহায়া পুরুষ জন্মে দেখি নি।"

রঙ্গলাল নির্ভীক। নবাব মুর্শিদকুলী খাঁকে বলিতেছে, "তোমার মত গোলামি আমি চাই নে।" তাহার অন্তরের তেজ, বল—অদ্ভুত। মুর্শিদকুলী খাঁ প্রশ্ন করিলেন, "তোমার এত্তা বল ক্যায়সে? তোমার এত্তা জোর ক্যায়সে?" রঙ্গলাল বলিল, "আমি যদি আপনার জন্য বাঁচতেম, তাহ'লে তোমারই মত আমার প্রাণে দরদ হ'ত; মরতে চাইতেম না। কিন্তু আমার মনে হয় কি জান? যে মরবার সময় পর্য্যন্ত যদি হাত উঠে, তাহ'লে একটা পরের কাজ করে যাব। আমি পরের জন্য বেঁচে আছি।"

মুর্শিদকুলী খাঁ পরের জন্য বাঁচার কোন হেতু খুঁজিয়া পাইলেন না। বলিলেন, "তোম কেয়া ধরমকা ওয়াস্তে অ্যায়সা কর?" রঙ্গলাল বলিল, "নবাব সাহেব, যে ধর্ম্মের জন্য পরের কাজ করে, সে আপনাকে বিলোতে পারে নাই।"

পাঠক স্মরণ করুন, কালীকিঙ্কর বসুও এই সত্যের আভাস পাইয়া বলিয়াছিলেন, "মরণে আত্মত্যাগ হবে না, আত্মা সঙ্গে যাবে, এইখানে আপনাকে বিলিয়ে দিলে তবে আত্মত্যাগ হবে।"

রঙ্গলাল কেবল কর্ম্মী নহে, কবি। গঙ্গাকে বলিতেছে, "কিন্তু গঙ্গা, একটী ছোট ফুল ফুটে কি কথা কয়, তা কি তুমি শুনেছ? মেঘের মুখে কি প্রেম, তা কি তুমি দেখেছ? চাঁদে তারায় নীরবে কেন ভেসে যায়, তা কি তুমি ভেবেছ? দেবতার প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি মানুষকে কি তুমি ঠাওর করেছ? দেখ, এ দুনিয়া একটা দেখবার জিনিস। দেখলে দেখতে পার। যদি দেখতে শেখ, তাহ'লে আমার মত একটা ছোট-খাট কীট-পতঙ্গ দেখবে না! তোমার প্রাণ উদার আকাশে মিশিয়ে যাবে, তুমি আপনাকে খুঁজে পাবে না। দেখবে যে রসের তরঙ্গ বইছে।"

শ্রীরামকৃষ্ণের উপদিষ্ট, শ্রীবিবেকানন্দের প্রচারিত নারায়ণ-জ্ঞানে নরসেবা এই চরিত্রের ভিত্তি। 'লোকহিতায়' উৎসৃষ্ট জীবন—এই মহাপুরুষের চরিত্রের সকল দিক 'ভ্রান্তি' নাটকের ক্ষুদ্র কর্ম্মক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বিকাশলাভ করে নাই—করিতে পারেও না। গিরিশচন্দ্র অতি সুকৌশলে ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়া রঙ্গলালের মুখে তাহার কতকটা আভাস দিয়া গিয়াছেন। তাহা অনুধাবন করিবার বিষয়। সে ভার পাঠকের উপর দিয়া আমরা নিরস্ত হইলাম।

'ভ্রান্তি'তে আর-একটী দেখিবার মত চরিত্র 'গঙ্গা'—রঙ্গলালের কর্ম্মসঙ্গিনী।

তাহার প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগে গণিকা গঙ্গা উচ্চব্রতে দীক্ষিতা হইয়াছে—"পোড়ারমুখো কি এক মন্ত্র দিলে, পরের ভাবনা ভাবতে-ভাবতেই গেলুম।"

এ নাটকের আর-একটী চরিত্র অন্নদা—উদয়নারায়ণের পরিণীতা কিন্তু পরিত্যক্তা পত্নী। প্রেমবলে এই নারীর দিব্যদৃষ্টি উন্মীলিত। 'কালাপাহাড়'র চঞ্চলা ও শিবাজী-মহিষী পুতলাবাঈ এই চরিত্রের অনুরূপ।

'ভ্রান্তি' সম্বন্ধে মন্তব্য

যাঁহারা ''ভ্রান্তি' পাঠ করিয়াছেন অথবা ইহার অভিনয় দেখিয়াছেন, তাঁহারা আমাদের সহিত একবাক্যে বলিবেন যে 'ভ্রান্তি' একখানি উচ্চ অঙ্গের নাটক। দেশ-প্রসিদ্ধ ডাক্তার পণ্ডিতবর মহেন্দ্রলাল সরকার বলিয়াছিলেন, "এই অসুখ অবস্থা-তেও গিরিশের বই বলে 'ভ্রান্তি' পড়তে আরম্ভ করলুম। বড় মিষ্টি লাগলো—একেবারেই সবটা পড়ে ফেললুম। রঙ্গলাল আর গঙ্গাবাঈ—এই দুইটি character-ই original. রঙ্গলাল সব্বার চেয়ে ভাল লেগেছে। গিরিশের এখনও লেখবার বেশ জোর আছে, এখনও সে tired হয় নি।" রায়সাহেব স্বর্গীয় বিহারীলাল সরকার 'বঙ্গবাসী'তে (২১শে ভাদ্র, ১৩০৯ সাল) লিখিয়াছিলেন, " 'ভ্রান্তি'—নাটকের অয়স্কান্ত মণি। কি অদ্ভুত আকর্ষণ!...গিরিশবাবু, তুমি ধন্য! তুমি রঙ্গলাল আঁকিয়াছ, আর তুমি রঙ্গলাল সাজিয়া রঙ্গমঞ্চে আপন চিত্র দেখাইয়া, বঙ্গ-নাট্যমঞ্চে রঙ্গ-রসের যে উৎস ছুটাইয়াছ, পরোপকার মহাব্রতের যে ধ্যান-কথা শুনাইয়াছ, তাহা অনেকদিন শুনি নাই, দেখি নাই।" ইত্যাদি।

যেরূপ যত্নের সহিত গিরিশচন্দ্র এই নাটকের শিক্ষাদান করিয়াছিলেন, ইহার অভিনয়ও সেইরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল। রঙ্গলালের ভূমিকায় নবীন যুবার ন্যায় সাজসজ্জায় গিরিশচন্দ্রকে যেমন মানাইয়াছিল, যুবাজনোচিত উৎসাহে তাঁহার অভিনয়ও সেইরূপ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল।

অভিনয় দর্শনে সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায় তৎ-সম্পাদিত 'বসুমতী'তে (২৬শে ভাদ্র, ১৩০৯ সাল) লিখিয়াছিলেন, "'ভ্রান্তি'র প্রত্যেক কথা ভাবিতে হয়—ভাবিয়া দেখিতে পারিলে আমি যে সত্যসত্যই এতটুকু—আমার যে স্পর্দ্ধার কিছুই নাই—আমার মধ্যে পুরুষকারের কিছুই নাই—তাহা বেশ হৃদয়ঙ্গম হয়। নিরঞ্জন, পুরঞ্জনের অকৃত্রিম বন্ধুতা—হায়! জগতে তাহা দুর্লভ। আর রঙ্গলাল, গঙ্গা—কবির অপূর্ব্ব সৃষ্টি; এমন স্বার্থত্যাগ বাঙ্গালী একবার চক্ষু খুলিয়া দেখিবে কি? এক-দিকে স্বার্থ, হিংসা, দ্বেষ—আর-একদিকে স্বর্গের পবিত্রতা। দাঁড়াও রঙ্গলাল, এই অধঃপতিত বাঙ্গালীর সম্মুখে তোমার কাছে শিক্ষাগ্রহণ করিলে বাঙ্গালীর শ্রী ফিরিবে! গঙ্গা বারবিলাসিনী—ফকির রঙ্গলাল কেমন ধীরে-ধীরে তাহাকে পরহিতব্রতে দীক্ষিত করিল! নাটকের কথা বলিব না, নাটককারের কৃতিত্বের পরিচয় আবার নূতন করিয়া

কি দিব ? এখন অভিনয়ের কথা ; পুরঞ্জন-নিরঞ্জন দুইজনই পাকা অভিনেতা, অভিনয়-কৌশলে উভয়েই বিশেষ পারদর্শী, দর্শকগণ এই দুই যুবক অভিনেতার অভিনয় দর্শনে মোহিত হইয়াছিলেন। রঙ্গলাল নিজে গিরিশবাবু, চিরপ্রশংসিতে আবার কি বলিয়া প্রশংসা করিতে হয় জানি না।...তাহার পর অভিনেত্রীগণের কথা ; গঙ্গা, অন্নদা, মাধুরী, ললিতা এই চারিটী অভিনেত্রী—কাহাকে রাখিয়া কাহার প্রশংসা করিব—চারিজনই নিজ-নিজের অংশ উৎকৃষ্ট অভিনয় করিয়াছেন। উন্মাদিনী অন্নদার কথা শুনিয়া হৃদয় অবনত হয়। গঙ্গা গণিকা—হউক গণিকা, কিন্তু তাহার পরহিতেচ্ছা পুরবাসিনীরও অনুকরণীয়, আর তাহার অভিনয় কেমন স্বাভাবিক।...'ভ্রান্তি' দেখিবার জিনিস—দেখাইবার জিনিস। 'ভ্রান্তি'র একটী গান এই স্থানে উদ্ধৃত করিবার প্রলোভন সংবরণ করিতে পারিলাম না ; গানটী এই :

'নাই তো তেমন বনে কুসুম, মনে যেমন ফোটে ফুল।
মধুভরে থরে-থরে আপনি কুসুম হয় আকুল ॥
সোহাগের চাঁদের কিরণ খেলে এ ফুলে,
ফুলে-ফুলে অজানা-তান হাসি মুখ তুলে,
মধু উছলে যবে, মাতে ফুল আপন সৌরভে,
আলোক-লতার মালা গাঁথা,—বিকিয়ে গিয়ে চায় না মূল ॥'

গিরিশবাবুর রচনায় স্বর্গের অমৃত বর্ষিত হউক।"

এই নাটকের তৃতীয় অঙ্ক, ষষ্ঠ গর্ভাঙ্কে, দেবীমন্দিরে ললিতা ও যোগবালাগণের গীতখানি উদ্ধৃত করিলাম। গীতের বিশেষত্ব এই, সাকারভাবে নিরাকার যোগমায়া বর্ণিত হইয়াছে। গীতখানি রচনা করিয়া গিরিশচন্দ্র বড়ই আনন্দলাভ করিয়াছিলেন।

"ত্রিকাল-মোহিনী, যোগিনী-সোহিনী, মুক্তিযোগ রঙ্গিনী।
দাহিত-বাসনা-বিভূতি-ভূষণা, জ্ঞান-করুণা-সঙ্গিনী ॥
সত্তা নিত্য, নিত্যবিত্ত, সত্যচিত্ত-বাসিনী—
সাধক শান্তি, বিবেক কান্তি, প্রান্তি ভ্রান্তি-নাশিনী ;
উপাধি নগনা, সমাধি মগনা, ত্রিগুণাতীত অঙ্গিনী।
করুণার্ণব, (অ)নাদি প্রণব, ভাবাভাব ভঙ্গিনী ॥"

'ক্লাসিকে'র পর 'মিনার্ভা' ও 'মনোমোহন থিয়েটারে' 'ভ্রান্তি'র পুনরভিনয় হয়। রঙ্গলালের ভূমিকা দানিবাবু গ্রহণ করিয়াছিলেন। অন্নদা ও গঙ্গার ভূমিকাভিনয়ে পরলোকগতা তিনকড়ি দাসী ও সুশীলাবালা যশস্বিনী হইয়াছিলেন।

আয়না

১০ই পৌষ (১৩০৯ সাল) 'ক্লাসিক' থিয়েটারে গিরিশচন্দ্রের 'আয়না' প্রথম অভিনীত হয়। প্রথমাভিনয় রজনীর অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ :

গৌরীশঙ্কর মিত্র	নটবর চৌধুরী।
ব্রজেন্দ্র	শ্রীযুক্ত অতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য
সদাশিব গুঁই	চণ্ডীচরণ দে।
আনন্দরাম	শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ঘোষ।
সৃষ্টিধর	অমরেন্দ্রনাথ দত্ত।
মিঃ সামসহায় দে	
মটুকো	শ্রীযুক্ত ননিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।
কিনু স্যাকরা	শ্রীযুক্ত অহীন্দ্রনাথ দে।
নিরু উকিল	গোষ্ঠবিহারী চক্রবর্ত্তী।
গৌরীশঙ্করের দেওয়ান	শশীভূষণ আশ।
চিনিবাস	শ্রীযুক্ত হীরালাল চট্টোপাধ্যায়।
ভুলো পোদ্দার	পান্নালাল সরকার।
চা-ওয়ালা	শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু।
রামেশ্বরী	শ্রীমতী জগত্তারিণী।
কিশোরী	কিরণবালা।
তড়িৎসুন্দরী	কিরণশশী (ছোটরাণী)।
বামা	কুমুদিনী। ইত্যাদি।
সঙ্গীত-শিক্ষক	শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ঘোষ।
নৃত্য-শিক্ষক	শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু।
রঙ্গভূমি-সজ্জাকর	শ্রীযুক্ত কালীচরণ দাস।

ইহা একখানি সামাজিক নক্সা—বড়দিন উপলক্ষ্যে লিখিত। বিয়েপাগলা বুড়োর লাঞ্ছনা উপলক্ষ্য করিয়া এই আয়নায় সমাজের অনেক বিকৃত ছবি প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। নক্সাখানি হইতে একখানি শ্লেষাত্মক গীত পাঠকগণকে উপহার দিলাম :

"চা-ওয়ালা ও চা-ওয়ালী—

পুরুষ। সাহেবরা দেখলে ভেবে, বাঙ্গালা বরবাদে যাবে,
গরম-গরম চা না খেলে।
স্ত্রী। জেনানা চা পায় না খেতে, মেম কাঁদে তাই হুকুর রেতে,
বলে, 'পুয়োর জেনানা বাঁচবে কিসে চা না পেলে ?'
পু। আয় গাড়োয়ান, মজুর মুটে,
স্ত্রী। কুলো ছেড়ে আয় লো ছুটে,
উভয়ে। গরম গরম চায়ের মজা নিয়ে যা লুটে,—
আয় চলে—কাজ ফেলে।
পু। তিন আনা রোজ তো পেলি, কি করলি যদি চা না খেলি ?
(ওরে ও গাড়োয়ান মুটে !)

স্ত্রী। আজ তো নগদ পয়সা দেছে, ভাত খেলে কি থাকবি বেঁচে,
(ওলো ও ঝাড়ুনীরে !)

উভয়ে। ডাক্তার সাহেব ঠিক বলেছে, রোগের ঘর ঐ ভাতে-ডালে ;
বাবুরা সব চা চিনেছে, ময়রা গেছে 'গো টু হেলে' ।"

কবি গিরিশচন্দ্র চিরদিন কল্পনালোকে ভ্রমণ করিলেও সামাজিক সমস্যায় এবং এবং সমাজের কল্যাণে তাঁহার দৃষ্টি চিরজাগ ছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'আয়না' হইতে নিয়ে আর-একখানি গীত উদ্ধৃত করিলাম। কিন্তু ইহার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাঠক তাঁহার সামাজিক নাটকে পাইবেন।

"গীত।

যারা পরাশরের দোহাই দিয়ে দুঃখে কাঁদ বিধবার।
কুমারী ঘরে-ঘরে, পার কে করে, ব্যবস্থা কি কর তার ?
মেয়ে পার করতে কত গিয়েছে ভিটে,
হেঁটে স্মলকজ কোর্টে, গেছে চাকরীটী ছুটে,
ফেন খেয়ে ছেলে কত ঘুমোয় আধ পেটে !
থাকুক জেতের অভিমান, থাকুক কন্যাদানের কাণ,
রেখে দাও হিন্দুয়ানীর ভাণ ; –
আইবুড়ো পার করতে গিয়ে গেরস্ত যায় ছারেখার।
যুবতী কুমারী আছে, দোজবরে, কি ভাবো আর ?"*

'সৎনাম'

১৮ই বৈশাখ (১৩১১ সাল) 'ক্লাসিক থিয়েটারে' গিরিশচন্দ্রের 'সৎনাম' নাটক প্রথম অভিনীত হয়। প্রথমাভিনয় রজনীর অভিনেতৃগণ :

আওরঙ্গজেব	শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু)।
হামিদ খাঁ	নটবর চৌধুরী।
বিষণ সিংহ ও মীরসাহেব	গোষ্ঠবিহারী চক্রবর্ত্তী।
কারতরফ খাঁ	চণ্ডীচরণ দে।
করিম	শ্রীযুক্ত হীরালাল চট্টোপাধ্যায়।
মোহান্ত	শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ঘোষ।
ফকিররাম	পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিভূষণ ভট্টাচার্য্য।
রণেন্দ্র	অমরেন্দ্রনাথ দত্ত।

* পরাশর মুনি বিধবা-বিবাহের ব্যবস্থা দেন। সেই মত অবলম্বন করিয়া স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা-বিবাহ প্রচলনের চেষ্টা পাইয়াছিলেন।

চরণদাস	অনুকূলচন্দ্র বটব্যাল (ব্যাদাস)।
পরশুরাম	শ্রীযুক্ত অহীন্দ্রনাথ দে।
রঘুরাম	শ্রীযুক্ত অতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।
বৈষ্ণবী	শ্রীমতী কুসুমকুমারী।
মোহিনী	শ্রীমতী পান্নারাণী।
গুলসানা	রাণীমণি।
পান্না	শ্রীমতী হরিসুন্দরী (ব্ল্যাকী)। ইত্যাদি।
সঙ্গীত-শিক্ষক	শ্রীযুক্ত দেবকণ্ঠ বাগচী ও শশীভূষণ বিশ্বাস।
নৃত্য-শিক্ষক	শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু।

সম্রাট আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে সৎনামী-সম্প্রদায়ের বিদ্রোহ অবলম্বনে এই ঐতিহাসিক নাটকখানি রচিত হয়। (1) *The Posthumous Papers of the late Sir H. M. Elliot*, K. C. B., (2) *British India* by Hugh Murray, F. R. R. E., and others, (3) Scott's *History of Dekkan*, (4) *Calcutta Review*, (5) Elphinstone's *History of India*, (6) *Mogul Dynasty* (Catron) গ্রন্থসমূহ হইতে ইহার উপাদান সংগৃহীত। ভগবানকে 'সৎনাম' বলিয়া ডাকায় এই সম্প্রদায় সৎনামী বলিয়া অভিহিত হইত। বৈষ্ণবী নাম্নী জনৈকা রাজপুত-রমণী—হিন্দু 'জোয়ান অফ্ আর্ক'—এই বিদ্রোহের নেত্রী ছিলেন। ইহাদের শৌর্য্য-বীর্য্যে উপর্য্যুপরি মোগল বাহিনী পরাজিত হওয়ায় সম্রাট স্বয়ং রণস্থলে আগমনপূর্ব্বক সুকৌশলে বিপক্ষদল দমিত করেন। আদিরস ইহার প্রধান আশ্রয় এবং প্রধানতঃ বীররস ইহার অঙ্গীভূত।

গিরিশচন্দ্র এই নাটকে দেখাইয়াছেন যে ন্যায়-অন্যায়, পাপ-পুণ্য-নির্ব্বিচারে দয়া, মায়া, প্রেম, মমতা—এমনকি মুক্তিকামনা-শূন্য হইয়া লক্ষ্যপথে অগ্রসর হইতে না-পারিলে উচ্চসঙ্কল্প সিদ্ধ হয় না। আরও প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে বিশ্বাস অসাধ্য-সাধনে সমর্থ এবং রমণীর মোহিনীশক্তি অমোঘ।

এই নাটকের নায়ক-চরিত্রসৃষ্টির বিশেষত্ব এই যে, কবি যে সকল উচ্চগুণে নায়ককে ভূষিত করিয়াছেন, সেই সকল উচ্চবৃত্তিই রণেন্দ্রের সর্ব্বনাশের কারণ হইয়াছে। নায়িকা গুলসানা চরিত্রে প্রেম ও প্রতিহিংসা এই দুই বিপরীত ভাবের অদ্ভুত দ্বন্দ্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। গুলসানা গিরিশচন্দ্রের একটী অপূর্ব্ব সৃষ্টি। নাটকের অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে প্রধান বৈষ্ণবী, ফকিররাম, চরণদাস ও আওরঙ্গজেব।

ফকিররাম এবং চরণদাস উভয়েই সৎনামী সিদ্ধ-পুরুষ। ফকিররাম দেশকে মোগল-শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিবার স্বপ্নে চির-বিভোর—সম্ভবতঃ এইজন্যই তিনি পরিব্রাজক। চরণদাস তাঁহার শিষ্য, দাস্য-ভক্তি-সিদ্ধ, গুরুগত প্রাণ। চরণদাসের কর্ম্মাশ্রয় দেশের জন্য নয়—গুরুর জন্য। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের সর্ব্বাপেক্ষা কৃতিত্ব আওরঙ্গজেবের চিত্র অঙ্কনে। ভারত-সম্রাট সদাসতর্ক, সাবধান—সাবহিত। শুভ অবসর তিনি কখনও

পরিত্যাগ করেন না। কাল-কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার সঙ্গে-সঙ্গেই তিনি যেন তাহার কেশাগ্র ধরিয়া স্বীয় কার্য্য সাধন করাইয়া লন। কেহই সম্রাটের বিশ্বাসভাজন নহে—কিন্তু আপনার উপর তাঁহার প্রভূত বিশ্বাস। বাদশা অপেক্ষা আপনাকে অধিক বিচক্ষণ বা জ্ঞানী মনে করা তাঁহার কাছে অপরাধ। সম্রাটের উক্তিতে আড়ম্বর নাই, কপটতা নাই, বাহুল্য নাই। গিরিশচন্দ্র সে সকল রাজকীয় গুণে ভারত-সম্রাটকে—কেবল ভারত-সম্রাটকে কেন—প্রধান-প্রধান মোগল নেতাগণকে ভূষিত করিয়াছেন, তাহা হিন্দুর আদর্শস্থানীয়—অনুকরণযোগ্য, এ কথা গ্রন্থকার ভূমিকাতেই পুনঃ-পুনঃ ইঙ্গিত করিয়াছেন।

কিন্তু অতি অশুভক্ষণে গিরিশচন্দ্র 'সৎনাম' নাটক রচনা করিয়াছিলেন। এই নাটকখানি হিন্দু-মুসলমান দ্বন্দ্ব-বিষয়ক, সুতরাং পরস্পর-বিবদমান বিরোধী সম্প্রদায়ের পরস্পরের প্রতি কটূক্তি-প্রয়োগ নাটকে অপরিহার্য্য। গিরিশচন্দ্র 'সৎনাম' গ্রন্থের ভূমিকায় এ কথা দৃষ্টান্তসহ উল্লেখ করিলেও মুসলমান-সম্প্রদায় বিশেষরূপ চঞ্চল হইয়া উঠেন। সে সময়ের মুসলমান সংবাদপত্রসমূহেও অগ্নিতে ফুৎকারের ন্যায় এতদ্-সম্বন্ধে তীব্র আলোচনা হইতে থাকে। যাহাই হউক একদিকে মুসলমান সম্প্রদায়ের দারুণ চাঞ্চল্য, অন্যদিকে হিন্দুজাতির পরাজয়ে সাধারণ দর্শকগণও সেরূপ প্রসন্ন নহে, এই উভয় কারণ মিলিত হইয়া 'সৎনাম' অকালে কালগ্রাসে পতিত হইল। থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষগণ চতুর্থ রজনীতে (৮ই জ্যৈষ্ঠ) উত্তেজিত মুসলমানগণের জনতা দর্শনে তাঁহাদের প্রীতির নিমিত্ত 'সৎনামে'র অভিনয় বন্ধ করিয়া দিয়া তৎ-পরিবর্ত্তে 'ভ্রমর' ও 'দোললীলা'র অভিনয় ঘোষণা করেন।

ইহার কিছুকাল পরে ৺বিহারীলাল দত্তের 'ন্যাসান্যাল থিয়েটারে' (রয়েল বেঙ্গল রঙ্গমঞ্চে) 'ভারত-গৌরব' নাম দিয়া সুপ্রসিদ্ধ নট-নাট্যকার শ্রীযুক্ত চুণীলাল দেব কয়েক রাত্রি 'সৎনাম' নাটক অভিনয় করেন। চুণীলালবাবু রণেন্দ্রের এবং সুবিখ্যাতা অভিনেত্রী তিনকড়ি দাসী বৈষ্ণবীর ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। 'সৎনামে'র ইহাই শেষ অভিনয়।

ত্রিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

সাপ্তাহিক ও মাসিকপত্রে গিরিশচন্দ্র

'ক্লাসিক থিয়েটারে'র একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা—'রঙ্গালয়' নামক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রচার। ইংরাজী ও বাঙ্গালা সংবাদপত্রসমূহে থিয়েটারে অভিনীত নাটকাভিনয়ের মধ্যে-মধ্যে সমালোচনা বাহির হইলেও সকল সংবাদপত্রের সম্পাদকই যে সাহিত্যরথী অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রভৃতির ন্যায় নাট্যকলার উন্নতিকল্পে অতি যত্নের সহিত দোষ-গুণ উভয়ই দেখাইয়া দিতেন তাহা নহে। অভিনয়-মাধুর্য্য বিকাশের নিমিত্ত অভিনেতৃগণকে কিরূপ কঠোর সাধনা করিতে হয়, তাহার মর্ম্ম-গ্রহণে সকলেই যে মনোযোগী হইতেন বা তৎ-সম্বন্ধে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন তাহাও ঠিক বলা যায় না। এ নিমিত্ত সময়ে-সময়ে নাটক—বিশেষতঃ নাটকের অভিনয়ে—যথাযথ সমালোচনার পরিবর্ত্তে অযথা স্তুতি বা অযথা নিন্দা প্রচারিত হইত; কখনও-কখনও-বা ব্যক্তিগত বিদ্বেষের বিষও সমালোচনায় ফুটিয়া উঠিত। এইসময়ে দুইখানি বাঙ্গালা সংবাদপত্রের সম্পাদক থিয়েটারওয়ালাদের গালি দিবার জন্যই যেন উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছিল।

রঙ্গালয়ের দর্শকগণ-মধ্যে অনেকেই সংবাদপত্র পাঠ করিয়া থাকেন, এইরূপ এক-পক্ষের কথা শুনিয়া নাট্যাভিনয় সম্বন্ধে তাঁহাদের একটা বিকৃত ধারণা জন্মিত, কারণ অপরপক্ষের কোন কথাই শুনিবার তাঁহাদের সুযোগ ছিল না। এই অভাব দূর করিবার মানসে এবং তৎ-সঙ্গে নাট্যকলা সংক্রান্ত প্রবন্ধাদি প্রকাশে সাধারণকে নাট্যকলা-রসাস্বাদনে প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত অমরবাবু একখানি সাপ্তাহিকপত্র প্রচারার্থ গিরিশচন্দ্রের পরামর্শ গ্রহণ করেন। গিরিশচন্দ্র এরূপ একখানি সংবাদপত্রের অভাব বহুদিন হইতেই অনুভব করিতেন। তাঁহার সম্পূর্ণ উৎসাহ পাইয়া এবং তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতায় অমরবাবু সত্বর কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন।

'রঙ্গালয়' সাপ্তাহিকপত্র

সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সম্পাদকতায় ১৩০৭ সাল, ১৭ই ফাল্গুন, শুক্রবার হইতে 'রঙ্গালয়' নামক সচিত্র সাপ্তাহিক সংবাদপত্র বাহির হইতে থাকে। প্রথম সংখ্যাতেই গিরিশচন্দ্রের "আত্মকথা", "রঙ্গালয়", "ইংরাজরাজত্বে বাঙ্গালী"

ও "নটের আবেদন" শীর্ষক চারিটী প্রবন্ধ এবং "সেয়ান ঠক্‌লে বাপকে বলে না" নামক একটী গল্প বাহির হয়। যে পর্য্যন্ত না রঙ্গালয় সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, গিরিশচন্দ্র প্রত্যেক সপ্তাহেই তাহাতে নিয়মিত লিখিতেন। রঙ্গালয়ের প্রথম সংখ্যায় সূচনাস্বরূপ গিরিশচন্দ্রের যে "আত্মকথা" শীর্ষক প্রথম প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল, আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম। ইহা পাঠ করিলেই 'রঙ্গালয়' প্রকাশে গিরিশচন্দ্রের মনোভাব পাঠকবর্গের উপলব্ধি হইবে।

"অনেক সংবাদপত্রেই প্রায় রঙ্গালয়ের বিষয় কিছু না কিছু থাকে, ইহাতে প্রকাশ পায় যে, রঙ্গালয়ের কথা অনেকে জানিতে চান, তবে আপনার কথা আপনি যেমন বলা যায়, অপরের দ্বারা সেরূপ হয় না। আপনার কথা আপনারা যতদূর পারি বলিব, এই নিমিত্তই 'রঙ্গালয়ে'র আয়োজন। আমাদের সহিত সম্বন্ধ নাই, এরূপ ব্যক্তি বা বস্তু হইতে পারে না। কারণ, রঙ্গালয় জগতের একটী ক্ষুদ্র অনুরূপ। সুতরাং সমস্ত বিষয়ই রঙ্গালয়ের স্তম্ভে উল্লিখিত হইবে। তবে আমাদের অন্তর যেরূপ আলোকিত ও সে আলোকে সে বস্তু যেরূপ দেখিব, সেইরূপ বর্ণনা করিব। এক বস্তু দুইজনে দুইভাবে দেখেন সন্দেহ নাই। কেরানী, অফিসের সময় বৃষ্টি হইলে, বিধাতাকে নিন্দা করেন, কিন্তু কৃষকের আনন্দের সীমা থাকে না। কেহ বা রঙ্গালয় উৎসন্ন না যাওয়াতে ক্ষুণ্ণ, কেহ বা সম্পূর্ণ উৎসাহপ্রদান করেন। অত্যাচারী ধনীর বিচারপতি ঘুষ খাইলে ভাল হয়, কিন্তু দরিদ্রের তাহাতে সর্ব্বনাশ। রাজ্যশাসন না থাকিলে চোরের ভাল, গৃহস্থের অমঙ্গল। এইরূপ সমস্ত বিষয়েই মতান্তর। আমাদের সহিতও অনেকের মতান্তর হইবার সম্ভাবনা।

"আমাদের মতে স্বদেশ ধনধান্যে পূর্ণ হউক, সকলে নীরোগ হউন, ঘরে-ঘরে আনন্দকার্য্য উপস্থিত হউক, আমরা পরমসুখে কালাতিপাত করিতে পারিব। দেশে সঙ্গীতশিল্পের উন্নতি হউক, সুযোগ্য নাটককার জন্মগ্রহণ করুন, অরসিক ঘৃণিত হউন, সুরসিকের সম্মান হউক, আমাদের বিশেষ মঙ্গল। রাজপুরুষেরা সুখে থাকুন, নটে উৎসাহপ্রদান করুন, আমরা পরম আনন্দে থাকিব। হিংস্রক, নিন্দক, কুৎসিত-আচারী ব্যক্তি জগতে না থাকে, যে বস্তু যেরূপ—তাহার সেরূপ আদর হয়, জগতে মার্জ্জনাশীল ব্যক্তি অধিক হন, সম্ভ্রান্ত ধনাঢ্য ব্যক্তি আনন্দময় হন, আমরা শিল্পী, আমাদের পরম মঙ্গল। বাণিজ্য-বিস্তার এবং বিজ্ঞানের উন্নতি দ্বারা নানাবিধ আবিষ্কারে রঙ্গালয় সুসজ্জিত হউক—আমাদের পরম আনন্দ।

"বলা হইল, যে সমস্ত বিষয়ের সহিত আমাদের সম্বন্ধ, সমস্ত বিষয়েরই চর্চ্চা 'রঙ্গালয়ে' হইবে। আত্মরক্ষা পরমধর্ম্ম। আমরা আত্মরক্ষার সর্ব্বদা চেষ্টা করিব। কুৎসিত-প্রকৃতি ব্যক্তিমাত্রেই রঙ্গালয়ের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করেন। মিথ্যা অপবাদ রঙ্গালয়ের প্রতি অর্পণ করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত নহেন, যে কথা বলিলে লোকে রঙ্গালয়কে ঘৃণা করিবেন, মন্দ কল্পনা-প্রভাবে সেই কথাই সৃষ্টি করেন। আমরাও 'রঙ্গালয়' হইতে তাঁহাদের প্রতি তীব্র দৃষ্টি করিব।

"সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেই আমাদের সর্ব্বদা স্নেহ করেন—আশীর্ব্বাদ করেন—উপদেশ-

প্রদান করেন,—আমরাও তাঁহাদের নিকট সম্পূর্ণ কৃতজ্ঞ, তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ ও উপদেশ আদরে মস্তকে ধারণ করি। যে সকল ব্যক্তি রঙ্গালয়ের প্রতিপালনের নিমিত্ত অনুকম্পা প্রদর্শনে রঙ্গালয়ে পদার্পণ করেন, তাঁহাদের আমরা সেবক। যথাসাধ্য তাঁহাদের প্রীতি-সাধনে আমরা চিরযত্নবান্।

"যাঁহাদের উৎসাহে, যত্নে ও আয়াসে বঙ্গবাসী রঙ্গালয় প্রথম দেখিয়াছিল, রাজপদে ও উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াও যাঁহারা অভিনয় শিক্ষা দিয়াছিলেন, নব বঙ্গভাষার পুষ্টি-সাধনে নাটক পুষ্ট করিয়াছিলেন, যাঁহারা আমাদের পথপ্রদর্শক ও গুরু, গুরুদক্ষিণাস্বরূপ আমরা তাঁহাদের পদে প্রণাম করি।* আমাদের দৃষ্টিতে তাঁহারা দেবস্থানীয় ও পরম পূজ্য। আমরা তাহাদের দাসানুদাস। তাঁহাদের মধ্যে কেহ-কেহ স্বর্গগত হইয়াও আমাদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করেন—এই আমাদের ধারণা, সর্ব্বদাই তাঁহাদের স্মৃতি আমাদের ধারণা, সর্ব্বদাই তাঁহাদের স্মৃতি আমাদের হৃদয়ে জাগরূক থাকিবে।

"রাজার প্রতি আমাদের পরম শ্রদ্ধা। বাল্য রঙ্গালয়—সকল দেশেই হতাদৃত হইয়া থাকে—আমাদেরও সেই দুর্ভাগ্য, কিন্তু নিরপেক্ষ রাজার প্রভাবে আমাদের প্রতি বিদ্বেষপ্রকাশে কেহই সম্পূর্ণ সাহসী হন না। রাজদ্বারে আমাদের ব্যবসা—ব্যবসা বলিয়া গণ্য—জঘন্য ব্যবসা নয়—অনেক রাজপুরুষ আমাদের উৎসাহ-প্রদানার্থ আয়াস স্বীকারে রঙ্গালয়ে উপস্থিত হন, ও মিষ্ট সম্ভাষণে আমাদের হৃদয় উন্নত করেন। কৃতজ্ঞতা-সহকারে যদি কখনও কোন উপহার দিই, তাহা যত্নে গ্রহণ করিয়া আমাদের সম্মানিত করেন। রাজপ্রতিনিধি কৃপায় আমাদের তত্ত্বাবধারণ করিয়া থাকেন। রাজার গুণে আমরা সম্পূর্ণ রাজভক্ত।

"সাধুর প্রতি আমাদের অচলা ভক্তি। সাধু-সন্ন্যাসী সদাসর্ব্বদা আমাদের রঙ্গালয়ে উপস্থিত হন। ঘৃণিতা অভিনেত্রীকেও পদধূলি দেন, দক্ষতার প্রশংসা করেন, ধর্ম্মপুস্তক অভিনয় দর্শনে আনন্দ করেন—ভাবদশাপন্ন হন, তাঁহাদের ভক্তগণকে অভিনয় দেখিতে উপদেশ দেন। কেহ ঘৃণা করিয়া আমাদের প্রতি কুবচন নিক্ষেপ করিলে, তাঁহাদের বুঝান ও যাহাতে আমাদের ধর্ম্মোন্নতি হয়, তাহা সর্ব্বদাই কামনা করেন। আমরা তাঁহাদের চরণে শত-শত প্রণাম করিয়া 'রঙ্গালয়' কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম।

"আমাদের আত্মকথা সংক্ষেপে বলিলাম। ক্রমে কার্য্যে আমাদের আরও পরিচয় পাইবেন। পরিশেষে বক্তব্য—আমরা নিরপেক্ষ, কাহারও তোষামোদ বা কাহারও প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করিব না। মনে-জ্ঞানে যাহা সত্য জানি,—সত্যের দাস হইয়া তাহা প্রচার করিব। বলা বাহুল্য—আমরা সাধারণের উৎসাহপ্রার্থী।"

প্রায় দুই বৎসর 'রঙ্গালয়' প্রকাশিত হইবার পর রঙ্গালয় সংক্রান্ত লোকজন, আসবাব ও হিসাবপত্র এত বাড়িয়া যাইতে লাগিল, যে থিয়েটার ও একখানি বৃহৎ সাপ্তাহিক সংবাদপত্র একসঙ্গে পরিচালনা করা অসুবিধাজনক হইয়া উঠিল। অমরবাবু যদি

* মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র প্রভৃতিকে লক্ষ্য করিয়া লিখিত।

'রঙ্গালয়ে'র স্বত্ব প্রদান করেন, তাহা হইলে 'রঙ্গালয়'-প্রচারের উদ্দেশ্য বজায় রাখিয়া পাঁচকড়িবাবু স্বয়ং কাগজখানি পরিচালনা করেন, এইরূপ তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। অমরবাবু ঔদার্য্যগুণে 'রঙ্গালয়ে'র স্বত্ব ছাড়িয়া দিতে সম্মত হইলে, পাঁচকড়িবাবু গিরিশচন্দ্রকে বলেন, "আজকাল সকল সংবাদপত্রে গ্রাহকবৃদ্ধির নিমিত্ত উপহার প্রদান করা হয়। যত্তপি আপনার কয়েকখানি নাটক আমাকে এক বৎসরের নিমিত্ত উপহার-প্রদানে অনুমতি দেন, তাহা হইলে আপনাদের অনুগ্রহে আমি স্বাধীনভাবে জীবিকা-নির্ব্বাহে সমর্থ হই।" 'রঙ্গালয়ে'র স্থায়িত্ব কামনায় গিরিশচন্দ্র আনন্দের সহিত এক বৎসরের নিমিত্ত তাঁহার 'কালাপাহাড়', 'মুকুল-মুঞ্জরা' ও 'চণ্ড' নাটক রঙ্গালয়ের উপহার-নিমিত্ত প্রদান করেন।

'নাট্যমন্দির' মাসিকপত্র

ইহার প্রায় দশ বৎসর পরে অমরবাবু 'নাট্যমন্দির' নামে একখানি মাসিকপত্র বাহির করিবার অভিপ্রায় করেন। অমরেন্দ্রনাথ সে সময়ে 'ষ্টার থিয়েটারে' এবং গিরিশচন্দ্র 'মিনার্ভা'য়। অমরবাবুর উৎসাহ এবং আগ্রহে গিরিশচন্দ্র 'রঙ্গালয়ে'র ন্যায় 'নাট্যমন্দিরে'রও পৃষ্ঠপোষকতায় সম্মত হইয়াছিলেন। ১৩১৭ সাল, শ্রাবণ মাস হইতে 'নাট্যমন্দির' বাহির হইতে আরম্ভ হয়। প্রথম বর্ষের 'নাট্যমন্দিরে' গল্প, কবিতা ও প্রবন্ধাদিতে মোট ৬২টী বিষয় ছিল, তাহার তিনভাগের একভাগ গিরিশচন্দ্রের লিখিত। দ্বিতীয় বর্ষেও গিরিশচন্দ্রের কয়েকটী প্রবন্ধ বাহির হয়; কিন্তু সেই বৎসরেই তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করেন। আমরা এই মাসিকপত্রিকায় গিরিশচন্দ্রের লিখিত "নাট্য-মন্দির" শীর্ষক প্রথম প্রস্তাবনা-প্রবন্ধটী নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। পাঠক দেখিবেন, আজিকালিকার সাধারণ রঙ্গালয়ের বিরোধী সমালোচকগণ যেভাবে সমালোচনা করিয়া থাকেন, তখনও অর্থাৎ ১৭ বৎসর পূর্ব্বে সেই একই ভাবের সমালোচনা চলিত। বর্ত্তমান সমালোচকদিগের নূতনত্ব কিছুই নাই। প্রস্তাবনা-প্রবন্ধ:

"পরিব্রাজকমাত্রেই বিদেশে যাইয়া তথাকার লোকের আচার-ব্যবহার—রীতি-নীতি—আর্থিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থা জানিবার ইচ্ছা করেন, তাহার সহজ উপায়—নাট্যমন্দির দর্শন। তথায় দেখিতে পান, শিল্পীরা কিরূপ উন্নত, কবি কিরূপ ভাবাপন্ন এবং দর্শকবৃন্দও কি রসে আকৃষ্ট। মানবের প্রধান পরীক্ষা—তাহার রুচি। সে রুচির পরিচয় নাট্যমন্দিরে সম্পূর্ণ প্রাপ্ত হন। অতি উচ্চ হইতে নিম্নস্তরের মনুষ্য পর্য্যন্ত এককালীন দেখিতে পান; এবং জাতীয় রুচির সাংসারিক অবস্থায় কিরূপ পরিমাণে প্রভেদ হইয়াছে, তাহাও বুঝিতে পারেন। সময় কি মূর্ত্তিতে মানব-হৃদয়ের সহিত ক্রীড়া করিয়া চলিতেছে, সে মূর্ত্তি পৃথিবীব্যাপী বা সে দেশীয়, তাহা বুঝিতে পারা যায়। মানব কাঠিন্ত ধারণ করিয়া, কার্য্য সংঘর্ষণে প্রবৃত্ত হয়; কিন্তু কার্য্যান্তে সে কঠিন আবরণ পরিত্যাগ করিতে প্রায় সকলেই ব্যস্ত। মুকুটধারী হইতে শ্রমজীবী

পর্য্যন্ত কার্য্যের বিরাম প্রার্থনা করিয়া থাকে। যাহাদের দৈনিক অন্নের জন্য কঠোর পরিশ্রমে দিবা অতিবাহিত হইয়াছে, তাহারাও বিরামদায়িনী নিদ্রার আবাহন উপেক্ষা করিয়া, কথঞ্চিৎ সময় কিঞ্চিৎ আনন্দে কাটাইবার চেষ্টা করিয়া থাকে। শ্রমজীবী ব্যক্তির সহিত একত্রে বসিয়া, নাচ-গান, হাস্য-পরিহাসে নিদ্রার পূর্ব্বকাল অতিবাহিত করে। কার্য্যক্লান্ত মানবের আনন্দ-প্রদানের জন্য নাট্যমন্দির সৃষ্টি হয়; এবং তথায় ছোট-বড় সকলেই আনন্দ করিতে যান।

"কিন্তু নাট্যমন্দির কলাবিদ্যাবিশারদের কার্য্যস্থল। কেবল আনন্দ-দানে তাহার তৃপ্তি নহে। তাহার আজীবন উদ্যম, কিরূপে আনন্দস্রোত মানব-হৃদয় স্পর্শ করিয়া, মানবের উন্নতিসাধন করিতে পারে। গাম্ভীর্য্য ও মাধুর্য্যপূর্ণ দৃশ্যসকল অঙ্কিত করিয়া, দর্শকের চক্ষের সম্মুখে ধরে। দর্শক তুষারাবৃত হিমাদ্রি শিখরের চিত্র দর্শনে মহাদেবের ধ্যানভূমির আভাস পান। কোকিল-কূজিত পুষ্পিত-কুঞ্জবনে রাধাকৃষ্ণের লীলাভূমি অনুভব করিতে পারেন। মহাকালের মুকুর-স্বরূপ বিশাল সমুদ্র-অঙ্কিত চিত্রপট দর্শন করিয়া, অনন্তের আভাসপ্রাপ্তে স্তম্ভিত হন। বাহ্য চাক্‌চিক্য-মণ্ডিত পাপের ছবি দেখিয়া তাঁহার মনে পাপের প্রতি ঘৃণার উদ্রেক হয়। আত্মত্যাগী মহাপুরুষের বিশ্বপ্রেমে প্রেমের আভাস পান। উদ্‌ঘাটিত মানব-হৃদয়ে রিপুর দ্বন্দ্ব দেখেন, এবং তাঁহার হৃদয় হইতে যে সে সকল রিপু বর্জ্জনীয়, তাহাও বুঝিয়া যান। অন্তঃস্থলস্পর্শী তানলহরীর সরস সলিলে হৃদ্‌পদ্ম প্রস্ফুটিত হইয়া বিমল অশ্রুজল শ্রোতার চক্ষে আনে। ক্ষুদ্র কাপট্যের ক্রিয়াকলাপ নিজ চতুরতা-প্রভাবে বিফল হইয়া, কিরূপ হাস্যাস্পদ হয়—তাহাও দেখিতে পান। নবরসে আপ্লুত হইয়া দর্শক তাঁহার সুখ-স্বপ্নে যামিনী যাপন করেন।

"বঙ্গদেশে সেই আনন্দ-প্রদায়িনী নাট্যমন্দির হইয়াছে। এ নাট্যমন্দিরের যে অনেক ক্রটী রহিয়াছে, এবং উন্নতির যে অনেক অপেক্ষা, তাহা মন্দির-অধ্যক্ষেরা স্বীকার করেন। কিন্তু তাঁহাদের প্রাণপণ উদ্যম ও আজীবনের আকিঞ্চন, নিন্দার বিষদন্ত হইতে পরিত্রাণ পায় না। নিন্দুকের কি আশ্চর্য্য শক্তি! তাহারা একরূপ সর্ব্বজ্ঞ! সমুদ্রের গর্জ্জন না শুনিয়াও—ফরাসীদেশের নাট্যমন্দির কিরূপে চলিতেছে, তাহা তাঁহারা জানেন; এবং আমাদের দেশের নাট্যমন্দির যে ফরাসীদেশের নাট্য-মন্দির নয়, তজ্জন্য ঘৃণা করেন। গৃহে বসিয়া বিলাতের 'ড্রুরি লেন' থিয়েটারও দেখিয়াছেন, সার হেন্‌রি আরভিংকে তথায় আনাইয়া, তাঁহার অভিনয়ও শুনিয়াছেন, সুতরাং কথায়-কথায় বিলাতের নাট্যমন্দিরের সহিত আমাদের নাট্যমন্দিরের তুলনা করিয়া ঘৃণা প্রকাশ করেন। আমাদের দৃশ্য-পট সেরূপ নয়, আমাদের সাজ-সরঞ্জাম সেরূপ নয়, অভিনয় সেরূপ নয়, এই নিমিত্ত নাসিকা উত্তোলন করিয়া থাকেন। কিন্তু দেখা যায় যে ঐরূপ নাসিকা উত্তোলকের বাক্যচ্ছটা ব্যতীত—ফরাসী, ইংলণ্ড বা আমেরিকার কিছুই নাই। তাঁহার প্রাসাদ তুলনায় কুটীরও নয়, তাঁহার পরিচ্ছদ প্রতিদিন তুলনা করিয়াই দেখিতে পারেন, পরিচ্ছন্ন অবস্থায় থাকিলে থাকিতে পারিতেন, তাহারও চেষ্টা দেখা যায় না। পুত্র-কন্যাকে যেরূপ যত্নে ঐ সকল প্রদেশে

শিক্ষাপ্রদান করা হয়, তাহারও ত কোনও আভাষ পাওয়া যায় না। এই সকল ব্যক্তিরা যদি কেবল নাসিকা উত্তোলন করিয়া ক্ষান্ত থাকিতেন, তাহা হইলে আমাদের বক্তব্য কিছু ছিল না। কপির লাঙ্গুলের ন্যায় তাঁহার নাসিকা তিনি যতদূর উত্তোলন করিতে পারেন করুন, তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই। কিন্তু তাঁহাদের বিষ উদ্গীরণ বহু অনিষ্টসাধক। আমরা অপক্ষপাতী সমালোচকের পদধূলি গ্রহণ করি। কিন্তু ওরূপ সমালোচকের অনিষ্টকর কার্য্যে বড়ই দুঃখিত। তাঁহাদের কলুষ-বাক্যে অপরের মন কলুষিত করিতে পারেন, সেই নিমিত্ত এই মাসিক 'নাট্যমন্দির' সাধারণকে উপহার দিবার জন্য আমরা যত্ন করিতেছি। নাট্যমন্দিরের স্বরূপ অবস্থা, কুটীর হইতে অট্টালিকা পর্য্যন্ত জ্ঞাপন করিতে আমরা উৎসুক। 'নাট্যমন্দিরে'র অঙ্কে সাধারণ রঙ্গালয়ের অবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণিত থাকিবে। সকল সম্প্রদায়ের মুখপাত্র-স্বরূপ সংবাদপত্র আছে, কিন্তু রঙ্গালয়ের কিছুই নাই। টিকিট না পাইয়া বিরক্ত হইয়া যাহা লেখেন, তাহা শুনিতে হয়। কিন্তু অনেকদিন শুনিয়া আসিতেছি, আর শুনিতে ইচ্ছুক নহি। আমরা আপনারদের আপনি সমালোচক 'নাট্যমন্দির' প্রকাশিত করিব। কতদূর কৃতকার্য্য হইতে পারিব, তাহা সাধারণের উৎসাহের উপর নির্ভর করে। আমরা দ্বারে-দ্বারে সেই উৎসাহের প্রার্থী।"

আমরা যতদূর জানিতে পারিয়াছি, গিরিশচন্দ্রের রচিত কতকগুলি কবিতা এবং "হাবা" নামক একটী গল্প প্রথমে 'নলিনী' নামক মাসিকপত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পরে 'কুসুমমালা'য় তাঁহার 'চন্দ্রা'* নামক উপন্যাস এবং গল্পপ্রবন্ধ বাহির হইতে থাকে। তাহার পর 'জন্মভূমি', 'উদ্বোধন,' 'রঙ্গালয়', 'নাট্যমন্দির', 'সাহিত্য' প্রভৃতি বহু পত্রিকায় তাঁহার কবিতা, উপন্যাস, গল্প ও নানাজাতীয় প্রবন্ধ বাহির হয়। 'প্রতিধ্বনি' নামক গ্রন্থে গিরিশচন্দ্র-বিরচিত যাবতীয় কবিতা সংগৃহীত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। 'চন্দ্রা' উপন্যাসখানিও স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার গল্প ও প্রবন্ধগুলি একত্র করিয়া এ পর্য্যন্ত পুস্তকাকারে বাহির হয় নাই,—গিরিশ গ্রন্থাবলীতে বিশৃঙ্খলভাবে কতকগুলি প্রকাশিত হইয়াছে মাত্র। আমরা কবিতাগুলি বাদ দিয়া যে সকল পত্রে তাঁহার অন্যান্য উপন্যাস, গল্প ও প্রবন্ধ প্রথম প্রকাশিত হয়, তাহার একটী তালিকা নিম্নে প্রকাশিত করিলাম।—

* এই 'চন্দ্রা' উপন্যাসে পাগলিনীর চরিত্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গিরিশচন্দ্র এই চরিত্রে যে মানসিক শক্তির ক্রমবিকাশ অসামান্য কৃতিত্বের সহিত বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা বাঙ্গালা উপন্যাস-সাহিত্যে বিরল। এই রমণী গঙ্গায় সন্তান বিসর্জ্জন দিয়া পাগল হইয়াছিল। পাগলিনী সন্তানকে পালন করিতে পারিল না বটে, কিন্তু তাহার কল্পনায় শিশু দিন-দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, অবিকল তাহার স্বাভাবিক আকৃতির অনুরূপ। এই কল্পপুত্র যখন যৌবনে পদার্পণ করিয়াছে, পাগলিনী তাহার চিত্র দেখিয়াই তৎক্ষণাৎ আপনার পুত্র বলিয়া চিনিতে পারিল।

উপন্যাস

১। "আলোয়ার-দুহিতা" — 'সৌরভ' মাসিকপত্রে কিয়দংশ, পরে 'উদ্বোধনে' প্রথম হইতে প্রকাশিত হয় ('উদ্বোধন', ১ম বর্ষ, ১৩০৫-০৬ সাল)
২। "লীলা" — ('নাট্যমন্দির', ১ম বর্ষ, ১৩১৭-১৮)

গল্প

১। "হাবা" — ('নলিনী', ৮ম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১২৮৭ সাল)
২। "নবধর্ম্ম বা নক্সা" (১) — ('কুসুমমালা', ১২৯১)
৩। "ন'সে বা নক্সা" (২) — (ঐ)
৪। "বাচের বাজী" — ('জন্মভূমি', ১ম খণ্ড, জ্যৈষ্ঠ ১২৯৮)
৫। "বাঙ্গাল" — ('উদ্বোধন', ১ম বর্ষ, ১৫ই জ্যৈষ্ঠ ১৩০৬)
৬। "গোবরা" — (ঐ, ১লা আষাঢ়, ঐ)
৭। "বড় বউ" — (ঐ, ১৫ই কার্ত্তিক, ঐ)
৮। "ভূতির বিয়ে সেয়ান ঠক্‌লে বাপকে বলে না" — ('রঙ্গালয়', ১ম বর্ষ, ১৭ই ফাল্গুন ১৩০৭)
৯। "সই" — ('নন্দন কানন', ১ম বর্ষ, ১ম খণ্ড)
১০। "কর্জ্জনার মাঠে" — ('প্রয়াস', ৩য় বর্ষ, ১৩০৮)
১১। "পূজার তত্ত্ব" — ('বসুমতী', আশ্বিন, পূজার সংখ্যা, ১৩১১)
১২। "প্রায়শ্চিত্ত" — ('উদ্বোধন', ১০ম বর্ষ, আষাঢ় ১৩১৫)
১৩। "টাকের ঔষধ বা 'ধর্ম্মদাস'" — ('জন্মভূমি', ১৭শ বর্ষ, বৈশাখ ১৩১৬)
১৪। "পিতৃ-প্রায়শ্চিত্ত" — ('উদ্বোধন', ১১শ বর্ষ, অগ্রহায়ণ ১৩১৬)
১৫। "সাধের বউ" — ('নাট্যমন্দির', ২য় বর্ষ, ভাদ্র ১৩১৮)

ধর্ম্ম-প্রবন্ধ

১। "ঈশ-জ্ঞান" — ('কসুমমালা', ১২৯১ সাল)
২। "সাধন-গুরু" — ('সৌরভ', ভাদ্র ১৩০২)
৩। "কর্ম্ম" — ('উদ্বোধন', ১ম বর্ষ, মাঘ ও ফাল্গুন ১৩০৫)
৪। "তাও বটে — তাও বটে !" — ('তত্ত্বমঞ্জরী', ৫ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৩০৮)
৫। "ধর্ম্ম সংস্থাপক ও ধর্ম্মযাজক" — ('রঙ্গালয়', ১৩ই বৈশাখ ১৩০৮)
৬। "ধর্ম্ম" — ('উদ্বোধন', ৪র্থ বর্ষ, ১৫ই মাঘ ১৩০৮)

৭। "গুরুর প্রয়োজন" – ('উদ্বোধন', ৪র্থ বর্ষ, ১৬ই ভাদ্র ১৩০৯)
৮। "প্রলাপ না সত্য ?" – (ঐ, ৫ম বর্ষ, ১লা অগ্রহায়ণ ১৩১০)
৯। "নিশ্চেষ্ট অবস্থা" – (ঐ, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১লা মাঘ ১২১০)
১০। "শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ" – (ঐ, ৭ম বর্ষ, ১৫ই মাঘ ১৩১১)
১১। "রামদাদা" – ('তত্ত্বমঞ্জরী', ৯ম সংখ্যা, ১৩১১)
১২। "স্বামী বিবেকানন্দ বা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহিত স্বামী বিবেকানন্দের সম্বন্ধ" – ('তত্ত্বমঞ্জরী', ৮ম বর্ষ, ফাল্গুন ১৩১১)
১৩। "পরমহংসদেবের শিষ্য-স্নেহ" – ('উদ্বোধন', ৭ম বর্ষ, ১লা বৈশাখ ১৩১২)
১৪ "বিবেকানন্দ ও বঙ্গীয় যুবকগণ" – (ঐ, ৯ম বর্ষ, ১লা মাঘ ১৩১৩)
১৫ "ধ্রুবতারা" – (ঐ, ১০ম বর্ষ, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৫)
১৬ "শান্তি" – (ঐ, ১০ম বর্ষ, শ্রাবণ ১৩১৫)
১৭ "গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্ম" – (ঐ, ১১শ বর্ষ, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৬)
১৮ "ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব" – ('জন্মভূমি', ১৭শ বর্ষ, আষাঢ় ১৩১৬)
১৯ "স্বামী বিবেকানন্দের সাধন-ফল" – ('উদ্বোধন', ১৩শ বর্ষ, বৈশাখ ১৩১৮)

নাট্য-প্রবন্ধ

১ "পুরুষ অংশে নারী অভিনেত্রী" – ('রঙ্গালয়', ২রা চৈত্র ১৩০৭ সাল)
২ "অভিনেত্রী সমালোচনা" – ('রঙ্গালয়', ৯ই চৈত্র ১৩০৮)
৩ "বর্ত্তমান রঙ্গভূমি" – (ঐ, ২৬শে পৌষ ১৩০৮)
৪ "পৌরাণিক নাটক" – (ঐ, ১ম বর্ষ, ১৩০৮)
৫ "অভিনয় ও অভিনেতা" – ('অর্চ্চনা', ৬ষ্ঠ বর্ষ, আষাঢ়, শ্রাবণ ও ভাদ্র ১৩১৫। পরিবর্দ্ধিত অংশ 'নাট্যমন্দির', ১ম বর্ষ, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮)
৬ "রঙ্গালয়ে নেপেন" – (বঙ্গ-নাট্যশালায় নৃত্যশিক্ষা ও তাহার ক্রমবিকাশ। ৯ই এপ্রিল ১৯০৯ খ্রী, ১৩১৬ সাল, 'মিনার্ভা থিয়েটার' হইতে স্বতন্ত্র পুস্তিকা প্রকাশিত)
৭ "নাট্যমন্দির" – ('নাট্যমন্দির', ১ম বর্ষ, শ্রাবণ ১৩১৭)
৮ "নাট্যকার" – (ঐ)
৯ "নটের আবেদন" – (ঐ, ভাদ্র ঐ)
১০ "কেমন করিয়া বড় অভিনেত্রী হইতে হয় ?" – (ঐ)
১১ "রঙ্গালয়" – (ঐ, আশ্বিন ঐ)
১২ "বহুরূপী বিদ্যা" – (ঐ, পৌষ ঐ)
১৩ "কাব্য ও দৃশ্য" – (ঐ)
১৪ "নৃত্যকলা" – (ঐ, ২য় বর্ষ, মাঘ ১৩১৮)

১৫। "স্বর্গীয় অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী" (নটের জীবন ও নাট্যলীলা) — ১৩১৫ সাল, ১০ই আশ্বিন, 'মিনার্ভা থিয়েটার' হইতে শ্রীযুক্ত মনোমোহন পাঁড়ে কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

শোক-প্রবন্ধ

১। "স্বর্গীয় মহেন্দ্রলাল বসু" — ('রঙ্গালয়', ২রা চৈত্র ১৩০৭ সাল)
২। "স্বর্গীয় বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়" — (ঐ, ১৬ই বৈশাখ ১৩০৮)
৩। "স্বর্গীয় অঘোরনাথ পাঠক" — (ঐ, ৩০শে জ্যৈষ্ঠ ১৩১১)
৪। "স্বর্গীয় লক্ষ্মীনারায়ণ দত্ত" — ('উদ্বোধন', ৭ম বর্ষ, ১লা শ্রাবণ ১৩১২)
৫। "কবিবর স্বর্গীয় নবীনচন্দ্র সেন" — ('সাহিত্য', মাঘ ১৩১৫)
৬। "নবীনচন্দ্র" — ('সাহিত্য', ফাল্গুন ১৩১৫)
৭। "নাট্যশিল্পী ধর্ম্মদাস" — ('নাট্যমন্দির' ১ম বর্ষ, ভাদ্র ১৩১৭)
৮। "স্বর্গীয় অমৃতলাল মিত্র" — ('নাচঘর', ১ম বর্ষ, ১৩৩১)

সামাজিক প্রবন্ধ

১। "সমাজ সংস্কার" — ('জন্মভূমি', ১৮শ বর্ষ, আশ্বিন ১৩১৭ সাল)
২। "স্ত্রী-শিক্ষা" — ('নাট্যমন্দির', ২য় বর্ষ, শ্রাবণ ১৩১৮)

বিজ্ঞান প্রবন্ধ

১। "বিজ্ঞান ও কল্পনা" — ('কুসুমমালা', ১২৯১ সাল)
২। "গ্রহফল" — (ঐ)

বিবিধ প্রবন্ধ

১। "ভারতবর্ষের পথ" — ('কুসুমমালা', ১২৯১ সাল)
২। "দীননাথ" — (ঐ)
৩। "ফুলের হার" — (ঐ)
৪। "পাখি, গাও" — (ঐ)
৫। "গরুড়" — (ঐ)
৬। "ইংরাজ রাজত্বে বাঙ্গালী" — ('রঙ্গালয়', ১৭ই ফাল্গুন ১৩০৭)
৭। "পলিসি" — ('রঙ্গালয়', ১৬ই চৈত্র ১৩০৭)
৮। "রাজনৈতিক আলোচনা" ('রঙ্গালয়', ৩রা জ্যৈষ্ঠ ১৩০৮)
৯। "রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী" — ('বসুমতী', ৪ঠা ভাদ্র ১৩১১)
১০। "বিশ্বাস" — ('জন্মভূমি', ১৬শ বর্ষ, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৫)
১১। "কবিবর রজনীকান্ত সেন" — ('নাট্যমন্দির', ১ম বর্ষ, আশ্বিন ১৩১৭)
১২। "সম্পাদক" — ('রঙ্গালয়', ২৭শে বৈশাখ ১৩০৮ সাল হইতে 'নাট্যমন্দিরে' পুনর্মুদ্রিত। ১ম বর্ষ, ১৩১৭ সাল)

চতুশ্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয়বার হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা

'ক্লাসিক থিয়েটারে' কার্য্যকালীন একদিন শীতকালের রাত্রে থিয়েটার হইতে বাটী ফিরিয়া আসিবার সময় গিরিশচন্দ্র শুনিতে পাইলেন, বাটীর সম্মুখস্থ মাঠে একজন হিন্দুস্থানী গাড়োয়ান অস্ফুট চীৎকার করিতেছে। বাটীতে আসিয়া ভৃত্য পাঠাইয়া জ্ঞাত হইলেন, গাড়োয়ানের ভারি জ্বর হইয়াছে, শীতবস্ত্র নাই, গরুর গাড়ীর নীচে শুইয়া শীত নিবারণের বৃথা চেষ্টা করিতেছে। তখন রাত্রি প্রায় আড়াইটা, অন্য উপায় না থাকায় তিনি আহারান্তে শয়ন করিলেন। কিন্তু কিছুতেই তাঁহার নিদ্রা হইল না— কেবলই মনে হইতে লাগিল, আমি তো দিব্য গরম বিছানায় লেপ গায়ে দিয়া শুইয়া আছি, আর এ ব্যক্তি জ্বরে-শীতে খোলা জায়গায় আর্ত্তনাদ করিতেছে। প্রভাত হইবামাত্র তিনি একখানি কম্বল ও ঔষধ কিনিয়া আনাইয়া রোগীকে দিয়া তবে সুস্থ হইলেন।

ইহার অল্পদিন পরেই গিরিশচন্দ্রের প্রতিবাসী একজন পরামাণিকের কলেরা হয়। তিনি তাহাকে দেখিতে যাইলে পরামাণিক "বাবু ওষুদ, বাবু ওষুদ" বলিয়া কাতরোক্তি করিতে থাকে। গিরিশচন্দ্র ঔষধের ব্যবস্থা করিলেও যথাসময়ে ঔষধ না পড়ায় রোগী একপ্রকার বিনা চিকিৎসায় মারা যায়।

গিরিশচন্দ্র পূর্ব্বে অফিসে কার্য্যকালীন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করিতেন এবং নানা কারণে তাহা ছাড়িয়া দেন—এতদ্-সম্বন্ধে সপ্তদশ পরিচ্ছেদে বিস্তৃতভাবে লিখিত হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত ঘটনার পর পুনরায় তিনি বহুসংখ্যক গ্রন্থ ও ঔষধ ক্রয় করিয়া চিকিৎসা আরম্ভ করেন এবং জীবনের শেষ পর্য্যন্ত দীন-দরিদ্রের সেবায় ব্রতী হইয়াছিলেন। একদিন শ্রদ্ধাস্পদ দেবেন্দ্রবাবু গিরিশচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করেন, "আপনি আবার চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন কেন?" উত্তরে গিরিশচন্দ্র বলেন, "থিয়েটারের কার্য্যে এখন আর আমায় পূর্ব্বের ন্যায় খাটিতে হয় না, হাতে অনেক সময়। নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া থাকিলে হয় আত্মচর্চ্চায়, নয় পরচর্চ্চায় সময় কাটাইতে হয়। এ কার্য্যে ব্রতী হইয়া সে সকল হইতেও অব্যাহতি পাওয়া যায় এবং দীন-দরিদ্রের উপকারও হয়।"

এইসময়ে তিনি 'ভ্রান্তি' নাটক লিখিতেছিলেন। রঙ্গলাল চরিত্রের নানা গুণের মধ্যে তাহার চিকিৎসাবিদ্যায় পারদর্শিতা গিরিশচন্দ্রের তাৎকালীক চিকিৎসানুরাগের ছায়াপাত বলিয়া আমাদের মনে হয়। রঙ্গলালের মুখ দিয়া তিনি একস্থানে বলিয়াছেন,

"সংসার যে সাগর বলে, এ কথা ঠিক, কূল-কিনারা নাই। তাতে একটী ধ্রুবতারা আছে—দয়া। দয়া যে পথ দেখায়, সে পথে গেলে নবাবও হয় না, বাদশাও হয় না,—তবে মনটা কিছু ঠাণ্ডা থাকে। এটী প্রত্যক্ষ, তর্ক-যুক্তির দরকার নাই।"

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় যিনি যে রোগীর অবস্থা আনুপূর্ব্বিক বুঝিয়া সূক্ষ্ম বিচারে যেভাবে ঔষধ নির্ব্বাচন করিতে পারেন, তিনিই সেই পরিমাণে সুফল প্রাপ্ত হন। এই সূক্ষ্ম বিচারে গিরিশচন্দ্র অসামান্য শক্তির পরিচয় দিয়া শত-শত কঠিন রোগ আরোগ্য করিয়াছেন। আমরা দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটী ঘটনার উল্লেখ করিতেছি:—

১। বসুপাড়া পল্লীস্থ সুবিখ্যাত ব্যারিষ্টার ইভান্স সাহেবের 'বাবু' এবং গিরিশচন্দ্রের বাল্যবন্ধু স্বর্গীয় নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র বসুর স্ত্রী বহুদিন ধরিয়া স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য ও হৃদ্‌রোগে কষ্ট পাইতেছিলেন। কলিকাতার তাৎকালীন বড়-বড় ডাক্তারগণের চিকিৎসায় কোন ফললাভ হয় নাই। অবশেষে ক্ষীরোদবাবুর অনুরোধে গিরিশচন্দ্র গিয়া রোগিণীকে দেখেন এবং প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া উপসর্গগুলি শুনিতে-শুনিতে যখন জ্ঞাত হইলেন 'রোগিণী ঘুমাইবার সময় কালো-কালো কুকুর-বাচ্ছা স্বপ্ন দেখে'—তখন তিনি আনন্দ এবং উৎসাহের সহিত বলিয়া উঠিলেন, "ক্ষীরোদ, তুই ভাবিস্ নে, তোর স্ত্রীকে আমি আরাম করবো।" বাটীতে আসিয়া বই খুলিয়া উক্ত লক্ষণের সহিত মিলাইয়া তিনি যে ঔষধ নির্ব্বাচন করেন, তাহা সেবন করিয়া রোগিণী অল্পদিনেই আরোগ্যলাভ করেন।

২। বাগবাজারের লব্ধপ্রতিষ্ঠ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মিত্র বলেন, "বসুপাড়া পল্লীস্থ অবিনাশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের স্ত্রীর একটী সন্তান প্রসবের পর রক্তস্রাব হইতে থাকে—সঙ্গে-সঙ্গে উন্মাদের লক্ষণ দেখা দেয়। এলোপ্যাথিক চিকিৎসায় কোনও ফল না হওয়ায় অবিনাশবাবু গিরিশবাবুর নিকট আসেন। আমি সে সময় গিরিশবাবুর বাটীতে উপস্থিত থাকায়, তিনি আমাকে ঔষধ নির্ব্বাচন করিতে বলিলেন। আমি তিনটী ঔষধ নির্ব্বাচিত করিলাম। তাহাতে তিনি বলিলেন, 'ইহা তো রক্তস্রাব নিবারণের ঔষধ ব্যবস্থা করিলে, রোগীর মানসিক লক্ষণের কি করিলে?' এই বলিয়া তিনি নিজে একটী ঔষধ নির্ব্বাচিত করিলেন। আমি বলিলাম, 'মহাশয়, ইহাতে রক্তস্রাব তো আরও বৃদ্ধি হইবে।' তদুত্তরে তিনি বলিলেন, 'তাহা হউক, রোগীর উপস্থিত মানসিক লক্ষণ অর্থাৎ এই উন্মাদের অবস্থা ধরিয়াই ঔষধ নির্ব্বাচন করিতে হইবে।' তখন আমার হ্যানিমানের অমূল্য উপদেশের কথা স্মরণ হইল, 'চিকিৎসাকালীন রোগীর মানসিক লক্ষণের প্রতি সর্ব্বোপরি লক্ষ্য রাখিতে হইবে।' আশ্চর্য্যের বিষয়, সেই ঔষধেই রোগীর সমস্ত উপসর্গ দূর হইল।"

৩। রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীটস্থ সুপ্রসিদ্ধ 'বামার লরি' অফিসের বড়বাবু শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে গিরিশচন্দ্র বিশেষ স্নেহ করিতেন। রামবাবুর প্রথম শিশুপুত্র শ্রীমান নরেন্দ্রনাথের কঠিন পীড়া হওয়ায় তিনি বড়ই ব্যাকুল হইয়া পড়েন। গিরিশচন্দ্র শিশুকে দেখিয়া এবং রোগের সমস্ত লক্ষণ মিলাইয়া একটী ঔষধ নির্ব্বাচিত করিয়া বলেন, 'দেখ, তোমার পুত্রের পীড়ায় তুমি যেরূপ অস্থির হইয়া উঠিয়াছ, আমিও তোমার পুত্র

বলিয়া সেইরূপ চঞ্চল হইয়াছি। এরূপ অবস্থায় আমি যে ঔষধ নির্ব্বাচিত করিলাম, তাহা এই কাগজে লিখিয়া রাখিয়া যাইতেছি। তুমি কোনও সুচিকিৎসককে আনিয়া দেখাও। তিনি যে ঔষধ দিবেন, সেই ঔষধের সহিত যদি আমার ঔষধ এক হয়, তাহাহইলে তৎক্ষণাৎ খাইতে দিবে। ইহাতেই শিশু আরোগ্য হইয়া যাইবে।' রামবাবু বলিলেন, 'কোন সুচিকিৎসককে আপনি দেখাইতে বলেন?' গিরিশচন্দ্র উত্তরে বলেন, 'হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা-শাস্ত্রে একটী রোগের একশতপ্রকার ঔষধ আছে। রোগীর অবস্থা এবং রোগের লক্ষণ ও উপসর্গাদি আনুপূর্ব্বিক অবগত হইয়া সূক্ষ্ম বিচার করিয়া যিনি ঔষধ নির্ব্বাচিত করেন, তাঁহাকেই আমি সুচিকিৎসক বলি। নচেৎ ডাক্তার আসিল—দু'একটা কথা জিজ্ঞাসা করিল—পাঁচ মিনিটের মধ্যেই একটা ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া চলিয়া গেল—সে চিকিৎসকগণের উপর আমার শ্রদ্ধা নাই। হ্যারিসন রোডের ডাক্তার অক্ষয় দত্তকে তুমি ডাকাও। তিনি রোগীর সমস্ত অবস্থা অবগত না হইয়া ঔষধ দেন না—এ নিমিত্ত অক্ষয়বাবুর উপর আমার বিশেষ শ্রদ্ধা আছে।'

রামবাবু তাহাই করিলেন। অক্ষয়বাবু আসিয়া রোগীর আনুপূর্ব্বিক অবস্থা অবগত হইয়া যে ঔষধ লিখিয়া দিয়া যাইলেন, রামবাবু তাহা পড়িয়া বিস্মিত হইলেন—গিরিশচন্দ্রও সেই ঔষধ লিখিয়া দিয়া গিয়াছেন। যাহাই হউক এই ঔষধ সেবনে শিশু আরোগ্যলাভ করে।

৪। কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল অফিসের রাসায়নিক পরীক্ষক ডাক্তার শ্রীযুক্ত শশীভূষণ ঘোষ, এম. বি., মহাশয়ের ভগ্নী বহুদিন ধরিয়া নানা রোগে অস্থিচর্ম্মসার হইয়াছিলেন। শশীবাবুর মেডিক্যাল কলেজের সহপাঠী বন্ধু ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসকগণ নানারূপ চিকিৎসা করিয়া অবশেষে তাঁহার জীবনের আশা পরিত্যাগ করেন। ডাক্তারেরা তরল খাদ্য খাইতে দিতেন, শেষে এমনটা হইল যে সাগু-বার্লি পর্য্যন্ত রোগিণী আর হজম করিতে পারিতেন না। শশীবাবুর অনুরোধে গিরিশচন্দ্র আসিয়া রোগিণীকে দেখেন, এবং নানারূপ প্রশ্ন করিয়া অবশেষে বলেন, 'তোমার কি খাইতে ইচ্ছা হয়?' রোগিণী বলিলেন, 'শসা খাবার ইচ্ছা হয়।' গিরিশচন্দ্র, যে রোগী সাগু হজম করিতে পারে না, তাহাকে শসা খাইতে বলিলেন; এবং এই লক্ষণ মিলাইয়া ঔষধদানে তাঁহাকে আরোগ্য করেন।

৫। কলিকাতা পোর্ট কমিশনারের ইন্সপেক্টর এবং গিরিশচন্দ্রের প্রতিবাসী শ্রীযুক্ত শৈলেশ্বর বসু মহাশয়ের পুত্র বহুদিন ধরিয়া আমাশয় পীড়ায় ভুগিতেছিল, রোগ সারিয়াও সারে না। গিরিশচন্দ্র পূর্ব্বোক্তরূপ 'বালক আদা খাইবার জন্য বায়না করে'—জ্ঞাত হইয়া যে ঔষধ নির্ব্বাচন করেন, তাহাতেই পীড়ার উপশম হয়।

৬। পুস্তকের কলেবর-বৃদ্ধিভয়ে, আমরা আর-একটী ঘটনার উল্লেখ করিয়া বর্ত্তমান পরিচ্ছেদ সমাপ্ত করিব। গিরিশচন্দ্রের পল্লীস্থ জনৈক বিশিষ্ট বন্ধু হাইকোর্টের তাৎকালীন অ্যাডভোকেট জেনারল কেনৃরিক সাহেবের 'বাবু' স্বর্গীয় জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের জনৈক আত্মীয়ের কঠিন পীড়া হয়। কোনও সুপ্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক তাঁহার চিকিৎসা করিতেছিলেন। গিরিশচন্দ্র প্রত্যহ জ্ঞানবাবুর নিকট

রোগীর কিরূপ অবস্থা এবং ডাক্তার কি ঔষধ দিয়া যাইলেন—সংবাদ লইতেন। সেদিন সন্ধ্যার পর থিয়েটারে বাহির হইতেছেন—এমনসময়ে সংবাদ পাইলেন, ডাক্তার আসিয়া 'সালফার' দিয়া গেলেন। ঔষধটী যেন তাঁহার মনঃপূত হইল না, কিন্তু সেদিন থিয়েটারে তাঁহাকে অভিনয় করিতে হইবে, অগত্যা বাধ্য হইয়া তিনি আর অপেক্ষা করিতে পারিলেন না। কিন্তু থিয়েটার হইতে আসিয়াই তিনি ডাক্তারি বই খুলিয়া বসিলেন। রোগীর যেরূপ অবস্থা—তাহাতে কি ঔষধ নির্ব্বাচন করা যাইতে পারে—তাহা নির্ণয়ের নিমিত্ত তিনি বহু গ্রন্থ দেখিতে-দেখিতে, ডাক্তার ফ্যারিংটনের গ্রন্থে একস্থলে পাঠ করিলেন, "রোগীর এইসব লক্ষণ দেখিয়া অনেক চিকিৎসক ভ্রমে পড়িয়া 'সালফার' ব্যবস্থা করেন। কিন্তু এইরূপ অবস্থায় 'সালফার'—পাহাড় হইতে যে নামিয়া যাইতেছে, তাহাকে ধাক্কা দিলে (pushing a man who is going down hills) তাহার অবস্থা যেরূপ হয়, রোগীর পরিণামও তদনুরূপ হইয়া থাকে। গিরিশচন্দ্র সমস্ত রাত্রি উৎকণ্ঠায় অতিবাহিত করিয়া প্রভাত হইতে-না-হইতে খবর লইয়া জানিলেন যে রাত্রি-শেষে রোগীর মৃত্যু হইয়াছে।

ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, অক্ষয়কুমার দত্ত, চন্দ্রশেখর কালী প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসকগণ বসুপাড়া পল্লীতে চিকিৎসার্থে আসিলেই প্রথমে খোঁজ লইতেন, গিরিশ-বাবু রোগীকে দেখিয়াছেন কি না? গিরিশচন্দ্রের সতর্ক চিকিৎসার উপর তাঁহাদের বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল।

ঔষধের নিমিত্ত প্রাতে ও বৈকালে ভদ্রগৃহস্থ হইতে বহু দীন-দরিদ্রের আগমনে গিরিশচন্দ্রের বাড়ী একটী ডাক্তারখানা বলিয়া বোধ হইত। কেবল বিনামূল্যে ঔষধ-দান নহে, যে সকল গরীবের সুপথ্যের অভাবে রোগ সারিয়াও সারিতেছে না, অনেক-সময়ে তিনি নিজ খরচে তাহাদের পথ্যের উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া দিতেন।

ডাক্তার কাঞ্জিলাল

মেডিক্যাল কলেজের কৃতী ছাত্র এবং সুপ্রসিদ্ধ অস্ত্র-চিকিৎসক ডাক্তার জে. এন. কাঞ্জিলাল গিরিশচন্দ্রের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। কিন্তু হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় তাঁহার আদৌ বিশ্বাস ছিল না। তিনি গিরিশচন্দ্রকে বলিতেন, 'প্যাথলজি না জানিলে কখনও চিকিৎসা-বিদ্যায় পারদর্শী হওয়া যায় না।'* একদিন রাত্রে তিনি গিরিশচন্দ্রের বাটীতে আসিয়া ঘন-ঘন কাসিতে লাগিলেন। গিরিশচন্দ্র বলিলেন, 'অত কাসিতেছ, একটা আমাদের ওষুদ খাও।' কাঞ্জিলালবাবু বলিলেন, 'খাইতে পারি, কিন্তু যদি সারিয়া

* কাঞ্জিলাল ডাক্তারের এই কথাটী তিনি তাঁহার 'ব্যাল্লিক-কা-ত্যারসা' প্রহসনে ডাঃ নন্দীর মুখে বলাইয়া দিয়েছেন। যথা: "বদ্যি, হাকিম, হোমিওপ্যাথ—ওরা রোগের কি জানে, প্যাথলজি পড়েছে?" (সপ্তম দৃশ্য)

যায়, হোমিওপ্যাথিক ঔষধ খাইয়া সারিয়া গেল, তাহা বলিতে পারিব না। এমনই সারিয়া যাইতে পারে।' গিরিশচন্দ্র হাসিতে-হাসিতে বলিলেন, 'আচ্ছা তাই, ঔষধের গুণ তোমাকে স্বীকার করিতে হইবে না।' কাঞ্জিলালবাবু ঔষধ খাইয়া অল্পক্ষণ পরে বাটী চলিয়া গেলেন। তৎ-পরদিন আসিলে গিরিশচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেমন ছিলে?' কাঞ্জিলালবাবু বলিলেন, 'রাত্রে আর কাসি হয় নাই বটে, কিন্তু আপনার ঔষধের গুণে নয়, ঔষধ না খাইলেও আর কাসি হইত না।' গিরিশচন্দ্রকে কঠিন-কঠিন রোগ আরোগ্য করিতে দেখিয়াও কাঞ্জিলালবাবু গোঁড়ামি ছাড়িতে পারেন নাই। কিন্তু গিরিশচন্দ্র অনেকসময়ে উৎকট রোগ সম্বন্ধে তাঁহার সহিত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার আলোচনা করিতেন।

এইরূপে গিরিশচন্দ্র কাঞ্জিলালবাবুর হৃদয়ে যে বীজ বপন করিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার মৃত্যুর কয়েক বৎসর পরে সেই বীজ অঙ্কুরিত হইয়া ক্রমে বৃক্ষাকারে পরিণত হয়। কাঞ্জিলাল ডাক্তার এলোপ্যাথি ত্যাগ করিয়া (বলা বাহুল্য, তিনি অস্ত্র-চিকিৎসায় প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিতেন) একেবারে গোঁড়া হোমিওপ্যাথ হইয়া উঠেন। ডাক্তার কাঞ্জিলাল প্রায়ই আক্ষেপ করিতেন, 'গিরিশবাবুর জীবদ্দশায় হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা আরম্ভ করিলে তাঁহার নিকট কতই না শিখিতে পারিতাম, আর তাঁহারও কত আনন্দ হইত!' বড়ই পরিতাপের বিষয়, কাঞ্জিলাল হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াই অকালে ইহলোক ত্যাগ করেন।

গিরিশচন্দ্র হাঁপানি পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া জীবনের শেষাবস্থায় যে দুই বৎসর কাশীতে গিয়া অবস্থান করিয়াছিলেন, কাশী রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের কঠিন-কঠিন রোগীর চিকিৎসা তিনিই করিতেন। এলাহাবাদ, জৌনপুর হইতে শিক্ষিত ব্যক্তিগণ তাঁহার নিকট চিকিৎসার্থে আসিতেন। যথাসময়ে আমরা তাহার উল্লেখ করিব।

পঞ্চচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

উপহারপ্রদানে 'ক্লাসিকে'র অবনতি এবং গিরিশচন্দ্রের 'মিনার্ভা'য় প্রত্যাবর্ত্তন

অমরবাবু এ পর্য্যন্ত বিশেষ প্রতিপত্তির সহিত 'ক্লাসিক থিয়েটার' চালাইয়া আসিতেছিলেন; কিন্তু ১৩১০ সাল হইতে 'মিনার্ভা থিয়েটার' ভাড়া লইয়া 'ক্লাসিক' ও 'মিনার্ভা' উভয় থিয়েটারই পরিচালনা করিতে যাওয়া তাঁহার অবনতির কারণ হইল।

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সরকার 'মিনার্ভা থিয়েটার' ছাড়িয়া দিবার পর উক্ত থিয়েটারের তাৎকালীন স্বত্বাধিকারী—খুলনার উকীল স্বর্গীয় বেণীভূষণ রায় এবং জমীদার প্রিয়নাথ দাস—উভয়ের নিকট হইতে অমরবাবু তিন বৎসরের জন্য 'মিনার্ভা'র লিজ গ্রহণ করেন। সর্ত্ত ছিল—অমরবাবু বাটী সুসংস্কৃত করিবেন এবং দশ হাজার টাকা ডিপজিট রাখিবেন; কিন্তু কার্য্যতঃ উপস্থিত তিনি কয়েক সহস্র মাত্র টাকা দিয়া থিয়েটারের দখল গ্রহণ করেন।

১৩১০ সাল, ২১শে কার্ত্তিক—'মিনার্ভা থিয়েটার' সুসংস্কৃত করিয়া পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদের 'রঘুবীর' নামক নূতন নাটক লইয়া অমরবাবু 'মিনার্ভা'র উদ্বোধন করেন। রঘুবীরের ভূমিকাভিনয়ে তাঁহার বিশেষ সুনাম হইয়াছিল, কিন্তু থিয়েটারে সেরূপ অর্থসমাগম হইল না। এইরূপে এক বৎসর 'মিনার্ভা থিয়েটার' চালাইয়া তিনি ক্ষতিগ্রস্তই হইলেন। 'ক্লাসিক থিয়েটার' হইতে অমরবাবু যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিলেও কিছুই সঞ্চয় করিতে পারেন নাই। বাল্যকাল হইতেই মিতব্যয়িতা শিক্ষা তাঁহার হয় নাই—'যত্র আয় তত্রব্যয়'—শেষে তিনি ঋণ-জালে জড়িত হইয়া পড়িলেন। লব্ধপ্রতিষ্ঠ কণ্ট্রাক্টার (বর্ত্তমান 'মনোমোহন থিয়েটারে'র স্বত্বাধিকারী) শ্রীযুক্ত মনোমোহন পাঁড়ে মহাশয়ের নিকট হইতে অমরবাবু প্রায়ই ঋণ গ্রহণ করিতেন। প্রথম-প্রথম তিনি টাকা শোধ করিয়া দিতেন, কিন্তু ক্রমশঃ টাকা বাকী পড়ায় ঋণের মাত্রা বৃদ্ধি পাইতেই থাকে। কথা ছিল, প্রত্যেক সপ্তাহে অমরবাবু থিয়েটার হইতে আড়াইশত টাকা করিয়া মনোমোহনবাবুকে ঋণ-পরিশোধ হিসাবে দিয়া যাইবেন, কিন্তু তাঁহার অন্যান্য পাওনাদারও ছিল, এজন্য তাহাও সব সপ্তাহে ঘটিয়া উঠিত না।

এইসময়ে 'ক্লাসিক থিয়েটারে' ভাড়ার নিমিত্ত বেলচেম্বার সাহেবকে দুই হাজার টাকা দিবার প্রয়োজন হওয়ায় অমরবাবু বিশেষ বিব্রত হইয়া মনোমোহনবাবুকে টাকার নিমিত্ত পুনরায় ধরিয়া বসেন। মনোমোহনবাবুর তখনও প্রায় দশ হাজার টাকা পাওনা হওয়ায় তিনি আর টাকা দিতে অসম্মত হন। অবশেষে 'ক্লাসিক

থিয়েটারে'র স্বত্ব বিক্রয়ের খোস কবলা লিখিয়া দিয়া অমরবাবু তাঁহার নিকট উক্ত টাকা গ্রহণ করেন। কথা থাকে, তিন মাসের মধ্যে এই কবলা রেজিষ্ট্রী হইবে না। অমরবাবু এই তিন মাসের মধ্যে টাকা পরিশোধ করিতে না পারিলে তবে রেজিষ্ট্রী হইবে।

'ক্লাসিক থিয়েটারে'র স্বত্ব বিক্রয়ের একে এই কঠিন সর্ত্ত, তাহাতে বৎসরাবধি 'মিনার্ভা থিয়েটার' চালাইয়া লাভ হওয়া দূরে থাক—ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধিই হইতে লাগিল। তাহার উপর 'মিনার্ভা থিয়েটারে'র স্বত্বাধিকারী পূর্ব্বোক্ত বেণীভূষণ রায় ও ও প্রিয়নাথ দাস ডিপজিটের বাকী টাকার জন্ম কড়া তাগাদা আরম্ভ করিলেন—সে টাকা না দিলে লিজ কাঁচিয়া যায়, এই সঙ্কট-অবস্থায় অমরবাবু 'মিনার্ভা থিয়েটারে'র বাকী দুই বৎসরের লিজ মনোমোহনবাবুকে হস্তান্তর করিয়া দিলেন। মনোমোহনবাবু ঐ লিজ পাইয়া বেণীভূষণবাবুদের পাওনা টাকা পরিশোধ করিয়া দিলেন এবং নিজের প্রাপ্য টাকা হইতে অমরবাবুকে অব্যাহতি প্রদান করিলেন।

'মিনার্ভা থিয়েটারে'র লেসি হইয়া মনোমোহনবাবু শ্রীযুক্ত চুণীলাল দেবকে থিয়েটার সাব-লিজ দিলেন। কথা হইল, চুণীবাবু তাঁহাকে ৭৫০৲ টাকা করিয়া মাসিক ভাড়া দিবেন এবং ভাড়ার টাকা সপ্তাহে-সপ্তাহে দিয়া যাইবেন। চুণীবাবু স্বয়ং অধ্যক্ষ এবং পরিচালক হইয়া 'মিনার্ভা থিয়েটারে'র অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণের সহিত একটা share-এর ব্যবস্থা করিয়া থিয়েটার চালাইতে আরম্ভ করিলেন। স্বর্গীয় মনোমোহন গোস্বামীর নূতন সামাজিক নাটক 'সংসার' 'মিনার্ভা থিয়েটারে' প্রথম অভিনীত হয়। নাটকখানি পাঁচ ফুলের সাজি হইলেও দর্শকগণের হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। এইসময়ে 'ক্লাসিক থিয়েটারে' হঠাৎ 'সৎনাম' নাটক বন্ধ হইয়া যাওয়ায় 'ক্লাসিক'-প্রত্যাগত বহু দর্শক-সমাগমে 'সংসার' বেশ জমিয়া যায়।

শনিবারে 'সংসার' অভিনয়ে কতকটা আর্থিক সচ্ছলতা হইল এবং চুণীবাবুও সপ্তাহে-সপ্তাহে মনোমোহনবাবুকে ঠিক ভাড়া দিয়া যাইতে লাগিলেন। কিন্তু রবি ও বুধবারে অতি সামান্য বিক্রয় হওয়ায় তিনি বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। তখনও 'ক্লাসিক' অক্ষুণ্ণ প্রতাপে চলিতেছে। থিয়েটার জমাইতে হইলে ভাল নাটক চাই—কিন্তু চুণীবাবুর টাকা কোথায়?

হঠাৎ এমন একটী অভাবনীয় ঘটনা ঘটিল, যাহাতে 'মিনার্ভা থিয়েটারে'র সমস্ত দৈন্য দূর হইয়া সৌভাগ্যের সূচনা হইল।

থিয়েটারে উপহার

সুবিখ্যাত 'বসুমতী' সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় সুলভ মূল্যে সৎসাহিত্যের প্রচার করিয়া সাহিত্য-জগতে অমরত্বলাভ করিয়াছেন। কিন্তু এইসময়ে তিনি তিন সহস্র 'অতুল গ্রন্থাবলী' একেবারে ছাপাইয়া

একটু মুস্কিলে পড়েন। তাঁহার সুবৃহৎ গুদামে বই রাখিবার আর স্থান সংকুলান হইতেছিল না। এ নিমিত্ত তিনি বুধবার 'ক্লাসিক থিয়েটার' ভাড়া লইয়া প্রত্যেক দর্শককে 'অতুল গ্রন্থাবলী' উপহার দিবেন সংকল্প করিলেন। ইহাতে অমরবাবু সম্মত আছেন কিনা—জানিবার জন্য উক্ত থিয়েটার-সংশ্লিষ্ট কোনও ব্যক্তি মারফৎ প্রস্তাব করিয়া পাঠান। অমরবাবু নানা কারণ দেখাইয়া উপেন্দ্রবাবুর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন।

অমরবাবু অসম্মত হইলেন বটে, কিন্তু চুণীবাবু তাঁহার 'মিনার্ভা থিয়েটারে' উপহার-দানে অভিনয় করিতে সহজেই সম্মত হইলেন। ব্যবস্থা হইল, উপেন্দ্রবাবু দর্শকদিগকে উপহার জোগাইবেন এবং বিনামূল্যে হ্যাণ্ডবিল ছাপাইয়া দিবেন, থিয়েটার-সম্প্রদায় কেবল অভিনয় ও প্লাকার্ড ছাপাইবার ভার লইবেন। লভ্যাংশ আধা-আধি।

বহুকাল পূর্ব্বে 'ন্যাসান্যাল থিয়েটার' ভাড়া লইয়া যোগেন্দ্রনাথ মিত্র দর্শকগণকে অঙ্গুরীয়, ইয়ারিং, আয়না, এসেন্স প্রভৃতি উপহার দিয়াছিলেন, পাঠকগণ পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদে তাহা জ্ঞাত হইয়াছেন। 'এমারেল্ড থিয়েটারে'র ভাঙ্গা অবস্থাতে আর-একবার এইরূপ ইয়ারিং, নাকছাবি প্রভৃতি উপহার দেওয়া হয়—কিন্তু পুস্তক উপহার রঙ্গালয়ে এই প্রথম।

সেদিন বুধবার (৮ই ভাদ্র ১৩১১ সাল) 'মিনার্ভা থিয়েটারে' 'নন্দ-বিদায়', 'লক্ষ্মণ-বর্জ্জন' এবং 'কুঞ্জ ও দর্জী'র অভিনয়, তৎ-সঙ্গে প্রত্যেক দর্শককে 'অতুল গ্রন্থাবলী' উপহার প্রদান করা হইবে—বিজ্ঞাপিত হয়। উপহার-প্রত্যাশায় গ্যালারি, পিট ও ষ্টলের সমস্ত আসনগুলিই বিক্রয় হইয়া যায়। থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষগণ আর স্থান দিতে না পারিয়া অবশেষে হতাশ হইয়া দর্শকমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'আমরা আগামীকল্য বৃহস্পতিবারেও এই একই অভিনয় এবং এই একই উপহার প্রদান করিব। যাঁহাদের ইচ্ছা হয়, আজ হইতেই টিকিট ও উপহার লইতে পারেন।' সঙ্গে-সঙ্গে প্রায় তিনশত টাকার টিকিট বিক্রয় হইয়া যায়। সময়ের অল্পতাবশতঃ তৎ-পরদিবস বৃহস্পতিবারের অভিনয় উত্তমরূপে বিজ্ঞাপিত হইল না; তথাপি উভয় রাত্রে দেড়হাজার টাকার উপর টিকিট বিক্রয় হইয়াছিল।

এই অপ্রত্যাশিত বিক্রয়ে উৎসাহিত হইয়া 'মিনার্ভা'-সম্প্রদায় তৎ-পরসপ্তাহ বুধ ও বৃহস্পতিবারে মাইকেল মধুসূদন দত্তের গ্রন্থাবলী উপহার দিবার প্রস্তাব করিল। অমরবাবু এই সংবাদ পাইয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনিও প্রচুর অর্থব্যয়ে চারি-পাঁচ দিনের মধ্যে মাইকেল মধুসূদনের গ্রন্থাবলী ছাপাইয়া তৎ-পর-সপ্তাহে বুধ ও বৃহস্পতি—দুই দিনই উক্ত গ্রন্থাবলী উপহার-প্রদানে অভিনয় ঘোষণা করিলেন। উভয় থিয়েটারেই একই উপহার—অপরাহ্ণ হইতে দলে-দলে দর্শক-সমাগমে হেদুয়ার মোড় হইতে বিডন উদ্যানের সম্মুখ পর্য্যন্ত সমস্ত বিডন ষ্ট্রীট লোকে লোকারণ্য হইয়া গেল—থিয়েটারে এরূপ জনসমাগম বহুকাল কেহ কখনও দেখে নাই। উপেন্দ্রবাবুর পৃষ্ঠপোষকতায় 'মিনার্ভা থিয়েটার' উপহারের বন্যা ছুটাইল। এরূপ অবস্থায় অমরবাবু বাধ্য হইয়া 'হিতবাদী'র স্বত্বাধিকারিগণের শরণাপন্ন হইলেন। ভাদ্র ও

আশ্বিন এই দুই মাস উভয় থিয়েটারে উপহারের প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিল—'অতুল-গ্রন্থাবলী' হইতে আরম্ভ করিয়া কালীপ্রসন্ন সিংহের 'মহাভারত' ও 'শব্দকল্পদ্রুম' পর্য্যন্ত উপহার প্রদত্ত হইয়াছিল।

এইরূপ উপহারদানে দুর্ব্বল 'মিনার্ভা থিয়েটার' দিন-দিন যেরূপ বল সঞ্চয় করিতে লাগিল, অপরপক্ষে 'চল্‌তি' 'ক্লাসিক থিয়েটার' 'বসুমতী'র প্রতিযোগিতায় উপহার-প্রদানে পশ্চাৎপদ হইয়া অধিক বিক্রয়ও করিতে পারিল না, তৎ-সঙ্গে আত্মমর্য্যাদাও হারাইল; আবার অল্প বিক্রয়ের অর্দ্ধাংশ 'হিতবাদী'কে দিতে বাধ্য হওয়ায় ক্রমেই নিস্তেজ হইয়া পড়িল। ফলতঃ 'মিনার্ভা' উপহার-প্রদানে যেরূপ দিন-দিন উন্নতিলাভ করিতে লাগিল, 'ক্লাসিকে'র সেইরূপ অবনতি হইতে লাগিল।

ক্রমে 'ক্লাসিক থিয়েটারে' বেতনাদি বাকী পড়িয়া যাইতে লাগিল, এই সময়টা অমরবাবুর বড়ই দুঃসময়। গিরিশচন্দ্র তাঁহাকে এইসময়ে কয়েক সহস্র টাকা ঋণদান করিয়া দুইবার বিপদ হইতে উদ্ধার করেন। সেই টাকা অমরবাবু ক্রমশঃ পরিশোধ করিতেছিলেন। শেষে পরিশোধ হইল বটে—কিন্তু গিরিশচন্দ্রের তিন মাসের বেতন বাকী পড়িয়া গেল। অমরবাবুর পাওনাদারের অভাব ছিল না। দেনা শোধের নিমিত্ত হাইকোর্টে দরখাস্ত করিয়া তাঁহারা 'ক্লাসিক থিয়েটারে' রিসিভার নিযুক্ত করিয়া দিলেন। ইহার ফলে অমরবাবুকে ইনসল্‌ভেন্ট লইতে হয়।

গিরিশচন্দ্রের 'মিনার্ভা'য় যোগদান

'সংসার' অভিনয়ের পর হইতে উদ্যমশীল চুণীলালবাবু একে-একে সুবিখ্যাতা অভিনেত্রী তিনকড়ি দাসীকে এবং 'ইউনিক থিয়েটার'* হইতে অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী মহাশয়কে আনিয়া নিজ সম্প্রদায়ের পরিপুষ্টিসাধন করিতেছিলেন। সর্ব্বশেষে 'ক্লাসিক থিয়েটার' হইতে গিরিশচন্দ্রকে লইয়া গিয়া থিয়েটারকে প্রতিদ্বন্দ্বীহীন করিলেন। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে 'ক্লাসিকে' গিরিশচন্দ্রের তিন মাসের বেতন বাকী পড়িয়া যায়। বেতন পাইবার তখন সম্ভাবনাও অতি অল্প। এই অবস্থায় চুণীবাবুর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে গিরিশচন্দ্র 'মিনার্ভা'য় যোগদানে আর ইতস্ততঃ করিলেন না।

মনোমোহনবাবু অক্লান্ত পরিশ্রমে একমাত্র রিহারস্থাল ব্যতীত থিয়েটার সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন, এ নিমিত্ত তিনি থিয়েটারের ভাড়া ব্যতীত, সমগ্র বিক্রয়ের (gross sale) উপর শতকরা পাঁচ টাকা কমিশন পাইতেন।

* স্বর্গীয় বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর 'বেঙ্গল থিয়েটার' বন্ধ হইয়া যায়। স্বত্বাধিকারী স্বর্গীয় অনাথনাথ দেবের নিকট উক্ত থিয়েটার ভাড়া লইয়া 'অরোরা', 'ইউনিক', 'ক্যাসাক্যাল', 'গ্রেট ক্যাসাক্যাল', 'গ্রাণ্ড ক্যাসাক্যাল', 'থেস্‌পিয়ান টেম্পল', 'প্রেসিডেন্সি' প্রভৃতি নানা থিয়েটার খাদি পড়িয়া থাকে। উপস্থিত ঐ স্থানে বিডন ষ্ট্রীট পোষ্টাফিসের নূতন বাটী নির্ম্মিত হইয়াছে।

হাইকোর্টের উকীল স্বর্গীয় মহেন্দ্রকুমার মিত্র এম. এ., বি. এল.* এই সম্প্রদায়ের আইন-আদালত সম্বন্ধে পরামর্শদাতা (legal adviser) ছিলেন, ইহার জন্ত ইনিও একটা কমিশন পাইতেন।

কয়েক মাস সুনাম ও সুশৃঙ্খলার সহিত অভিনয় করিয়া সম্প্রদায় মাঘ মাসে বায়না লইয়া মালদহে গমন করে। অশুভক্ষণে সামান্ত কারণে তথায় মনোমোহনবাবুর সহিত চুণীবাবুর মনোমালিন্ত ঘটে। কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া মনোমোহন থিয়েটার আসা বন্ধ করেন। এদিকে নানা কারণে চুণীবাবুও থিয়েটার ছাড়িলেন। মহেন্দ্রবাবু মধ্যস্থ হইয়া সিদ্ধান্ত করিলেন, চুণীবাবুর কর্তৃত্বকালীন দৃশ্যপট, পরিচ্ছদ ইত্যাদির জন্ত চুণীবাবু একহাজার টাকা নগদ পাইবেন এবং থিয়েটারের অন্যান্য যাহা দেনা ছিল, তাহা পরিশোধ করিবার ভার মনোমোহনবাবু স্বয়ং গ্রহণ করিবেন।

যখন চুণীবাবু তাঁহার হাতে গড়া 'মিনার্ভা'য় এই তৈরী-হাট সহসা পরিত্যাগ করিলেন, তখন মনোমোহনবাবুও থিয়েটার ভাড়া দিবার সঙ্কল্প করিলেন। মহেন্দ্রবাবু বলিলেন, "থিয়েটারে লোকসান হইবে না ; কেন ছাড়িয়া দিতে চাহিতেছ ? আমার কথায় বিশ্বাস করো—স্বয়ং থিয়েটার চালাও।" মহেন্দ্রবাবুর আগ্রহ দেখিয়া এবং তাঁহার বুদ্ধিমত্তার উপর দৃঢ় বিশ্বাস থাকায় মনোমোহনবাবু তাঁহাকে বলেন, "তুমি যদি বখ্‌রা লইয়া আমার সহিত কার্য্যে যোগ দাও, তাহাহইলে আমি থিয়েটার চালাইতে সম্মত আছি।" সেইরূপই হইল—মহেন্দ্রবাবু এক-তৃতীয়াংশ অংশগ্রহণে legal adviser-রূপে মনোমোহনবাবুর সহযোগে থিয়েটার চালাইতে আরম্ভ করিলেন। মনোমোহনবাবু তাঁহার বাল্যবন্ধু শ্রীযুক্ত অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে চুণীবাবুর অধ্যক্ষতার সময়েই 'মিনার্ভা থিয়েটারে' আনিয়াছিলেন। অপরেশবাবু 'মিনার্ভা থিয়েটারে'র সহিত মালদহেও গিয়াছিলেন। চুণীবাবুর স্থলে তাঁহাকেই ম্যানেজার করা হইল।

'হর-গৌরী'

'মিনার্ভা থিয়েটারে' আসিয়া গিরিশচন্দ্র তাঁহার বিখ্যাত সামাজিক নাটক 'বলিদান' লিখিতে প্রবৃত্ত হন। নাটকখানির রচনা প্রায় সমাপ্ত হইয়া আসিলে সম্মুখে শিবরাত্রি

* মহেন্দ্রবাবু পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সরকারের ষ্টেটের ম্যানেজার ছিলেন। ইঁহারই উৎসাহে নরেন্দ্রবাবু গিরিশচন্দ্রকে 'মিনার্ভা'য় লইয়া যান। তৎ-পরে মহেন্দ্রবাবু ম্যানেজারি ছাড়িয়া দিলে নরেন্দ্রবাবুও অন্ত'ন্ত লোকের পরামর্শে গিরিশচন্দ্রের সহিত অসদ্ব্যবহার করেন। মহেন্দ্রবাবু নাট্যকলাভিজ্ঞ ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইনি এম. এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। নাটকের প্রশ্নপত্রে সেই বৎসর প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। মহেন্দ্রবাবুর নানা গুণে গিরিশচন্দ্র তাঁহার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। গিরিশচন্দ্রের শেষ কর্ম্ম-জীবনের সহিত মহেন্দ্রবাবু বিশেষরূপ জড়িত। মহেন্দ্রবাবু বর্ত্তমান 'মিনার্ভা থিয়েটারে'র প্রোপ্রাইটার শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার মিত্র বি. এ.

উপলক্ষ্যে একখানি শিব-ভক্তিমূলক গীতিনাট্যের আবশ্যক হওয়ায় তিনি দুই অঙ্কে সমাপ্ত এই 'হর-গৌরী' গীতিনাট্যখানি লিখিয়া দেন।

রামেশ্বরের 'শিবায়ন' অবলম্বনে গ্রন্থখানি রচিত। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের নিজের কৃতিত্ব এই গীতিনাট্যের সর্ব্বাংশেই সুপ্রকাশ। প্রজাপতি জীব সৃষ্টি করিয়াছেন, সতীদেহত্যাগে মানব পতি-পত্নীর সম্বন্ধ বুঝিয়াছে, কিন্তু সৃষ্টির উদ্দেশ্য এখনও সম্পূর্ণরূপে সাধিত হয় নাই। ধরণীর আদিমবাসীগণ এখনও ঘর বাঁধিতে শিখে নাই, বনে-বনে শিকার করিয়া ফেরে, বিজ্ঞান ইহাকে মানবের 'Hunting Age' শিকার-বৃত্তির যুগ বলিয়া নির্দ্ধারিত করিয়াছে। ইহার সঙ্গে-সঙ্গেই 'Nomadic Age' বেদিয়াবৃত্তির যুগের প্রবর্ত্তন। তৎ-পরে 'Agricultural Age' অর্থাৎ কৃষি-বৃত্তির যুগ। তাহার পর শিল্প-কলার (Art) ক্রমোন্নতি। গিরিশচন্দ্র 'শিবায়নে'র গল্পে মানব-জাতির ক্রমবিকাশের এই বৈজ্ঞানিক ধারা অতি দক্ষতার সহিত অঙ্কিত করিয়াছেন। ইহার গল্পাংশ হাস্যরসপ্রধান। এতৎ-সম্বন্ধে আর অধিক কিছু না বলিলেও চলে। পুস্তকখানি পাঠ করিলেই পাঠক গিরিশচন্দ্রের কৃতিত্ব হৃদয়ঙ্গম করিবেন।

২০শে ফাল্গুন (১৩১১ সাল) 'মিনার্ভা থিয়েটারে' 'হর-গৌরী' প্রথম অভিনীত হয়। প্রথমাভিনয় রজনীর অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ:

হর	তারকনাথ পালিত।
নারায়ণ	শ্রীক্ষেত্রমোহন মিত্র।
নারদ	শ্রীমন্মথনাথ পাল (হাঁদুবাবু)।
কার্ত্তিক	নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।
গণেশ	শ্রীনন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।
ইন্দ্র	শ্রীমণীন্দ্রনাথ মণ্ডল (মণ্টুবাবু)।
মদন	কিরণবালা।
নন্দী	শ্রীঅতুলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।
	জ্ঞানকালী চট্টোপাধ্যায়।
কুবের	শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী।
বিশ্বকর্ম্মা	শ্রীঅমৃতলাল দাস।
ব্যাধ	শ্রীজীবনকৃষ্ণ পাল।
গৌরী	শ্রীমতী তারাসুন্দরী।
লক্ষ্মী	শ্রীমতী মনোরমা।
জয়া	শ্রীমতী গোলাপসুন্দরী।
বিজয়া	সরোজিনী (নেড়ী)।
পৃথিবী	সরোজিনী।

মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ এবং শিশির পাবলিশিং হাউসের স্বত্বাধিকারী ও 'সচিত্র শিশির'-সম্পাদক শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার মিত্র বি. এ. মহাশয়ের পিতা।

রতি	শ্রীমতী ফিরোজাবালা (নেনি)।
মেনকা	নগেন্দ্রবালা। ইত্যাদি।
সঙ্গীত-শিক্ষক	অমৃতলাল দত্ত (হাবুবাবু)।
নৃত্য-শিক্ষক	শ্রীসাতকড়ি গঙ্গোপাধ্যায়।
রঙ্গভূমি-সজ্জাকর	শ্যামাচরণ কুণ্ডু।

এই গীতিনাট্যে গিরিশচন্দ্র হর-পার্ব্বতীর দেব-ভাব পরিস্ফুট না করিয়া ভাষায় ও ভাবে একটা মধুর গার্হস্থ্য চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। কিন্তু কবির কৃতিত্বে এই গার্হস্থ্য চিত্রের ভিতর দিয়া নায়ক-নায়িকার দেবত্ব দেখা দিয়াছে। নিখুঁত স্বাভাবিক অভিনয়ে শ্রীমতী তারাসুন্দরী গৌরীর ভূমিকা মূর্ত্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন, কিন্তু তারকনাথ পালিত মহাদেবের ভূমিকায় সেরূপ কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই। এ নিমিত্ত অভিনয়ের আদর্শ দিবার জন্য গিরিশচন্দ্র স্বয়ং কয়েক রাত্রি শিবের ভূমিকায় রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। মেনকার ভূমিকায় নগেন্দ্রবালা 'এসেছিস তো থাকনা উমা দিন কত' এবং 'জামাই নাকি শ্মশানবাসী শুনতে পাই' দুইখানি গীতে দর্শকমণ্ডলীকে বিমুগ্ধ করিয়াছিলেন।

দীর্ঘকাল পরে 'মনোমোহন থিয়েটারে' এই গীতিনাট্যখানি পুনরভিনীত হয়। অভিনয় দর্শনে সাধারণে বিশেষ প্রীতিলাভ করায়, বহুদিন ধরিয়া তথায় ইহা অভিনীত হইয়াছিল।

'বলিদান'

'বলিদান' গিরিশচন্দ্রের সুবিখ্যাত সামাজিক নাটক। ইহার অভিনয় দর্শনে সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার স্বর্গীয় ডি. এল. রায় বলিয়াছিলেন, "যদি 'বলিদানে'র ন্যায় সামাজিক নাটক লিখিতে পারি, তবেই সামাজিক গ্রন্থ লিখিব।" বাস্তবিক সমাজচিত্র প্রদর্শনে গিরিশচন্দ্রের সমকক্ষ কেহ ছিলেন না এবং এখনও নাই—এ কথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কবি নাটকের শেষে বলিয়াছেন, "বাঙ্গালায় কন্যা সম্প্রদান নয়—বলিদান।" এই মর্ম্মভেদী সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে যাহা কিছু অবস্থা এবং ঘটনার প্রয়োজন, একটীর পর একটী বলয় সংযোগ করিয়া যেমন শৃঙ্খল গঠিত হয়, নিখুঁত শিল্পী গিরিশচন্দ্র সেইরূপ সংযোজনা করিয়াছেন।

'বলিদান' বাঙ্গালার গৃহ-চিত্র। কন্যাদায়গ্রস্ত গৃহস্থের উৎপীড়ন এবং লাঞ্ছনা সমাজের নিত্য ঘটনা—সম্পূর্ণ নূতনত্ববিহীন। পুরাতন ক্ষত যেমন শলাকাঘাতে বেদনাবোধ বা রক্তমোক্ষণ করে না, বাঙ্গালার এই সামাজিক ক্ষত তেমনি অসাড় হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু কবির মায়া-দণ্ড স্পর্শে সেই পুরাতন ক্ষতে আবার অভিনব চেতনার সঞ্চার হইয়াছে। হাইকোর্টের বিচারপতি স্বর্গীয় সারদাচরণ মিত্র মহোদয়ের অনুরোধে নাটকখানি রচিত এবং তাঁহাকেই উৎসর্গীকৃত হয়। উৎসর্গপত্রে একটু বিশেষত্ব

আছে। নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :

"পণ্ডিতপ্রবর মাননীয় শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয়েষু—

মহোদয়, এই নাটকখানি মহাশয়ের আদেশে রচিত। পরীক্ষার্থে সবিনয়ে মহাশয়কে অর্পণ করিলাম। কঠিন পরীক্ষা। পঠদশায়, উচ্চপ্রতিভায়, সহযোগিগণের প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিরাশ করিয়াছিলেন। সংসার-পরীক্ষায়, উত্তরোত্তর নিজ গৌরব বর্দ্ধনপূর্ব্বক বিচার-পতির আসন গ্রহণ করিয়াছেন। তবে নট ও নাট্যকারের উৎসাহবর্দ্ধন মহাশয়ের স্বভাবসিদ্ধ। যৌবনাবস্থায়, রঙ্গমঞ্চ হইতে 'নিমচাঁদ'-রূপে দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে, মহাশয়ের প্রথম দর্শন পাই। তদবধি আমি মহাশয়ের অনুকম্পাভাজন। সেই অনুকম্পাই, এ স্থলে আমার উকীল। বিচারপ্রার্থীর অবস্থায়, মহাশয়ের সমীপে উপস্থিত—

অনুগত

শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ।"

২৮শে চৈত্র (১৩১১ সাল) 'মিনার্ভা থিয়েটারে' 'বলিদান' সর্ব্বপ্রথম অভিনীত হয়। প্রথমাভিনয় রজনীর অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ :

করুণাময়	গিরিশচন্দ্র ঘোষ।
রূপচাঁদ	অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী।
দুলালচাঁদ	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু)।
মোহিতমোহন	শ্রীক্ষেত্রমোহন মিত্র।
ঘনশ্যাম	শ্রীমণীন্দ্রনাথ মণ্ডল (মণ্টুবাবু)।
কিশোর	শ্রীঅপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
কালী ঘটক	শ্রীজীবনকৃষ্ণ পাল।
রমানাথ	শ্রীমন্মথনাথ পাল (হাঁদুবাবু)।
নলিন	ধীরেন্দ্র নাথ।
মুকুন্দলাল	শ্রীঅতুলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।
ইন্সপেক্টার	শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঘোষ।
উকীল	জ্ঞানকালী চট্টোপাধ্যায়।
সরস্বতী	শ্রীমতী তারাসুন্দরী।
যশোমতী	সরোজিনী।
রাজলক্ষ্মী	নগেন্দ্রবালা।
জোবি	সুশীলাবালা।
মাতঙ্গিনী	শ্রীমতী সুধীরাবালা (পটল)।
কিরণ্ময়ী	কিরণবালা।
হিরণ্ময়ী	শ্রীমতী চারুবালা।
জ্যোতির্ম্ময়ী	শ্রীমতী মনোরমা।
ভামিনী	শ্রীমতী শান্তাসুন্দরী।
করুণাময়ের ঝি	শ্রীমতী চপলাসুন্দরী। ইত্যাদি।

শিক্ষক গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও
অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী (সহকারী)।
রঙ্গভূমি-সজ্জাকর শ্যামাচরণ কুণ্ডু।

পণ্ডিতবর রায় বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর এই নাটকের গীতগুলির সুর সংযোজনা করিয়া দিয়াছিলেন।

পাঠক দেখিবেন—সেইসময়ে খ্যাতনামা অভিনেতামাত্রেই এই নাটকে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, এবং কেবল তাহাই নহে, সকলেই যেন পরস্পর প্রতিযোগিতা করিয়া এই সমাজচিত্রকে দর্শকের চক্ষে সজীব করিয়া তুলিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন।

এই সর্ব্বজন-সমাদৃত নাটকের নায়ক করুণাময় হইতে সামান্যা ঝি পর্য্যন্ত সকল চরিত্রই জীবন্ত এবং গ্রন্থকারের সৃষ্টি-নৈপুণ্যের পরিচায়ক। ইহার প্রত্যেক চরিত্র সমালোচনা করিয়া দেখাইতে আনন্দ আছে; কিন্তু গ্রন্থের অত্যধিক কলেবর-বৃদ্ধির ভয়ে আমাদের সে সুখলাভে বঞ্চিত হইতে হইল। তবে দুলালচাঁদ এবং জোবির চরিত্রে যে বিশেষত্ব আছে, আমরা পাঠকগণকে তাহারই একটু ইঙ্গিত করিতেছি।

'বসুমতী'-সম্পাদক এই নাটকের যথেষ্ট প্রশংসা করিলেও দুলালচাঁদ সম্বন্ধে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, যথা "দুলালচাঁদের রসিকতা বড়ই অস্বাভাবিক হইয়াছে, যত বড় মূর্খই হউক না কেন, যত বড় আদুরে বয়াটেই হউক না কেন, ভদ্রলোকের ছেলে পিতামাতার সম্মুখে এতদূর বেয়াদবি করিতেই পারে না।" ('বসুমতী' ৩০শে বৈশাখ ১৩১২ সাল।) আমাদের কিন্তু মনে হয়—সমালোচক একটু ভ্রমে পতিত হইয়াই এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। দুলালচাঁদের কোন উক্তিই রসিকতা নহে—তাহার সকল কথাই সারল্যের অভিব্যক্তি; কেবল শিক্ষাহীনতা, অসৎ সংসর্গ এবং মাদক-প্রভাবে তাহার ভাষা বিকৃত হইয়াছে মাত্র। রূপচাঁদের যৌবনের পাপাচার যেন মূর্ত্তিমন্ত হইয়া দুলালচাঁদ-রূপে তাহাকে সময়ে-অসময়ে লাঞ্ছিত করিতেছে। রূপচাঁদ বলিতেছেন, "অ্যাঁ, তুই কি বলছিস? তুই করুণাময়ের মেয়েকে জোর ক'রে বাগানে নিয়ে যাবার জোগাড় করেছিলি?" দুলাল উত্তর দিতেছে, "কেন বাবা, দোষ কি বাবা?—বাপ্‌কো বেটা, সেপাইকো ঘোড়া? বিন্দি বামনির কথা তো শুনেছি বাবা, তুমি রাতারাতি লোপাট করেছিলে বাবা।" (১ম অঙ্ক, ৩য় গর্ভাঙ্ক।) যাঁহারা সমাজের সকল স্তরের সহিত সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে পরিচিত, তাঁহারা অবশ্যই স্বীকার করিবেন যে এরূপ চরিত্রের আদর্শ বিরল হইলেও, দুর্লভ নহে। তবে সে আদর্শ সকল সময়ে ছাপাখানার গণ্ডীর ভিতর দেখা যায় না। দুলালচাঁদের পিতা কোনরূপে পুত্রকে সংযত করিবার প্রয়াস করিলেই দুলালচাঁদ পিতার চরিত্রকে যেন ভূগর্ভ হইতে টানিয়া তুলিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করে। পরিণামে দুলালচাঁদের এই সারল্যই তাহাকে মহত্ত্বের পথে চালিত করিয়াছিল।

দুরাচার স্বামী কর্ত্তৃক লাঞ্ছিতা ও পরিত্যক্ত হইয়াও জোবি অসাধারণ পতিভক্তি-পরায়ণা ও পতি-প্রেমোন্মাদিনী—শুধু ইহাই তাহার বিশেষত্ব নহে, পরের দুঃখে তাহার হৃদয় গলিয়া যায়; নিঃস্বার্থ প্রেমিকা জোবি দুলালচাঁদের শিক্ষয়িত্রী—জঘন্য বিলাসের

এবং ঘৃণিত ভোগলিপ্সার পূতিগন্ধময় পঙ্ক হইতে উদ্ধৃত করিয়া এই অসংযত, অসংবৃত এবং উপহাসাস্পদ চরিত্রকে জোবি যে আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, তাহা মহৎ হইতেও মহত্তর এবং পরমশান্তিময়। আত্ম-বলিদানের কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দুলাল ডাকিতেছে, "পাগলি, পাগলি—দেখে যা, তোর পড়া তুলি নি। আর জালা নেই, আমার প্রাণ জল হ'য়ে গিয়েছে।" (৫ম অঙ্ক, ৮ম গর্ভাঙ্ক।) কিন্তু পাগলি তখন কোথায়? যেখানে সংসার-সন্তপ্তা, লাঞ্ছিতা, বঞ্চিতা, পরিত্যক্তা, উৎপীড়িতা—নিঃস্বার্থ পতিপ্রাণার পরমশান্তিময় স্থান—সেই মধুসূদনের শ্রীচরণে।

করুণাময়ের ভূমিকাভিনয়ে গিরিশচন্দ্র অসামান্য অভিনয়-প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন। স্বীয় গৃহিণী সরস্বতীর সহিত কন্যার বিবাহের কথাবার্তা কহিতে-কহিতে কাগজে বিবাহের দ্রব্যাদির ফর্দ্দ করা—হিরণ্ময়ীর জল-নিমজ্জন-দৃশ্যের শেষভাগে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিয়া "এই যে খুঁজে পাওয়া গিয়েছে। তাইতো বলি—আমার শান্ত মেয়ে—রাস্তায় যাবে না, লজ্জাশীলা রাস্তায় যাবে না।" বলিয়া সেই শোক-মত্তাবস্থাতেও আশ্বস্তভাব প্রদর্শন—পরক্ষণেই—গভীর বেদনায় শুষ্ককণ্ঠে "মা, মা, অন্ন দিতে পারি নাই, এই যে আকণ্ঠ জল খেয়েছ!" (৪র্থ অঙ্ক, ৭ম গর্ভাঙ্ক।) বলিয়া বসিয়া পড়া, বিকৃত মস্তিষ্কে রূপচাঁদ মিত্রের বাটীতে বিবাহের কণ্ট্রাক্ট সহি করা প্রভৃতি দৃশ্যগুলি যিনি দেখিয়াছেন, তিনি কখনও ভুলিবেন না, যিনি দেখেন নাই—বর্ণনায় তাঁহাকে তাহার আভাস-প্রদানের প্রয়াস বৃথা।

সে সময়ের কি ইংরেজি কি বাঙ্গালা—সকল সংবাদপত্রেই 'বলিদান' নাটকের ভূয়সী সুখ্যাতি বাহির হইয়াছিল। কয়েকখানি সংবাদপত্রের মন্তব্য আংশিক উদ্ধৃত করিলাম।—মেট্রোপলিটন ইনষ্টিটিউসনের প্রিন্সিপ্যাল সুপণ্ডিত এন. ঘোষ অভিনয় দর্শনে তৎ-সম্পাদিত 'ইণ্ডিয়ান নেসনে' (১৪ই আগষ্ট ১৯০৫ খ্রী) লিখিয়াছিলেন:

"The play is an intensely realistic tragedy.…Babu Girish Chunder Ghose, the talented author of the play, plays the part of Karunamoy to perfection. Most of the actors and actresses are up to the mark. &c." 'বঙ্গবাসী'তে (২৭শে শ্রাবণ ১৩১২ সাল) বাহির হইয়াছিল, "বঙ্গের রঙ্গমঞ্চে বাঙ্গালীর ঘরের ছবি যে এতটা পরিস্ফুট হইবে, দর্শকের হৃদয় যে এতটা উদ্বেলিত হইবে, 'বলিদান' অভিনয় দেখিবার পূর্ব্বে আমরা তাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই।" শোভাবাজার রাজবাটী হইতে প্রকাশিত 'সাহিত্য-সংহিতা'র (৭ম খণ্ড, ৩য় সংখ্যা) লিখিত হয়, "ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নাটক বাঙ্গালা ভাষায় অদ্যাপি প্রচারিত হইয়াছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস নাই।"

'সিরাজদ্দৌলা'

'বলিদান' নাটকের পর গিরিশচন্দ্র 'রাণা প্রতাপ' নাটক লিখিতে প্রবৃত্ত হন। এইসময়ে শুনা গেল 'ষ্টার থিয়েটারে' স্বর্গীয় ডি. এল. রায়ের 'রাণা প্রতাপ' রিহারস্তালে পড়িয়াছে। গিরিশচন্দ্রের নাটক তখন সবেমাত্র দুই অঙ্ক লেখা হইয়াছে।* সম্পূর্ণ করিয়া রিহারস্তালে ফেলিতে বিলম্ব হইবে। এইজন্ত তিনি 'রাণা প্রতাপ' রচনার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলেন। 'সাহিত্য'-সম্পাদক স্বর্গীয় সুরেশচন্দ্র সমাজপতি বহুদিন হইতে তাঁহাকে 'সিরাজদ্দৌলা' নাটক লিখিবার জন্ত বিশেষরূপ অনুরোধ করিতেছিলেন। গিরিশচন্দ্র এশিয়াটিক সোসাইটির সভ্য ছিলেন, তিনি এই নাটক লিখিবার উদ্দেশ্তে তথা এবং অন্ত স্থান হইতে তৎসাময়িক ইতিহাস আনাইয়া সিরাজ-চরিত্র অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। রাশি-রাশি পুস্তক অধ্যয়নের পর, 'সিরাজদ্দৌলা' লেখা আরম্ভ হইল।

সিরাজদ্দৌলার বাল্যজীবন হইতে আরম্ভ করিয়া নাটক লিখিতে গেলে দুইখানি পঞ্চাঙ্ক নাটক লেখা প্রয়োজন। কিন্তু বঙ্গ-নাট্যশালার দর্শকগণের ধৈর্য্যচ্যুতির আশঙ্কায় তিনি একখানি নাটকেই সিরাজ-চরিত্র সমাপ্ত করিবার সঙ্কল্প করেন। কিন্তু এ সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে তাঁহাকে বিলক্ষণ বেগ পাইতে হইয়াছিল। দুই-তিনটী দৃশ্য অগ্রসর হয়, আর তাহা নির্ম্মমভাবে পরিত্যাগ করেন, এইরূপে দুই-তিনবারে plot-এর পরিকল্পনা সুস্পষ্ট আকার ধারণ করিল, এবং লেখাও দ্রুতগতি চলিতে লাগিল। কিন্তু তথাপিও প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত করিতে একপক্ষ বিলম্ব হয়। এই প্রথমাঙ্কে সিরাজদ্দৌলার জীবনের প্রায় অর্দ্ধেক ঘটনা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। বাকী কয়েক অঙ্কে ঐতিহাসিক চিত্রের সঙ্গে-সঙ্গে সিরাজ-চরিত্রের ক্রমবিকাশ এবং তাঁহার মর্ম্মান্তিক পরিণাম গিরিশচন্দ্র যেভাবে চিত্রিত করিয়াছেন, তাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। সিরাজের স্বদেশ-বাৎসল্য, তাঁহার যৌবনসুলভ চাপল্য, অনুতাপ এবং সর্ব্বোপরি তাঁহার গার্হস্থ্য-জীবনের প্রীতিময় চিত্র এরূপভাবে অঙ্কিত হইয়াছে যে বাঙ্গালায় কোনও ঐতিহাসিক নাটকে তাহার তুলনা নাই। 'সিরাজদ্দৌলা' ঐতিহাসিক নাটক হইলেও নাটকীয় ঘটনার যথাযথ সংযোগ এবং পরিপুষ্টির জন্য গিরিশচন্দ্র জহরা ও করিমচাচা এই দুইটী কাল্পনিক চরিত্র নাটকের অঙ্গে সন্নিবেশিত করিয়াছেন।

২৪শে ভাদ্র (১৩১২ সাল) 'মিনার্ভা থিয়েটারে' 'সিরাজদ্দৌলা' সর্ব্বপ্রথম অভিনীত হয়। প্রথমাভিনয়-রজনীর অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ :

সিরাজদ্দৌলা	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু)।
মীরজাফর খাঁ	নীলমাধব চক্রবর্ত্তী।
মীরণ	শ্রীছুটবিহারী মিত্র।
সকওতজঙ্গ, ক্লাক্টন ও মুঁসালা	শ্রীমন্মথনাথ পাল (হাঁদুবাবু)।

* এই দুই অঙ্ক পঞ্চম বর্ষের 'অর্চ্চনা' মাসিকপত্রিকায় পরে প্রকাশিত হয়।

রাজবল্লভ ও লক্ষ্মণ সিংহ	জানকালী চট্টোপাধ্যায়।
রায়চুর্লভ ও মীরকাশিম	কুমুদনাথ মুখোপাধ্যায়।
মোহনলাল	তারকনাথ পালিত।
জগৎশেঠ মহতাব চাঁদ ও আমিরবেগ	শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঘোষ।
জগৎশেঠ, স্বরূপচাঁদ ও মীর দাউদ	শ্রীসাতকড়ি গঙ্গোপাধ্যায়।
মানিকচাঁদ ও রাসবিহারী	শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য।
মীরমদন ও মহম্মদী বেগ	মণীন্দ্রলাল মণ্ডল (মণ্টু বাবু)।
উমিচাঁদ	শ্রীহরিদাস দত্ত।
করিমচাচা	গিরিশচন্দ্র ঘোষ।
দানসা	অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী।
ক্লাইভ	শ্রীক্ষেত্রমোহন মিত্র।
ড্রেক ও কুট	শ্রীউপেন্দ্রনাথ বসাক।
হলওয়েল ও ওয়াট্‌স্	অটলবিহারী দাস।
চেম্বার্স ও সিনফ্রে	শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী।
ওয়ালস্ ও কিলপ্যাট্রিক	শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।
আলীবর্দ্দী-বেগম ও জহরা	শ্রীমতী তারাসুন্দরী।
ঘসেটী বেগম ও ওয়াটস্-পত্নী	শ্রীমতী সুধীরাবালা (পটল)।
আমিনা বেগম ও জোবেদী	শ্রীমতী ভূষণকুমারী (ছোট)।
লুৎফ উন্নিসা	সুশীলাবালা।
উম্মৎ জহুরা	সুবাসিনী। ইত্যাদি।
সঙ্গীত-শিক্ষক	শশীভূষণ বিশ্বাস ও শ্রীতারাপদ রায়।
নৃত্য-শিক্ষক	শ্রীসাতকড়ি গঙ্গোপাধ্যায়।
রঙ্গভূমি-সজ্জাকর	শ্রীকালীচরণ দাস।

অপরেশবাবু নানা কারণে 'মিনার্ভা থিয়েটার' পরিত্যাগ করায়, 'সিরাজদ্দৌলা'র রিহারস্যাল-কাল হইতে গিরিশচন্দ্রের নাম 'ম্যানেজার' বলিয়া বিজ্ঞাপিত হয়।

অর্দ্ধেন্দুবাবুর সহযোগিতায় 'বলিদান' নাটকের ন্যায় 'সিরাজদ্দৌলা'ও নিখুঁতভাবে অভিনীত হইয়াছিল। গিরিশচন্দ্র যেরূপ প্রধান-প্রধান ভূমিকাগুলির শিক্ষাদানে ব্যাপৃত থাকিতেন—অর্দ্ধেন্দুবাবু সেইরূপ ছোটখাটো ভূমিকাগুলির শিক্ষাদানে চরিত্রগুলি জীবন্ত করিয়া দিতেন। 'সিরাজদ্দৌলা' নাটকে হিন্দু, মুসলমান, ফরাসী, ইংরাজ প্রভৃতি বিস্তর ছোট-ছোট ভূমিকা আছে, অর্দ্ধেন্দুবাবু অতি কৃতিত্বের সহিত সেগুলি ফুটাইয়া দিয়াছিলেন।

প্রত্যেক চরিত্রের অভিনয় সমালোচনার আমাদের স্থানাভাব, অথচ যাঁহার কথা বাদ দেওয়া যাইবে, তাঁহার পক্ষে যথার্থই অবিচার করা হইবে, এজন্য করিমচাচার ভূমিকায় গিরিশচন্দ্রের কেবলমাত্র একটী দৃশ্যাভিনয়ের কথা উল্লেখ করিয়া আমরা

নিরস্ত হইলাম। সিরাজদ্দৌলাকে পলায়নের সুযোগ-প্রদানের নিমিত্ত করিমচাচা যখন নবাবের সহিত পোষাক বদল করিলেন এবং নবাব প্রস্থান করিলে স্বয়ং নবাবের বেশে গমনকালীন পুনরায় পশ্চাৎ চাহিয়া সিরাজের উদ্দেশ্যে সিংহাসনকে তিনবার কুর্ণিস করিলেন—গিরিশচন্দ্রের ভক্তিকরুণরস-মিশ্রিত সেই নির্ব্বাক অভিনয় দর্শনে কেহই অশ্রুসংবরণ করিতে পারিতেন না।

'সিরাজদ্দৌলা' নাট্যজগতে যুগপ্রবর্ত্তন করিয়াছিল, এই নাটকের উচ্চ প্রশংসা-ধ্বনিতে সমস্ত বঙ্গদেশ ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছিল। ভারতবিখ্যাত বালগঙ্গাধর তিলক কংগ্রেস-উপলক্ষ্যে কলিকাতায় আসিয়া এই নাটকের অভিনয় দেখিতে আসেন। অভিনয়ান্তে পরম প্রীতির সহিত গিরিশচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার যথেষ্ট সুখ্যাতি করিয়া যান। ইতিপূর্ব্বে নানা কারণে 'মিনার্ভা থিয়েটার' হাইকোর্ট হইতে প্রকাশ্য নীলামে উঠে। গিরিশচন্দ্রের উৎসাহে 'মিনার্ভা'র কর্তৃপক্ষগণ ৫১৪০০৲ টাকায় উক্ত থিয়েটার খরিদ করিয়াছিলেন। এক 'সিরাজদ্দৌলা' অভিনয়েই ঐ বিপুল অর্থ-রাশির শীঘ্রই পূরণ হইয়া যায়।

১৯১১ খ্রী, ৮ই জানুয়ারী তারিখে গভর্ণমেণ্ট 'সিরাজদ্দৌলা' নাটকের অভিনয় ও প্রচার বন্ধ করিয়া দেন। এ নিমিত্ত এতদ্‌-সম্বন্ধে অধিক কিছু না বলিয়া দুইজন প্রখ্যাত-নামা সিরাজ-চরিত্র লেখকের পত্র এবং কয়েকখানি সংবাদপত্রের মন্তব্য উদ্ধৃত করিলাম।

নবীনচন্দ্রের পত্র

'পলাশীর যুদ্ধ'-প্রণেতা কবিবর নবীনচন্দ্র সেন 'সিরাজদ্দৌলা' পাঠে গিরিশচন্দ্রকে ১১নং ইয়র্ক রোড, রেঙ্গুন হইতে ১৯০৬ খ্রী, ২৫শে ফেব্রুয়ারী তারিখে লিখিয়াছিলেন :
"ভাই গিরিশ !

২০ বৎসর বয়সে 'পলাশীর যুদ্ধ' লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। ৬০ বৎসর বয়সে তুমি 'সিরাজদ্দৌলা' লিখিয়াছ শুনিয়া তাহার একখানি আনাইয়া এইমাত্র পড়া শেষ করিয়াছি। তুমি আমার অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী, আমার অপেক্ষা অধিক ভাগ্যবান। আমি যখন 'পলাশীর যুদ্ধ' লিখি, তখন সিরাজের শত্রু-চিত্রিত আলেখ্যই আমাদের একমাত্র অবলম্বন ছিল। শ্রীভগবান তোমাকে আরও দীর্ঘজীবী করিয়া বঙ্গসাহিত্যের মুখ আরও উজ্জ্বল করুন

আমি নবযুবক সিরাজের পত্নীর মুখে শোক-সঙ্গীত প্রথম সংস্করণ 'পলাশীর যুদ্ধে' দিয়াছিলাম। শোকের সময়ে সঙ্গীত মুখে আসে কি না বড় সন্দেহের কথা বলিয়া বঙ্কিমবাবু বলিয়াছিলেন। সেই জন্য আমি সঙ্গীত পরে উঠাইয়া দিয়াছিলাম। তুমি চিরদিন গোঁয়ার। দেখিলাম, তুমি সেই সন্দিগ্ধ পথ অবলম্বন করিয়াছ।

তোমার 'গীতাবলী'র সঙ্গে তোমার জীবনী প্রকাশিত হইয়াছে দেখিয়া উহার এক-

খণ্ডও পাঠাইতে জলধরবাবুকে লিখিলাম। এই সুদূর প্রবাস হইতে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, তোমার অদ্ভুত জীবন যেন সুখশান্তিতে শেষ হয়।

স্নেহাকাঙ্ক্ষী
শ্রীনবীনচন্দ্র সেন।"

অক্ষয়বাবুর পত্র

স্বনামখ্যাত ঐতিহাসিক এবং অন্যান্য ঐতিহাসিক গ্রন্থ-প্রণেতা শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় সি. আই. ই. রাজসাহী, ঘোড়ামারা হইতে ১৯০৬ খ্রী, ৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে লিখিয়াছিলেন:

"পরম শুভাশীর্ব্বাদ রাশয়ঃ সন্তু।–

বাল্য-সুহৃদ জলধরের যোগে আপনার 'সিরাজদ্দৌলা' নাটক পাইয়া, তাঁহার যোগেই, এই কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ পত্র পাঠাইলাম। আমি অভিনয় দর্শন করি নাই; তাহার কথা লোকমুখে শুনিয়াছি মাত্র। আমার পক্ষে আপনার এই নাটকখানির সমালোচনা করা শোভা পায় না; নচেৎ আমি সমালোচনা করিতে পারিতাম। ইতিহাস যাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছে, আপনি তাহাকেই প্রত্যক্ষবৎ ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন। স্থানে-স্থানে অনেক কথা বলিবার ছিল; পুস্তক অভিনয়ের পূর্ব্বে আমার সঙ্গে দেখা হইলে, তাহার আলোচনা করিতাম; এখন অনাবশ্যক। সে সকল ছোটখাট বিষয় আমি ধরি না; মোটের উপর আপনি যে ইতিহাসের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া নাটকের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে পারিয়াছেন, ইহাই আপনার রচনা-প্রতিভার প্রচুর আত্মপ্রসাদ। ইতিহাস লিখিয়া সুখী হইতে পারি নাই;– লিখিতে-লিখিতে অশ্রু-বিসর্জ্জন করিয়াছি। নাটক পড়িয়াও সুখী হইতে পারিলাম না, পড়িতে-পড়িতে অশ্রু বিসর্জ্জন করিলাম। ভগবতী ভারতী আপনার লেখনীর উপর পুষ্পচন্দন বর্ষণ করুন। অলমতি বিস্তরেণ।

চিরশুভাকাঙ্ক্ষিণঃ
শ্রীঅক্ষয়কুমার শর্ম্মণঃ।"

সুবিখ্যাত বাগ্মী স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'বেঙ্গলী' সংবাদপত্রে (৩রা ফেব্রুয়ারী ১৯০৬) প্রকাশিত হইয়াছিল:

"...both from the dramatic and the literary point of view, *Siraj-ud-Dowla* is destined to occupy a high and an enduring place in our national literature. As a piece for the stage it is *non pareil*; and it requires no mean talent to interpret the diverse and complex characters that the gifted author has marshalled in it. &c."

সুবিখ্যাত 'ষ্টেটস্‌ম্যান' সংবাদপত্রে (১১ই ফেব্রুয়ারী ১৯০৬) বাহির হইয়াছিল :

"The company at this theatre has been playing *Seraj-ud-Dowlah*, by G. C. Ghose, for the past five months with unabated success. The author himself takes the part of Karim Chacha, Clive is represented by Mr. K. Mitter, and the remaining characters are well placed. &c."

রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত জলধর সেন তৎ-সম্পাদিত 'বসুমতী' সংবাদপত্রে (৫ই ফাল্গুন ১৩১২ সাল) লিখিয়াছিলেন :

"কবিবর শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় 'সিরাজদ্দৌলা' অবলম্বন করিয়া যে নাটক লিখিয়া অভিনয় করিতেছেন, তাহা সাহিত্যে চিরজীবী হইয়া থাকিবে। ইতিহাসের সিরাজদ্দৌলা সেকালের মানুষ, তাহাকে একালের লোক ভাল করিয়া বুঝিতে পারে নাই। নাটকের সিরাজদ্দৌলাকে সকলেই বুঝিতে পারিয়াছে। যাঁহারা অভিনয় দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারাই তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছেন। ইতিহাস বড় গম্ভীর, বড় সুসংযত, বড় শৃঙ্খলাবদ্ধ। নাটক সেরূপ নহে। তাহাতে সত্যের সহিত কল্পনা মিশাইয়া গিরিশবাবু আসল কথা ফুটাইয়া তুলিয়া, সিরাজদ্দৌলাকে রক্তমাংসের মানুষের মত লোকসমক্ষে দাঁড় করাইয়া দিয়াছেন।...করিমচাচা এবং তাহার জহরা চাচী কবি-কল্পনা হইয়াও, ইতিহাস ধরিয়াই ফুটিয়া উঠিয়াছে।...গিরিশবাবু ইতিহাসের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন, নিরঙ্কুশ অধিকারের দোহাই দিয়া, কালি ঢালিয়া ইতিহাস বিকৃত করেন নাই।" ইত্যাদি।

প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাস এম. এ. মহাশয় তাঁহার 'সময়' সংবাদ-পত্রে (১৮ই ফাল্গুন ১৩১২ সাল) লিখিয়াছিলেন :

"...অভিনয় দেখিয়া আমরা অপর্য্যাপ্ত আনন্দলাভ করিয়াছি। সাহিত্য, ইতিহাস ও নাট্য, এই তিনের এমন উৎকৃষ্ট সমবায় আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখি নাই।... রাজ্যাভিষেকের পর সিরাজদ্দৌলার অল্পবয়স্কতা-জনিত মানসিক অস্থিরতামাত্র ছিল, তাঁহার আর কোন দোষ ছিল না, বরং তিনি দয়ার্দ্র, ক্ষমাশীল ও প্রজাহিতৈষী ছিলেন; কেবল শত্রুপক্ষ এবং বিশ্বাসঘাতক বন্ধুবর্গ তাঁহাকে চারিদিক হইতে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তাঁহার শোচনীয় পরিণামসাধন করিয়াছিল। 'সিরাজদ্দৌলা' দেখিবার সময় পাশ্চাত্য নাট্য-রাজেশ্বর সেক্‌সপীয়রের 'দ্বিতীয় রিচার্ড' নাটক আমাদের স্মৃতি-পথে উদিত হইয়াছিল। সেই নাট্যেও বিশ্বাসঘাতক আত্মীয়বর্গ ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় রিচার্ডের রাজ্য গ্রাস ও হত্যা করিয়াছিল। কিন্তু তদপেক্ষা গিরিশবাবুর কল্পনা অধিকতর মনোহর হইয়াছে। তিনি যে এক হোসেনকুলী খাঁর প্রতিহিংসা-পরায়ণা স্ত্রীরূপে জহরার সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা অতি বিচিত্র ও তৎ-সহিত মহা ভয়ানক হইয়াছে। সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের নিয়ম ধরিলে জহরাকেই আলোচ্য নাট্যের নায়িকা বলিতে হয়। এই রমণীই সমস্ত ঘটনার অন্যতম মূল ও প্রধান চালক। নাট্যের সর্ব্বপ্রধান ব্যক্তি সিরাজদ্দৌলার অংশ এত স্বাভাবিক ও সুন্দরভাবে অভিনীত হইয়াছিল যে, অনেক

সময়ে আমাদের ভ্রম হইয়াছিল যে বুঝি অভিনয়ের পরিবর্তে বা সত্য ঘটনা দেখিতেছি। বিশ্বাসঘাতকতা, মারামারি ও কাটাকাটির মধ্যে নবাব-মহিষী লুৎফ-উন্নিসার সুন্দর কোমল অংশ অতি মনোরম হইয়াছিল। অন্যান্য অংশগুলিও যথা-যোগ্যভাবে অভিনীত হইয়াছিল। সঙ্গীত-প্রিয়দের জন্য কয়েকটী উত্তম গীতও ছিল।"

হাঁপানী পীড়ার সূত্রপাত

'বলিদান' ও 'সিরাজদ্দৌলা' নাটক রচনায় এইসময়ে গিরিশচন্দ্রের যশঃপ্রভা যেমন উজ্জ্বলতর হইয়া সমগ্র বঙ্গদেশকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিতেছিল, তেমনি অপরদিক হইতে অত্যধিক শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমে দুরন্ত হাঁপের পীড়া করালরূপ ধারণ করিয়া কবির দেহে ধীরে-ধীরে প্রবেশ-লাভ করিতেছিল। ভাদ্র মাসে (১৩১২ সাল) 'সিরাজদ্দৌলা' অভিনীত হয়। এই বৎসর হেমন্ত ঋতুর প্রারম্ভে তিনি হাঁপানী পীড়ায় প্রথম আক্রান্ত হন। এই অসুস্থ অবস্থায়ও বড়দিনের নিমিত্ত তিনি 'বাসর' রচনা করিয়াছিলেন

'বাসর'

'বাসর' আর্য্যরাজ-মহিমা-কীর্ত্তিত একখানি গীতপ্রধান নাটক। রাজা বিক্রমাদিত্য-সংক্রান্ত একটী উপকথা অবলম্বনে গ্রন্থখানি রচিত। রাজার কর্ত্তব্য, সতীর পতিভক্তি, ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম ও সত্যনিষ্ঠা ইত্যাদি প্রাচীন ভারতের গৌরবচিত্র ইহাতে উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত হইয়াছে।

১১ই পৌষ (১৩১২ সাল) বড়দিন উপলক্ষ্যে এই নাটকখানি 'মিনার্ভা থিয়েটারে' প্রথম অভিনীত হয়। প্রথমাভিনয় রজনীর অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ:

বিক্রমাদিত্য	তারকনাথ পালিত।
মন্ত্রী	মণীন্দ্রনাথ মণ্ডল (মণ্টুবাবু)।
গঙ্গাধর	খগেন্দ্রনাথ সরকার।
বিষ্ণুপদ	শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী।
শূরধ্বজ	শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঘোষ।
অধ্যাপক ও নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ	নীলমাধব চক্রবর্ত্তী।
জগন্নাথ	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু)।
বিধাতাপুরুষ	অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী।
পুরোহিত	শ্রীঅতুলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।
সন্ন্যাসী	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দে।

বাদ্যকর	শ্রীহরিদাস দত্ত।
রাণী ও যত্নী	শ্রীমতী প্রকাশমণি।
বিম্বাবতী	সুশীলাবালা।
ব্রাহ্মণী	শ্রীমতী তারাসুন্দরী।
সুমতি	শ্রীমতী শশীমুখী।
সরস্বতী	শ্রীমতী ভূষণকুমারী (ছোট)।
পুরোহিত-পত্নী	শ্রীমতী চপলাসুন্দরী।
অধ্যাপক-পত্নী	নগেন্দ্রবালা।
সূতিকার ঝি	নগেন্দ্রবালা (পটলের দিদি)। ইত্যাদি।
সঙ্গীত-শিক্ষক	শ্রীদেবকণ্ঠ বাগচি।
নৃত্য-শিক্ষক	শ্রীসাতকড়ি গঙ্গোপাধ্যায়।
রঙ্গভূমি-সজ্জাকর	শ্রীকালীচরণ দাস।

হাঁপানী পীড়ায় গিরিশচন্দ্র থিয়েটারে আসিতে অক্ষম হওয়ায় নাট্যাচার্য্য অর্দ্ধেন্দুশেখর ইহার শিক্ষাপ্রদান করেন। নাটকে যথেষ্ট হাস্যরস, এবং বিক্রমাদিত্য ও বিম্বাবতী চরিত্রের বিশেষত্ব সত্বেও 'বাসর' রঙ্গশালায় স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই।

'দুর্গেশনন্দিনী'

গিরিশচন্দ্র কর্তৃক নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া 'ন্যাসান্যাল থিয়েটারে' 'দুর্গেশনন্দিনী'র প্রথম অভিনয় হয়, বিংশ পরিচ্ছেদে পাঠকগণ তাহা জ্ঞাত আছেন। পাণ্ডুলিপি রক্ষিত না হওয়ায় গিরিশচন্দ্র পুনরায় ইহা নাট্যাকারে গঠিত করেন এবং আবশ্যকমত কয়েকটী নূতন দৃশ্য এবং কয়েকখানি গানও ইহাতে সংযোজিত করিয়াছিলেন।

২৭শে মাঘ (১৩১২ সাল) 'মিনার্ভা থিয়েটারে' 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রথম অভিনীত হয়। প্রথমাভিনয় রজনীর অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ :

বীরেন্দ্রসিংহ	গিরিশচন্দ্র ঘোষ।
বিদ্যাদিগ্‌গজ	অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী।
জগৎসিংহ	তারকনাথ পালিত।
ওসমান	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু)।
কতলু খাঁ	মণীন্দ্রনাথ মণ্ডল (মণ্টুবাবু)।
অভিরাম স্বামী	নীলমাধব চক্রবর্ত্তী।
তিলোত্তমা	শ্রীমতী প্রকাশমণি।
—(২য় রজনী হইতে)	সুশীলাবালা।
বিমলা	তিনকড়ি দাসী।

আয়েষা — শ্রীমতী তারাসুন্দরী।
আশমানি — শ্রীমতী চপলাসুন্দরী। ইত্যাদি।

গিরিশচন্দ্র যেরূপ নিপুণতার সহিত 'দুর্গেশনন্দিনী'র চরিত্রগুলি নাটকে ফুটাইয়াছিলেন, স্বনামপ্রসিদ্ধ অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ কর্তৃক অভিনীত হওয়ায় তাহার অভিনয়ও সেইরূপ উৎকৃষ্ট হইয়াছিল। বীরেন্দ্রসিংহ স্বয়ং গিরিশচন্দ্র—বধ্যভূমে ক্ষত্রিয়োচিত তেজ এবং গর্ব্বে মৃত্যু আলিঙ্গন—একটী দেখিবার জিনিষ। অর্দ্ধেন্দুবাবু—আসল কি নকল বিদ্যাদিগ্‌গজ—অভিনয়ে তাহা নির্ণয় করা কঠিন হইয়াছিল। বিশেষ আহারে বসিয়া আশমানির সমক্ষে তাঁহার জলপানের ভঙ্গি—গলনালি সঞ্চালনের অভিনয় এত স্বাভাবিক হইয়াছিল—যে তাহা প্রশংসার অতীত। বঙ্কিমচন্দ্র বিমলার চরিত্র যেরূপ পরিকল্পনা করিয়াছিলেন, তিনকড়ির অভিনয়-চাতুর্য্যে সেই চিত্রই পরিস্ফুট হইয়াছিল। জগৎসিংহ, অভিরাম স্বামী, তিলোত্তমা ও আশমানির ভূমিকাভিনয়েও কৃতিত্ব প্রকাশ পাইয়াছিল। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবলাভ করিয়াছিলেন সুরেন্দ্রবাবু এবং শ্রীমতী তারাসুন্দরী। ওসমান ও আয়েষার ভূমিকায় ইঁহারা উভয়ে যেরূপ সূক্ষ্ম কলাজ্ঞানের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা অতুলনীয়। এখনও পর্য্যন্ত 'দুর্গেশনন্দিনী' অভিনয়ে ইঁহাদের নাম বিজ্ঞাপিত হইলে রঙ্গালয়ে আশাতীত দর্শক-সমাগম হয়। গিরিশচন্দ্র কর্তৃক নাটকাকারে গঠিত এই 'দুর্গেশনন্দিনী'র সকল থিয়েটারেই অভিনয় হইয়া থাকে। একখানি গীত নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

জগৎসিংহের উদ্দেশ্যে আয়েষা :

"যার ছবি দিবানিশি, যতনে হৃদয়ে রাখো,
আপন ভুলিয়া মন, তার সুখে সুখী থাকো।
করিয়াছ প্রেমদান, চাহনি তো প্রতিদান,
তবে কেন হীনপ্রাণ, সলিলে নয়ন ঢাকো।
দেখিতে সে মুখে হাসি, সতত তুমি প্রয়াসী,
হ'য়ে তারি অভিলাষী, সাধে বাদ সেধোনাকো।"

'মীরকাসিম'

'সিরাজদ্দৌলা' অভিনয়ে আশাতীত কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়া গিরিশচন্দ্র পুনরায় 'মীরকাসিম' ঐতিহাসিক নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হন। অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে লিখিত হইয়াছে, "'সিরাজদ্দৌলা', 'মীরকাসিম', 'ছত্রপতি শিবাজী' প্রভৃতি প্রকৃত ঐতিহাসিক নাটক বহুকাল পরে রচিত হয়। যথাসময়ে তাহার আলোচনা করিব।" বাস্তবিক ইতিহাস অক্ষুণ্ণ রাখিয়া এই তিনখানি নাটক রচনায় তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা পাইয়াছিলেন, এবং তাঁহার পরিশ্রমও সার্থক হইয়াছিল। 'সিরাজদ্দৌলা' রচনার পর হইতেই স্বদেশী যুগের প্রবর্ত্তন। এই যুগে 'মীরকাসিম' লিখিত হওয়ায় বহুল পরিমাণে স্বদেশীভাব

ইয়াতে প্রতিফলিত হইয়াছিল।

২রা আষাঢ় (১৩১৩ সাল) 'মীরকাসিম' 'মিনার্ভা থিয়েটারে' প্রথম অভিনীত হয়। প্রথমাভিনয় রজনীর অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ :

মীরজাফর	গিরিশচন্দ্র ঘোষ।
মীরকাসিম	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু)।
সুজাউদ্দৌলা ও লাল সিং	মণীন্দ্রনাথ মণ্ডল (মণ্টুবাবু)।
সাহ্ আলম ও আমিয়ট	N. Banerjee (Amateur)।
আলী ইব্রাহিম	তারকনাথ পালিত।
সামসেরউদ্দিন ও ডাক্তার ফুলারটন	শ্রীমন্মথনাথ পাল (হাঁদুবাবু)।
তকী খাঁ	শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঘোষ।
মহম্মদ আমীন	শ্রীউপেন্দ্রনাথ বসাক।
হায়বতুল্লা ও আরাব আলী	শ্রীজীবনকৃষ্ণ পাল।
ফৌজদার-দূত	শ্রীননিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।
জগৎশেঠ মহতাবচাঁদ ও সমরু	পণ্ডিত শ্রীহরিভূষণ ভট্টাচার্য্য।
জগৎশেঠ স্বরূপচাঁদ	শ্রীছুটবিহারী মিত্র।
রায়দুর্লভ, কৃষ্ণচন্দ্র ও সলিমান	জ্ঞানকালী চট্টোপাধ্যায়।
রাজবল্লভ ও মহম্মদ ইসাখ	পান্নালাল সরকার।
রামনারায়ণ ও আলম খাঁ	শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।
নন্দকুমার	শ্রীসাতকড়ি গঙ্গোপাধ্যায়।
ভ্যান্সিটার্ট	অটলবিহারী দাস।
হলওয়েল, হে ও মেজর অ্যাডম্স্	অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী।
হেষ্টিংস	শ্রীমতী প্রকাশমণি।
ইলিস, ব্যাটসন ও মনরো	শ্রীক্ষেত্রমোহন মিত্র।
মাঝি	মন্মথনাথ বসু।
কেন্ড ও জোন্স	শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী।
জন কার্ণাক	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দে।
গুরগিন খাঁ	খগেন্দ্রনাথ সরকার।
খোজা পিক্রু	শ্রীহরিদাস দত্ত।
খোজা, বাজিদ ও জাফর খাঁ	শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।
মণি বেগম	শ্রীমতী সুধীরাবালা (পটলা)।
বেগম	সুশীলাবালা।
তারা	তিনকড়ি দাসী। ইত্যাদি।
শিক্ষক	গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী।
সঙ্গীত-শিক্ষক	শ্রীতারাপদ রায়।

'সিরাজদ্দৌলা'র ন্যায় 'মীরকাসিমে'র অভিনয়ও সর্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল। এই দুইখানি নাটকই গিরিশচন্দ্রের শেষজীবনের বিজয়-বৈজয়ন্তী। নবাব সিরাজদ্দৌলা ও নবাব মীরকাসিমের পতন এবং বঙ্গে ইংরাজ-রাজশ্রীর প্রথম অভ্যুদয়ের ইতিহাস এই নাটক দুইখানিতে যেরূপ পরিস্ফুট — তৎ-সঙ্গে নাট্য-সৌন্দর্য্যও সেইরূপ পরিপুষ্ট। 'মীরকাসিম' নাটক একাদিক্রমে সাত মাস কাল ধরিয়া প্রত্যেক শনিবারে 'মিনার্ভা'য় অভিনীত হইয়াছিল, অথচ উহা কাহারও নিকট আদৌ পুরাতন হয় নাই। দর্শক-সমাগমে ইহা 'সিরাজদ্দৌলা'কেও অতিক্রম করে। এই বৎসর 'মিনার্ভা থিয়েটারে'র আয় লক্ষাধিক হইয়াছিল।

অভিনেত্রী-সংসর্গে বঙ্গ-নাট্যশালা দূষিত বলিয়া যে সম্প্রদায়-বিশেষ থিয়েটারের নামে নাসিকা কুঞ্চিত করিতেন, তাঁহাদের মধ্যে বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিই এই দুই নাটকের অভিনয় দেখিবার জন্য থিয়েটারে পদার্পণ করেন।

১৯১১ খ্রী, ১৮ই জানুয়ারী তারিখে গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক 'মীরকাসিম' নাটকের অভিনয় ও প্রচার বন্ধ হয়। এ নিমিত্ত এতদ্-সম্বন্ধে আমরা বিশদ সমালোচনা না করিয়া তৎসাময়িক কয়েকখানি সংবাদপত্রের মন্তব্য মাত্র উদ্ধৃত করিলাম :

"Babu Girish Chandra Ghose's new historical drama, *Mir Kasem*, which was put on the boards of the Minerva Theatre for the first time on Saturday last, has been a phenomenal success, both from the histrionic and literary points of view. The tumultuous period that followed the accession of Mir Kasem to the throne, the strenuous fight that the ruler had with the East India Company for the protection of the indigenous industries and the various stratagems resorted to by both sides to win their points, how, with remarkable fidelity and consummate art, been portrayed by Bengal's greatest playwright. The piece abounds with diverse and complex characters, all of them very skillfully marshalled to produce an excellent stage effect, which one must see to fully realise it. &c." *Bengalee*, 23rd June 1906.

"গিরিশবাবু তাঁহার পরিণত বয়সের সকল শক্তি ও আগ্রহ, তাঁহার অদম্য উৎসাহ ও অনন্যসাধারণ লিপিকুশলতার সহায়তায় এই নাটকখানিকে তাঁহার স্বকীয় কীর্ত্তি-স্তম্ভে পরিণত করিয়াছেন ; এই স্তম্ভের বনিয়াদ হইতে চূড়া পর্য্যন্ত স্বদেশ-প্রেমের পাকা সোনায় গঠিত।...গিরিশবাবুর রচনা-কৌশলে মুগ্ধ হইয়াছি, অভিনয়ের পারিপাট্যে পরিতৃপ্ত হইয়াছি। ইতিহাসে পাঠ করিয়াছি, মীরকাসিম প্রজা হিতৈষী নরপতি ছিলেন, ইংরাজ বণিকের কর্ম্মচারীর হস্তের ক্রীড়াপুত্তলিকা হইয়া তিনি নবাবী করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না, তাই তিনি ইংরাজের সঙ্গে লড়িয়াছিলেন, হটিয়াছিলেন ও শেষে সর্ব্বস্ব বঞ্চিত হইয়া নিরাশ্রয় অনাথের ন্যায় মরিয়াছিলেন। এই কথাটুকু অবলম্বন করিয়া

এমন একখানি বিচিত্র ও বিপুল নাটক গিরিশবাবু ভিন্ন অন্য কেহ রচনা করিতে পারিবেন কিনা জানি না।" ইত্যাদি। 'বসুমতী', ৩০শে আষাঢ়, ১৩১৩ সাল।

"The exceedingly lavish manner in which *Mir Kasem* has been staged at the Kohinoor assists materially in enhancing the enjoyment of this piece, which deals with the incidents of the tumultuous period that followed the accession of Mir Kasem to the throne and the strenuous fight that the ruler had with the East India Company for the protection of indigenous industries. The acting all round reaches a high water mark of excellence, and the huge audience testified their appreciation in a most unmistakable manner." *Statesman*, 17th November 1907.

'য্যায়সা-কা-ত্যায়সা'

১৩১৩ সালের হেমন্তাগমে অর্থাৎ কার্ত্তিক মাসের প্রারম্ভেই গিরিশচন্দ্র পুনরায় হাঁপানী পীড়ায় আক্রান্ত হন। শীতকালে দারুণ যন্ত্রণায় যখন তিনি গৃহে আবদ্ধ, সেই সময়ে বড়দিনের কিয়দ্দিবস পূর্ব্বে 'মিনার্ভা'র কর্ত্তৃপক্ষগণ একদিন তাঁহাকে দেখিতে আসিয়া দুঃখপ্রকাশ করিয়া বলিলেন, "মহাশয়, সব থিয়েটারে নূতন বই হইতেছে, আপনি পীড়িত, আমরা কিছুই করিতে পারিলাম না।" সেই রুগ্ন অবস্থায় গিরিশচন্দ্র বলিলেন, "ভাবিবেন না, যাহা হোক কিছু একটা করিয়া দিব।" সেইদিনই তিনি সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী নাট্যকার মলিয়ারের গ্রন্থাবলী পড়িতে আরম্ভ করিলেন এবং কয়েক দিবসের মধ্যেই মলিয়ারের *L' Amour Medicin* অবলম্বনে 'য্যায়সা-কা-ত্যায়সা' প্রহসন রচনা করিয়া বড়দিনের নূতন প্রহসনের অভাব পূর্ণ করিলেন।*

১৭ই পৌষ (১৩১৩ সাল) 'মিনার্ভা থিয়েটারে' 'য্যায়সা-কা-ত্যায়সা' প্রথম অভিনীত হয়। প্রথমাভিনয় রজনীর অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ :

হারাধন	অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী।
রসিক	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু)।
সনাতন	অটলবিহারী দাস।
মাণিক	শ্রীনৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু।
মিঃ নন্দী	শ্রীক্ষেত্রমোহন মিত্র।

* গিরিশচন্দ্রের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করিয়া তৎপরে সুপ্রসিদ্ধ গীতিনাট্যকার স্বর্গীয় অতুলকৃষ্ণ মিত্র মহাশয় মলিয়ারের গ্রন্থ অবলম্বনে 'তুফানী', 'ঠিকে ভুল', 'রঙ্গরাজ' প্রভৃতি অনেকগুলি গীতিনাট্য ও প্রহসন রচনা করেন এবং তাহা সুখ্যাতির সহিত 'মিনার্ভা'য় অভিনীত হয়।

মিঃ ঢোল	শ্রীহরিদাস দত্ত।
হোমিওপ্যাথি ডাক্তার	শ্রীদেবকণ্ঠ বাগচী।
রত্নমালা	শ্রীমতী হেমন্তকুমারী।
গরব	সুশীলাবালা। ইত্যাদি।
শিক্ষক	গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী।
সঙ্গীত-শিক্ষক	শ্রীদেবকণ্ঠ বাগচী।
নৃত্য-শিক্ষক	শ্রীনৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু।
রঙ্গভূমি-সজ্জাকর	শ্রীকালীচরণ দাস।
বংশীবাদক ও ঐক্যতান বাদনাধ্যক্ষ	শ্রীঅমৃতলাল ঘোষ।

প্রহসনখানি দর্শকমণ্ডলীর বিলক্ষণ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল, এ নিমিত্ত 'য্যায়সা-কা-ত্যায়সা' বহুদিন পর্য্যন্ত রঙ্গমঞ্চ অধিকার করিয়াছিল। প্রায় সকল থিয়েটারেই ইহার অভিনয় হইয়া থাকে। গ্রন্থখানি গিরিশচন্দ্র তাঁহার পিতৃষ্বসেয় শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসুর নামে উৎসর্গীকৃত করেন। যথা :

"স্নেহাস্পদ শ্রীমান দেবেন্দ্রনাথ বসু।

ভায়া,—তোমার উদ্যোগ ও সাহায্য ব্যতীত শয্যাশায়ী অবস্থায় এ প্রহসনখানি লিখিতে পারিতাম না। তুমি চিরদিনই আমার সহায়, এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি তোমার নামে উৎসর্গীকৃত করিয়া আমি যে তৃপ্ত, তাহা নহে। তবে তোমারই সাহায্যে এই গ্রন্থখানি রচিত হইয়াছে, এ নিমিত্ত ইহার সহিত তোমার নাম জড়িত থাকে, ইহাই আমার অভিপ্রায়। ইতি

আশীর্ব্বাদক
শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ।"

ষড়চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

'কোহিনুরে' গিরিশচন্দ্র

বসন্তাগমে রোগমুক্ত হইয়া গিরিশচন্দ্র সুপ্রসিদ্ধ সংবাদপত্র-সম্পাদক পণ্ডিত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি কয়েকটি সুহৃদের উৎসাহে 'মহম্মদ সা' (অর্থাৎ নাদির সার ভারত আক্রমণ) নাটক লিখিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু 'সিরাজদ্দৌলা'র সহিত কল্পিত নাটকের ঘটনা ও চরিত্রগত বিস্তর সৌসাদৃশ্য দেখিয়া প্রথম দুই অঙ্ক রচনার পর, উহা পরিত্যাগ করেন এবং 'ছত্রপতি শিবাজী' নাটক লিখিতে প্রবৃত্ত হন। নাটক রচনা শেষ হইলে জ্যৈষ্ঠ মাস (১৩১৪ সাল) হইতে 'মিনার্ভা থিয়েটারে' তাহার শিক্ষাদান-কার্য্য আরম্ভ হয়।

এই বৎসরের প্রারম্ভে বৈশাখ মাসে নদীয়া কুড়ুলগাছির বিদ্যোৎসাহী জমীদার, হাইকোর্টের উকীল, পণ্ডিতবর প্রসন্নকুমার রায় এম. এ., বি. এল. মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র বাবু শরৎকুমার রায় বি. এ. এক লক্ষ আট হাজার টাকায় প্রকাশ্য নিলামে স্বর্গীয় গোপাললাল শীলের 'এমারেল্ড থিয়েটার' ক্রয় করেন। ইতিপূর্ব্বে এই থিয়েটার-বাটী ভাড়া লইয়া 'ক্লাসিক থিয়েটার' সম্প্রদায় অভিনয় করিতেন। শরৎবাবু থিয়েটার কিনিয়া কার্য্য-সুশৃঙ্খলার নিমিত্ত একজন উপযুক্ত অধ্যক্ষের বিশেষরূপ অভাব অনুভব করিতে লাগিলেন। তাঁহার পিতা প্রসন্নবাবু বহুদর্শী ও বিচক্ষণ ছিলেন। তিনি শরৎবাবুর নিকট গিরিশচন্দ্রের নাম উল্লেখ করিয়া বলেন, "যদি আদর্শ নাট্যশালা স্থাপন করিতে চাও, তাহা হইলে তাঁহার ন্যায় উপযুক্ত ব্যক্তির হস্তে কার্য্যভার অর্পণ কর।" উদ্যোগশীল শরৎবাবু দশ হাজার টাকা বোনাস ও চারিশত টাকা মাসিক বেতন দিয়া গিরিশচন্দ্রকে অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত করিলেন। নবপ্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়ের নাম হইল 'কোহিনুর থিয়েটার'।

আষাঢ় মাসের শেষে গিরিশচন্দ্র কার্য্যভার গ্রহণ করেন। তিনি যখন যোগদান করিলেন, তখন বাটীর সংস্কারকার্য্যও শেষ হয় নাই; দৃশ্যপট, পোষাক-পরিচ্ছদ, সাজ-সরঞ্জাম প্রভৃতি সকলই অভাব। সুবিখ্যাত নাট্যকার পণ্ডিত স্বর্গীয় ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় 'চাঁদবিবি' নাটক লিখিতেছেন, তাহারও শেষাঙ্ক তখন অসম্পূর্ণ। গিরিশচন্দ্রের বিপুল উদ্যমে ও পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্য্যবেক্ষণে অনিয়মপ্রক্ষিপ্ত সকল কার্য্য সুশৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া উঠিল। কার্য্যের সত্বরতাবশতঃ 'চাঁদবিবি'র বাকী অংশ তিনি স্বয়ং লিখিয়া অভিনয়োপযোগী করিয়া লইলেন এবং দিবারাত্র রিহারস্যাল দিয়া সম্প্রদায়কে সুশিক্ষিত করিয়া তুলিলেন। বঙ্গ-নাট্যশালার আদি ষ্টেজ-ম্যানেজার

ধর্ম্মদাসবাবু, গিরিশচন্দ্রের উপদেশ ও সাহায্যে দ্বিগুণ উৎসাহে বাটীর সংস্কারকার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন, সকলদিকেরই সুব্যবস্থা হইল। সম্প্রদায়স্থ সকলেই গিরিশচন্দ্রের উৎসাহে উৎসাহান্বিত, যে কোন উপায়ে দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়া শ্রাবণ মাসের মধ্যেই থিয়েটার খুলিতে হইবে, কারণ—কোনও শুভ কার্য্যানুষ্ঠান ভাদ্র মাসে হিন্দুর পক্ষে নিষিদ্ধ। আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইলে স্বত্বাধিকারীকে বিস্তর ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু কর্ম্মবীর গিরিশচন্দ্রের নিকট কোন কার্য্যই অসাধ্য নহে, আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া পলিতকেশ বৃদ্ধ, যুবকের ন্যায় অহোরাত্র পরিশ্রম করিতেছেন দেখিয়া সকলেই পরমোৎসাহে স্ব-স্ব কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। ২৬শে শ্রাবণ, রবিবার, 'কোহিনুর থিয়েটার' মহাসমারোহে খোলা হইল। ক্ষীরোদবাবুর 'চাঁদবিবি' এই রাত্রে প্রথম অভিনীত হয়। সুবিখ্যাত প্রফেসর স্বর্গীয় দক্ষিণাচরণ সেন মহাশয় গিরিশচন্দ্রের উৎসাহে, তাঁহার সম্প্রদায় লইয়া 'চাঁদবিবি' নাটকের গীতগুলি সুদক্ষতার সহিত ঐক্যতানবাদনের সহিত গঠিত করিয়া বঙ্গ-নাট্যশালার দর্শকগণকে নূতনত্ব প্রদর্শনে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। প্রথম অভিনয় রজনীতে ২২৫০৲ টাকার টিকিট বিক্রয় হইয়াছিল।

'ছত্রপতি শিবাজী'

এইসময়ে ৩২শে শ্রাবণ (১৩১৪ সাল) গিরিশচন্দ্রের 'ছত্রপতি শিবাজী' 'মিনার্ভা থিয়েটারে' প্রথম অভিনীত হয়। গিরিশচন্দ্র তৃতীয় অঙ্ক পর্য্যন্ত এই নাটকের শিক্ষাদান করিয়া 'কোহিনুরে' যোগদান করিয়াছিলেন। প্রথিতযশা স্বর্গীয় অমরেন্দ্রনাথ দত্ত তৎপরে 'মিনার্ভা'র অধ্যক্ষপদ গ্রহণ করিয়া শেষ দুই অঙ্কের অভিনয়-শিক্ষা সম্পূর্ণ করেন। প্রথমাভিনয় রজনীর অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ:

শিবাজী	অমরেন্দ্রনাথ দত্ত।
দাদোজী কোণ্ডদেব ও সায়েস্তা খাঁ	নীলমাধব চক্রবর্ত্তী।
রামদাস স্বামী	শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঘোষ।
শম্ভাজী	শ্রীমতী শশীমুখী (শিশু) ও শ্রীধীরেন্দ্রনাথ সিংহ (যুবা)
তানাজী	শ্রীপ্রিয়নাথ ঘোষ।
গঙ্গাজী	শ্রীনৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু।
ফেরঙ্গজী, খোবান খাঁ ও পোলাদ	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দে।
মোরোপন্ত	শ্রীরামকালী বন্দ্যোপাধ্যায়।
সূর্য্যাজী	শ্রীসিতাংশুজ্যোতি মজুমদার (রকুবাবু)।
আফজল খাঁ	N. Banerjee (Amateur)।

শম্ভাজী, মোহিতে, পূজারী ও জমাদার	অক্ষয়কুমার চক্রবর্ত্তী
মল্লিকজী ও মুলানা আহম্মদ	শ্রীহরিদাস দত্ত।
কৃষ্ণাজীপন্ত	অনুকূলচন্দ্র বটব্যাল (অ্যাকাস)।
আওরঙ্গজেব	তারকনাথ পালিত।
জাফর খাঁ	শ্রীসতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
দিলির খাঁ	শ্রীঅহীন্দ্রনাথ দে।
রামসিংহ ও উদয়ভানু	শ্রীহীরালাল চট্টোপাধ্যায়।
আবুল ফতে খাঁ	শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।
জিজাবাই	শ্রীমতী প্রকাশমণি।
সইবাই	শ্রীমতী কুসুমকুমারী।
পুতলাবাই	সুশীলাবালা।
লক্ষ্মীবাই	শ্রীমতী সুধীরাবালা (পটল)।
বিজাপুর বেগম	শ্রীমতী পান্নাসুন্দরী।
মুলানা আহম্মদের পুত্রবধূ	শ্রীমতী বাঁকারাণী। ইত্যাদি।
সঙ্গীত-শিক্ষক	শ্রীদেবকণ্ঠ বাগচী ও শ্রীতারাপদ রায়।
নৃত্য-শিক্ষক	শ্রীনৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু।
রঙ্গভূমি-সজ্জাকর	শ্রীকালীচরণ দাস।

'মীরকাসিমের'র ন্যায় 'ছত্রপতি শিবাজী'ও স্বদেশীযুগে রচিত হওয়ায় বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চের উপর অসামান্য প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। তিন সপ্তাহের পর ২৮শে ভাদ্র হইতে 'কোহিনুর থিয়েটারে'ও 'ছত্রপতি শিবাজী'র অভিনয় আরম্ভ হয়। উভয় থিয়েটারে এই নাটকের অভিনয় লইয়া নাট্যজগতে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। 'কোহিনুরে' আওরঙ্গজেব, শিবাজী, গঙ্গাজী, জিজিবাই, লক্ষ্মীবাই প্রভৃতি ভূমিকা গ্রহণে গিরিশচন্দ্র, দানিবাবু, হাঁদুবাবু, তিনকড়ি দাসী, শ্রীমতী তারাসুন্দরী প্রভৃতি রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হওয়ায় অভিনয় যে অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। প্রতিযোগিতায় অভিনয়-নৈপুণ্য-প্রদর্শনে উভয় থিয়েটারই ন্যূনাধিক সুখ্যাতিলাভ করিয়াছিল। সে সময়ে এমন একখানি সংবাদপত্র ছিল না, যাহার স্তম্ভ 'ছত্রপতি'র সুখ্যাতিতে পরিপূর্ণ না হইয়াছিল। উভয় থিয়েটারের অভিনয় তুলনায় 'বঙ্গবাসী'তে একটা দীর্ঘ সমালোচনা বাহির হইয়াছিল। তন্মধ্যে গিরিশচন্দ্রের আওরঙ্গজেব-ভূমিকাভিনয় সম্বন্ধে এক ছত্র এই, "তাঁহারই তুলনা তিনি এ মহীমণ্ডলে।"

১৯১১ খ্রী, জানুয়ারী মাসে গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক 'ছত্রপতি শিবাজী'রও অভিনয় এবং প্রচার নিষিদ্ধ হয়। এ নিমিত্ত এ নাটক সম্বন্ধেও আমরা কোনও আলোচনা করিব না। কেবল শিবাজীর তৃতীয়া মহিষী পুতলাবাই চরিত্র বিশেষরূপ উল্লেখযোগ্য বলিয়া তাহার উল্লেখ করিতেছি।

গিরিশচন্দ্র বলিতেন, "প্রেম নর-নারীর তৃতীয় নেত্র উন্মীলিত করে।" ইহার

আভাস 'কালাপাহাড়ে'র চঞ্চলার এবং 'ভ্রান্তি'র রঙ্গলাল্ল গিরিশচন্দ্র কিছু-কিছু দিয়াছেন ; কিন্তু পুতলায় আমরা তাহার পূর্ণবিকাশ দেখিতে পাই। পুতলা সতী, প্রেমবলে পতির ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান তাহার নখ-দর্পণে। পুতলা গিরিশচন্দ্রের অপূর্ব্ব সৃষ্টি!

এ নাটক সম্বন্ধেও আমরা তৎ-সাময়িক কয়েকখানি সংবাদপত্রের মন্তব্য উদ্ধৃত করিলাম:

ভারত-প্রসিদ্ধ স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-কর্ত্তৃক সম্পাদিত 'বেঙ্গলী'তে লিখিত হয়: "Chhatrapati is one of the best and most powerful dramas ever produced on the Indian stage." অর্থাৎ ভারতবর্ষের রঙ্গালয়-সমূহে এ পর্য্যন্ত সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্বাপেক্ষা ওজস্বিতাপূর্ণ যতগুলি নাটক অভিনীত হইয়াছে, 'ছত্রপতি' তাহাদের মধ্যে অন্যতম। মহারাষ্ট্রের সুসন্তান তেজস্বী পণ্ডিত স্বর্গীয় সখারাম গণেশ দেউস্কর তৎ-সম্পাদিত 'হিতবাদী'তে (১১ই আশ্বিন, ১৩১৪ সাল) লিখিয়াছিলেন, "মহারাষ্ট্রীয়েরা ছত্রপতি শিবাজীকে যেরূপ শ্রদ্ধার চক্ষে দর্শন করিয়া থাকেন, গিরিশবাবুর নাটকে তাহা বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। শিবাজীর চরিত্রের বিবিধ সদ্‌গুণ এবং তাঁহার সহচর ও কর্ম্মচারীদিগের চরিত্রের বিশেষত্ব এই নাটকে অতীব দক্ষতার সহিত পরিস্ফুট করা হইয়াছে। জাতীয় অভ্যুদয়ের পক্ষে ঐসকল গুণের প্রয়োজনীয়তার বিষয় চিন্তা করিলে বলিতে হয়, গিরিশবাবু অতি সুসময়েই এই নাটকের প্রচার করিয়াছেন। বাঙ্গালীর জাতীয় ভাব বর্দ্ধন বিষয়ে এই নাটক বিশেষ সহায়তা করিবে বলিয়া আমাদিগের বিশ্বাস।" ইত্যাদি।

রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত জলধর সেন তৎ-সম্পাদিত 'বসুমতী'তে (৪ঠা আশ্বিন, ১৩১৪ সাল) লিখিয়াছিলেন, "তাঁহার উর্ব্বর কল্পনার লীলা কোথাও ইতিহাসের সত্যকে ব্যর্থ বা ক্ষুণ্ণ করে নাই। ক্ষুদ্র লেখক অতিরঞ্জনের প্রলোভনে শিবাজীর প্রকৃত মূর্ত্তি বিকৃত করিয়া ফেলিত, গিরিশবাবু তাহা উজ্জ্বল করিয়া দেখাইয়াছেন। শিবাজীর কনিষ্ঠা মহিষী পুতলীবাই ও স্বদেশভক্ত ব্রাহ্মণ-যুবক গঙ্গাজী গিরিশবাবুর নূতন সৃষ্টি ; ইহারা শিবাজী চরিত্রের দুইটী বিভিন্ন বিশেষত্ব—যেন শিবাজীর অন্তর হইতে মনুষ্য মূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করিয়া কোথাও তাঁহাকে কর্ত্তব্যপথে পরিচালিত করিতেছে, কোথাও মৌন ছায়ার ন্যায় তাঁহার অনুবর্ত্তী হইয়াছে। শিবাজীর অভিনয় দেখিতে-দেখিতে মনে হয়, যেন শিবাজী দেশবিশেষে, যুগবিশেষে জন্মগ্রহণ করেন নাই, ধরাতলে যখন অত্যাচার প্রবল হয়, দরিদ্র উৎপীড়িত হয়, দেবমূর্ত্তি চূর্ণ হয়, সতীলক্ষ্মীগণ পাষণ্ড-হস্তে নিগৃহীতা হন—তখনই সেই দেশকে রক্ষা করিবার জন্য বিধাতা একজন শিবাজীকে ছত্রপতিরূপে প্রেরণ করেন, এইজন্যই শিবাজী শিবশক্তি-সম্ভূত—শঙ্কর-অংশ। গিরিশ-বাবু শিবাজী-জননী জিজিবাইকে যেভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন, এই হতভাগ্য জাতির মাতৃত্বের বরণীয় আদর্শ সেইরূপ মহনীয় হওয়া কর্ত্তব্য। গিরিশবাবু তাঁহার পরিণত বয়সের সংযত কল্পনার সকল শক্তি, সকল জ্যোতিঃ ঢালিয়া এই প্রাতঃস্মরণীয় মহারাষ্ট্র

দেশনায়কের উজ্জ্বল চিরপূজ্য বরণীয় মহনীয় দেবমূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছেন। নাটক কোনরূপেই ইহা অপেক্ষা ইতিহাসের অধিক অনুবর্ত্তী হইত না।" ইত্যাদি।

ইংরাজ-সম্পাদিত 'ষ্টেট্স্‌ম্যান্' সংবাদপত্রে (১৭ই নভেম্বর ১৯০৭ খ্রী) প্রকাশিত হইয়াছিল, "The popularity of Babu Girish Chandra Ghose's powerful drama 'Chhatrapati' which deals with some of the most striking incidents in the life of Shivaji, is manifest from the large audiences which are attracted to the Minerva Theatre on every occasion that this thrilling play is billed. Though it has been running for about ten weeks now the large auditorium was crammed in every part and early in the evening the sale of tickets had to be stopped, the large overflow helping to fill the adjacent play houses. &c."

'কোহিনুরে'র শোচনীয় পতন

বঙ্গ-নাট্যশালার সর্বশ্রেষ্ঠ রত্নগুলির একত্র সমাবেশে, উন্নতির সর্ব্বোচ্চ শিখরে উত্থিত হইয়া, এক বৎসরের মধ্যে 'কোহিনুর থিয়েটারে'র যেরূপ শোচনীয় পতন হইয়াছিল, বোধহয় বঙ্গের কোনও রঙ্গালয়ের ইতিহাসে এরূপ ঘটে নাই।

'কোহিনুর থিয়েটার' খুলিবার অল্পদিন পরেই স্বত্বাধিকারী শরৎবাবুর মাতৃ বিয়োগ হয়। সঙ্গে-সঙ্গে শরৎবাবুও অসুস্থ হইয়া পড়েন। ক্রমশঃ পীড়া বৃদ্ধি হওয়ায় চিকিৎসকের পরামর্শে তিনি মধুপুরে বায়ু পরিবর্ত্তনের নিমিত্ত গমন করেন। দারুণ পরিশ্রমে এবং হেমন্তাগমে গিরিশচন্দ্রও পুনরায় হাঁপানী পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। থিয়েটার খুলিবার ছয় মাস গত হইতে-না-হইতে পৌষ মাসে শরৎবাবুর মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর তিনদিন পরে তাহার পিতৃদেবও স্বর্গারোহণ করেন। শরৎবাবুর মৃত্যুর পর তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার রায়, শরৎবাবুর এষ্টেটের একজিকিউটার হইয়া থিয়েটারের পরিচালনভার গ্রহণ করিলেন। গিরিশচন্দ্রের পীড়া ও শরৎবাবুর অকালমৃত্যুতে 'কোহিনুরে'র অবস্থা অতিশয় বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িল। গিরিশচন্দ্র কোনও নতুন নাটক লিখিবার অবসর পাইলেন না, থিয়েটারের আয়ও ক্রমশঃ কমিতে লাগিল। শিশিরবাবুর পক্ষে এ কাজ নূতন, গিরিশচন্দ্রের সহিত তিনি ইতিপূর্ব্বে পরিচিত ছিলেন না। তিনি পুনরায় স্বাস্থ্যলাভ করিয়া কতদূর আর কার্য্যক্ষম হইবেন, শিশিরবাবুর মনে এই সন্দেহের উদ্রেক হওয়ায় তিনি গিরিশচন্দ্রের বেতন বন্ধ করিয়া দিলেন।

গিরিশচন্দ্র শিশিরবাবুর অভিপ্রায় বুঝিতে পারিলেন না। বসন্তাগমে শরীর কথঞ্চিৎ সুস্থ হইলে তিনি 'ঝাঁসির রাণী' নাটক লিখিতে আরম্ভ করিলেন। দুই অঙ্ক

লেখা শেষ হইবার পর একদিন কোনও উচ্চতম পুলিশ কর্ম্মচারী কথা-প্রসঙ্গে তাঁহাকে ঐতিহাসিক নাটক লিখিতে নিষেধ করিয়া দিলেন। সুতরাং গিরিশচন্দ্র 'ঝান্সির রাণী' লিখিতে বিরত হইয়া একখানি সামাজিক নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। চারি অঙ্ক লেখা শেষ হইলে* দেখিলেন, তাঁহার তিন মাসের বেতন বাকী পড়িয়াছে, পুনঃ-পুনঃ তাগাদা সত্ত্বেও থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষগণ উদাসীন। সুতরাং তাঁহাকে আদালতের আশ্রয় লইতে হইল। শিশিরবাবু এ সময়ে স্বর্গীয় শরৎবাবুর এষ্টেটের দেনা এবং বিশৃঙ্খল থিয়েটার লইয়া বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তিনি বুঝিতে পারিলেন না যে গিরিশচন্দ্রের সহিত সদ্ব্যবহার করিল, সর্ব্বপ্রকারে তাঁহার সাহায্যলাভে পুনরায় তিনি সকল দিক গুছাইয়া লইতে পারিতেন। এই একটী ভুলে গিরিশচন্দ্রের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইল।

আদালতের আশ্রয় লইতে গিরিশচন্দ্রের ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু কোনও সুযোগ্য এটর্নী তাঁহাকে বলেন, যে আপনি যদি নালিশ না করিয়া অন্য থিয়েটারে যোগদান করেন, তাহাহইলে ইহারাই আপনার বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগ করিবে। গিরিশচন্দ্র বুঝিলেন কথা সত্য, তিনি তাঁহার প্রাপ্য বেতন এবং বোনাসের দরুন বাকী চারি হাজার টাকার জন্য হাইকোর্টে মকদ্দমা রুজু করিলেন। বিচারে জয়লাভ করিয়া খরচা সমেত তিনি সমস্ত টাকা প্রাপ্ত হন।

'কোহিনুরে'র সহিত গিরিশচন্দ্রের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইলে, 'ষ্টার থিয়েটার' তাঁহাকে লইবার জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন; কিন্তু 'মিনার্ভা'ও নিশ্চিন্ত ছিল না। 'মিনার্ভা'-পক্ষীয় তীক্ষ্ণবুদ্ধি মহেন্দ্রকুমার মিত্রের একান্ত যত্ন এবং আগ্রহ দর্শনে, শ্রাবণ মাস হইতে গিরিশচন্দ্র পুনরায় 'মিনার্ভা থিয়েটারে' মাসিক চারিশত টাকা বেতন এবং খরচ বাদ থিয়েটারের লাভের পঞ্চমাংশের অধিকারী হইয়া যোগদান করিলেন।

* ১৯১২ খ্রী, ২৭শে জুলাই তারিখে প্রকাশ্য নিলামে 'কোহিনুর থিয়েটার' ঋণের দায়ে বিক্রীত হইয়া যায়। একলক্ষ এগার হাজার টাকায় 'মিনার্ভা থিয়েটারে'র স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত মনোমোহন পাঁড়ে মহাশয় তাহা খরিদ করেন। তাঁহার উৎসাহে এবং সকলের অনুরোধে গ্রন্থকারের পরম স্নেহভাজন ও পরমাত্মীয় পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় উক্ত নাটকের পঞ্চম অঙ্ক লিখিয়া দেন। 'গৃহলক্ষ্মী' নামে এই নাটক 'মিনার্ভা থিয়েটারে' (৫ই আশ্বিন, ১৩১৯ সাল) প্রথম অভিনীত হয়। "পরিশিষ্টে" ইহার বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

সপ্তচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

'মিনার্ভা'য় কর্ম্মজীবনের অবসান
হাঁপানীর আক্রমণ নিবারণের জন্য দুই বৎসর কাশী গমন।

এবার 'মিনার্ভা থিয়েটারে' আসিয়া গিরিশচন্দ্র প্রথমে 'শাস্তি কি শাস্তি ?' নামক সামাজিক নাটক রচনা করেন। ১৩১৫ সালে নানা কারণে কলিকাতায় বিধবা-বিবাহ লইয়া তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়। সেইসময়ে 'মিনার্ভা থিয়েটারে'র কর্ত্তৃপক্ষগণ গিরিশচন্দ্রকে ঐ বিষয় লইয়া একখানি সামাজিক নাটক লিখিতে অনুরোধ করেন। 'বলিদান' নাটক অনুরোধে লিখিতে হইলেও গিরিশচন্দ্রের তাহাতে সম্পূর্ণ সহানুভূতি ছিল, কিন্তু এই বিরাট উত্তেজনার সময়, উত্তেজনার বিষয় লইয়া নাটক লিখিতে তিনি প্রথমতঃ সম্মত হন নাই, কেননা সে রচনা অনেকের মনঃপীড়ার কারণ হইতে পারে। যাহাই হউক কর্ত্তৃপক্ষের সনির্ব্বন্ধ অনুহরাধ তিনি উপেক্ষা করিতে পারিলেন না, এবং পারিলেন না বলিয়াই বঙ্গ-নাট্যসাহিত্যের এই অপূর্ব্ব সম্পদ আমরা লাভ করিয়াছি।

'শাস্তি কি শাস্তি ?'

এই নাটকে গিরিশচন্দ্র বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে কোনও মতামত প্রকাশ করেন নাই। নাটকের শেষে তিনি পাগলের মুখ দিয়া বলিয়াছেন, "বিবেচনা করুন, বিধবা সম্বন্ধে ঋষিদের যেরূপ ব্যবস্থা, তা শাস্তি কি শাস্তি ?" কিন্তু সমাজের প্রতি কৌশলে এই প্রশ্ন প্রয়োগ করিলেও সূক্ষ্মদর্শী পাঠক বা দর্শকের কাছে কবির মনোভাব লুক্কায়িত থাকে না। গিরিশচন্দ্র যে ঋষিদিগের সিদ্ধান্ত এবং আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া লইয়াছিলেন, তাহা সহজেই বুঝা যায়। প্রসন্নকুমারের পুত্রবধূ নির্ম্মলা বলিতেছে, "বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হ'লে ব্রহ্মচারিণী থাক্‌বে না, হিন্দু সমাজের এ গঠন থাক্‌বে না, আর-এক গঠন হবে। বাবা, যে দেশে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত, সে দেশেও যে বিধবা, চিরবৈধব্য-ব্রত গ্রহণ করে, সেই প্রকৃত সতী ব'লে গণ্য।" (২য় অঙ্ক, ৪র্থ গর্ভাঙ্ক।) কিন্তু কন্যার প্রতি মমতার প্রেরণায় প্রসন্নকুমার তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন না। বিশেষতঃ এইসময় তাঁহার বিধবা কন্যা ভুবনমোহিনীর অধঃপতনে তাঁহার সঙ্কল্প দৃঢ়তর হইল। প্রসন্নকুমার বিধবা কন্যা প্রমদার পুনরায় বিবাহ দিলেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে-

হরমণি বলিতেছে, "যারা সমাজ মানে না, তারা টাকার জন্ত বিধবা-বিবাহ করে।" (৩য় অঙ্ক, ৪র্থ গর্ভাঙ্ক।)

বিধবা-বিবাহের সপক্ষে যে সকল যুক্তি আছে, গিরিশচন্দ্র সে সকলেরও অবতারণা করিতে ত্রুটী করেন নাই। প্রসন্নকুমার তাঁহার পত্নীকে বুঝাইতেছেন, "এখনো বলছ (বিধবা-বিবাহ) মহাপাপ। ভ্রূণহত্যা—মহাপাপ নয়? স্বেচ্ছাচারিণী হওয়া মহাপাপ নয়? নীতিবিরোধী কাজ মহাপাপ নয়। উপায় থাকতে উপায় না করা মহাপাপ নয়। চক্ষের উপর অনাচার দেখ্‌বে—চক্ষের উপর মেয়ে ভ্রষ্টা হবে দেখ্‌বে—চক্ষের উপর উপপতির আনাগোনা দেখ্‌বে? বোঝো—এখনো বোঝো।" ইহার উত্তরে তাঁহার পত্নী বলিলেন, "ইন্দ্রিয় কি এতই দুর্দ্দম, যে নিষ্ঠাচার—ধর্ম্মাচরণে দমিত হয় না?" প্রত্যুত্তরে প্রসন্নকুমার বলিলেন, "ইন্দ্রিয় দুর্দ্দম কি না—তোমার সন্দেহ আছে? পুত্র-শোকাতুরা নারী, বৎসর ফেরে না, আবার পুত্র প্রসব করে।—ইন্দ্রিয় তাড়নায় উপপতির দাসী হয়, শোণিত সম্বন্ধ বিচার থাকে না।" (২য় অঙ্ক, ৭ম গর্ভাঙ্ক।)

এ কথার উত্তর পার্ব্বতী মৃত্যুশয্যায় দিয়া গিয়াছে। মৃত্যুশয্যায় তিনি ভুবন-মোহিনীকে বলিতেছেন, "আমি তোমায় দেখি নাই, তাই তো মা গায়ে কালি মাখ্‌তে পেয়েছ। আমি তোমায় জোর ক'রে এনে কেন কাছে রাখিনি? তুমি নিরাশ্রয় হ'য়ে পথ ভুলেছ; ধর্ম্মে তোমার মতি হোক্।" (৫ম অঙ্ক, ১ম গর্ভাঙ্ক।)

পিতামাতার কর্ত্তব্যের ত্রুটী ভুবনমোহিনীর অধঃপতনের কারণ। সত্য বটে, নাট্যকার ভাবে ও ভাষায় নাটকের ভিতর আত্মপ্রকাশ করিতে পারেন না, কিন্তু এই সামাজিক নাটক একটা উদ্দেশ্ত ধরিয়া রচিত। হিন্দুভাব গিরিশচন্দ্রের মজ্জাগত ছিল, এ নাটকে গিরিশচন্দ্র যে সকল চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহারা তাঁহার মুখপাত্র না হইলেও হিন্দুভাবে ভাবিত। সুতরাং তাহাদের উপর কবির মনের ছায়াপাত হইয়াছে। তথাপি তিনি এই সামাজিক প্রশ্নের সমাধান না করিয়া সমস্তার আকারেই রাখিয়া গিয়াছেন; এবং নাটকেরও নামকরণ করিয়াছেন, বিধবা-বিবাহ—'শাস্তি কি শান্তি?'

২২শে কার্ত্তিক (১৩১৫ সাল) এই নাটক 'মিনার্ভা থিয়েটারে' প্রথম অভিনীত হয়। প্রথম অভিনয়-রজনীর অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ:

প্রসন্নকুমার	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু)।
বেণীমাধব	শ্রীপ্রিয়নাথ ঘোষ।
শ্যামাদাস	সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
প্রকাশ	তারকনাথ পালিত।
পাগল	N. Banerjee Esq. (থাকবাবু)।
প্রবোধ	সুবাসিনী (মাজিনী)।
সর্ব্বেশ্বর	শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঘোষ।
ঘেঁচী	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দে।
ঘটকৃষ্ণ	শ্রীহরিদাস দত্ত।

হেবো	শ্রীহীরালাল চট্টোপাধ্যায়।
শুভঙ্কর	অক্ষয়কুমার চক্রবর্ত্তী।
মিঃ বাসু ও ডাক্তার	শ্রীঅহীন্দ্রনাথ দে।
মিঃ মল্লিক	শ্রীউপেন্দ্রনাথ বসাক।
মিঃ বড়াল ও ঘটক	শ্রীসাতকড়ি গঙ্গোপাধ্যায়।
ম্যাজিষ্ট্রেট	পণ্ডিত শ্রীহরিভূষণ ভট্টাচার্য্য।
পুলিস ইন্সপেক্টর	শ্রীবিভূতিভূষণ গঙ্গোপাধ্যায়।
জমাদার, বেসো ও স্বর্ণকার	মন্মথনাথ বসু।
কোচম্যান	শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।
বেহারা ও ১ম বৃদ্ধ	শ্রীমধুসূদন ভট্টাচার্য্য।
১ম পাহারাওয়ালা ও ২য় বৃদ্ধ	শ্রীননিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।
২য় পাহারাওয়ালা	পান্নালাল সরকার।
শুঁড়ী	শ্রীনৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু।
পার্ব্বতী	শ্রীমতী প্রকাশমণি।
নির্ম্মলা	শ্রীমতী হেমন্তকুমারী।
ভুবনমোহিনী	সরোজিনী (নেড়া)।
প্রমদা	শ্রীমতী শশীমুখী।
হরমণি	সুশীলাবালা।
চিত্তেশ্বরী	শ্রীমতী চপলাসুন্দরী।
১মা দাসী	শ্রীমতী শরৎকুমারী।
২য়া দাসী ও দাই	নগেন্দ্রবালা। ইত্যাদি।
সঙ্গীত-শিক্ষক	শ্রীদেবকণ্ঠ বাগচী।

প্রত্যেক অভিনেতা ও অভিনেত্রী এই নাটকের ভূমিকাভিনয়ে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। সুরেন্দ্রবাবুর প্রসন্নকুমারের অভিনয় বড়ই মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছিল। থাকবাবু দেখিতেও যেরূপ সুপুরুষ ছিলেন, পাগলের ভূমিকাভিনয়ও করিয়াছিলেন সেইরূপ সুন্দর।* হেবোর ভূমিকায় হীরালালবাবু দর্শক-হৃদয়ে একটী জীবন্ত চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন।

নাটকখানি গিরিশচন্দ্র স্বর্গীয় দীনবন্ধু মিত্রের নামে উৎসর্গীকৃত করিয়াছিলেন। যথা :

* এই সম্ভ্রান্তবংশীয় নাট্যামোদী যুবা বিনয়, সৌজন্য এবং কলাবিদ্যায় গিরিশচন্দ্রের বিশেষ স্নেহাকর্ষণ করিয়াছিলেন। পীড়িতাবস্থায় ইঁহারই বাটীতে থাকিয়া নাট্যাচার্য্য অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী মহাশয়ের মৃত্যু হয়। বিশেষ ভক্তি-শ্রদ্ধার সহিত সহৃদয় নরেন্দ্রবাবু তাঁহার পরিচর্য্যা করেন। তাঁহার অকালমৃত্যুতে বঙ্গ-নাট্যশালার অভিনেতাগণ একজন উচ্চপ্রাণ এবং প্রকৃত সুহৃদ হারাইয়াছেন। ইনি সাধারণের নিকট থাকবাবু নামে সুপরিচিত ছিলেন।

"নাট্যগুরু স্বর্গীয় দীনবন্ধু মিত্র মহাশয় শ্রীচরণেষু—

"বঙ্গে রঙ্গালয় স্থাপনের জন্ত মহাশয় কর্মক্ষেত্রে আসিয়াছিলেন। আমি সেই রঙ্গালয় আশ্রয় করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছি, মহাশয় আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতাভাজন। শুনিয়াছি, শ্রদ্ধা—সকল উচ্চস্থানেই যায়। মহাশয় যে উচ্চস্থানে যেরূপ উচ্চকার্য্যেই থাকুন, আমার শ্রদ্ধা আপনার চরণ স্পর্শ করিবে—এই আমার বিশ্বাস। যে সময়ে 'সধবার একাদশী'র অভিনয় হয়, সে সময়ে ধনাঢ্য ব্যক্তির সাহায্য ব্যতীত নাটকাভিনয় করা একপ্রকার অসম্ভব হইত; কারণ পরিচ্ছদ প্রভৃতিতে যেরূপ বিপুল ব্যয় হইত, তাহা নির্ব্বাহ করা সাধারণের সাধ্যাতীত ছিল। কিন্তু আপনার সমাজচিত্র 'সধবার একাদশী'তে অর্থব্যয়ের প্রয়োজন হয় নাই। সেইজন্য সম্পত্তিহীন যুবকবৃন্দ মিলিয়া 'সধবার একাদশী' অভিনয় করিতে সক্ষম হয়। মহাশয়ের নাটক যদি না থাকিত, এইসকল যুবক মিলিয়া 'ন্যাশান্যাল থিয়েটার' স্থাপন করিতে সাহস করিত না। সেই নিমিত্ত আপনাকে রঙ্গালয়-স্রষ্টা বলিয়া নমস্কার করি।

"আপনাকে আমার হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা প্রদান করিবার ইচ্ছা চিরদিনই ছিল, কিন্তু উপহার দিবার যোগ্য নাটক লিখিতে পারি নাই, এইজন্য বিরত ছিলাম। এক্ষণে দেখিতেছি, জীবনের শেষ সীমায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। তবে আর কবে আশা পূর্ণ করিব।—সেই নিমিত্ত এই নাটকখানি অযোগ্য হইলেও আপনার পুণ্য-স্মৃতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিলাম। ভাবিলাম, ক্ষুদ্র ফুলেও দেবপূজা হইয়া থাকে। ইতি

চিরকৃতজ্ঞ

শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ।"

'মনোমোহন' ও আর্ট থিয়েটার পরিচালিত 'ষ্টার থিয়েটারে' এই নাটকের পুনরভিনয় হয়।

পীড়াবশতঃ দুই বৎসর কাশী গমন

পূর্ব্ব-পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও (১৩১৫ সাল) হেমন্ত ঋতুর আরম্ভের সঙ্গে এবং 'শাস্তি কি শান্তি' নাটকের শিক্ষাদানের পরিশ্রমে তাঁহার আবার হাঁপানী দেখা দেয় এবং তিনি সমস্ত শীতকাল কষ্ট পান। এইরূপে প্রতি বৎসর পীড়াক্রান্ত হওয়ায় চিকিৎসকগণের পরামর্শে ও বন্ধু-বান্ধবগণের আগ্রহে তিনি পূর্ব্ব হইতে সাবধান হইবার নিমিত্ত ১৩১৬ এবং ১৩১৭ সালে আশ্বিন মাসেই কাশীধামে গিয়া সমস্ত শীতকাল যাপন করেন। ইহাতে আশাতীত ফললাভ হয়, বিশ্বেশ্বরের কৃপায় তিনি দুই বৎসরই হাঁপানীর পীড়া হইতে অব্যাহতি পাইয়াছিলেন। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় তাঁহার যৌবনকাল হইতে অনুরাগ ছিল, এবং দীনদরিদ্রগণকে বিনামূল্যে চিকিৎসা ও তাহাদের পথ্যাদির ব্যবস্থা করিয়া বহুসংখ্যক অনাথের জীবন-রক্ষার কারণ হইতেন। কাশীধামে আসিয়া তাঁহার হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার বিশেষ

চর্চা হইতে লাগিল। তাহার প্রধান কারণ, কাশীধামের 'রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে'র পরিচালকগণ তাঁহার অব্যর্থ ঔষধ-প্রয়োগনৈপুণ্য দেখিয়া আশ্রমের কঠিন পীড়াক্রান্ত ব্যক্তিমাত্রকেই তাঁহার চিকিৎসাধীন রাখিতেন। বহু লোকের আরোগ্যসংবাদ শ্রবণে কাশীধামের বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি গিরিশচন্দ্রের নিকট আসিতে লাগিলেন। কাশীর হিন্দুস্থানীমাত্রেই তাঁহাকে 'ডাক্তারসাব' বলিয়া ডাকিতেন। ক্রমে তাঁহার চিকিৎসা-নৈপুণ্যের সুখ্যাতি এরূপ বহু বিস্তৃত হইয়া পড়িল, যে সুদূর জৈনপুরের সুপ্রসিদ্ধ উকীল শম্ভুপ্রসাদ, এলাহাবাদের গভর্নমেণ্ট উকীল রায় গোকুলপ্রসাদ বাহাদুর, উকীলবাবু সারদাপ্রসাদ এম. এ, বি. এল. প্রভৃতি লব্ধপ্রতিষ্ঠ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ চিকিৎসার জন্য তাঁহার কাছে কাশীধামে আসিতে লাগিলেন। বাবু সারদাপ্রসাদের দৃষ্টিশক্তি ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল। সেইসময় এলাহাবাদ এক্‌জিবিসনের মহাসমারোহে আয়োজন চলিতেছে, সারদাপ্রসাদবাবু ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া বলেন, "দৃষ্টিশক্তি যেরূপ দ্রুত বিনষ্ট হইতেছে। তাহাতে আমার আর এলাহাবাদ এক্‌জিবিসন দেখা হইবে না।" গিরিশচন্দ্র তাঁহার চক্ষুর অবস্থা পরীক্ষা করিয়া বলেন, "আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি আপনাকে এলাহাবাদের এক্‌জিবিসন দেখাইব।" গিরিশচন্দ্রের ঔষধ-প্রয়োগে সারদাপ্রসাদবাবু সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য না হইলেও এলাহাবাদ প্রদর্শনী দেখিয়াছিলেন এবং তজ্জন্য তাঁহাকে যথেষ্ট ধন্যবাদ দেন। গিরিশচন্দ্র কলিকাতায় আসিলেও রায় গোকুলপ্রসাদ বাহাদুর প্রভৃতি অনেকেই আবশ্যক হইলে ঔষধের ব্যবস্থার নিমিত্ত টেলিগ্রাম ও পত্র প্রেরণ করিতেন।

কাশীধামের পশ্চিমাংশে সেণ্ট্রাল হিন্দু কলেজ হইতে অল্পদূরে, সিকরায় বাবু রামপ্রসাদের বাগানবাড়ীতে গিরিশচন্দ্র অবস্থান করিতেন। দুই বৎসর শীতকাল গিরিশচন্দ্র মহানন্দে কাশীধামে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। ভোরে উঠিয়া বহুদূর ভ্রমণ করিয়া আসিয়া বেলা প্রায় ১১টা পর্য্যন্ত সমাগত রোগীগণের অবস্থা শ্রবণ ও ঔষধাদির ব্যবস্থা করিতেন। পরে স্নানাহার করিয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রামপূর্ব্বক ২টার সময় পোষ্ট-পিয়ন আসিলে পত্র-পাঠে আবশ্যকমত জবাব দিতেন। অপরাহ্ন হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত পুনরায় সমাগত রোগীগণের ঔষধ-পথ্যাদির ব্যবস্থা করিতেন। সন্ধ্যার সময় রামকৃষ্ণ অদ্বৈত-আশ্রমের সন্ন্যাসীগণ, রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের সেবকগণ, সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার নৃপেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সেণ্ট্রাল হিন্দু কলেজের সহকারী প্রিন্সিপ্যাল উনওয়ালা সাহেব ও তথাকার শ্রীযুক্ত পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি. এ. প্রভৃতি শিক্ষকগণ, থিয়োজফিক্যাল সোসাইটীর পুস্তক-প্রকাশ বিভাগের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত অম্বিকাকান্ত চক্রবর্ত্তী, কাশীর প্রসিদ্ধ উকিল আনন্দকুমার চৌধুরী এম. এ., বি. এল. ও শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দে বি. এল., ভূতপূর্ব্ব কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল এবং গিরিশচন্দ্রের হেয়ার স্কুলের সহপাঠী পণ্ডিত অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম. এ., বি. এল., পেন্সন-প্রাপ্ত সাব্-জজ ললিতকুমার বসু, সুবিখ্যাত ভূদেববাবুর পৌত্র শ্রীযুক্ত বটুকদেব মুখোপাধ্যায় এম. এ., চন্দননগর-নিবাসী জমীদার শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়, হিন্দু কলেজের লাইব্রেরীয়ান শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, এতদ্ব্যতীত কাশীধামের বান্ধব সমিতি, হরিহর সমিতি, মিত্রসমাজ থিয়েটারের পরিচালকগণ প্রভৃতি নানা

শ্রেণীর ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের সমাগম হইত। ধর্ম, সাহিত্য প্রভৃতি নানাবিধ প্রসঙ্গে রাত্রি ১০টা বাজিয়া যাইত। সকলে চলিয়া গেলে রাত্রি ১২টা, কোন-কোন দিন ১টা পর্য্যন্ত তিনি লেখাপড়ার কার্য্য করিতেন। ইহা ভিন্ন নিত্য সংবাদপত্র পাঠ এবং কারমাইকেল ও সেন্ট্রাল হিন্দু কলেজ লাইব্রেরী হইতে আনীত বিবিধ গ্রন্থ অবকাশ পাইলেই পাঠ করিতেন। শঙ্করাচার্য্যের গীতগুলি, সমগ্র 'তপোবন' নাটক এবং অমরেন্দ্রনাথ দত্ত-প্রকাশিত 'নাট্যমন্দির' মাসিকপত্রের জন্য অধিকাংশ প্রবন্ধ ও "লীলা" নামক গল্প কাশীধামেই রচিত হয়। দুই বৎসরই আমি তাঁহার সঙ্গে ছিলাম।

'শঙ্করাচার্য্য'

'শাস্তি কি শান্তি'র অভিনয়ে অর্থাগম সম্বন্ধে আশানুরূপ ফল না হওয়ায় নূতন নাটক লিখিবার প্রয়োজন হইল; কিন্তু কি লেখা যায়? ইহাই এক সমস্যা। অসংখ্য নাটক, নভেল প্রভৃতির জনক ইউরোপীয় সমাজের মত বাঙ্গালার সমাজ নানা বৈচিত্র্যময় নহে, ইহাতে সংকীর্ত্তির যেমন অভ্রভেদী উচ্চতা নাই, পাপেরও তেমনই অতলস্পর্শী গভীরতা নাই। আমাদিগের এই বৈচিত্র্যহীন সমাজে যে কিছু সমস্যা আছে, 'প্রফুল্ল', 'হারানিধি', 'বলিদান' প্রভৃতি নাটকে তাহা একে-একে প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে; একটা বিষয় আছে—ভাই-ভাই মামলা-মকদ্দমায় সংসার ছারখার—গিরিশচন্দ্র এই বিষয় লইয়া 'কোহিনুরে'র জন্য একখানি নাটক লিখিতেছিলেন, তাহার চারি অঙ্ক শেষ হইবার পর উক্ত থিয়েটারের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়, এবং স্বত্বাধিকারীর সহিত মামলাবশতঃ ঐ চারি অঙ্ক তখন আদালতের জিম্মায় ছিল। এখন কি লইয়া নূতন নাটক লেখা যায়—গিরিশচন্দ্র এই মহাসমস্যায় পতিত হইলেন। ঐতিহাসিক নাটক পুলিশে পাশ হইবার পক্ষে অনেক বাধা। তবে ধর্ম্মপ্রাণ ভারতে ধর্ম্মের কখনই অনাদর হইবে না। এখানেও এক অন্তরায়—বাঙ্গালা ভক্তি-প্রধান দেশ—ভক্তিমূলক নাটকও অনেক রচিত হইয়াছে। ঐ বিষয়ের পুনরবতারণা—চর্ব্বিতচর্ব্বণ মাত্র। গিরিশচন্দ্র ভাবিতে লাগিলেন, একবার জ্ঞানমার্গ ধরিয়া নাটক রচনা করিলে হয় না? কিন্তু বিষয় বড় নীরস। যে উন্মাদনা নাটকে প্রয়োজন, তাহা ভক্তিমার্গেই আছে—অদ্বৈতমার্গে নাই। কিন্তু তথাপি বেদান্ত বিষয় অবলম্বনপূর্ব্বক অদ্ভুত কৌশলে তাহাতে মানবীয় সহানুভূতি মিশাইয়া তিনি 'শঙ্করাচার্য্য' লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

নাটক রচনা সমাপ্ত হইলে ইহার সাফল্য সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্রের প্রথমে সন্দেহ হইয়াছিল, কিন্তু পূজ্যপাদ স্বামী সারদানন্দের কথায় তাঁহার সে দ্বিধা দূর হয়। নাটকের সম্পূর্ণ শিক্ষাদানও তিনি করিতে পারেন নাই, কারণ এইসময়ে তিনি পীড়াবশতঃ কাশীধামে গমন করিয়াছিলেন। স্বর্গীয় রাধামাধব কর এবং পণ্ডিত শ্রীহরিভূষণ ভট্টাচার্য্য শিক্ষাদান-কার্য্য সমাপ্ত করেন। কেবলমাত্র দানিবাবু কাশীধামে গিয়া শঙ্করাচার্য্যের ভূমিকা পিতৃদেবের নিকট শিক্ষা করিয়া আসিয়াছিলেন।

২রা মাঘ (১৩১৬ সাল) 'শঙ্করাচার্য্য' প্রথম 'মিনার্ভা থিয়েটারে' অভিনীত হয়।

প্রথমাভিনয় রজনীর অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ:

শঙ্করাচার্য্য	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ।
শিশু-শঙ্কর (প্রথম অঙ্ক)	সরোজিনী (নেড়া)।
অমরকরাজ—দেহাশ্রিত শঙ্কর ও বৃদ্ধ বৌদ্ধ কাপালিক	শ্রীপ্রিয়নাথ ঘোষ।
মহাদেব ও উগ্রভৈরব	শ্রীসতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
ব্রহ্মা ও গণপতি	শ্রীহীরালাল চট্টোপাধ্যায়।
গোবিন্দনাথ, ব্যাস ও মণ্ডনমিশ্র	পণ্ডিত শ্রীহরিভূষণ ভট্টাচার্য্য।
সনন্দন	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দে।
শান্তিরাম	শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঘোষ।
রামদাস	পান্নালাল সরকার।
সখারাম ও প্রথম পণ্ডিত	শ্রীমধুসূদন ভট্টাচার্য্য।
জগন্নাথ	শ্রীনৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু।
ঋষি, পুরোহিত ও সুধন্বা রাজার সেনাপতি	শ্রীপ্রমথনাথ পালিত।
বৃদ্ধ বৌদ্ধ কাপালিক-শিষ্য	শ্রীউপেন্দ্রনাথ বসাক।
চণ্ডাল-বালক	শ্রীমতী ননীবালা।
২য় পণ্ডিত	শ্রীঅতুলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।
অমরক রাজার মন্ত্রী	শ্রীহরিদাস দত্ত।
ঐ ব্রাহ্মণ	বিজয়কৃষ্ণ বসু।
শিউলি	শ্রীসাতকড়ি গঙ্গোপাধ্যায়।
মহামায়া	শ্রীমতী রাজবালা।
বিশিষ্টা	শ্রীমতী হেমন্তকুমারী।
উভয়ভারতী ও কামকলা	শ্রীমতী চারুশীলা।
রমা ও অম্বালিকা	শ্রীমতী নলিনীসুন্দরী।
গঙ্গা ও যমজ-শিশুমাতা	শ্রীমতী সরযূবালা।
সরমা	শ্রীমতী নীরদাসুন্দরী।
কুমারী	সুবাসিনী।
শিউলিনী	শ্রীমতী তিনকড়ি (ছোট)।
	ইত্যাদি।
সঙ্গীত-শিক্ষক	শ্রীদেবকণ্ঠ বাগচী।
নৃত্য-শিক্ষক	শ্রীনৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু।
রঙ্গভূমি-সজ্জাকর	ধর্ম্মদাস সুর ও শ্রীকালীচরণ দাস (সহকারী)।

'শঙ্করাচার্য্যে'র রিহারস্থালকালীন অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ একপ্রকার হতাশ হইয়া পড়িয়াছিল এবং বিপুল অর্থব্যয়ে সাজ-সরঞ্জাম ও ধর্ম্মদাসবাবুকে দিয়া দৃশ্যপটাদি প্রস্তুত করিয়া স্বত্বাধিকারীও বিশেষরূপে চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিলেন ; কিন্তু অভিনয় দর্শনে সম্পূর্ণ নূতন রসের আস্বাদন পাইয়া যখন দর্শকগণ ঘন-ঘন উল্লাস প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং অভিনয়ান্তে উচ্চ জয়ধ্বনি করিয়া রঙ্গালয় পরিত্যাগ করিলেন—তখন তাঁহাদের বিস্ময় ও আনন্দের সীমা রহিল না।

'চৈতন্যলীলা'র ন্যায় 'শঙ্করাচার্য্য' নাটকও নাট্যজগতে এক যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিল। বেদান্ত প্রচারক নীরস শঙ্কর-চরিত্র, গিরিশচন্দ্রের অমৃতময়ী রচনায় এরূপ সরস হইয়া উঠিয়াছিল, যে বঙ্গে আবালবৃদ্ধবণিতা 'শঙ্করাচার্য্য' দেখিবার জন্য উন্মত্ত হইয়াছিল। এই নাটকের অভিনয় দর্শনে অনেক পণ্ডিত বলিয়াছিলেন, "গিরিশবাবু কায়স্থকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণকে বেদান্তের সূক্ষ্ম মর্ম্ম জলের ন্যায় বুঝাইয়া দিলেন, তিনি ঈশ্বরানুগৃহীত তাহার আর সন্দেহ নাই।"

নাটকের সকল চরিত্রই নূতন ছাঁচে ঢালা, তন্মধ্যে মহামায়া ও জগন্নাথের চরিত্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য। জগন্নাথ চরিত্র সম্বন্ধে পূজ্যপাদ স্বামী ব্রহ্মানন্দ গিরিশচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন, "মায়িক ভালবাসায় যে মুক্তির অধিকারী হইতে পারে এ চরিত্র, গিরিশবাবু, তুমি মহাগুরুর কৃপায় চিত্রিত করেছ।"

গিরিশচন্দ্র কঠোর বেদান্তের ভাব কাব্যরসে কিরূপ সরস করিয়া তুলিয়াছেন, তাহা মহামায়ার গীতখানি হইতে পাঠক পরিচয় পাইবেন।

গীত।

[সনন্দনাদি শঙ্করাচার্য্যের শিষ্যগণকে সঙ্গীতচ্ছলে সাধন-প্রথা সম্বন্ধে মহামায়ার উপদেশ—"বিদ্যামায়ার সংঘর্ষণে বিদ্যামায়া ও অবিদ্যামায়া পরস্পর ধ্বংস না হ'লে জীবের চৈতন্য লাভ হয় না।"]

"প'রলে পরে সাধের বাঁধন, খুল্‌লে খোলে না।
কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা কথায় চলে না॥
সোনায় লোহায় ঘ'সে-ঘ'সে, তবে লোহার শেকল খসে,
যত্নে গড়ে সোনার শেকল, কিনতে মেলে না॥
সে শেকল শক্ত লোহার, আঁতে আঁতে বাঁধুনি তার,
হার ব'লে পরছে গলে, অমনি ফেলে না॥
লোহার শেকল মনে হ'লে, তখন চায় সে শেকল খোলে,
চেনে, যে চোখ পেয়েছে, চোখ না পেলে, না।"

'শঙ্করাচার্য্যে'র অভিনয় দর্শনে 'বেঙ্গলী'তে (১২শে মার্চ্চ ১৯১০ খ্রী) মন্তব্য প্রকাশিত হয় :

"Our Indian Garrick Girish Chandra, when still in the full vigour of youth, brought out his *Chaitanya Lila* and represented

the life and teachings of Chaitanya. But it was an easy task comparatively for Sri Gouranga's creed of love is in itself a fascinating subject and treated by his masterly pen, it was destined to crown him with success. The creed of Shankaracharyya is the creed of knowledge, wich is proverbially dry. A student of Hindu Philosophy can hardly guess how Shankar's life and doctrine can form the subject-matter of a dramatic performance, specially in these times when levity on the stage is the order of the day. But our Girish Chandra has performed an apparently impossible task by infusing into the dry loves of the subject, balmy liveliness which has made the drama quite agreeable to every variety of taste. The play, in short, is an all-round master-piece which adds a fresh laurel to the already-over-loaded brow of the dramatist. etc."

রায়সাহেব স্বর্গীয় বিহারীলাল সরকার 'বঙ্গবাসী'তে লিখিয়াছিলেন, "যিনি জ্ঞান-যোগী শঙ্করাচার্য্যের চরিত্রাবলম্বনে নাট্য-রচনা করিতে পারেন, আর সেই নাট্য-রচনার অভিনয়ে যিনি বঙ্গের লক্ষ-লক্ষ লোককে মুগ্ধোন্মত্ত করিয়া তুলিতে পারেন, ধন্য তাঁহার লেখনী। জ্ঞান-যোগীর জ্ঞান-কথা সাধারণের কয়জন বুঝিতে পারে ? কিন্তু গিরিশবাবু সে সব জ্ঞানকথার যেরূপ সহজ বিশ্লেষণ করিয়াছেন, তাহা সাধারণের বোধগম্য হইয়াছে। তাই শত সহস্র অভিনয়দর্শী চিত্রার্পিতের ন্যায় বসিয়া অভিনয়-সৌন্দর্য্যের সুখোপভোগ করিয়া থাকেন। যিনি এমন জ্ঞানী-চরিত্র এমন করিয়া ফুটাইতে পারেন, আর যিনি অভিনয়ে সে চরিত্রের পূর্ণবিকাশ করিতে পারেন, তিনি সমগ্র বঙ্গবাসীর ধন্যবাদ-পাত্র নহেন কি ? ইতিহাসে শঙ্কর চরিত্রের বৈচিত্র্য কোথায় ? কিন্তু গিরিশচন্দ্র নানা চরিত্রের সৃষ্টি করিয়া, প্রাসঙ্গিকক্রমে নাট্যকাব্যের যেরূপ বৈচিত্র্যসাধন করিয়াছেন, তাহা তিনি ভিন্ন আর কেহ করিতে পারেন কিনা সন্দেহ।...নাটকে নব রস। শঙ্করাচার্য্যের মাতা বিশিষ্টার করুণ চিত্র মর্ম্মে-মর্ম্মে অঙ্কিত হইয়া যায়। শঙ্করাচার্য্যের কৃষক ভৃত্য জগন্নাথ—মমতার সাকার সৃষ্টি। মহামায়ার মহাচিত্রে নাট্য-কাব্যসৌন্দর্য্যের পূর্ণোচ্ছাস।" ইত্যাদি।

নাটকখানি তিনি তাঁহার যৌবন-সুহৃদ এবং গুরুভ্রাতা অন্‌ ডিকেন্সন কোম্পানীর সর্ব্বময় কর্ত্তা স্বর্গীয় কালীপদ ঘোষকে উৎসর্গ করিয়াছেন। যথা :

"আনন্দময় সহচর আনন্দধামবাসী কালীপদ ঘোষ।

"ভাই, আমরা উভয়ে একত্রে বহুবার শ্রীদক্ষিণেশ্বরে মূর্ত্তিমান বেদান্ত দর্শন ক'রেছি। তুমি এখন আনন্দধামে, কিন্তু আমার আক্ষেপ—তুমি নরদেহে আমার "শঙ্করাচার্য্য" দেখলে না। আমার এ পুস্তক তোমায় উৎসর্গ করলেম, তুমি গ্রহণ কর।

গিরিশ।"

কাশীধাম হইতে আসিয়া গিরিশচন্দ্র কয়েকরাত্রি পিউলির ভূমিকা লইয়া রঙ্গমঞ্চে

অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এইসময়ে শ্রীমতী তারাসুন্দরী 'মিনার্ভা'য় পুনরায় যোগদান করেন। তিনিও শিউলিনী হইয়া বাহির হইতেন। ইহাতে নূতন আকর্ষণ হওয়ায় 'শঙ্করাচার্য্যে'র বিক্রয় আরও বাড়িয়া যায়।

'মিনার্ভা'য় 'চন্দ্রশেখর'

এইসময়ে 'মিনার্ভা থিয়েটারে' 'চন্দ্রশেখর' অভিনীত হয়। অনুরুদ্ধ হইয়া গিরিশচন্দ্র এই নাটকে কয়েকটী অতিরিক্ত দৃশ্য সংযোজিত করিয়া দেন এবং দুই রাত্রি চন্দ্রশেখর এবং একরাত্রি শ্রীনাথ, সর্ব্বেশ্বর (প্রতিবাসী) ও বকাউল্লার ভূমিকা অভিনয় করেন। দর্শকগণ পূর্ব্ব-প্রচলিত অভিনয়ে নূতনত্ব পাইয়া বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন। 'ক্লাসিক থিয়েটারে' অমরবাবুর বিশেষ আগ্রহ ও অনুরোধে গিরিশচন্দ্র এইরূপ এক রাত্রি 'ভ্রমরে' কৃষ্ণকান্তের ভূমিকা অভিনয় করেন।

'অশোক'

'শঙ্করাচার্য্য' নাটকের আশাতীত সাফল্য গিরিশচন্দ্রকে পুনরায় ধর্ম্ম-বিষয় অবলম্বনে নাটক রচনা করিতে উৎসাহপ্রদান করে। তাঁহার প্রথম ইচ্ছা হইয়াছিল 'কুমারিল ভট্ট' লেখা, কিন্তু গিরিশচন্দ্রের বিশেষ প্রিয়পাত্র শ্রীযুক্ত কমুদবন্ধু সেন মহাশয়ের অনুরোধে তিনি 'অশোক' লিখিতে প্রবৃত্ত হন। বেদান্তের ভাবে যে গিরিশচন্দ্রের মস্তিষ্ক তখনও পর্য্যন্ত আচ্ছন্ন ছিল, 'অশোক' নাটকে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

মার চরিত্র যেমন অবিদ্যার রূপান্তর, নাটকে উপগুপ্ত ও বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ তেমনি বিদ্যামায়ার প্রতিমূর্ত্তি। 'অশোক' নাটকে দেখিতে পাওয়া যায় যে সকল চরিত্রেই মানবীয় সহানুভূতির (human sympathy) অভাব। ইহাতে পতি-পত্নীর সম্বন্ধ আছে, কিন্তু তাহাতে সে উন্মাদনা নাই, ভ্রাতৃস্নেহ, পুত্র-বাৎসল্য আছে, তাহাতে সে আসক্তি নাই। নায়ক অশোক যেন অন্য জগতের লোক—মানবীয় সহানুভূতির বহুদূরে। এইজন্যই সম্ভবতঃ এ নাটক সাধারণ দর্শকের সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে পারে নাই। যদি কখনও ধর্ম্মপ্রাণ উচ্চ ভাবুক দর্শকরূপে রঙ্গালয়ে আবির্ভূত হন, তখন এ নাটকের যথাযোগ্য সম্মান ও আদর হইবে। নাটকখানি নিবিষ্টচিত্তে পাঠ করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে গিরিশচন্দ্র ইহাতে কি উচ্চাঙ্গের নাট্যকলা বিকাশ করিয়াছেন। এখন কথা—'অশোক' ঐতিহাসিক নাটক কিনা? সে সময় অশোক সম্বন্ধে যাহা কিছু ঐতিহাসিক তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছিল, গিরিশচন্দ্র তন্ন-তন্ন তাহার অনুসন্ধান করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তবে নাটক ইতিহাস নহে, ইতিহাসকে নাটকে পরিণত করিতে যাহা কিছু আবশ্যক, গিরিশচন্দ্র নিঃশঙ্কচিত্তে সে সকল গ্রহণ

করিয়াছেন। বিদ্যামায়ার প্রভাবে কিরূপ অবিদ্যাশক্তি পরাভূত হয়—এ নাটকে তাহাই প্রধান বিষয়।

সাধারণ দর্শক এ নাটকের উচ্চরস গ্রহণ করিতে না পারিলেও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তাৎকালিক ভাইস্-চ্যান্সেলার সদ্ব্যাগম চক্রবর্ত্তী মনীষীপ্রবর স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহোদয় এই নাটকখানিকে বি. এ. ও এম. এ. পরীক্ষায় পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ব্বাচিত করিয়া ইহার যথাযোগ্য স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন।

'শ্রীবৎস-চিন্তা' নাটকে বাতুল চরিত্রে আকালের বীজ নিহিত থাকিলেও 'অশোকে' তাহার সর্ব্বাঙ্গীণ ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। কিরূপ উচ্চভাবে নাটকখানি লিখিত হইয়াছিল, নিম্নলিখিত সঙ্গীত হইতে পাঠক তাহার কথঞ্চিৎ আভাস পাইবেন। উত্তপ্ত-মস্তিষ্ক অশোক-সমক্ষে বৌদ্ধভিক্ষুগণ গাহিতেছে:

"ক্রোধানল কেন হৃদয়ে জ্বালি,
পরশ রতন দিব শান্তি ঢালি,
চির শান্তি—শান্তি—শান্তি!
যত্ন করি ধরি হৃদয়ে অহি,
কেন দংশন-তাড়ন নিয়ত সহি,
একি ভ্রান্তি—ভ্রান্তি—ভ্রান্তি!
ভ্রান্তচিত নাহি বাহিরে অরি,
অন্তরে রাখিয়াছ আদর করি,
ঠেকিয়ে শেখ, অরি বিবেক দেখ,
আলিয়ে ভবে, যদি মানব হবে,
বিমল হৃদে হের শান্তি,
অমৃতময় কিবা কান্তি,
কিবা কান্তি—কান্তি—কান্তি!"

১৭ই অগ্রহায়ণ (১৩১৭ সাল) 'অশোক' 'মিনার্ভা থিয়েটারে' প্রথম অভিনীত হয়।

প্রথমাভিনয় রজনীর অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ:

বিন্দুসার	ননীলাল দত্ত।
সুসীম ও জনৈক জৈন	শ্রীঅহীন্দ্রনাথ দে।
অশোক	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু)।
বীতশোক	শ্রীঅপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
কুণাল	সুশীলাবালা।
মহেন্দ্র	শ্রীমতী শশীমুখী।
ন্যগ্রোধ	সরোজিনী।
কহ্লাটক	শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঘোষ।
রাধাগুপ্ত	প্রমথনাথ পালিত।
আকাল	তারকনাথ পালিত।

উপগুপ্ত	পণ্ডিত শ্রীহরিভূষণ ভট্টাচার্য্য।
মার	শ্রীপ্রিয়নাথ ঘোষ।
চণ্ডগিরিক, ২য় বৌদ্ধ ও ১ম রাজপারিষদ	শ্রীমৃত্যুঞ্জয় পাল।
১ম বৌদ্ধ, আভীর ও তক্ষশিলার মন্ত্রী	অটলবিহারী দাস।
তক্ষশিলার সভাপতি	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দে।
ঐ সেনাপতি ও পাটলিপুত্রের ২য় রাজপারিষদ	শ্রীনরেন্দ্রনাথ সিংহ।
তক্ষশিলার ১ম সদস্য ও প্রথম ঘাতক	শ্রী উপেন্দ্রনাথ বসাক।
তক্ষশিলার ধর্ম্মযাজক	শ্রীহীরালাল চট্টোপাধ্যায়।
তক্ষশিলার দূত	শ্রীধর্ম্মদাস মুখোপাধ্যায়।
২য় ঘাতক	শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দে।
চণ্ডাল সর্দ্দার	শ্রীহরিদাস দত্ত।
১ম ব্রাহ্মণ	অক্ষয়কুমার চক্রবর্ত্তী।
২য় ব্রাহ্মণ	শ্রীমধুসূদন ভট্টাচার্য্য।
পাটলিপুত্রের দূত	মন্মথনাথ বসু।
বৌদ্ধ উপাসকগণ	শ্রীননিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। পান্নালাল সরকার। ইত্যাদি।
সুভদ্রাঙ্গী	সরোজিনী।
চন্দ্রকলা ও কাঞ্চনমালা	শ্রীমতী নীরদাসুন্দরী।
পদ্মাবতী	শ্রীমতী তারাসুন্দরী।
দেবী	শ্রীমতী হেমন্তকুমারী।
সঙ্ঘমিত্রা	শ্রীমতী ফিরোজাবালা।
চিত্তহরা	শ্রীমতী চারুশীলা।
তৃষা	শ্রীমতী তিনকড়ি (ছোট)।
চণ্ডাল-পত্নী	শ্রীমতী রাধারাণী।
আভীর-পত্নী ও পরিচারিকা	শ্রীমতী নলিনীবালা।
শিক্ষক	পণ্ডিত শ্রীহরিভূষণ ভট্টাচার্য্য ও মহেন্দ্রকুমার মিত্র।
সঙ্গীত-শিক্ষক	শ্রীদেবকণ্ঠ বাগচী।
নৃত্য-শিক্ষক	শ্রীসাতকড়ি গঙ্গোপাধ্যায়।
রঙ্গভূমি-সজ্জাকর	শ্রীকালীচরণ দাস।

অশোকের ভূমিকা স্বয়ং দানিবাবু গ্রহণ করিয়াছিলেন, প্রকৃতপক্ষে অশোক

চরিত্র দুইভাগে বিভক্ত। প্রথম চণ্ডাশোক—নিষ্ঠুর—নির্দয়—দাম্ভিক। দুরন্ত রাজ্য-লিপ্সায় তাহার হৃদয় অধিকৃত, সেখানে দাম্পত্যপ্রেম, পুত্রবাৎসল্য প্রভৃতির অধিকার নাই। তারপর ধর্মাশোক—ত্যাগের মহিমায় মহান্—আত্মজয়ের গৌরবে পরিপূর্ণ। চণ্ডাশোকের উদ্দেশ্য—পরপীড়ন ও প্রভুত্ব স্থাপন; ধর্মাশোকের উদ্দেশ্য—বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার। দানিবাবু এ ভূমিকায় যথেষ্ট কৃতিত্ব এবং কলাকৌশল প্রদর্শন করিলেও বিচিত্র অশোক চরিত্র সাধারণ দর্শকের হৃদয় অধিকার করিতে পারে নাই। অশোকের চরিত্র অপেক্ষা বীতশোকের চরিত্র দর্শকবৃন্দের অধিকতর মর্মস্পর্শ করিয়াছিল। সুপ্রসিদ্ধ নট ও নাট্যকার শ্রীযুক্ত অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ইহার অভিনয়েও বিশেষ নৈপুণ্য দেখাইয়াছিলেন। বীতশোকের পর কুণালের ভূমিকায় সুশীলাবালার অভিনয় দর্শকগণের অতীব হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। আকালের ভূমিকায় স্বর্গীয় তারকনাথ পালিতও যথেষ্ট সুখ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন।

'মিনার্ভা' মহেন্দ্রবাবুর হস্তে

ফাল্গুন মাসের (১৩১৭ সাল) শেষভাগে গিরিশচন্দ্র কাশী হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। ১৩১৮ সালে 'মিনার্ভা থিয়েটারে' বিশেষ পরিবর্ত্তন হয়। মনোমোহনবাবুর পিতা পণ্ডিতবর স্বর্গীয় বীরেশ্বর পাড়ে মহাশয়ের কাশীধামে জীবনের শেষভাগ অতিবাহিত করিবার ইচ্ছা ছিল। মনোমোহনবাবু পিতার অভিপ্রায়মত কাশীধামে একটী বাটী এবং তাঁহার নামে তথায় একটী শিবালয় প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প করেন। এ নিমিত্ত কাশীতে কিছুকাল থাকিবার প্রয়োজন হওয়ায় এবং অন্যান্য কারণে তিনি থিয়েটার ছাড়িয়া দিতে চাহেন।

পাঠকগণ জ্ঞাত আছেন, মনোমোহনবাবু মহেন্দ্রবাবুকে থিয়েটারের এক-তৃতীয়াংশ বখরা দিয়া, এ পর্য্যন্ত একসঙ্গে 'মিনার্ভা' চালাইয়া আসিতেছিলেন। এক্ষণে তিনি থিয়েটারের যথেষ্ট সংস্কারসাধন করিলেও, প্রথমে যে ষাইট হাজার টাকায় তিনি 'মিনার্ভা থিয়েটার' খরিদ করিয়াছিলেন এবং থিয়েটার সংলগ্ন যে নূতন হোটেল-বাটী নির্ম্মাণ করিতে তাঁহার ছয় হাজার টাকা খরচ পড়িয়াছিল তাহার এক-তৃতীয়াংশ অর্থাৎ মোট বাইশ হাজার টাকা লইয়া তিনি মহেন্দ্রবাবুকে বখ্‌রা বিক্রয় কবালা লিখিয়া দেন।

উৎকৃষ্ট সাজসরঞ্জাম এবং লব্ধপ্রতিষ্ঠ অভিনেতা ও অভিনেত্রী-পরিবৃত 'মিনার্ভা থিয়েটারে'র পূর্ণ অধিকার পাইয়া, মহেন্দ্রবাবু মনোমোহনবাবুকে তাঁহার অংশের নিমিত্ত মাসিক ১৮০০৲ আঠার শত টাকা করিয়া ভাড়া দিতে স্বীকৃত হন, এবং ১৩১৮ সাল, আষাঢ় মাস হইতে মনোমোহনবাবুর নিকট দশ বৎসরের লিজ লইয়া থিয়েটার চালাইতে আরম্ভ করেন। সহসা এই পরিবর্ত্তনে থিয়েটারে একটা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। ২রা আষাঢ়, শনিবার, স্বর্গীয় অতুলকৃষ্ণ মিত্রের 'রকমফের' নামক নূতন

গীতিনাট্যের প্রথম অভিনয়-রজনী ঘোষিত হইবার পর, এই গীতিনাট্যের প্রধান নায়ক এবং আরও দুই-একজন গুণী ব্যক্তি তৎ-পূর্ব্ব বৃহস্পতিবার রাত্রে কর্ম্ম-পরিত্যাগের পত্র প্রেরণ করেন। শুক্রবার প্রাতে মহেন্দ্রবাবু ব্যস্ত হইয়া গিরিশচন্দ্রের নিকট এই বিপদবার্ত্তা জ্ঞাপন করিলেন, এবং সদুপায় নির্দ্দেশের নিমিত্ত বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন। কর্ম্মবীর গিরিশচন্দ্র তৎক্ষণাৎ থিয়েটারে আসিয়া অভিনেতৃবর্গকে উৎসাহিত করিলেন, এবং বার্দ্ধক্য ভুলিয়া স্বয়ং উক্ত গীতিনাট্যে জালিমের ভূমিকাভিনয় করিয়া বিশৃঙ্খল সম্প্রদায়ে শান্তিস্থাপন করিলেন। যৌবন হইতে বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত তাঁহার এই অদম্য উৎসাহ ও কার্য্যদক্ষতা-গুণেই তিনি, যখন যে থিয়েটারে থাকিতেন, সেই থিয়েটার সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া থাকিত। অন্য সম্প্রদায় যে তাঁহার সম্প্রদায়কে কোনও অংশে ক্ষুণ্ণ করিবে, তাহা তিনি কোনওমতে সহ্য করিতে পারিতেন না। তিনি স্বাস্থ্যরক্ষায় সাবধানী ছিলেন, কিন্তু কার্য্য-সমুদ্রে একবার ঝাঁপাইয়া পড়িলে স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্য করা তাঁহার পক্ষে আর অসম্ভব হইত। উপর্য্যুপরি অভিনয়, থিয়েটারে সর্ব্ববিষয়ে তত্ত্বাবধান, একসঙ্গে দুইখানি পুস্তক (গীতিনাট্য ও প্রহসন) লিখিতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার পরিশ্রম বড়ই অতিরিক্ত হইয়া উঠিল।

৩০শে আষাঢ়, শনিবার, 'মিনার্ভা থিয়েটারে' 'বলিদান' নাটকে তিনি করুণাময়ের ভূমিকা গ্রহণ করিবেন বলিয়া বিজ্ঞাপিত হয়। সেদিন সন্ধ্যার পর হইতেই বৃষ্টি হইতেছিল। যখন তিনি থিয়েটারে উপস্থিত হইলেন, তখন মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে। অতি অল্প দর্শকই তখন উপস্থিত, অনুমান ৫০৲ টাকার অধিক টিকিট বিক্রয় হয় নাই। মহেন্দ্রবাবু বলিলেন, "এই দুর্য্যোগে ও এত অল্প বিক্রয়ে নিষ্ফল অভিনয়ে, আপনার আর ঠাণ্ডা লাগাইয়া স্বাস্থ্যভঙ্গ করিবার প্রয়োজন নাই।" কিন্তু গিরিশচন্দ্রের করুণাময় অভিনয় দর্শনের নিমিত্ত সেই দারুণ দুর্য্যোগেও ক্রমশঃ দর্শক সমাগমে প্রায় চারিশত টাকার টিকিট বিক্রয় হইল। তখন গিরিশচন্দ্র বলিলেন, "এই ভীষণ দুর্য্যোগে মুষলধারায় বৃষ্টি উপেক্ষা করিয়া যাঁহারা আমার অভিনয় দর্শন করিতে আসিয়াছেন, আমি তাঁহাদিগকে বঞ্চিত করিব না, ইহাতে স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়, তাহার আর উপায় কি ?" হায় তখন কে জানিত যে রঙ্গালয়ে সেই কালরাত্রি তাঁহার শেষ অভিনয় রজনী। করুণাময়ের চরিত্রাভিনয়ে বহুবার অনাবৃত গায়ে রঙ্গমঞ্চে আসিতে হইত। সেই ভীষণ রজনীর দারুণ শীতল বায়ু-স্পর্শে তাঁহার বিশেষ ঠাণ্ডা লাগে, পরদিন হইতে শরীর অসুস্থ হয়। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা হইতে লাগিল। কিন্তু শরীরের গ্লানি কোনওমতে যায় না, ক্রমে হাঁপও দেখা দিল। ভাদ্র মাসে কতিপয় সুহৃদের পরামর্শে তিনি সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্যামাদাস বাচস্পতি মহাশয়ের চিকিৎসাধীন হন। কবিরাজ মহাশয় বলিলেন, "আপনাকে শীঘ্রই নীরোগ করিতেছি, সুস্থদেহে আপনাকে প্রত্যহ গঙ্গাস্নান অভ্যাস করাইয়া দীর্ঘজীবী করিব।" প্রকৃতই কবিরাজ মহাশয়ের চিকিৎসা-নৈপুণ্যে দিন-দিন তিনি আরোগ্যলাভ করিতে লাগিলেন। কবিরাজ মহাশয় প্রায় প্রত্যহ আসিতেন। পূর্ব্ব দুই বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও আশ্বিন

মাসে কাশী যাইবার কথা, কিন্তু কবিরাজ মহাশয়ের চিকিৎসার অসুবিধা হইবে বলিয়া অপেক্ষা করিতে-করিতে কার্ত্তিক মাস কাটিয়া গেল। এই অবস্থাতেও তিনি বাটীতে অভিনেতৃগণকে আনাইয়া অল্পে-অল্পে তাঁহার পূর্ব্ব-রচিত 'তপোবনে'র শিক্ষাদানকার্য্য সমাধান করিতে লাগিলেন।

'প্রতিধ্বনি'

এইসময়ে ১৩১৮ সাল, আশ্বিন মাসে গিরিশচন্দ্রের রচিত যাবতীয় কবিতা সংগৃহীত হইয়া 'প্রতিধ্বনি' নামে একখানি গ্রন্থ বাহির হয়। সাহিত্যরথী স্বর্গীয় অক্ষয়চন্দ্র সরকার ইহার ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছিলেন। পাঠকগণের প্রীতির নিমিত্ত প্রথম কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি :

"দৃশ্যকাব্যে বা নাটকে, কবির শক্তিরই প্রচুর পরিচয় পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাঁহার বোধ-বেদনার সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায় না। মনের পরিচয় পাওয়া গেলেও তাঁহার হৃদয়ের পরিচয় ভালরূপ পাওয়া যায় না। কবি গিরিশচন্দ্রের শক্তির পরিচয় তাঁহার রচিত নাটকাবলীতে আমরা যথেষ্ট পাইয়াছি, কিন্তু সেইগুলি হইতে আমরা তাঁহার হৃদয়ের পরিচয় যে সেইরূপ পাইয়াছি, তাহা বোধ হয় না। পরের মুখে ঝাল খাওয়া যেরূপ অসম্ভব, মধুর স্বাদ লওয়াও সেইরূপ অসম্ভব। আবার পরের মুখে রসগ্রহ হওয়া যেরূপ অসম্ভব, পরের মুখ দিয়া হৃদয়ের কথা প্রকাশ করাও সেইরূপ অসম্ভব। সেক্সপীয়ারের নাটকগুলি পড়িয়া, তাঁহার (mind and his art) শক্তি এবং কলাকৌশল বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু ঐগুলিতে সেক্সপীয়ারের বোধ-বেদনা ভালরূপ বুঝিতে পারা যায় না। তাহার জন্য অন্যত্র অনুসন্ধান আবশ্যক। কবি গিরিশচন্দ্রকেও বুঝিতে হইলে, কেবল তাঁহার নাটকগুলি পড়িলে বা দেখিলে হইবে না, অন্যত্র অনুসন্ধান আবশ্যক।

"কবিতায় কবির মনের ভাব ফুটিয়া উঠে। কবিতার ভিতর দিয়া কবির বোধ-বেদনা বেশ বুঝা যায়। নাটকে তেমন যায় না। কতকটা কৃত্রিম। কবিতা অপেক্ষাকৃত সহজ, স্বাভাবিক, সরল ও সাদাসিদে। কবি ভাবের আবেগে সরল মনে যাহা বলেন, তাহাই কবিতার আকারে প্রকাশিত হয়।

"কবি গিরিশচন্দ্রকে সম্যক্ বুঝিতে হইলে, তাঁহার নাটকও দেখিতে হইবে, তাঁহার কবিতাগুলিও পড়িতে হইবে। সাহিত্য-সেবক পাঠক বলিবেন, সে সকল আমরা পড়িয়াছি, শুনিয়াছি। শুনিয়াছেন বটে, তখন সেগুলি ছিল ধ্বনি—এখন শুনুন প্রতিধ্বনি। ধ্বনি ক্ষণস্থায়ী, প্রতিধ্বনি আবহমান কাল থাকে।" ইত্যাদি।

কাশিমবাজারাধিপতির নামে গ্রন্থখানি উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল। নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :

"কাশিমবাজারাধিপতি অনারেবল মহারাজাধিরাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহোদয়

সমীপেষু—

"মহারাজ, বাল্যকালের সকল ব্যক্তি ও বস্তর প্রতি মহারাজের আদর। সেইসময় 'নলিনী' মাসিকপত্রিকায় আমার যে সকল কবিতা বাহির হইত, তাহা মহারাজের আদরের ছিল। সেই কবিতাগুলি একত্র করিয়া মুদ্রিত করিয়াছি এবং তাহার সহিত, এ পর্য্যন্ত যে সমস্ত কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাও যোগ করিলাম। বাল্যে যাহা মহারাজের আদরের ছিল, সেই আদরের পরবর্ত্তী কবিতাগুলিও আদর পাইবে, এই সাহসে রাজ-হস্তে প্রতিধ্বনি অর্পণ করিলাম। আশা পূর্ণ হইলে পরম সম্মানিত হইব।

চিরানুগত

শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ।"

গ্রন্থের প্রচ্ছদ-পৃষ্ঠায় নিম্নলিখিত কবিতাটি উদ্ধৃত হইয়াছিল :

"Our sweetest songs are those that tell of saddest thought."

Shelley.

"অতীব মধুর — অতি করুণ সঙ্গীত।"

'তপোবল'

কলিকাতা, বহুবাজারের সম্ভ্রান্ত মতিলাল পরিবারের বংশধর এবং গিরিশচন্দ্রের পরম স্নেহভাজন শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মতিলাল বহুপূর্ব্বে গিরিশচন্দ্রকে 'বিশ্বামিত্র' নাটক লিখিতে অনুরোধ করেন। এই লইয়াই গিরিশচন্দ্রের সহিত মতিলালের প্রথম পরিচয়। অবসর পাইলেই মতিলালবাবু তাঁহার অনুরোধ স্মরণ করাইয়া দিতেন। কাশীধামে অবস্থানকালীন সেই অনুরোধ কার্য্যে পরিণত হয়। রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম লাইব্রেরী হইতে রামায়ণ আনাইয়া তৎ-পাঠে গিরিশচন্দ্র 'তপোবল' লিখিতে আরম্ভ করিলেন।

কাশীধামে 'তপোবল' রচিত হইলেও 'মিনার্ভা'র অবস্থা পরিবর্ত্তন এবং তাঁহার কঠিন পীড়াবশতঃ প্রায় দশ মাস পরে নাটকখানি ২রা অগ্রহায়ণ (১৩১৮ সাল) 'মিনার্ভা থিয়েটারে' প্রথম অভিনীত হয়। প্রথমাভিনয় রজনীর অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ :

বিশ্বামিত্র	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু)
বশিষ্ঠ	পণ্ডিত শ্রীহরিভূষণ ভট্টাচার্য্য।
ব্রহ্মা ও বিশ্বামিত্রের সেনাপতি	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দে।
ব্রহ্মণ্যদেব	শ্রীমতী নীরদাসুন্দরী।
ইন্দ্র ও কল্মষপাদ	শ্রীহীরালাল চট্টোপাধ্যায়।
ধর্ম্মরাজ	শ্রীনরেন্দ্রনাথ সিংহ।
অগ্নি ও ১ম ব্রাহ্মণ	ননীলাল দত্ত।
শক্তি ও অম্বরীষের পুরোহিত	শ্রীঅহীন্দ্রনাথ দে।

ত্রিশঙ্কু	শ্রীপ্রিয়নাথ ঘোষ।
অম্বরীষ ও বিশ্বামিত্রের মন্ত্রী	শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঘোষ।
সদানন্দ	শ্রীমন্মথনাথ পাল (হাঁদুবাবু)।
যুবরাজ	শ্রীখগেন্দ্রনাথ দে।
শুনঃশেফ	শ্রীমতী শশীমুখী।
পরাশর	পারুলবালা।
ব্রহ্মদূত ও অম্বরীষের ১ম দূত	শ্রীমৃত্যুঞ্জয় পাল।
২য় ব্রাহ্মণ ও বিশ্বামিত্রের সভাসদ	শ্রীউপেন্দ্রনাথ বসাক।
নগর-রক্ষক	শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দে।
ঘোষণাকারী ও অম্বরীষের ২য় দূত	শ্রীমধুসূদন ভট্টাচার্য্য।
বেদমাতা	শ্রীমতী নরীসুন্দরী।
সুনেত্রা	শ্রীমতী তারাসুন্দরী।
অরুন্ধতী	শ্রীমতী প্রকাশমণি।
বদরী	তিনকড়ি দাসী।
অদৃশ্যন্তী	শ্রীমতী রাজবালা।
মেনকা	শ্রীমতী সরোজিনী (নেড়া)।
রম্ভা	শ্রীমতী চারুশীলা।
উর্ব্বশী	শ্রীমতী তিনকড়ি (ছোট)।
ঘৃতাচী	প্রফুল্লবালা। ইত্যাদি।
স্বত্বাধিকারী	মহেন্দ্রকুমার মিত্র এম. এ., বি. এল.।
অধ্যক্ষ	গিরিশচন্দ্র ঘোষ।
শিক্ষক	গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও পণ্ডিত শ্রীহরিভূষণ ভট্টাচার্য্য।
সঙ্গীত-শিক্ষক	শ্রীদেবকণ্ঠ বাগচী।
নৃত্য-শিক্ষক	শ্রীসাতকড়ি গঙ্গোপাধ্যায়।
রঙ্গভূমি-সজ্জাকর	শ্রীকালীচরণ দাস।

ইতিপূর্ব্বেই 'কোহিনুর থিয়েটারে' 'বিশ্বামিত্র' নাম দিয়া একখানি নূতন নাটকের অভিনয় চলিতেছিল, সুতরাং 'মিনার্ভা'য় যখন 'তপোবল' খোলা হইল, তখন আর বিষয়ের নূতনত্ব রহিল না। তাহা হইলেও 'তপোবলে'র অভিনবত্ব দর্শকগণকে অপর্য্যাপ্ত আনন্দদানে সমর্থ হইয়াছিল। বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ, সদানন্দ, ব্রহ্মণ্যদেব, সুনেত্রা, বদরী প্রভৃতি প্রত্যেক ভূমিকাই দর্শকগণের হৃদয়স্পর্শী হইয়াছিল, তাহার প্রধান কারণ, পীড়িত গিরিশচন্দ্র বাটীতে বসিয়া শিক্ষাদান ব্যতীত থিয়েটারে আসিতে না পারায়, মহেন্দ্রবাবু হরিভূষণবাবুকে লইয়া স্বয়ং শিক্ষাদান করিতেন এবং যাহাতে অভিনয় নিখুঁত হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্নশীল হইয়াছিলেন।

'তপোবল' কবি-প্রতিভার শেষ দীপ্তি। তপঃগৌরব এবং ব্রাহ্মণ্য মাহাত্ম্য—এই নাটকের মূলীভূত বিষয়। গিরিশচন্দ্র নাটকের শেষে বলিয়াছেন :

"নরত্ব দুর্লভ অতি বুঝুক মানব।
নাহি জাতির বিচার,
লভে নর উচ্চ পদ তপোবলে।"

ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে নাটকের শেষ দৃশ্যে (৫ম অঙ্ক, ৬ষ্ঠ গর্ভাঙ্ক) তিনি বলিয়াছেন :

"হে ব্রাহ্মণ,
বুঝি নাই মাহাত্ম্য তোমার।
যজ্ঞসূত্রধারী, দেবতার দেবতা ব্রাহ্মণ!"

রামায়ণ এ নাটকের মূল ভিত্তি হইলেও অভিনব সৃষ্টি-চাতুর্য্যে এবং নৈপুণ্যে ইহাকে সম্পূর্ণ নূতন নাটক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। গিরিশ-প্রতিভার শেষ দীপ্তি হইলেও ইহা তাঁহার মাহাত্ম্য-গৌরবে গৌরবান্বিত। 'তপোবল' নাটকের পরিণাম-দৃশ্যের কল্পনা যেমন নূতন, তেমনই অতুলনীয়। ভাষা ও ভাবের উচ্চতায়, রস-বৈচিত্র্যে এবং চরিত্রের ক্রমবিকাশে ইহা গিরিশচন্দ্রের প্রথমশ্রেণীর নাটকের সমকক্ষ।

বশিষ্ঠ এবং বিশ্বামিত্রকে কেন্দ্র করিয়া এই নাটকের রস এবং ঘটনা আবর্ত্তিত হইতেছে। একদিকে বিশ্বামিত্র যেমন ক্ষত্রিয়তেজে চঞ্চল, ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ সাগরের ন্যায় আলোড়িত, অন্যদিকে বশিষ্ঠদেব তেমনি ব্রাহ্মণ্য-মহিমায় স্থির, ধীর, মেরুর ন্যায় অটল, সাগর-তরঙ্গ শৈলমূলে আছাড়িয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, কিন্তু পর্ব্বতকে টলাইতে পারিতেছে না, নিষ্ফল আক্রোশে প্রতিহত হইতেছে, পাঠক এই অপূর্ব্ব দৃশ্য 'তপোবল' নাটকে দেখিবেন। বিশ্বামিত্র এবং বশিষ্ঠ ব্যতীত নাটকে প্রায় অন্যান্য সকল চরিত্রই অভিনব।

সুনেত্রা এবং অরুন্ধতী উভয়েই সতীত্ব-মহিমায় মহীয়সী, কিন্তু চরিত্রে পরস্পর বিভিন্ন। নাটকের উচ্চ ভাবতরঙ্গে বিলাসিনী অপ্সরাও নবভাবে ভাবিতা—বিশ্বামিত্রের প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী। স্বর্গে কেবল ভোগ, কিন্তু প্রেমের আদান-প্রদানে মর্ত্ত্য স্বর্গ হইতেও ধন্য। ইন্দ্রের আদেশে মেনকা বিশ্বামিত্রকে ছলনা করিতে আসিয়া বলিতেছে, "বিশ্বামিত্র যদি আমায় পায়ে স্থান দেন, আমি দেবরাজের শচী হবার বাঞ্ছা করি না।" (৩য় অঙ্ক, ৪র্থ গর্ভাঙ্ক।) রম্ভা যখন মেনকাকে প্রশ্ন করিল :

"ত্যজিয়ে অমরে, নরে ভজিবারে
সাধ কি অন্তরে তব?"

মেনকা উত্তরিল :

"যদি নাহি কর উপহাস,
হৃদয়ের সাধ মম করি লো প্রকাশ।
যাই যবে ধরণী ভ্রমণে,

উঠে মম মনে,
প্রেমের বন্ধনে বন্ধে সুখে নর-নারী।
উদ্বাহ-বন্ধন—প্রাণে-প্রাণে অপূর্ব্ব মিলন
দেহ দান—প্রাণ যারে চায়,
নহে কাম পিপাসায়,
যখন যে চায়, সেবিতে তাহায়,
স্বর্গের মতন, নিয়ম নহেক তথা।
নাহি হৃদয়-বন্ধন,
কামক্রিয়া হেতু সম্মিলন,
সত্য কহি, ধিক্কার জন্মেছে মম প্রাণে!
ত্রিদিব মণ্ডলে
ক্রীতদাসী আমরা সকলে,
ধরা-নিবাসিনী
ভাগ্য মানি যত্তেক রমণী!
প্রেমে দেহ বিতরণ—ধরার নিয়ম।" (৩য় অঙ্ক, ১ম গর্ভাঙ্ক।)

আমরা যতদূর দেখিয়াছি, গিরিশচন্দ্রের পূর্ব্বে আর কেহ বঙ্গসাহিত্যে এইরূপ নূতনভাবে অপ্সরা-চরিত্র অঙ্কিত করেন নাই।

এ নাটকের আর-এক নূতন সৃষ্টি—সদানন্দ—রাজ-বিদূষক। কৌতুকে-রহস্যে-রঙ্গে এবং সর্ব্বোপরি অকৃত্রিম সৌহার্দ্দ্যে ও আত্মত্যাগে সদাশয় সরল ব্রাহ্মণ—অসামান্য মহিমায় মহিমান্বিত। সংস্কৃত নাটকের বিদূষক সাধারণতঃ রাজার প্রেমমন্ত্রীরূপে চিত্রিত হইয়া থাকে। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের চিত্রিত সকল বিদূষক চরিত্রই নাটকীয় ঘটনার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে লিপ্ত।

বেদমাতা এবং ব্রহ্মণ্যদেবের চরিত্র স্বতঃই মনের মধ্যে মহান্ এবং গাম্ভীর্য্যময় ভাবের উদ্রেক করে; কিন্তু গিরিশচন্দ্র ব্রহ্মণ্যদেবকে রসে-রঙ্গে সমুজ্জ্বল করিয়া এইরূপ মানবীয়ভাবে পরিস্ফুট করিয়াছেন যে দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। অথচ পরিণামে ইহার আত্মপ্রকাশ অতি সহজভাবেই সাধিত হইয়াছে। বেদমাতা কার্য্য-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ এবং ঘটনার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে লিপ্ত হইয়াও করুণায় এবং হিতৈষণায় অপরূপ গাম্ভীর্য্য ও মাধুর্য্যে পরিস্ফুট হইয়াছে। বিশ্বামিত্রের সৃজিত তরু, লতা, ফল, পুষ্প ও নবস্বর্গ নির্ম্মাণে গিরিশচন্দ্র অতি কৌশলে আধুনিক বৈজ্ঞানিক ক্রমবিকাশের আভাস দিয়াছেন।

আমরা পাঠকবর্গকে কয়েকটী বিষয়ের ইঙ্গিত করিলাম মাত্র। অভিনয় দর্শনে বা নাটকপাঠে দর্শক এবং পাঠক বুঝিবেন যে মৃত্যুর বৎসরেক পূর্ব্বে 'তপোবল' রচিত হইলেও গিরিশচন্দ্রের প্রতিভা তখনও অণুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই। গ্রন্থখানি শ্রীবিবেকানন্দের শ্রীচরণাশ্রিতা—গিরিশচন্দ্রের অশেষ স্নেহ-ভাগিনী, পরলোকগতা সিস্টার নিবেদিতাকে উৎসর্গ করা হইয়াছিল। যথা:

"পবিত্রা নিবেদিতা,

"বৎস! তুমি আমার নূতন নাটক হইলে আমোদ করিতে। আমার নূতন নাটক অভিনীত হইতেছে, তুমি কোথায়? কাল দার্জ্জিলিং যাইবার সময়, আমায় পীড়িত দেখিয়া স্নেহবাক্যে বলিয়া গিয়াছিলে, 'আসিয়া যেন তোমায় দেখিতে পাই।' আমি তো জীবিত রহিয়াছি, কেন বৎসে, দেখা করিতে আইস না? শুনিতে পাই, মৃত্যু-শয্যায় আমার স্মরণ করিয়াছিলে, যদি দেবকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া এখনও আমায় তোমার স্মরণ থাকে, আমার অশ্রুপূর্ণ উপহার গ্রহণ কর।

শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ।"

স্যার জগদীশচন্দ্র বসু

বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক স্যার জগদীশচন্দ্র বসু ও ডাক্তার শ্রীযুক্ত নীলরতন সরকার সি. আই. ই. এবং সিস্টার নিবেদিতা একসঙ্গে দার্জ্জিলিং বেড়াইতে যান। গিরিশচন্দ্রের বিশ্বাস, ভক্তি এবং নাট্যপ্রতিভা সম্বন্ধে সিস্টার নিবেদিতা ইঁহাদের সহিত প্রায়ই নানারূপ কথাবার্ত্তা কহিতেন। নিদারুণ রোগশয্যায় শায়িত হইয়াও তিনি পীড়িত গিরিশচন্দ্র কেমন আছেন জানিবার জন্য উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিতেন। স্যার জগদীশচন্দ্র দার্জ্জিলিং হইতে ফিরিয়া আসিয়া গিরিশচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করেন, এবং সিস্টার গিরিশচন্দ্রকে কিরূপ আন্তরিক ভালবাসিতেন, মুগ্ধচিত্তে তাহা বর্ণনা করেন।

অষ্টচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

জীবনের শেষ দৃশ্য—যবনিকা

কবিরাজ শ্রীযুক্ত শ্যামাদাস বাচস্পতি মহাশয়ের চিকিৎসায় প্রথমে যেরূপ উপকার হইয়াছিল, তাহার পর আর সেরূপ ফল দর্শিল না। এদিকে তখন এত শীত পড়িয়াছে যে, সেরূপ দুর্ব্বল অবস্থায় কোনও চিকিৎসক তাঁহাকে একেবারে পশ্চিমের দারুণ শীতের ভিতর গিয়া পড়িতে পরামর্শ দিলেন না। শীতকালে কলিকাতা মহানগরী সন্ধ্যার পর হইতে কতক রাত্রি পর্য্যন্ত ধূমে আচ্ছন্ন হইয়া থাকে, এই ধূম শ্বাসের সহিত ফুসফুসে প্রবেশ করিয়া হাঁপানী-রোগীর বিশেষ যন্ত্রণাপ্রদ হয়। যে-যে পল্লীতে বস্তি আছে, তত্তৎস্থলে ধূম অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়। গিরিশচন্দ্রের বাটীর সন্নিকটে বস্তি থাকায়, ধূমে তাঁহার অত্যন্ত কষ্ট হইত। একে তিনি বায়ুপথ রোধ করিয়া থাকিতে পারিতেন না, তাহাতে এই ধূমের উৎপাত। পশ্চিম তো যাওয়া হইল না, কলিকাতায় বা তাহার কাছাকাছি এমন কোন স্থান পাওয়া গেল না, যেখানে তিনি ধূমের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারেন। সকলই বিধি-বিড়ম্বনা!

১৩১৬ সাল, মাঘ মাসের শেষভাগে প্রথম কাশীধাম হইতে আসিয়া, কলিকাতায় ধূমের যন্ত্রণায় তিনি ঘুঘুডাঙ্গায় সাহিত্যিক ও সুকবি শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনারায়ণ রায় মহাশয়ের আগ্রহাতিশয্যে তাঁহার 'সুরেন্দ্র-কুটীরে' গিয়া ফাল্গুন ও চৈত্র দুই মাস অবস্থান করেন। গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে আমিও তথায় থাকিতাম। সুরেন্দ্রবাবু যেরূপ শ্রদ্ধা-ভক্তির সহিত তাঁহার পরিচর্য্যা করিয়াছিলেন, তাহা জীবনে ভুলিতে পারিব না। এ বৎসরও পুনরায় ঘুঘুডাঙ্গা যাইবার কথা হয়, কিন্তু তথায় ম্যালেরিয়া জ্বর হইতেছে শুনিয়া সে সঙ্কল্প পরিত্যাগ করা হইল।

গিরিশচন্দ্র পুনরায় হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার অধীনে আসিলেন। তাঁহার পূর্ব্ব-সুহৃৎ খ্যাতনামা ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বরাট মহাশয় সুপ্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ইউনিয়ান সাহেবকে লইয়া চিকিৎসা করিতে আরম্ভ করিলেন। হোমিও-প্যাথিক চিকিৎসায় গিরিশচন্দ্রের যেমন আজীবন অনুরাগ ছিল, নিজেও হোমিও-প্যাথি-মতে চিকিৎসিত হইতে ভালবাসিতেন। ডাঃ ইউনিয়ান তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তায় এবং পূর্ব্ব হইতে সতীশবাবুর মুখে তাঁহার উক্ত চিকিৎসায় অভিজ্ঞতার বিষয় অবগত হইয়া যে ঔষধের ব্যবস্থা করিতেন, তাহা তাঁহাকে জানিতে দিতেন না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় গিরিশচন্দ্র অনুমান করিয়া যে দুই-একটী ঔষধের উল্লেখ

করিতেন, তাহার মধ্যে চিকিৎসকের প্রদত্ত ঔষধের নাম থাকিত। যাহা হউক ক্রমশঃ তিনি নিরাময় হইয়া আসিতে লাগিলেন। কিন্তু তখনও অতি দুর্ব্বল, চিকিৎসকের পরামর্শে প্রত্যহ প্রাতে গাড়ী করিয়া একবার বেড়াইতে আসিতেন। এইরূপে যখন মাঘ মাসের প্রায় অর্দ্ধেক দিন অতীত হইল, তখন সকলের আশা হইল, এ বৎসর ভালয়-ভালয় কাটিয়া গেল। কিন্তু হায় আশা। বার-বার প্রতারিত হইয়াও মন তোমায় প্রত্যয় করিতে চায়! ২০শে মাঘ, শনিবার, আহারাদির পর গিরিশচন্দ্র শয়ন করিয়া আছেন; আমিও আহারাদি করিয়া বৈঠকখানায় বিশ্রাম করিতেছি। দ্বিতীয়া ভার্য্যার লোকান্তর হওয়ার পর হইতে গিরিশচন্দ্র আর অন্তঃপুরে শয়ন করিতেন না। এই সুদীর্ঘ দ্বিতল বৈঠকখানার এক প্রান্ত কাঠের প্রাচীর দ্বারা বিভাগ করিয়া তিনি নিজের শয়নকক্ষে পরিণত করিয়া লইয়াছিলেন। এই দ্বিতল বৈঠকখানার সহিত গিরিশচন্দ্রের কত স্মৃতিই না বিজড়িত, ইহাই তাঁহার অধ্যয়ন কক্ষ—ইহাই তাঁহার চিকিৎসালয়; এই স্থানে প্রত্যহ পরিচিত, অপরিচিত বহু ব্যক্তির সহিত তাঁহার সাহিত্য, ধর্ম্ম প্রভৃতি নানা বিষয়ের আলোচনা হইত। বহিঃসংসারের নানা দুঃখ-তাপ-জ্বালায় উত্যক্ত কর্ম্মক্লান্ত জীবন—এই কক্ষে আসিয়া পরম শান্তিলাভ করিত। এই কক্ষই তাঁহার অমর-কবি-কল্পনার লীলা-বিলাসভূমি! এই কক্ষই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের পদধূলি বক্ষে ধারণ করিয়া গয়া-গঙ্গা-বারাণসীর ন্যায় তীর্থ-মহিমায় মহিমান্বিত! এইখানে অমর মহাকবির অন্তিম শ্বাস অনন্তে বিলীন হইয়াছে।

বলিয়াছি, গিরিশচন্দ্র শয়ন করিয়াছিলেন। ক্ষণেক পরে আমায় ডাকিয়া বলিলেন, "তুমি কি কোথাও বাহির হইবে?" আমি বলিলাম, "না"। তিনি বলিলেন, "আবশ্যক থাকিলেও কোথাও বাহির হইও না, আমি বড়ই অসুখ অনুভব করিতেছি।" বেলা ৪টার সময় তিনি পুনরায় আমায় ডাকিয়া temperature লইতে বলিলেন। আমি temperature লইয়া দেখিলাম, ১০২ ডিগ্রী জ্বর! একটু ইতস্ততঃ করিয়া তাঁহার ভ্রাতা শ্রদ্ধাস্পদ অতুলকৃষ্ণবাবুর পরামর্শানুসারে জ্বরের পরিমাণের কথা তাঁহাকে জ্ঞাপন করিলাম। তিনি বলিলেন, "সেইজন্যই এত অসুস্থতা বোধ করিতেছি।" অতুলবাবু তৎক্ষণাৎ চিকিৎসকগণকে সংবাদ দিলেন। চিকিৎসকগণের ব্যবস্থামত গিরিশচন্দ্র ঔষধ সেবন করিতে লাগিলেন।

শনি ও রবিবারের পর সোমবার ৯৮ ডিগ্রী উত্তাপ দর্শনে সকলেই আশ্বস্ত হইলেন। কিন্তু দেহের উত্তাপ দিন-দিন হ্রাস হইতে লাগিল। আমার উপর উত্তাপ পরীক্ষা করিয়া লিপিবদ্ধ করিবার এবং যথাসময়ে ঔষধ খাওয়াইবার ভার ছিল। মঙ্গলবার ৯৭ ও বুধবার ৯৬ ডিগ্রী উত্তাপ দেখিয়া আমি বলিলাম, "এ কি আশ্চর্য, উত্তাপ যে প্রত্যহ কমিতেছে।" গিরিশচন্দ্র হাসিতে-হাসিতে বলিলেন, "দেখিতেছ কি, ক্রমে collapse হইবে।" আমি সভয়ে বলিয়া উঠিলাম, "অমন কথা বলিবেন না!" তিনি গম্ভীর হইয়া রহিলেন, কোনও উত্তর দিলেন না।

ক্রমশঃ শয়ন করা তাঁহার পক্ষে কষ্টকর হইয়া উঠিল। শুইলেই শ্বাসরুদ্ধ হইয়া আসে। সোমবার রাত্রি কখনও শুইয়া কখনও বসিয়া অনিদ্রায় কাটিল। মঙ্গলবার সমস্ত রাত্রি,

শয়ন করা দূরে থাক্ একটু বালিশে হেলান দিলেই দারুণ যন্ত্রণা বোধ করিতে লাগিলেন। রাত্রি ২টার পর আমাকে শয়ন করিতে বলিলেন। অন্যান্য ব্যক্তি জাগিয়া থাকায় এবং উপর্য্যুপরি রাত্রি জাগরণে আমার যে একটু বিশ্রামের প্রয়োজন, সে অবস্থাতেও তিনি তাহা লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন। আমি শয়ন করিতে ইতস্ততঃ করায় তিনি বলিলেন, "অবুঝ হইও না, পালা করিয়া জাগো, তুমি পড়িলে বড়ই মুস্কিল হইবে। ইহারা তো রহিয়াছে।"* আমি নিরুত্তর হইয়া শয়ন করিলাম। কিন্তু নিদ্রা কোথায়? ঘড়িতে ৩টা বাজিল শুনিলাম। এমনসময়ে গিরিশচন্দ্র যেন হৃদয়ের সমস্ত আবেগ সঞ্চিত ও কেন্দ্রীভূত করিয়া অতি করুণকণ্ঠে তিনবার "রামকৃষ্ণ" নাম উচ্চারণ করিলেন। শুনিয়াই আমি শিহরিয়া উঠিলাম। তাঁহার এরূপ কণ্ঠস্বর আর কখনও শুনি নাই। সে আকুল আহ্বান প্রকাশ করিবার সামর্থ্য আমার নাই! নিমেষে আমার মনে হইল, যেন তিনি স্বীয় ইষ্টদেবতা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে আত্মনিবেদন করিয়া দিয়া বলিতেছেন, "প্রভু আর কেন,—শান্তি দাও—শান্তি দাও—শান্তি দাও।" আমি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া বসিলাম। আমাকে সহসা উঠিতে দেখিয়া, তিনি যেন ধ্যানভঙ্গের ন্যায় চকিত হইয়া বলিলেন, "উঠিলে যে?" আমি বলিলাম, "ঘুম হইল না।" চতুষ্পার্শে চাহিয়া দেখি, যাহাদের সে সময় জাগিবার কথা, তাহারা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের তাহাতে ভ্রূক্ষেপও নাই। আমি কাহাকেও কিছু বলিলাম না, কিন্তু সেই রাত্রিতেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল, গিরিশচন্দ্র আমাদের পরিত্যাগ করিবেন! আমি বলিলাম, "ন'বাবুকে ডাকিব?" তিনি বলিলেন, "ঘুম না হইলে তাহার অসুখ হয়, এখন থাক্।" ৪টা বাজিবার পর বলিলেন, "অতুলকে তোলো।" আমি ভিতর-বাটী হইতে ন'বাবুকে ডাকিয়া আনিলাম। গিরিশচন্দ্র ভ্রাতাকে বলিলেন, "একেবারে নিদ্রা নাই, কিছু বুঝিতে পারিতেছি না।"

সুবিজ্ঞ ডাক্তার শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী ঘোষ, ডাঃ জে. এন. কাঞ্জিলালের সহিত অতি সতর্কভাবে চিকিৎসা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। সমস্ত বুধবার দিবারাত্রি এইভাবেই কাটিল, সমাগত সকলের সহিতই কথাবার্ত্তা কহিতেছেন, কিন্তু নিদ্রা যাইবার উপায় নাই; বলেন, "খাড়া হইয়া বসিয়া কিরূপে ঘুমাই—একি হইল!" কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যরথী স্বর্গীয় অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় গিরিশচন্দ্রকে দেখিতে আসিয়া চুঁচূড়ার 'শিবপ্রিয়' নামক ঔষধের ধূমগ্রহণ করিতে বলেন, এবং চুঁচূড়ায় গিয়া এক কৌটা পাঠাইয়া দেন। গিরিশচন্দ্র উক্ত ধূম গ্রহণ করিয়া প্রথম-প্রথম ফল পাইয়াছিলেন, এ অবস্থাতেও তাহা ব্যবহার করিয়া কতকটা শ্লেষ্মা বাহির হইয়া গেল। কিন্তু নিদ্রা যাইবার কোনওরূপ উপায় হইল না। ইতিপূর্ব্বে 'মিনার্ভা থিয়েটার'

* শ্রীযুক্ত বসীশ্বর সেন বি. এ. এবং শ্রীযুক্ত সতীশ্বর সেন (সাবুবাবু) ভ্রাতৃযুগল শেষরাত্রে জাগিবার জন্য এ সময়ে কক্ষান্তরে নিদ্রা যাইতেছিলেন। তাঁহারা যেরূপ কায়মনে গিরিশচন্দ্রের সেবা করিয়াছিলেন, তাহা একমাত্র সুসন্তানের পিতৃসেবায় সম্ভব। রামকৃষ্ণ মিশন হইতে প্রেরিত সেবাপরায়ণ যুবকগণ এবং ব্রহ্মচারী হরিহর মুখোপাধ্যায়ের নামও এখানে উল্লেখযোগ্য।

ফরিদপুর একজিবিশনে বায়নায় গিয়াছিল, দানিবাবুকেও (তাঁহার একমাত্র পুত্র স্বর্গের শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ) যাইতে হইয়াছিল। সেইদিন (বুধবার) সন্ধ্যার পর অতুলবাবু দানিবাবুকে টেলিগ্রাম করিলেন। কয়েকঘণ্টা পরে তিনি আচ্ছন্ন অবস্থাতেই বলিলেন, "দানি—message।" অতুলবাবু তৎক্ষণাৎ বলিলেন, "হাঁ, দানিকে টেলিগ্রাম করিয়াছি।" তিনি আর-কোনও উত্তর করিলেন না। বুধবারও সমস্ত রাত্রি এইরূপ অনিদ্রাবস্থায় কাটিল। মাঝে-মাঝে অবসন্নতাবশতঃ একটু-একটু আচ্ছন্ন হইতে লাগিলেন। অক্সিজেন্ শ্বাস গ্রহণ করিবার জন্ত যন্ত্র আনয়ন করা হইয়াছিল, তিনি দুই-একবার শ্বাস লইয়া আর লইতে সম্মত হইলেন না।

বৃহস্পতিবার প্রাতে বলিলেন, "আমাকে সরাইয়া আমার বিছানা ঝাড়িয়া দাও।" তাহাই হইল। বেলা ৯টার পর হইতে বলিতে আরম্ভ করিলেন, "চলো।" আমরা বলিলাম, "কোথায় যাইবেন?" তিনি বলিলেন, "গাড়ী আসিয়াছে।"

এইরূপ "চলো-চলো" প্রায়ই অতি আগ্রহের সহিত বলিতে লাগিলেন, অথচ জ্ঞান বেশ আছে। পরিচিত ব্যক্তিমাত্রকেই দুই-একটী কথা বলেন। মেডিক্যাল কলেজের সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার ব্রাউন সাহেবের সহিতও কথা কহিলেন। ডাক্তারসাহেব পরীক্ষান্তে "পীড়া সাংঘাতিক" বলিয়া প্রস্থান করিলেন। মধ্যাহ্নকালে দেবেন্দ্রবাবু আসিয়া গিরিশচন্দ্রের কাছে বসিলেন। গিরিশচন্দ্র জল খাইতে চাহিলে দেবেন্দ্রবাবু জল দিলেন, তিনি স্বহস্তে গেলাস লইয়া পান করিলেন। দেবেন্দ্রবাবু দুই-এক কোয়া কমলালেবুও খাওয়াইয়া দিলেন। কিন্তু কিছুতেই তাঁহাকে শয়ন করাইতে পারিলেন না। শেষে পুনঃ-পুনঃ অনুরোধ করিয়া বুঝিলেন যে তাঁহার কথা তিনি ধারণা করিতে পারিতেছেন না। তখন দেবেন্দ্রবাবু রামকৃষ্ণ-ভক্ত জননী শ্রীশ্রীমার কথা তুলিলেন। বলিলেন, "মার কাছে সংবাদ পাঠাব কি?" গিরিশচন্দ্র স্থিরভাবে কিছুক্ষণ দেবেন্দ্রবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "দেখ, সব ভাল বুঝতে পাচ্চিনি, কেমন গুলিয়ে যাচ্চে।"

অপরাহ্নকাল হইতে প্রায়ই আচ্ছন্ন হইয়া আসিতে লাগিলেন, এইসময়ে কোন কিছু জিজ্ঞাসা করিলে তাহারই দুই-এক কথায় উত্তর দিতেন মাত্র। পূর্ব্বোক্ত 'শিবপ্রিয়' ঔষধের ধূমগ্রহণে উপকার পাওয়ায় আর চারি কৌটা ভ্যালুপেবেলে পাঠাইবার জন্ত চুঁচুড়ায় হারাণবাবুকে পত্র পাঠাইয়াছিলাম। সেইসময়ে পিয়ন কৌটা লইয়া আসিল। কেহ-কেহ বলিলেন, "আর ঔষধের প্রয়োজন কি?" দেবেন্দ্রবাবু বলিলেন, "গিরিশদাদা যখন স্বয়ং ভ্যালুপেবেলে ঔষধ পাঠাইতে লিখিয়াছেন, তখন গ্রহণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য।" ভ্যালুপেবেল গৃহীত হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে গিরিশচন্দ্রের আচ্ছন্নভাব একটু কাটিয়া গেলে আমি বলিলাম "ভ্যালুপেবেল ডাকে 'শিবপ্রিয়' আসিয়াছে।" তিনি বলিলেন, "টাকা দিয়াছ?" আমি বলিলাম, "আজ্ঞে হাঁ।" তিনি বলিলেন, "বেশ করিয়াছ।" তখন বেলা প্রায় ৪টা। কিয়ৎক্ষণ পরে আবার আচ্ছন্ন হইয়া পড়িলেন এবং ঐ অবস্থায় উচ্চৈঃস্বরে 'শিবপ্রিয়' বলিয়া উঠিলেন। ক্রমে আচ্ছন্নাবস্থা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে লাগিল। কখনও "চলো", কখনও "নেশা কাটিয়ে দাও", কখনও "রামকৃষ্ণ" এইরূপ বলিতে লাগিলেন।

রাত্রি ৮টার পর ফরিদপুর হইতে দানিবাবু আসিয়া পঁহুছিলেন। দানিবাবু আসিয়া যখন কাতরকণ্ঠে "বাপি—বাপি" বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন, তখন পুত্রবৎসল পিতা কম্পিত হস্ত পুত্রশিরে অর্পণ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং জল চাহিলেন। পার্শ্বে বেদানার রস ছিল, দানিবাবু ব্যস্ত হইয়া খাওয়াইয়া দিলেন। কিঞ্চিৎ পান করিয়া ঘাড় নাড়িলেন। ফরিদপুর যাইবার সময়ে তিনি দানিবাবুকে বলিয়াছিলেন, "তুমি ঘুরিয়া আইস, অনেক কথা আছে।" সেই কথা স্মরণ করাইয়া দানিবাবু বলিলেন, "বাপি, আমাকে যে কি বলিবে বলিয়াছিলে?" উত্তরে তিনি কি জড়িতস্বরে বলিলেন, ঠিক বুঝা গেল না। ক্রমে আচ্ছন্নভাব বাড়িতে লাগিল। চিকিৎসকগণ বলিলেন, "মহাশ্বাস আরম্ভ হইয়াছে।"

সেদিন অপরাহ্ন হইতে বৃষ্টি পড়িতেছিল। সেই বৃষ্টি উপেক্ষা করিয়া বহুসংখ্যক ব্যক্তি তাঁহাকে দেখিতে আসিতে লাগিলেন, কারণ তাঁহার সঙ্কট অবস্থার সংবাদ সকাল হইতেই সহরে রাষ্ট্র হইয়া পড়িয়াছিল। রাত্রি ১১টার সময় স্বামী সারদানন্দ প্রভৃতি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শিষ্য ও ভক্তগণ এবং সুপ্রসিদ্ধ নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল বসু প্রভৃতি আত্মীয়স্বজনগণ তাঁহার ইষ্টদেবের নামগান আরম্ভ করিলেন। "রামকৃষ্ণ হরিবোল" ধ্বনিতে পল্লী পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। রাত্রি ১টা ২০ মিনিটের (বৃহস্পতিবার, ২৫শে মাঘ, ১৩১৮ সাল) সময় গিরিশচন্দ্রের অন্তিমশ্বাস শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-চরণে বিলীন হইল। তিনদিন অনিদ্রার পর মহাকবি মহানিদ্রায় মগ্ন হইলেন।

পরদিন প্রভাত হইতে না হইতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যান্য ভক্তগণ ও বহুবিধ জনসমাগমে সমস্ত গৃহপ্রাঙ্গণ পরিপূর্ণ হইয়া যাইল। মহাকবিকে একবার শেষদর্শন করিবার নিমিত্ত সকলের এরূপ আগ্রহ, যে, জনতার সুশৃঙ্খলতাসাধন একপ্রকার অসম্ভব হইয়া উঠিল। নাট্যসম্রাটকে কিরূপে সাজাইয়া কিরূপ সমারোহে শ্মশানে লইয়া যাওয়া হইবে, তাহা লইয়া সাধারণের মধ্যে এরূপ আন্দোলন উপস্থিত হইল, যে গিরিশচন্দ্রের সহোদর অতুলবাবুরই বিভ্রম ঘটিতে লাগিল—গিরিশচন্দ্র তাঁহাদের না সাধারণের!

বিচিত্র খট্টায় বিচিত্র পুষ্পলতায় সজ্জিত করিয়া ললাটে "রামকৃষ্ণ" নাম লিখিয়া দিয়া নাট্যসম্রাটকে বাহিরে আনয়ন করা হইল। ফটোগ্রাফারগণ আসিয়া সম্মুখ-পথ রোধ করিলেন। কার্ত্তনওয়ালাদের সহিত ফটোগ্রাফারগণের হুড়াহুড়ি দর্শনে আমরা বিনীতভাবে ফটোগ্রাফারদিগকে নিবেদন করিলাম, "মহাশয়গণ, অনুগ্রহ করিয়া গঙ্গা-তীরে গিয়া ফটো গ্রহণ করিবেন। এ গলি-পথে এত জনতায় আমাদিগকে মহা বিব্রত হইতে হইয়াছে।" দ্রুতবেগে জনতা গঙ্গাতীরাভিমুখে প্রবাহিত হইল।

দেখিতে-দেখিতে কাশী মিত্রের শ্মশান ঘাটে গিরিশচন্দ্রের বন্ধুবান্ধব ও গুণগ্রাহী বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সমাবেশে ৺রাধাকান্ত দেবের মুমূর্ষু-নিকেতন হইতে গোলাবাড়ী ঘাট পর্য্যন্ত মনুষ্য ও যানে পরিপূর্ণ হইয়া গমনাগমন দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। মাননীয় ভূপেন্দ্রনাথ বসু, 'অমৃতবাজার'-সম্পাদক মতিলাল ঘোষ, 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'-সম্পাদক সুবিখ্যাত অধ্যাপক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, পণ্ডিত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ও

সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, রায়সাহেব শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন, 'বিশ্বকোষ'-সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু, দেশপ্রসিদ্ধ নাট্যকার দীনবন্ধুবাবুর পুত্র ললিতচন্দ্র মিত্র, সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার আর. জি. কর, খ্যাতনামা নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, নটচূড়ামণি স্বর্গীয় অর্দ্ধেন্দুবাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র ব্যোমকেশ মুস্তফী, এতদ্ভিন্ন স্বামী সারদানন্দ প্রভৃতি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিষ্য ও ভক্তগণ এবং নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু, অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত মনোমোহন পাঁড়ে, মহেন্দ্রকুমার মিত্র, শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার রায় প্রভৃতি থিয়েটারের কর্তৃপক্ষগণ ইত্যাদি প্রায় সহস্রাধিক ব্যক্তি শ্মশানে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

গিরিশচন্দ্রকে চিতা-শয্যায় শয়ন করাইয়া পুনরায় সহস্রকণ্ঠে "রামকৃষ্ণ হরিবোল" নাম গীত হইতে লাগিল। সেই পরমসময়ে, অগ্নিদেব শতজিহ্বা বিস্তার করিয়া সেই বিশাল বপু গ্রাস করিবার পূর্ব্ব-মুহূর্ত্তে আর-একবার মহাকবিকে প্রাণ ভরিয়া শেষ দেখা দেখিবার জন্য শ্মশানভূমিতে চতুর্দ্দিকস্থ নির্ব্বাপিত চিতাস্তূপের উপর এত জনতা হইল যে কত লোক স্খলিতপদ হইয়া শ্মশান-শয্যায় গড়াগড়ি দিল, তাহার ইয়ত্তা নাই, কিন্তু তাহাতে কাহারও ভ্রূক্ষেপ নাই। বহুশত ব্যক্তি তাঁহার পদতলে মস্তক লুণ্ঠিত করিতে লাগিলেন, কেহ-কেহ-বা পরম ভক্তিসহকারে খট্টাস্থ ফুল মস্তকে স্পর্শ করিয়া দেবতার নির্ম্মাল্যস্বরূপ সযত্নে লইয়া যাইতে লাগিলেন। সেরূপ দৃশ্য জীবনে কখনও দেখি নাই! বাষ্পাকুল লোচনে সেই লোকসমুদ্র দর্শনে বুঝিয়াছিলাম বঙ্গদেশ গুণীর সম্মান করিতে শিখিয়াছে!

দেখিতে-দেখিতে ঘৃত, চন্দনকাষ্ঠ, ধূনা ও কর্পূরে ব্রহ্মণ্যদেব, শতজিহ্বা বিস্তার করিয়া নিমিষ মধ্যে লক্ষ-লক্ষ নাট্যামোদীর প্রিয়দর্শন, বীণাপাণি বাগ্দেবীর বরপুত্র, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-শ্রীচরণ-রজঃপূত সেই বিশাল বপু ভস্মে পরিণত করিলেন। আর এ বিপুল সংসার খুঁজিয়া সে উজ্জ্বল প্রতিভা-মুকুট-মণ্ডিত দেহের চিহ্নমাত্র খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। কেবলমাত্র কয়েকটী ভক্ত এবং বেলুড়মঠের সন্ন্যাসীগণ নববস্ত্র পরিধানে নব তাম্রকুণ্ডে ভস্মাবশিষ্ট চিতা হইতে যত্নসহ অস্থি সংগ্রহ করিয়া প্রস্থান করিলেন। সব শেষ হইল।

ঊনপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ

গিরিশ-প্রসঙ্গ

মানবের চিন্তাপ্রণালী অবগত হইতে পারিলে প্রকৃত মানুষকে বুঝা যায়। আমরা বাছিয়া-বাছিয়া কয়েকটীমাত্র গিরিশ-প্রসঙ্গ প্রকাশ করিলাম। ইহা পাঠ করিয়া সহৃদয় পাঠকগণ আনন্দলাভ করিলে ভবিষ্যৎ সংস্করণে আরও অধিক প্রসঙ্গ প্রকাশের বাসনা রহিল।

নাটক রচনা

গিরিশচন্দ্র জীবনে বহু শোক পাইয়াছিলেন। তাঁহার দারুণ শোকসন্তপ্ত জীবনের সান্ত্বনা ছিল—কবিতা এবং শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের শ্রীপাদপদ্ম। শোক যতই তাঁহার হৃদয়ে উপর্য্যুপরি শেলাঘাত করিয়াছে, গিরিশচন্দ্রের প্রতিভা ততই উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর প্রভা ধারণ করিয়াছে, শ্রীগুরুর উপর নির্ভর ততই দৃঢ়তর হইয়াছে। তিনি বলিতেন, "জীবনে যে কখনও দুঃখের আঘাত পায় নাই, কবিতার সাধনা তাহার বিড়ম্বনা—বিশেষ নাটক রচনা। নাট্যকারকে অনেকরকম অবস্থায় পড়িয়া সত্য উপলব্ধি করিতে হয়। প্রকৃত কবি নিজে যাহা অনুভব করেন না, তাহা লিখেন না। ঈশ্বরের কৃপায় আমি সংসারের ঘৃণ্য বেশ্যা ও লম্পট চরিত্র হইতে জগৎপূজ্য অবতার-চরিত্র পর্য্যন্ত দর্শন করিয়াছি। সংসার বৃহৎ রঙ্গালয়, নাট্যরঙ্গালয় তাহারই ক্ষুদ্র অনুকৃতি।"

গিরিশচন্দ্র বলিতেন, "যতপ্রকার রচনা আছে, নাটক রচনা সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন এবং শ্রেষ্ঠ। ইতিহাস লেখা তাহার নীচে।"

নাটকে অবস্থাগত ভাব ও ভাষা

গিরিশচন্দ্র বলিতেন, "ঘোরতর দুশ্চিন্তায় মানবের মস্তিষ্ক যখন জড়িত হয়, তখন তাহার ভাব ও ভাষাও জড়িত হয়। সূক্ষ্মদর্শী নাট্যকার সেইরূপ অবস্থায় চরিত্রের মুখে জড়িত ভাব ও ভাষা ব্যক্ত করেন। হ্যামলেটের মনে যখন আত্মহত্যা উচিত কি

আপনি আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী

গিরিশচন্দ্রের নূতন নাটক সাধারণে সমাদৃত হইলে, তিনি বিশেষ চিন্তিত হইতেন। বলিতেন, ইহার পর আর কি নূতন লিখিব, যাহা সাধারণের অধিকতর প্রিয় হইবে। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের কোন নাটক সাধারণের নিকট সেরূপ আদৃত না হইলে, তাঁহার উৎসাহ বৃদ্ধি পাইত। বলিতেন, "এবারে নিশ্চয়ই কিছু-একটা নূতন করিতে হইবে।" তিনি প্রায়ই বলিতেন, "আমার মুস্কিল হইয়াছে কি জানো—আমার আপনার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা। রঙ্গালয়কে জীবনের অবলম্বন করিয়া সাধারণের তুষ্টি-সাধনের জন্ত ব্রতী হইয়াছেন—এমন নাট্যকার উপস্থিত বঙ্গ-রঙ্গালয়ে কেহ নাই—কেবল আমিই আছি। আমায় প্রতিবার উত্তম করিতে হয়, আপনাকে আপনি কেমন করিয়া হারাইব। যে নাটক লিখিব, তাহা পূর্ব্ব-রচিত নাটক অপেক্ষা কেমন করিয়া উচাইয়া যাইবে।"

প্রতিভার উপকরণ

গিরিশচন্দ্র বলিতেন, "স্মৃতিশক্তি, কল্পনাশক্তি এবং ইচ্ছাশক্তি সাধারণ অপেক্ষা প্রতিভাশালী ব্যক্তিদিগের অধিক পরিমাণ থাকে। কিন্তু এ শক্তিগুলি তাঁহাদের আয়ত্তের মধ্যে থাকা চাই। নতুবা আয়ত্তাতীত কল্পনাশক্তির প্রভাবে মানুষ পাগল হইয়া যায়। স্মৃতিশক্তি আবার এমন হওয়া চাই যে লিখিবার সময় অনুভূতিসিদ্ধ বিষয়সকল আপনা হইতে মনে উদয় হয়। নচেৎ মহাবীর কর্ণের কার্য্যকালে মহাস্ত্র-সকল বিস্মৃত হইতে হয়। আর ইচ্ছাশক্তির দৃঢ়তা না থাকিলে কল্পনাও কার্য্যে পরিণত করা যায় না।"

গোঁয়ার গোবিন্দের কার্য্য

গিরিশচন্দ্র গোঁয়ারগোবিন্দ কাঠখোট্টা ছেলেদের পছন্দ করিতেন, বলিতেন, "ইহাদের একটু সুবিধা করিয়া লইয়া চালাইতে পারিলে, শিষ্ট-শান্ত, মিউ-মিউয়ে ছেলেদের চেয়ে বেশী কাজ পাওয়া যায়। পাড়ায় কোন বিপদ হইলে ইহারাই আগে আসিয়া দেখা দেয়; নিঃসম্বল নিঃসহায় পরিবারের শব-সৎকারের জন্ত ইহারাই আগে আসিয়া খাট ধরে। একটু মনুষ্যত্ব ইহাদের মধ্যেই থাকে।"

ভাষার প্রাঞ্জলতা

খ্যাতনামা পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মোক্ষদাচরণ সামধ্যায়ী মহাশয় একদিন গিরিশচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। নানা প্রসঙ্গের পর সাহিত্য-প্রসঙ্গ উঠিল। পণ্ডিতমহাশয় গিরিশচন্দ্রকে বলিলেন, "আপনার রচনা এত সরল যে, স্ত্রীলোকের পর্য্যন্ত বুঝিতে কষ্ট হয় না—ইহাই আপনার ভাষার বিশেষত্ব। আমরা লিখিতে যাইলে ভাষাটা সংস্কৃতানুগামী হইয়া পড়ে—সাধারণে সহজে উপলব্ধি করিতে পারে না। কিরূপে প্রাঞ্জল ভাষায় লেখা যায়—এ সম্বন্ধে আমায় কিছু উপদেশ দিতে পারেন?" গিরিশচন্দ্র হাসিতে-হাসিতে বলিলেন, "আপনি পণ্ডিত লোক, আপনাকে উপদেশ কি দিব বলুন, তবে একটা কৌশল বলিয়া দিতে পারি।" পণ্ডিতমহাশয় সাগ্রহে বলিলেন, "কৌশল—সে কিরূপ?" গিরিশচন্দ্র বলিলেন, "আপনার বাড়ীতে ছেলে-মেয়েদের সহিত যেরূপ ভাষায় কথা কহেন, সেইরূপ ভাষায় লিখিবেন; দেখিবেন—সে ভাষা বুঝিতে কাহারও কোন কষ্ট হইবে না এবং বার-বার অভিধান খুলিবারও প্রয়োজন হইবে না।"

উপস্থিত রচনাশক্তি

একদিন যুবা গিরিশচন্দ্র অফিস যাইবার জন্য পথে বাহির হইয়াছেন, এমনসময়ে তাঁহার পরিচিত কোনও ভদ্রলোক আসিয়া অনুরোধ করেন, "আমি বেহাই বাড়ীতে লিচু পাঠাইতেছি, তোমায় একটা কবিতা বেঁধে দিতে হবে।" গিরিশচন্দ্র তৎক্ষণাৎ লিখিয়া দিলেন:

"সুগোল কণ্টকময় পাতা কুচু কুচু,
সবিনয় নিবেদন পাঠা'তেছি কিছু।
দেখিলেই বুঝিবেন রসভরা পেটে,
মধ্যেতে বিরাজ করে আঁটি বেঁটে-বেঁটে।
সুরস রসেতে যদি রসে তব মন,
জানিবেন এ দাসের সিদ্ধ আকিঞ্চন।"

কলানৈপুণ্য

গিরিশচন্দ্র বলিতেন, "কলা-কৌশল গোপনই শ্রেষ্ঠ কলানৈপুণ্য।"

চিত্রকর ও কবি

গিরিশচন্দ্র বলিতেন, "চিত্রকরের ন্যায় কবিও চিত্র করেন। একজন বর্ণে—অপরজন কথায়। আমি আমার রচনায় ঠিক-ঠিক ছবি তুলিবার চেষ্টা করিয়াছি।"

Paradise Regained.

গিরিশচন্দ্র বলিতেন, "মিল্টনের *Paradise Lost* মহাকাব্যেরই সাধারণে বিশেষ আদর। *Paradise Regained* তত আদর করিয়া কেহ পড়ে না। আমি কিন্তু শেষোক্ত কাব্যের নিকট বিশেষ ঋণী। *Paradise Regained* না পড়িলে আমি 'চৈতন্যলীলা' যেরূপভাবে লিখিয়াছি, তেমন করিয়া লিখিতে পারিতাম না।" বলা বাহুল্য, 'চৈতন্যলীলা' লিখিবার পূর্ব্বে গিরিশচন্দ্রের পরমহংসদেবের সহিত পরিচয় হয় নাই।

উপন্যাস

উপন্যাস-পাঠ সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্র বলিতেন, "ফিল্ডিং, স্কট, ডিকেন্স, থ্যাকারে প্রভৃতির উপন্যাস আগে পাঠ করা উচিত। (সমসাময়িক লেখকদিগের মধ্যে তিনি মেরি কোরেলির বড়ই সুখ্যাতি করিতেন।) ফরাসী উপন্যাস-লেখকগণের গল্প-রচনাশক্তি অতি উৎকৃষ্ট; যেমন ডুমা প্রভৃতি। ইংরাজ উপন্যাস-লেখকগণ যেমন চরিত্র-অঙ্কনে, ফরাসী উপন্যাস-লেখকগণ তেমনি গল্প-সৃজনে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু ভিক্টর হিউগোর যেমন চরিত্র-সৃজনশক্তি, তেমনি গল্প-রচনা—তেমনি কল্পনাশক্তি ছিল। যদি এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস-লেখকের হাস্যরসে অধিকার থাকিত, তাহা হইলে ইঁহাকেই অনেকাংশে সেক্সপীয়ারের সমকক্ষ কবি বলা যাইত।"

হিন্দু শাস্ত্রকারগণের প্রতি শ্রদ্ধা

হিন্দু শাস্ত্রকারগণের উপর গিরিশচন্দ্রের অগাধ শ্রদ্ধা ছিল। তিনি বলিতেন, "ইঁহারা চিন্তার যেসকল স্তর উদ্ভাবন করিয়াছেন, সাধারণ মানববুদ্ধি সে স্তরে উপনীত হইতে পারে না। নাস্তিকতার অনুকূলে শাস্ত্রকারগণ যে সকল তর্কযুক্তি দেখাইয়াছেন, ইয়ুরোপীয় বড়-বড় দার্শনিক নাস্তিকগণের মস্তিষ্কে সে সকল তর্কযুক্তি উদয় হয় নাই। অদ্ভুত এই প্রখর তর্কযুক্তি অবশেষে পরাস্ত করিয়া ইঁহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে

মীমাংসা করিয়াছেন। আমি দেখিয়াছি, শাস্ত্রকারগণ আমার জন্য পূর্ব্ব হইতেই তর্কযুক্তি চিন্তা দ্বারা আমার জ্ঞাতব্য বিষয় সকলের মীমাংসা করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। এমন অনুকূল বা প্রতিকূল যুক্তি চিন্তা কোথাও দেখি নাই, যাহা পূর্ব্ব হইতেই শাস্ত্রকারগণের মস্তিষ্কে উদয় হয় নাই, এবং তাহার মীমাংসা তাঁহারা করিয়া যান নাই।"

আত্মজীবনী রচনা

কোন সময় আত্মজীবনী লিখিবার জন্য অনুরোধ করিলে গিরিশচন্দ্র বলিয়াছিলেন, "সে বড় সহজ কথা নয়। বেদব্যাস তাঁহার জন্মবৃত্তান্ত যেরূপ অকপটে বলিয়াছেন, যখন আত্মদোষ ব্যক্ত করিবার সেইরূপ সাহস হইবে তখন আত্মজীবনী লিখিবার কথা উত্থাপন হইতে পারে। নচেৎ আত্মজীবনী লিখিতে বসিয়া আপনাকে আপনার উকীল হইতে হয়, কেবল দোষক্ষালনের চেষ্টা এবং আত্মম্ভরিতা প্রকাশ।"

তর্কশক্তি

গিরিশচন্দ্র বলিতেন, "যত বড় খ্যাত্যাপন্ন ও শক্তিশালী লেখক হউন না, আমি কখনও মনে-মনে তর্ক-বিতর্ক না করিয়া তাঁহার কোন সিদ্ধান্ত মানিয়া লই নাই।" এই প্রণালীতে অধ্যয়ন করায় গিরিশচন্দ্রের তর্কশক্তি এত প্রখর হইয়াছিল যে সহজে তাঁহাকে পরাস্ত করা একপ্রকার দুঃসাধ্য হইত।

তর্কে গিরিশচন্দ্রের কখনও ঔদ্ধত্যভাব প্রকাশ পাইত না, কিন্তু তিনি সে সময় আত্মহারা হইয়া যাইতেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহার প্রখর তর্কশক্তির পরিচয় পাইয়া সময়ে-সময়ে তাঁহাকে উপস্থিত কাহারও-কাহারও সহিত তর্কযুদ্ধে নিয়োগ করিয়া দিতেন। এইরূপে একদিন স্বনামখ্যাত মহিমচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর সহিত তাঁহার তর্কযুদ্ধ উপস্থিত হয়। কিছুক্ষণ তর্কের পর মহিমচন্দ্র গিরিশচন্দ্রের সিদ্ধান্ত মানিয়া লইলেন। তর্কশেষে গিরিশচন্দ্র স্থানান্তরে গমন করিলে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব মহিমচন্দ্রকে বলিলেন, "আপনি দেখ্‌লে, ও জল খেতে ভুলে গেল।* যদি ওর কথা না মান্‌তে, তাহলে তো মায় ছিঁড়ে খেত।" কিন্তু ইদানীং তিনি আর বড় তর্ক করিতেন না। 'শঙ্করাচার্য্য' নাটকের এক স্থলে গিরিশচন্দ্র লিখিয়াছেন, "তর্ক-বুদ্ধি নাশ হেতু তর্ক প্রয়োজন।" (৩য় অঙ্ক, ৪র্থ গর্ভাঙ্ক।)

* কিছুক্ষণ পূর্ব্বে গিরিশচন্দ্র জল চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তর্ক করিতে-করিতে তাঁহার তৃষ্ণার কথা মনেই ছিল না।

শ্রীরামকৃষ্ণের গুণানুকীর্তন

পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দ ও গিরিশচন্দ্রের শ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে আলোচনা শুনিবার জন্ম বহু ভক্ত আগ্রহে ছুটিয়া আসিতেন। কলিকাতায় অবস্থানকালীন স্বামীজী প্রায়ই সহচর ভক্তগণকে বলিতেন, "চল হে, G. C.-র সঙ্গে খানিক false talk করতে যাই।" গিরিশচন্দ্রকে গুরু-নিন্দায় আহত করিয়া স্বামীজী তৎ-পরিবর্তে গুরু-গুণ-কীর্তন শ্রবণে অজস্র আনন্দে ভরপুর হইয়া প্রস্থান করিতেন।

শান্তি

গিরিশচন্দ্র একদিন আমায় কথা-প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করেন, "যত্তপি ভগবান সদয় হইয়া তোমায় কেবলমাত্র একটী বর দিতে চাহেন, তাহাহইলে তুমি কি বর প্রার্থনা করিবে? তাঁহার কাছে চাহিবার মত কি আছে?" আমি উত্তরে "ধর্ম্মে যেন মতি থাকে" ইত্যাদি নানারূপ বলিলাম। গিরিশচন্দ্র বলিলেন, "তুমি সব ভাবিয়া চিন্তিয়া সাজাইয়া বলিতেছ। কথাটা কি জানো,—টাকা, মান প্রভৃতি যে যাহা চাহিতেছে, শান্তির জন্তই চাহিতেছে; মনে করিতেছে, ঐসকল পাইলেই শান্তি পাইবে। প্রত্যেক মানুষই শান্তির প্রার্থী। যে যে-অবস্থাগত হোক, সকলে শান্তির প্রয়াসী, শান্তি ভিন্ন আর দ্বিতীয় প্রার্থনা নাই।"

বিপদে প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব

আর-একদিন গিরিশচন্দ্র বলিয়াছিলেন, "তুমি পল্লীগ্রামে বাস করো, হঠাৎ মাঠে যদি লাঠি হস্তে তোমাকে দস্যুতে আক্রমণ করে, তুমি কি করিবে?" আমি উত্তর করিতে না পারায় তিনি বলিয়াছিলেন, "দেখ, ঐ সময় অনেকে ছুটিয়া পলাইবার চেষ্টা করে এবং লাঠিটী ঘাড়ে পাতিয়া লইবার সুযোগ করিয়া দেয়। কিন্তু এরূপ বিপদে পড়িলে উচিত, দস্যু লাঠি উত্তোলন করিবামাত্র তাহারই দিকে ছুটিয়া গিয়া তাহার কোমর জড়াইয়া ধরিয়া পেটে মাথা গুঁজিয়া দেওয়া। আর সেই সুযোগে এক মুঠা ধূলা সংগ্রহ করিয়া যদি কোনওরূপে দস্যুর চক্ষে নিক্ষেপ করিতে পার তাহাহইলে পলাইবার এমন সুযোগ আর পাইবে না।"

প্রলোভনে সৎকার্য্যে প্রবৃত্তিদান

আমি একসময় একখানি উপন্যাস পাঠ করিয়া গিরিশচন্দ্রকে বলি, "মহাশয়, এ গ্রন্থ-প্রণেতার একটি রচনা-বৈচিত্র্য এই, নায়ক যেখানে-যেখানে নিঃস্বার্থভাবে কার্য্য করিতেছে, অচিরে, ভগ্নিমিত্ত সে পুরস্কৃত হইতেছে। বেশ স্থকৌশলে গ্রন্থ-রচয়িতা সৎকার্য্যে উৎসাহপ্রদান করিয়াছেন।" গিরিশচন্দ্র গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন, "গ্রন্থকারের এরূপ পুরস্কারের প্রলোভন দেখাইয়া সৎকার্য্যে প্রবৃত্তিদান আমি আদৌ ভাল বলি না। প্রথমতঃ সত্যের সংসারে এরূপ সকল সময় দেখা যায় না। সৎকার্য্য করিয়া জীবনে কখন কেহ ফল পায়, কেহ-বা ইহজীবনে পায়ই না। কিন্তু সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান সৎকার্য্যের জন্য—সুফলপ্রাপ্তির জন্য নয়, উচ্চপ্রকৃতি গ্রন্থকার এই উচ্চ-আদর্শ মানব-চক্ষে ধরিবার প্রয়াস পাইবেন। সংসারে এরূপ লোক আছে, যাহারা সৎকার্য্য করিয়া পুরস্কারের প্রত্যাশা করে এবং না পাইলে সৎকার্য্যে আস্থাহীন হয়। তুমি যেরূপ পুস্তকের কথা বলিতেছ, এরূপ পুস্তকে এইসকল লোকের ভ্রান্তবিশ্বাসকে বদ্ধমূল করে, কিন্তু তাহারা যখন কর্ম্মক্ষেত্রে বিপরীত দেখে, তখন তাহাদের ধর্ম্মের প্রতিও বিশ্বাস হারাইয়া যায়।"

সময়ের মূল্য

গিরিশচন্দ্র সময়ের মূল্য বুঝিতেন, কাহারও সময় নষ্ট করিতে তিনি ভালবাসিতেন না। কোনও পাওনাদার গিরিশচন্দ্রের নিকট আসিয়া বৈঠকখানায় বসিতে না বসিতে তিনি বাক্স হইতে টাকা বাহির করিয়া দিয়া পরে ভৃত্যকে বলিতেন, "বাবুকে তামাক দে।" নচেৎ সঙ্গে-সঙ্গে বলিতেন, "অমুকদিন অমুক সময় আসিবেন।" তিনি বলিতেন, "দুই ঘণ্টা বাজে গল্পে বসাইয়া রাখিয়া পরে টাকা দেওয়া বা 'অন্যদিন আসিও' বলা আমি একেবারে পছন্দ করি না। কার্য্য শেষ করিয়া সে তাহার সুবিধামত তিন ঘণ্টা গল্প করুক, তাহাতে আমার আপত্তি নাই।"

অকৃতজ্ঞ দেহ

একদিন দুরন্ত হাঁপানী পীড়ায় যন্ত্রণাভোগ করিতে-করিতে গিরিশচন্দ্র হাসিতে-হাসিতে বলিলেন, "দেখ, অকৃতজ্ঞ দেহটার উপর আর আমার কোনও মমতা নাই। এই দেহের পুষ্টির জন্য কত উপাদেয় আহার দিয়েছি, কত যত্নে ইহাকে সাজিয়েছি-গুছিয়েছি,—কিন্তু এই দেহই পরম যত্নে হাঁপানীকে ডাকিয়া আনিয়া আশ্রয় দিয়াছে। সত্য বলিতেছি, আমার প্রাণের ইচ্ছা নয় যে এই রোগ আমার সারিয়া যায়। হাঁপানীর

প্রত্যেক টানে দেহের ক্ষণভঙ্গুরতার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।" এই বলিয়া তিনি গদ্‌গদকণ্ঠে সরল প্রার্থনার স্বরে বলিলেন, "জগদীশ্বর, জগদীশ্বর, তুমি মঙ্গলময়—যেন জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত এই বিশ্বাস থাকে।"

প্রায়শ্চিত্ত

একদিন এক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত কথাপ্রসঙ্গে গিরিশচন্দ্রকে বলিতেছিলেন, "কৃতাপরাধের জন্য ঈশ্বরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত। হিন্দুদিগের প্রায়শ্চিত্তবিধির এই উদ্দেশ্য।" গিরিশচন্দ্র বলিলেন, "প্রার্থনার পূর্ব্বেই তো তিনি ক্ষমা করিয়াছেন, সংসারে প্রতি পদক্ষেপে আমাদের অপরাধ হইতেছে। তিনি দোষ গ্রহণ করিলে মানুষের সাধ্য কি এক মুহূর্ত্ত স্থির থাকে।"

তীব্র অনুভব

একদিন মধ্যাহ্নে গিরিশচন্দ্র আহার করিয়া বৈঠকখানায় বসিবার পর শ্রীযুক্ত মণিলাল মুখোপাধ্যায় নামক পল্লীস্থ একটী যুবা আসিলেন। গিরিশচন্দ্র তাঁহার শোক-কাতর মুখ দেখিয়া, কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া শুনিলেন, ভদ্রলোকটীর জ্যেষ্ঠ পুত্র সম্প্রতি গঙ্গায় ডুবিয়া মারা গিয়াছে। অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তার পর বাবুটী চলিয়া গেলে নিত্য-নৈমিত্তিক অভ্যাসমত গিরিশচন্দ্র শয়ন করিতে গেলেন। কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই শসব্যস্ত হইয়া পুনরায় বৈঠকখানায় আসিয়া বসিলেন। হঠাৎ উঠিয়া আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, "শয়ন করিয়া মণিবাবুর ছেলেটীর কথা ভাবিতেছিলাম। জলমগ্ন হইয়া বালক শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য কিরূপ ছট্‌ফট্ (struggle) করিয়াছিল, মনে উদয় হইল, সেই কথা ভাবিতে-ভাবিতে আমারও ঠিক সেইরূপ শ্বাসরুদ্ধ হইবার উপক্রম হইল। শেষ আর মশারির মধ্যে থাকিতে পারিলাম না, বাতাসের জন্য প্রাণ যেন হাঁপাইয়া উঠিতে লাগিল। তাড়াতাড়ি তাই বাহিরে আসিলাম।"

স্বামী বিবেকানন্দ

একদিন গিরিশচন্দ্র বলরাম বসুর বাটীতে গিয়া দেখেন স্বামী বিবেকানন্দ কয়েকজন যুবককে ঋগ্বেদ পড়াইতেছেন। তাঁহাকে দেখিয়া স্বামীজী বলিলেন, "এই যে G. C. এসেছ, একটু বেদ শোনো।" গিরিশচন্দ্র বলিলেন, "ওতে ঠাকুরের ভাবসমাধির কথা কিছু আছে?" এই বলিয়া তিনি পরমহংসদেবের ভাবসমাধির বর্ণনা-

করিতে লাগিলেন। তাহার পর কথায়-কথায় তিনি দেশের দুর্দশার কথা উল্লেখ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "গ্রামেতে অসহায়া বৃদ্ধা—তার বিধবা মেয়েকে নিয়ে শুয়ে আছে, বদমাইস লম্পটেরা বেড়া কেটে সেই মেয়েকে নিয়ে যাচ্ছে,—তার তুমি কি ক'চ্ছ? বাড়ীতে উৎসব, আর তার পাশের বাড়ীতে না খেয়ে মরুচে,—তার কি ক'চ্ছ?" দেশের এইভাবের শোচনীয় অবস্থার কথা তিনি এরূপ করুণকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, যে সেই কথা শুনিতে-শুনিতে স্বামীজীর চক্ষু দিয়া দরবিগলিতধারে অশ্রুপ্রবাহ বহিতে লাগিল। তিনি অত্যন্ত কাতরভাবে বলিতে লাগিলেন, "হ্যাঁ, তাই তো G. C., কি করবো—কি করবো"—বলিতে-বলিতে তিনি যেন তন্ময় হইয়া গেলেন। স্বামীজীর এই ভাবদর্শনে তাঁহার গুরুভ্রাতাগণ ব্যস্ত হইয়া গিরিশচন্দ্রকে এই প্রসঙ্গ হইতে বিরত হইবার নিমিত্ত ইঙ্গিত করিলেন।

সকলে নিস্তব্ধ, কিছুক্ষণ পরে ব্রহ্মানন্দস্বামী স্বামীজীকে কক্ষান্তরে লইয়া গেলেন। গিরিশচন্দ্র সমবেত ভক্তমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "এইজন্যই ইনি জগজ্জয়ী স্বামী বিবেকানন্দ! যার দয়া নাই, তার ধর্ম্ম কোথায়?"

স্মৃতিশক্তি

গিরিশচন্দ্রের অদ্ভুত স্মরণশক্তি ছিল। রামায়ণ, মহাভারত, মিল্টন ও সেক্সপীয়ারের নাটকগুলির বহুস্থান তিনি মৌখিক আবৃত্তি করিয়া যাইতেন। যে লোকের সহিত একবার তাঁহার পরিচয় হইত বহুকাল পর দেখা হইলেও প্রথমে তাঁহার সহিত যে-যে কথা হইয়াছিল—অবিকল বলিয়া দিতে পারিতেন। তিনি যে গ্রন্থ পড়িতেন, তাহার প্রয়োজনীয় স্থানগুলির পৃষ্ঠা এমনকি পঙক্তি পর্য্যন্ত তাঁহার কণ্ঠস্থ থাকিত।

গিরিধারী বসু নামক তাঁহার জনৈক বাল্যবন্ধু একদিন তাঁহাকে বলেন, "প্রত্যহ যখন বহু রোগীকে তোমায় ঔষধ দিতে হয়, তখন একখানি খাতায় রোগীদের ও ঔষধের নাম লিখিয়া রাখ না কেন?" গিরিশচন্দ্র বলিলেন, "আমার যখন মনে থাকে, তখন আর লিখিয়া রাখিবার আবশ্যক কি?" গিরিধারীবাবু বলিলেন, "আট বৎসর পূর্ব্বে তুমি আমার মার অসুখে কি-কি ঔষধ দিয়াছিলে বল দেখি?" গিরিশচন্দ্র সেই ঔষধগুলির নাম করিয়া গেলে, তাঁহার আর বিস্ময়ের সীমা রহিল না।

গিরিশচন্দ্র কখনও দাগ দিয়া বই পড়িতেন না। বলিতেন, "দাগ দিয়া বই পড়িলে memory-কে সীমাবদ্ধ করা হয়। দেখ—বাড়ীর ঝি-চাকরেরা কিছু লিখিয়া লইয়া বাজারে যায় না, কিন্তু সে সিকি পয়সা, আধ পয়সা, দেড় পয়সার সমুদায় জিনিস খরিদ করিয়া আনিয়া তাহার হিসাব বুঝাইয়া দেয়—একটী পয়সারও ভুলচুক হয় না। আর তুমি ফর্দ্দ করিয়া বাজার কর, প্রত্যেক বারে সেটা দেখিতেছ ও কিনিতেছ, কিন্তু তাহাতেও হয়তো ভুল থাকিয়া যায়।"

স্বজাতি-বাৎসল্য

যেবার মোহনবাগান ফুটবল খেলায় প্রথম 'শিল্ড' পাইয়াছিল, সেদিন গিরিশচন্দ্রের উৎসাহ ও আনন্দ দেখিলে কে মনে করিত যে ইনি বৃদ্ধ ও রোগজীর্ণ। তাঁহার এত আনন্দের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, "ইংরাজের সঙ্গে বাঙ্গালীর ছেলেরা দৈহিক বলে কখনও যে প্রতিদ্বন্দ্বী ক্ষেত্রে দাঁড়াইতে পারে, ইহা কাহারও ধারণা ছিল না। কিন্তু ছেলেরা যে গোরা সৈন্যদলকে তাদেরই খেলাতে পরাজিত করিতে পারিয়াছে, ইহাতে আর কিছু না হউক, একদিন বাহুবলেও যে তাহারা গোরার প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইতে সক্ষম হইবে—এই আশার উদ্রেক করিয়া দেয়। ইহা বড় কম কাজ নয়, এই 'শিল্ড' জয়লাভে বাঙ্গালী জাতি দশ বৎসর আগাইয়া গেল।"

অভিনয় শিক্ষাপ্রণালী

বাঙ্গালা নাট্যশালায় দুইজন শিক্ষকের চূড়ামণি ছিলেন। একজন গিরিশচন্দ্র, আর-একজন অর্দ্ধেন্দুশেখর। শিক্ষকতা সম্বন্ধে এই দুইজনকে ছাড়াইয়া কেহ যান নাই। দলগঠন করিয়া, দলের উপযোগী নাটক লিখিয়া গিরিশচন্দ্র এদেশে থিয়েটারের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, এই সৃষ্টি-কার্য্যে অন্যান্য উত্তরসাধকের মধ্যে অর্দ্ধেন্দুশেখরের নামই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আমরা গিরিশচন্দ্রের শিক্ষকতা প্রসঙ্গে অর্দ্ধেন্দুশেখরের নাম করিলাম এই নিমিত্ত, যে এই দুইজন আচার্য্যের শিক্ষকতার প্রণালী কিরূপ ছিল, তুলনায় সংক্ষিপ্তভাবে বলিলেই পাঠক সহজেই বুঝিতে পারিবেন, শিক্ষাদানকার্য্যে গিরিশচন্দ্রের বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য কোথায়? অর্দ্ধেন্দুশেখর নাট্যকার ছিলেন না, অন্য লোকের নাটক লইয়া তাঁহাকে শিখাইতে হইত। গিরিশচন্দ্র নিজে নাটক লিখিতেন এবং তাহার অভিনয় সম্বন্ধে যথাযথ শিক্ষা দিতেন। কাজেই এককথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, গিরিশচন্দ্রকে বাঙ্গালার নাট্যশালা তৈয়ারী করিতে গিয়া রথ ও পথ দুই-ই নির্ম্মাণ করিতে হইয়াছে। আমরা অর্দ্ধেন্দুশেখরের রিহারস্তালও দেখিয়াছি—গিরিশচন্দ্রের রিহারস্তালও দেখিয়াছি, নাটকীয় চরিত্রের ও রূপ-কল্পনায় অর্দ্ধেন্দুশেখর যেরূপ বুঝিতেন, শিক্ষার্থীকে হুবহু তাহারই অনুকরণ করিতে বলিলেন। ইহাতে শিক্ষার্থীর পক্ষে শিক্ষা করাটা অনেকসময় কষ্টকর হইয়া পড়িত। আদর্শ হস্তলিপি লিখিয়া দিলাম, তুমি যতটা পারো, আদর্শের অনুকরণ করো—এই ছিল অর্দ্ধেন্দুশেখরের শিক্ষার মূলমন্ত্র। সাধারণ শিক্ষার্থীর পক্ষে এভাবে অগ্রসর হওয়া কষ্টকর হইলেও একটা ছবি তাহারা খাড়া করিতে পারিত। গিরিশচন্দ্রের শিক্ষাপ্রণালী ছিল সম্পূর্ণ অন্যধরনের। কোন নূতন নাটকের শিক্ষাদানের পূর্ব্বে তিনি অনেকসময়েই সমগ্র নাটকখানি সমবেত অভিনেতা ও অভিনেত্রীর সম্মুখে পাঠ করিতেন। এই পাঠের সময় শ্রোতারা নাটকীয় সকল চরিত্রের ছবি, রূপ ও কল্পনা—জীবন্ত ছবির মত দেখিতে

পাইত। চরিত্রগত রস, চরিত্রের বৈশিষ্ট্য—সমগ্র নাটকের উপর প্রত্যেক চরিত্রের প্রভাব অভিনেতৃদিগের সহজেই বোধগম্য হইত। যেমন কোন যন্ত্রের ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রত্যেক অংশেরই কার্য্যকারিতা আছে, তেমনি নাটকীয় plot-এ ছোট বড় সকল চরিত্রেরই প্রয়োজনীয়তা থাকে। সমগ্র নাটক প্রণিধান না করিলে, তাহা সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করা যায় না।

তাহার পর গিরিশচন্দ্র প্রত্যেক চরিত্রের বিশেষতঃ নাটকীয় বড়-বড় চরিত্রের অভিনয় কিরূপ হইবে, তাহা অনেকটা শিক্ষার্থীদিগের স্বাভাবিক শক্তির উপর নির্ভর করিয়াই শিখাইতেন। যাঁহার কণ্ঠে যেভাবে বলিলে সহজে দর্শকের ও অভিনেতার হৃদয়গ্রাহী হয়, অঙ্গভঙ্গী বা ভাবের অভিব্যক্তি কোন অভিনেতার অঙ্গভঙ্গী, মুখ ও নয়নের ভঙ্গীতে সুন্দর হয়, সুপরিস্ফুট হয়—সেইদিকে তাঁহার খরদৃষ্টি থাকিত, অর্থাৎ অভিনয়কলা-বিকাশে যাঁহার যতটুকু শক্তি বা সামর্থ্য—তাঁহার সেই শক্তি ও সামর্থ্যের যাহাতে অনুশীলনের দ্বারা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হয়, সেইদিকেই লক্ষ্য রাখিতেন। কাহারও মৌলিকতা (orginality) নষ্ট করিয়া কেবলমাত্র অনুকরণ-পটু করিতে তিনি চাহিতেন না। উদাহরণ দিয়া বলি, জগৎসিংহ শিখাইতেছেন কি আয়েষা শিখাইতেছেন —তিনি আগে এই চরিত্রদ্বয়ের যতপ্রকার interpretation হইতে পারে, দৃশ্যের অভিনেতা ও অভিনেত্রীকে নিজে সেইভাবে অভিনয় করিয়া দেখাইয়া দিতেন। পরে তাঁহাদের বলিতেন, "এই বিভিন্ন ভাবের অভিব্যক্তির মধ্যে কোনটা কাহার ভাল লাগিল ?" যেরূপ উত্তর পাইতেন, শিক্ষাকার্য্য সেইরূপভাবেই চলিত।

এইরূপে অভিনয়কলার স্বাভাবিক বিকাশে অনুকরণের ক্লেশ হইতে মুক্তি পাইয়া অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের স্ফূর্ত্তি হইত। অভিনয়েও রস সহজেই জমিয়া যাইত। এইভাবে শিক্ষা দিতেন বলিয়া গিরিশচন্দ্রের হাতে-গড়া অভিনেতা-অভিনেত্রীদের মধ্যে একটা নির্দ্দিষ্ট ধারা বড় দেখা যাইত না। সামান্য দূত হইতে রাজা ও রাণীর অভিনয় পর্য্যন্ত সরল সচ্ছন্দ গতিতে স্বাভাবিকভাবেই সম্পন্ন হইত। তাঁহার শিক্ষাদানে গঠিত নাটকে কোনও মামুলি ধাচ (sterio-type) থাকিত না। স্বর্গীয় অমৃতলাল মিত্রের স্বাভাবিক কণ্ঠস্বর ছিল একটু সুরেলা, 'গ্রেট ট্রাজিডিয়ান' মহেন্দ্রলাল বসুর কণ্ঠস্বর ছিল প্রায় সুর-বর্জ্জিত। অনেকসময় একই ভূমিকা গিরিশচন্দ্রের এই দুইটী কৃতী শিষ্য—তাঁহারই শিক্ষকতায় স্ব-স্ব স্বভাব অনুযায়ী অভিনয় করিয়াছেন,—অথচ উভয়ের অভিনয়েই রসের ব্যাঘাত কিছুমাত্র ঘটে নাই।

শিক্ষাদানকালে যেমন, তেমনই আবার নাটক লিখিবার সময়েও গিরিশচন্দ্র নিজ দলের প্রধান-প্রধান অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণের আবৃত্তি ও অভিনয় করিবার ক্ষমতার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া নাটকের ভাব ও ভাষা রচনা করিতেন। এইজন্যই অভিনেতা ও অভিনেত্রীরা তাঁহার নূতন নাটকে কোন ভূমিকা পাওয়া সৌভাগ্য বলিয়া মনে করিতেন। অল্প আয়াসে অভিনয়-নৈপুণ্য প্রদর্শনের এরূপ সুযোগ ও সুশিক্ষা তাঁহারা আর কোথাও পাইতেন না।

কালিদাস ও সেক্সপীয়ার

গিরিশচন্দ্র বলিলেন, "কালিদাস মহাকবি, 'শকুন্তলা' নাটকে অতি উচ্চ অঙ্গের নাট্যকলার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথম দৃশ্য দেখ : রাজা পরিশ্রান্ত, ক্লান্ত ; মৃগকে শর-সন্ধান করিয়াছেন, এমনসময় শুনিলেন, 'মহারাজ, এ আশ্রম-মৃগ, বধ করিবেন না,—বধ করিবেন না।' তাহার পর মুনিগণ তাঁহাকে কণ্বমুনির আশ্রমে গিয়া আতিথ্য স্বীকার করিয়া শ্রান্তি দূর করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিলেন। রাজা ভাবিলেন, আজ রাত্রে দীর্ঘশ্মশ্রু মুনিগণের সহবাস, শাস্ত্রীয় আলাপন এবং হরিতকী ভক্ষণ! এই কল্পনায় রাজা চলিতেছেন, সহসা পথে তিনটী অপূর্ব্বা সুন্দরীর সহিত সাক্ষাৎ। তাঁহাদের মিষ্ট হাস্তে, মিষ্ট ভাষায় রাজা বিমোহিত, এখানে আর মদনের শর-সন্ধানের অপেক্ষা করে না।

"আবার দেখ, আশ্রমের এই প্রেম-কাহিনী দুর্ব্বাসার শাপে রাজা বিস্মৃত হইলেন ; অভিজ্ঞানপ্রাপ্তে সে মোহ কাটিয়া গেল, শকুন্তলার চিত্র স্মৃতিপটে ফুটিয়াছে। রাজা বয়স্তসহ কুঞ্জে বসিয়া প্রণয়িনীর বাহ্যচিত্র দেখিতেছেন, ভৃঙ্গ শকুন্তলার মুখের কাছে উড়িয়া-উড়িয়া তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিতেছে। রাজা বলিতেছেন, 'বয়স্ত এ দুর্ব্বৃত্তকে নিবারণ করো।' রাজা অন্তরের চিত্র ও বাহ্যচিত্রে অভিভূত হইয়া যে কতদূর তন্ময় হইয়াছেন, তাহা কি নিপুণভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। ইহা উচ্চ অঙ্গের কাব্যকলা।

"কিন্তু নাট্যকলায় সেক্সপীয়ার অদ্বিতীয়। ঘটনা-পরম্পরার সূচনায় সমাবেশে সমকক্ষ কেহ নাই। জ্যামিতির যেমন theorem প্রতিপন্ন করিয়া শেষে Q. E. D. অর্থাৎ Question Exactly Demonstrated বলিয়া লেখা হয়, সেক্সপীয়ারের নাটকের পরিণামে ঠিক সেইরূপ Q. E. D. লেখা যাইতে পারে।* হ্যামলেটের পিতার সহসা মৃত্যু হইয়াছে, পিতৃ-বিয়োগের অল্পদিনমাত্র পরেই মাতা দেবরকে পাণিদান করিয়াছেন। মৃত নরপতির প্রেতাত্মা পুত্রকে প্রতিশোধ লইতে উত্তেজিত করিতেছে। এরূপ অবস্থাগত চরিত্রের পরিণাম tragedy বই আর কিছুই হইতে পারে না। নাটকের পরিণাম tragedy হইবে কি comedy হইবে, সেক্সপীয়ার তাঁহার প্রতি নাটকে তাহার বীজ প্রথম অঙ্কেই কোথাও-বা প্রথম দৃশ্যেই বপন করিয়াছেন।"

ব্যাস ও সেক্সপীয়ার

"সেক্সপীয়ার কল্পনাশক্তিতে ব্যাসদেবের সমকক্ষ হইতে পারেন না। সত্য বটে, সেক্সপীয়ার যেখানে যে কল্পনা করিয়াছেন, অন্য কোন কবি তাহা হইতে উচ্চতর কল্পনা

* (L. *quod erat demonstrandum.*) Which was to be demonstrated.

করিতে পারেন নাই, কিন্তু যে কল্পনায় কৃষ্ণচরিত্র প্রতিভাত হইয়াছিল, তাহা অপেক্ষা সেক্সপীয়ারের আসন নিম্নে। সেক্সপীয়ার অন্তর্দ্বন্দ্বে ব্যক্তিগত প্রবৃত্তি ও প্রকৃতির অতি তুচ্ছ অদ্ভুত লীলা দেখাইয়াছেন, কিন্তু মহাকবি ব্যাসের দৃষ্টি আরও সূক্ষ্ম। প্রবৃত্তি ও প্রকৃতির কোথা হইতে উদ্ভব, তিনি তাহাও দেখাইয়াছেন। দেখ না, দুর্য্যোধন মহামানী। বেদব্যাস দেখাইয়াছেন, যে সতী (গান্ধারী) স্বামীর অন্ধত্বের নিমিত্ত জগৎ-সংসার দেখিবেন না বলিয়া চক্ষে ঠুলি দিয়া থাকিতেন, তাঁহার পুত্র মহামানী হইতে পারে না কি? আরও দেখ, চরিত্র ও ঘটনায় মহাকবি ব্যাসের কি সূক্ষ্ম দৃষ্টি। কীচক বধ করিতে হইবে। ভীম দ্রৌপদীকে বলিলেন, 'কোনওরূপে তাহাকে ভুলাইয়া নাট্যশালায় লইয়া আসিতে পার?' দ্রৌপদী অনায়াসে তাহা কার্য্যে পরিণত করিলেন। দ্রৌপদীর প্রতিহিংসা-তৃষা এত প্রবল যে নারীর ছল অবলম্বনে কীচককে ভুলাইয়া আনা তাঁহার কাছে কি! সীতা, সাবিত্রী বা দময়ন্তীকে এরূপ অনুরোধ করিলে, তাঁহারা প্রস্তাব শুনিয়াই মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িতেন। কিন্তু যাঁহাকে পঞ্চস্বামীর মন রাখিতে হয়, কীচককে ভুলাইয়া আনা তাঁহার পক্ষে সহজসাধ্যই হইয়াছিল। মহাকবি কালিদাসও অতি সূক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্ন কবি। শকুন্তলা রাজা দুষ্মন্ত কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাতা হইয়া তাঁহাকে 'অনার্য্য' বলিয়া গালি দিলেন। সীতা বা দময়ন্তী কখনই এরূপ দুর্ব্বাক্য স্বামীকে বলিতে পারিতেন না। কিন্তু শকুন্তলা যে স্বর্গবেশ্যা মেনকার গর্ভজাতা, এই দুর্ব্বাক্য-প্রয়োগে তাহা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।"

পঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ

গিরিশচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র

'সিরাজদ্দৌলা' অভিনীত হইবার পর, কবিবর স্বর্গীয় নবীনচন্দ্র সেনের সহিত গিরিশচন্দ্রের যেসকল পত্র বিনিময় হইয়াছিল, আমরা নিম্নে তাহা প্রকাশ করিলাম।—

নবীনচন্দ্রের পত্র

"Rangoon, 11 York Road.
২৫শে ফেব্রুয়ারী, ১৯০৬।

ভাই গিরিশ!

২০ বৎসর বয়সে 'পলাশীর যুদ্ধ' লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। ৬০ বৎসর বয়সে তুমি 'সিরাজদ্দৌলা' লিখিয়াছ শুনিয়া তাহার একখানি আনাইয়া এইমাত্র পড়া শেষ করিয়াছি। তুমি আমার অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী..." ইত্যাদি (৩৬৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

গিরিশচন্দ্রের উত্তর

"১৩ নং বসুপাড়া লেন, কলিকাতা।
৭ই মার্চ্চ, ১৯০৬।

কবিবর শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন সহৃদয়েষু—

ভাইজী!

তোমার পত্র পেয়ে আমার, পত্রের উত্তরের আনন্দে নয়, সত্যই আনন্দ হয়েছে। তার বিশেষ কারণ, যখন তোমার সঙ্গে হামেসা দেখা হবার সম্ভাবনা ছিল, তখন তোমার প্রতি আমার যে কিরূপ শ্রদ্ধা ও ভালবাসা, আমি বুঝিতে পারি নাই, কিন্তু যখন বহুদিন তোমার সংবাদ পেলেম না, আর কোথায় আছ, তাহাও জানতেম না, তখন আমার মনোভাব আমি আপনি বুঝতে পারলুম। আমি অনেকদিন হ'তে মনে করি, যে, আমার ছন্দের সম্বন্ধে তোমার সহিত একটা বাদানুবাদ করবো, কিন্তু

আমার স্বভাব, কাল যা করলে হয়, তা আজ করবো না। এরকম প্রকৃতির লোকের কাল বড় শীঘ্র হয় না। আমার মনোগত ইচ্ছা, সাহিত্য সম্বন্ধে এই দূর হ'তে তোমার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কই, কিন্তু কতদূর হ'য়ে উঠবে, ঈশ্বর জানেন। তুমি আমার 'সিরাজদ্দৌলা'র প্রশংসা করেছ; আমি তোমার একটী প্রশংসা করি, তোমার 'পলাশীর যুদ্ধে' সিরাজদ্দৌলার চিত্র অন্তরূপ হ'লেও তোমার স্বদেশ-অনুরাগ ও সেই দুর্দ্দান্ত সিরাজদ্দৌলার প্রতি অসীম দয়া রাণী ভবানীর মুখে প্রকাশ পায়। আমার ধারণা, অনেক দেশানুরাগী লেখকের তুমি আদর্শ। আমার উপর তোমার অকৃত্রিম ভালবাসা, এ আমার গুণে না, এ আমি সম্পূর্ণ বুঝি, তোমার মাহাত্ম্য! লেখা ও ব্যবহারে তুমি একজন বৈষ্ণব। তোমার পত্রখানি আমি সকলকে দেখাই, তারা আনন্দ করে কিনা জানি না, কিন্তু আমার বড় আনন্দ হয়।

তুমি আমার বই কিনে পড়েছ; আমার সঙ্গে প্রথম দেখা হ'তে তুমি জানো, আমি একটা 'বাউণ্ডুলে'; তুমি আপনার গুণে আমায় মাপ করো। কেমন আছ, পরিবারবর্গ কেমন—উত্তরে আমায় সংবাদ দিয়ো। আমি হাঁপানিতে ভুগছি। ঈশ্বরের কৃপায়, যদি আবার তোমার সঙ্গে দেখা হয়, আমার মনে হচ্ছে, তিন দিনেও তোমার সঙ্গে কথা ফুরোবে না। তুমি জানো কিনা জানি না, আমার বন্ধুবান্ধব বড় কম, সে অন্ত কারো দোষে নয়, আমার দোষে। আমি মনে-মনে তোমায় পরম-বন্ধু বলিয়া জানি। এ পত্রখানি আমার হাতের লেখা নয়; আমার হাতের লেখা পত্র, আমি না প'ড়ে দিলে মানুষের সাধ্য নাই যে পড়ে! যার হস্তাক্ষর, সে আমার সন্তানের তুল্য, আমার সঙ্গে ব'সে লেখে। আমি যে-যে কথা বললুম, তা যে আমার অন্তরের কথা, এই লেখকই তার সাক্ষী। আমি 'সিরাজদ্দৌলা'র ভূমিকায় তোমার সম্বন্ধে অক্ষয়বাবু যে কটাক্ষ করেছেন, তার প্রতিবাদ লিখছিলেম, কিন্তু এই লেখকই আমায় নিবৃত্ত করে। এর নাম অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। অবিনাশ আমায় একটা উপদেশ দিলে; বললে, "মশায়, স্বভাবকবির 'পলাশীর যুদ্ধ' কাব্য আর 'সিরাজদ্দৌলা'র ওকালতী—দুইটাতে বিস্তর প্রভেদ। আপনি সে সম্বন্ধে সমালোচনা করিলে কাব্যের সম্মান বৃদ্ধি না ক'রে, ওকালতির সম্মান বেশী বাড়াবেন।"

আমার 'পলাশীর যুদ্ধ' সম্বন্ধে বক্তব্য ছিল, যা ইতিপূর্ব্বে বললেম—তোমার সিরাজের প্রতি স্নেহ ও তোমার দেশানুরাগ! শ্রীমান নিখিলনাথ রায় ও সমাজপতি আমার এই মতের সম্পূর্ণ সমর্থন করেন। আজ রাত হয়েছে, শুইগে। শরীরটে বড় ভাল নয়। ছন্দ নিয়ে একটা বাদানুবাদ করবো শাসিয়ে রাখলুম; কাজে এ 'বাউণ্ডুলে' দ্বারা কতদূর হবে, তা ঈশ্বরকে মালুম। ইতি

স্নেহ-প্রাপ্ত
গিরিশ।"

"Rangoon, 11 York Road.
২৩শে মার্চ্চ, ১৯০৬।

ভাই গিরিশ,

তোমার ৭ই মার্চ্চের পত্রখানি যথাসময়ে পাইয়াছি। তুমি যেরূপ ভোলানাথ, তুমি যে আমার পত্রের উত্তর দিবে, আমি কখনো মনে করিয়াছিলাম না। অতএব এই ত্যাগস্বীকারের জন্য আমার ধন্যবাদ বলিব কি? তাহার অর্থও বুঝি না। আমার আন্তরিক প্রীতি গ্রহণ কর।

পৌরাণিক কাল বহুদিন চলিয়া গিয়াছে। অতএব এখন কলিকাতা-রেঙ্গুনের মধ্যে সেতুবন্ধন করিয়া তোমার ছন্দ সম্বন্ধে একটা লড়াই চলিবে কি না বড় সন্দেহের কথা। আমি একজন চিররোগী। শীঘ্র যে কলিকাতা যাইব সে আশা নাই। তুমিও কলিকাতার রঙ্গালয়ের রক্তপূর্ণ বৃহৎ উদরটি লইয়া সমুদ্রের এপারে আসিবে তাহাও অসম্ভব। আমার বোধ হয়—এ জীবনে তুমি 'মহারাষ্ট্র-পরিখা'র বাহিরে, কলিকাতার পাঁচরকমের আনন্দ ও পাঁচরকমের দুর্গন্ধ ছাড়িয়া, কখনও যাও নাই। যদি একবার মহারাষ্ট্র-দুর্গের বাহিরে এই ব্রহ্মদেশে আসিয়া যুদ্ধ দাও, তবে একবার ছন্দ লইয়া যুদ্ধ করি। ব্রহ্মদেশ প্রকৃতই Land of Pagodas & Palms—দেখিবার যোগ্যস্থান। তোমাকে একবার এখানে পাইলে তালা-চাবি দিয়া ২ মাস বন্ধ করিয়া রাখিয়া একখানি নাটক লেখাইয়া লই। আমার বিশ্বাস রঙ্গালয়ের দায়ে নাটক লিখিয়া তোমার প্রতিভা পূর্ণস্ফুর্ত্তি হইতেছে না।

কেবল 'সিরাজদ্দৌলা' নহে, তোমার যখন যে বহি বাহির হয়, আমি তাহা কিনিয়া আনিয়া আগ্রহের সহিত পড়ি। শুনিয়াছি অনেক "সাহিত্যসিংহ" অন্যের লেখা বাঙ্গালা বহি পড়েন না। কেবল নিজের বহিই পড়েন। অনেকের বহির পাঠকও বোধহয় নিজে গ্রন্থাকার। কিন্তু আমি ক্ষুদ্র লোক। আমার সেই বড়মানুষী নাই। তোমার 'গীতাবলীর' একখণ্ডও আনাইয়া তোমার জীবনীটি পড়িলাম। ঠিক কথা। তোমার বন্ধুবান্ধব বড় কম। তুমি পীঠস্থান কলিকাতায় এক জীবন বলিদান দিলে। কিন্তু কলিকাতার অল্প লোকেই বোধহয় তোমাকে চিনে, ও আমার মত তোমায় শ্রদ্ধা করে।

সুরেশের (সমাজপতির) দ্বারা অক্ষয়বাবু এক দীর্ঘ পত্র লিখিয়া আমি কেন ঐরূপভাবে সিরাজদ্দৌলার চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছি, তাহার লম্বাচৌড়া কৈফিয়ত চাহিয়াছিলেন। আমি বলিয়াছিলাম, তিনি লিখিয়াছেন ইতিহাস, আমি লিখিয়াছি কাব্য। তখন পড়িয়াছিলাম 'মার্সমেন'। তথাপি বাঙ্গালীর মধ্যে বোধহয় আমিই গরীব সিরাজদ্দৌলার জন্য এক ফোঁটা চক্ষের জল ফেলিয়াছিলাম। অক্ষয়বাবু তাহার পর আমাকে ক্ষমা চাহিয়া এক পত্র লেখেন এবং আমার এক পত্র ছাপাইতে চাহিয়াছিলেন। আমি লিখিয়াছিলাম যে 'পলাশীর যুদ্ধে'র জন্যে গবর্ণমেণ্টের বিষ-

চক্রে পড়িয়া একজীবনে অশেষ দুর্গতিভোগ করিয়াছি। পত্রখানি ছাপাইলে আমার দুর্গতি আরো বাড়িবে মাত্র।

ভাল, আমার 'কুরুক্ষেত্র'খানি কি তুমি অভিনয় করাইতে পার না? তাহার 'যাত্রা' হইয়া ত শুনিতেছি কলিকাতা ও সমস্ত বঙ্গদেশ কাঁদাইতেছে।

হাতের লেখা সম্বন্ধে আমিও তোমার কনিষ্ঠ কি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা! ঢাকার কালীপ্রসন্ন ঘোষ একবার লিখিয়াছিলেন যে হাতের লেখার উপর বিবাহ নির্ভর করিলে আমার বিয়া হইত না।

ভরসা করি এখন ভাল আছ। 'গীতাবলী'র ছবিতে দেখিলাম যে, শরীরটি একেবারে খোয়াইয়াছ এবং মূর্ত্তিখানি গণেশের মত করিয়া তুলিয়াছ। এখন কোন্ নূতন খেয়াল লইয়া নিজে নাচিবার, ও বঙ্গদেশ নাচাইবার চেষ্টায় আছ?

অমৃতবাবুকে ২ খানি পত্র লিখিয়া উত্তর পাই নাই। দেখা হইলে বলিও। ভায়া বোধহয় এখন 'স্বদেশী' রসের রসিক।

তোমারই
নবীন।"

গিরিশচন্দ্রের উত্তর

"১৩নং বসুপাড়া লেন, কলিকাতা।
২৩শে এপ্রিল, ১৯০৬।

কবিবর শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন সমীপেষু—
ভাইজী,

তোমার পত্রের উত্তর দিই নাই, তাহার কারণ 'মীরকাসিম' লিখিতে ব্যস্ত ছিলাম। 'কুরুক্ষেত্র' ভাল করিয়া দেখিবার অবকাশ ছিল না। সুন্দর নাটক হয় নিশ্চয়, কিন্তু এখন ভেসে যাবে। এখনো স্বদেশের মৌখিক অনুরাগ খুব উচ্চ। যতদূর নাটক হোক বা না হোক, নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণের এইরূপ মৌখিক ঝাঁজ এখন সাধারণের প্রিয়। মহাভারতের যেরূপ প্রকৃত ব্যাখ্যা তোমার 'কুরুক্ষেত্রে' হয়েছে, তা যদি সাধারণে বুঝতে পারতো, তা হ'লে প্রকৃত নীতিশিক্ষা ও কর্ত্তব্য অনুষ্ঠান সুরু হতো। বুঝতো ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুর ধর্ম্ম ব্যতীত উপায় নাই। সময় ঘুরচে, মহাভারতের দিন সত্বর ফিরবে। কাব্যখানি নাটকাকারে পরিণত করা আমার ইচ্ছা রহিল। দু'টী প্রশ্নের উত্তর হ'লো। দেহের অবস্থা নিজ দেহের অবস্থায় অনুভব করো।

তুমি যুদ্ধ না করিলে কি হয়? আমি যুদ্ধ করবো, যুদ্ধ আর-কিছু নয়, "গৈরিশ-ছন্দের" একটা কৈফিয়ৎ। "গৈরিশ-ছন্দ" বলিয়া যে একটা উপহাসের কথা আছে, তার প্রতিবাদ। প্রতিবাদ এই, আমি বিস্তর চেষ্টা করে দেখেছি, গদ্য লিখি সে এক স্বতন্ত্র, কিন্তু ছন্দোবদ্ধ ব্যতীত আমরা ভাষা কথা কইতে পারি না। চেষ্টা করলেও

ভাষা কথা কইতে গেলেই ছন্দ হবে। সেইজন্ত ছন্দে কথা নাটকের উপযোগী। উপস্থিত দেখা যাক্—কোন্ ছন্দে অধিক কথা হয়। দীর্ঘ ত্রিপদী, লঘু ত্রিপদী বা যে-যে ছন্দ বাঙ্গালায় ব্যবহার হয়, সকলগুলি পয়ারের অন্তর্গত। অমিত্রাক্ষর ছন্দ পড়িবার সময় আমার যেমন ভাঙ্গা লেখা, তেমন ভেঙ্গে-ভেঙ্গে পড়তে হয়। যেখানে বর্ণনা, সেখানে স্বতন্ত্র, কিন্তু যেখানে কথাবার্ত্তা, সেইখানেই ছন্দ ভাঙ্গা। তারপর দেখা যাউক, কোন ছন্দ অধিক। দীর্ঘ-ত্রিপদীর দ্বিতীয় চরণের সহিত শেষ চরণে মিলিত হইয়া অধিকাংশ কথা হয়।

'দেখিলাম সরোবরে কমলিনী বাস্থিয়াছে করি।'

লঘুত্রিপদীর দ্বিতীয় চরণ ও শেষ চরণ অনেকসময় মিলিত হয়।

'বিরস বদন রানীর নিকট।'

এ সওয়ায় পয়ার লঘুত্রিপদীর এক-এক পদ বিশেষতঃ শেষ পদ পুনঃ-পুনঃ ব্যবহৃত হয়। আমার কথা এই যে এস্থলে নাটকের চৌদ্দ অক্ষরে বাঁধা পড়া কেন? চৌদ্দ অক্ষরে বাঁধা পড়লে দেখা যায়—সময়ে-সময়ে সরল যতি থাকে না।

'বীরবাহু চলি যবে গেলা যমপুরে
অকালে।'

এরূপ হামেসাই হবে। বাঙ্গালা ভাষার ক্রিয়া 'হইয়াছিল' প্রভৃতি অনেকসময়েই যতি জড়িত করিবে। কিন্তু গৈরিশ-ছন্দে সে আশঙ্কা নাই। যতি সম্পূর্ণ করিয়া সহজেই লেখা যাইবে। আর-এক লাভ, ভাষা নীচ হ'তে বিনা চেষ্টায় উচ্চস্তরে সহজেই উঠবে। সে সুবিধা চৌদ্দর কিছু কম। কাব্যে তার বিশেষ প্রয়োজন নাই; কিন্তু নাটকে অধিকাংশ সময় তার প্রয়োজন। এইতো পাতনামা করিলাম; যদি তুমি দুই-এক ঘা তীর ছাড়ো, আমিও দু-একটা কাটান তীর ছাড়বো। তবে যদি তোমার ফুরসৎ না হয়, শরীর ভাল না থাকে যুদ্ধে আহ্বান করি না। 'আম গেলে আম্‌সী—যৌবন গেলে কাঁদতে বসি।' যতদিন তোমার সঙ্গ করা অনায়াসসাধ্য ছিলো, ততদিন তা উপেক্ষা করেছি। কিন্তু এখন এই দূরদেশ-ব্যবধানে কথা কইতে ইচ্ছা করে। তোমার তো লিখতে ক্লান্তি নাই। যদি মাঝে-মাঝে লেখো, শোবার সময় পাঠ করে শুতে যাই। তোমার সমস্ত কুশল সংবাদ প্রতীক্ষায় রইলাম। ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষী
গিরিশ।"

গিরিশচন্দ্রের উত্তর

"১৩ নং বসুপাড়া লেন, কলিকাতা।
২০শে জুলাই, ১৯০৬।

কবিবর শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন।
ভায়া,

তুমি আমার যুদ্ধের আহ্বান ঠিক বুঝতে পারো নাই। যুদ্ধে আপোষে অস্ত্রপরীক্ষা করবার আমার ইচ্ছা ছিল; হার-জিতের প্রতি কখনো আমি লক্ষ্য রাখি নাই। যাই হোক, তোমার শরীর অসুস্থ, ও সম্বন্ধে কথার আর প্রয়োজন নাই। আমি ভাবিয়াছিলাম, আস্তে-আস্তে সময়ানুসারে এ বিষয়ে কথাবার্ত্তা কহিলে ভাষার কোন না কোন উপকার হইতে পারে। এই তো যুদ্ধের কথা।

সত্যই খুব ব্যস্ত ছিলাম, এখনো আছি। 'মীরকাসিম' লইয়া ব্যস্ত ছিলাম, এখন আবার পরের কাজে পড়িয়াছি। 'মীরকাসিম' সম্বন্ধে বাজারে সুখ্যাতি শুনিতে পাইতেছি। আর যে কয় রাত্রি অভিনয় হইয়াছে, লোকেরও যথেষ্ট ভিড়। ব্রাহ্মরা পর্য্যন্ত সন্তুষ্ট। এ আমার সামান্য ভাগ্য নহে। আমার ছেলে দানি, মীরকাসিমের অংশ লইয়াছিল, তাহার সুখ্যাতি একবাক্যে।

'মীরকাসিম' ছাপাখানায় পাঠাইয়াছি, তবে কতদিনে প্রুফ দেখিয়া উঠিতে পারিব, তাহা আমার আমিরী মেজাজের উপর নির্ভর। তুমি তো জানো, "Never to do to-day what you can put off till to-morrow"—আমার মটো। এইতে যতদিনে ছাপা হয়। তবে অবিনাশ বাবাজী যে আমার লেখক, তার কল্যাণে নেহাৎ আমিরীটে চলবে না। 'মীরকাসিম' ছাপা হইলেই আমার 'বলিদান' ও 'বাসরে'র (বিক্রমাদিত্যের) সহিত পাঠিয়ে দিব।

আমি তো হাঁপে ভুগছি। তোমায় কোন বন্ধু আশ্রয় করেছে? আমার এক দানির কথা বললুম, আর তো কারো কথা বলবার খুঁজে পাই না। তোমার পরিবারবর্গ, ছেলেপুলের আনুপূর্ব্বিক সংবাদ লিখবে। সকলের শুভসংবাদ শুনলে একটু মনটা খুসী হবে, ভাববো, যাহোক একটা বুড়ো আছে যে পরিবারবর্গ লয়ে একটু শান্তিতে কাটায়। বোধহয় বুঝতে পেরেছ, এ পত্রের লৌকিক উত্তর নয়। বন্ধুবান্ধব তো বেশী নাই, এ একজনের সঙ্গে তবু কথা কই। কবিগিরি কাজটা কি বুঝলে? আমি কি বুঝিছি বলি, একটু দৃষ্টি খোলে—তাতে একটু আনন্দও আছে। কিন্তু আপনার পেটের ময়লা দেখে ঘোর অশান্তি হয়। মনে হয়, বুড়ো হলুম, তবু স্বভাব শোধরালো না। ইতি

স্নেহাস্পদ
গিরিশ।"

"Rangoon, 11 York Road.
Palm Grove, ২৭।৮।০৬।

ভাই গিরিশ,

তোমার ২০শে জুলাইর পত্র পাইয়াছি। আমি কিছু অসুস্থ ছিলাম, তুমিও 'মীরকাসিম' লইয়া ব্যস্ত, তাই এতদিন উত্তর লিখি নাই। সংবাদপত্রেও দেখিতেছি 'মীরকাসিমে'র বেশ প্রতিপত্তি হইয়াছে। তুমি ক্ষণজন্মা লোক। এই বয়সেও যেন তোমার প্রতিভা দিন-দিন আরো বর্দ্ধিত হইতেছে।

আমার অনুরোধ, তুমি ৭ দিনে প্রসব না করিয়া, কিছু বেশীদিন সময় লইয়া আমাদের দেশের বর্ত্তমান রাজনীতি, সমাজনীতি, শিল্পনীতি, ধর্ম্মনীতি, দরিদ্রতা, অন্নহীনতা, জলহীনতা, শিক্ষা-বিভ্রাট, চাকরি-বিভ্রাট, উকিল-ডাক্তারি-বিভ্রাট, বিচার-বিভ্রাট, উপাধি-ব্যাধি—সকল বিষয়ের আদর্শ ধরিয়া এবং দেশোদ্ধারের উপায় দেখাইয়া একখানি comico-tragic নাটক লিখিয়া দেশ রক্ষা কর। বর্ত্তমান স্বদেশী আন্দোলনটা স্থায়ী করা উহার প্রধান লক্ষ্য হইবে। আমরা এতকাল সাহিত্য ও রঙ্গমঞ্চে যে স্বদেশ লইয়া কাঁদিয়াছি, এতদিনে শ্রীভগবান যেন তাহা শুনিয়াছেন, এবং দেশের হৃদয়ে এই নবশক্তি সঞ্চারিত করিয়াছেন। উহা রঙ্গমঞ্চের দ্বারা তুমি যেরূপ স্থায়ী ও বর্দ্ধিত করিতে পারিবে, আর কেহ পারিবে না। 'নীলদর্পণে'র মত এই একখানি বহি তোমাকে অমর করিবে। উহা নগরে-নগরে, গ্রামে-গ্রামে অভিনীত হইয়া দেশে নূতন জীবন সঞ্চার করিবে। তুমি রঙ্গমঞ্চের দ্বারা ধর্ম্মে ও প্রেমে দেশ বহুবার মাতাইয়াছ। এবার স্বদেশপ্রেমে মাতাইয়া তোমার জীবন-ব্রত উদ্‌যাপন কর। তুমি এই বহিখানিতে নিয়মিত অমিত্রাক্ষর ও মিত্রাক্ষর গদ্যের সহিত চালাইবে। আমার ক্ষুদ্র শক্তিতে যতদূর পারি, তোমার উক্ত রচনায় আমি সাহায্য করিব। আমার অনুরোধটা রক্ষা করিবে কি? আমার এরূপ পেড়াপিড়ির দরুন বঙ্কিমবাবু 'আনন্দমঠ' লিখিয়াছিলেন। তাঁহার হাতের চিঠি আমার কাছে আছে। এত বৎসর পরে উহার কি অমৃত ফল ফলিয়াছে দেখিতেছ। তবে তিনি 'আনন্দমঠে' দেশোদ্ধারের উপায় দেখাইতে পারেন নাই। তুমি সেই মাতৃপূজার সঙ্গে পূজার পদ্ধতিও দেখাইবে।

দানি বাবাজির মীরকাসিমের অভিনয় এত ভাল হইয়াছে শুনিয়াছি—বড় সুখী হইলাম। বাবাজির অভিনয় দেখিয়া বহুপূর্ব্বে আমি স্থির করিয়াছিলাম, যে অভিনয়ে বাবাজি পিতার যোগ্যপুত্র হইবেন।

আমার আর ছেলেপুলে কি? যদিও শ্রীভগবান একটি ক্ষুদ্র সৈন্যের প্রতিপালন-ভার আমি-দরিদ্রের স্কন্ধে অর্পণ করিয়াছেন, আর উহাই আমার জীবনের এক সান্ত্বনা—আমার নিজের এক সন্তান মাত্র। নির্ম্মলকে তুমি কলিকাতায় বড় ভালবাসিতে এবং তাহার গানের প্রশংসা করিতে। বিলাত হইতে ব্যারিষ্টার হইয়া আসিলে এক

বৎসর কলিকাতায় শিক্ষানবিসি করিয়া, নির্ম্মল এখানে ব্যবসা করিতে গত বৎসর আসে। আমিও extension of service অস্বীকার করিয়া তাহার সঙ্গে এখানে আসি। তুমি শুনিয়া সুখী হইবে নির্ম্মল প্রথম মাসেই ১২০০৲ টাকা পায়, এবং এ ১৷৷০ বৎসর যাবত তাহার আয় ১২০০৲ হইতে ২০০০৲। তাহার মাসিক ব্যয়ই প্রায় ১৫০০৲। তাহার এই আশাতীত কৃতকার্য্যতা শ্রীভগবানের কৃপা, আমার পিতার পুণ্যফল এবং আমার চট্টগ্রামের মুসলমানদের সাহায্য। এখানে তাহাদের সংখ্যা অল্প, এবং ইহারা আমার পুত্র বলিয়া নির্ম্মলকে অত্যন্ত সাহায্য করিয়াছে। শ্রীভগবানের অসীম দয়ায় আমার পিতৃত্ব ঘুচিয়া এখন দ্বিতীয় পুত্রত্ব অবস্থা। কি আশ্চর্য্য, এইমাত্র আমার ৪ বৎসরা বড় নাতনী ঠাকুরাণী আসিয়া বলিল, "তাতা! তাতা! এই গ্রন্থাবলী নেও।" দেখিলাম "গিরিশ গ্রন্থাবলী"!

স্নেহাকাঙ্ক্ষী
শ্রীনবীনচন্দ্র সেন।"

নবীনচন্দ্রের পত্র

"11 York Road, Rangoon.
১২।১০।০৬।

ভাই গিরিশ,

তুমি এই নির্ব্বাসিতের সপ্রেম বিজয়ার আলিঙ্গন গ্রহণ করিও। বাড়ীতে পূজা, কিন্তু পুত্র দুইটি বড় মকদ্দমায় আবদ্ধ হওয়াতে এ বৎসর বাড়ী যাইতে পারি নাই। পূজা এই নির্ব্বাণের দেশে নিরানন্দে কাটাইয়াছি। ইহার মধ্যে আনন্দ যাহা—তোমার পাঁচখানি নাটক পূজার উপহার পাইয়া অনুভব করিয়াছি। কিন্তু এ অপব্যয় কেন? তুমি ত মহাপুরুষ, কখনো আমাকে তোমার কোন বহি উপহার পাঠাও নাই। আমি বরাবর তোমার যখন যে বহি বাহির হইয়াছে কিনিয়া পড়িয়াছি। আমিও কখনো তোমাকে উপহার পাঠাই নাই, কারণ তুমি পড়িবে না। যাক, 'মীরকাসিম' নূতন পড়িলাম। অন্য বহিসকল আর-একবার এই নিরানন্দের সময় পড়িয়া বড়ই আনন্দ পাইলাম। 'ভ্রান্তি' ও 'বলিদান' আমার বড়ই ভাল লাগিল। 'স্বর্ণলতা'র পূর্ব্বে কি পরে হতভাগিনী বাঙ্গালার অধঃপতনের এমন জীবন্ত ছবি বুঝি আর দেখি নাই। একজন 'রুদ্রসেন' নাম দিয়া সেক্সপীয়ারের 'অথেলো'র অনুবাদ করিয়াছেন। তুমি উহা একবার পড়িয়া দেখিবে কি? ভরসা করি তাহাতে তুমি অমিত্রাক্ষর ছন্দ ও তোমার অমিত্রছন্দের তারতম্য কি বুঝিতে পারিবে।

'মীরকাসিম'ও 'সিরাজদ্দৌলা'র সমকক্ষ বলিয়া বোধ হইল। তবে 'মীরকাসিমে'র প্রস্তাবনা (plot) অধিকতর জটিল। ভাল, ইঁহারা উভয় যে এরূপ দেবচরিত্র সম্পন্ন ও দেশহিতৈষী (angel and patriot) ছিলেন, তাহার প্রমাণ কি? যদি কিছু থাকে, সে সকল একটা পরিশিষ্টে দিলে ভাল হয়।

উপহারের সঙ্গে তোমার কোন পত্র পাই নাই। ভরসা করি তাহার কারণ—শারীরিক অসুস্থতা নহে। আবার কি কোন নাটকি নেশায় পড়িয়াছ?

তোমার 'ভ্রান্তি' নাটকের ফটোটাও কি ভ্রান্তি? এক-একটা ফটো যেন নিতান্ত ভ্রান্তিই বোধ হইল। আপনি মহাপুরুষ বলিয়া মূর্ত্তিটা এক-একসময়ে একরকম হয়?

স্নেহাকাঙ্ক্ষী

শ্রীনবীনচন্দ্র সেন।

পুঃ। ফাউনটেন পেনের কল্যাণে লেখাটাও আগাগোড়া তোমার ফটোর মত নানামূর্ত্তি ধারণ করিল। ক্ষমা করিও।"

গিরিশচন্দ্রের উত্তর

"13, Bosepara Lane, Calcutta.
16th October, 1906.

কবিবর শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন।

ঠিক ধরেছ, শরীরের অসুখের দরুন পত্রের উত্তর দিতে পারি নাই। সহজ উত্তর সহজেই দেওয়া যেতে পারতো, কিন্তু তোমার ফরমাস সম্বন্ধে দু'কথা বলবো ও দু'কথা জিজ্ঞাসা করবো, এইজন্য শরীরের আরাম অপেক্ষা করছিলেম, সে অবধি আর সে আরাম পাই নাই। পুরীতে হাওয়া বদল করতে গেলেম, শয্যাগত হ'য়ে ফিরে এলেম। লাভের মধ্যে জগন্নাথ দর্শন হয়েছে। ব্যামো আমার পুরানো কুটুম—হাঁপানী। পয়সা ব্যয় ক'রে তার পরিচর্য্যা হ'চ্চে।

নির্ম্মলের উন্নতিতে আমি আশ্চর্য্য হই নাই। তোমার টেবিলে আমার পাশে সেই বালককে এখনো আমি দেখছি। সে যে mathematics তখন পারতো না, তার মানে drudgery করা তার স্বভাব-সঙ্গত নয়। তোমায় বলা বাহুল্য, mathematics-এর সার অংশ লইয়া আইনের তর্ক করিতে হয়। সে তর্কে নির্ম্মল অবশ্যই সম্পূর্ণ পটু হয়েছে। আমি কায়মনোবাক্যে তারে আশীর্ব্বাদ করলেম। তাকে জিজ্ঞাসা ক'রো—এ বুড়োকে কি তার মনে আছে?

সাত সমুদ্র তেরো নদীর জল খেয়ে, শেষ দশায় তুমি যে তোমার পুত্রের কল্যাণে এরূপ সুখী হয়েছ, এ তোমার বন্ধুমাত্রেরই আনন্দের বিষয়। আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, এ সুখ বুড়ো-বুড়ীতে অবাধে ভোগ করো।

একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটী ক'রে এমন তাজা প্রাণ কি ক'রে রেখেছ? আমার ধারণা, সচরাচর ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট যেরূপ দেখি, তাদের সংসর্গে যদি পনের দিন বাস করতে হয়, তাহ'লে পাগল হ'য়ে যাই। কোন কাজের কথা বলবার শক্তি নাই।

তোমার প্রস্তাবিত নাটক, যদি ভগবান আমার দ্বারা লেখান, আপনাকে ধন্য জ্ঞান করবো। কিন্তু লেখবার আমি কতদূর যোগ্য, তা বিশেষ ভাবনার বিষয়।

তোমার বই যে আমি পড়ি না—এমত নয়। কিন্তু পড়বো-পড়বো ক'রে অনেকসময়ে পড়া হয় না। অনেক দেখলে-শুনলে বটে, কিন্তু আমার জোড়া আল্‌সে-কুঁড়ে দেখেছ কিনা সন্দেহ। পিঠে চাবুক না পড়লে আমি নড়বার বান্দা নই। তোমার পত্রের উত্তর লিখবো কল্পনা করেছি, এমনসময় তোমার পত্রের উত্তর এলো। সমুদ্র-ব্যবধানে যদি মনে-মনে কোলাকুলি হয়, তুমি নিশ্চয় জেনো, সে কোলাকুলি হয়েছে। আর-এক মজার কথা, আমার হাওয়া বদলাবার প্রয়োজন, তাই ভাবছিলেন, রেঙ্গুনে যাব। অনেকেই যেতে পরামর্শ দেয়, তবে 'রাধা নাচবে কিনা।' জানি না। সকাল-সকাল শুতে চল্লুম, প্রস্তাবিত নাটক সম্বন্ধে আমার অনেক কথা আছে। একটু সুস্থ হ'য়ে, তোমার সঙ্গে আলোচনা করবো। নমস্কার।

স্নেহাকাঙ্ক্ষী
গিরিশ।"

নবীনচন্দ্রের উত্তর

"Rangoon, 11 York Road.
১৯।১১।০৬।

ভাই গিরিশ,

তোমার ১৬ই অক্টোবরের পত্র পাইয়াছি। তুমি অসুস্থ শুনিয়া তোমাকে জ্বালাতন করিতে এতদিন উত্তর দি নাই। নিজে ও পুত্রবধূর পীড়া হওয়াতে 'লেডি' ও 'অ-লেডি' ডাক্তারদের ছোটাছুটিতে বড় বিব্রত ছিলাম। বউ এখন সারিয়াছেন।

তুমি তবে এবার একটা অসাধ্য কর্ম করিয়াছ। তুমি কলিকাতার বাহিরে গিয়াছিলে! শুধু তাই নহে, একেবারে শ্রীক্ষেত্রে গিয়াছিলে! সাধে কি গোটা ভারতটায় এত ঘন-ঘন ভূমিকম্প হইয়াছে। কেবল জগন্নাথদেবত্রয়ের 'চন্দ্রমুখ'মাত্র যদি দর্শন করিয়া ফিরিয়া থাক, তবে তুমি বড় হতভাগ্য। তুমি পুরীর সমুদ্রশোভা একবার তোমার কবিত্ব ও ভাবভরা হৃদয়ে কি দেখ নাই? আহা! কি দৃশ্য! আমি ৭ মাস সেই সমুদ্র-সৈকতের একটা বাঙ্গালায় ছিলাম এবং দিনরাত্রি সমুদ্রের দিকে আত্মহারা চাহিয়া থাকিতাম।

নির্ম্মল তোমার আশীর্ব্বাদ পাইয়া অত্যন্ত সুখী হইয়াছে। নির্ম্মল তোমার ভক্ত। এখনো সর্ব্বদা তোমার গান গাহিয়া থাকে। একবার রাণাঘাটে তোমার একটি গান গাইলে, রবিবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেমন? গানটী বড় সুন্দর না?" তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "গানটি কার?" আমি বলিলাম, "গিরিশের।" তিনি ধীরে-ধীরে

বলিলেন, "শুনিয়াছি লোকটা বেশ গান বাঁধিতে পারে।" আমি অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলাম।

ভায়া, আমরা দু'জনের প্রাণটা বুঝি চিরদিনই তাজা থাকিবে। আমি তাজা রাখিয়াছি, তুমি রাখ নাই। আমি ডেপুটীর পালে পড়িয়া নথি ঘাঁটিয়াছি। তুমিও রঙ্গভূমির তরঙ্গে পড়িয়া যে কেবল রঙ্গটুকু পাইয়াছ এমন ত বোধ হয় না। একটা দুটা নহে, এতগুলি রঙ্গভূমি সৃষ্টি করা, ও তার পরিচালনা করা, এবং তজ্জন্যে এতগুলি নাটক লেখা, বড় রসের কার্য্য নহে।

অতএব তুমি "আলসে কুঁড়ে" না হইলে, এই তাম্রকূটসেবী বঙ্গদেশে "আলসে কুঁড়ে" কে? এই কৈফিয়ত আমি শুনিব না। আমার প্রস্তাবিত নাটকটি তোমাকে লিখিতে হইবে। আর ৭ দিনে প্রসব করিতে পারিবে না। উহার জন্যে দীর্ঘ সময় নিয়া, তোমার নাটক-মন্দিরের সুদর্শন চূড়াস্বরূপ উহা স্থাপিত করিতে হইবে।

হিমালয় যখন একবার টলিয়াছেন, আর একবারও পারেন। একবার যখন তুমি কলিকাতার, ধূলি ধূম্র ও হট্টগোলপূর্ণ কলিকাতার মায়া কাটাইয়া পুরী যাইতে পারিয়াছ, তখন ইচ্ছা করিলে এই 'Palm & Pagoda'র দেশেও আসিতে পার। ৩ দিন অনন্ত সমুদ্রের নির্ম্মল বাতাস সেবন করিলে ও তাহার অবর্ণনীয় শোভা দেখিলে, তোমার ভাবুক হৃদয় আনন্দে বিভোর হইবে।

স্নেহাকাঙ্ক্ষী
শ্রীনবীনচন্দ্র সেন।"

গিরিশচন্দ্রের উত্তর

"13, Bosepara Lane, Calcutta.
14-12-06.

কবিবর শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন।
ভায়া,

যেদিন তোমার পত্র পাইলাম, সেদিন আমার বড় অসুখ। মনে হইল, তুমি যদি নিকটে থাকিতে, ছুটিয়া আসিতে। এখনও উপশম হয় নাই। কবিরাজী ইস্তফা দিয়া উপস্থিত নীলরতন সরকারের চিকিৎসায় আছি। তাতেও কিছু বিশেষ ফল দেখিতেছি না।

তোমার স্মরণ থাকিতে পারে, অমর দত্তের 'সৌরভে' লিখিয়াছিলাম, "সাহিত্যে কতদূর আমার স্থান জানি না।" তুমি ঐ কথা লইয়া ব্যঙ্গ করিয়াছিলে। এখন রবিবাবুর কথায় কি বোঝো? তোমার মতন গলা-প্রাণ আর বউমার ভেড়ে নির্ম্মলের মতন লোক, দুনিয়ায় বড় বেশী নাই জেনো।

আমি তোমার ফরমাইস খাটিব, নিতান্ত ইচ্ছা, কতদূর কৃতকার্য্য হইব, ঈশ্বরের

ইচ্ছা। বিষয়টী ভাবুকের ভাবিবার বটে; রোগের তাড়নায় রাত্রি জাগিতে হয়, সে সময় নিরিবিলি পাইয়া ঐ বিষয়টীই উঁকি মারে। আমি মাথা গরমের ভয়ে ঝাড়িয়া ফেলি; কিন্তু সে একেবারে ছাড়ে না।

প্রাণ তাজা রাখার কথা বলিতেছ, প্রাণ তাজা ছিল, কিন্তু ভগবান-চিন্তা আসিয়া লুটপাট করিতেছে। এ জীবনে কিরূপ লাভ হইবে, তাহা আমার অহর্নিশি চিন্তা। সে সকল চিন্তার স্রোত কিরূপ বহিতেছে, পারি যদি কখনো তোমায় জানাইব।

সমুদ্র দেখিয়াছি, ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট অটলবাবুর বাড়ীতে হামেসা যাইতাম, সমুদ্র ঠিক সামনে তর্জ্জন-গর্জ্জন করিতেন। কিন্তু জাহাজে না চড়িলে তাঁহার সম্পূর্ণ শোভা হৃদয়ঙ্গম হয় না। রেঙ্গুন যাইয়া তোমার অতিথি হইবার যে কত ইচ্ছা, তাহা তুমি বিশ্বাস করিবে না। এখন আমার বেড়াইবার বড় সাধ, কিন্তু হাঁপানী বুকে বাঁশ দিয়া চাপিয়া ধরিয়া রাখিয়াছে। আমার অন্তর নিয়তই বলে, তুমি আমার পরমাত্মীয়। কেন এরূপ মনে হয়, তাহা কিছু বলিতে পারি না। অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গের কথা যাহা শাস্ত্রে দেখি, আমার বোধ হয়, তাহা সত্য।

ডাক্তার চন্দ্রশেখর কালীর একটা ফরমাইস আছে। তাঁর কথা—ইংরাজীতে যেমন He, She, আছে, বাঙ্গলাতে সেইরূপ চলুক। 'সিদ্ধিপ্রদ লক্ষণচয়' নামক তাঁহার হোমিওপ্যাথিক পুস্তকে She স্থানে সা ও Her স্থানে তস্যা ব্যবহার করিয়াছেন। যদি সেখানে একখানি পুস্তক পাও, সমস্ত বুঝিতে পারিবে। এ বিষয়ে তিনি তোমার মত কি জানিতে চান। বল তো তাঁহাকে তোমার নিকট একখানি পুস্তক পাঠাইতে বলি, তিনি আহ্লাদের সহিত পাঠাইবেন। উপস্থিত আমি তোমাকে তাঁহার সমস্ত ভাব বুঝাইতে অক্ষম।

অমরের বড় অসুখ, শুনিয়াছ কি? একটু ভাল আছে শুনিলাম। আজ এইখানেই বিদায়। ঈশ্বর তোমার তাজা প্রাণ চিরদিনের জন্য তাজা রাখুন। আশীর্ব্বাদ করি, নির্ম্মল চিরজীবি হউক। ইতি

স্নেহাকাঙ্ক্ষী
গিরিশ।"

পরিশিষ্ট

(১)
গিরিশচন্দ্রের স্মৃতিরক্ষার্থ টাউন হলে বিরাট শোকসভা।

("গিরিশচন্দ্র স্মৃতি-সমিতি" কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তিকা হইতে উদ্ধৃত)

সভাপতি :

বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ মহামাননীয় স্যার্ বিজয়চাঁদ মহাতাব বাহাদুর।

২২শে ভাদ্র, ১৩১৯, শুক্রবার, অপরাহ্ন ৫ ঘটিকার সময় কলিকাতার টাউন হলে স্বর্গীয় মহাকবি গিরিশচন্দ্রের স্মৃতিরক্ষার জন্য এক মহতী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। গিরিশচন্দ্রের মৃত্যুতে বাঙ্গালী জাতির ও বঙ্গভাষার যে মহাক্ষতি হইয়াছে, তজ্জন্য বিশেষভাবে শোকপ্রকাশ ও মহাকবির স্মৃতি যাহাতে বঙ্গদেশে স্থায়ীভাবে রক্ষিত হয়, তাহার উদ্যোগ-আয়োজনকল্পে এই মহতী সভার অনুষ্ঠান হয়। সম্পূর্ণ বিভিন্ন সম্প্রদায়-ভুক্ত ও পরস্পর বিপরীত ভাব ও কর্ম্মানুষ্ঠানে রত বঙ্গের শিক্ষিত অসংখ্য আবাল-বৃদ্ধগণ এই সভায় উপস্থিত থাকিয়া মহাকবি গিরিশচন্দ্রের প্রতি অশেষ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

মাননবর শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের প্রস্তাবে, রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের অনুমোদনে ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয়ের সমর্থনে বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

এই প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া শ্রদ্ধাস্পদ সারদাচরণ মিত্র বলেন, "মহাকবি, নটগুরু নাট্যসম্রাট গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অভাব সহজে পূর্ণ হইবার নহে। তিনি আমার জ্যেষ্ঠ সহোদরের ন্যায় ছিলেন। তাঁহার সহোদর শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ ঘোষ আমার সহপাঠী। তাঁহার সহিত পরিচিত হইয়া আমি প্রথম জীবনে তাঁহার সহিত অনেকসময় কাটাইয়াছি। তিনি আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন, আমিও তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতাম। ইদানীং নানা কার্য্যে ব্যস্ত থাকায় যদিও তাঁহার সহিত সদাসর্ব্বদা আলাপের সুযোগ ঘটিত না, তত্রাচ অবসরমত প্রায় আমাদের দেখা-সাক্ষাৎ ঘটিত। গিরিশবাবুর পাঠানুরাগ অতুলনীয় ছিল। তিনি অবসরকালের অধিক সময়ই নানা পুস্তকাদি পাঠে ব্যয় করিতেন। তিনি নানা বিষয়ে সুপণ্ডিত ছিলেন। নাট্যসাহিত্যে তাঁহার প্রভাবের কথা বলা বাহুল্যমাত্র। গিরিশচন্দ্রের ধর্ম্ম, ইতিহাস ও সমাজতত্ত্বপূর্ণ নাট্য-গ্রন্থাবলী

তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে। আজ আমরা আমাদের দেশের সর্ব্বজন-সমাদৃত মহাকবির বিয়োগে শোকার্ত্ত হইয়া শোকসভার অধিবেশন করিয়াছি, এমন মহাপুরুষের স্মৃতিসভার যোগ্য সভাপতি পাওয়া বড় সহজসাধ্য নহে। বহু চিন্তার পর আমরা বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুরকে এই সভার সভাপতিত্বে বরণ করিবার অভিলাষ করি। মহারাজাধিরাজও মহাকবির প্রতি শ্রদ্ধানিবন্ধন আমাদের অভিলাষ পূর্ণ করিতে স্বীকৃত হইয়া আমাদিগকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। অতএব আমি প্রস্তাব করি যে বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ মহামাননীয় স্যার বিজয়চাঁদ মহাতাব বাহাদুর কে. সি. আই. ই.; কে. সি. এস. আই.; আই. ও. এম. মহোদয় এই সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।"

মহারাজাধিরাজ সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে, প্রথমে সঙ্গীতাচার্য্য সুকণ্ঠ দেবকণ্ঠ বাগচী মহাশয় ভক্তি-গদ্গদ-চিত্তে 'বঙ্গবাসী'-সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার-রচিত একটি স্মৃতি-সঙ্গীত * গাইয়া সকলকে মুগ্ধ করেন।

তৎপরে সভাপতি মহারাজাধিরাজ বাহাদুর সুগম্ভীর স্বরে স্বীয় অভিভাষণে বলেন, "অদ্যকার এই মহতী সভা সুখ-দুঃখ, হর্ষ-শোক উভয়ই মিশ্রিত। সুখ ও শোক একত্র কেন? সুখ এইজন্য—গিরিশচন্দ্রের ন্যায় প্রতিভাশালী মহাকবি আমাদের মধ্যে ছিলেন। দুঃখ কেন, তিনি আর আমাদের মধ্যে নাই। অদ্যকার এই সভায় এমন অনেকে হয়ত উপস্থিত আছেন, যাঁহারা গিরিশবাবুর রচিত নানা রসপূর্ণ নাটকাদির অভিনয় দেখিয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাবান হইয়াছেন। আবার এমন অনেকেও এখানে আছেন, যাঁহারা তাঁহার গ্রন্থাবলী পাঠে গিরিশচন্দ্রকে 'ক্ষেপা মায়ের ক্ষেপা ছেলে' বলিয়া চিনিতে পারিয়াছেন। তাঁহার রচনাবলী হইতে অন্ততঃ ইহা বেশ জানা যায় যে তিনি একজন মহাভক্ত ছিলেন। তাঁহার নাটকাবলী পাঠ করিয়া অনেকেই উপকৃত হইবেন। তাঁহার নাটকসমূহে যে সকল ধর্ম্মতত্ত্ব লিপিবদ্ধ আছে, সে সকলের

* গীতটী এই :

ঝিঁঝিট—একতালা।

ওই শুন পুনঃ-পুনঃ উঠে ধ্বনি-প্রতিধ্বনি,
কোথায় গিরিশ আজি, নট-কবি চূড়ামণি।
যেভাবে যে আছে যথা, জানায় ব্যথার কথা,
বুকে ব'য়ে মর্ম্মব্যথা, শোক-বিকল ধরণী।
সে যে শুধু কবি নয়, মানুষ মণীষাময়,
দিগন্তে উজলি' রয় মহত্ত্ব-রতন-খনি।
বিশ্ব-প্রেম বুকে ব'য়ে, বিশ্ব-প্রেম বিনিময়ে,
যত কথা গেছে ক'য়ে, একে-একে কত গণি।
এত গান কে গাহিল, এত প্রাণ কে ঢালিল,
পুণ্যে তারে পেয়েছিল, ওই জন্মভূমি জননী—
কেন মিছে কাঁদা আর, কেন-বা বেদনা তার,
নাহিক জীবন তার, আছে তো তার জীবনী।

আলোচনায় ভবিষ্যতে যে লোকে উন্নত হইবে তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। এইরূপ একজন মহাকবির স্মৃতি স্থায়ীভাবে রক্ষা করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য।"

তৎ-পরে সভাপতি মহারাজাধিরাজ বাহাদুর দেশমান্য শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও উত্তরপাড়ার পূজনীয় রাজা শ্রীযুক্ত পিয়ারীমোহন মুখোপাধ্যায় মহোদয়দ্বয়-প্রেরিত সভার সহানুভূতিজ্ঞাপক পত্রদ্বয় পাঠ করিয়া তাঁহাদের অপরিত্যাজ্য কারণে অনুপস্থিতির বিষয় জ্ঞাপন করিলেন।

মহামান্য শ্রদ্ধাস্পদ স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তখন প্রথম প্রস্তাবটি উত্থাপন করিয়া বলিলেন, "আমার উপর যে প্রস্তাবটি উত্থাপন করার ভার অর্পিত হইয়াছে সে প্রস্তাবটী এই, 'বঙ্গীয় নাট্যজগতের অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্র, ঐতিহাসিক, সামাজিক ও ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধীয় বহুবিধ নাটকের প্রণেতা এবং সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা স্বর্গীয় মহাকবি গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহোদয়ের মৃত্যুতে বঙ্গদেশের ও বঙ্গসাহিত্যের যে ক্ষতি হইয়াছে। তাহা সহজে অপনোদিত হইবে না। গিরিশচন্দ্রের মৃত্যুতে এই সভা গভীর শোক প্রকাশ করিতেছেন।" প্রস্তাব পাঠ করিয়া তিনি বলিলেন, "যদিও অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় আমাদের বঙ্গীয় নাট্যশালা উন্নতির চরম সীমায় এখনও উঠে নাই, উত্তরোত্তর পরিবর্ত্তন দ্বারা পূর্ণ উন্নতি পরে সাধিত হইবে, তত্রাচ ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত ও সকলের স্বীকার্য্য যে গিরিশচন্দ্রের ন্যায় নাট্যকলা-কুশল ব্যক্তি বঙ্গীয় নাট্যশালার ও নাটকের প্রভূত উন্নতিসাধন করিয়াছেন।" পরে 'গিরিশ-গৌরব' নামক খণ্ডকাব্য হইতে নিম্নলিখিত দুই ছত্র উদ্ধৃত করিয়া বলিলেন,

"চিনে না জীবিত কালে,
মরিলে অমর বলে,
তাই কিহে চলে গেলে তুমি ?"*

"এই কয়েকটী কথা গিরিশচন্দ্র সম্বন্ধে বর্ণে-বর্ণে প্রযোজ্য। বাল্যে গিরিশচন্দ্র আমার সহাধ্যায়ী ছিলেন এবং তখন হইতেই আমি তাঁহার গুণমুগ্ধ। গিরিশচন্দ্র যে কেবল আমাদের শ্রদ্ধাস্পদমাত্র তাহা নহে, গিরিশচন্দ্র আমাদের পূজার্হ ছিলেন। তাঁহার কবি-প্রতিভা ও কবিত্বশক্তি অসাধারণ ছিল। সেক্সপীয়ারের বিখ্যাত নাটক 'ম্যাক্‌বেথে'র অনুবাদে তিনি যে শক্তির পরিচয় দিয়াছেন, তাহা অনন্যসাধারণ। এই 'ম্যাক্‌বেথ' অভিনয়কালেও তিনি নাট্যকলাভিজ্ঞতার বিশেষ পরিচয় দিয়াছিলেন। কেবল আমার মত ব্যক্তি নহে, লক্ষ্মী ও সরস্বতীর বরপুত্র কলিকাতার খ্যাতনামা মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রভৃতি মহোদয়গণ এই 'ম্যাক্‌বেথ' অভিনয় দর্শনে মুগ্ধ হইয়া কবিকে বহু শ্রদ্ধা সম্মান দান করেন। বঙ্গীয় নাট্যশালা, সকল বিষয়ে নির্দ্দোষ না হইলেও এ কথা সকলেই স্বীকার করিবেন যে গিরিশচন্দ্র সত্যসত্যই একজন লোক-

* সুকবি শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের এই অতি সুন্দর ক্ষুদ্র কাব্যগ্রন্থখানি যাঁহারা পাঠ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা কলিকাতা, বাগবাজার 'লক্ষ্মী-নিবাসে' সহৃদয় গ্রন্থকারের নিকট সন্ধান করিলে বিনামূল্যে প্রাপ্ত হইতে পারেন।

শিক্ষক ও সমাজের হিতাকাঙ্ক্ষী মনীষী ছিলেন।"

পরে এই প্রস্তাব অনুমোদনকল্পে রায়বাহাদুর ডাক্তার শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু মহাশয় বলেন "পরমশ্রদ্ধাস্পদ স্যার গুরুদাস যে প্রস্তাবের প্রস্তাবক, তাহার অনুমোদনের বিশেষ আবশ্যকতা নাই। কারণ পূজ্যপাদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অদ্যাবধি এমন কোনও প্রস্তাব লইয়া সাধারণের নিকট উপস্থিত হয়েন নাই, যাহা জন-সমাজ কর্তৃক সসম্মানে সমর্থিত ও গৃহীত হয় নাই। এজন্য এই প্রস্তাব সম্বন্ধে আমার বলিবার কিছু নাই। তবে গিরিশচন্দ্রের সম্বন্ধে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে অপর সাধারণের ন্যায় গিরিশচন্দ্র কখনও আত্মদোষ গোপন করিতে প্রয়াসী হয়েন নাই। তাঁহার দুর্ব্বলতার উপর তিনি তীক্ষ্ণদৃষ্টি সর্ব্বদা রাখিতেন এবং সেইজন্য তিনি সেই-গুলিকে জয় করিতে পারিয়াছিলেন। গিরিশচন্দ্রের কীর্ত্তিরাশিই তাঁহার স্মৃতিস্তম্ভ, তবে আমাদেরও সেই স্মৃতিরক্ষার্থে কর্ত্তব্য আছে।"

পরে এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়া পণ্ডিত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি বলেন, "যুগ-প্রবর্ত্তন-কারী নূতন-নূতন শক্তি মানবসমাজে মধ্যে-মধ্যে আবির্ভূত হয়। ইহা জগতের চিরন্তন নিয়ম। অস্মদীয় সমাজে সেইভাবেই লোকগুরু শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব ও তদীয় শিষ্য গিরিশচন্দ্র আমাদের মধ্যে আসিয়াছিলেন। মনীষা ও প্রতিভার অত্যদ্ভুদ্ সমাবেশে গিরিশচন্দ্রে দেশে নূতন ভাবের বন্যা ছুটাইয়াছিলেন। যথার্থই গিরিশচন্দ্র 'ক্ষেপা মায়ের ক্ষেপা ছেলে' ছিলেন।" তৎ-পরে তিনি স্বরচিত "গিরিশচন্দ্র" শীর্ষক নিম্নলিখিত প্রবন্ধটী পাঠ করেন।—

"গত ২৫শে মাঘ (১৩১৮ সাল), বৃহস্পতিবার, রাত্রি ১টা ২০ মিনিটের সময় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের একনিষ্ঠ ভক্ত ও প্রিয় শিষ্য, বাঙ্গালার রঙ্গভূমির পিতৃতুল্য, নাট্যসাহিত্যের চক্রবর্ত্তী সম্রাট, কবিবর গিরিশচন্দ্র ঘোষ ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন।

"গিরিশচন্দ্র অনন্যসাধারণ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তাঁহার বিয়োগে বাঙ্গালীর যে ক্ষতি হইল, তাহা সহজে পূর্ণ হইবার নহে। চিরজীবন দেশের সেবা করিয়া, মাতৃভাষার পূজায় মগ্ন থাকিয়া, সাধনায় সিদ্ধ হইয়া কর্ম্মবীর গিরিশচন্দ্র কর্ম্মসূত্র ছিন্ন করিলেন। বঙ্গের গৌরব-রবি অস্তমিত হইল। বঙ্গভূমি! তুমি যে রত্ন কালসমুদ্রে বিসর্জ্জন দিলে, কুবেরের অলকায় সে রত্ন নাই। গিরিশ তোমার অঙ্ক শূন্য করিয়া দেশবাসীকে কাঁদাইয়া বাঙ্গালার নাট্যশালা ও নাট্যসাহিত্যের সিংহাসন শূন্য করিয়া পৃথিবীর পান্থশালা ত্যাগ করিলেন। গিরিশের স্বর্গাদপি গরীয়সী জননী জন্মভূমি! তোমার রত্নপ্রদীপ নিভিয়া গেল! বাঙ্গালায় পুঞ্জীভূত ঘনীভূত অমানিশার অন্ধকার! এই অন্ধকারে স্মৃতির শ্মশানে বাঙ্গালী! অশ্রুজলে গিরিশচন্দ্রের তর্পণ কর।

"গিরিশচন্দ্রের জীবন অত্যন্ত বিচিত্র। বহু ঘাত-প্রতিঘাতে গিরিশচন্দ্রের 'নিজস্ব' গঠিত হইয়াছিল। গিরিশচন্দ্র বহু ভাবের আধার ছিলেন। পরস্পর-বিরোধী বহু ভাবের এমন একত্র সমাবেশ মানবজীবনে প্রায় দেখা যায় না। গিরিশচন্দ্র ভাবের তরঙ্গে অভিভূত মগ্ন হন নাই। বীরের ন্যায় তাহাদিগকে আপনার অধীন করিয়া-

ছিলেন। ভাব-বীর গিরিশ হাসিতে-হাসিতে সংসারের হলাহল স্বয়ং পান করিয়াছিলেন, শঙ্কর কৃপায় নীলকণ্ঠ হইতে পারিয়াছিলেন; জীবের দুঃখে কাঁদিতে-কাঁদিতে গুরু-দত্ত অমৃত বাঙ্গালাদেশের দ্বারে-দ্বারে বিতরণ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন।

"গিরিশচন্দ্রের মনীষা ও প্রতিভার সমন্বয় হইয়াছিল। গিরিশচন্দ্র অসাধারণ তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও স্বভাবত উজ্জ্বল প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তাঁহার নাটকে, গানে, কবিতায়, প্রবন্ধে, উপন্যাসে, রস-রচনায়—সেই মনীষা ও প্রতিভার পরিচয় দেদীপ্যমান। যে প্রতিভা নিত্য নূতনের সৃষ্টি করিতে পারে, যে প্রতিভা দেশ ও কালের প্রভাব অতিক্রম করিয়া, সঙ্কীর্ণতা, ক্ষুদ্রতা ও গতানুগতিকতাকে বিজয় করিয়া দিব্য অনুভূতির সাহায্যে নূতনের সৃষ্টি করিয়া চরিতার্থ হয়, গিরিশচন্দ্র সেই প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। চিরাচরিত সংস্কারের অনুশাসন, প্রচলিত পদ্ধতির প্রভাব গিরিশচন্দ্রের প্রতিভা ক্ষুণ্ণ করিতে পারে নাই। নাটককার গিরিশচন্দ্র নিপুণ ও সাহসী চিত্রকরের মত তুলিকার দুই-চারিটী টানে ছবি সম্পূর্ণ ও সজীব করিয়া দিতেন। মানসীর সীমান্ত সিন্দুর উজ্জ্বল করিয়া দিবার অথবা মোহিনীর কণ্ঠমালার মুক্তায় শুভ্রতার আরোপ করিবার জন্য গিরিশচন্দ্র কখনও 'মিনিয়েচার' চিত্রকরের ন্যায় বর্ণ-ফলকে ধীরে-ধীরে ক্ষুদ্র তুলিকা ঘর্ষণ করিতেন না। তাঁহার প্রতিভা কৃত্রিম প্রসাধনের পক্ষপাতিনী ছিল না। বাণীর বরপুত্র গিরিশের প্রতিভা কপালকুণ্ডলার ন্যায় স্বভাব-সুন্দরীর; তাঁহার নাটকীয় প্রতিভা নিসর্গের মুকুর; জগৎ তাহাতে প্রতিবিম্বিত হইত। তাই গিরিশচন্দ্র অনায়াসে অবলীলায় বিশাল পটে স্বর্গের, মর্ত্ত্যের ও নরকের, —দেব, মানব ও দানবের বহিঃপ্রকৃতির অন্তঃপ্রকৃতির অপূর্ব্ব চিত্র অঙ্কিত করিতে পারিতেন।

"গিরিশচন্দ্রের সৃষ্টিশক্তি অতুলনীয়। তিনিও বিশ্বামিত্রের ন্যায় সাহিত্যে নূতন জগতের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সৃষ্ট মানব-পরিবার, দেব-পরিবার প্রভৃতি যেমন অসংখ্য, তেমনই বিচিত্র। অনুভূতির উপাদানে কল্পনা মিশাইয়া তিনি চরিত্রের সৃষ্টি করিতেন। আপনার অনুভব ভাব ঢালিয়া দিয়া মানসী প্রতিমার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিতেন। মনোবৃত্তির বিষম দ্বন্দ্ব, পুণ্য ও পাপের সংঘর্ষ, ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত ও এইসকলের অবশ্যম্ভাবী পরিণামে গিরিশচন্দ্র দিব্যদৃষ্টি ছিলেন। তিনি অনেক নূতন মৌলিক চরিত্রের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। সেই নূতনের রাজ্যেও তাঁহার বিদূষক চিত্রাবলী নূতন বলিয়া মনে হয়। সংস্কৃত সাহিত্যের বিদূষক ইংরাজী সাহিত্যের 'বফুন' ফলষ্টাফ্‌ প্রভৃতি গিরিশচন্দ্রের বিদূষক বা বরুণচাঁদ প্রভৃতির সন্নিহিত হইতে পারে না।

"গিরিশচন্দ্র গীতিকবিতায় সিদ্ধ ছিলেন। গিরিশের গান বাঙ্গালায় অমর হইয়া থাকিবে। তাহা খাঁটী বাঙ্গালার গান। সে গানে বাঙ্গালাদেশের কবির, প্রেমিকের, নিরাশের, সুধীর, ব্যথিতের, বিপন্নের, সাধকের, ভক্তের, ধর্ম্মোন্মাদের হৃদয়ের উচ্ছ্বাস—হৃদয়-স্পন্দন অনুভব করা যায়। তাঁহার রস-রচনাও অপূর্ব্ব। তাঁহার ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ হীরকের ন্যায় সমুজ্জ্বল।

"আদিকবি বাল্মীকি ও বেদব্যাসের সৃষ্ট চরিত্রে যে প্রতিভা নূতনতার ও মৌলিকতার আরোপ করিতে বিন্দুমাত্র সঙ্কুচিত হয় নাই, সে প্রতিভার শক্তি, সাহস ও সাফল্যের আলোচনা করিবার, পরিচয় দিবার শক্তি আমাদের নাই। ভবিষ্যতে কোনও সৌভাগ্যবান শক্তিশালী সমালোচক সে সাধনায় সিদ্ধ হইবেন।

"গিরিশচন্দ্র বাঙ্গালার নাট্যশালায় নবজীবন দান করিয়াছিলেন। তিনি রঙ্গভূমির জন্মদাতা কি না, ঐতিহাসিক তাহার নির্দ্দেশ করিবেন। কিন্তু ইহা সত্য গিরিশচন্দ্রই এতদিন পিতার মত বাঙ্গালার রঙ্গভূমির লালনপালন, এমনকি শাসন করিয়া আসিয়াছেন। এ সম্বন্ধে কালিদাসের ভাষায় বলা যায়,

'স পিতা পিতরস্তাসাং কেবলং জন্মহেতবঃ।'

"দক্ষ, ম্যাক্‌বেথ, যোগেশ প্রভৃতির ভূমিকায় গিরিশচন্দ্র যে অভিনয়-প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা নট-সম্প্রদায়ের আদর্শ হইয়া থাকিবে।

"গিরিশচন্দ্রের অধ্যয়ন ও জ্ঞানার্জ্জনের স্পৃহা দেখিয়া বিস্মিত হইতাম। শেষবয়সেও গ্রন্থই তাঁহার একমাত্র অবলম্বন ছিল। গিরিশচন্দ্র চিরজীবন জ্ঞানসাগরের কূলে বসিয়া উপল সঞ্চয় করিয়াছিলেন। দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য, পুরাণ, ইতিহাস, ধর্ম্মশাস্ত্র, সংবাদপত্র ও মাসিকপত্র, হোমিওপ্যাথী চিকিৎসাশাস্ত্র—তাঁহার নিত্য সহচর ছিল। তাঁহার ভূয়োদর্শন ও বিবিধ বিষয়ের জ্ঞান দেখিয়া বিস্ময়ের উদ্রেক হইত। বিতর্কে, যুক্তিবিন্যাসে গিরিশচন্দ্রের স্বাভাবিক পটুতা ছিল। মনীষার এমন অভিব্যক্তি এ জীবনে আর দেখিব কি?

"গিরিশচন্দ্র শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রসাদে নবজীবন লাভ করিয়াছিলেন। তিনি অগাধ বিশ্বাস ও দেবদুর্লভ ভক্তির আধার ছিলেন। পূর্ব্বপুরুষের পুণ্যে ও প্রাক্তনের ফলে গিরিশ এই বিশ্বাস ও ভক্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি শ্রীশ্রীগুরুর চরণে সস্মিত মুখে আপনাকে নিবেদন করিয়াছিলেন। মৃত্যু যেন সেই বিশ্বাসের আধার, ভক্তির আধারকে স্পর্শ করিতে কুণ্ঠিত হইয়াছিল। শ্মশানশায়ী গিরিশচন্দ্রের শিবনেত্রে সেই অপূর্ব্ব স্বপ্নাবেশ, আর প্রশান্ত মুখে সেই প্রসন্ন হাস্যের রেখা, তাহা কি ভুলিবার? ধরার পান্থশালা, কর্ম্মভোগের ভূমি ত্যাগ করিবার সময় এমন হাসি হাসিয়া যাইবার সৌভাগ্য কয়জনের ঘটে?

"গিরিশচন্দ্র যশের কাঙ্গালী ছিলেন না। বন্ধুত্ব, আত্মীয়তার বিনিময়ে তিনি সমালোচনা, মোসাহেবী চাহিতেন না। 'স্তুতিগুরুবান্ধবতা' গিরিশচন্দ্রের ললাটে বিধাতা লিখিয়া দিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। প্রকৃত প্রতিভা যশের ভিখারিণী নয়, সে যশকে, যশের আকাঙ্ক্ষাকে বিজয় করিতে পারে।

"কবিবর! জীবনে তোমার স্তুতি করিবার অবকাশ দাও নাই; তুমি ত যশের কাঙ্গাল ছিলে না! গিরিশচন্দ্র! আজ ব্রাহ্মণের পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ কর। বাইশ বৎসর তোমার স্নেহ ভোগ করিয়াছি। এখন তোমার স্মৃতি সেই স্নেহের অধিকার করিয়া থাকুক।

"গিরিশচন্দ্রের শেষ দান—শেষ রচনা—'বিশ্বামিত্র' (তপোবল)। তিনি জাতিকে

আত্মবিসর্জনের উজ্জ্বল আদর্শ দান করিয়া গুরুপদে আত্মনিবেদন করিয়াছিলেন। লোকসেবা করিতে-করিতে কর্ম্মযজ্ঞের ক্ষেত্র হইতে সাধনোচিত ধামে গমন করিয়াছেন। তাঁহার সৃষ্ট আদর্শ দেশে উজ্জ্বল হইয়া থাকুক।"

প্রস্তাবটী সকলে দণ্ডায়মান হইয়া সসম্মানে গ্রহণ করিলেন।

দ্বিতীয় প্রস্তাবটী এই: "স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহোদয়ের মৃত্যুতে এই সভা তদীয় ভ্রাতা শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ ঘোষ ও তদীয় পুত্র শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়দ্বয়ের সহিত গভীর সমবেদনা ও সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছে। এই সভার সমবেদনা ও সহানুভূতিজ্ঞাপক পত্র তাঁহাদের নিকট প্রেরিত হউক।"

মাননীয় শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় এই প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া বলেন, "গিরিশচন্দ্রের মৃত্যুতে আমরা সকলেই শোক-সন্তপ্ত, এ কথা বলাই বাহুল্য; এবং এ একটী প্রস্তাব যে সমবেত ভদ্রমণ্ডলী কর্ত্তৃক গৃহীত হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই। বিশ বৎসর পূর্ব্বে শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ সাধারণ নাট্যশালার সম্পর্কে থাকিতে ভাল বাসিতেন না, এ কথা অনেকেই জানেন। কিন্তু গত কয়েক বৎসরের মধ্যে বঙ্গীয় সাধারণ নাট্যশালার নানা উন্নতি সাধিত হওয়ায়, ইহা এখন আর শিক্ষিত-সমাজ কর্ত্তৃক অনাদৃত নহে। বরং দেখা যায় যে নাট্যশালাগুলি সমাজের হিতকর অনুষ্ঠানে পরিণত এবং তজ্জন্য সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত সমাজের সহানুভূতি ও সমাদর পাইবার যোগ্য হইয়াছে। বর্ত্তমান নাট্যশালাগুলি যে মার্জ্জিত সংস্কৃত ও উন্নত হইয়াছে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। নাট্যবিশারদ গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ সুধী মনীষিগণ কর্ত্তৃক বঙ্গীয় নাট্যশালাগুলির এই উন্নতিসাধন হইয়াছে ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত। মদীয় শিক্ষক বাবু অমৃতলাল বসু মহাশয়ও এই বিষয়ে আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র।"

তৎ-পরে 'অমৃতবাজার'-সম্পাদক শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ মহাশয় এই প্রস্তাব অনুমোদনকল্পে বলেন, "আমি আমার প্রতিবেশী গিরিশবাবুর সহিত বহু বৎসর পূর্ব্বে পরিচিত এবং একসঙ্গে বহু বৎসর হৃদ্যতার সহিত কাটাইয়াছি। আমরা উভয়ে প্রায়ই আমার পূজ্যপাদ অগ্রজ সেই ভক্ত-চূড়ামণি শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়ের সহিত কালাতিপাত করিতাম। গিরিশচন্দ্র একজন পরমভাগবত ছিলেন তদ্বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই। তাঁহার গ্রন্থে ভক্তিরসের বহুলপ্রচার ও প্রাধান্য সকলেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন।"

পরে প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় ওজস্বিনী ভাষায় বলেন, "প্রায় চারিশত বৎসর পূর্ব্বে নদীয়ায় শ্রীচৈতন্যদেব প্রথম নাটকাভিনয় করেন। নাটকাভিনয়ে লোকশিক্ষা হয় ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। গিরিশচন্দ্রও সেই উদ্দেশ্যে গৌরচন্দ্রের প্রদর্শিত পথ অবলম্বনে লোকশিক্ষা-কার্য্যে নিয়োজিত হয়েন। মহৎ লোকের দেহান্তর ঘটিলে তাঁহার সাধারণ ক্রিয়াকলাপাদি বা দোষানুষ্ঠানাদির আলোচনা কেহই করেন না; সকলেই মৃতের গুণের আলোচনা করিয়া থাকেন। রসালের খোসা, আঁশ ও আঁটি ফেলিয়া সকলেই যেমন তাহার সেই অমৃতায়মান রস গ্রহণ করে, মহাত্মাগণের তেমনই ছোটখাটো দোষগুলি ত্যাগ করিয়া জীবনান্তে তাঁহাদের গুণাবলীই সাধারণের আলোচ্য হইয়া উঠে। গিরিশচন্দ্রকেও ঠিক সেইভাবে গ্রহণ করিলে আপনারা

দেখিবেন যে, এই মহাকবি কেবলমাত্র কবি নহেন; তিনি একজন মহাভাগবত। গিরিশচন্দ্র তাঁহার 'চৈতন্যলীলা', 'বিল্বমঙ্গল'-আদি নাটক রচনা ও অভিনয় করিয়া বর্ত্তমান বঙ্গীয় বৈষ্ণব-সমাজের যে প্রভূত উপকারসাধন করিয়াছেন, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। গিরিশচন্দ্র তাঁহার আচার্য্য, তাঁহার ইষ্টদেব মহাত্মা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সংস্পর্শে থাকিয়া শ্রীগুরুর অমৃতময় উপদেশাবলী সম্যক্‌ভাবে গ্রহণে সমর্থ হইয়াছিলেন — এ কথা তাঁহার গ্রন্থাবলীর নিবিষ্ট পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন। গিরিশচন্দ্রের ভক্তিরস-পীযূষ-পরিপূর্ণ নাটকাবলী আমাদের ও আমাদের ভবিষ্যদ্বংশীয়গণের হৃদয়ে ভক্তি-স্রোত প্রবাহিত করিবে, তদ্বিষয়ে আর মতদ্বৈধ নাই।" প্রস্তাবটী গৃহীত হইল।

তৃতীয় প্রস্তাব এই: "স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্রের উপযুক্ত স্মৃতিরক্ষার অনুষ্ঠানের জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ লইয়া একটী সমিতি গঠিত হইল।" (স্মৃতি-সমিতির সভ্যগণের নামের তালিকাপাঠ।)

প্রস্তাবক প্রখ্যাতনামা বাগ্মী শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়। এই প্রস্তাবটী উপস্থাপিত করিয়া তিনি মর্ম্মস্পর্শী ওজস্বিনী ভাষায় বলিলেন, "গিরিশচন্দ্রের অনুষ্ঠিত কার্য্যাদি বুঝিতে বা সম্যক্‌রূপে তাহার উপকারিতা উপলব্ধি করিতে দিন লাগিবে। গিরিশচন্দ্র একজন মহাকবি ছিলেন এবং তাঁহার শিক্ষা সার্ব্বভৌমিক ছিল। কবি গিরিশচন্দ্রকে একভাবে ও মানুষ গিরিশচন্দ্রকে আর-একভাবে গ্রহণ করিতে কেহ-কেহ ইচ্ছুক, কিন্তু, আমার মনে হয় — সংসারের ধূলা-কাদায় মাখান এই কবি, আজকালকার কয়েকজন ব্যোমচারী উড্ডীয়মান কবির ন্যায় — যাঁহারা বহু উচ্চে আকাশে ভাব সংগ্রহ করিয়া আকাশ হইতে সংসারের লোকগণের উপর প্রতিভার ধারা বর্ষণ করেন — সাধারণ্যে কবিত্বশক্তির লীলাচাতুর্য্য প্রকাশ করেন নাই। গিরিশচন্দ্র এই সংসারের মানুষ — সংসারের ধূলা-খেলায় মলিন হইয়াও উন্নতি-সোপানে দিন-দিন আরোহণ করিয়া শেষে বহু উচ্চে উঠিয়াছিলেন এবং উন্নতির চরমসীমায় তাঁহার সেই সংসার-ধূলিরাশি সুসংস্কৃত হইয়া সুবর্ণকণা-বৃষ্টির ন্যায় সংসারবাসিগণের উপর পতিত হইয়াছিল। আমার ধারণা, গিরিশচন্দ্র সেইজন্যই বিল্বমঙ্গলের চরিত্র ফুটাইয়া ঐ নামের উচ্চাঙ্গের নাটকখানি রচনা করিতে পারিয়াছিলেন।"

এই প্রস্তাবের অনুমোদন করিয়া 'নায়ক'-সম্পাদক পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মহাকবির স্মৃতিরক্ষাকল্পে কোনও স্থায়ী-অনুষ্ঠানের জন্য উপস্থিত সভ্যমহোদয়গণের নিকট অর্থভিক্ষাকল্পে বলিলেন, "শৈবালদাম-বিজড়িত পঙ্কপূর্ণ সরোবরেই পঙ্কজ শতদল-কমল ফুটিয়া থাকে। ধনীর মণি-কুট্টিমে পদ্ম ফুটে না। শতদল-কমলই বাণীর পূর্ণার্ঘ্যের উপযোগী সম্ভার। গিরিশচন্দ্র বাঙ্গালার পঙ্কিল-ভারপূর্ণ সরোবরের শতদল-কমল। তাঁহার অভাব সহজে পূর্ণ হইবার নহে। আজ তাঁহারই স্মৃতিসভা। তাঁহার স্মৃতি যাহাতে স্থায়ীভাবে আমাদের দেশে রক্ষিত হয়, তজ্জন্য কমিটী গঠিত হইয়াছে। বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ বাহাদুর এই সমিতির সভাপতি। রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম. এ., বি. এল. সমিতির সম্পাদক। এই কমিটীর হাতে মহাকবির স্মৃতিরক্ষা-উদ্দেশ্যে যে কেহ যাহা দান করিবেন, তাহা

সংবাদপত্রে যথারীতি প্রকাশিত হইবে।" নাট্যকার পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় সমর্থন করিলে প্রস্তাবটী গৃহীত হইল। সর্ব্বশেষে শ্রদ্ধেয় নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় সভাপতি মহারাজাধিরাজকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন, "গিরিশচন্দ্রের এই সম্মানে আজ অভিনেতামাত্রেই বুঝিতে পারিবে যে নটজীবন হেয় নহে। তাঁহারা যদি গিরিশবাবুর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া আত্মোন্নতি করিতে পারেন, তাঁহারাও সময়ে এইরূপ সম্মানের অধিকারী হইতে পারিবেন। গিরিশবাবুর এই সম্মানে আজ সমগ্র বঙ্গীয় নাট্যশালা সম্মানিত ও সমস্ত নটকুল উৎসাহিত।"

(২)
গিরিশচন্দ্র-স্মৃতিসভা

গিরিশচন্দ্রের পরলোকগমনের পর প্রথম বৎসর বেলুড় মঠে তাঁহার জন্মতিথি উপলক্ষ্যে প্রথম উৎসব হয়। তাহার পর শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়, স্বর্গীয় ডাক্তার জ্ঞানেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল, শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মতিলাল প্রভৃতিকে লইয়া প্রত্যেক বৎসর গিরিশচন্দ্রের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে ছোটখাটো একটী উৎসব করিয়া আসিতে-ছিলেন। গিরিশচন্দ্রের সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় অদ্যাবধি নিজ ভবনে উক্ত তিথিতে উৎসব করিয়া থাকেন।

এই ক্ষুদ্র উৎসবই ক্রমে গিরিশচন্দ্র-স্মৃতি-সমিতি কর্ত্তৃক সাধারণ উৎসবে পরিণত হয়। গিরিশচন্দ্রের পরলোক-প্রাপ্তির একাদশ বর্ষ পরে এই স্মৃতিসভার প্রথম অধিবেশন ২৫শে মাঘ (১৩৩০ সাল) 'মনোমোহন থিয়েটারে' হইয়াছিল। সন্ধ্যা ৬টায় সভার অধিবেশন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু তাহার অর্দ্ধঘণ্টা পূর্ব্বেই রঙ্গালয় অসংখ্য দর্শকে পরিপূর্ণ হইয়া যায়। সভাপতি হইয়াছিলেন স্বনামধন্য দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস। বহু বক্তাগণের বক্তৃতার পর সভাপতি মহাশয় যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা সর্ব্বসাধারণের বড়ই মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছিল। 'অমৃতবাজার' ও 'ফরওয়ার্ড' (৯ই ফেব্রুয়ারী ১৯২৪), 'বন্দে মাতরম্' (২৮শে মাঘ, ১৩৩০ সাল) প্রভৃতি তাৎসাময়িক ইংরাজী ও বাঙ্গালা সংবাদপত্রে ইহার রিপোর্ট বাহির হইয়াছিল। আমরা সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণের সারাংশ পাঠককে উপহার দিতেছি :

"তিন বৎসর পূর্ব্বে ভগবানকে স্মরণ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, যে স্বরাজ ছাড়া কোন কথা কহিব না, স্বরাজের কার্য্য ছাড়া অন্য কোন কার্য্য করিব না, স্বরাজের চিন্তা ছাড়া অন্য আর কোন চিন্তা করিব না, স্বরাজের সভা ছাড়া অন্য কোন সভায় যোগদান করিব না। তবে যদি বলেন, আজ কেন এই সভায় যোগদান করিলাম? ইহার উত্তর—স্বরাজ কাহাকে বলে? স্ব-রাজ—নিজের মূর্ত্তি যাহাতে বিকাশ পায়—তাহাই স্বরাজ। আমার স্বরাজ অর্থে সমস্ত জিনিস এসে পড়ে—নিজেকে যেখানে প্রকাশ। কবিকে চিনতে গেলে তাঁর কার্য্যের ভিতর থেকে তাঁকে চিনতে

হয়। তাঁর লেখার মধ্যে স্বরাজের কথা আমি পাই, তাই এই সভায় আজ আমি সভাপতিত্ব গ্রহণ করেছি। বেদান্তের কথা দুই একটা বলিলে আমার বোধহয় একেবারে অনধিকার চর্চ্চা হবে না। বেদান্তে বলে—ভগবান এক, আবার বহু—এই নিয়েই তো বেদান্তে ঝগড়া। কেউ বলছে এক, কেউ বলছে বহু। একের মধ্যেই আমরা বহুকে পাই, আবার বহুর মধ্যে এককেই উপলব্ধি করি। কতকগুলি দেশ লইয়াই যে বিশ্ব—তাহা নহে, এই ফুলের (টেবিলের উপর ফুলের তোড়া দেখাইয়া) মধ্যেই বিশ্ব রহিয়াছে, যিনি ধ্যানস্থ হইয়া দেখিবেন তিনিই দেখিতে পাইবেন। আমি আমার সম্পাদিত 'নারায়ণ' মাসিকপত্রে একটী স্তব লিখিয়াছিলাম—'হে ভগবান, তুমিই এক এবং তুমিই বহু, তোমাকে নহিলে আমাদের চলে না, আবার আমাদের নহিলেও তোমার চলে না।' গিরিশচন্দ্রকে আমি মহাকবি বলি কেন? যে কবিতায় ধর্ম্ম নাই—সে কবি অধিকদিন বাঁচে না। মহাকবি বলি কাকে?—যাঁর কবিতায়—যাঁর রচনায়—জাতীয়তা আছে, ধর্ম্ম আছে—তাহাকেই মহাকবি বলি। চণ্ডীদাস থেকে ঈশ্বর গুপ্ত পর্য্যন্ত আমি আমার 'নারায়ণ'পত্রে দেখাইয়াছি—কবিতার মধ্যে জাতীয়তার কতবার উত্থান ও পতন হইয়াছে। চণ্ডীদাসের পর মহাপ্রভুর সময়ে এই ভাব বিশেষ জাগিয়া উঠিয়াছিল, তাহার পর আবার ভারতচন্দ্রের সময় অনেকটা মলিন হইয়া যায়, পরে রামপ্রসাদে তাহা আবার জাগিয়া উঠে—আবার এই গিরিশ ঘোষে তাহা জেগে উঠেছিল। গিরিশবাবুর কবিতায়—গানে—আমরা জাতীয়তা পাই—প্রাণ পাই—দেশের একটা স্বরূপ-মূর্ত্তি দেখতে পাই,—ইহাই তাঁহার রচনার বৈশিষ্ট্য। তাঁর কবিতা যাচাই করতে ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড, জার্ম্মানিতে যেতে হবে না। তাঁর কবিতায় বিলাতী ভাব নাই, ভাব ধার করতে তাঁকে বিদেশে যেতে হয় নাই। গিরিশচন্দ্র খাঁটী দেশী কবি, তিনি দেশীয় ভাবে দেশমাতৃকার সেবা করেছেন—দেশের প্রাণের কথা ফুটিয়ে তুলেছেন—এইজন্যই তিনি মহাকবি—দেশের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি। এমন একদিন আসবে, যেদিন সমস্ত জগৎ ভারতের দ্বারে এসে নতজানু হয়ে ভারতের ধর্ম্ম, সাহিত্য, কাব্য, নাটক আলোচনা করবে, তখন গিরিশচন্দ্র স্বরূপ-মূর্ত্তিতে তাঁদের নিকট প্রকাশিত হবেন, এবং তখন তাঁরা জানতে পারবেন—গিরিশচন্দ্র কত বড়।"

পরবৎসর 'ষ্টার থিয়েটারে' (৪ঠা ফাল্গুন, ১৩৩১ সাল) গিরিশচন্দ্রের ত্রয়োদশ বার্ষিকী স্মৃতিসভার অধিবেশন হইয়াছিল। সভাপতি হইয়াছিলেন পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন, এম. এ., বি. এল মহাশয়। তিনি গিরিশচন্দ্রের প্রতিভা সম্বন্ধে নানা কথা কহিয়া অবশেষে তাঁহার বিদূষক চরিত্রসৃষ্টির উল্লেখ করিয়া বলেন যে, কোন জাতির কোন নাটকে তাহা নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

তৎ-পরবৎসর ২৫শে মাঘ (১৩৩২ সাল) 'মিনার্ভা থিয়েটারে' চতুর্দ্দশ বার্ষিকী স্মৃতিসভার অধিবেশনে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম. এ., সি. আই. ই. মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। গিরিশচন্দ্র সাহিত্যের ভিতর দিয়া কি অমূল্য সম্পদ দেশবাসীকে দিয়া গিয়াছেন, এতদ্-সম্বন্ধে তিনি বহু সারগর্ভ কথা বলেন।

গিরিশচন্দ্রের মর্ম্মরমূর্ত্তি

বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ শ্রীযুক্ত বিজয়চাঁদ মহাতাব বাহাদুর, কাশিম-বাজারাধিপতি মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর, হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মাননীয় সারদাচরণ মিত্র ও মাননীয় আশুতোষ চৌধুরী, মাননীয় ভূপেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ প্রামাণিক, স্বর্গীয় রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, সুবিখ্যাত পুস্তক-প্রকাশক ও বিক্রেতা স্বর্গীয় গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত মনোমোহন পাঁড়ে, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, ডাক্তার চন্দ্রশেখর কালী প্রভৃতি বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিগণের আনুকূল্যে 'গিরিশচন্দ্র-স্মৃতি-সমিতি'-কর্তৃক মহাকবির একটী মর্ম্মরমূর্ত্তি স্থাপনের প্রস্তাব হয়। ইতিপূর্ব্বে এতদ্-উদ্দেশ্যে কলিকাতার নাট্যশালাগুলি সম্মিলিত হইয়া সমবেত অভিনয়ে তিন হাজার পাঁচশত মুদ্রা কমিটীর হস্তে তুলিয়া দেন।

বম্বের সুপ্রসিদ্ধ ভাস্কর বি. ভি. ওয়াগ গিরিশচন্দ্রের মর্ম্মরমূর্ত্তিটী নির্ম্মাণ করেন। প্রস্তরমূর্ত্তি কলিকাতায় আসিলে 'বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ'-মন্দিরে বহুদিন ধরিয়া ইহা রক্ষিত হয়।

গিরিশ পার্ক

দেশপূজ্য দেশবন্ধু স্বর্গীয় চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয়ের উদ্যোগে, কলিকাতা করপোরেশন সেণ্ট্রাল এভিনিউ সংলগ্ন পূর্ব্বতন জোড়াপুকুর স্কোয়ার পার্কটী বিস্তৃত করিয়া 'গিরিশ পার্ক' নামকরণ করিয়াছেন। 'গিরিশচন্দ্র-স্মৃতি-সমিতি' এইখানেই গিরিশচন্দ্রের মর্ম্মরমূর্ত্তি স্থাপনে সঙ্কল্প করেন। সুপ্রসিদ্ধ কণ্ট্রাক্টার কে. সি. ঘোষ কোম্পানী মূর্ত্তির বেদী নির্ম্মাণ করেন। আশা করি, দেশবাসীর উৎসাহ এবং উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত গিরিশ পার্কে গিরিশচন্দ্রের এই মর্ম্মরমূর্ত্তির উন্মোচন উৎসব শীঘ্রই সুসম্পন্ন হইবে।

(৩)

নাটকে পঞ্চসন্ধি

গিরিশচন্দ্রের সূক্ষ্ম নাট্যরসানুভূতির পরিচয় দিবার জন্য সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রমতে আমরা এই নাটকের পঞ্চসন্ধি বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইব।

যদিও আমরা গিরিশচন্দ্রের মুখে "মুখং প্রতিমুখং গর্ভোবিমর্ষ উপসংহৃতি" এই শ্লোকটী বহুবার শুনিয়াছি, তথাপি তিনি সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্র সম্যক্‌ভাবে আলোচনা করেন নাই। কিন্তু কবির সূক্ষ্মদর্শী প্রতিভা অজ্ঞাতসারে সত্যের কিরূপ অনুসরণ করিয়াছে, 'সৎনাম' নাটকের গল্প বিশ্লেষণ করিলেই তাহা বেশ বুঝা যাইবে। সংস্কৃত

আলঙ্কারিকগণ রসের দিক দিয়া পঞ্চসন্ধির বিচার করিয়াছেন, কিন্তু এস্থলে নাটকের ঘটনা (plot) এবং উদ্দেশ্যের দিক দিয়া পঞ্চসন্ধি বিচার করিতে হইবে।

সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের মতে 'নাটকং খ্যাতবৃত্তং স্যাৎ পঞ্চসন্ধি সমন্বিতম।' নাটক পৌরাণিক অথবা ঐতিহাসিক চরিত্রবিশিষ্ট এবং মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ, বিমর্ষ ও উপসংহৃতি এই পঞ্চসন্ধি সমন্বিত হইবে।

এই পঞ্চসন্ধি নাটকীয় রস বা গল্পবিকাশের পাঁচটা স্বরমাত্র। প্রথম স্তরে বীজ-বপন ও ঘটনার উৎপত্তি; দ্বিতীয়ে বিষয়ান্তর সূচনা ও প্রতিকূল অবস্থার অবতারণা; তৃতীয়ে অনুকূল ও প্রতিকূল অবস্থার সংঘর্ষ; চতুর্থে বিঘ্ন সমাগম ও অতিক্রম, পঞ্চমে পরিণাম ফল।*

প্রথম অঙ্ক — মুখসন্ধি — বীজবপন ও সঙ্কল্প।

নাড়োল নগরে মহান্ত নামে একজন সৎনামী পণ্ডিত ছিলেন। বৈষ্ণবী তাঁহার কন্যা। মহান্তর এক শিষ্য ছিল — বীর, ধীর, শাস্ত্রজ্ঞ, নাম রণেন্দ্র। আওরঙ্গজেব তখন হিন্দুস্থানের সম্রাট। বাদসাহী সেনা নাড়োলে আসিয়া একদিন অকারণে মহান্তকে হত্যা করায় বৈষ্ণবীর সুপ্তশক্তি জাগিয়া উঠিল; রণেন্দ্রকে বলিল, 'নগবালা মহিষাসুর বধ করেছেন, শুম্ভ-নিশুম্ভ বধ করেছেন, আমি শত্রু বধ করবো।' রণেন্দ্র গুরুহত্যা দর্শনে ইতিপূর্ব্বেই সঙ্কল্প করিয়াছে যে শত্রুধ্বংস না ক'রে যদি আমি পরকাল কামনা করি, যেন আমার শত্রু-হস্তে মৃত্যু হয়। এই উদ্দেশ্যে সে সৎনামী পরিব্রাজক ফকীররামের উপদেশ গ্রহণ করে। ফকীররাম তাহাকে উচ্চকার্য্যে উৎসাহ দিয়া রমণীর মোহকারিণী শক্তি সম্বন্ধে সতর্ক হইতে বলেন। রণেন্দ্র বলে, 'রমণী হ'তে তাহার কোন ভয় নাই।' প্রত্যুত্তরে ফকীররাম বলেন, 'বাপু, তোমার ভয় নাই, কিন্তু ঐটুকুতে আমার ভয় হচ্ছে।' ইহাই নাটকের বীজ। বৈষ্ণবী, রণেন্দ্র, ফকীররাম ও তাহার শিষ্য চরণদাস এবং পরশুরাম কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন।

দ্বিতীয় অঙ্ক — প্রতিমুখসন্ধি — অনুকূল ও প্রতিকূল অবস্থার অবতারণা।

অনুকূল অবস্থা —

রণেন্দ্র, বৈষ্ণবী প্রভৃতির উৎসাহে সৎনামী সম্প্রদায়ের মধ্যে আগুন জ্বলিয়াছে। আবালবৃদ্ধবণিতা উত্তেজিত বা অতঃপর কৌমারীপূজা করিয়া বৈষ্ণবী বিদ্রোহের পতাকা ধারণ করিল।

প্রতিকূল অবস্থা —

রণেন্দ্র নেতৃ-মুকুট ধারণ করিল; কিন্তু কৌমারীর নিকট শক্তি প্রার্থনা না করায় বৈষ্ণবী বলিয়া উঠিল, 'কি ক'রলে — কি ক'রলে? ঐ দেখ — দেবীর মুখ তমসাচ্ছন্ন হলো।'

তৃতীয় অঙ্ক — গর্ভসন্ধি — অনুকূল ও প্রতিকূল সংঘর্ষ।

অনুকূল —

* শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু-প্রণীত 'শকুন্তলার নাট্যকলা' (৬৬ পৃষ্ঠা)।

বাদসাহী পাইকগণ নিরন্তর হিন্দুদের উপর অত্যাচার করিবার অছিলা খুঁজিয়া বেড়ায়। শস্তুক্ষেত্রে মঠ লুট করিতে আসিয়া এইরূপ একজন পাইক চরণদাস কর্তৃক নিহত হইল। মোগল দুর্গাধিপতি কারতরফ খাঁ হত্যাকারীকে চিহ্নিত করিতে না পারিয়া প্রাণদণ্ডের ভীতি প্রদর্শন করিয়া সহস্র প্রজাকে কারারুদ্ধ করিলেন। তাঁহার কন্যা গুলসানা ইহাদের মুক্তির জন্য অনেক অনুনয় করিলেও কোন ফল হইল না। কিন্তু চরণদাসের কৌশলে সৎনামী সেনা সেই রাত্রে দুর্গাধিকার করিয়া রুদ্ধ প্রজাগণকে মুক্ত করিয়া দিল। কারতরফ খাঁ রণেন্দ্রের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে পরাস্ত হইয়া ফকীররাম কর্তৃক নিহত হইলেন।

প্রতিকূল—

গুলসানা তথায় উপস্থিত ছিল। অন্যের অলক্ষিতে সে তথা হইতে পলাইল। অনুকূল ও প্রতিকূলের সংঘর্ষে প্রতিকূল শক্তি প্রবল হইয়া উঠিল। গুলসানা দৃঢ়সঙ্কল্প করিল—কোমলহৃদয় রণেন্দ্রকে কটাক্ষ-সন্ধানে বিদ্ধ করিয়া পিতৃহত্যার প্রতিশোধ দিবে।

চতুর্থ অঙ্ক—বিমর্ষ সন্ধি—বিঘ্ন সমাগম ও অতিক্রম।

দেবীর বরে সৎনামীদল দিনে-দিনে দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিল। শত শত্রুদুর্গ একে-একে তাহাদের করগত হইতে লাগিল। রণেন্দ্রের হৃদয়ে এখনও প্রেমস্পর্শ করে নাই। ক্রমে নানা ছলে—কৌশলে—ছদ্মবেশে গুলসানা রণেন্দ্রকে দুর্ভেদ্য মায়াজালে জড়িত করিল; সে নিজেও আপনার মায়াজালে জড়াইয়া পড়িল। রণেন্দ্রকে যেমন সে মুগ্ধ করিয়াছে, আপনিও তেমনি মুগ্ধ হইয়াছে। কেবল কঠোর প্রতিহিংসা-তৃষা তাহার প্রেম-পিপাসাকে দমিত করিয়া রাখিল।

বিঘ্ন সমাগম—

কৌমারী দেবীর নিষেধ—রমণী-কটাক্ষে হৃদয় না বিদ্ধ হয়। গুলসানা রণেন্দ্রকে বিচলিত করিয়া সৎনামী দীক্ষা গ্রহণ করিল। কিন্তু আপনার প্রতিহিংসা পথ হইতে একপদ টলিল না। ক্রমে রণেন্দ্র যখন নিজ অন্তরে কলুষিত ভাব বুঝিল, তখন আর তাহার প্রতিকারের উপায় নাই। বৈষ্ণবীকে বলিল, "ভগ্নি, তোমার হস্তে তরবারী রহিয়াছে, আমার হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া যন্ত্রণার অবসান করো। আমি রমণী-প্রণয়ে মুগ্ধ—পাপীষ্ঠ—আমাকে বধ করো।"

বিঘ্ন অতিক্রম—

বৈষ্ণবী অন্তরে-অন্তরে রণেন্দ্রের অবস্থা বুঝিল; কিন্তু রণেন্দ্রকে বুঝাইল, "তোমার এ প্রেম নয়—দয়া। দেবীর পায় মার্জ্জনাভিক্ষা করিয়া যুদ্ধে অগ্রসর হও।" বৈষ্ণবীর উৎসাহে রণেন্দ্র কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া কৌমারী-চরণে মার্জ্জনা-ভিক্ষা করিয়া যুদ্ধে অগ্রসর হইবার নিমিত্ত প্রস্থান করিলেন।

পঞ্চম অঙ্ক—উপসংহৃতি—পরিণাম।

কৌমারীর বরে সৎনামী বীর্য্য সূর্য্যের সায়াহ্ন দীপ্তির ন্যায় প্রভা বিস্তার করিয়া সম্রাট-সৈন্যকে ছারখার করিতে লাগিল। আওরঙ্গজেব সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন। এইসময়

'চাতুরীনিপুণা গুলসানা আর-এক কৌশল করিল ; পঞ্চদশ মোগলসৈন্য যেন তাহাকে বন্দী করিবার চেষ্টা করিতেছে, এইভাবে তাহাদের সহিত কপটযুদ্ধ করিতে-করিতে রণেন্দ্রকে ভুলাইয়া সংগ্রামের সন্নিস্থল হইতে অন্যত্র লইয়া গেল। গুলসানার আদেশে রণেন্দ্র বন্দী অবস্থায় সম্রাট সমীপে নীত হইয়া নিহত হইল, এবং সঙ্গে-সঙ্গে গুলসানাও প্রাণ বিসর্জ্জন করিল।

অতঃপর বৈষ্ণবী সম্রাটের নিকট স্বয়ং উপস্থিত হইয়া মৃত্যুভিক্ষা করিল। আওরঙ্গজেব তাহাকে সে দণ্ড দিলেন না। কিন্তু কৌমারী দেবী—সেবিকা দুহিতাকে নিজ অঙ্কে স্থানদান করিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে বৈষ্ণবী মোগল সম্রাটকে বলিল, "শ্বেত-বীরগণ (ইংরাজ) তোমার বংশ ধ্বংস করিয়া বীর্য্যবলে ভারত-শাসন করিবে। আর হিন্দুগণ কামিনীকাঞ্চন বর্জ্জন করিয়া যতদিন না দীন ভ্রাতৃসেবা করিবে, ততদিন তাহাদের মুক্তি নাই।"

(৪)

'গৃহলক্ষ্মী' (বা আদর্শ-গৃহিণী)

ষড়চত্বারিংশ পরিচ্ছেদে (৩৮৪ পৃষ্ঠায়) লিখিত হইয়াছে, 'কোহিনূর থিয়েটারে'র জন্য গিরিশচন্দ্র একখানি সামাজিক নাটক চারি অঙ্ক পর্য্যন্ত লিখিয়াছিলেন। গিরিশচন্দ্রের পরমাত্মীয় সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় ইহার পঞ্চম অঙ্ক লিখিয়া দেন। গিরিশচন্দ্রের পরলোকগমনের সাত মাস পরে 'মিনার্ভা থিয়েটারে' ৫ই আশ্বিন (১৩১৯ সাল) 'গৃহলক্ষ্মী' প্রথম অভিনীত হয়। প্রথমাভিনয় রজনীর অভিনেতৃগণ :

উপেন্দ্রনাথ	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু)।
শৈলেন্দ্রনাথ	N. Banerjee, Esq. (খাকবাবু)।
নীরদ	ক্ষেত্রমোহন মিত্র।
মন্মথ	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দে।
বৈদ্যনাথ	শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঘোষ।
নিতাই	শ্রীপ্রিয়নাথ ঘোষ।
হীরু ঘোষাল	শ্রীঅপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
শিবু	তারকনাথ পালিত।
নকুলানন্দ	পণ্ডিত শ্রীহরিভূষণ ভট্টাচার্য্য।
শরৎ	শ্রীহীরালাল চট্টোপাধ্যায়।
সতীশ ও পুলিশের জমাদার	অমুকূলচন্দ্র বটব্যাল (অ্যাজাস)।
প্রমথ ও জনৈক ভদ্রলোক	শ্রীমধুসূদন ভট্টাচার্য্য।
বিহারী, ডাক্তার ও রেজিষ্ট্রার	শ্রীনরেন্দ্রনাথ সিংহ।

জমাদার ও পুলিশ ইন্সপেক্টার	শ্রীমৃত্যুঞ্জয় পাল
ভৈরবী	শ্রীহরিদাস দত্ত।
শ্যামা	মন্মথনাথ বসু।
পাওনাদার ও পিয়াদা	শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় (ভুলি)।
রেজিষ্ট্রারের কর্ম্মচারী ও প্রথম দ্বারবান	শ্রীউপেন্দ্রনাথ বসাক।
২য় দ্বারবান ও পাহারাওয়ালা	শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দে।
১ম পাওনাদার ও পিয়াদা	শ্রীআশুতোষ ঘোষ।
২য় পাওনাদার ও পিয়াদা	শ্রীপুলিনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
বেলিফ	শ্রীমন্মথনাথ বসাক।
বিরজা	শ্রীমতী তারাসুন্দরী।
তরঙ্গিণী	শ্রীমতী প্রকাশমণি।
সরোজিনী	সরোজিনী (নেড়া)।
মণি ও কুমুদিনীর মাতা	শ্রীমতী হেমন্তকুমারী।
ফুলি	শ্রীমতী নীরদাসুন্দরী।
কুমুদিনী	শ্রীমতী চারুশীলা। ইত্যাদি।
স্বত্বাধিকারী	শ্রীমনোমোহন পাঁড়ে।
অধ্যক্ষ	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ।
শিক্ষক	পণ্ডিত শ্রীহরিভূষণ ভট্টাচার্য্য ও শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ।
সঙ্গীত-শিক্ষক	শ্রীদেবকণ্ঠ বাগচী।
নৃত্য-শিক্ষক	শ্রীসাতকড়ি গঙ্গোপাধ্যায়।
রঙ্গভূমি-সজ্জাকর	শ্রীকালীচরণ দাস।

যদিও গিরিশচন্দ্র নাটকখানি অসমাপ্ত অবস্থায় রাখিয়া গিয়াছিলেন, এবং তাহার পরিণাম কি হইবে, তাহা দেবেন্দ্রবাবুকে জানাইয়া দিয়া যান নাই, তথাপি তাঁহার প্রিয়তম ভক্তের কল্পনা এবং লিপিচাতুর্য্যে দর্শকগণ পঞ্চম অঙ্ক যে অন্য কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছিল, তাহা একেবারেই বুঝিতে পারে নাই, এবং শেষাঙ্ক দর্শনে পরম আনন্দে নাটকের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া যান। চরিত্রসৃষ্টি এবং নাট্যসৌন্দর্য্যে 'গৃহলক্ষ্মী' অতি অল্পদিনের মধ্যেই নাট্যামোদিগণের নিকট বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। এ নাটকের উপেন্দ্রের চরিত্র সম্পূর্ণ নূতন ছাঁচে গঠিত হইয়াছে। গিরিশচন্দ্রের সামাজিক নাটকে প্রায় সকল চরিত্রই কর্ম্মী, কিন্তু এ নাটকের নায়ক উপেন্দ্র একপ্রকার নিশ্চেষ্ট কর্ম্মহীন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সমগ্র নাটকের ভিতর ইহার কার্য্য একটী এবং সেই কার্য্যের ফলেই উপেন্দ্রের সংসারে সকল অনিষ্টের সৃষ্টি হইয়াছিল। আমরা তাঁহার পুত্র নীরদকে বিষয়ের মোক্তারনামা দিবার কথা উল্লেখ করিতেছি। সামান্য উত্তেজনায় উপেন্দ্র অসংযত এমনকি সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়েন। অথচ ইহারই চারিদিকে লোভ, প্রতিহিংসা

প্রভৃতি দুর্জ্জয় রিপুচয় ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সাগরের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া তাঁহাকে মুহুর্মুহু আহত করিতেছে। ইহাতে পাহাড়কেও টলাইয়া দেয়—উপেন্দ্র তো স্নায়বিক বিকারগ্রস্ত রোগী। অন্যান্য সামাজিক নাটকের ন্যায় এ নাটকেরও চরিত্রসৃষ্টি স্বাভাবিক এবং সকলগুলিই সুন্দরভাবে বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছে। বড় বউ বিরজা চরিত্রের তুলনা নাই। একদিকে উপেন্দ্রের চরিত্রে যেমন ধৈর্য্যের অভাব—অন্যদিকে এই বড় বউ বিরজা তেমনি সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্ত্তি। পুস্তকখানির বিশদ সমালোচনা করিতে যাইলে অনেক-অনেক কথা বলিবার আছে; পুত্রের উপর জননীর কুপ্রভাব যে কি বিষময় পরিণাম উৎপাদন করে—এ নাটকে তাহার চিত্র অতি নিপুণভাবে চিত্রিত হইয়াছে। কিন্তু অন্যসকল চরিত্র যাহাই হউক, গণিকা-কন্যা ফুলী এ নাটকের এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি! মোনাবাবুর এই মানসী কন্যা সৌন্দর্য্যে ও মাধুর্য্যে যেন একটী অপার্থিব কুসুম। হীরু ঘোষাল, শরৎ, কুমুদিনী এবং অবধূতের চরিত্র একেবারে সজীব। নাটকখানির অভিনয়ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল।

১৯১২।১৩ খ্রীষ্টাব্দের বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের রিপোর্টে প্রকাশিত হইয়াছিল :

"Dramas were many but on the whole poor; the best of them was the "Griha-Lakshmi" of the late Babu Girish Chandra Ghose, whose recent death is a great loss to the Bengalee stage."

The Bengal Administration Report 1912-13, Page 114, para 587.

নাটকখানি সাধারণে কিরূপ সমাদৃত হইয়াছিল, তাহা ইহার দ্বিতীয় সংস্করণে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের লিখিত "কৃতজ্ঞতা-স্বীকার" পাঠে পাঠক অবগত হইবেন। যথা—

"আমার পূজ্যপাদ পিতৃদেব জীবনের শেষভাগে 'গৃহলক্ষ্মী' লিখিতে আরম্ভ করেন; কিন্তু শারীরিক অসুস্থতানিবন্ধন এবং অন্যান্য নানা কারণবশতঃ নাটকখানির চতুর্থ অঙ্ক পর্য্যন্ত লিখিয়া রচনা স্থগিত রাখেন। তাঁহার স্বর্গারোহণের পর, পুস্তকখানি অভিনয়ের বিশেষ উপযোগী দেখিয়া তাহা সম্পূর্ণ করিবার জন্য পূজ্যপাদ পিতৃদেবের পিতৃব্যপ্রেয় আমার পরমশ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ বসু খুল্লতাত মহাশয়কে অনুরোধ করি, এবং ইহার দ্বারা পঞ্চম অঙ্কটী লিখাইয়া লই। দেবেন্দ্রবাবুর শ্রম যে বিফল হয় নাই, অল্প সময়ের মধ্যে 'গৃহলক্ষ্মী'র প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হওয়ায় এবং অভিনয়কালে দর্শকবৃন্দের উচ্চপ্রশংসালাভ করায় তাহা সুপ্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ।"

অভিনয় আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে রঙ্গমঞ্চে পুষ্প-পত্র শোভিত গিরিশচন্দ্রের প্রতিমূর্ত্তির সম্মুখে সমবেত অভিনেতা ও অভিনেত্রী-কর্ত্তৃক নিম্নলিখিত "গিরিশ-বন্দনা" গীতটী গীত হয়।

"অর্দ্ধ শতাব্দী কর্ম্মক্ষেত্রে অটল অদ্রির মত,
ঘৃণা-লজ্জা-ভয় বজ্র-ঝঞ্ঝা সহি সাধনে হইয়া রত,

নাট্যশালা-নাটক-নট নবভাবে করি গঠন,
জ্ঞানধর্ম্ম স্বদেশ-প্রীতি বীজ করিয়া বপন,
রঙ্গ মাত্র রঙ্গালয়—কলঙ্ক করিয়া দূর,
বীরসজ্জা ত্যজি, ফুলশয্যা 'পরি শায়িত কে আজি শূর?
সে যে, বঙ্গের গৌরব, বঙ্গের সৌরভ, বঙ্গের কৌস্তুভহার,
বঙ্গের গিরিশ, বঙ্গের গ্যারিক, বঙ্গের সেক্সপীয়ার।

নাট্যশালা কুসুমমালায় সাজিয়া আজি যে নগরী,
মত্ত করিছে নাট্যামোদীরে নিত্য নবরস বিতরি,
ক্রুদ্ধচিত্ত হ'তেছে স্নিগ্ধ, পাষাণ হৃদয় চূর্ণ,
প্রেমিকজন প্রেমে বিভোর, তৃষিত প্রাণ পূর্ণ!
কেবা প্রাণপণে, এ বঙ্গ-প্রাঙ্গণে সৃজি এ নাট্যশালা,
কঠোর সাধনে, তুলিলা জাগায়ে নিদ্রিত নাট্যকলা?
সে যে, বঙ্গের গৌরব, বঙ্গের সৌরভ, বঙ্গের কৌস্তুভহার,
বঙ্গের গিরিশ, বঙ্গের গ্যারিক, বঙ্গের সেক্সপীয়ার!

কেবা, পুরাণ-সমাজ-ইতিহাস হ'তে করিয়া চিত্র অঙ্কন,
নবীন ছন্দে নাট্যজগতে যুগ করিলা বর্ত্তন?
নাটক-নাটিকা-প্রহসন আদি বিবিধ কুসুমস্তরে,
তীব্র অনুরাগে আজীবন কেবা পূজিলা নাট্যাগারে?
ধন্য জনম, ধন্য প্রতিভা, ধন্য রচনা প্রাণময়,
নরদেহ ধরি, নারায়ণ আসি দেখিলা যাহার অভিনয়!
সে যে, বঙ্গের গৌরব, বঙ্গের সৌরভ, বঙ্গের কৌস্তুভহার,
বঙ্গের গিরিশ, বঙ্গের গ্যারিক, বঙ্গের সেক্সপীয়ার!

গুরুর অভাবে কে সে নটগুরু আপনি হইলা সিদ্ধ,
'নিমচাঁদ'-বেশে প্রথমাভিনয় করিলা বঙ্গ মুগ্ধ?
উন্নত মার্জ্জিত অভিনয়-কলা প্রচার করিয়া বঙ্গে,
বঙ্গ-রঙ্গালয়-কীর্ত্তি-মেখলা দানিলা অবনী-অঙ্গে।
পুত্রকন্যা সম নট-নটীগণে করিলা শিক্ষা দান,
চরণ পরশে মূর্খ কতই লভিলা উচ্চ স্থান!
সে যে, বঙ্গের গৌরব, বঙ্গের সৌরভ, বঙ্গের কৌস্তুভহার,
বঙ্গের গিরিশ, বঙ্গের গ্যারিক, বঙ্গের সেক্সপীয়ার।

পীড়িত দরিদ্র আর্ত্ত-নিনাদে আর্দ্র চিত্তে কেবা—
করিলা গ্রহণ আজীবন ব্রত দীন-অনাথ-সেবা ?
বিপুলোত্তমে চিকিৎসাশাস্ত্রে লভিয়া গভীর জ্ঞান,
ভেষজ-পথ্য বিলায়ে নিত্য রাখিলা লক্ষ প্রাণ !
কাহার বিহনে দীন-নয়নে ছুটিছে তপ্তধার—
কে আর শুনিবে ব্যগ্র চিত্তে মর্ম্মবেদনা তার ?
সে যে, বঙ্গের গৌরব, বঙ্গের সৌরভ, বঙ্গের কৌস্তুভহার,
বঙ্গের গিরিশ, বঙ্গের গ্যারিক, বঙ্গের সেক্সপীয়ার !

শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীমুখ-নিঃসৃত 'ভৈরব' আখ্যা যাঁর,
বীরভক্ত মুক্তপুরুষ ধ্রুব বিশ্বাসাধার,
গুরু-কৃপাবল-বর্ম্ম পরিয়া বিজয়ী কর্ম্মক্ষেত্রে,
স্তুতি-নিন্দায় নহে বিচলিত, চকিত শত্রু-মিত্রে !
বিরামবিহীন জীবন-সমরে উড়ায়ে বিজয়-নিশান,
গুরুআজ্ঞা পালি, 'রামকৃষ্ণ' বলি তেয়াগিল কেবা প্রাণ ?
সে যে, বঙ্গের গৌরব, বঙ্গের সৌরভ, বঙ্গের কৌস্তুভহার,
বঙ্গের গিরিশ, বঙ্গের গ্যারিক, বঙ্গের সেক্সপীয়ার !

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।"

—

সম্পূরণ

কর্মীর জীবনী প্রধানত তাঁর কর্মজীবনের ইতিহাস। গিরিশচন্দ্রের জীবনী সেই অর্থে বাঙলা সাধারণ নাট্যশালার প্রথম চল্লিশ বছরের ইতিহাস। উন্মেষ পর্বের বাঙলা মঞ্চের আলো-আঁধার তাঁর জীবনকেও বর্ণিল ক'রে তুলেছিলো। গিরিশচন্দ্র ও তাঁর সহযোগীদের চেষ্টায় যে-নাট্যশালা গ'ড়ে উঠেছিলো বাঙলাদেশে, একমাত্র ভারতীয় রঙ্গমঞ্চেরই ঐতিহ্যবাহী ব'লে তাকে দাবী করা যায় না, অথচ যাত্রার সঙ্গে তার যোগ নাড়ীর। মনে রাখা দরকার, তর্জা পাঁচালী কবিগান তখন ক্রমে অপস্রয়মান, যাত্রার প্রতিপত্তি গ্রামে-গঞ্জে যতোটা, শহরে তখনও ততোটা প্রতিষ্ঠিত নয়। অর্থাৎ, সামন্ত সমাজের আমোদ উপকরণ যখন আর শিল্প-নাগরিক শহুরে সমাজের মনোরঞ্জন করতে পারছে না, তখন একদিকে বিদগ্ধ কিন্তু অপ্রচলিত সংস্কৃত নাট্যাচার ও প্রাণবন্ত কিন্তু ভ্রষ্টরুচির লোকায়ত যাত্রা, অন্যদিকে নবলব্ধ য়ুরোপীয় নাট্যকলা—এরই মধ্যে গ'ড়ে উঠেছে বাঙলা নাটক ও নাট্যশালা। তার আদর্শ যদিও নব্য-প্রভু ইংরেজদের থেকে পাওয়া, সে-নাট্যশালায় যা পরিবেষিত হয়, যাত্রার সঙ্গে তার দূরত্ব সামান্যই। তাই, 'শর্মিষ্ঠা' যাত্রা সম্প্রদায়ের সফলতা লাভের সঙ্গে-সঙ্গেই বাঙলা নাট্যশালার প্রতিষ্ঠাতৃদের মনে থিয়েটারের দল বসানোর বাসনা প্রবল হ'লো—থিয়েটারের আঙ্গিক তাঁদের আত্মপ্রকাশের অনিবার্য ও একমাত্র মাধ্যম মনে করেছিলেন ব'লে নয়, থিয়েটার নামের সঙ্গেই তাঁরা যুক্ত ক'রে নিয়েছিলেন এক কৌলিন্যের অনুষঙ্গ—যেন যাত্রার সঙ্গে থিয়েটারের প্রয়োগশিল্পগত দর্শনের কোনো প্রভেদ নেই, আঙ্গিক ও বাচিক অভিনয়ের কোনো তারতম্য নেই, তফাৎ শুধুমাত্র 'দৃশ্যপট ও পোষাক-পরিচ্ছদে বিস্তর খরচ' করতে পারার ওপর নির্ভরশীল। তাই, প্রসিনিয়ম মঞ্চে প্রকৃতপক্ষে তাঁরা যখন যাত্রা পরিবেষণ করছেন, তখনও থিয়েটার নামের মোহ ত্যাগ করতে পারেননি!

এতোদিন প্রমোদমূল্য বাধা ছিলো না সাধারণ মানুষের অবসর বিনোদনের, ধনিক সম্প্রদায়ের আত্মগৌরব উপভোগের স্বাদে পরিতৃপ্ত হ'তো সে-বাসনা। কিন্তু এখন, যখন রাজবাড়ির নাটমন্দির ছেড়ে রাজপথের ধারে গ'ড়ে উঠলো প্রেক্ষাগৃহ, নগদমূল্য ছাড়া সেখানে প্রবেশের অধিকার হ'লো সীমিত। বিত্তের তারতম্যে আমোদশালার পথও হ'য়ে গেলো দ্বিধাবিভক্ত। বিষয়বস্তু বা পরিবেষণে রুচির যে বিশেষ তারতম্য ঘটলো তা নয়, কিন্তু দর্শকের চরিত্র পাল্‌টে গেলো প্রায় সম্পূর্ণই। নাট্যশালায় গতায়াত হ'য়ে উঠলো সামাজিক প্রতিষ্ঠার অন্যতম শর্ত এবং সেই সূত্রে আভিজাত্য ও ঐশ্বর্য প্রদর্শনের উপলক্ষ-বিশেষ। বলা বাহুল্য, উপায় ও উদ্দেশ্যের এই বিরোধের ফলে নাট্যশালা হয়তো লাভজনক বিনিয়োগের ক্ষেত্র হিশেবে

প্রযোজকদের সতৃষ্ণ দৃষ্টি আকর্ষণ করলো; কিন্তু এই কৃত্রিম আবহাওয়া নাট্যরুচির পরিশীলনে সাহায্য করলো না বিন্দুমাত্র। অর্থের বিনিময়ে সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকের অধিকার লাভ করাকে সঙ্গতভাবেই গিরিশচন্দ্র তাই ব্যঙ্গ করতে বাধ্য হয়েছিলেন: 'স্বান মহাত্ম্যো হাড়ীতঁড়ী পয়সা দে দেখে বাহার'।

ঔপনিবেশিক পরিবেশের মধ্যে এইভাবে যে নব্য নাট্যশালার সূচনা হ'লো বাঙলাদেশে, দ্বিধা ও স্ববিরোধের বীজ উপ্ত ছিলো তার প্রথম থেকেই। পাশ্চাত্য পরিভাষায় যাকে নাটক বলে, তার অভাব সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন হরচন্দ্র ঘোষ থেকে মধুসূদন দত্ত পর্যন্ত সকলেই। কিন্তু সমাজ-পরিবেশ ও মূল্যবোধের পার্থক্যের কথা স্বীকার ক'রেও তাঁরা আবিষ্টের মতো মেনে নিয়েছিলেন প্রতীচ্য নাট্যকৌশল, যদিও তার প্রকাশ উপযোগী কোনো ভাষায়তন তখনও অনায়ত্ত ছিলো তাঁদের। তাই বিদেশী ছাঁদে চরিত্র গড়তে গিয়ে শেষ পর্যন্ত দেশীয় পরিচ্ছদে ভূষিত ক'রেই তাঁদের সে-প্রয়াস ক্ষান্ত হ'তো। কয়েক শতাব্দীর অনুক্রমিক বিবর্তনের ধারায় য়ুরোপীয় নাট্যকলা যে-স্তরে এসে পৌঁছেছিলো, মাত্র কয়েকটি দশকের চর্চায় তার সব সুকৃতি আত্তীকরণ করার চেষ্টায় বাঙলা নাটক পল্লবগ্রাহিতার চোরাবালিতে পা বাড়ালো। এই মন্থন পর্বের নাট্যকারেরা একমাত্র প্রহসন রচনার উপযুক্ত অসঙ্গতির পাঠ লাভ করতে পেরেছিলেন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায়। আর সেই শিকড়ের অভাবেই তাঁরা নাটক ভ'রে তুলেছিলেন অমূল ও অলীক কল্পনায়।

কিন্তু গিরিশচন্দ্রকে অনিকেত বলা যায় না কিছুতেই। তিনিই প্রথম, যিনি দর্শকের অভিরুচি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন এবং তাকে অবজ্ঞা করেননি। প্রথম জীবনে যিনি সচেতনভাবে যাত্রার মণ্ডপ ছেড়ে মঞ্চের পাদপ্রদীপের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, জীবনের মধ্য পর্বে এসে সেই যাত্রার বৈশিষ্ট্যগুলিই তিনি প্রয়োগ করলেন নাট্যের প্রয়োজনে—চমক সৃষ্টির কোনো আশু অভিসন্ধিতে নয়, যাত্রার পরিবেশনরীতিতে দর্শকের সহানুভব কল্পনা আশ্রয় ক'রে নাট্যের অধিকারকে অনেক দূর বাড়িয়ে নেওয়া যায়, এই আন্তরিক বিশ্বাস থেকেই। জাতীয় ভাবের মধ্যেই যে নাটকের মূল অনুসন্ধেয়—এ-বিষয়ে কোনো দ্বিধা বা সংশয় ছিলো না তাঁর। এবং তাঁর স্বকালের সঙ্গে যোগ রেখে সমীচীন কারণেই তিনি ধর্মের মধ্যে খুঁজে পেয়েছিলেন জাতীয় ভাবের মর্মমূল। যুগের এই বিশ্বাসের সঙ্গে যোগ ছিলো ব'লেই তাঁর কালের নাট্যশালা জাতীয় জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হ'তে পেরেছিলো। গিরিশচন্দ্র খুঁজে পেয়েছিলেন তাঁর অধিক্ষেত্রের সন্ধান, বাঙলা নাটক পেয়েছিলো স্বস্থ হওয়ার মতো অবলম্বন। শুধু তা-ই নয়, বাঙলাদেশে ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর সন্ধিকালীন দুটি দশক জুড়ে উগ্র ধার্মিকতা থেকে উদগ্র স্বাদেশিকতায় যে-দীক্ষা চলছিলো, গিরিশচন্দ্রের নাট্যজীবনও তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বিবর্তিত হচ্ছিলো। পৌরাণিক নাটক দিয়ে শুরু ক'রে পরবর্তী পর্বেই তিনি নিয়েছিলেন নাম-ভক্তি প্রচারকের ভূমিকা, প্রচলিত লৌকিক আখ্যান পর্যন্ত তখন তাঁর নাটকের উৎস বিস্তৃত। দেব ও দেবোপম মানুষে ভক্তি থেকে দেশ ও দেশপ্রেমীর প্রতি ভক্তির পথে পৌঁছতে

বেশি বিলম্ব হয়নি তাঁর। কারণ, এর সবটাই ঘটেছিলো তাঁর অভিজ্ঞতার ও বিশ্বাসের পরিধির মধ্যে। কিন্তু সামাজিক সমস্যা নিয়ে তিনি যখনই নাটক লিখতে গেছেন, তাঁর বেদনার সঙ্গে বিশ্বাসের অমিল ঘটেছে পদে-পদে। তাই সে-নাটকে কারুণ্য প্রকাশ পেয়েছে, কিন্তু করুণাঘন সত্যের বনিয়াদ পায়নি। আর এই অন্তরের অসহযোগের ফলেই সামাজিক বিষয় নিয়ে নাটক রচনাকে তাঁর মনে হয়েছে নর্দমা ঘাঁটার সমতুল্য।

নাট্যজগতের নেপথ্যের মানুষটিকে একালে হয়তো অনাত্মীয় মনে হ'তে পারে, কিন্তু অশ্রদ্ধেয় কিছুতেই নয়। নিমচাঁদ যেন নিছক রূপায়িত ভূমিকা নয়, তাঁর অস্তিত্বেরই অন্তরতর প্রকাশ। অবতার সাজার যুগে সুযোগ পেয়েও তিনি সে-পথে যাননি, বরং তারস্বরে প্রচার করেছেন নিজের স্খলন-পতনের কথা—হয়তো অতিকৃত আকারেই। কিন্তু আত্ম-অপচয়ের এই দাম্ভিকতা সত্ত্বেও পরিচিত ও পরিজনবর্গের কাছে সম্ভ্রম না-পেলেও তিনি যে শ্রদ্ধা পেয়েছিলেন, তার অকৃত্রিম প্রমাণ তাঁর মৃত্যুর পর টাউন হলে সমাজের অভিজাত গণ্যমান্যদের আহূত সভায় যতোটা পাওয়া যাবে, তার থেকে কম পাওয়া যাবে না ষ্টার থিয়েটারে সমাজ-পরিত্যক্তাদের আয়োজিত সঙ্গতে (দ্র 'নাট্যমন্দির', ১৩১৯ আশ্বিন-কার্তিক, পৃ ৬৮-৭৭ ; পু: 'বহুরূপী' ৪২, মার্চ ১৯৭৪, পৃ ৭৬-৮৩)।

তা সত্ত্বেও গিরিশচন্দ্র মানুষ ছিলেন। মানুষী দুর্বলতা তাঁকেও অস্পৃষ্ট রাখেনি। 'গজদানন্দ' প্রহসনের গান থেকে 'ছত্রপতি শিবাজী' পর্যন্ত যাঁর রচনা, 'নটের রাজভক্তি উপহার' স্বরূপ তাঁকেও লিখতে হয়েছিলো 'হীরক জুবিলী'। যে ন্যাশনাল থিয়েটার নামকরণ নিয়ে তিনি আদর্শগতভাবে ভিন্ন মত পোষণ করেছিলেন, শুধুমাত্র প্রতিপক্ষকে বিব্রত করার জন্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটা মাত্র নিজের স্বত্বাধিকারে ঐ-নাম রেজিস্টরি ক'রে নিয়েছিলেন। যে-বিনোদিনী ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ও সম্পত্তির বিনিময়ে বাঙলাদেশকে একটি নাট্যশালা উপহার দিয়েছিলেন, শিষ্যবর্গের প্ররোচনায় গিরিশচন্দ্র বিনোদিনীর নামে সে-নাট্যশালার নামকরণে প্রতিবন্ধকতা করেছিলেন। নাট্যগতপ্রাণ হ'লেও গিরিশচন্দ্র নাট্যশালাকে কেন্দ্র ক'রে তৎকালীন আবর্তের ঊর্ধ্বে ছিলেন না। থিয়েটারের দল ভাঙানোর প্ররোচনা তাঁর কাছ থেকে আসাও অসম্ভব ছিলো না ; তিনি নিজেও আকস্মিকভাবে দলত্যাগ ক'রে কর্তৃপক্ষের—এবং অবশ্যই সংশ্লিষ্ট নাট্যমঞ্চের—অসুবিধা সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন ; যে-কোনো কারণেই হোক্, চুক্তিবদ্ধ অবস্থায় প্রতিযোগী মঞ্চের সহায়তা বা চুক্তিভঙ্গ করার কলঙ্কভাগীও তিনি না-হ'য়ে পারেননি ; গুণী হ'লেও পুত্রের পক্ষ অবলম্বন করায় তাঁর নিরপেক্ষতা সর্বদা অক্ষুণ্ণ থাকেনি। মঞ্চের স্বত্বাধিকার গ্রহণ না-করার পেছনে প্রতিশ্রুতি রক্ষা ছাড়াও অনিশ্চয়তা ও দায়-দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার সুবুদ্ধি যে ছিলো না—তা অস্বীকার করা কঠিন। তবে কেউ বলতেই পারেন, এ-কলঙ্ক অলঙ্কার হয়েছিলো তাঁর প্রতিভার গুণে। আর গত একশো বছরে তিনিই প্রথম ও প্রধান, যিনি নাট্যশালাকে সামাজিক দায়িত্ব ও মর্যাদা-সম্পন্ন একটি প্রতিষ্ঠান ব'লে মনে করেছেন এবং বহুল পরিমাণে তার

সে-সম্মান অর্জনে সহায়তা করেছেন। অভিনেতা নাট্যকার নৃত্য-পরিচালক মঞ্চশিল্পী শিক্ষক বা সুরকার কাউকেই তিনি প্রাপ্য সম্মান দিতে কার্পণ্য করেননি। তাঁর এ-শ্রদ্ধাগুলি ব্যক্তিবিশেষকে নয়, সমগ্র নাট্যশিল্পের প্রতি নিবেদিত প্রণাম।

আমাদের জাতীয় স্বভাবের গুণে কারও প্রতিভার পরিমাণ করতে হ'লে দ্বিতীয় বা তৃতীয়—বিশেষত প্রতীচীর—কোনো প্রতিভাবানের তুলনায় তাঁর স্থান নির্দেশ করার রীতি প্রচলিত আছে। এ-প্রবণতা কখনো-কখনো যে কতোদূর সাম্প্রদায়িক হ'য়ে উঠতে পারে, তার প্রমাণ বাঙলা নাট্যসমালোচনায় অজস্র ছড়ানো আছে। গিরিশচন্দ্র ও অর্ধেন্দুশেখরের তুলনা এবং সেই সূত্রে তাঁদের সমর্থকগোষ্ঠীর উত্তেজনা, তার উজ্জ্বল প্রমাণ। শিল্পিত ও স্বাভাবিক অভিনয়শৈলী নাট্যশাস্ত্রের যুগ থেকেই নাট্যাভিনয়ের দুই স্বীকৃত প্রস্থান। উভয় রীতিতেই চূড়ান্ত সিদ্ধিলাভ সম্ভব। এই বৈচিত্র্য স্বীকার ক'রে নিলে গিরিশচন্দ্র ও অর্ধেন্দুশেখরের মধ্যে নট হিশেবে কে শ্রেষ্ঠ বিচার করা অর্থহীন—বিশেষ ক'রে শুধু লিখিত বিবরণের ওপর নির্ভর ক'রে করা অসম্ভব। তবে অর্ধেন্দুশেখর নট ও শিক্ষক, সংগঠক হওয়ার পক্ষে তাঁর চরিত্র একটু বেশি বেহিসেবী; কিন্তু নাট্যশালার সামগ্রিক চরিত্রের জন্য গিরিশচন্দ্রের কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে। সমবেত একটি প্রচেষ্টাকে এইজাতীয় ব্যক্তিতন্ত্রের দৃষ্টিতে দেখলে তাকে বিকৃত ক'রেই দেখা হয়; সে-ত্রুটি থেকে এঁদের অনুসারী দুই সম্প্রদায়ের কেউই মুক্ত নন—অবিনাশচন্দ্রও নন।

সূচনা থেকেই বাঙলা নাটকের ক্ষেত্রে শেক্সপীঅর হ'য়ে উঠেছিলেন বিচারের মাপকাঠি। নাট্যকার মধুসূদনকে সাবধান ক'রে দিতে হয়েছিলো, শেক্সপীঅরীয় মানদণ্ডে তাঁর নাটক বিচার না-করতে। ক্ষোভ সত্ত্বেও গিরিশচন্দ্রও এই তুলনা-শিকারীদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাননি; 'বঙ্গের গ্যারিক, বঙ্গের শেক্সপীয়ার' ব'লেই বন্দিত হয়েছেন। এইধরনের উচ্ছ্বাস প্রকাশ ক'রে আসলে গিরিশচন্দ্রকে আমরা অবহেলা করতেই শিখেছি। কারণ, পরম্পরা ও পরিপার্শ্ব ভুলে বাহ্য সাদৃশ্যের দিকে মনোনিবেশ করতে গিয়ে তাঁর নাটকে শক্তির কেন্দ্র কোথায়, কেনই-বা তাঁর নাটক ঠিক এমনটিই হ'য়ে উঠলো, তা আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। প্রতিযোগিতা ক'রে তাঁর রচনা সংকলিত হ'লেও আজ পর্যন্ত সমগ্র রচনাবলী প্রকাশিত হয়নি। এমনকি মধুসূদনের ব্যক্তিজীবন নিয়ে যখন আমাদের ভাবাবেগ অসংযত হ'য়ে পড়ে, তখনও গিরিশচন্দ্রকে আমরা অনায়াসে ভুলে থাকতে পারি। তার একটা কারণ হয়তো এই যে, গিরিশচন্দ্রের জীবনী-লেখক মধুসূদনের চরিতকারের মতো তাঁর নায়ককে শহীদ ক'রে তুলতে চাননি। অবশ্য, গিরিশচন্দ্রের ব্যক্তিত্বের জটিল গ্রন্থিপরম্পরাও অবিনাশচন্দ্র উন্মোচন করতে পারেননি, সে-চেষ্টাও তাঁর ছিলো না। তবুও গিরিশচন্দ্রের জীবনীর প্রাথমিক ও মৌলিক তথ্যগুলো যে আজ অজ্ঞাত নয়, তার জন্য অবিনাশচন্দ্রের সমর্পিত অধ্যবসায়ের প্রতি আমাদের ঋণ অপরিসীম।

টীকা

[সর্বত্র শিরোনাম বাদ দিয়ে পঙক্তি গণনা করা হয়েছে।]

পৃষ্ঠা	পঙক্তি	
৪৫	১৪	দুই রাত্রি : ২৭ নভেম্বর ১৭৯৫ ও ২১ মার্চ ১৭৯৬
৪৬	৮	চৌরঙ্গী থিয়েটার : ২৫ নভেম্বর ১৮১৩
	১১	সাঁ স্যুচি থিয়েটার : ২১ আগস্ট ১৮৩৯
	১৮	১৮৩১ : ভুল। ৬ অক্টোবর ১৮৩৫
	৩০	১৮৩২ : ভুল। ২৮ ডিসেম্বর ১৮৩১
৪৭	৫	ওরিয়েন্টাল থিয়েটার : ২৬ সেপ্টেম্বর ১৮৫৩
৪৮	১	'কুলীনকুলসর্বস্ব' : মার্চ ১৮৫৭
	৭	'শকুন্তলা' : ৩০ জানুঅরি ১৮৫৭
	৮	'বেণীসংহার' : ১১ এপ্রিল ১৮৫৭
	৮	'রত্নাবলী' : ৩১ জুলাই ১৮৫৮
		'শর্মিষ্ঠা' : ৩ সেপ্টেম্বর ১৮৫৯
	১১	'বিধবাবিবাহ' : ২৩ এপ্রিল ১৮৫৯
	১২	'মালবিকাগ্নিমিত্র' : ১৮৫৯
		'বিদ্যাসুন্দর' : ৩০ ডিসেম্বর ১৮৬৫
		'মালতীমাধব' : ১০ জানুঅরি ১৮৬৯
		'রুক্মিণী-হরণ' : ১৩ জানুঅরি ১৮৭২
	১৩	'বুঝলে কিনা ?' : ১৫ ডিসেম্বর ১৮৬৬
	১৪	'নব-নাটক' : ৫ জানুঅরি ১৮৬৭
		'কৃষ্ণকুমারী' : ৮ ফেব্রুঅরি ১৮৬৭
	১৬	'পদ্মাবতী' : ৯ ডিসেম্বর ১৮৬৫
	১৭	'কিছু কিছু বুঝি' : ২ নভেম্বর ১৮৬৭ বলা বাহুল্য, এ-তালিকা নিতান্তই অসম্পূর্ণ। বিস্তৃত তথ্যের জন্য দ্র ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস' (কলিকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ১৩৬৮), পৃ ২৩-৭৮। [এর পর ব. না. ই. রূপে উল্লিখিত।]
৪৯	১৩	রাধামাধব করের স্মৃতিকথা অনুসারে তিনি ও নগেন্দ্রনাথ এই যাত্রা সম্প্রদায়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। দ্র বিপিনবিহারী গুপ্ত, 'পুরাতন প্রসঙ্গ' (কলিকাতা : বিদ্যাভারতী ১৩৭৩), বিশু মুখোপাধ্যায় স., পৃ ২৭০-৭১। [এর পর পু. প্র. রূপে উল্লিখিত।]
৫১	৪	নাট্য সম্প্রদায় গঠনের পরিকল্পনা মতান্তরে নগেন্দ্রনাথের মস্তিষ্ক-প্রসূত। দ্র পু. প্র., পৃ ২৭১

পৃষ্ঠা	পঙক্তি	
	১০	'সধবার একাদশী' প্রকাশ : ১৮৬৬
৫৪	৩৩	অক্টোবর ১৮৬৯
৫৬	২২	১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের পুজো—১২৭৬ বঙ্গাব্দের পুজো। সুতরাং তারিখ দুটির একটি অবশ্যই ভুল। বাঙলা নাট্যশালার সব ইতিহাস-লেখকই ৭ রাত্রি 'সধবার একাদশী' অভিনয়ের কথা বলেছেন। কিন্তু তাঁদের মতান্তর সনের হিশেবে। দ্র ব. না. ই., পৃ ৭৩ পা-টী। তবে পরোক্ষ প্রমাণ থেকে ১৮৬৯-৭০—এই এক বৎসরকেই বাগবাজার এ্যামেচার থিয়েটারের 'সধবার একাদশী' অভিনয়কাল ধরা যেতে পারে।
৫৫	৬	রাধামাধব-প্রদত্ত তালিকা অন্যরকম : কেনারাম : অরুণচন্দ্র হালদার; রামমাণিক্য : নীলকণ্ঠ গঙ্গোপাধ্যায়; কুমুদিনী : আপালচন্দ্র বিশ্বাস; [বেলবাবু প্রথম মঞ্চে নামেন 'লীলাবতী' অভিনয়ে, সে-কথা অবিনাশচন্দ্র লিখেছেন কয়েক পাতা পরে। দ্র পৃ ৬৪ প ২৭। সুতরাং এখানে তাঁরই ভুল।] এবং কাঞ্চন : রাধামাধব কর। দ্র পু. প্র., পৃ ২৭১
	১৭	১৮৬৯
	১৮	রাধামাধবের মতে এটর্নি দীননাথ বসুর বাড়িতে । দ্র পু. প্র., পৃ ২৭১
	১৯	ফেব্রুঅরি ১৮৭০
৫৬	২২	দ্র পৃ ৫৪ প ৩৩ টীকা
	২৩	সপ্তমাভিনয় : অক্টোবর ১৮৭২
৫৭	১৩	'উষাহরণ' নাটকের (১৮৮০) লেখকের নাম রাধানাথ মিত্র। মণিমোহন (-লাল নয়) সরকারের নাটকের নাম 'উষানিরুদ্ধ নাটক' (১৮৬৩)। এই নাটককে কেন্দ্র ক'রে যে চাপান-উতোর চলে তার বিবরণের জন্য দ্র পু. প্র., পৃ ২৭৩
	১৯	সম্ভবত নভেম্বর ১৮৭০
৫৯	৪	রাজেন্দ্রনাথ (-লাল নয়) পাল।
৬৩	২	১২৭৮ : ভুল। ১১ মে ১৮৭২
	৬	ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে তখন সম্প্রদায়ের নাম ছিলো 'শ্যামবাজার নাট্যসমাজ'। (দ্র ব. না. ই., পৃ ৭৭) হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের মতে, "ইহার সহিত গিরিশ অর্দ্ধেন্দুর কোন সম্বন্ধ ছিল না।" দ্র 'ভারতীয় নাট্যমঞ্চ' [১] (কলিকাতা : বঙ্গভাষা সংস্কৃতি সম্মেলন ১৯৪৫), পৃ ২৪ পা-টী। [এর পর ভা. না. ১ রূপে উল্লিখিত।]

পৃষ্ঠা	পঙক্তি	
	১২	রাধামাধব কর বলেছেন, "Calcutta National Theatre নামকরণের প্রস্তাব আদৌ উল্লিখিত হয় নাই ; নবগোপালের মুখ হইতে এরূপ অসঙ্গত নাম কখনই প্রস্তাবিত হইবার সম্ভাবনা ছিল না।" দ্র পু. প্র., পৃ ২৭৬
	১৪	বিপিনবিহারী গুপ্তের মতে Calcutta শব্দযোজনায় আপত্তি করেন অমৃতলাল বসু। দ্র পু. প্র., পৃ ২২৫ পা-টী
পা-টী	৭	হিন্দুমেলার তারিখ ভুল। হবে ১২৭৩ চৈত্র সংক্রান্তি বা ১২ এপ্রিল ১৮৬৭। ৭৮-এর পরিবর্তে ৬১ হবে। বর্তমান সংস্করণের প্রমাদ।
৬৬	৫	মধ্যম নয়, তৃতীয়।
৬৮	২	খাটের পরিবর্তে ঘাটের হবে। বর্তমান সংস্করণের প্রমাদ।
	৪	কিম্বা : পাঠান্তর কিবা। দ্র ব্যোমকেশ মুস্তফি, "রঙ্গালয় (বঙ্গীয়)", 'বিশ্বকোষ' ১৬ (কলিকাতা : বিশ্বকোষ ১৩১২), পৃ ১৯২। [এর পর র. ব. রূপে উল্লিখিত।] ৫ম পঙক্তির পর বর্তমান পঙক্তি সন্নিবেশিত হয়েছে 'বিশ্বকোষ'-এর পাঠে।
	৮-১২	'বিশ্বকোষ'-এর পাঠে গানের শেষে সন্নিবিষ্ট। দ্র র. ব., পৃ ১৯২
	৯	পাল : পাঠান্তর পালে। দ্র র. ব. ১৯২ ; পু. প্র., পৃ ২২৯
	১১	পাঠান্তর : মিলে যত চাষা, কোরে আশা,...। দ্র র. ব., পৃ ১৯২ ; পু. প্র., পৃ ২২৯
	১৩	পাঠান্তর : বুঝি বা দিনের গৌরব যায় খসে। দ্র. পু. প্র., পৃ ২২৯ ; জ্ঞান হয় দীনের গৌরব যায় বুঝি খসে। দ্র র. ব., পৃ ১৯২
	২২	অমৃতলাল বসুর মতে পূর্ণচন্দ্র ঘোষ। দ্র পু. প্র., পৃ ২২৯
৬৯	১৩	শশীলাল (-ভূষণ নয়) দাস। দ্র পৃ ৭৯ প ৭ ; র. ব., পৃ ১৯২
৭০	৩	'বিশ্বকোষ'-এর আরো ভুলত্রুটি নির্দেশ করেছেন রাধামাধব কর। দ্র পু. প্র., পৃ ২৭৫-৭৭ ও ২৭৮
	২২	১৩১২ বঙ্গাব্দে
৭২	৭	অর্ধেন্দুশেখরের শিক্ষকতা প্রসঙ্গে অবিনাশচন্দ্রের মন্তব্য পক্ষপাতদুষ্ট। অমৃতলাল নিজেই বলেছেন, "অর্দ্ধেন্দু ছিলেন আমাদের General Master...।" দ্র পু. প্র., পৃ ২২৬। তবে অন্যান্যদের ভূমিকা নগণ্য হ'লেও ঐতিহাসিকের পক্ষে বর্জনীয় নয়।
৭৮	৬	বর্তমানে ২৭৯ এ-এক রবীন্দ্র সরণী।
৭৯	১১	অমৃতলালের মতে যদুনাথ ভট্টাচার্য একজন রায়তের ভূমিকা গ্রহণ করেন।
	১৭	'নীলদর্পণ'-এর পরবর্তী অভিনয়ের তারিখ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

পৃষ্ঠা	পঙক্তি	
		সংকলিত তালিকা অনুযায়ী ভিন্নতর। অমৃতলাল বসু ও ব্যোমকেশ মুস্তফি-প্রদত্ত তথ্য অবিনাশচন্দ্রের বক্তব্যের সঙ্গে সমঞ্জস হ'লেও মুদ্রিত প্রমাণ ব্রজেন্দ্রনাথের সপক্ষে। ১৪ ডিসেম্বর ১৮৭২ : 'জামাই বারিক'; ২১ ডিসেম্বর : 'নীলদর্পণ'; ২৮ ডিসেম্বর : 'সধবার একাদশী' এবং ১১ জানুঅরি ১৮৭৩ : 'লীলাবতী'।
	শেষ	৮ ফেব্রুঅরি ১৮৭৩
৮৩	২২	১৫ ফেব্রুঅরি ১৮৭৩
৮৭	৫	পাঠান্তর : এ সভা রসিকে মিলিত, হেরিয়ে অধীন-চিত। দ্র. র. ব., পৃ ১৯৪
	৮	পাঠান্তর : অভিমান-বিমলিনী। দ্র তদেব
	৯	পাঠান্তর : নিদয় মতি। দ্র তদেব
৮৮	৩	অবিনাশচন্দ্র সম্ভবত সজ্ঞানেই গিরিশচন্দ্রের নাম এই দুই তালিকার অন্তর্ভূক্ত করেননি। তিনি ছিলেন দ্বিতীয় দলের সঙ্গে। এ ছাড়া একটি তথ্যও তিনি গোপন করেছেন। ন্যাশনাল থিয়েটারে ভাঙনের শুরুতেই "গিরিশবাবু এই ভগ্নাংশটিকে ন্যাশনাল থিয়েটর নামে রেজিষ্টরি করিয়া লইলেন।" দ্র. পু. প্র., পৃ ২৪১
	১৩	প্রতিষ্ঠা : ৮ সেপ্টেম্বর ১৮৭৪
৯০	১৩	৫ এপ্রিল ১৮৭৩
	১৬	৫ এপ্রিল ১৮৭৩
	২৯	১২ এপ্রিল ১৮৭৩
৯১	৩	মে-জুন ১৯৭৩
	১১	১০ মে ১৮৭৩; 'কৃষ্ণকুমারী' ও 'কপালকুণ্ডলা'র মধ্যে অন্যান্য নাটক অবশ্য অভিনীত হয়েছিলো। দ্র. ব. না. ই., পৃ ১৭৮
৯২	৩	মে-জুন ১৮৭৩
	২৯	দীঘাপতিয়া : জুলাই ১৮৭৩; এ ছাড়া ১৬ জুলাই মধুসূদনের সন্তানদের সাহায্যার্থে অপেরা হাউসে ন্যাশনাল থিয়েটার-আহূত অভিনয়-রজনীতে হিন্দু ন্যাশনালের অর্ধেন্দুশেখর-প্রমুখ কয়েকজন অংশগ্রহণ করেন। এই উপলক্ষ্যে গিরিশচন্দ্র-রচিত এই গানটি গাওয়া হয় : কে রচিবে মধুচক্র মধুকর মধু বিনে। মধুহীন বঙ্গভূমি হইয়াছে এত দিনে॥ কুহকী কল্পনাবলে, কে আনিবে রঙ্গস্থলে, কুমারী কৃষ্ণা-কমলে, মোহিতে মনে॥

পৃষ্ঠা	পঙক্তি	
		বীর-মদে অম্বুনাদে, কে আনিবে মেঘনাদে, কাঁদিবে প্রমীলা-সনে, কেলি বিপিনে ॥ দ্র ব. না. ই., পৃ ১২৬-২৭
	শেষ	১৩ সেপ্টেম্বর ১৮৭৩ বস্তুত এটি দ্বিতীয় পর্যায়ের শেষ অভিনয়। তৃতীয় পর্যায়ে ন্যাশনাল থিয়েটার আবার ফিরে আসে সান্যাল-বাড়ীতে। এ-পর্বের ব্যাপ্তি ১৩ ডিসেম্বর ১৮৭৩ থেকে ২৮ ফেব্রুঅরি ১৮৭৪। তবে গিরিশ-চন্দ্র এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না।
৯৫	৫	১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে সপ্তম এডওয়ার্ড লুইস থিয়েটারে পদার্পণ করার পর থেকে মঞ্চটির নামে 'রয়েল' যুক্ত হয়।
৯৪	২১	দ্র পৃ ৫৪ প ৩৩ টীকা
১০৩	২১	না। ত্রয়োদশ হবে : ১৮৯৯-১৯১২
১০৭	১৭	৩১ ডিসেম্বর ১৮৭৩
	১৯	ফেব্রুঅরি ১৮৭৪
১০৯	২৫	দ্র 'বিলাতী যাত্রা থেকে স্বদেশী থিয়েটার' (কলিকাতা : যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৭১), সুধীর রায়চৌধুরী স., পৃ ৪৪
	২৬	৬ সেপ্টেম্বর ১৮৭৩
১১১	৪	গ্রেট ন্যাশনাল নয়, সান্যাল-বাড়ীতে ন্যাশনাল থিয়েটারের ব্যবস্থাপনায়।
১১২	৩	এই তারিখে অভিনয় হয় সান্যাল-বাড়ীতে, ন্যাশনাল থিয়েটারের উদ্যোগে। গ্রেট ন্যাশনালে অভিনয়ের তারিখ ২১ ফেব্রুঅরি ১৮৭৪। বর্তমান ভূমিকালিপি অবশ্যই গ্রেট ন্যাশনালের।
১১৬	৬	এর আগেও গ্রেট ন্যাশনালে 'কপালকুণ্ডলা' অভিনীত হয়েছিলো, কিন্তু সে-নাট্যরূপ গিরিশচন্দ্রের নয়।
১১৭ পা-টী	৭	ভুল। ৩১ অক্টোবর ১৮৭৪
১২৩	১১	গ্রেট ন্যাশনালে 'হেমলতা' অভিনয়ের তারিখ ১৮ এপ্রিল ১৮৭৪। সুতরাং প্রথম অভিনয় হ'তে পারে না। ন্যাশনাল থিয়েটারের উদ্যোগে এই নাটক দিয়েই সান্যাল-বাড়ীতে তৃতীয় পর্যায়ের অভিনয় শুরু : ১৩ ডিসেম্বর ১৮৭৩।
	১৬	জুন মাসে সম্প্রদায় তিন মাসের জন্য বাঙলাদেশের মফস্বল অঞ্চল সফরে যায়। সেপ্টেম্বরে নতুন ব্যবস্থাপনায় পুনরায় গ্রেট ন্যাশনালে অভিনয় শুরু হয়।
	১৯	২২ আগস্ট ১৮৭৪
	শেষ	৩ অক্টোবর ১৮৭৪

পৃষ্ঠা	পঙক্তি	
১২৪	৯	১৪ নভেম্বর ১৮৭৪
	১৬	নভেম্বর ১৮৭৪ ; নতুন দলের নাম হ'লো গ্রেট ন্যাশনাল অপেরা কোম্পানি।
	১৭	জানুঅরি ১৮৭৫
	১৯	২ ডিসেম্বর ১৮৭৪ ; ২ জানুঅরি ১৮৭৫ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে প্রথম দিন অভিনয় হয়নি। দ্র ব. না. ই., পৃ ১৬৪
	২১	প্রথমে চুঁচুড়ায় ; ২৪ ডিসেম্বর : 'দুর্গেশনন্দিনী' ; ২৬ ডিসেম্বর : 'সতী কি কলঙ্কিনী' ; তার পর চন্দননগরে ; ২৮ ডিসেম্বর : 'জামাই বারিক' ; তার পর 'লুইসে' ; ৯ জানুঅরি ১৮৭৫ : 'সতী কি কলঙ্কিনী' ও 'কিঞ্চিৎ জলযোগ' ; তার পর হাওড়ায় ; ১৬ জানুঅরি : 'সতী কি কলঙ্কিনী' ; ৩০ জানুঅরি : 'আনন্দ কানন' ও 'ভারতে যবন'। দ্র অরুণকুমার মিত্র, 'অমৃতলাল বসুর জীবনী ও সাহিত্য' (কলিকাতা : নাভানা ১৯৭০), পৃ ৬২
	২২	ফেব্রুঅরি ১৮৭৫
১২৫	১৩	আগস্ট-নভেম্বর ১৮৭৫ ধর্মদাস সুর তাঁর অনুগামীদের নিয়ে যোগ দিলেন বেঙ্গল থিয়েটারে, নিউ এরিয়ান থিয়েটার কোম্পানি নাম নিয়ে।
	১৫	ডিসেম্বর ১৮৭৫। আবার দলের পুরনো নাম ফিরিয়ে আনা হ'লো।
	২১	১৬ ফেব্রুঅরি ১৮৭৫
	৩০-৩২	গানদুটি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটকে ব্যবহৃত হ'লেও এ-দুটির রচয়িতা যথাক্রমে সত্যেন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। দ্র সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'আমার বাল্যকথা ও আমার বোম্বাই প্রবাস' (কলিকাতা : ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, [১৯১৫]), পৃ ২৬ এবং বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি' (কলিকাতা : শিশির পাবলিশিং হাউস, ১৯২০), পৃ ১৪৭
১২৯	১১	দ্র Prannath Pundit, "The Dramatic Performances Bill", *Mookerjee's Magazine*, New Series V/36-40, January – June 1876, pp. 126-67. Reprinted: *Nineteenth Century Studies* 6, April 1974, Alok Ray ed., pp. 200-45.
	২২	ভুল। Act XIX of 1876 dt. 16 December 187 6.
	৩০	মার্চ ১৮৭৭

পৃষ্ঠা	পঙক্তি	
	৩৪	২৯ মার্চ ১৮৭৭
১৩০	৩	'শৈব্যাসুন্দরী'
	৭	গানের প্রথম পঙক্তিটি ভুলক্রমে বর্তমান মুদ্রণ থেকে বাদ গেছে : গড় করি বাপ ঘর চলি।
	২৪-২৬	এই তালিকায় 'যামিনী চন্দ্রমাহীনা'র উল্লেখ নেই। কারণ এই অনামী রচনার লেখস্বত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় অবিনাশচন্দ্রের বই প্রকাশের পরে। 'দুর্গাপূজার পঞ্চরং' 'মজলিস' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিলো 'সপ্তমীতে বিসর্জন' নামে (১৮৯৩)।
১৩৩	৩২	১ ডিসেম্বর ১৮৭৭
১৩৫	২৫	২৫ সেপ্টেম্বর ১৮৭৫
	২৭	৫ জানুঅরি ১৮৭৮
১৩৭	১	২৯ সেপ্টেম্বর ১৮৭৭
	৮	৩ অক্টোবর ১৮৭৭
	২৯	অক্টোবর ১৮৭৭
১৩৯	৪	ডিসেম্বর ১৮৭৭
	১৫	ভুল। এই সভার প্রতিষ্ঠা হয় ৪ অক্টোবর ১৮৬১
১৪০	৯	৯ মার্চ ১৮৭৮
১৪২	৫	আগস্ট ১৮৭৮
	২৩	১৮ জানুঅরি ১৮৭৯
১৪৩	৩	৯ ফেব্রুঅরি ১৮৭৯
	২২	সেপ্টেম্বর ১৮৭৯
	২৯	নভেম্বর ১৮৭৯
	৩০	জানুঅরি ১৮৮০
	শেষ	নামত অবশ্য তিনি ছাড়েননি।
১৪৪	৩	সেপ্টেম্বর ১৮৮০
	৯	নভেম্বর ১৮৮০
১৫০	৩	২২ জানুঅরি ১৮৮১
	৪	৯ এপ্রিল ১৮৮১
১৫২	১৭	২১ মে ১৮৮১
১৫৪	১	দ্র পৃ ৪৮ প ১৪ টীকা
	২	ভুল। মধুসূদনের পূর্বসূরীর সম্মান এ-ব্যাপারে তারাচরণ শীকদার ('ভদ্রার্জ্জুন' ১৮৫২) এবং যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত ('কীর্তিবিলাস নাটক' ১৮৫২) -এর প্রাপ্য।
	১৫	৩০ জুলাই ১৮৮১

পৃষ্ঠা	পঙক্তি	
১৬২	৩	১৭ সেপ্টেম্বর ১৮৮১
১৬৪	১৪	২৬ নভেম্বর ১৮৮১
১৬৬	৭	৩১ ডিসেম্বর ১৮৮১
১৬৭	২৩	১১ মার্চ ১৮৮২
১৬৮	১১	১৫ এপ্রিল ১৮৮২
১৬৯	২৫	২২ জুলাই ১৮৮২
১৭১	১৫	১২৮৮ চৈত্র ২০ ; ১ এপ্রিল ১৮৮২
	২০	৭ অক্টোবর ১৮৮২
	শেষ	১৮ মে ১৮৮২
১৭২	৬	২৮ অক্টোবর ১৮৮২
১৭৩	৩	১৩ জানুঅরি ১৮৮৩
১৭৫	১৫	২৬ মার্চ ১৮৮১
১৭৬	২১, ২২	তেরো বৎসর। দ্র পৃ ১০৩ প ২১ টীকা
১৮৭	১০	ফেব্রুঅরি ১৮৮৩
	শেষ	ষ্টার থিয়েটার প্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গে অবিনাশচন্দ্র যেভাবে বিনোদিনীর প্রসঙ্গ এড়িয়ে গেছেন, তা বিস্ময়কর। গিরিশচন্দ্রের চরিত্রের এই অন্ধকার অধ্যায় বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন বিনোদিনী স্বয়ং। দ্র 'আমার কথা ও অন্যান্য রচনা' (কলিকাতা : সুবর্ণরেখা ১৩৭৬), নির্মাল্য আচার্য ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় স., পৃ ৩৯-৪৪
১৮৮	১	২১ জুলাই ১৮৮৩
১৮৯	১৭	মার্চ ১৮৮৩
	১৯	সেপ্টেম্বর ১৮৮২
	২০	মার্চ ১৮৮৩
১৯০	১	১১ আগস্ট ১৮৮৩
১৯১	৮	২১ ডিসেম্বর ১৮৮৩
১৯২	১৮	জানুঅরি ১৮৮৪
১৯৩	৪	ফেব্রুঅরি ১৮৮৪
	১২	৪ ডিসেম্বর ১৮৮৩
১৯৪	২	২৯ মার্চ ১৮৮৪
১৯৫	৪	১৬ এপ্রিল ১৮৮৪
১৯৬	৪	৭ জুন ১৮৮৪
১৯৮	২৯	২০ সেপ্টেম্বর ১৮৮৪
২০৮	১১	২২ নভেম্বর ১৮৮৪

পৃষ্ঠা	পঙক্তি	
২০৯	৮	রাজকৃষ্ণ রায়-প্রণীত। ১১ অক্টোবর ১৮৮৪
২১০	২	২৮ জানুঅরি ১৮৮৫
২১১	১	৩ মে ১৮৮৫
	২৪	সমকালে নয়, অনেক পরে। ২৯ অক্টোবর ১৮৮৭
২১২	৪	১৯ সেপ্টেম্বর ১৮৮৫
২১৩	১২	ভুল। ১২৯৩ জ্যৈষ্ঠ ৩০ ; ১২ জুন ১৮৮৬
২১৬	১	২৪ ডিসেম্বর ১৮৮৬
২১৭	১	২১ মে ১৮৮৭
২৩১	৬	জুলাই ১৮৮৭
	১৫	৩১ জুলাই ১৮৮৭
২৩২	১৬	আগস্ট ১৮৮৭
	১৭	সেপ্টেম্বর ১৮৮৭
	পা-টী ১	দ্র পৃ ১৮৭ প ১০ টীকা
	„ ২	দ্র পৃ ১৮৯ প ১৭ „
	„ ৩	সেপ্টেম্বর ১৮৮৩ ; এর পরে প্রতাপচাঁদ থিয়েটার ত্যাগ করেন।
	„ ৪	৭ মে ১৮৮৩
	„ ৬	২৭ আগস্ট ১৮৮৫
	„ ৯	জুলাই ১৮৮৫ ; অবিনাশচন্দ্রের কালক্রম ভুল।
	„ ১১	৩ জুলাই ১৮৮৬
	„ ১৩	অক্টোবর ১৮৮৬
২৩৩	৩২	নভেম্বর ১৮৮৭
২৩৪	৫	১৭ মার্চ ১৮৮৮
২৩৬	৫	৬ অক্টোবর ১৮৮৮
২৩৭	২০	দুই নয়, এক বৎসর পর (১৮৮৭-৮৮)।
	২৩	অক্টোবর ১৮৮৮ .
	২৪	জানুঅরি ১৮৮৯
২৪২	২	২২ সেপ্টেম্বর ১৮৮৮
	৫	১ জানুঅরি ১৮৮৯
	৭	দ্র পৃ ২৩৭ প ২৪ টীকা
	১৪	ভুল। ১২৯৬ বৈশাখ ১৫ ; ২৭ এপ্রিল ১৮৮৯
২[illegible]	পা-টী ১	১৩ জুলাই ১৮৯৫
২৪৫	৫	৮ সেপ্টেম্বর ১৮৮৯
২৪৬	২৯	১১ মার্চ ১৮৯০
২৪৭	১৩	২৬ জুলাই ১৮৯০

পৃষ্ঠা	পঙক্তি	
২৪৮	২৪	১৩ সেপ্টেম্বর ১৮৯০
২৪৯	২১	২৪ ডিসেম্বর ১৮৯০
২৫২	২২	১৫ ফেব্রুঅরি ১৮৯১
২৫৩	১০	অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মতে এগারোজন। দ্র 'রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর' (কলিকাতা : গ্রন্থন ১৯৭২), স্বপন মজুমদার স., পৃ ৩৪
	১৪	১৬ মে ১৮৯১
	পা-টী ৮	বর্তমান জওহর সিনেমা। প্রথম অভিনয় : ৮ ডিসেম্বর ১৮৮৭
২৫৮	১	২৮ জানুঅরি ১৮৯৩
	৩	মে ১৮৯২
	৬	মার্চ ১৮৯১
২৫৯	১	এপ্রিল ১৮৯২ পর্যন্ত
	১৮	জুলাই ১৮৯২
২৬৭	পা-টী ১	১৮ অক্টোবর ১৯২২
২৬৮	৪	৫ ফেব্রুঅরি ১৮৯৩
২৭০	৩	২৫ মার্চ ১৮৯৩
২৭২	১	৭ অক্টোবর ১৮৯৩
	২৪	২৩ ডিসেম্বর ১৮৯৩
২৭৪	পা-টী ৩	দ্র পৃ ২৩৭ প ২৩ টীকা
	„ ৫	মার্চ-অক্টোবর ১৮৮৯
	„ ৬	ভুল। মার্চ ১৮৯২
	৮	২৩ জুন ১৮৮২ ; ১০ সেপ্টেম্বর ১৮৯২ ; ৭ অক্টোবর ১৮৯৩
২৭৫	৯	২৪ ডিসেম্বর ১৮৯৩
২৭৬	১৮	১৭ নভেম্বর ১৮৯৪
২৭৮	২৬	২৫ ডিসেম্বর ১৮৯৪
২৮০	৬	১৮ মে ১৮৯৫
২৮১	১৬	২৫ ডিসেম্বর ১৮৯৫
২৮২	২৭	৫ জানুঅরি ১৮৯৬
২৮৩	২৯	২৭ জানুঅরি ১৮৯৪
২৮৪	৩	বাক্যটি হবে : '…গিরিশচন্দ্রের শেষ নূতন পুস্তক।' বর্তমান সংস্করণের প্রমাদ।
	২৫	মার্চ ১৮৯৬
২৮৫	১০	জুন ১৮৯৬
	২৩	মার্চ ১৮৯৬

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	
২৮৬	৫	২৬ সেপ্টেম্বর ১৮৯৬
২৮৮	৭	২০ জুন ১৮৯৭
২৮৯	১	১১ সেপ্টেম্বর ১৮৯৭
২৯০	২৭	১৮ ডিসেম্বর ১৮৯৭
২৯৭	৫	জানুআরি ১৮৮৯-মার্চ ১৮৯১
২৯৯	৮	মার্চ ১৮৯৮
	২২	এপ্রিল-মে ১৮৯৮
৩০২	২	জুলাই ১৮৯৮
	৯	আগস্ট ১৮৯৫
	১১	আশ্বিন তথা অক্টোবর ১৮৯৫-এ প্রকাশিত তৃতীয়টিই শেষ সংখ্যা।
৩০৩	২	মার্চ ১৮৯৭
	৩	১৬ এপ্রিল ১৮৯৭
	৮	এখানেও অবিনাশচন্দ্র তথ্যগোপন করেছেন। ১৮৯৮ ডিসেম্বরের শেষে তিনি মিনার্ভায় যোগ দেন। সেখানকার অধিকারী তখন হারু মল্লিক। তিন মাস সেখানে থেকে তিনি আবার ফিরে আসেন ক্লাসিকে। দ্র রমাপতি দত্ত, 'রঙ্গালয়ে অমরেন্দ্রনাথ' (কলিকাতা: লেখক ১৯৪১), পৃ ১৯৮-২০০ [এর পর র. অ. রূপে উল্লিখিত।]
	পা-টী ৩	এপ্রিল ১৮৯৬-ফেব্রুঅরি ১৮৯৭
৩০৪	১	১০ জুন ১৮৯৯
৩০৬	৭	২৬ আগস্ট ১৮৯৯; ১ জানুঅরি ১৯০০
	৮	১৬ সেপ্টেম্বর ১৮৯৯
	১৩	১৭ ফেব্রুঅরি ১৯০০
৩১০	৭	দ্র পৃ ২৫৮ প ১ টীকা
	৯	দ্র পৃ ২৮৫ প ১০ টীকা
	১২	মার্চ ১৮৯৮
	১৫	এপ্রিল ১৮৯৯; এর মধ্যে অবশ্য নেপথ্য-নাটক বন্ধ ছিলো না। প্রমথনাথ দাসের কর্তৃত্বাধীনে চুনীলাল দেব ও নিখিলেন্দ্রকৃষ্ণ দেব মার্চ ১৮৯৮ পর্যন্ত এই মঞ্চ পরিচালনা করেন। ডিসেম্বর ১৮৯৮ পর্যন্ত লীজ ছিলো জে. কে. ও পি. সি. বসুর। এর পর ও নরেন্দ্র-নাথ সরকারের পূর্ব পর্যন্ত লেসী ছিলেন হারু মল্লিকের বকলমে অমৃতলাল দত্ত।
	১৭	১২ আগস্ট ১৮৯৯
	১৯	২৯ মে ১৮৯৯
	২৭	এপ্রিল ১৯০০

পৃষ্ঠা	পঙক্তি	
	৩০	এপ্রিল ১৯০০
৩১১	২	৭ মে ১৯০০
	৮	২৩ জুন ১৯০০
৩১৫	২	৩০ জুন ১৯০০
	৬	২৩ নভেম্বর ১৮৯৫
	১৫	১৩০৬ মুদ্রণপ্রমাদ, ১৩০৭ হবে। ২২ জুলাই ১৯০০
৩১৭	১১	১৭ আগস্ট ১৯০০
৩১৯	২	১২৮৪ ফাল্গুন ২১ ; ৪ মার্চ ১৮৭৮। রাধিকার ভূমিকায় ছিলেন বিনোদিনী।
	২৭	অক্টোবর ১৯০০
৩২০	৩	নভেম্বর ১৯০০
৩২১	৯	২৬ জানুঅরি ১৯০১
	২১	২০ এপ্রিল ১৯০১
৩২৫	১০	৩১ মে ১৯০১
৩২৯	৯	২৬ জুলাই ১৯০১
৩৩১	১	২৮ সেপ্টেম্বর ১৯০১
	পা-টী ৪	আগস্ট ১৯০১ ; মিনার্ভায় যোগ দেন।
৩৩২	৭	৭ জুন ১৯০১
	২১	১৯ জুলাই ১৯০২
৩৩৮	৩০	২৫ ডিসেম্বর ১৯০২
৩৪০	১৯	৩০ এপ্রিল ১৯০৪
৩৪২	২১	১ মে ১৯০৯
৩৪৩	২১	১ মার্চ ১৯০১
৩৪৫	৩০	দুই নয়, তিন বৎসর ; ১৯০৪ পর্যন্ত।
৩৪৬	১৩	জুলাই ১৯১০
৩৪৯	১৯	প্রথম প্রকাশ : 'রঙ্গালয়', ১৩০৭ ফাল্গুন। নাম : "দেউজীর ভাত হোক, সতীনের পো হোক"।
৩৪৯-৫১		"বঙ্গ-রঙ্গালয়ে শ্রীমতী বিনোদিনী" সম্ভবত গ্রন্থাকারে সংকলিত ব'লে এই তালিকায় স্থান পায়নি। কিন্তু "আত্মকথা" বা "স্বর্গীয় অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়" ('রূপ ও রঙ্গ', ১৩৩১ পৌষ ৫) প্রবন্ধটি বোধহয় বাদ পড়েছে অনবধানে।
৩৫৭	২	মে ১৯০৩
	৪	ডিসেম্বর ১৯০২
	১০	৭ নভেম্বর ১৯০৩

পৃষ্ঠা	পঙ্ক্তি	
	১৩	প্রকৃতপক্ষে পাঁচ মাস। দ্র র. অ., পৃ ৩৫৭ পা-টী
৩৫৮	১০	জুলাই ১৯০৪
	১৪	আগস্ট ১৯০৪
	১৮	২৩ এপ্রিল ১৯০৪ ; অবিনাশচন্দ্রের কালক্রমে ভুল।
	২০	২১ মে ১৯০৪
৩৫৯	১১	দ্র পৃ ১৪৪ প ৩ টীকা
	১৩	নভেম্বর ১৮৯৬
	১৬	২৭ আগস্ট ১৯০৪
	২৬	৩ ও ৪ সেপ্টেম্বর ১৯০৪
	৩০	১০ ও ১১ সেপ্টেম্বর ১৯০৪
৩৬০	১৫	৩ এপ্রিল ১৯০৫
	১৬	ডিসেম্বর ১৯০৬
	২৫	নভেম্বর ১৯০৪
	পা-টী ১	মে ১৯০১
	„ ২-৩	অরোরা : আগস্ট ১৯০১ ; ইউনিক : জুন ১৯০৩ ; ন্যাশনাল : ডিসেম্বর ১৯০৫ ; গ্রেট ন্যাশনাল : জুন ১৯১১ ; গ্র্যাণ্ড ন্যাশনাল : ডিসেম্বর ১৯১১ ; থেসপিয়ান টেম্পল : আগস্ট ১৯১৫ ; প্রেসিডেন্সী : অক্টোবর ১৯১৭
৩৬১	৫	জানুঅরি ১৯০৫
	২১	ফেব্রুঅরি ১৯০৫
	পা-টী ২	দ্র পৃ ৩১০ প ২৭ টীকা
		মহেন্দ্রবাবু ম্যানেজারি ছাড়েন আগস্ট ১৯০০
৩৬২	১৪	৪ মার্চ ১৯০৫
৩৬৪	১২	৮ এপ্রিল ১৯০৫
৩৬৭	২৬	৯ সেপ্টেম্বর ১৯০৫
৩৬৮	২৫	আগস্ট ১৯০৫
৩৬৯	১০	এর আগে নয়, পরে : ডিসেম্বর ১৯০৬
৩৭২	১৬	২৬ ডিসেম্বর ১৯০৫
৩৭৩	২১	১১ ফেব্রুঅরি ১৮০৬
৩৭৫	২	১৬ জুন ১৯০৬
৩৭৭	২১	১ জানুঅরি ১৯০৭
	পা-টী ১-২	১৯০৯-১০
৩৭৯	৬	মে ১৯০৭
	১১	এপ্রিল ১৯০৭

পৃষ্ঠা	পঙক্তি	
	১৯	জুলাই ১৯০৭
৩৮০	৯	১০ আগস্ট ১৯০৭
	১৪	১৬ আগস্ট ১৯০৭
৩৮১	২০	তিন নয়, চার সপ্তাহের পর : ১৩ সেপ্টেম্বর ১৯০৭
৩৮৩	২০	৩১ ডিসেম্বর ১৯০৮
৩৮৪	১৯	জুলাই ১৯০৮
৩৮৬	২৫	৭ নভেম্বর ১৯০৮
৩৮৭ পা-টী	৩	১৫ সেপ্টেম্বর ১৯০৮
৩৯১	১	১৫ জানুআরি ১৯১০
৩৯৪	৪	১৫ মে ১৯১০
	৯	১৬ সেপ্টেম্বর ১৮৯৯
৩৯৫	২৪	৩ ডিসেম্বর ১৯১০
৩৯৭	১২	মার্চ ১৯১১
	১৩	জুন ১৯১১
	শেষ	১৮ জুন ১৯১১
৩৯৮	১৬	১৫ জুলাই ১৯১১
৩৯৯	৫	অক্টোবর ১৯১১
৪০০	২১	১৮ নভেম্বর ১৯১১
৪০১	২৮	২৬ আগস্ট ১৯১১
৪০৯	১৬	৮ ফেব্রুঅরি ১৯১২
৪৩৮	৪	৭ সেপ্টেম্বর ১৯১২
৪৪৬	১৬	৮ ফেব্রুঅরি ১৯২৪
৪৪৭	২৬	১৬ ফেব্রুঅরি ১৯২৫
	৩১	৮ ফেব্রুঅরি ১৯২৬
৪৪৮	৮	২৯ সেপ্টেম্বর ১৯২৬
	১৮	১৩৩৪ বৈশাখ। অর্থাৎ, বইয়ের এই অংশ ছাপা হওয়া ও বইটি প্রকাশিত হওয়ার মধ্যে দীর্ঘকালের ব্যবধান ছিলো।
৪৫১	১৬	২১ সেপ্টেম্বর ১৯১২

নাটক

নাটক	প্রথম অভিনয়	মঞ্চ
অকালবোধন	১২৮৪ আশ্বিন ১৮ ৩ অক্টোবর ১৮৭৭	ন্যাশনাল (৬ বীডন স্ট্রীট)
অভিমন্যুবধ	১২৮৮ অগ্রহায়ণ ১২ ২৬ নভেম্বর ১৮৮১	
অভিশাপ	১৩০৮ আশ্বিন ১২ ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯০১	ক্লাসিক
অশোক	১৩১৭ অগ্রহায়ণ ১৭ ৩ ডিসেম্বর ১৯১০	মিনার্ভা ,
অশ্রুধারা	১৩০৭ মাঘ ১৩ ২৬ জানুঅরি ১৯০১	ক্লাসিক
আগমনী	১২৮৪ আশ্বিন ১৪ ২৯ সেপ্টেম্বর ১৮৭৭	ন্যাশনাল
আনন্দ রহো	১২৮৮ জ্যৈষ্ঠ ৯ ২১ মে ১৮৮১	"
আবু হোসেন	১২৯৯ চৈত্র ১৩ ২৫ মার্চ ১৮৯৩	মিনার্ভা
আলাদিন	১২৮৭ চৈত্র ২৮ ৯ এপ্রিল ১৮৮১	ন্যাশনাল
আয়না	১৩০৯ পৌষ ১০ ২৫ ডিসেম্বর ১৯০২	ক্লাসিক
কমলে কামিনী	১২৯০ চৈত্র ১৭ ২৯ মার্চ ১৮৮৪	ষ্টার (৬৮ বীডন স্ট্রীট)
করমেতি বাঈ	১৩০২ জ্যৈষ্ঠ ৫ ১৮ মে ১৮৯৫	মিনার্ভা
কালাপাহাড়	১৩০৩ আশ্বিন ১১ ২৬ সেপ্টেম্বর ১৮৯৬	ষ্টার (হাতিবাগান)
চণ্ড	১২৯৭ শ্রাবণ ১১ ২৬ জুলাই ১৮৯০	
চৈতন্যলীলা	১২৯১ শ্রাবণ ১৯ ২ আগষ্ট ১৮৮৪	

নাটক	প্রথম অভিনয়	মঞ্চ
ছত্রপতি শিবাজী *	১৩১৪ শ্রাবণ ৩২ ১৬ আগস্ট ১৯০৭	মিনার্ভা
ছটাকী †	১৩৩৪ পৌষ ৮ ২৪ ডিসেম্বর ১৯২৭	„
তপোবল	১৩১৮ অগ্রহায়ণ ২ ১৮ নভেম্বর ১৯১১	„
জনা	১৩০০ পৌষ ৯ ২৩ ডিসেম্বর ১৮৯৩	„
দক্ষযজ্ঞ	১২৯০ শ্রাবণ ৬ ২১ জুলাই ১৮৮৩	ষ্টার (বীডন ষ্ট্রীট)
দেলদার	১৩০৬ জ্যৈষ্ঠ ২৮ ১০ জুন ১৮৯৯	ক্লাসিক
দোললীলা	১২৮৪ ফাল্গুন ২১ ৪ মার্চ ১৮৭৮	ন্যাশনাল
ধ্রুবচরিত্র	১২৯০ শ্রাবণ ২৭ ১১ আগস্ট ১৮৮৩	ষ্টার (বীডন ষ্ট্রীট)
নন্দদুলাল	১৩০৭ ভাদ্র ১ ১৭ আগস্ট ১৯০০	মিনার্ভা
নল-দময়ন্তী	১২৯০ পৌষ ৭ ২১ ডিসেম্বর ১৮৮৩	ষ্টার (বীডন ষ্ট্রীট)
নসীরাম	১২৯৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩ ২৫ মে ১৮৮৮	ষ্টার (হাতিবাগান)
নিমাই-সন্ন্যাস	১২৯১ মাঘ ১৬ ২৮ জানুঅরি ১৮৮৫	ষ্টার (বীডন ষ্ট্রীট)
পাণ্ডব-গৌরব	১৩০৬ ফাল্গুন ৬ ১৭ ফেব্রুঅরি ১৯০০	ক্লাসিক
পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস	১২৮৯ মাঘ ১ ১৩ জানুঅরি ১৮৮৩	ন্যাশনাল
পারস্য-প্রসূন	১৩০৪ ভাদ্র ২৭ ১১ সেপ্টেম্বর ১৮৯৭	ষ্টার (হাতিবাগান)

* সরকার-কর্তৃক বাজেয়াপ্ত
† দ্র ব. না. ই., ১৯৯

নাটক	প্রথম অভিনয়	মঞ্চ
পাঁচ ক'নে	১৩০২ পৌষ ২২ ৫ জানুঅরি ১৮৯৬	মিনার্ভা
পূর্ণচন্দ্র	১২৯৪ চৈত্র ৫ ১৭ মার্চ ১৮৮৮	এমারেল্ড
প্রফুল্ল	১২৯৬ বৈশাখ ১৫ ২৭ এপ্রিল ১৮৮৯	ষ্টার (হাতিবাগান)
প্রভাস যজ্ঞ	১২৯২ বৈশাখ ২১ ৩ মে ১৮৮৫	ষ্টার (বীডন ষ্ট্রীট)
প্রহ্লাদচরিত্র	১২৯১ অগ্রহায়ণ ৮ ২২ নভেম্বর ১৮৮৪	ষ্টার (বীডন ষ্ট্রীট)
ফণির মণি	১৩০২ পৌষ ১১ ২৫ ডিসেম্বর ১৮৯৫	মিনার্ভা
বড়দিনের বখ্‌শিস	১৩০০ পৌষ ১০ ২৪ ডিসেম্বর ১৮৯৩	"
বলিদান	১৩১১ চৈত্র ২৬ ৮ এপ্রিল ১৯০৫	"
বাসর	১৩১২ পৌষ ১১ ২৬ ডিসেম্বর ১৯০৫	"
বিল্বমঙ্গল ঠাকুর	১২৯৩ জ্যৈষ্ঠ ৩০ ১২ জুন ১৮৮৬	ষ্টার (বীডন ষ্ট্রীট)
বিষাদ	১২৯৫ আশ্বিন ২১ ৬ অক্টোবর ১৮৮৮	এমারেল্ড
বুদ্ধদেবচরিত	১৮৯২ আশ্বিন ৪ ১৯ সেপ্টেম্বর ১৮৮৫	ষ্টার (বীডন ষ্ট্রীট)
বেল্লিক বাজার	১২৯৩ পৌষ ১০ ২৪ ডিসেম্বর ১৮৮৬	"
বৃষকেতু	১২৯১ বৈশাখ ৫ ১৬ এপ্রিল ১৮৮৪	"
ব্রজ-বিহার	১২৮৮ চৈত্র ২০ ১ এপ্রিল ১৮৮২	ন্যাশনাল
ভোট-মঙ্গল	১২৮৯ আশ্বিন ২২ ৭ অক্টোবর ১৮৮২	"
ভ্রান্তি	১৩০৯ শ্রাবণ ৩ ১৯ জুলাই ১৯০২	ক্লাসিক

নাটক	প্রথম অভিনয়	মঞ্চ
মণিহরণ	১৩০৭ শ্রাবণ ৭ ২২ জুলাই ১৯০০	মিনার্ভা
মনের মতন	১৩০৮ বৈশাখ ৭ ২০ এপ্রিল ১৯০১	ক্লাসিক
মল্লিনমালা	১২৮৯ কার্তিক ১২ ২৮ অক্টোবর ১৮৮২	ন্যাশনাল
মলিনা-বিকাশ	১২৯৭ ভাদ্র ২৯ ১৩ সেপ্টেম্বর ১৮৯০	ষ্টার (হাতিবাগান)
মহাপূজা	১২৯৭ পৌষ ১০ ২৪ ডিসেম্বর ১৮৯০	"
মায়াতরু	১২৮৭ মাঘ ১০ ২২ জানুঅরি ১৮৮১	ন্যাশনাল
মায়াবসান	১৩০৪ পৌষ ৪ ১৮ ডিসেম্বর ১৮৯৭	ষ্টার (হাতিবাগান)
মীরকাসিম *	১৩১৩ আষাঢ় ২ ১৬ জুন ১৯০৬	মিনার্ভা
মুকুল-মুঞ্জরা	১২৯৯ মাঘ ২৪ ৫ ফেব্রুঅরি ১৮৯৩	"
মোহিনী প্রতিমা	১২৮৭ চৈত্র ২৮ ৯ এপ্রিল ১৮৮১	ন্যাশনাল
ম্যাক্‌বেথ	১২৯৯ মাঘ ১৬ ২৮ জানুঅরি ১৮৯৩	মিনার্ভা
য্যায়সা-কা-ত্যায়সা	১৩১৩ পৌষ ১৭ ১ জানুঅরি ১৯০৭	"
রাবণবধ	১২৮৮ শ্রাবণ ১৬ ৩০ জুলাই ১৮৮১	ন্যাশনাল
রামের বনবাস	১২৮৯ বৈশাখ ৩ ১৫ এপ্রিল ১৮৮২	"
রূপ-সনাতন	১২৯৪ জ্যৈষ্ঠ ৮ ২১ মে ১৮৮৭	ষ্টার (বীডন ষ্ট্রীট)
লক্ষ্মণ-বর্জ্জন	১২৮৮ পৌষ ১৭ ৩১ ডিসেম্বর ১৮৮১	ন্যাশনাল

* সরকার-কর্তৃক বাজেয়াপ্ত

নাটক	প্রথম অভিনয়	মঞ্চ
শঙ্করাচার্য্য	১৩১৬ মাঘ ২ ১৫ জানুআরি ১৯১০	মিনার্ভা
শাস্তি	১৩০৯ জ্যৈষ্ঠ ২৪ ৭ জুন ১৯০২	ক্লাসিক
শাস্তি কি শাস্তি ?	১৩১৫ কার্তিক ২২ ৭ নভেম্বর ১৯০৮	মিনার্ভা
শ্রীবৎস-চিন্তা	১২৯১ জ্যৈষ্ঠ ২৬ ৭ জুন ১৮৮৪	ষ্টার (বীডন ষ্ট্রীট)
সপ্তমীতে বিসর্জ্জন	১৩০০ আশ্বিন ২২ ৭ অক্টোবর ১৮৯৩	মিনার্ভা
সভ্যতার পাণ্ডা	১৩০১ পৌষ ১১ ২৫ ডিসেম্বর ১৮৯৪	"
সৎনাম	১৩১১ বৈশাখ ১৮ ৩০ এপ্রিল ১৯০৪	ক্লাসিক
সিরাজদ্দৌলা *	১৩১২ ভাদ্র ২৪ ৯ সেপ্টেম্বর ১৯০৫	মিনার্ভা
সীতার বনবাস	১২৮৮ আশ্বিন ২ ১৭ সেপ্টেম্বর ১৮৮১	ন্যাশনাল
সীতার বিবাহ	১২৮৮ ফাল্গুন ২৮ ১১ মার্চ ১৮৮২	"
সীতাহরণ	১২৮৯ শ্রাবণ ৭ ২২ জুলাই ১৮৮২	"
স্বপ্নের ফুল	১৩০১ অগ্রহায়ণ ২ ১৭ নভেম্বর ১৮৯৪	মিনার্ভা
হর-গৌরী	১৩১১ ফাল্গুন ২০ ৪ মার্চ ১৯০৫	"
হারানিধি	১২৯৬ ভাদ্র ২৪ ৮ সেপ্টেম্বর ১৮৮৯	ষ্টার (হাতিবাগান)
হীরক জুবিলী	১৩০৪ আষাঢ় ৭ ২০ জুন ১৮৯৭	"
হীরার ফুল	১২৯১ বৈশাখ ৫ ১৬ এপ্রিল ১৮৮৪	"

* সরকার-কর্তৃক বাজেয়াপ্ত

নাট্যরূপ

'কপালকুণ্ডলা'	১০ মে ১৮৭৩	ন্যাশনাল (শোভাবাজার রাজবাড়ী)
	৪ এপ্রিল ১৮৭৩	গ্রেট ন্যাশনাল
	৩১ মে ১৯০১	ক্লাসিক
'চন্দ্রশেখর' *	১৫ মে ১৯১০	মিনার্ভা
'দুর্গেশনন্দিনী'	২২ জুন ১৮৭৮	ন্যাশনাল
'পলাশীর যুদ্ধ'	৫ জানুঅরি ১৮৭৮	"
'বিষবৃক্ষ'	৯ মার্চ ১৮৭৮	"
'ভ্রমর' †	১৬ সেপ্টেম্বর ১৮৯৯	ক্লাসিক
'মাধবীকঙ্কণ'	২৬ মার্চ ১৮৮১	ন্যাশনাল
'মেঘনাদবধ'	১ নভেম্বর ১৮৭৭	"
'মৃণালিনী'	২১ ফেব্রুঅরি ১৮৭৪	গ্রেট ন্যাশনাল
	২৬ জুলাই ১৯০১	ক্লাসিক
'যমালয়ে জীবন্ত মানুষ'	? নভেম্বর ১৮৭৭	ন্যাশনাল
'সীতারাম'	২৩ জুন ১৯০০	মিনার্ভা

অসমাপ্ত নাটক

অনামী নাটক (৪ অঙ্ক)
গৃহলক্ষ্মী (৪ অঙ্ক)
চোল-রাজ **
নিত্যানন্দ-বিলাস ††
মহম্মদ সা (২ অঙ্ক)
সাধের বউ (১ অঙ্ক) ††

* অতিরিক্ত দৃশ্য গিরিশচন্দ্র-সংযোজিত। দ্র পৃ ৩০৪ প ৫
† অতিরিক্ত দৃশ্য গিরিশচন্দ্র-সংযোজিত। দ্র ভা. না. ১, পৃ ৫৪
** ব. না. ই., ১৯৯
†† ব. না. ই., ২০০

অন্যান্য রচনা

* নাট্যকার : অতুলকৃষ্ণ মিত্র। অভিনয় : এমারেল্ড, ২১ জুলাই ১৮৮৮। দ্র ভা. না. ১, পৃ ৮১

† নাট্যকার : অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। অভিনয় : মিনার্ভা; ৮ এপ্রিল ১৯১১। দ্র হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, 'গিরিশ-প্রতিভা' (কলিকাতা : গ্রন্থকার ১৩৩০), পৃ ৬১২

বিভিন্ন মঞ্চে

১৮৬৯-৭০ : বাগবাজার এ্যামেচার থিয়েটার
১৮৭১-৭২ : ন্যাশনাল থিয়েটার (অবৈতনিক)
১৮৭৩ : ন্যাশনাল থিয়েটার (সাধারণ নাট্যশালা)
১৮৭৪ : গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার (৬ বীডন স্ট্রীট)
জুলাই ১৮৭৭ — ফেব্রুঅরি ১৮৮৩ : ন্যাশনাল থিয়েটার (ঐ)
মে ১৮৮৩ — জুলাই ১৮৮৭ : ষ্টার থিয়েটার (৬৮ বীডন স্ট্রীট)
নভেম্বর ১৮৮৭ — অক্টোবর ১৮৮৮ : এমারেল্ড থিয়েটার (ঐ)
জানুঅরি ১৮৮৯ — ফেব্রুঅরি ১৮৯১ : ষ্টার থিয়েটার (হাতিবাগান)
মে ১৮৯২ — মার্চ ১৮৯৬ : মিনার্ভা থিয়েটার
মার্চ ১৮৯৬ — মার্চ ১৮৯৮ : ষ্টার থিয়েটার (হাতিবাগান)
জুলাই ১৮৯৮ — ডিসেম্বর ১৮৯৮ : ক্লাসিক থিয়েটার (৬৮ বীডন স্ট্রীট)
ডিসেম্বর ১৮৯৮ — মার্চ ১৮৯৯ : মিনার্ভা থিয়েটার
মার্চ ১৮৯৯ — এপ্রিল ১৯০০ : ক্লাসিক থিয়েটার
এপ্রিল ১৯০০ — অক্টোবর ১৯০০ : মিনার্ভা থিয়েটার
নভেম্বর ১৯০০ — নভেম্বর ১৯০৪ : ক্লাসিক থিয়েটার
নভেম্বর ১৯০৪ — জুন ১৯১১ : মিনার্ভা থিয়েটার

বিভিন্ন ভূমিকায়

১৮৬৯ অক্টোবর	সধবার একাদশী	নিমচাঁদ	বাগবাজার এ্যামেচার থিয়েটার
১৮৮২ মে ১১	লীলাবতী	ললিত	ন্যাশনাল (সান্যাল-বাড়ী)
১৮৭৩ ফেব্রুঅরি ২২	কৃষ্ণকুমারী	ভীমসিংহ	„
মার্চ ২৯	নীলদর্পণ	উড্	(টাউন হল)
১৮৭৪ ফেব্রুঅরি ২১	মৃণালিনী	পশুপতি	গ্রেট ন্যাশনাল (শোভাবাজার রাজবাড়ী)
১৮৭৭ অক্টোবর ৩	অকালবোধন	রাম	ন্যাশনাল
ডিসেম্বর ১	মেঘনাদবধ	রাম ও মেঘনাদ	„
১৮৭৮ জানুঅরি ৫	পলাশীর যুদ্ধ	ক্লাইভ	„
মার্চ ৯	বিষবৃক্ষ	নগেন্দ্রনাথ	„
জুন ২২ ↓	দুর্গেশনন্দিনী	জগৎসিংহ	„
১৮৮১ জানুঅরি ১	হামির	হামির	„
মার্চ ২৬	মাধবীকঙ্কণ	সাতটি চরিত্রে	„
এপ্রিল ৯	আলাদিন	কুহকী	„
মে ২১	আনন্দ রহো	বেতাল	„
জুলাই ৩০	রাবণবধ	রাম	„
সেপ্টেম্বর ১৭	সীতার বনবাস	রাম	„
নভেম্বর ২৬	অভিমন্যুবধ	যুধিষ্ঠির ও দুর্যোধন	„
ডিসেম্বর ৩১	লক্ষ্মণ-বর্জ্জন	রাম	„
১৮৮২ মার্চ ১১	সীতার বিবাহ	বিশ্বামিত্র	„
অক্টোবর ৭	ভোট-মঙ্গল	নাচওয়ালা	„
১৮৮৩ জানুঅরি ১৩	পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস	কীচক ও দুর্যোধন	„
জুলাই ২১	দক্ষযজ্ঞ	দক্ষ	ষ্টার
১৮৯৩ জানুঅরি ২৮	ম্যাক্‌বেথ	ম্যাক্‌বেথ	মিনার্ভা
ডিসেম্বর ২৩ ↓	জনা	বিদূষক	„
১৮৯৫ জুলাই ১৩	প্রফুল্ল	যোগেশ	„
১৮৯৬ সেপ্টেম্বর ২৬	কালাপাহাড়	চিন্তামণি	ষ্টার
১৮৯৭ ডিসেম্বর ১৮	মায়াবসান	কালীকিঙ্কর	„

↓ চিহ্ন দিয়ে পরবর্তী কোনো সময়ে মঞ্চাবতরণ বোঝানো হয়েছে।

১৮৯৯	সেপ্টেম্বর ১৬	ভ্রমর	কৃষ্ণকান্ত	মিনার্ভা
১৯০০	ফেব্রুঅরি ১৭	পাণ্ডব-গৌরব	কঞ্চুকী	ক্লাসিক
	জুন ২৩	সীতারাম	সীতারাম	মিনার্ভা
১৯০১	এপ্রিল ৩০ ↓	কপালকুণ্ডলা	পাঁচটি চরিত্রে	ক্লাসিক
১৯০২	জুলাই ১৯	ভ্রান্তি	রঙ্গলাল	”
১৯০২	ডিসেম্বর ২৫	আয়না	সৃষ্টিধর	”
১৯০৩	ফেব্রুঅরি ১৮	বিল্বমঙ্গল	সাধক	”
১৯০৫	মার্চ ৪ ↓	হর-গৌরী	হর	মিনার্ভা
	এপ্রিল ৮	বলিদান	করুণাময়	”
	সেপ্টেম্বর ৯	সিরাজদ্দৌলা	করিমচাচা	”
১৯০৬	ফেব্রুঅরি ১১	দুর্গেশনন্দিনী	বীরেন্দ্রসিংহ	”
	জুন ১৬	মীরকাসিম	মীরজাফর	”
১৯০৭	সেপ্টেম্বর ১৩	ছত্রপতি শিবাজী	আওরঙ্গজেব	কোহিনুর
১৯১০	জানুঅরি ১৫ ↓	শঙ্করাচার্য্য	শিউলি	মিনার্ভা
	মে ১৫ ↓	চন্দ্রশেখর	চন্দ্রশেখর : তিনটি ভূমিকা	”
১৯১১	জুন ১৭	রকমফের	জালি	”

নির্দেশিকা

স্বীকৃতি

অধ্যাপক অলোক রায় মূল 'গিরিশচন্দ্র' বইটি ও
অধ্যাপক চিত্তরঞ্জন ঘোষ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের 'গিরিশ-প্রতিভা' বইটি দিয়ে এবং
শ্রী জগন্নাথ ভট্টাচার্য প্রুফ দেখার দায়িত্ব নিয়ে সম্পাদনার কাজে সহায়তা করেছেন।
কৃতজ্ঞতা জানাই।